আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

তিন খণ্ডে সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

বিষণ্ণ প্রভাত

STATE CENTRAL LIBRARY W.B.
Road, Calcutta

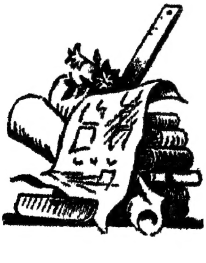

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ

প্রথম সংস্করণ ঃ **ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫** ॥

আলেক্সি তল্‌স্তয়ের **অর্ডিয়েল** উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড **ব্লিক মর্নিং** মূল রুশভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ঃ **আইভি লিৎভিনোভা** ও **তাতিয়ানা লিৎভিনোভা** ॥

ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশক ঃ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো ॥

তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ঃ **সোমনাথ লাহিড়ী** ॥

প্রচ্ছদপট ঃ **খালেদ চৌধুরী** ॥

প্রকাশক ঃ **সুরেন দত্ত**

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২॥

মুদ্রক ঃ গোপালচন্দ্র রায়,
নাভানা প্রিন্টিং ওঅর্কর্স লিমিটেড,
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যু, কলিকাতা

ছ' টাকা ॥

এই উপন্যাসের আগের দুই খণ্ড
দুই বোন
ও
উনিশ-শো আঠারো

তৃতীয় খণ্ড

বিষন্ন প্রভাত

রচনা সমাপ্তিকাল

২২শে জুন, ১৯৪১

VOLTAS-VOLKART EMPLOYEES' UNION LIBRARY
CALCUTTA.

বিজয়ীর জীবন,
না হয় গৌরবের
নাশ*

আগুনের ধারে বসে আছে একটি মেয়ে, আর একজন পুরুষ। স্তেপের মাঝখানে নালা, সেখান থেকে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে ওদের পিঠে লাগে। শস্যহীন, শুকনো গম-গাছগুলোর মধ্যে বাতাস শোঁ শোঁ ক'রে বেড়ায়। ঘাগরা

---

* সুভিয়াতোস্লাভ (অনুমান ৯৪২—৯৭৩ খৃষ্টাব্দে)—কিয়েভ রাজ্যের রাজা। নির্ভীকতার জন্যে ইনি বিখ্যাত ছিলেন।

দিয়ে পা-টা ঢেকে আস্তিনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বসল মেয়েটি। ওর মাথার শাল একেবারে চোখ পর্যন্ত নামানো, চেহারার মধ্যে দেখা যায় শুধু খাড়া নাকটা, আর মুখটুকু। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখটা এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

তেমন কিছু আগুন নয়। গরুটরু যেখানে জল খায়, সেখান থেকে ক'খানা ঘুঁটে কুড়িয়ে এনেছিল লোকটি—সেই ক'খানাই ধিকি ধিকি জ্বলছে। তার ওপর হাওয়াটা আবার জোর ধরল—ওদের অবস্থা আরও কাহিল।

"যখন ঘরে বসে আগুনের ধারে মৌজ করি, কিংবা উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার বাইরে চাই, তখন স্বভাবের শোভা তারিফ করা খুবই সহজ। কিন্তু নিরানন্দ স্তেপের মাঝখানে বসে তো সহজ লাগে না। বাপরে, এখানে এ কী কষ্ট!"

কথা বলছিল পুরুষ লোকটি, নীচু সুরে। সে সুর তিক্ত, কিন্তু তাতে সন্তোষেরও আমেজ পাওয়া যায়। ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধবাক্ বসে রইল মেয়েটি। একে তো ক্ষিধের জ্বালা আর লম্বা সফরের ধকল, তার ওপর আবার কী যে বকতে পারে এই লোকটা, ওকে একেবারে হয়রান করে ফেলেছে। লোকটাও তেমনি, মনের গোপন কথাগুলো পর্যন্ত দিব্যি আন্দাজ করে বলে দেয়, ভাবে কী কেরদানিই না করছে! ঘোমটার ভেতর থেকে ঘাড় কাত করে মেয়েটি সুমুখপানে চেয়ে রইল। দূরে দূরে ঝাপ্সা ঝাপ্সা পাহাড়—তারই পেছনে শরতের দীপ্তিহীন সূর্য তখন অস্তে চলেছে। সূর্যাস্ত তো নয়, কালো আকাশের মাঝখানে সামান্য একটু ফাটল মাত্র। জনহীন স্তেপ যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

"দেখ শ্রীমতি দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, এবার আমাদের আত্মাপুরুষটাকে খুশি করা যাক—কটা আলু সেঁকে নিই এসো। ...... আমি না থাকলে তুমি কী যে করতে ভেবেও পাইনে!"

একটু বেঁকে শক্ত কখানা ঘুঁটে তুলে নিল ঘুঁটের গাদা থেকে। তারপর বেশ করে উল্টে পাল্টে তবে আগুনে বসাল। কোটের পকেটটা প্রকাণ্ড, তার থেকে বার হল আলু। জ্বলন্ত ঘুঁটেগুলো একটু খুঁচিয়ে আলু চাপিয়ে দিল। ওর মুখের রং লালচে। নাকটা মোটা, তবে ডগার দিকে চ্যাপ্টা হয়ে এসেছে। পাতলা দাড়ি, সুতোর মতো গোঁফ। মুখ দেখলে মনে হয়, লোকটা বোধ হয় চালাক চতুর। তবে ধূর্তের শিরোমণি হওয়াও অসম্ভব নয়। লোকটার একটা বদ অভ্যাস আছে—ঠোঁট দিয়ে চপ্ চপ্ শব্দ করে অনবরত।

"খালি খালি তোমার কথাই ভাবি দারিয়া দ্মিত্রেভ্না," লোকটি বলল। "জীবনের ওপর তোমার দখল বড় আলগা, হিংস্রতা না থাকলে কি চলে? তুমি সভ্য তা মানি, তবে সেও শুধু ওপর ওপর, বুঝলে বাছা।...তুমি হচ্ছ গোলাপী আপেল—মিষ্টি কিন্তু অপরিপক্ক।......"

বলছে আর আলুগুলোকে এ-পিঠ ও-পিঠ করছে। ওগুলো চোরাই আলু, আসার পথে একটা সব্জী ক্ষেত থেকে চুরি করে এনেছে। বোধ হয় সেই

কথাটারই ইঙ্গিত দিয়ে ওর নাকটা পিট-পিট করে। আবার আগুনের তাতে ঝকমকও করে। ওর নাম কুজ্মা কুজ্মিচ নেফেদভ। এন্তার বক্বক্ করে, আবার মনের কথা সব ফাঁস করে দেয়—দাশাকে পাগল করে তুলল লোকটা।

মাত্র ক'দিন আগে ওদের পরিচয়, রেলগাড়ীতে। সে গাড়ীও তেমনি। না ছিল সময়ের বাঁধন, না ছিল রাস্তার ঠিক-ঠিকানা। শেষ পর্যন্ত হোয়াইট কসাকরা এসে ডিরেল-ই করে দিল।

দাশা ছিল শেষের কামরায়—সে কামরাটা লাইন থেকে সরেনি। কিন্তু গাড়ীর দিকে কটা গুলি আসতেই যাত্রীরা সব ভোঁ দৌড়, একেবারে দূরে স্তেপের মধ্যে। গাড়ীতে থাকলেই সব লুটে পুটে নেবে, মেরে ধরে শেষ করবে—এই তখনকার নিয়ম। কাজেই যাত্রীদের ভয় হবারই কথা।

দাশার দিকে কুজমার নজর গিয়েছিল গাড়ীতে থাকতেই, কেন জানি একটু মায়াও পড়েছিল। দাশা অবিশ্যি চুপচাপই ছিল। কিন্তু ভোরবেলা নির্জন স্তেপের মধ্যে একলা পড়ে দাশা নিজেই আর ওকে ছাড়তে চায় না। ভয়ঙ্কর অবস্থা তখনঃ বাঁধের নীচে গাড়ীগুলো উল্টে আছে, সেখান থেকে গুলীর আওয়াজ আর মানুষের কান্নার শব্দ আসে। তারপর আগুন জ্বলে উঠল, মাঠের ওপর নাচতে লাগল গাছ-গাছালির বিষণ্ণ ছায়া—বুড়ো ভাঁটুই আর শুকনো নাগদোলার প্রতিবিম্ব পড়ল আগুনের আলোয়। সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে দাশা পথ চিনবে কি করে?

ভোরের সবুজ ঘনিয়ে আসছিল। দাশার পাশাপাশি চলে কুজমা কুজমিচ—যেদিকে উনুনে আগুন দেওয়ার গন্ধ সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এন্তার বকর বকরঃ "সুন্দরী, তুমি ভয় তো পেয়েছই, তার ওপর তোমার মনেও সুখ নেই। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। অনেক ঘাটের জল খেলাম, কিন্তু মনের অসুখ তো টের পেলাম না কখনো, একঘেয়েমি মানে কি তাও বুঝলাম না। ছিলাম পাদ্রী—স্বাধীন চিন্তার অপরাধে পাদ্রীর কুর্তা কেড়ে নিল, বন্ধ করে রাখল মঠের মধ্যে। আর এখন বন্ধনই নেই; অবাধে ঘুরে বেড়াই বাতাসের মতো—সারা দুনিয়াই আমার ঘরবাড়ী। গরম বিছানা নইলে যাদের সুখ হয় না, পরিপাটি আলোটি, বই-এ ঠাসা আলমারিটি যাদের চাই-ই চাই—সুখের মর্ম তারা কোন দিনই বুঝবে না। কাল সুখ আসবে, কাল সুখ আসবে করতে করতেই ওদের কর্ম শেষ, হঠাৎ একদিন দেখা যায় আর কালও নেই, গরম বিছানাও নেই। চিরটা কালই এদের শুধু হা অদৃষ্ট জো অদৃষ্ট। কিন্তু আমাকে দেখ তো! কেমন দিব্যি মাঠে মাঠে ঘুরি আর তাজা রুটির গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি, ঐ যে ওখানে গ্রাম আছে, এখুনি কুকুরের ডাক শুনতে পাব।......আরে সাবাশ! দেখ, দেখ, সূর্য উঠছে একবার চেয়ে দেখ! আহা, আজ আমার পথের সাথী যে-জন তার মুখ দেখলে মনে হয় যেন দেবী, কিন্তু সে মুখে দুঃখের ছায়া। সহানুভূতির আবেগে আমি যে আর থাকতে পারিনে, ইচ্ছে করে বাচ্চা ঘোড়ার মতো লাফালাফি করি। আমি কে জান?

আমি হচ্ছি সুখী লোক, আমার মতো সুখী আর নেই। পকেটে নুনের পুরিয়া তো রাখাই আছে। তার সঙ্গে গোটা কয়েক আলু, তা ইচ্ছে হলেই নিয়ে আসতে পারি, সব্জি ক্ষেতের অভাব কি? ব্যস আর কি চাই? মানুষের দুনিয়া—সেখানে তো খালি আবেগ আর উত্তেজনা আর হানাহানি। দেখ দারিয়া, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভাগ্য সম্বন্ধে আমি বহুদিন ধরে ভেবেছি।... ওদের ভাবসাব কিন্তু ঠিক রুশদের মতো নয়—তা বলতেই হবে। সে জন্যেই তো ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বাতাসে মিলিয়ে গেল। হায়, হায়, কিছুই রইল না অবশেষে! অথচ আমাকে দেখ! পাদ্রী থেকে নাম কেটে দিয়েছে, এখন দিব্যি হেসে খেলে বেড়াই। যদ্দিন ইচ্ছে এমনি করেই দিন কাটাব, তাও বলে রাখছি।"

ও ছিল তাই রক্ষে, নইলে দাশা গিয়েছিল আর কি। কোনো অবস্থাতেই ঘাবড়ায় না লোকটা। চলতে চলতে সূর্যোদয়ের সময় ওরা একটা জোতবাড়ীতে এসে ঠেকল। রিক্ত নগ্ন প্রান্তরেরর মধ্যে বসতি শুধু ঐ একটি। বাড়ীটার আস্তাবল ফাঁকা, মেটে দেওয়ালের ওপর ছাতটা আগুনে পুড়ে গেছে। কুয়োর কাছে এসে দেখা এক বুড়ো কসাকের সাথে—তার হাতে বন্দুক, মুখে রাগের ঝাঁঝ। কোঁচকানো ভ্রূর নীচে হাল্কা চোখ দুটো পাগলের মতো জ্বলজ্বল করছে। বুড়ো ওদের চেঁচিয়ে বলল—দূর হও। কিন্তু বুড়োকে বাগিয়ে আনতে কুজমার আর কতক্ষণ লাগে।

"আরে দাদু, চলে যাব কি রকম!" চেঁচিয়ে বলে কুজমা। "ও আমার দেশের মাটি, তোমার কোলে মরাও ভাল! বিপ্লব আমাদের তাড়া করেছে, দিনরাত খালি ছুটছি। পা কেটে গেল, গলা শুকিয়ে গেল, তবু ছোটার কামাই নেই। আমাদের গুলী করবে? কর! যাই কর আর তাই কর, আমাদের যাবার তো আর জায়গা নেই!"

যাই হোক শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল, বুড়ো দেখতে যত ভয়ঙ্করই হোক, আসলে ওর অবস্থাটা খুবই করুণ। ওর ছেলেদের নিয়ে গেছে মামন্তভের ফৌজে, আর ছেলের বৌ দুটো হাঁটা দিয়েছে গাঁ-মুখো। এ বছর বুড়োর চাষই হয়নি। ওর একটিমাত্র ঘোড়া নিয়ে গেল রেডরা*। তারপর এল হোয়াইট†, তারা 'জবর দখল' করল হাঁস আর মুরগি। এখন একা একা শুধু ও-ই থাকে জোতবাড়ীতে। ছাতাধরা এক টুকরো শুকনো রুটি আর গত বছরের সঞ্চয় থেকে কয়েক আউন্স তামা—এই ওর সম্বল, ব্যস্......

ওখানে ওরা বিশ্রাম করল, তারপরে ফের চল্ল রাতের বেলা। চলেছে জারিতসিনের দিকে—সেখান থেকে দক্ষিণে যাওয়ার একটা উপায় হয়তো হতে পারে। রাত্রে পথ হাঁটে আর ঘুমোয় দিনের বেলা। মাঠে মাঠে গত বছরের খড় গাদা করা আছে—বেশীর ভাগ সময় তার ওপরই শয্যা পাতে। লোকালয়ের দিকে

---

*রেড=কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট পক্ষীয় লোক + হোয়াইট=প্রতিবিপ্লবী পক্ষ

যায় না। একবার একটা খড়ি-মাটির ঢিবির ওপর উঠেছিল কুজমা। নীচে গ্রাম—লম্বা পুকুরের দুধারে এলোমেলো ছড়ানো শাদা শাদা কুঁড়ে ঘর। দেখে ও বলল :

“যে জায়গায় মানুষ জমাট বেঁধে থাকে, সে জায়গায় আজকাল বিপদের সম্ভাবনা; নিজে কি চায় তা যে নিজেই জানে না, তার পক্ষে তো আরও বিপদ। নিজের অভাব নিজেই জাননা বললে লোকে ভাবে হেঁয়ালি করছ, তাদের সন্দেহ হয়। দেখ দারিয়া, রুশরা দপ ক'রে জ্বলে ওঠে বটে, কিন্তু রুশদের আত্মবিশ্বাস আছে। নিজেদের শক্তি বড় করে দেখাই ওদের স্বভাব। রুশ মানুষকে একটা কাজ দিয়ে দেখ—এমন কাজ যা ওর সাধ্যাতীত বলে মনে হতে পারে। যদি কাজের মতো কাজ হয় তাহলে ওর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকবে না, পায়ের ধুলো নিয়ে ছাড়বে।......কিন্তু একবার গাঁয়ের দিকে চল তো—দেখবে কী জেরার চোট! তখন কী জবাব দেবে তুমি, বল না গা বুদ্ধিজীবী? তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি এখনো দুলছ, কোনো বিষয়েই কোনো মীমাংসায় পৌঁছতে পারনি।......”

“উঃ!” একটু রেহাই দিন. নীচু স্বরে দাশা বলল। দাশার কথা বলতে ভাল লাগছিল না। তা ছাড়া একটু গুমোরও ছিল। প্রথমে ও তাই কিছুই বলতে চায়নি। তবু কুজমা কি ছাড়ে? দাশার বাপ ডাঃ বুলাভিন, স্বামী রেড কম্যাণ্ডার ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন. বোন কাতিয়া—“সুন্দরী দরদী, উচ্চমনা” কাতিয়া—এক এক করে সব কথাই বের করে নিয়েছিল কুজমা কুজমিচ। তারপর একদিন অবাক কাণ্ড! দিনটা ভারি সুন্দর! সারা বেলা দিব্যি ঘুম দেবার পর দাশা নদীতে গা ধুয়ে এসেছে। শালের তলে চুলগুলো আলুথালু হয়ে, গিয়েছিল, সেগুলো আঁচড়েছে, পেটেও কিছু পড়েছে। মনটা তখন বেশ খুশি খুশি। আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ দেখে যে, নিজের বৃত্তান্ত নিজেই বলে চলেছে :

“মানে কি ক'রে এত কাণ্ড হ'ল দেখুন।...সামারায় বাবার কাছে আর থাকা যায় না।...আপনার ধারণা, আমি একটা পরগাছা। আমার নিজের ধারণা আবার আরও খারাপ।...কিন্তু ত বলে নিজেকে নীচাদপি নীচ ভাবতে হবে, সে অপমান আমি সইতে পারিনে--না পারিনে, সোজা কথা......”

“সে আমি বেশ বুঝতে পারছি”, ঠোঁট চকচক করতে করতে কুজমা কুজমিচ জবাব দিল।

“না, পারছেন না”, আগুনের শিখায় চোখ দুটিকে কুঁচকে এনে বলল দাশা। “শুধু একটি মুহূর্ত আমার সঙ্গে দেখা করবে, তারই জন্যে আমার স্বামী জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ করেছে। তার শক্তি আছে, সাহস আছে—একবার মনস্থির করলে আর তাকে টলানো যায় না।...আর আমি কী? আমার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্যে মরণের ঝুঁকি নিয়ে লাভ কোথায়? সেবার ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জানলায় মাথা ঠুকেছি। বাবাকে ঘৃণা করেছি।......সব দোষই তো তাঁর। একেবারে অসম্ভব মানুষ, দেখলে ঘেন্না হয়। ঠিক করলাম, একাতেরিনোস্লাভ

যাব; দিদি কাতিয়া, তাকে খুঁজে বার করব। ও ঠিক বুঝত, সাহায্যও করত। আহা, দিদির আমার কী বুদ্ধি, কী দরদ! হাসবেন না! যা সবাই করে আমি তাই করতে চাই—যা মহৎ, যা দরকারী—হ্যাঁ তাই করতে চাই!......কিন্তু কি নিয়ে শুরু করব জানিনে তো। থাক, থাক আর বিপ্লবের বক্তৃতা শোনাতে হবে না......"

"আমি তো বক্তৃতা শোনাতে যাচ্ছিলাম না মা লক্ষ্মী। তোমার কথা খুব মন দিয়েই শুনছি। আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করো।"

"রাখুন আপনার 'আন্তরিক'।...কি বলছিলাম? হ্যাঁ, ঠিক সেই সময়েই লাল-ফৌজ এসে সামারা পৌঁছল। অমনি গবর্মেণ্টও চম্পট—ওদের যা কাণ্ড-কারখানা, দেখলে ঘেন্না ধরে যায়।...বাবা চান আমি তাঁর সঙ্গে যাই। উঃ কী ঝগড়াটাই না হল! স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল দুজনেরই, মানে তাঁর আর আমার!......বাবা পুলিশ ডেকে পাঠালেন। বললেন, "এর জন্যে তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।" পুলিশ-টুলিশ অবিশ্যি আসেনি। আসবে কোত্থেকে, তারাও তো সব পালিয়েছে।......খালি ব্রীফকেসটা নিয়েই বাবা তো ভোঁ দৌড়, এক দৌড়ে একেবারে রাস্তায়। চেঁচিয়ে জানলা থেকেই তাঁকে শেষ কথা শুনিয়ে দিলাম।...... নিজের বাপকে যদি ঘৃণা করা যায় তো সে ঘৃণা হয় একেবারে বিষের মতো! হুঁ, তারপর শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম সোফার ওপর—প্রাণ খুলে কাঁদতে হবে। অতীতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ—ঐখানে, ঐ মুহূর্তে......"

স্তেপের ওপর দিয়ে এমনি করেই ওদের পথ চলা। জীবন্ত মানুষের সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ই না। গৃহযুদ্ধের আবর্তে উৎক্ষিপ্ত ছোট বড় কত গ্রাম পার হয়ে যায়, কিন্তু জানেওনা যে সেখানে কী রক্তারক্তি চলেছে। আগস্ট মাসে দন কসাক আর্মি* দারুণ মার খেয়েছিল, পঁচাত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে এবার তারা ফের অভিযানে চলেছে—জারিতসিন শহর অবরোধ করবে। কিন্তু এসব রক্তারক্তির খবর ওরা জানেও না।

ছাইয়ের মধ্যে আলু খুঁজতে খুঁজতে কুজমা বলল:

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তুমি যদি খুব ক্লান্ত হয়ে থাক তা হলে আজ রাতটা বিশ্রাম করা যায়—তাড়াতাড়ি কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ডেরার জায়গাটা বড় খারাপ। নালা থেকে হাওয়া আসবে, ঘুমতে দেবে না। তার চেয়ে চল, মাথার ওপর দিব্যি তারাভরা আকাশ, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই চল। মরি, মরি কী সুন্দর পৃথিবী!" শেয়ানা শেয়ানা, লালচে মুখটা তুলে ধরে আকাশের দিকে—নভোমণ্ডলের অর্থনীতিতে সব ঠিক আছে কিনা তাই যেন পরীক্ষা করে দেখছে। বলে, "আচ্ছা দেখ, পৃথিবীর পথে আমরা দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; গুটি গুটি চলি, তবু আমাদেরই চোখের সামনে ভিড় করে আসে কত বিচিত্র দৃশ্য—একের পর এক, আশ্চর্যের পর পরমাশ্চর্য; অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আমরা

---

* আর্মি=ফৌজ

পর্যবেক্ষণ করি, সিদ্ধান্ত টানি, সে সিদ্ধান্তের পেছনে কোন বাধ্যবাধকতা পর্যন্ত মানিনে; তারপর দেখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও নিবৃত্তি করি, অথচ তার জন্যে বিবেকে আঘাত লাগতে দিইনে এতটুকু! এই যে গোটা ব্যাপারটা এটা কি তোমার কাছে চরম বিস্ময় বলে মনে হয় না? ...না, এ পথের শেষে পৌঁছাবার জন্যে ব্যস্ত না হওয়াই ভাল।"

ছোট্ট এক পুরিয়া নুন বার করল পকেট থেকে। একটা আলু নিয়ে হাতে করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আঙুলে ফুঁ দিল, তারপর আলুটা ফাটিয়ে এগিয়ে দিল দাশার দিকে।

"আমি বই ঘেঁটেছি বিস্তর, তাতে মনের মধ্যে শুধু গণ্ডগোলই পাকিয়েছে। মঠে বন্দী ছিলাম, বিপ্লব এসে সেখান থেকে আমাকে মুক্তি দিল, ছুঁড়ে ফেলে দিল জীবনের মাঝখানে, বেশ কঠোরভাবেই। সারাতভ জেলার পুলিশের কর্তামশাই আমাকে চৌদ্দ দিন হাজতে পুরে রেখেছিলেন। খাসা বুদ্ধিমান লোক তিনি, নিজের হাতে পরিচয়পত্র লিখে দিলেন: পেশা—পরগাছা; শিক্ষা—আপাত বৈজ্ঞানিক; মতামত—নাই। এইভাবে, বুঝলে দারিয়া দেবী, যখন দেখলাম আমি একেবারে স্বাধীন, নুনের পুরিয়া ছাড়া পকেটে আর কিছুই নেই, তখনই জানলাম জীবনের অলৌকিক রহস্য কী জিনিস। যত সব অকেজো জ্ঞান-বুদ্ধি মনের মধ্যে জুড়ে বসেছিল, সে সব খসে পড়তে লাগল। কিন্তু বিনিময়-মূল্যরূপে তার কিছু অংশ বেশ কাজ দিল।......যেমন ধর, সামুদ্রিক শাস্ত্র অর্থাৎ মানুষের হাত দেখার বিদ্যাটা শিখেছিলাম বলেই তো আজ নিয়মিতভাবে নুন জোগাড় করতে পারছি।"

দাশার মন অন্য দিকে। কেন জানি ওর ভয়ানক কাঁদতে ইচ্ছে করে। হতাশায় আকুল বাতাস গমের ডাঁটায় ডাঁটায় কর্কশ বিষণ্ণ শব্দ তুলছে, তাই শুনে হয়তো ওর কান্না পায়। ঝাপসা সূর্যাস্তের পানে মুখ ফেরায় বারে বারে। ইভান আর কাতিয়াকে খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে আপন সত্তাকে—পাড়ি দিতে হবে এক অসীম থেকে আর এক অসীমে—সেই ভাবনায় ওর মন তখন হতাশামগ্ন। আগের দিন হলে নিজেকে করুণা করেই দাশা কিছুটা সন্তোষ পেত:—আহা, এতটুকু দাশা, এত অসহায়—সীমাহীন, শীতার্ত স্তেপভূমির মধ্যে একেবারে নিঃসঙ্গ।......কিন্তু এখন নয়, আর নয়।......কুজমার হাত থেকে আলুটা নিয়ে চিবোয় আর চোখের জলে ঢোঁক গেলে দাশা। ......কতদিন আগে পেত্রোগ্রাদ থাকতে কাতিয়ার চিঠি পেয়েছিল, তারই কটা কথা মনে আসে ঃ "অতীত চলে গেছে দাশা, চিরকালের মতো চলে গেছে......"

"বাস্তব জীবন থেকে পূর্ণ বিচ্ছেদ আর তার সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন ব্যস্তসমস্ততা—এ ছাড়াও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আর একটা বদ অভ্যাস আছে। সে বদ অভ্যাস হল চরিত্রভ্রষ্টতা, উদ্ধত রকমের চরিত্রভ্রষ্টতা, বুঝলে দারিয়া দেবী।......আমাদের বৃত্তিজীবীদের হাঁটার কায়দা দেখনি কখনো? উদারনীতিক বাবুরা চলেন, মনে হয় যেন জ্বলন্ত কয়লার ওপরই পা দিচ্ছেন।

এ দৃশ্য নিশ্চয়ই দেখেছ।......দেখলে মনে মনে প্রশ্ন না করে পারবে না, ‘আচ্ছা লোকটা এত ছুটে ছুটে যাচ্ছে কোথায়’......?”

ওর এই একঘেয়ে বক্তৃতা শুনে শুনে কান ঝালাপালা। বাহাদুরি আর হামবড়াইয়ের আর শেষ নেই।

“নিশ্চয়, আমাদের এগিয়ে চলতেই হবে” বলে দাশা শালটা আরও শক্ত করে জড়িয়ে নেয়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চায় কুজমা কুজমিচ। এমন সময় হঠাৎ আলোর ঝলক—অন্ধকার নালার বুকে অগ্নিশিখা ফুটে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে। আর নালার পাশে পাশে জাগছে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনি।......

নির্জন স্তেপের আকাশে সূর্যাস্তের শীর্ণ খণ্ডটুকু দূরে মেঘের আড়ালে অপসৃয়মান। প্রথম গুলিবর্ষণের শব্দ মেলাতে না মেলাতে জনশূন্য স্তেপভূমি হঠাৎ মানুষে মানুষে জীবন্ত হয়ে উঠল। শালের দু’মুড়ো আঁকড়ে ধ’রে বসেছিল দাশা, খাড়া হয়ে দাঁড়াবারও সময় পায়নি। পায়ের চাপে আগুনটাকে তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিতে গেল কুজমা কুজমিচ। কিন্তু জোর বাতাসে অঙ্গারগুলো জ্বলে উঠল, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ল। আগুনের শিখায় দেখা গেল: নালার ওধার থেকে গুলি চলছে, আর গুলি থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ঘোড়া ছুটিয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার। জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে চাবুক চালাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে।

ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর আবার নিস্তব্ধ। কিন্তু দাশার বুকের স্পন্দন স্তব্ধ হয়নি। একটু পরে নালার ওধার থেকে চিৎকার শোনা গেল, মুহূর্তের মধ্যে লোক বেরুতে লাগল কাতারে কাতারে। খুব সাবধানী গতিবিধি তাদের। অল্পক্ষণ যেতে না যেতে তাদের বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল স্তেপের ওপর। যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরই একজন ঘুরে এল আগুন লক্ষ্য করে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিশোর গলায় হাঁক দিল : “তোমরা কে ওখানে?” অমনি কুজমা কুজমিচের হাত একেবারে মাথার ওপর, আঙুল কটাও ঝট্ করে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফৌজী গ্রেট-কোট পরা এক যুবক এল সামনে। তার কালো ভ্রু-আঁকা মুখ বেশ দৃঢ়তাপূর্ণ। আগুনের পাশে যুগল মূর্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্ল: “তোমরা কি স্কাউট? হোয়াইট?” জবাবের জন্যে অবিশ্যি অপেক্ষা করল না। কুজমার গায়ে রাইফেলের কুঁদোর ঘা দিয়ে বলল, “চল, চল, রাস্তায় বোলো তা হলেই হবে......।”

“আমরা শুধু......”

“শুধু কি? দেখছ না একটা লড়াই চলছে?”

আর প্রতিবাদ না ক’রে কুজমা পা বাড়াল। ওর পাশে দাশা, সঙ্গে পাহারা। ডিট্যাচমেণ্টটা এত তাড়াতাড়ি চলেছে যে তার সঙ্গে তাল রাখতে ওরা প্রায় ছুটে ছুটেই চলে। চলতে চলতে যেখানে পৌঁছাল সেখানে কতকগুলো চালাঘর। কাছেই পুকুরের ধারে সাজ-খোলা ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি

করছে, গাড়ীটাড়ী সব এমনিই পড়ে আছে। তখন বেশ অন্ধকার। ডিট্যাচমেণ্টটাকে কে যেন থামতে বল্লে। অমনি বক্তাকে ঘিরে ধ'রে সৈন্যরা সবাই এক সঙ্গে কলরব করে উঠল ঃ

“আমরা হটে এসেছি। তা ছাড়া উপায় ছিল না, শালারা যে একেবারে পাশে এসে গেছে। আমরা তো ওদের ঘোড়সওয়ার টহলদারদের মুখেই পড়ে গিয়েছিলাম—এই কাছেই, ঠিক নালাটার পাশে।”

“অমনি বীরের মতো পিট্‌টান দিলে?”—যে লোকটি ওদের থামতে হুকুম করেছিল, ব্যঙ্গ করে সে বল্ল। “তোমাদের কম্যাণ্ডার কোথায়?”

“কম্যাণ্ডার? হোই, কম্যাণ্ডার! ও ইভান! জলদি আসুন—রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার ডাকছেন!”

একজন লোক বেরিয়ে এল অন্ধকারের মধ্যে থেকে। লোকটি লম্বা। একটু কুঁজোও বটে।

“সব ঠিক আছে কমরেড রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার, কেউ ঘায়েল হয়নি।”

“শান্ত্রী মোতায়েন করুন। দূরে একটা ঘাঁটি বসাতে হবে, লোক পাঠান: তারপর আপনার লোকজনকে খেতে দিন। আলোটালো দেখাবেন না যেন। সব শেষ হলে আমার চালায় আসবেন।”

লোকজন সব ছত্রভঙ্গ হল। জোতবাড়ীতে তখন আর যেন মানুষই নেই। কেবল চাপা সুরের আদেশ আর অন্ধকারে শান্ত্রীদের চ্যালেঞ্জ—এ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। তারপর এসব শব্দও স্তব্ধ হয়ে এল। শুধু বাতাস বয়ে চলে, চালের খড়ের মধ্যে খস খস শব্দ ওঠে, পুকুর পাড়ে উইলো গাছের রিক্ত শাখায় করুণ গুঞ্জন শোনা যায়। যে সিপাহীটি দাশা আর কুজমা কুজমিচকে খুঁজে এনেছিল সে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। জোতবাড়ীর মাথার ওপর তারার ঝিকিমিকি, সেই আলোতে সিপাহীর রোগা, ফ্যাকাশে মুখটি চোখে পড়ে, কালো ভ্রূ দুটিও দেখা যায়। বেশ খুঁটিয়ে দেখে দাশা একেবারে স্থির নিশ্চয় করে ফেল্ল যে, সিপাহীটি আসলে মেয়ে। “আমার পেছনে এস”, বলে সে ওদের চালাঘরের ভেতরে নিয়ে এল। “দরজার কাছে অপেক্ষা কর। জায়গা করে কোথাও বসেও যেতে পার।”

বলে দরজা খুল্ল। তারপর পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরের ভেতরে ডিট্যাচমেণ্ট কম্যাণ্ডারের রুক্ষ গলার একঘেয়ে আওয়াজ চলেছে তো চলেছেই। দাশা শেষকালে কুজমার কাঁধের ওপর ঢলেই পড়ল! “কিছু ভেবো না—সব ঠিক হয়ে যাবে,” ফিসফিস করে বলে কুজমা। সেই সিপাহীটি এবার বাইরে এল—ওদের দুজনকেই খুঁজছে। বল্ল. “আমার পেছনে এস।” ওদের আগে আগে উঠোনে নেমে সিপাহী এদিক ওদিকে খোঁজে—বন্দীদের রাখতে হবে, জায়গা চাই। শেষকালে ওদের একটা গোলাঘর দেখিয়ে দিল। গোলাঘরের দরজা নেই, একেবারে কব্জা থেকে উপড়ে নিয়ে গেছে। দাশা আর কুজমাকে ভেতরে পাঠিয়ে সিপাহী বসে রইল চৌকাঠের ওপর।

হাতে রাইফেল, সেটিকে কিছুতেই হাতছাড়া করে না। গোলাঘরের মধ্যে ময়দা আর ইঁদুরের গন্ধ।

দাশার মনে হতাশার ভাব। তবু বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে: "তোমার পাশে বসতে পারি? ইঁদুরের ভয় করে বড্ড।"

অনিচ্ছুকভাবে সিপাহী জায়গা দেয়, তার পাশে ঝনকাঠের ওপর বসে পড়ে দাশা। হঠাৎ প্রাণ খুলে হাই তোলে সিপাহী ঠিক ছেলেমানুষের মতো। দাশার দিকে আড়চোখে চায়।

"তোমরা তা হলে গুপ্তচর, তাই না?"

"দেখুন কমরেড", অন্ধকারে সিপাহীটির কাছে সরে আসতে আসতে কুজমা কুজমিচ বলে, "ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে দিন......"

"পরে বোঝাবেন......"

"আমরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক, বাস্তুহারা......"

"শান্তিপ্রিয়! 'শান্তিপ্রিয়' বলার অর্থ কি? শান্তিটা পেলেন কোথায় শুনি?"

দরজার বাজুতে দাশার মাথাটা হেলানো। সিপাহীর মুখের দিকে চাইল দাশা—কালো ভ্রূ-আঁকা সুন্দর মুখশ্রী, নাকের শেষ প্রান্তটি বঙ্কিম রেখায় সূক্ষ্ম হয়ে এসেছে। অভিমানের ভঙ্গিতে বাঁকানো ছোট্ট মুখখানি। আর চিবুক একেবারে শিশুর মতো। হঠাৎ দাশা শুধালঃ

"তোমার নাম কি?"

"তাতে তোমাদের মামলার কি আসে যায়?"

"তুমি কি মেয়ে?"

"যদি তাই হই, তাতেও তোমাদের কোনো সুবিধা হবে না।"

কথা হয়তো ওখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ওর মুখ থেকে দাশা আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

"আমার সঙ্গে শত্রুর মতো কথা বলছ কেন?" কোমল স্বরে ও জিজ্ঞাসা করে। "তুমি তো আমার কিছুই জান না। তবে আমাকে শত্রু বলে ধরে নাও কেন? ঠিক তোমারই মতো আমিও একজন রুশ মেয়ে, আর কিছু নয়। ......তফাৎ শুধু এইটুকু যে, আমাকে বোধ হয় তোমার চেয়েও কষ্ট পেতে হয়েছে......"

"রুশ! 'রুশ' বলে তুমি কি বোঝাতে চাও? তুমি একটা বুর্জোয়া", সিপাহী বলে। কথার মধ্যে একটু ইতস্তত ভাব—সেটাকে কাটাবার জন্যে কটমট করে চায়।

দাশার ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে এল। স্বভাবসিদ্ধ আবেগভরে সিপাহীর কাছে ঘেঁষে এসে ও তার রুক্ষ উষ্ণ গালের ওপর চুমু দিল। সিপাহীর কাছে এ আচরণ একেবারে অপ্রত্যাশিত।... .....আধখোলা চোখে সিপাহী দাশার দিকে

চায়, ভ্রূজোড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।.........উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল চেপে ধরে স্ট্র্যাপটা কাঁধে ফেলে, তারপর এক কদম পিছিয়ে আসে.........

"এ সব চলবে না!" বলে সিপাহী চোখ রাঙায়। "ওতে কিছু সুবিধা হবে না, বুঝলে নাগরিকা।"

"কিসে সুবিধা হবে, কিসে?" আবেগভরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশা। "কি করতে হবে তা তোমরা বুঝে নিয়েছ, কিন্তু আমি তো বুঝিনি।.........সেই অন্য জীবন ছেড়ে ছুটেছি পাগলের মতো, সুখ কোথায় তাইতো খুঁজেছি।............তোমাকে দেখে হিংসে হয়।......সিপাহীর পোষাক পরতে আমিও চাই।"

উত্তেজনায় শাল খুলে ফেলে দুহাতে শালের খুঁট চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে।

"তোমার কাছে তো সবই সোজা, পরিষ্কার।.........কিসের জন্যে লড়ছ তুমি? দুনিয়ার মেয়েরাও যাতে আকাশের তারার পানে চোখ তুলে চাইতে পারে, চোখের জল ফেলতে না হয়, সেই জন্যেই না? আমিও তাই চাই, আমিও চাই অম্‌নিধারা আনন্দ......"

তীব্র আবেগের এই অপরিচিত বন্যার সামনে সিপাহী বিব্রত বোধ করে, ওকে বাধা না দিয়ে বলে যেতে দেয়। ঠিক তখনই কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়াল কম্প্যানী কম্যাণ্ডার।

"এসো, এসো, আগ্রিপিনা, পরগাছা দুটোকে ভেতরে নিয়ে এসো!"

টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আর কম্প্যানী কম্যাণ্ডার। তাদের গায়ে মিলিটারী গ্রেটকোট, মাথায় চুড়োতোলা টুপী। সামনে ভাঙ্গা মাটির পাত্রে তেলের মধ্যে সলতে ভাসছে। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের চোখ দুটি বেশ ফাঁক ফাঁক, আর ঝকঝকে। সে বসে বসে পাইপ টানছে। অপর কম্যাণ্ডারের মুখ একেবারে কড়াপাড়া, মুখের চামড়া না তো যেন গাছের ছাল। দাশা আর কুজমা দুয়ারের ধারে থেমে পড়েছিল, কম্প্যানী কম্যাণ্ডারের হুকুম পেয়ে এগিয়ে এল।

"রেজিমেণ্টের এলাকায় আপনারা কি করছিলেন?"

এদিক ওদিক না চেয়ে সোজা ওদের চোখের দিকে চায় কম্প্যানী কম্যাণ্ডার। সেই স্থিরদৃষ্টির সামনে দাশার শরীরটা যেন হঠাৎ এলিয়ে আসে, শুকনো ঠোঁটে চাপা গলায় বলেঃ

"ইনিই বলবেন। আমি একটু বসতে পারি?"

বসে পড়ে বেঞ্চির কানাটা আঁকড়ে থাকে দাশা। মাটির পাত্রে ভাসমান শিখার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ওদিকে কুজমা কুজমিচ জিভ চকচক্ করে, একবার এ পায়ে দাঁড়ায়, আর একবার ওপায়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কাহিনী শুনিয়ে যায়ঃ কি করে স্তেপের মাঝখানে দেখা হল দারিয়া দ্মিত্রেভ্নার সঙ্গে—কি রকম উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতে করতে দুজনে চল্ল দন নদীমুখো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভ্রমণ বৃত্তান্তের এ দিকটা সে সবিস্তারেই বর্ণনা করল, সব কথা

একেবারে এক নিঃশ্বাসে—যেন কেউ বুঝি ওর মুখ চাপা দিতে আসছে। কিন্তু কম্যান্ডার দুজন বসে আছে একেবারে পাথরের মতো, সাড়া শব্দ নেই।

“সর্বজনীন সূত্রের আকারে আলোচনা করতে পারা কি কম কথা, সিটিজেন কম্যান্ডার! অর্থাৎ নিত্তনৈমিত্তিক জীবনের তুচ্ছতা থেকে বিপ্লব যে আমাদের মুক্তি দিল সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। মানুষ হল দেবতার সমান, বড় বড় কাজ করার জন্যেই তার জন্ম। বীণার ঝঙ্কার তুলে অর্ফিয়ুসের মতো সে পাথরে প্রাণ এনে দেবে; বনের পশুকে পোষ মানাবে—তা না, বাতি জ্বেলে বসে বসে খালি ব্যাঙ্কনোট নিয়ে হাত কালো করছিল, আর রাত জেগে জেগে ফন্দী আঁটছিল কি করে আপন প্রতিবেশীকেই ঠকানো যায়!.........আমাদের সেই হতভাগ্য, অভিশপ্ত জীবনকে আপনারা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন সে জন্যে ধন্যবাদ—সে জীবনের স্মৃতি অভিশপ্ত হোক। এখন আর ব্যাঙ্কনোটই নেই তো হাত কালো করব কিসে, কাজেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক উচ্চাঙ্গের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।.........আমার আন্তরিকতার প্রমাণ চান? এই যে এই আমার প্রমাণ—(নুনের থলিটা বার করল)। এটিই আমার একমাত্র সম্পত্তি! এ ছাড়া আর কিছু দরকার নেই, বাকী যা লাগে সবই ভিক্ষে করে আনতে পারি, নয়তো চুরি করে। কিন্তু শুনুন, আপনাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। ......মানুষের সুখের জন্যে আপনারা লড়ছেন, অথচ মানুষকেই কত সময় ভুলে বসে থাকেন, আপনাদের হিসেব থেকে মানুষটাই বাদ পড়ে যায়। বিপ্লবে আর মানুষে তফাৎ করবেন না—দেখবেন বিপ্লব যেন নিছক দার্শনিক তত্ত্ব হয়ে না দাঁড়ায়। দর্শন তো স্রেফ ধোঁয়া—সুন্দর সুন্দর কত রূপই না ধরে, কিন্তু শেষকালে সবই হাওয়া।... .....এবার বুঝতে পারবেন কেন আমি এই মেয়েটির ভাগ্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিঃ মেয়ে তো নয় যেন এক ছন্দোবদ্ধ মনোজ্ঞ কাহিনী—পাতার পর পাতা উল্টে গেছি। হ্যাঁ, ভাল কথা; এমনধারা কাহিনী সব মানুষের মধ্যেই খুঁজে পাবেন, যদি অবশ্য সত্যি সত্যিই জানবার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকে।.........বুঝতে পারছেন না?—ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জুতো প'রে এ তো পৃথিবীই আমাদের সুমুখ দিয়ে চলেছে!”

“গল্পটা বানিয়েছেন ভাল,” এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে মন্তব্য করলেন রেজিমেণ্টাল কম্যান্ডার। কিন্তু কম্প্যানী কম্যান্ডারের শুধু একটি কথা: “নিন, নিন, এখন আপনাদের কাগজপত্র দেখান।”

দাশা আর কুজমা কুজমিচের হাত থেকে পাসপোর্ট দুটো নিয়ে কম্প্যানী কম্যান্ডার আলোটা কাছে আনলেন। তারপর পাসপোর্টের ওপর ঝুঁকে পড়ে থুতুতে ভেজানো আঙুল দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে গেলেন—বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওদিকে রেজিমেণ্ট্যাল কম্যান্ডার শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর পোড়া পাইপে টান দেন—যুদ্ধের পাঁচ পাঁচটা বছরের মধ্যে ওটা এক দিনও মুখ থেকে নামিয়েছেন কিনা সন্দেহ।

"আপনার বাপের নাম কি?" কম্প্যানী কম্যাণ্ডার প্রশ্ন করলেন দাশাকে।

"ডাঃ বুলাভিন।"

"বলেন কি? গতবারের সামারা গবর্নমেণ্টে যিনি মন্ত্রী ছিলেন তিনি?"

"হ্যাঁ।"

রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের দিকে চেয়ে তাঁর হাতে পাসপোর্টটা তুলে দিলেন কম্প্যানী কম্যাণ্ডার। তারপর ভ্রূভঙ্গী করে কুজমা কুজমিচকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

"আর আপনি? আপনি কি পাদ্রীদের দলে?"

কুজমা যেন এই প্রশ্নটার জন্যেই বসেছিল—আনন্দের চোটে ছেঁড়া জুতো ঘষতে ঘষতে বল্ল:

"ধর্মবিদ্যালয় থেকে গলাধাক্কা খেয়েছিলাম দুবার—একবার খাবার নষ্ট করার জন্যে, আর একবার দেবনিন্দার অপরাধে। আমার বাবা ছিলেন সারাতভের পাদ্রী। পিতৃহস্তের চাবকানিতে দু দুবার প্রাণটাই প্রায় যেতে বসেছিল। পেশা সম্বন্ধে বাকী পরিচয় পাসপোর্টেই পাবেন........."

কম্প্যানী কম্যাণ্ডারের কিন্তু মন নেই। তর্যক দৃষ্টিতে দাশার দিকে চেয়ে বলেনঃ

"আপনার কেস খারাপ।......সব কিছু খুলে বলুন, তাতেই ভাল হবে।" ওঁর মুখভাব কঠিন হয়ে আসে। পাসপোর্টের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে গলাটা ঝেড়ে নেনঃ "হ্যাঁ, ও ছাড়া আর আপনার বাঁচবার উপায় নেই। খুব শক্ত মামলা।"

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে রইল দাশা, মুখে শব্দ নেই। এতক্ষণ ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল আগ্রিপিনা—হঠাৎ বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলঃ

"ওঁকে বিশ্বাস করা যায়, ইভান। আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করেছি......"

প্রকাণ্ড নাকটা ঝট্ করে ওপরে তুলে কম্প্যানী কম্যাণ্ডার অবাক দৃষ্টিতে আগ্রিপিনার দিকে চান। মুখ টিপে হাসেন রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার। কুজমা কুজমিচ ঢক ঢক করে ঘাড় নাড়ে—লাল মুখটাতে ফুর্তি যেন আর ধরে না। খুব আস্তে ধীরে ধীরে কম্প্যানী কম্যাণ্ডার বল্লেনঃ

"আরে, এ কি রান্নাঘর পেয়েছ? উনুনের ধারে বসে আড্ডা দিচ্ছি নাকি আমরা?" (রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের কোঁকড়ানো গোঁফ জোড়া একেবারে কপালে উঠল, হাসি চাপার চেষ্টায় চোখ দুটো কুঁচকে গেল।) "লাল সিপাহী চেব্‌রেৎস! জেরার মাঝখানে কথা বলতে আস কোন হিসেবে?"

আগ্রিপিনা রেগে টং। রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার সামনে ছিলেন তাই, নইলে পাড়াগেঁয়ে রায়বাঘিনীর মতোই সে জবাব দিত, কম্প্যানী কম্যাণ্ডারকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে ছাড়ত—তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু জলদগম্ভীর স্বরে কম্প্যানী কম্যাণ্ডার হাঁকলেনঃ

"লাল সিপাহী চেব্‌রেৎস, বাইরে চলে যাও।"

কালো চোখে আগুন ঝলসে দিয়ে রাইফেলের কুঁদোটা সজোরে মাটিতে ঠুকল

আগ্রিপিনা। কিন্তু তবু বাইরে চলে গেল, দাঁতে দাঁত চাপতে চাপতে। কম্প্যানী কম্যান্ডার জোরে দম নিলেন, তারপর পকেট হাতড়ে তামাক খুঁজতে লাগলেন।

"হুঁ, আপনি তাহলে এখানেও একটু আন্দোলন করে নিয়েছেন!"

মাথা নীচু করে দাশা উত্তর দিলঃ

"আমাকে বিশ্বাস করুন। যদি বিশ্বাস না করেন, তাহলে কিছু বলাই বৃথা। আমার বাবা ডাঃ বুলাভিন আপনাদের শত্রু। কিন্তু তিনি তো আমারও শত্রু।......তিনি আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন—সে জন্যেই তো সামারা থেকে পালালাম......"

হতভম্ব ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড হাত দুখানা সামনে ছড়িয়ে দিলেন কম্প্যানী কম্যান্ডার।

"আপনি যদি শুধু আজগুবি গল্পই বলেন—তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করি কি করে নাগরিকা?"

এ কথা শুনে রেজিমেণ্ট্যাল কম্যান্ডার মুখ থেকে পাইপ নামালেন, তারপর আস্তিনের গায়ে সেটাকে মুছে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বল্লেনঃ

"ব্যস্ত হবেন না গোরা, উনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন।......আপনার নাম কি তেলেগিন?" (দাশার কাছ থেকে অস্ফুট স্বরে জবাব এল: "হ্যাঁ"।) "আপনার স্বামীর নিজের নাম, আর তাঁর পিতৃ-সংক্রান্ত নাম দুটোই বলুন তো!"

"ইভান ইলিয়িচ।"

"তিনি কি জারের বাহিনীতে দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন ছিলেন?"

"তাই বোধ হয়......হ্যাঁ।"

"আর লাল ফৌজের একাদশ আর্মিতে কম্প্যানী কম্যান্ডার?"

"আপনি তাঁকে চেনেন?"

টেবিলের কিনারার ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাশা—ওর গাল দুটো যেন জ্বলছে। মুহূর্তকাল পূর্বেও ও ছিল নিষ্প্রভ, নিরুদ্যম, কিন্তু এখন একেবারে ফুটন্ত ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে।

"ইভানকে শেষ দেখি যখন সে গুলিবৃষ্টির মধ্যে ছাত দিয়ে পালাচ্ছে।...... হয়েছিল কি......"

"বসুন বসুন, শান্ত হোন", রেজিমেণ্টাল কম্যান্ডার বল্লেন। "ইভান ইলিয়িচ আমার পরিচিত—একসঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম, জার্মান বন্দীশিবির থেকে এক সঙ্গেই পালিয়েছিলাম। আমার নাম মেলশিন, পিওতর নিকোলাইয়েভিচ। তাঁর কাছে আমার কথা শুনে থাকবেন। লাল ফৌজের মধ্যেও তিনি খুব পরিচিত।" কম্প্যানী কম্যান্ডারের দিকে ফিরে তিনি বল্লেন, "আপনার স্ত্রী তা হলে আপনার চেয়ে চালাক, তাইতো মনে হচ্ছে।" তারপর দাশাকে লক্ষ্য করে, "এখন একটু জিরিয়ে নিন—কথা-টথা সব কাল হবে। আপনারা এখানে থাকতে পারেন। ঐ দিক দিয়ে বেরিয়ে যান, দেখবেন ঢোকার পথে উল্টো দিকে একটা রান্নাঘর। ভাল করে ঘুমিয়ে নেবেন!"

দাশা আর পেছনে পেছনে কুজমা কুজমিচ—কম্যাণ্ডাররা যেন তার কথাটা ভুলেই গেছেন মনে হয়—দুজনে প্রবেশ-পথ দিয়ে রান্নাঘরে পৌঁছাল। রান্নাঘরটা দিব্যি গরম, কোন লোকজন নেই।

উনুনের গায়ে তাক। তার ওপর দাশাকে শুতে বল্ল কুজমা। "হাড়গুলো একটু সেঁকে নিতে পারবে। আর হপ্তাভর তো ঘুমোওনি, সে অভাবও মিটিয়ে নাও। এস, আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি মামণি......"

কষ্টেসৃষ্টে তাকের ওপর ছেঁচড়ে উঠে দাশা গা থেকে শাল খুলে ফেল্ল। ওটাকে গালের নীচে রেখে গায়ের ওপর কোট চাপা দিল, তারপর পা দুটো গুটিয়ে নিল। তপ্ত ইঁট আর খামিরের দিব্যি গন্ধ, জায়গাটায় ভারী আরাম। ঝিঁ ঝিঁ পোকা অনবরত ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, গ্রামের উনুনের ধারে সে তো অনাদিকালের অতিথি। প্রথম দিকে ঐ জন্যেই দাশা জেগে ছিল। ঘুমের ঝিলিমিলিটা যেই ঘিরে আসে অমনি ঝিঁ ঝিঁ শব্দে সেটা ফুটো হয়ে যায়—বোধ হয় ধূসর রংয়ের সরু সুতো দিয়ে কে যেন সবটা সেলাই করে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় শব্দটা বুঝি তাল-যন্ত্রের সংগত; সংগতের সংগে কান মিলিয়ে দাশা যেন পিয়ানোয় বসেছে, কিন্তু হাত দুটোর আর সাড়া নেই, অসাড় হয়ে পড়ে আছে। উন্মাদ উৎকণ্ঠায় বুকটা ধক ধক করে ওঠে, কিন্তু প্রিয়তমের পদধ্বনি তো কানে আসে না—কানে ফিরে আসে শুধু ঝিঁঝিঁর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, অবিশ্রান্ত, টিচ্, টিচ্, টিচ্......

"কী শান্তি, কী শান্তি!" প্রতিধ্বনি ওঠে অন্তরের সুর থেকে। "দাশা হতভাগিনী এবার তো ফিরলি আপন দেশে।......কিন্তু হায় দাশা, নিজের দেশকে যে কখনো চিনিস্‌নি! দাও দাও আমাকে একলা থাকতে দাও! না এ তো শুধু ওস্তাদজির ছড়ির শব্দ—সংগীত পরিচালনার জন্যে হাতির দাঁতের ছড়িটা ঠুকছেন মঞ্চের ওপর; এখুনি বাজনা শুরু হবে।"......তারপর আবার ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ...

কুজমা কুজমিচও প্রথমটা ঘুমতে পারেনি। উনুনের ধারে বেঞ্চের ওপর শুয়ে শুয়ে খালি ঠোঁট চকচক করে আর বিড়বিড় বকেঃ

"ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করল, বিশ্বাস করল।......নিষ্পাপ মন ওদের।... আমি হলে এত সহজে বিশ্বাস করতাম না।......কেন? মানুষ তো হেঁয়ালি, লোকে নিজেই নিজেকে চেনে না। ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করল—পৌরুষ থাকলেই সরল হয়।......এই তো ওদের শক্তি। এবার আমরা পাসপোর্ট পেয়ে গেছি—ওরা আমাদের বিশ্বাস করেছে। আচ্ছা বেশ, বুদ্ধিশুদ্ধির কোনো দরকার আছে? বুদ্ধিশুদ্ধিওলা লোক কি বিপ্লবের কাজে লাগতে পারে? পারে? বেশ তাহলে—এই তো আমি রয়েছি।......বলতো দারিয়া দেবী বুদ্ধিশুদ্ধিওলা লোক কি বিপ্লবের কাজে লাগতে পারে?"

॥ দুই ॥

সামারায় সামরিক অভিযানের পর ইভান ইলিয়িচ তেলোগিন নতুন কাজ পেল।

লাল ফৌজের দশম আর্মির হাতে যা সামান্য গোলাবারুদ ছিল, আগস্ট মাসে জারিত্সিনের যুদ্ধের পর তা আরও কমে এসেছে। এদিকে দন আর্মির আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। সে আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে জারিত্‌সিন থেকে সর্বোচ্চ সমর পরিষদের কাছে অনুরোধ যায়—মালমশলা পাঠান। কিন্তু সমর পরিষদের পাঠাবার ইচ্ছে নেই; তাঁরা অনেক দেরি করে জবাব দেন। যাই হোক, এবার একজন খুব কাজের লোককে মস্কো পাঠান হয়েছে—তিনি আবার ১০ম আর্মি-কম্যাণ্ডার ভরোশিলভের পুরানো বন্ধু। তাঁকে মস্কো পাঠানোর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে, সর্বোচ্চ সমর পরিষদের সরবরাহ বিভাগে এত বিলম্ব আর দীর্ঘসূত্রতা কেন ঘটে তিনি গিয়ে তার কারণ খুঁজে বার করবেন, প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা করবেন। এরি মধ্যে জারিত্সিন রণাঙ্গনের জন্যে কিছু মালমশলা তিনি পাঠাতেও পেরেছেন।

ইভান ইলিয়িচের ওপর আদেশ হ'ল—নিঝ্নি যাও; সেখান থেকে গোলাবারুদের কয়েকটা বাক্স আর দুটো কামান বাষ্পীয় টাগ-বোটে চাপিয়ে তার সঙ্গে জারিত্সিন যেতে হবে। মন্থর, সীমাহীন ভলগার দুর্ধর্ষ, নির্জন স্রোতে ইভান আবার ভেসে চল্ল। গত গ্রীষ্মে আর তার বহু আগে সেই আর এক গ্রীষ্মে এমনিই ভেসেছিল ইভান। বাদামী রংয়ের টাগটা, বেশী উঁচু নয়—চাকার আঘাতে আঘাতে স্থির জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে ভেসে চলে। অনেক দূরে তাকালে মনে হয় নদী বুঝি তীরভূমিতে আটকা পড়ে গেছে, নদীর শেষ বুঝি ঐখানেই। কিন্তু বাঁক ঘুরলেই আবার জলরাশির নতুনতর বিস্তার শারদ সূর্যলোকে গভীর, স্বচ্ছ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ভলগা থেকে হোয়াইটদের তখন দূর করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও টাগটা প্রায়ই তীর থেকে দূরে সরে যায়ঃ চলতে চলতে যখনি কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম কাছে আসে, শৈলপ্রান্তের ওপর দিয়ে ধোঁয়াটে, কাঠের ঘরবাড়ী চোখে পড়ে, কিংবা যখন সামনের সোনালি পাতাল তো ভেদ ক'রে দূরে কোনো নেড়া পাহাড় নজরে আসে, কোনো গির্জার ঘণ্টাঘর মাথা জাগায় (ঘণ্টাঘর থেকে মেশিনগান চালানোর খুব সুবিধা) তখন টাগটা তীর থেকে যথাসম্ভব দূরে চলে যায়।

জাহাজের পাছ-গলুইয়ের ওধারে কামানটার পাশে বসে বল্টিক নৌবাহিনীর দশজন নাবিক হাসি-গল্পে ব্যস্ত। তেলোগিনও ওখানটায় বসে থাকতে ভালবাসে: কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে ওদের গাঁজাখুরি গল্প শোনে, অবাক হয়ে

বিস্ময় প্রকাশ করে, নয়তো হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদেই ফেলে। শ্রোতা হিসাবে ও একদম সরলবিশ্বাসী, ছলচাতুরী জানেই না। আর নাবিকরাও ঠিক এমনিধারা শ্রোতাই চায়—যে নাকি একেবারে হাঁ করে শুনবে

শারিগিন তরুণ কমিউনিস্ট*। ওদের মধ্যে ওরই বয়স সবচেয়ে কম—কিন্তু বেশ দীর্ঘ গড়ন, আর আত্মমর্যাদাবোধও যথেষ্ট। প্রতিদিন জাহাজের ঘণ্টাটার কাছে গিয়ে সে ঘণ্টা বাজায়—সবাই ডেকের ওপর জমা হও! নাবিকরা গোল হয়ে বসে। নীচের তলা থেকে কষ্টে সৃষ্টে উঠে আসে এঞ্জিনীয়ার—সে বুড়ো লোক, বিপ্লবের ফলে তার নাকি অনেক টাকা মারা গেছে। তিতবিরক্ত, বদমেজাজী মানুষ, আগওয়ালা সিঁড়িপথের গর্ত থেকে শরীরের আধখানা বার করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। গামছায় হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাঁধুনী মেয়েটি। শারিগিন গিয়ে কুণ্ডলী পাকানো দড়ির গাদার ওপর আসন গাড়ে। তারপর বেশ আত্মবিশ্বাসের সুরে শিক্ষামূলক বক্তৃতা শুরু করে দেয়। ছেলেমানুষ, খুব বেশী পড়াশুনাও করেনি, কিন্তু আসল কথাটা ধরেছে ঠিক। জাহাজী টুপির নীচে দিয়ে ওর কোঁকড়া চুল উঁকি দেয়। ধূসরাভ চোখ দুটি বেশ সুন্দর। কিন্তু ছোট্ট খাঁদা নাকটাই সব মাটি করে দিয়েছে, মনে হয় নাকটা যেন ওর নয়, আর কার।

ওর কাজ বড় সহজ নয়। নাবিকরা সব বহুদিন গ্রাম ছাড়া; কেউ কৃষক ছিল, লাঙ্গল চষার ক্লান্তি ছেড়ে চলে এসেছে; কেউ ছিল জেলে, উত্তর উপকূলে ডিঙ্গি ভাসাত, ডিঙ্গি ছেড়ে চলে এসেছে। এই ধরনের মানুষের যেমন ধারণা হয়, বিপ্লব সম্বন্ধে ওদের ধারণাও তেমনি। সমুদ্র-জীবনের কঠোরতায় তারা শক্ত হয়ে উঠেছে, আর তারপর চূড়ান্ত মুহূর্তে অফিসারদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আকাশে তুলেছে বিশ্ব-বিপ্লবের জয়পতাকা। পৃথিবীর সঙ্গে তারা পরিচিত, সারা পৃথিবীটাই তো তারা ঘুরে এসেছে। তাই এ পৃথিবীর অসীম বিস্তার তাদের ধারণাতীত নয়। তখনকার দিনে নাবিকের যথাসর্বস্ব তার সমুদ্র-তোরঙ্গের মধ্যেই ধরে যেত। আর এখন সে তোরঙ্গটা পর্যন্ত নেই;—সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু একটা রাইফেল, একটা মেশিনগানের বেল্ট, আর...... আর বিস্তীর্ণ পৃথিবী।......এখন যদি স্তেপান বাজিনের দিন ফিরে আসত, তাহলে ওরা জনে জনে মাথায় চড়াত লাল-চূড়া বাঁকা টুপী, আর মুক্ত বাতাসের মতো সারা দুনিয়াটা চষে বেড়াত—ওদের পথের দিগন্তে দিগন্তে ঝলসাত আগুনের আভা। "ওরে ও জারের গোলাম আর বোইয়ার জমিদারের ক্রীতদাস ওরে তোরা মাতাল ভিখিরির দল, তোরা শোন! আয় সব, জমি ভাগ করে নে, আনন্দ কর, আনন্দ কর!" কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবের কর্মধারা ওর চেয়ে অনেক জটিল, তাই ওদের আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে বাধা পড়ল।

---

* তরুণ কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠানের সভ্য

"কমরেডস! বিপ্লবটা একটা বিজ্ঞান", আত্মপ্রত্যয়ী সুরে শারিগিন ওদের শোনাল। "এই বিজ্ঞানে দখল না থাকলে ভুল হবেই—তা যার যত বুদ্ধিই হোক না কেন। ভুল কাকে বলে জান? বাপ-মাকে খুন করতে হয় সেও ভি আচ্ছা, কিন্তু ভুলটি করলে চলবে না! ভুলের টানেই তো দৃষ্টিভঙ্গীতে বুর্জোয়া ভাব আসে—টোপের লোভে ইঁদুর যেমন ফাঁদে পড়ে তেমনি। একবার ফাঁদে পড়েছ কি মরেছ; বসে যত দাঁত কিড়মিড়ই কর, তোমার অতীত কাজ-কর্মের কেউ কোনো দাম দেবে না। তুমি তখন—শত্রু......"

এ কথায় নাবিকরা আপত্তি করে না ঃ বিজ্ঞান ছাড়া জাহাজটাই চালানো যায় না, তা রাক্ষুসে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে যুঝবে কি ক'রে? ওদের মধ্যে একজন কিন্তু মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্ন করে। উল্কি আঁকা বড় বড় হাত দুটো দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসে সে বলে: "বেশ, বুঝলাম, কিন্তু একটা কথার জবাব দাও। কলকৌশল রপ্ত না থাকলে চানের ঘরে উনুনটা পর্যন্ত ঠিক করা যায় না। মেয়েরা যে ময়দা মাখে তাতেও কলকৌশল জানা লাগে। তা হলে প্রতিভার দরকার আছে? না নেই? সেটা বল!"

"দেখ দেখ, লাতুগিন কোন্ দিকে টানতে চায় দেখ তোমরা। প্রতিভা মানুষের সহজাত গুণ, সুতরাং খুব মারাত্মক জিনিস। প্রতিভা থেকেই বুর্জোয়া অরাজকতন্ত্রের দিকে লোকের ঝোঁক হতে পারে, কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে......"

"এই শুরু হল!" অধৈর্যভাবে হাত নাড়িয়ে বল্ল লাতুগিন। "আরে বাবা ঐ সব বড় বড় কথাগুলো আগে ভাল করে চিবোও, তারপর গেলো, তারপর হজম কর—তবে গিয়ে ওসব কথা ইস্তেমাল কোরো!"

"সিঁড়ি-পথের ওধার থেকে বদমেজাজী সুরে আগওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল:

"প্রতিভা! প্রতিভা! নখে রং মাখে, বাহারে পেন্টুলুন প'রে গলায় হার ঝুলিয়ে বেড়ায়......। চিনি, তোমাদের সবাইকে চিনি।......প্রতিভা!"

নাবিকরা এবার চটে যায়, হৈ চৈ করে ওঠে।

"আগ-চুল্লীর ধারে বছর দশেক থেকে এস তো বাছাধন" বলে ভাঙ্গা গলায় গজ গজ করতে করতে আগওয়ালা এঞ্জিন ঘরে সটকে পড়ে; গোলমালের হাত এড়ানোই ভাল! শারিগিনের কোনোদিকে কোনো পক্ষপাত নেই, ও গোলমাল থামাতে চেষ্টা করে। বলে, "নখে রং মাখে এমন কমরেডও আছে আমাদের ভেতর, তা সত্যি। জাহাজের ওজন ঠিক রাখার জন্যে যেমন কাঁকর, পাথর কত কী ভরতে হয়—ওরাও কিন্তু তেমনি। ওদের ভবিষ্যৎ ভাল নয়। আবার 'এস-আর'* পোকাও ঢুকেছে কারো কারো মাথায়। কিন্তু আমাদের নাবিকদের বেশীর ভাগই তো সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজেদেরকে বিপ্লবের কাজে উৎসর্গ করেছে। প্রতিভার কথা ভুলে যাও—আমাদের উদ্দেশ্যই বড়, প্রতিভা তার

---

* এস=আর=বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক

নীচে। আগামী দিনে আনন্দের তো অভাব হবে না—যারা বেঁচে থাকবে তারা তো ভোগ করবে। আমি নিজে অবশ্য বেঁচে থাকার আশা রাখিনে।”

কোঁকড়া চুলগুলো নাড়িয়ে দিল শারিগিন। কয়েক মুহূর্ত ধ'রে আর কোনো শব্দ নেই, কেবল পাছ-গলুইয়ের গায়ে জলের ছল ছল শব্দ। অনাড়ম্বর কথা ক'টি শ্রোতাদের মনে ছাপ এঁকে দিয়েছে। একঘেয়েমির প্রাণহীন স্তর থেকে যা কিছুই ওপরে টেনে তোলে তার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে রুশদের। যদি ফুর্তি করতে গেলে তো চুটিয়ে ফুর্তি কর—পরিণাম যা হয় হবে; যদি লড়তে গেলে, তবে পাগলের মতো লড়াই কর, একবারও পেছনে চেও না। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দিন, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে যখন সমস্ত আচ্ছন্ন—তখনই মানুষ মরতে ভয় পায়। মস্ত বড় উদ্দেশ্যের জন্যে লড়াই বাধলে সে উত্তাপের মাঝখানে মৃত্যু তো শুধু প্রতিরোধকেই দৃঢ় করে তোলে। শিরায় শিরায় রক্ত যতক্ষণ অবাধে ছুটতে থাকে—ছুটির আনন্দে মাতলে রক্ত অমনি করেই ছোটে—ততক্ষণ রুশদের ভয় নেই। আর যদি শত্রুর গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হয়, কিংবা তার ঝলসানো তলোয়ারের ঘায়ে বুক ফুটো হয়ে যায়—তবে রুশরা ভাববে, ও তো অদৃষ্ট। বুঝবে যে, জীবনের উগ্রতম সুরায় এবার একেবারে চিরদিনের মতো মাতাল হয়ে গেছে, টলতে টলতে মাটিতে সটান হয়ে পড়েছে, আশ্রয় পেয়েছে উদার স্তেপভূমির বুকের মাঝখানে।

“বেঁচে থাকার আশা রাখিনে”—কথাটা যেভাবে বল্ল শারিগিন, তা শুনে জাহাজীদের ভারি ভাল লাগল। ওর বক্তৃতার বাক্যাড়ম্বর, তারুণ্যসুলভ আত্ম-প্রত্যয়, সবই ওদের কাছে মাফ হয়ে গেল। এমন কি ওর খাঁদা নাকটা পর্যন্ত মনে হল ঠিক আছে। শারিগিন আরও অনেক কথা বলে গেল—শস্যের ব্যাপারে একচেটে নীতি মানে কি, গ্রাম-দেশে শ্রেণী সংগ্রামের কি অবস্থা, বিশ্ব-বিপ্লবের কী তাৎপর্য—এমনি নানান কথা। দাড়িওলা এঞ্জিনীয়র সাহেবের চোখ অর্ধেক বোঁজা, হাত দুটো পেটের ওপর জুড়ে রেখে বসে বসে শোনে আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দেয়। কথার খেই হারিয়ে শারিগিন মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা শব্দ ছাড়ে—তার মানে বোঝাই দায়। আর ঐসব শব্দ শুনলেই এঞ্জিনীয়র আবার আরও বেশী করে ঘাড় নাড়ে। গতবারের পাড়ির সময় রাঁধুনী আনিসিয়া নাজারোভা আস্ত্রাখান থেকে জাহাজে এসেছে—সে কখনো পুরুষদের সঙ্গে বসে না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে পশ্চাদপসারী তীরভূমির দিকে চেয়ে থাকে। ওর কপালটা গোল, মাথায় সোনালি-ছাই রংয়ের অপর্যাপ্ত চুল, বিনুনি পাকানো চুলগুলি মাথার চারপাশে জড়ানো। শোক-বিশীর্ণ তরুণ মুখখানি নিস্পৃহ, উদাসীন,—কিন্তু গলার মধ্যে মাঝে মাঝে যেন একটা দলা ঠেলে ওঠে, ঢোঁক গিলে নামাতে গিয়ে গলাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ওদের আলাপ-আলোচনায় তেলোগিনও যোগ দিত—রণনীতির সমস্যা নিয়ে নাবিকদের সঙ্গে আলোচনা করত, ডেকের ওপর খড়ি পেতে এঁকে দেখাত কোন্ রণাঙ্গন কোথায় আছে।

“কমরেড্‌স, প্রতিবিপ্লবের একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা আছেঃ তারা মধ্য-রুশিয়াটাকে ঘিরে ফেলতে চায়—শস্য আর জ্বালানি সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়ে মধ্য-রুশিয়াকে তারা পিষে মারার মতলব করেছে। দূর প্রান্তের জেলাগুলোতে জমি উর্বর, ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ দেশ—সেখান থেকেই প্রতিবিপ্লব আরম্ভ হয়, প্রত্যেকবার। যেমন ধর কুবান। সেখানে কসাক আছে পনের লাখ, আর খাজনাদার চাষীও প্রায় তাই। চাষী আর কসাক একেবারে জন্ম-শত্রু—মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ওদের লড়াইয়ের শেষ নেই। দেনিকিন তা জানে, বেশ জানে—তাই তার রণনীতির ভিত্তিও এরই ওপর। মুষ্টিমেয় ভলান্টিয়র অফিসার নিয়েই সে সাহস করে লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল—তাইতেই সরোকিনের এক লক্ষ সৈন্য একেবারে ছত্রভঙ্গ। সরোকিন শয়তানটা মহা-স্বেচ্ছাচারী, তার ওপর আবার বিশ্বাসঘাতক। ওকে গোড়াতেই গুলি করে মারা উচিত ছিল। দেনিকিনের বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ হল কুবান প্রদেশে—সেটাই ও এখন মজবুত করে নিতে চায়। সেজন্যে ওখানে কসাকদের সাহায্যে নেমেছে দেনিকিন, দুজনে মিলে রেডদের সাবাড় করছে। দেনিকিন বড় সামান্য শত্রু নয়, মহা শেয়ানা।”

শুনতে শুনতে জাহাজীদের নাসারন্ধ্র কেঁপে ওঠে, তামাটে চামড়ার নীচে নীল শিরাগুলো ফুলতে থাকে। ওরা তেলিগিনের মুখের দিকে চায়। “ঠিক! ঠিক!” বলে এঞ্জিনীয়ার বুড়ো। বিড় বিড় করে কথা কয়, আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দেয়।

“দন কসাকদের দন অঞ্চলের বাইরে লড়ানো শক্ত, তাই আতামান* ক্রাসনভের দায়িত্ব দেনিকিনের চেয়ে অনেক কম। প্রবাদই আছেঃ ‘কসাক খায় ভাল, শোয় ভাল, আর সেই জন্যে দেখতেও ভাল।’ কসাকদের সাহস দারুণ, কিন্তু সে শুধু নিজের ঘরটি রক্ষা করার সময়। তাহলেও, ক্রাসনভের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণটাই আমাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে মারাত্মক। ভলগা অঞ্চল থেকে যদি আমরা হটে আসি, জারিতসিন যদি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, ক্রাসনভ আর দেনিকিন তাহলে সাইবেরিয়ার সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তির সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারবে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, ক্রাসনভ আর দেনিকিনের মধ্যে পুরোপুরি মিল হচ্ছে না। দন কসাকরা ভলান্টিয়ার বাহিনীর নাম দিয়েছে ‘ভবঘুরে সঙ্গীত সমিতি’। ওদিকে ভলান্টিয়াররা আবার কসাকদের বলে ‘জার্মান বেশ্যা’......কিন্তু এতে তো আর আমাদের সান্ত্বনা হবে না। প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের এক বিরাট পরিকল্পনা চাই—যার ওপর আমরা দাঁড়াতে পারি। তার মানে, শুধু ঘুরে ঘুরে গেরিলা যুদ্ধ করলে আর চলবে না, লাল-ফৌজটাকে ঠিক করে গড়ে তুলতে হবে।”

একটু হিংসার দৃষ্টিতে তেলেগিনের দিকে চেয়ে শারিগিন যোগ করলঃ

---

* কসাকদের সর্দার

"সব খাঁটি কথা।......তাহলে কমরেড্‌স, যে কথা নিয়ে শুরু করেছিলাম সে কথাতেই ফিরে আসছি আমরা......। বিপ্লবী শৃঙ্খলা জিনিসটা কি?"

একবার এমনি ধারা আলোচনা চলছে, এমন সময় আনিসিয়া নাজারোভা হঠাৎ হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল—ঠিক অন্ধের মতো—তারপর কথা বলতে শুরু করল একটানা সুরে। কিন্তু সে কথা এতই মর্ম্মস্পর্শী যে, সবাই ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, শুনতে লাগল একমনে।

"কমরেড্‌স, আপনাদের কথার মাঝে কথা বলছি, আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাদের যা শোনাতে চাই তা হল........."

আনিসিয়ার কাহিনী এইঃ

একদিন খুব ভোরে, রাত পোহাবার আগেই আনিসিয়া গরু দুইতে গিয়েছে। তপ্ত গোয়ালঘরের অন্ধকারে বুরেন্‌কা গরুটা উদ্বিগ্নভাবে হাম্বা হাম্বা করছে, আনিসিয়া গোয়ালের আগড় খুলতে যাবে—এমন সময় স্তেপের ওধার থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। ঘটি নামিয়ে রেখে মাথার ওপর শালটাকে ও ভাল করে চাপিয়ে দিল। বুক ধড়ফড় করে, হাঁটু কাঁপে, তবু কোনোরকমে বাখারি-আঁটা ফটকটার কাছে গিয়ে ফটক খোলে। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি দৌড়চ্ছে—মেশিনগান বইবার গাড়ী। গাড়ীর পেছন পেছন কত লোক, চলন্ত গাড়ীতেই সব লাফ দিয়ে ওঠে। গুলি আসছিল বাধ হয় স্তেপের ওদিক থেকে, আর পুকুরধার থেকে। বড় রাস্তার দুপাশ থেকেও আসছিল। ক্রমে ক্রমে আরও এগিয়ে এল, গুলি চল্ল আরও ঘন ঘন। গ্রাম-সোবিয়েতের কমরেডরা সব গাড়ীর ওপর ঠাসাঠাসি, কিন্তু গাড়ী নিয়ে পালাবার আগেই ঘোড়সওয়াররা এসে ওদের ঘিরে ফেল্ল। অচেনা কুকুর দেখলে কুকুরের পাল যেমন সেটাকে তাড়া করে—তেমনি ধারা পাগলের মতো ঘোড়সওয়ারগুলো গাড়ীর চারিদিকে ঘুরপাক খায়। হরদম গুলি চালায়, নয়তো তলোয়ার দিয়ে মানুষগুলোকে কচুকাটা করে।

ভগবানের নাম জপতে জপতে আনিসিয়া ফটকে খিল দিল। তারপর ঘটিটা আনতে যাবে, হঠাৎ মনে পড়ল তাইতো, পেত্রুশা আর আনিউতা, তারা তো ঘরে ঘুমুচ্ছে। পেত্রুশা ওর ছেলে, আর আনিউতা মেয়ে। ওদের কথা মনে পড়তে ভয়ে ওর দম একেবারে আটকে আসে। ছুটে ঘরে ফিরে এল আনিসিয়া। ছেলে-মেয়ের চুলে হাত বুলিয়ে, কানে কানে ফিস ফিস করে তাদের জাগিয়ে তুল্ল, কাপড় পরাল, তারপর নিয়ে এল গোয়ালের পেছনে যে উঠোনটা সেইখানে। উঠোনে ঘুঁটের গাদা, ঠিক উইঢিবির মতো, তবে ভেতরটা ফাঁক। খানকয়েক ঘুঁটে সরিয়ে ও বাচ্চা দুটিকে বল্ল—ঢিবির মধ্যে ঢুকে চুপচাপ বসে থাক, টুঁ শব্দটি কোরো না।

সারা রাস্তায় তখন খালি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, মানুষের চিৎকার, আর হাতিয়ারের একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড। তারপর উঠোনের বড় ফটকটার ওপর রাইফেলের কুঁদোর ঘা পড়ল, "খোল, খোল" বলে সে কী চীৎকার! যেমনি আনিসিয়া ফটক খুলেছে অমনি দুটো কসাক ওকে চেপে ধরল—মদ খেয়ে

কসাক দুটোর মুখ একেবারে টকটক করছে। "কোথায় তোর স্বামী, কোথায় আছে সেঙ্কো নাজারভ? বল্ বলছি, নইলে এখনি তোকে কেটে ফেলব।" আনিসিয়ার স্বামী কসাক নয়—সে লাল ফৌজের লোক, ও গাঁয়ে নতুন এসেছিল। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানত না আনিসিয়া। আনিসিয়া বল্লঃ স্বামী এখন কোথায় তা সে জানে না; গরমের সময় কারা যেন এসেছিল, তাদের সঙ্গে চলে গেছে। ওকে ছেড়ে কসাকগুলো তখন গেল ঘরের ভেতর—জিনিসপত্র সব উল্টে-পাল্টে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিল। বেরিয়ে এসে ফের ধরল আনিসিয়াকে, টানতে টানতে নিয়ে চল্ল গ্রাম-সোবিয়েতের অফিসে। ওটা আগে আতামানের বাড়ী ছিল।

ততক্ষণে সূর্য মাথায় উঠেছে, কিন্তু বাড়ীতে বাড়ীতে খড়খড়ি, ফটক সব একেবারে আঁটসাট বন্ধ—যেন গ্রামের লোকের ঘুম ভাঙেনি। লোকজন দেখা যায় শুধু সোবিয়েত বাড়ীটার সামনে। সেখানে ঘোড়সওয়ার কসাকগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। তার ওপর অনবরত নতুন নতুন সেপাই আসছে পায়ে হেঁটে হেঁটে—তারা গ্রাম থেকে অন্য কসাকদের ধরে এনেছে। চাষীদেরও ধরে এনেছে। ওদের সবাইয়ের হাতে দড়ি, কারো আবার সর্বাঙ্গে রক্ত মাখা। আগের বসন্ত কালে ভোটের সময় যারা সোবিয়েত রাজের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তাদের একেবারে লিষ্টি করা ছিল, এখন তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনছে। এ খবর আমরা অবিশ্যি পরে জানতে পারি।

আতামানের অফিসে একজন অফিসার বসে—তার জামার আস্তিনে চাপরাসের ওপর মড়ার খুলি আর মড়ার হাড় আঁকা। ছ' মাস আগে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিল সেই যে ডাকসাইটে লোকটা—কর্ণেত জ্‌মিয়েভ—সে আবার অফিসারের পাশে। ওর কথা কি আর কারও মনে ছিল? এখন দেখি একেবারে সশরীরে হাজির—সেই ঝুলে পড়া গোঁফ, সেই লাল মুখ, তেমনি মোটাসোটা, নাদুস নুদুস। আনিসিয়াকে যখন ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল তখন সেখানে আরও জনা পঞ্চাশ বন্দী—তাদের সঙ্গে পাহারাও হাজির। জ্‌মিয়েভ বন্দীদের ধমকাচ্ছে।

"আরে লাল শুয়োরের পাল, সোবিয়েত রাজ তোদের জন্যে কী করেছে? নে নে, এখন বলে ফেল দেখি—মস্কোর কমিসারগুলো তোদের কি পড়া পড়িয়ে গেছে......"

বন্দীদের এক এক করে টেবিলের ধারে ঠেলে দেয়। আর অফিসারটা লিষ্টি দেখে দেখে তাদের জেরা করে, নীচু স্বরে। "এই তোমাব নাম আর উপাধি তা স্বীকার করছ? বেশ। তুমি কি বলশেভিকদের জন্যে দরদ দেখাও? দেখাও না? মে মাসে ওদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলে কি না? দাও নি? তার মানে তুমি মিথ্যেবাদী। একে চাবুক লাগাও। তারপর কসাক রদিওনভ।" ফ্যাকাশে ছাগল-চোখ দুটো তুলে অফিসার এবার বল্লঃ "এটেনশন হয়ে দাঁড়াও! আমার দিকে চাও! চাষী কংগ্রেসে প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলে? যাও নি? সোবিয়েতের

পক্ষে প্রচার করেছিলে? তাও করনি? তার মানে সামরিক আদালতের সামনে মিছে কথা বলছ। বাঁয়ে ঘোরো। তারপর কে...!"

লোকেরা বেরিয়ে আসামাত্র কসাকগুলো তাদের চেপে ধরে, ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের পাজামা খুলে নেয়। ঝটাপটি করবারও জো নেই—একজন কসাক পায়ের ওপর চেপে বসে, আর একজন মাথাটা ঠেসে ধরে হাঁটু দিয়ে। তারপর আর দুজনে মিলে সটান মানুষটার ওপর কী মার, কী মার—বন্দুকের গাদনডাণ্ডা দিয়ে এই উঁচু থেকে বাড়ি কসায় শপাশপ্ শপাশপ্!

কান্না আর চীৎকারের শব্দে কানে যেন তালা ধরে, অফিসারের কথা শোনাই যায় না। হামলাদার কসাকরা—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে—ভিড় ক'রে ক'রে মার দেখছে। ওখানকার কসাকরাও অনেকে মার দেখতে এসেছে। হামলাদারেরা যখন প্রথম আসে তখন এরা তাদের কাছে ছুটে গিয়েছিল, "যীশু উঠে এসেছেন" বলে হল্লা লাগিয়েছিল—তারাও গালাগালি চালাচ্ছে গলা ফাটিয়ে ঃ "মারো, মারো ব্যাটাদের, মেরে মেরে হাড়-মাস আলাদা করে দাও; বদ-রক্ত একেবারে বের করে দাও! সোবিয়েতের পোঁ ধরবার মজাটা টের পাক!"

শেষ কালে আতামানের ঘর খালি হয়ে গেল, রইল শুধু আনিসিয়া আর ইস্কুলের দিদিমণি একজন, অল্প বয়সী। তিনি নিজে ইচ্ছে করেই এ গাঁয়ে এসেছিলেন—কি করে সবাই লেখাপড়া শিখতে পারে সে চেষ্টায়ই লেগে থাকতেন দিনরাত। মেয়েদের জড়ো করে পশ্‌কিন আর লিও তলস্তয়ের লেখা পড়ে শোনাতেন, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরতেন গুবরে পোকার পেছন পেছন! এমন ধারা সময়ে কেউ গুবরে পোকা ধরতে যায়!

জ্‌মিয়েভ চীৎকার করে তাঁকে বল্ল ঃ উঠে দাঁড়া,এই ইহুদী পেত্নী!"

দিদিমণি উঠে দাঁড়ালেন। ঠোঁট দুটো নিঃসাড়ে কাঁপছে, অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন ঃ

"আমি ইহুদী নই, তা তুমি বেশ জান জ্‌মিয়েভ।......আর যদি ইহুদী হতামই—সেটা কোনো দোষ নয়......"

"তুমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বর হয়েছ কতদিন?" অফিসার শুধাল।

"আমি কমিউনিস্ট নই। ছেলেপিলেদের আমি ভালবাসি, তাদের লেখাপড়া শেখানো আমি কর্তব্য বলে মনে করি। গাঁয়ের শতকরা নব্বুই জনই না পারে পড়তে, না পারে লিখতে—অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো!"

"খুব ভেবে দেখেছি," বল্ল অফিসার। "এখন তোমাকে চাবকানো হবে।"

মুখ শুকিয়ে গেল দিদিমণির, এক পা পিছিয়ে এলেন। হেঁড়ে গলায় কর্ণেত হাঁকে, "খোল্, কাপড় খোল্।" দিদিমণির সুন্দর মুখটা একেবারে কুঁচকে গেল।......ডোরাকাটা কোটটা খুলছেন, কিন্তু মনে হয় যেন হুঁশ নেই, স্বপ্ন দেখছেন......

"শোনো, শোনো!" বলে হাতটা ছড়িয়ে দিলেন—যেন ওকে ঠেকাতে যাচ্ছেন।

এমন ধারা ভয়ঙ্কর কথা বিশ্বাস করাই শক্ত,—বল্লেন ঃ “না, না, এ তুমি করতে পার না, পার না......”

অসহ্য যন্ত্রণার উন্মাদ চীৎকার আসছে বাইরে থেকে। কিন্তু কর্ণেতের মুখে শুধু এক কথাঃ “খোল্ ছুঁড়ী, পা-জামা খোল্!”

“বদমায়েস কোথাকার”, বলে চীৎকার করে উঠলেন দিদিমণি। তাঁর চোখ দুটো জ্বলছে, মুখটা রাগে টকটকে। “জানোয়ার, রাক্ষস, আয় আমাকে গুলি কর।......এর ফল পাবি একদিন।”

ওঁকে ঝট করে তুলে ধরে মাটিতে ফেলে দিল জ্‌মিয়েভ। দুজন কসাক ওঁর ঘাগরাটা টেনে উঠিয়ে নিল, মাথা আর পা দুটোকে এঁটে ধরে থাকল ঠিক যাঁতিকলের মতো। অফিসারের ফ্যাকাশে মুখে একটুখানি হাসির আভাস—টেবিলের পেছন থেকে ধীরে সুস্থে সে উঠে আসে, একটা চাবুক তুলে নেয় কসাকের হাত থেকে। শন্ শন্ চাবুক ঘুরিয়ে মেয়েটির খোলা পাছার ওপর সজোরে ঘা কষায়। চেয়ারে এগিয়ে বসে কর্ণেত হাঁকে ঃ “এক!” অফিসার চাবুক কষিয়ে চলেছে ধীরে সুস্থে। মেয়েটির মুখে শব্দ নেই।......“পঁচিশ, আচ্ছা তোমার পক্ষে ওতেই চলবে,” বলে অফিসার চাবুকটা ফেলে দিল। “এখন যাও গিয়ে জেলা আতামানের কাছে নালিশ করগে!” মেয়েটির কিন্তু সাড়া নেই, পড়ে আছে মড়ার মতো।

ওকে ভুলে দেউড়ির কাছে রেখে এল কসাকেরা। এবার আনিসিয়ার পালা। ককেসীয়ান কোমরবন্ধটা কষে নিল অফিসার, তারপর শুধু মুখটা ঝাঁকিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল। ঘেন্নায়, রাগে আনিসিয়া তখন ক্ষেপে গেছে, ছুটে পালাতে চাইছে। কসাকরা টানাটানি করে, ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে ফেলবে—কিন্তু আনিসিয়ার সে কী ধস্তাধস্তি—ওদের চুলের মুঠি চেপে ধরে, হাতে কামড় দেয়, প্রাণপণে গুঁতো লাগায় হাঁটু দিয়ে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ও ছাড়িয়েই ফেল্ল। মাথার শাল খুলে গেছে, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে একশেষ হয়েছে—তবু ও ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহারাদারদের ওপর। লড়তে লড়তে মাথায় এক বাড়ি লেগে শেষ কালে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর পিঠের ছাল চামড়া আর নেই তখন, গাদনডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। পিটুনির চোটে উৎপাত মাগীটা বোধ হয় সাবাড়ই হয়ে গেছে ভেবে ওর দেহটা ওরা দউড়ির সামনে ফেলে রেখে দিল।

গ্রামে ‘শৃঙ্খলা’ স্থাপনের পর কাপ্তেন নেমেশাএভের পিটুনি বাহিনী একজন আতামান ঠিক করে দিল, তারপর কয়েক গাড়ী ভর্তি রুটি আর চর্বি আর হেন তেন জিনিসপত্র নিয়ে ওখান থেকে প্রস্থান করল। সেদিন সারা দিন ধরে গ্রাম একেবারে চুপচাপ, উনুনে কেউ আঁচ দেয় না, গরুগুলোকে পর্যন্ত গোয়ালের বার করে না। যারা কসাক নয় তাদের কারও কারও ঘরে আগুন লাগল রাত্রি বেলা। আনিসিয়ার ঘরও পুড়ল।

গাঁয়ের এক কোণ থেকে আগুনের প্রথম হল্কা যেমন আকাশে উঠেছে, অমনি দেখা গেল কসাকরা আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে। বন্দুকের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পাড়াপড়শীরা সেইজন্যে আগুন নেভাতে সাহস পেল না। আনিসিয়ার খামার পুড়ে একেবারে ছাই। সকাল হলে তবে পড়শীদের মনে পড়ল—তাইতো আনিসিয়ার ছেলেমেয়ে দুটির কি হল! খোকা পেত্রুশা আর খুকী আনিউতা—সারারাত তারা সেই ঘুঁটের গাদার নীচে কুঁকড়ে পড়েছিল—তারা পুড়ে মরেছে। আনিসিয়ার গরু, ভেড়া, হাঁস, মুরগী—সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

আতামানের দেউড়ির সামনে জ্ঞানহারা আনিসিয়া গোঙাচ্ছিল, দরদী লোকেরা তাকে নিজেদের ঘরে তুলে নিয়ে যায়, সেবা-শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তোলে। ক'হপ্তা বাদে ও যখন প্রকৃতিস্থ হল, তখন ওকে ছেলেমেয়ের কথা জানাল তারা। শুনে ও বল্ল, গ্রামে আর কী নিয়ে থাকব তাহলে? ততদিনে শরৎ এসে গেছে। স্বামীর কোনো খবর পায় না আনিসিয়া, বেঁচে থাকারও কোনো কারণ খুঁজে পায় না। শেষকালে বেরিয়ে পড়ল—গ্রামে গ্রামে ফেরে, দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে খায়। রেললাইন পর্যন্ত এমনি গিয়ে, তারপর পৌঁছাল আস্ত্রাখানে। সেখানে ও জাহাজে রাঁধুনীর কাজ পেল—গত বারের পাড়ির সময় আগের রাঁধুনী ডাঙ্গায় নেমে আর ফেরেনি, তাই।

নিজের জীবনের এই কাহিনী শুনিয়ে তারপর আনিসিয়া নাজারোভা বল্লঃ

"কমরেডস্, আপনাদের ধন্যবাদ দিই। আমার কী দুঃখ তা আপনারা জানলেন।......আমার কথায় কান দিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।......"

চোখের জল গামছায় মুছে রান্নাঘরে ফিরে যায় আনিসিয়া। ভ্রূকুঞ্চিত করে নীরবে বসে থাকে নাবিকেরা, পেশীবহুল হাতে হাঁটু জড়িয়ে ঘরে অনেকক্ষণ বসে থাকে। একটু দূরে সরে ইভান ইলিয়িচ শুয়ে পড়ল একা একা। দীর্ঘশ্বাস চেপে মনে মনে বল্লঃ "আহা! মানুষ তো নয়, এ যে একটা গোটা দুনিয়া—পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। ঐ দেখ! এমন ধারা কত মানুষ সামনে পড়ে, আমরা কিন্তু বুঝতেও পারিনে, পাশ কাটিয়ে দূরে চলে যাই......"

এই মেয়েটির কাহিনী ওর মনে যে ছাপ এঁকে দিল, ধীরে ধীরে তা কিন্তু তার নিজের দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল। আপন দুঃখের কথা ও সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত, বিশেষ করে নিজের কাছ থেকে। দাশাকে আবার দেখতে পাবে, সে আশা তার ছিল না বল্লেই হয়। মানুষের সহ্যশক্তি অবিশ্যি খুবই বেশি, অন্য কোনো জীব হলে এত যন্ত্রণা, এত সর্বনাশের মধ্যে কিছুতেই বাঁচত না। কিন্তু দূর যে বড্ড বেশী। লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটছে পুব থেকে একেবারে স্রোতের মতো—তার মধ্যে দাশাকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে? বুড়ো বুলাভিন হয়তো তাকে বিদেশেই টেনে নিয়ে গেছে, তাও হতে পারে।

দাশার দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে নাড়তে ইভান ভাবতে লাগলঃ শোভা আর সুরুচি যে দাশা বড্ড ভালবাসত; তাছাড়া ওর স্বভাবও যে আবার

আবেগে ঔদাসীন্যে মেশানো—ঠিক বরফ দেওয়া শ্যাম্পেনের মতো।

“ও কি এত সইতে পারে? পারে না।......যে ঝড় আজ পৃথিবীকেই কাঁপিয়ে দিল সে ঝড়ের কন্‌কনে বাতাস ও সইবে কি করে, ও যে হট-হাউসের চারা! বেচারী! সেবার পেত্রোগ্রাদে সেই শীতার্ত গোধূলি বেলায় ওর কোলের বাচ্চাটা যখন মারা গেল, তখন মনে হল ওর জীবনের ক্ষীণ শিখাটিও বুঝি নিভে যাবে—ও যে তখন একেবারে ভেঙে পড়েছিল।”

দাশার খবর তো সামারার সেই চিঠি থেকে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেটুকু জানতে পেরেছিল তাই; পেত্রোগ্রাদে ছেড়ে আসার পর দাশার অদৃষ্টে কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে আর কিছুই ও জানে না। তারপর দাশাকে নিশ্চয় অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। অনেক কিছু বুঝেছেও নিশ্চয়।......অনুসরণকারীদের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে কী আবেগের সঙ্গেই না দাশা তাকে জানালার ধারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল! “থাকব তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসী থাকব। এখন পালাও, শীগ্গির পালাও!”

অঙ্গসংলগ্ন দাশার চিকন সোনালি চুলে সেদিন কী সুগন্ধ, সেকথা ইভান ইলিয়িচ ভুলতে পারেনি, কোনো দিনও পারবে না। কী অদ্ভুত, কী অপূর্ব, প্রিয়া আমার......। আচ্ছা থাক, স্মৃতিমন্থন অনেক হল......

আবহাওয়ায় পরিবর্তনের আভাস। ভল্‌গা একেবারে কালোয় কালো। উত্তর দিকে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে মেঘপুঞ্জ—হিমেল, মলিন। নীচু মাস্তুলগুলোর মাঝখান দিয়ে শোঁ শোঁ করে হাওয়া বয়ে যায়। স্টীমার কামিশিন পার হল। ওটা একটা ছোট্ট, নিভৃত শহর—গাছপালাশূন্য ঢালুর ওপর কতকগুলো কাঠের বাড়ী আর শুকনো বাগান। কামিশিন পার হলেই জারিতসিন রণাঙ্গন শুরু।

॥ তিন ॥

জারিতসিনের আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি মেঘ চলেছে, মেঘগুলো ঠিক বরফের মতো ঠাণ্ডা। নদীর উঁচু পাড়টা ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়ছে। পাড়ের ওপর কোথাও কারখানা, কোথাও পায়খানা—আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে কাঠের ঘরবাড়ীগুলো—হতশ্রী, এলোমেলো। হাওয়ায় হাওয়ায় ধুলোয় ঘূর্ণি ওড়ে, তারপর সব ধুলো এসে জমা হয় ঘরবাড়ীর গায়ে। খাড়া রাস্তা, মুষলধার বৃষ্টিতে খোয়াগুলো আলগা হয়ে গেছে, সেই রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটি প্রাণীও তেলেগিনের চোখে পড়ল না। জীর্ণ পারঘাটা, তারপর ডকের আশপাশ—সে জায়গাগুলোও জনশূন্য। ডক পেরিয়ে শহরের চক—দূরে ধুলোর আড়ালে গির্জাঘরের ধূসর আয়তন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—সেখানে পৌঁছে তবে একটা সশস্ত্র বাহিনী ওর নজরে পড়ল। বাহিনীর লোকদের পরনে হাজার রকমের অদ্ভুত বেশভূষা। একরোখা জেদের সঙ্গে হাওয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জোয়ান, বুড়ো সবাই তারা পা টেনে টেনে চলেছে, মনে হয়, শরীরে যেন আর শান নেই।

ওদের আগে আগে কদম ফেলে চলে এক বুড়ী—রোগা, কিন্তু হিংস্র চেহারা। তার মাথায় লাল ফৌজের টুপী, কাঁধে রাইফেল—অন্য সকলেরই মতো। কাছে পৌঁছে তেলেগিন ওকে জিজ্ঞাসা করল—সদর দপ্তরে যাবার রাস্তা কোন্‌দিকে? কিন্তু সে উত্তর দিল না, শুধু কটমট করে চাইল। পায়ে পায়ে মেঘের মতো ধুলো উড়িয়ে ডিট্যাচমেণ্টটা ওকে ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল।

সদর দপ্তরে গিয়ে স্টীমার পৌঁছানোর খবর দিতে হবে, বোঝাই মালের বিলটাও দিতে হবে—কিন্তু সদর দপ্তরের খোঁজে কোন্‌ দিকে যেতে হবে তেলেগিন তা ভেবেই পায় না। চারিদিকে দোকানপাট সব কপাট বন্ধ, জানলা-টানলার ধারে লোকজনের চিহ্ন নেই, নড়বড়ে সাইনবোর্ডগুলো দেখলে মনে হয় এখুনি খুলে পড়বে। এমন সময় হঠাৎ একজন ফৌজী লোকের সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। লোকটির একটি হাত ব্যাণ্ডেজ দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা। দাঁতে দাঁত চেপে সে যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল, নীচু স্বরে কী একটা গাল দিল। মাফ চাইল ইভান ইলিয়িচ, জিজ্ঞাসা করল ফৌজের সদর দপ্তরটা কোন্‌ দিকে। এতক্ষণে ওর হুঁশ হল যে, লোকটিকে চেনে। লোকটি সাপজ্‌কেভ, সার্গি সার্গিয়েভিচ, ওর পূর্বতন রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার।

“আরে, কি ব্যাপার পাগলের মত ছুটছ কেন?” সাপঝ্‌কভ শুধাল। “বেশ বেশ—তা আছ কেমন?”

ইভান ইলিয়িচ ওকে জড়িয়ে ধরতে আসছে দেখে সাপঝ্‌কভ পিছু হটল—বলে উঠলঃ “রক্ষে কর বাবা! একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও! তা হঠাৎ উদয় হলে কোথা থেকে?”

“একটা স্টীমার নিয়ে এসেছি।”

“কি বাবা, দিব্যি বেঁচে আছ তো! আবার গতরও ফেঁপে উঠেছে দেখছি! ওঃ, ধন্য জাত বটে এই রুশরা! সদর দপ্তর খুঁজছ? এই তো এখানে! আছ কোথায়? আস্তানা নেই বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।”

একটা ব্যবসাদারের বাড়ী—বেশ শাঁসালো গোছের—তার দেউড়ি পর্যন্ত তেলেগিনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সাপঝ্‌কভ তাকে সদর দপ্তরের পথটা দেখিয়ে দিল। বাড়ীটার তেতলায় সদর দপ্তরের অফিস।

“ইভান, তোমার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, ভুলো না যেন!”

সরোকিনের সদর দপ্তর ইভান ইলিয়িচ আগে দেখেছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনের আর্মিগুলোর দপ্তরও দেখেছে। সেসব জায়গায় গেলে যে-ঘরটি চাও সেটি কিছুতেই খুঁজে পাবে না, মনে হবে সবাই যেন ষড় করে মিথ্যে কথা বলে চলেছে। দেখবে চারিদিক শুধু তামাকের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, পাগলের মতো খটাখট করে চলেছে টাইপিস্টগুলো, আর দামী কাটের ‘সওয়ারী’ প্যান্ট পরে চালিয়াৎ ‘এডের’ * দল তীরবেগে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে, অনবরত। কিন্তু এখানে সব নিস্তব্ধ—যে ঘরটা তেলেগিন খুঁজছিল সেটা পেতে এক মুহূর্তও দেরী হল না। জানলার ধারে বসেছিলেন একজন আর্দালি অফিসার; জানলাটায় এত ধুলো জমেছে যে, এক ফোঁটাও আলো ঢোকে না। অফিসার তাঁর শীর্ণ, জ্বরগ্রস্ত মুখটা তুল্লেন, তারপর ফোলা ফোলা পাতার নীচে থেকে স্থির দৃষ্টি মেলে দিলেন তেলেগিনের দিকে।

“এখানে কেউ নেই, সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে,” তিনি বল্লেন।

“আমাকে একটু কম্যাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে পারেন না? খুব জরুরি চালান নিয়ে এসেছি আমি; সেটা আমাকে ডেলিভারি দিতে হবে।”

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাথাটা প্রায় বিকৃত হয়ে এলে লোকে যেমন আবেশের ঘোরে অনায়াসে উঠে দাঁড়ায়, তেমনিভাবেই অফিসারটি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর জানলা দিয়ে বাইরে চাইলেন। একটা মোটরগাড়ী তখনি এসে দাঁড়িয়েছে।

“এক মিনিট সবুর করুন,” ধীর স্বরে এই কথা বলে তিনি কতকগুলো চিঠি, রিপোর্ট ইত্যাদি বাছতে লাগলেন। চিঠিপত্রের অধিকাংশই হচ্ছে পেন্সিলে লেখা হিজিবিজি। তাতে এটুকু অবশ্য বোঝা যায় যে, যারা লিখেছে, তারা বেশ সহজ, সরল, সাহসী লোক—কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না।

দুজন লোক ভেতরে এলেন। একজনের গায়ে অস্ত্রাখান কোট, তার সামনের

---

* সেনাপতি প্রভৃতির ব্যক্তিগত সহকারী অফিসার

দিকে ঝুলছে ফিল্ড গ্লাস; কোমরে কাঁচা চামড়ার কোমরবন্ধে ঘোড়সওয়ার দলের ভারী তলোয়ার। অপরজন পরেছেন সিপাহীর গ্রেট কোট, আর কানপট্টী লাগানো আস্তর দেওয়া টুপি—পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা যেরকম পরে। তাঁর হাতে কোনো হাতিয়ার নেই। ধুলোয় দুজনেরই মুখ কালো। ডিউটির অফিসারটি বল্লেনঃ

"মস্কোর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগের তার মেরামত হয়ে গেছে।"

আস্ত্রাখান কোট-পরা লোকটির ছোকরা ছোকরা চালচলন, গোল গোল বাদামী চোখ দুটো বেশ হাসি হাসি। কথাটা শুনে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলে উঠলেনঃ

"খুব ভাল কথা!"

অন্যজনের গ্রেটকোটময় কাদার ছিটে। একটা রুমাল বার করে নিজের রোগাটে মুখটা মুছলেন—কালো গোঁফ থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। নীচের পাতার আড়াল থেকে চোখ দুটি বার করে তিনি যে একদৃষ্টে তেলেগিনকে দেখছেন—তা ও বুঝতে পারল।

"এই কমরেড একটা রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন," অফিসার বল্লেন।

লোক দুজনের কাউকেই ইভান ইলিয়িচ আগে দেখেনি, তাঁরা কে তা জানারও উপায় নেই, সে জন্যে সে একটু ইতস্তত করছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসারটা ওর দিকে ফিরলেনঃ

"কমরেড, আপনার কথা বলতে কোনো বাধা নেই। এই যুদ্ধক্ষেত্রের যে সমর পরিষদ—তার সদস্য এঁরা।"

কাগজপত্র বার করে রিপোর্ট শোনাল তেলেগিন। গোলাবারুদ নিয়ে একটা স্টীমার এসেছে শুনে নবাগত দুজন দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। যাঁর গায়ে গ্রেটকোট তিনি নিলেন বোঝাই মালের বিলটা। আর অন্যজন তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে সাগ্রহে বিলটির ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন। কার্তুজ, গোলা, মেশিন-গানের পেটি—কোন্‌টা কত এসেছে, তার অঙ্কটা পড়েন আর নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর মুখটা খোলে আর বন্ধ হয়।

"আপনার সঙ্গে লোক কত এনেছেন?" গ্রেটকোট-পরা মানুষটি জিজ্ঞাসা করলেন।

"বল্টিকের দশজন নাবিক, আর দুটি কামান।"

আবার সেই দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময়।

"একটা ফর্ম ভর্তি করে রেখে যান," গ্রেটকোট পরা লোকটি বল্লেন। "বিকাল পাঁচটার সময়ে আপনি আর আপনার সমস্ত দলবল এই ফ্রণ্টের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে রিপোর্ট করবেন।"

টেলিফোনের ঘটঘটে হাতলটা ধীরে-সুস্থে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি কনেকশন পেলেন—কয়েকটা কথা বল্লেন নীচু স্বরে। তারপর রিসিভার তুলে রেখে ডিউটিরত অফিসারকে সম্বোধন করলেন।

"কমরেড, এক্ষুনি যত পারেন মালটানা গাড়ী যোগাড় করে ফেলুন, অনুগ্রহ করে। মাল খালাস করার জন্যে গোলাবারুদের কারখানা থেকে শ্রমিক জড়ো করুন। এই হুকুমমাফিক যা কিছু কাজকর্ম সব আপনি তদারক করবেন, তারপর আমার কাছে রিপোর্ট দেবেন।"

আর এক ঘরে চলে গেল দুজনে। অফিসার তখন টেলিফোনের হাতল ঘোরাতে লেগেছেন। টেলিফোনে মুখ দিয়ে নীচু স্বরে বল্লেনঃ "যানবাহন বিভাগ......কমরেড ইভানভকে চাই। তিনি নেই? মারা গেছেন? আর কাউকে ডেকে দিন। যুদ্ধক্ষেত্রের সদর দপ্তর থেকে কথা বলছি।" ইভান ইলিয়িচ বাসল, ফর্ম ভর্তি করতে হবে। অবস্থাটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কম্যান্ডারের কাছে ডিউটির জন্যে রিপোর্ট করতে হবে—তার মানে এবার সোজা একেবারে যুদ্ধের পরিখায়। স্টীমারে থাকতে ইভান ইলিয়িচ কিছুটা নরম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন কলমটা কাগজের ওপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে চলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে মনের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি সবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠছে। এ আন্দোলন ওর অতি-পরিচিত, গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক বারই এর প্রভাব ও অনুভব করে এসেছে। অভ্যস্ত যা কিছু তা সবই ওকে ওরকম সময়ে সদুঃখে পেছনে সরিয়ে দিতে হয়েছে। যা শান্ত, যা উষ্ণ, স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্যে যা যা প্রয়োজন সে সবই পেছনে সরিয়ে দিয়ে যেন এক নতুন তেলেগিনই এসে হাল ধরেছে। সে তেলেগিন একেবারে সাদামাটা, কাঠখোট্টা, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত।

যাই হোক তখনও পাঁচটা বাজার অনেক দেরী। ফর্মটা জমা দিয়ে তেলেগিন চলে এল ঘরের বাইরে, দরদালানে। কাঠের বেঞ্চে বসেছিল সাপজকভ, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

"ছাড়া পেলে? চল, দেখি কোথায় বসে কথাবার্তা কওয়া যায়।"

হতবুদ্ধি তেলেগিনের দিকে চায় সাপঝ্‌কভ—দৃষ্টিতে বিদ্রূপ মেশানো। সাপঝ্‌কভ চিরদিন যেমন এখনো ঠিক তেমনি আছে—তেমনি অশান্ত, ব্যস্তসমস্ত ভাব—সব সময়েই যেন এমন কিছু জানে যা আর কেউ জানে না। কিন্তু ওর মুখের সে চেহারা আর নেই। গোলাপের মতো লাল মুখটা যেন বসে গেছে। যে সব বুড়োর বয়স একটু কম দেখায়, ওর চেহারা ঠিক সেই রকম বুড়োর মতো। যাই হোক, তেলেগিন বল্ল যে, তাকে এখুনি পারঘাটায় ফিরে যেতে হবে, জাহাজীদের সবাইকে জড়ো করে মাল নামাতে হবে......।

"দুঃখের কথা! যাকগে, চল আমিও তোমার সঙ্গে পারঘাটা যাই। তিন মাস ধরে কথাই বলিনি, বুঝলে ইভান। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, হাসপাতালে বসে একটা বই-ই লিখতে যাচ্ছিলাম—'ভূতপূর্ব বুদ্ধিজীবীর স্মৃতিকথা।' ......এখন আর মদ খাইনে ভাই, ভুলেই গেছি কি করে ..."

ইভান ইলিয়িচকে দেখে ওর মনে যে দারুণ সাড়া জেগেছে, তা বোঝাই যায়। দুজনে পথে বার হল। সারাটা পথ ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খেতে খেতে এসে

পৌঁছাল ভলগার ধারে। নদীর বুকে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় শাদা ফেনার চূড়া তীরবেগে ছুটে চলেছে—আর তার ওপর অন্ধকার জমছে আরও ঘন হয়ে।

"তোমার রেজিমেণ্ট কোথায়, সার্গি সার্গিয়েভিচ? তুমি রেজিমেণ্ট থেকে আলাদা হয়ে পড়লে কি করে?"

"আমাদের রেজিমেণ্টের আর কিছু নেই বল্লেই চলে। ১১নং আর্মিতে ও-নামের রেজিমেণ্ট এখন আর পাবে না।"

ভয়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল তেলেগিন। হাতের আড়াল দিয়ে ধুলো থেকে চোখ বাঁচিয়ে সাপঝ্‌কভ বল্লঃ

"বেস্‌পোকয়নি জোতবাড়ীতেই সব শেষ হয়। ১১ নম্বর আর্মির কপাল কি করে পুড়ল, শোনান সে কথা? সব নষ্টের গোড়া ঐ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সরোকিন—বেটাকে গুলী করে মারলেও ওর উপযুক্ত শাস্তি হয় না। জারিতসিন রণাঙ্গনের সদর দপ্তর থেকে ১১ নং আর্মিকে অর্ডার দিয়েছিল—ব্যূহ ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে ১০ম আর্মির সঙ্গে যোগ দাও—কিন্তু ঐ বেটা আর্মির কাছ থেকে সে অর্ডার চেপে রাখে।

আদেশ পালন করে খালি শেলেস্ত-এর ডিভিশন, ওরা জারিতসিনের দিকে এগিয়ে যায়। তাও এমনি নয়। সরোকিন শেলেস্তকে ডাকাত বলে নাম জারি করে দিয়েছিল, তাকে গুলী করে মারবার চেষ্টা করছিল; শেলেস্ত যে চলে গেল সে ঐজন্যেই। ভাব তো একবারঃ মিনেরান্‌নিয়ে ভদি থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন, স্তাভরোপল থেকেও বিচ্ছিন্ন—তামান আর্মিটা সেখানে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। সরোকিন পালাল তিখোরেৎস্কায়া থেকে, এমন ভয় খেয়েছিল যে গোলাগুলির গাড়ীটাড়ী সব ফেলেই পালাল। ওধারে ডান দিক থেকে তেড়ে আসছে শুকুরোর অশ্বারোহী সৈন্য, আর বাঁদিক থেকে রাঙ্গেলের। কোথাও এক-ফোঁটা জল নেই, শকনো স্তেপের মধ্যে দিয়েই আমরা পূর্বদিকে পিছু হঠছি। আমার রেজিমেণ্টে তখন বাকী আছে শুধু একটি কম্প্যানী, ব্যস। ঘুমতে ঘুমতেও চলতাম আমরা—শত্রুর নাগালের বাইরে যাবার জন্যে তাও স্বীকার—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ নালাপথ ধরে মার্চ করতাম।......কিচ্ছু খাবার নেই, জল নেই, আছে শুধু বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া আর তোমার হতভাগা স্তেপ। লোকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে ঘোড়া শুদ্ধই ঠাণ্ডায় জমে গেছে—তাও দেখেছি; জমে যাওয়ার পর অমনি খাড়াখাড়িভাবেই চাপা পড়েছে বালির নীচে—দেখলে মনে হবে বুঝিবা শকজাতের কায়দায় গোর দিয়ে রেখে গেছে। বেস্পোকয়নি পৌঁছে দেখি—জনপ্রাণী নেই, একটা মুরগী পর্যন্ত নেই—এমনকি, কুকুরগুলোকে পর্যন্ত কসাকেরা নিয়ে গেছে। ঘরগুলোর দরজা টরজা সব একদম হাটখোলা। ......তবে কিছু দুধ পাওয়া গেল—যত পারল খেল সিপাহীরা। বুঝতে পারছ? খাওয়া মাত্র মাটিতে পড়ে ওদের সে কী ছটফটানি, অথচ তখন আর কিছু করার উপায় নেই। বাঁচল শুধু জনাত্রিশেক।......তারপর সকালবেলা কি হল তা তো বুঝতেই পারছ—

শত্রুরা এসে ঘেরাও করলে চারধার থেকে—মেশিনগানের গুলি চালিয়ে সব শেষ করে দিল......”

কাহিনী যত শোনে তত জোরে পা ফেলে তেলেগিন, অথচ নিজেই তা টের পায় না। শেষকালে হোঁচট খেল।

“তাহলে তুমি বাঁচলে কি করে?”

“ভগবান জানেন! আমার কপালটা ভাল। একেবারে গোড়াতেই একটা চোট পেলাম...হাতের ওপর...স্নায়ু টায়ু কিছু একটা জখম হয়েছিল বোধ হয় তাই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।......ঐ দিনের পর থেকে আমার ধ্যান ধারণাই পাল্টে গেছে ...ওখানে যখন চিৎপাত পড়েছিলাম তখন আমাদেরই কেউ নিশ্চয় আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল, একটা খড়ের গাদায় তুলে খড় দিয়ে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল।...... অমন সময়ও তারা আমার কথা ভাবতে পারল। মানুষকে আমরা চিনিনি, কোনদিন চিনিনি—সত্যি বলছি। ইভান বুনিন* বলেছেন, ওরা নাকি বন্য জন্তু; আর মেরেজকভস্কি† রায় দিয়েছেন যে, ওরা পাষণ্ড, বর্বর, জানোয়ার, ওদের হাতেই নাকি ভবিষ্যতের সমস্ত সংস্কৃতি ধ্বংস হবে। রেলগাড়ীতে সেই যে আমরা আলোচনা করেছিলাম—মনে আছে তোমার? তখন নেশার ঘোর ছিল, কিন্তু একটি কথাও ভুলিনি। সে সময় আমাদের ভুলটা হয়েছিল কোথায়? কামানের পাল্লা ঠিক করতে হলে একটা প্রত্যক্ষ নিশানা দরকার; তেমনি আমাদের দর্শন বা যুক্তি-শাস্ত্রের সংশোধন করতে গেলেও কি জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতা দরকার নয়? এই কথাটা বুঝিনি বলেই কি আমাদের ভয় হয়েছিল? ইমানুয়েল কাণ্ট‡ এক জিনিস, আর বিপ্লব আবার সম্পূর্ণ আর এক জিনিষ।”

“তারপর কি হল, সার্গিয়েভিচ?”

“তারপর? রাত্রিবেলা গুঁড়িসুড়ি মেরে খড়ের গাদা থেকে বার হলাম। ঘরের মধ্যে বিজয়ীর দল তখন মহা চেঁচামেচি করে গান গাইছে—অর্থাৎ মাতাল হতে আর বাকী নেই। হঠাৎ একটা লাশ পায়ে ঠেকল, সেটাকে কেটে কুটে বিকলাঙ্গ করে রেখেছে। তারপর আর একটা। কিছু আর বুঝতে বাকী

---

* ইভান বুনিন (১৮৭০)—রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত)। পর পর কয়েকখানি ছোট উপন্যাসে ইনি প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার গ্রাম-দেশের নিরানন্দ জীবন বর্ণনা করেছেন, আর অতীতকে আদর্শরূপে তুলে ধরেছেন। অভিজাত জমিদার শ্রেণীর জমিদারিতে জীবনের যে দ্রুত ভঙ্গুর অবস্থা তাই এঁর কাছে আদর্শ স্থানীয়। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে ইনি দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে যান।

† ডি এম মেরেজকভস্কি (১৮৬৫)—রুশ কবি ও গদ্য লেখক; প্রতীক ও রহস্যবাদী, বিপ্লব বিরোধী। ইনিও দেশত্যাগ করেন।

‡ ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪—১৮০৪)—১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৯শ শতাব্দীর শুরুতে ইনি ছিলেন জার্মান ভাববাদের গুরু।

রইল না। একটা ঘোড়া ধ'রে নিয়ে স্তেপে পৌঁছলাম। ক'দিন ধরে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরলাম স্তেপ অঞ্চলে—সে কটা দিন কী বীভৎস। সাল্স্ক স্তেপে বুদিয়নি নামে এক ঘোড়সওয়ার অফিসার আছেন—সেই বুদিয়নির ঘোড়সওয়ার দল আমাকে দেখতে পায়, কুবার্ল স্টেশনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পাঠিয়েছে এখানে। আর এখন, এখন হাসপাতালে তাতো দেখতেই পাচ্ছ।...... আমার কাজের রেকর্ড, কাগজপত্র সব সেই খড়ের গাদায় রয়ে গেছে, কোটের পকেটে। আমার সেই যে সেই ফার কোটটা, মনে আছে? অমন কোট আর হবে না......"

"গিমজাও কি মারা পড়েছিলেন?"

"গিমজা মারা গেছে অনেক আগেই। সাপ্লাইয়ের গাড়ীগুলো যখন খোয়া যায়—সেই তখন। ওর স্পটেড টাইফাস জ্বর হয়েছিল, ভীষণ জ্বর......"

"গিমজার জন্যে দুঃখ হয়।"

"ওদের সকলের জন্যেই দুঃখ হয় ইভান।......তবে না, ঠিক তা নয়।...... রেজিমেণ্টটাকে ভাল লাগত, কিন্তু এখন তার মধ্যে শুধু আমিই বেঁচে আছি। ভাবতে যেন কি রকম লাগে এই হল সোজা কথা।......নিজেকে নিয়ে কি করব তা তো বুঝতে পারছিনে। সদর দপ্তরে গিয়ে বল্লাম একটা কম্প্যানী দাও...... যা হোক কিছু দাও।......তবে ওদের অবস্থাটাও অবশ্য বুঝি—আমার সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না, সিপাহীর টিকিট ছাড়া আর কিছুই তো আমি দেখাতে পারছিনে। ......সদর দপ্তরে আমার হয়ে দু কথা বলতে পার?

"নিশ্চয় পারব, সার্গি সার্গিয়েভিচ!"

"আমাকে তোমার ডিট্যাচমেণ্টে ভর্তি করে নাও না? তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। সত্যি খুব ভাল হয়। আমি তোমার সহকারী হতে পারি, সিগন্যালম্যান হতে পারি, যা বল তাই হতে পারি। অদৃষ্টের কী খেলা বলতো! মনে আছে, তোমার ফ্ল্যাটে বসে আমরা কি রকম কবিতা লিখতাম? কী ভয়টাই দেখাতাম বুর্জোয়াদের? কোনো জিনিসই বৃথা যায় না, ফল ফলে সব কিছুরই। তুচ্ছতার পেছনে মানুষ ছোটাছুটি করে, ভুলে যায়—তারপর হঠাৎ একদিন এমন কিছু দেখে যাতে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে, গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভাল কথা, সেই যে শেডের মধ্যে জার্মানরা তোমাকে বন্ধ করে রেখেছিল, তোমাকে গিয়ে বার করলাম—সে কথা মনে আছে তোমার? বাপরে, সে এক আক্রমণ বটে, ওঃ একেবারে কচুকাটা! কাটতে কাটতে তরোয়ালের ফলাটা ভেঙেই ফেলেছিলাম। ...আবার দুজনে মিললাম এখন, ভারী ভাল লাগছে। তোমার শরীর কিন্তু দিব্যি আছে দেখছি। ......তোমার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে—হুঁ, নিশ্চয়।......ভাল কথা, তোমার স্ত্রী কোথায়?"

ঘোড়ায় টানা লরীগুলো ঠিক এমনি সময় ওদের কাছে পৌঁছে গেল। হুড়মুড় করে গাড়ীগুলো নামছে—আওয়াজের চোটে তখন আর কথাবার্তা চালানো সম্ভব নয়।

অস্তসূর্যের বিরাট, বিষণ্ণ দীপ্তিতে মন্থর মেঘপুঞ্জ রক্তাভ। শহরের মাথার ওপর ধূলিজাল ভেদ করে সে দীপ্তি প্রায় চোখেই পড়ে না। নদীর বুকে তুষার-কণাগুলি ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে—মনে হয় যেন প্যাঁচালো গোলকধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজছে। সশস্ত্র পাহারা সঙ্গে নিয়ে গোলাবারুদ বোঝাই মালগাড়ীগুলো অনেকক্ষণ আগেই পারঘাটা থেকে চলে গেছে। ডক-এলাকা একেবারে খালি। নিষ্প্রদীপ জাহাজটা পারঘাটা ছেড়ে স্রোতের মুখে এগিয়ে গেছে, দূরে কোথাও বাঁধবে। অফিসটার আড়াল নিয়ে পারঘাটার এদিক ওদিকে নাবিকরা বসে আছে। তাদের কাঁধে হাতবোমা, কিটব্যাগ, আর রাইফেলের বোঝা, আর কোমরে রীফার জ্যাকেটের বেল্ট কষে আঁটা। ধূমপান, কথাবার্তা সব বন্ধ। আকাশে সূর্যাস্তের ঘোলাটে, লালচে আভা, তা ছাড়া শহরে আর আলো নেই। পরিত্যক্ত শহরের মধ্যে কি ঘটছে তা ওরা শ্রমিকদের কাছ থেকে শুনেছে। শহরের অবস্থা খুব গুরুতর।

ইভান ইলিয়া বেশ বিচলিত। একবার করে ঘড়ি দেখে আর টেলিফোনের কাছে গিয়ে সদর দপ্তরে ফোন করতে চেষ্টা করে। কামান টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়া পাঠাবে এই আশায় সে বসে আছে। খবর পেল যে, ঘোড়ার জুড়িটুড়ি সব রওনা হয়ে গেছে—ওর ডিট্যাচমেণ্ট যেন কামানগুলোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়—সোজা একেবারে রেলস্টেশন পর্যন্ত। দুরন্ত হাওয়া ঠেলে অফিসের দোর খুলে তেলেগিন পারঘাটায় গেল। পথে আনিসিয়া নাজারোভার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হওয়ার যোগাড়।

"তুমি এখানে কি কর?"

একটি কথাও না বলে আনিসিয়া শুধু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল, কিন্তু মাথাটা নত হয়ে এল ইভানের দৃষ্টির সামনে। জীর্ণ, তালিমারা শাল—সেটাকে আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে পেছন দিকে গিঁট বেঁধেছে। কনকনে শীতের মধ্যে ঐ বোধহয় ওর একমাত্র আচ্ছাদন। কাঁধে একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ।

"না, না।" ইভান ইলিয়িচ বল্ল। "ভাগো, এক্ষুনি স্টীমারে ফিরে যাও আনিসিয়া। ডিট্যাচমেণ্টে তোমার দরকার নেই।"

এদিকে লোকজন সব তক্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কামান দুটো মাটিতে নামাল, তারপর ঘোড়া জুতল। এর মধ্যে মেঘটেঘ ঝাপসা হয়ে এসেছে, নদী আর তীরভূমি সবই তখন কালোয় কালো। কামানের ঘোড়াগুলোকে হেট হেট করতে করতে ডিট্যাচমেণ্ট শহরের দিকে যাত্রা শুরু করবে, এমন সময় শারিগিন এল, নীচু গলায় ইভান ইলিয়িচকে বল্লঃ

"আনিসিয়াকে নিয়ে কি করি? কমরেডরা সব বলছে, ও আমাদের সঙ্গে থাকুক।"

কামানের চাকা ছেড়ে ওদিক থেকে আবার লাতুগিন এসে হাজির।

"কমরেড কম্যাণ্ডার, ওযে আমাদের মার মতো। লড়াইয়ের ময়দান কী

জিনিস তা তো জানেন! ওকে দিয়ে জিনিসপত্র আনানো যাবে, মাঝে মাঝে কাপড়চোপড়ও কেচে দিতে পারবে। ওকে দেখতে শান্ত, কিন্তু ও একেবারে আসল জংগী। পোষা কুকুরের মতো আমাদের পিছু নিয়েছে, এখন করা যায় কি?”

আনিসিয়াও আছে—ঠিক ইভান ইলিয়িচের পেছনে—ডিট্যাচমেণ্টের সংগে মার্চ করে চলেছে। মাথাটা তখনো নোয়ানো।

“ওকে আমরা অশিক্ষিত নার্স বলে ধরতে পারি।......”

ইভান ইলিয়িচ সায় দিলেনঃ “ভাল কথা বলেছ! আমি অবিশ্যি ভেবেছিলাম যে ওকে থাকতে দিতে হবে।”

কামানের গাড়ীর কাছে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে লাতুগিন। গাড়ীটা ওপরে তুলবার চেষ্টায় ঘোড়াগুলো প্রাণপণে টানছে। একখানা চাকা ধরে ঠেলতে ঠেলতে লাতুগিন হাঁকে, “হেট, হেট, আগে চল্।” টানাটানিতে বালি ছড়িয়ে পড়ে ঢেউখেলানো মেঘের মতো—মানুষ জন সব তার নীচে চাপা পড়ে যায়। অবশেষে চাকা চলল রাস্তার ওপর দিয়ে। আবছা, ছোট ছোট বাড়ী, কোনো জানালাতেই আলো জ্বলে না। টেলিগ্রাফের তারে তারে কাতর গোঙানির শব্দ, দোকানে দোকানে সাইনবোর্ডগুলো ঘটঘট করছে।

ইভান ইলিয়িচের গতি মন্থর, মুখে মৃদু হাসি: “শিক্ষা পেলে তো বাপু”, নিজেকেই বল্ল সে, “একেবারে মাথায় গাঁট্টা। লোকের মনে কি হচ্ছে সেদিকে তোমার খেয়ালই নেই, বুঝেছ কম্যাণ্ডার! সত্যি কথা। নিঝনি থেকে জারিত্‌সিন পর্যন্ত সারা পথটা নিষ্কর্মার মতো চিৎপাত হয়ে শুয়ে কাটালে, এরা মানুষগুলো বাস্তবিকই কেমন ধারা তা একবার টেরও পেলে না।......ওরা কেমন দুলে দুলে চলে, টুপির ওপর ফিতেগুলো কেমন পতপত করে তুমি শুধু তাই দেখেছ। আনিসিয়ার দুঃখ-দুর্ভাগ্যের সংগে ওরা কেমন আপনা হতেই নিজেদের এক ক’রে নিল, তার জন্যে তো ওদের বৈঠক বসাতে হল না! এ কি করে সম্ভব হয়? জাহাজের আরামের জীবন ছেড়ে ওরা আজ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়েছে, কোথায় যাবে তাও জানেনা—ঠাণ্ডা কনকনে বালির ঝড় ঠেলে ওরা লড়তে চলেছে, হয়ত মরবেও, তবু এমনি ধারা সময়েও ওরা আনিসিয়ার দুর্ভাগ্যটাকে আপনার করে নিল! এ কি করে সম্ভব হয়? ওরা কি তাহ’লে এতই বীর? কিন্তু, ওদের তো খুব সাধারণ লোক বলেই মনে হয়। ...ইভান ইলিয়িচ, তুমি বাপু কম্যাণ্ডার নামের যোগ্য নও।......তুমি অতি সাধারণ ব্যক্তি। সিপাহীর মনের ভেতরটা যত জটিলই হোক, ভাল কম্যাণ্ডারকে প্রত্যেকটি সিপাহীর মনের কথা খেয়ালে রাখতে হবে—পরিস্থিতি যদি সংগীন হয়ে উঠে তবু রাখতে হবে......।”

সার্গি সার্গিয়েভিচের সংগে একটু আগে যে আলাপ হ’ল তাতে ইভান ইলিয়িচের মনে খুব নাড়া লেগেছে; আনিসিয়ার ব্যাপারেও নাড়া লেগেছে—যদিও ব্যাপারটিকে খুব সামান্য বলেই মনে হতে পারে। ওর মনে আত্মধিক্কারের প্রবৃত্তিই জাগল প্রথমেঃ নিজেকে তিরস্কার করে বল্ল—আমি অহংকারী, উদাসীন,

মূঢ়, বুদ্ধিহীন।......এমন ধারা সময় অথচ আমি দিব্যি মেদ বৃদ্ধি করে নিলাম; সার্গি সার্গিয়েভিচ পর্যন্ত তা লক্ষ্য করেছে।......ইভান ইলিয়িচ কিন্তু ধরে ফেল্ল যে, এই তিক্ত আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেও তার মনের মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ আর এক কথা। মুহূর্তের জন্যে কি এক উষ্ণ অনির্বচনীয় সুখের অমৃতে মনটা যেন হঠাৎ স্নান করে এল—ভাবল, দাশার ভালবাসা ফিরে পাবে, এই গোপন আশাটাই কি সকল আত্মজিজ্ঞাসার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে না? ভাবতে ভাবতে বাঁক ঘুরতেই ধুলোর ঘূর্ণি এসে মুখে ঝাপটা মারল, নাক ফোঁস ফোঁস করে উঠল তেলেগিন। ভাবল নাঃ, এসব ভাবনা তো ঠিক নয়, মন থেকে এসব একেবারে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

রেল স্টেশনে ইভান ইলিয়িচ আদেশ পেল, কামান দুটো অবিলম্বে ট্রেনে চাপিয়ে ভরোপনভো স্টেশনের কাছাকাছি কোনো জায়গায় বসাও। অর্ডারটা এনে দিলেন কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব। সাহেবের গড়ন লম্বা, নিষ্প্রভ চোখ দুটি মার্চ রাত্রির মতো কালো, গালের ওপর ঘন লম্বা জুলপি। একটু ঘাবড়ে ইভান ইলিয়িচ বোঝাতে গেল যে সে পদাতিক দলের কম্যাণ্ডার; গোলন্দাজ নয়, কাজেই কামানের ব্যাটারী পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে না। কম্যাণ্ডাণ্ট জবাব দিলেন—জবাবের সুর উঁচু নয়, কিন্তু শুনলে ভয় লাগেঃ

"অর্ডারটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন, কমরেড?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি। কিন্তু কমরেড আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই......"

"বর্তমানে কম্যাণ্ড আপনার বোঝানো শুনতে চায় না। আদেশ পালন করার ইচ্ছা আছে আপনার?"

"ও বাবা, এদের এখানে কথা বলার ধরনই আলাদা।" তেলেগিন ভাবে। নিজের অজ্ঞাতেই স্যালুটে হাত তুলে সে বল্ল, "তাই হবে কমরেড।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে পাড়ি দিল।

এখানে কাজকর্মের ধারা একেবারে অভূতপূর্ব। অন্যান্য শহরের স্টেশনে আপনি যদি, এই ধরুন......একখান থেকে আর একখানে যেতে চান তাহলে কত লোককেই যে ডিঙিয়ে যেতে হবে! দেখবেন বস্তাটস্তার ওপর কাতারে কাতারে লোক শুয়ে আছে টেনে লম্বা হয়ে—কেউ ছদ্মবেশী বুর্জোয়া, কেউ পলাতক সৈন্য, কেউ বা চাষী (স্ত্রী, পুরুষ দুইই), কোথাও বস্তার ভেতর থেকে মুর্গীর লেজ বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও বা শুয়োরের বাচ্চার কেঁই কেঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে—এমনি সব। কিন্তু এখানকার স্টেশনে ওরকম একটি লোকও পাবেন না। এখানে মেঝের ওপর ঝাড়ু পর্যন্ত পড়েছে—সত্যি। তবে পরিত্যক্ত রিফ্রেশমেণ্ট রুমের টেবিলে আর দেওয়ালের গায়ে এক পুরু ধুলো—ধুলো উড়ে এসেছে ভাঙা জানলা দিয়ে। এখানে এদের কথা বলার কায়দা পর্যন্ত অন্য রকম—একেবারে সংক্ষেপে সারে, সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি যেন চোখও রাঙায়-- মনে হয় যেন বন্দুক উঁচিয়েই আছে।

তেলেগিন মাল বোঝাইয়ের পরোয়ানা পেল, একটা ইঞ্জিনও পেল—কিন্তু তার জন্যে না করতে হল খামোকা ছোটাছুটি, না করতে হল হল্লা হৈ-চৈ। সাপঝকভের কথা নিয়ে সদর দপ্তরে টেলিফোন করতে জবাব এলঃ "বেশ, ওঁকে নিতে পারেন, তবে দায়িত্ব আপনার।" ঝুলন্ত লণ্ঠনের আলোয় জাহাজীরা ততক্ষণে কামানগুলোকে দুটো ট্রাকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ইভান ইলিয়িচ। এই যে গাগিন ঃ ও নভগোরদের লোক—কড়া মুখের ওপর গভীর রেখা পড়েছে, কপাল থেকে ভ্রূ পর্যন্ত কালো চুল নেমেছে টুপির নীচে দিয়ে, আর তার বন্ধনীর গায়ে সোনালি হরফে লেখা রয়েছে—"বেস্‌পশ্‌চাদনি"। আর ঐ যে বাইকভ—মহা ফক্কড় লোক, মদও টানতে পারে খুব, ও এসেছে উত্তরের সমুদ্রকূল থেকে। ওর ময়লা দাড়িটা ইয়া লম্বা, মনে হয় যেন সেটা মুখের সঙ্গে লেই দিয়ে লেপটানো। আর মাথার খুলিটা গোল মতো, মজবুতও বটে। কামানের গাড়ীর চাকা চেপে ধরে ন'জন লোকে মিলে খাড়া তক্তা বরাবর গাড়ীটাকে ঠেলে তুলছে। কিন্তু বাইকভ সেখানে নেই—সে আছে এখানে, ওখানে, সেখানে, সর্বত্র; "আরে কমরেডস্‌, এই উঠল বলে—লাগাও, আর একটা ঠেলা লাগাও, তাহলেই ব্যস...।" যারা ঠেলছিল তাদের একজন হাঁটু দিয়ে ওকে গুঁতো কষাল, "আরে বাবা ইয়ারদাস, নিজেই এক হাত লাগাও না বাপু?"

এদিকে লাতুগিন—নির্জন নভগোরদের মানুষ, কারঝেনেৎস বন অঞ্চল থেকে এসেছে। চোস্ত, চওড়া মুখ—খাড়া নাকটা বুঝি কবে মারপিট করতে গিয়ে ভেঙে এসেছে। দেহটা তত লম্বা নয়, কিন্তু গায়ের জোর ঠিক দৈত্যের মতো। বুদ্ধিশুদ্ধিও ধারালো, ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে বিপদ আছে। আর মেয়ে পটানোর ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলা ভার। তারপর ওদিকে দেখ জাদুইভিতের...

"ইভান ইলিয়িচ", ডাকল শারিগিন। "এই ভরোপনভো স্টেশনটা কোথায় সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?"

"এ সব অঞ্চলের আমি তো কিছুই চিনিনে।"

"স্টেশনটা কাছেই, এই জারিতসিনের পরই। যুদ্ধক্ষেত্রও তো ওখানেই।... শুনলাম হোয়াইটরা নাকি সোজা ঠেলে আসছে।.........এন্তার কামান আর ট্যাঙ্ক আর হাওয়াই জাহাজ ওদের সঙ্গে......তার সঙ্গে আবার লাখ খানেক লুটেরা কসাক, গাড়ী নিয়ে নিয়ে সৈন্যদের পেছনে পেছনে ফেরে।

শারিগিনের গলার স্বর চাপা, উত্তেজিত। নীল চোখ দুটো ঝক ঝক করছে। স্পর্শকাতর ঠোঁটের ডগায় সচকিত মৃদু হাসি—ঠোঁট দুটো কাঁপছে। ইভান ইলিয়িচ ভ্রূ কোঁচকাল।

"আচ্ছা শারিগিন, সত্যিকারের লড়াইয়ে তুমি কখনও যাওনি বুঝি?" শারিগিনের চোখমুখ সব একেবারে লাল হয়ে উঠল, এমন কি পুঁচকে নাকটা পর্যন্ত।

"আজে বাজে কথায় আর কান দিও না, বুঝলে।......ও সব কথায় শুধু

আতঙ্ক ছড়ায়।......ডিট্যাচমেণ্টের সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছ তো?”

“রেখেছি!”

শারিগিন হাতটা ঝট্ করে কপালে ঠেকাল—এরকম ও বড় করে না। মুখের মেঘ তখন কেটে গেছে। “ছেলেটা ভাল,” ভাবল তেলেগিন। “সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়ে বটে, তবে তা কাটিয়ে উঠবে।” তারপর তেলেগিন এলো মালগাড়ীর কাছে—গাড়ীটা কামানের ট্রাকের পেছনে জোড়া। এমন সময় প্ল্যাটফর্ম ধরে উত্তেজিত ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে পেঁাছাল সার্গি সাপঝ্কভ। তার কাঁধে কিটব্যাগ, বগলে তলোয়ার.........।

“ইভান, আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছ?”

“সব ঠিক হয়ে গেছে সার্গি সার্গিয়েভিচ। এখন উঠে পড়!”

মালগাড়ীতে উঠল সাপঝ্কভ। গাড়ীর এক কোণে, জাহাজীদের মালের গাদার উপর আগে থেকেই বসেছিল আনিসিয়া।

পশ্চিমী রেল লাইনের ওপর ভরোপনভো স্টেশন। সেখান থেকে অল্প দূরে এক জায়গায় কামান দুটো নামানো হল ভোর হবার আগেই। ও দুটো ওখানকার একটা আর্টিলারী বাহিনীর কাজে লাগবে। ওখানে পেঁাছবার পর তেলেগিন আর তার ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা জানতে পারল যে, যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। ঠিক ভরোপনভোর নীচেই জারিত্সিন থেকে আট মাইল দূর পর্যন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে একটা প্রাকার তৈরী হচ্ছে; উত্তর দিকে গুমরাক স্টেশনে তার গোড়া আর জারিত্সিনের দক্ষিণ দিকে সারেপ্তায় তার শেষ। এই প্রাকারবেষ্টিত বন্ধনীই আত্মরক্ষার শেষ লাইন। এর পেছনে এক সার অনুচ্চ পর্বতমালা, আর পর্বতের ওপারে ঢালু প্রান্তরভূমি একেবারে শহরের কিনারা পর্যন্ত উঠে গেছে। পিছু হটার পথ নেই, পিছু হটতে গেলেই নামতে হবে ভলগার কনকনে স্রোতের মাঝখানে।

গতদিনের ঝড়ে মেঘ সরে গেছে। সে মেঘ এখন দিগন্তের ওপারে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে স্তূপীকৃত। উদীয়মান সূর্যে একটুও উত্তাপ নেই। বাদামী রংয়ের সমতল ভূমির ওপর অসংখ্য মানুষ—কেউ মাটি খুঁড়ছে, কেউ খোঁটা পুঁতছে, কেউ বা কাঁটা তারের বেড়া খাটাচ্ছে কিংবা বালির বস্তা সাজাচ্ছে। জারিত্সিনের ওধার থেকে মালগাড়ী আসে, গাড়ী থেকে লোক নামে, রওনা হয় স্তেপের দিকে, তারপর ভূপৃষ্ঠের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সদ্য-খোঁড়া গর্ত থেকে কেউ বা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে উঠে আসে, ক্লান্তভাবে টলতে টলতে চলে স্টেশনমুখো। শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে যারাই কোদাল ধরতে পারে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাদের প্রত্যেককেই বোধ হয় এখানে কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজ করবার এমনি একটা দল, নানান্ চেহারার জন-পনের স্ত্রী-পুরুষ,

তারা তেলেগিনের ব্যাটারীর দিকে আসছিল। এক শুঁটকো বুড়ো মিলিটারী এঞ্জিনীয়র তাদের পথ-প্রদর্শক।

টাইট করে জড়ানো উটের লোমের গলাবন্ধের ওপর দিয়ে তাঁর ছাই-রঙা গোঁফের ডগা দেখা যায়। "নাগরিকগণ!" বলে তিনি ভাঙা গলায় হাঁক দিলেন। "আপনাদের কাজ খুব সোজা। চোদ্দ ইঞ্চি একটা পাঁচিল আমার দরকার। ওখান থেকে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আপনারা ওপরে ফেলতে থাকুন—এই খুঁটির এই দাগ পর্যন্ত পৌঁছালেই ব্যস।......এক ফুট অন্তর অন্তর দাঁড়িয়ে পড়ুন, তারপর সবাই মিলে লেগে যান!"

ওঁর হাত দুটো শীতে নীল। সেই হাতেই তালি দিলেন যাতে ওরা ভরসা পায়। গর্তের মধ্যে লাফিয়ে নেমেছিলেন, এবার চটপট গর্ত থেকে উঠে রওনা দিলেন।

বাকী সবাইয়ের রাগত দৃষ্টি ওঁর পেছনে। একজন স্ত্রীলোক মাথাটা দুলিয়ে ওঁকে লক্ষ্য করে চীৎকার দিল ঃ

"লজ্জা করে না, গ্রিগরি গ্রিগরিয়েভিচ, লজ্জা করে না!"

আর সবাই যে যেখানে ছিল সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে—কোদালগুলো এমন-ভাবে ধরেছে যেন সেগুলো সর্বহারা একাধিপত্যের যন্ত্রবিশেষ। ওদের মধ্যে এক ছোকরা—তার ঠোঁট দুটো পুরু, কণ্ঠার হাড়টা উঁচু—মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে পেরে সে যেন খুব খুশি—সে খুঁড়তে এগিয়েছিল, কিন্তু এগুবামাত্র সবাই ফোঁস করে উঠল ঃ

"ছি, ছি, পেতিয়া, থাম এক্ষুনি।......"

তারপর কলরব করে উঠল সবাই একসঙ্গে। স্নায়ুপীড়িত ফ্যাকাশে চেহারার এক ভদ্রলোক এতক্ষণ চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আস্তে আস্তে দুলছিলেন—তিনিই ওদের সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল। ভদ্রলোকের ওভারকোট দেখে বোঝা যায় যে, তিনি গণ-শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী। ওভারকোটে বেল্ট নেই, দড়ি-বাঁধা; দড়িটা উড়ছে ঝাণ্ডার মতো।

"আপনি কিছু বলেন না কেন, স্তেপান আলেক্‌সিয়েভিচ? আপনাকে আমরা ভোট দিয়েছি।......আপনিই তো আমাদের ভরসা......"

আত্মবলিদানের ঢংয়ে তিনি আকাশে চোখ তোলেন, গালের উপর একটা পেশী ধুক ধুক করে উঠল।

"ভদ্রমহোদয়গণ, বলব, আমি কথা বলব—কিন্তু গ্রিগরি গ্রিগরিয়েভিচের সঙ্গে কথা বলব না। উনি আর আমাদের নন।"

এমন সময় অসম্পূর্ণ পাঁচিলের ওপর থেকে মাটির চাবড়া ঠিকরে পড়ল। পাঁচিলের মাথার ওপর আবির্ভূত হল একটা ঘোড়ার মুখ, লাগামের লোহাটা ঘোড়ার দাঁতে চাপা। ঘোড়ার আরোহী জিন থেকে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছেন—তাঁর প্রশস্ত কাঁধ, রক্তাভ কপোল, পরিধানে কুবান গাত্রবস্ত্র। চোখ দুটি সঙ্কুচিত করে ঠাট্টার সুরে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ

“কি ব্যাপার, নাগরিকবৃন্দ, কাজ করবেন কি করবেন না, তা স্থির করে উঠতে পারছেন না বুঝি?”

স্তেপান আলেক্‌সিয়েভিচ নামে সেই যে সন্ত্রস্ত গোছের ভদ্রলোকটি, যাঁর কোমরে বেল্টের বদলে দড়ি বাঁধা, তিনি এক পা এগিয়ে এলেন। অশ্বারোহীর দিকে মুখ তুলে তাকে অতি ধীরভাবে বোঝাতে লাগলেন—যেভাবে স্কুলের মাস্টার ছাত্রদের বোঝায়ঃ

“কমরেড, মনে হচ্ছে, এখানকার সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে সিনিয়র।......” গর্তের ধারে অশ্বারোহী ঘোড়াটা সাবধানে দাঁড়িয়ে আছে; দস্তানাপরা হাতে ঘোড়াকে চাপড়াতে চাপড়াতে ঘোড়সওয়ার বেশ ফুর্তির সঙ্গেই স্তেপানের প্রশ্নে ঘাড় নাড়লেন, বললেন, “হুঁম্‌।” “কমরেড, আমাদের দলটাকে কাল রাত্রে জবরদস্তি ফৌজে আনা হয়েছে; কে জানে কোথায় কোন্‌ নাকি নামের লিস্ট ছিল, তারই জোরে আমাদের আনা হয়েছে। আমাদের এই দলের পক্ষ থেকে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই......”

“হুঁম্‌”, বল্লেন দাড়িওলা ঘোড়সওয়ার, কিন্তু এবার তাঁর উচ্চারণের মধ্যে যেন হুমকির আভাস।

“হাঁ, আমরা প্রতিবাদ করি”, তীক্ষ্ণ সুরে বল্লেন, “স্তেপান আলেক্‌সিয়েভিচ, যারা শারীরিক পরিশ্রম করার উপযুক্ত নয় বলে সাব্যস্ত হয়েছে আপনারা তাদেরকেও ট্রেঞ্চ খুঁড়তে বাধ্য করছেন।......অত্যাচারের যুগই আপনারা এমনি করে ফিরিয়ে আনছেন। আপনাদের পথ জবরদস্তির পথ।”

এবার তাঁর দু গালের পেশীই ধুক ধুক করতে লাগল। যেন খুব বেশী বলা হয়ে গেছে—এমনিভাবে তিনি চোখ বুঁজলেন, বিবর্ণ ঊর্ধ্বনেত্র মুখটা এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল।......ঘোড়সওয়ার ওঁর দিকে চেয়ে চোখ দুটো কুঁচকে আনলেন; তাঁর প্রশস্ত নাসারন্ধ্র তখন কাঁপছে, কঠোরতার ভঙ্গীতে ঠোঁট দুটি জুড়ে এসেছে, মনে হয় যেন একটা কাটা দাগ পড়েছে মুখের ওপর। ঘোড়া ছেড়ে তিনি গর্তের মধ্যে নামলেন লাফিয়ে, ব্রীচেস প্যাণ্টের ভাঁজটা এক ঝটকায় ঝেড়ে নিয়ে বল্লেনঃ

“ঠিকই তো! আপনারা যদি নিজের ইচ্ছায় জারিতসিনকে রক্ষা করতে না আসেন, তাহলে জোর করেই আনা হবে। তাতে চটেন কেন? আসুন আসুন, দেখি একটা কোদাল দিন তো কেউ?”

বাদামী দস্তানা পরা প্রকাণ্ড হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন কারো দিকে না চেয়ে। মোটা মোটা গোল-মুখ যে স্ত্রীলোকটি সবার আগে প্রতিবাদ করেছিল, সে তার কোদালটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওঁর পানে।

“ঝগড়া করার কি আছে?” জের টানলেন ঘোড়ওয়ার। “এতো স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি।” বলতে বলতে মাটিতে কোদাল চালিয়ে একটা চাবড়া ওঠালেন, তারপর মাথা ছাড়িয়ে কোদাল তুলে সজোরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পাঁচিলের ওপর। “আমরা লড়ছি আর আপনারা আমাদের সাহায্য করছেন—

একই শত্রু আপনার আর আমার।......কসাকরা যে কাউকে ছাড়বে না; আমাকে পেলে জ্যান্তই চামড়া তুলে নেবে, আর আপনাদের পেলে লাগাবে চাবুক, একেবারে পাইকিরিভাবে—কারো কারোকে হয়তো তলোয়ার দিয়েই কাটবে......"

আরও ক' চাবড়া তুলে ফেলতে ফেলতে ঝট করে একবার শ্রোতাদের দিকে চেয়ে নিলেন। ও'র গা থেকে যেন স্বাস্থ্য আর শক্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

"আরে এসো ভাই, এসো!" বলতে বলতে উ'চু কণ্ঠাওলা ছেলেটির কাঁধ চাপড়ালেন; আর একটি ছেলে—বেশ প্রফুল্ল মুখ, কিন্তু বোকা বোকা চেহারা, চোখের পাতার রংটা যেন খড়ের মতো, তারও কাঁধ চাপড়ে দিলেন। "এবার চলে এসো ভাই—কি করে কাজ করতে হয় ও'দের একটু দেখিয়ে দেওয়া থাক, কি বল?"

একটু বোকার মতো হাসতে হাসতে ছেলে দুটি শুরু করে দিল—খু'ড়ছে আর মাটি ফেলছে। আর কয়েকজন, তারাও কাঁধ ঝাড়া দিয়ে কোদাল ধরতে শুরু করল। "আচ্ছা, আমিও লাগছি", বলে গোলমুখ মহিলাটি কোদালে বেধে হোঁচট খেলেন। দাড়িওলা কম্যান্ডার দৌড়ে গেলেন তাঁকে ধ'রে তুলতে। বেশ ভাল করেই জড়িয়ে ধরেছিলেন নিশ্চয়, কারণ দেখা গেল মহিলার মুখে রং লেগেছে, হাসি ফুটেছে। স্তেপান আলেক্‌সিয়েভিচের ভয় হল—বুঝি বা একেবারেই একঘরে হয়ে পড়েন।

"আচ্ছা......" খ্যারখেরে গলায় বল্লেন তিনি। "কিন্তু দেখুন কমরেডস—বিপ্লব—আর জবরদস্তি! বিপ্লবের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল যত রকম জবরদস্তি সব দমন করা।"

"বিপ্লব", দাড়িওলা কম্যান্ডারের আওয়াজটা গম গম করে ওঠে, "জবরদস্তি লাগায় মেহনতী মানুষের শত্রুদের ওপর; বিপ্লবের জন্মই তো এই জবরদস্তির পথে।......কথাটা পরিষ্কার হল?"

"মাফ করবেন—এটা যে নীতিবিরুদ্ধ।......"

"সর্বহারা শ্রেণী আপনার ওপর জবরদস্তি করছে—সে শুধু জবরদস্তির হাত থেকে সারা পৃথিবীকে মুক্তি দেবার জন্যে।"......

"মাফ করবেন......"

"না", দৃঢ়স্বরে বল্লেন কম্যান্ডার। "আপনাকে মাফ করব না। আপনি গোলমাল পাকাতে শুরু করেছেন। গোলমাল পাকানো ধ্বংসকার্য। ওঠান, কোদাল ওঠান......

"কমরেডস্, এগারোটার মধ্যে পাঁচিল তৈরী হয়ে যাবে সে ভরসা করতে পারি তাহলে? এখন আসি।"

একটু দূর থেকে এই কথাবার্তা সবই শুনছিল জাহাজীরা। তারা তো হেসে ফুটপাট। দাড়িওলা ঘোড়সওয়ার দশম আর্মি আর্টিলারি কম্যান্ডার—তিনি চলে গেলে জাহাজীরাই এগিয়ে এল ঐ সব বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য করতে—নইলে তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে পারে।

॥ চার ॥

গোটা ডিভিশনের সঙ্গে সঙ্গে পিওতর নিকোলায়েভিচ মেল্‌শিনের রেজিমেণ্টও দন নদীর বাঁদিক বরাবর পিছু হটে চলেছে। শত্রুপক্ষের সুসজ্জিত দন আর্মি একেবারে স্থায়ী ফৌজের কায়দায় সুগঠিত—তারই দ্বিতীয় কলামের অগ্রসর ইউনিটগুলো ওদের দিনরাত আক্রমণ করে, সে আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। অনবরত লড়াই, তার ওপর রাতের পর রাত ধরে মার্চ ক'রে চলা—না আছে নিয়মিত খাওয়া দাওয়া না আছে নিদ্রা বা বিশ্রাম---মেল্‌শিনের সৈন্যরা একেবারে অবসন্ন। পাহাড় আর স্তেপের প্রতিটি নালা, প্রত্যেকটি খানাখন্দ—সবই ক্রাসনভের কসাকদের কাছে সুপরিচিত—শত্রুকে যেখানে আক্রমণ করতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা সেই সব দিকেই তারা শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ভোরবেলা উঠে ওদের পদাতিক দলগুলি শত্রুর গুলির লক্ষ্যটাকে নিজেদের দিকে টেনে আনে, ওদিকে ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলো নালা আর সুড়ঙ্গ পথ ধরে শত্রুর পাশে গিয়ে পৌঁছায়—প্রচণ্ডভাবে শিস দিতে দিতে, হল্লা করতে করতে হিংস্রবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর।

"কমরেডস্‌, মাথা ঠিক রাখতে হবে—এই হল সবচেয়ে বড় কথা," সৈন্যদের উদ্দেশ ক'রে মেল্‌শিন বলেন। "সংহতিতেই আমাদের শক্তি। মশার কামড়ে ভয় পাওয়ার ছেলে আমরা নই। কিসের জন্যে লড়ছি তা জানি আমরা—তাই মরতে ভয় করিনে। কিন্তু কসাকের কথা ভাবুন—তার সাহস আছে, আবার লোভও আছে। তার লক্ষ্য হল লুট, সে তো প্রাণ হারাতে চায় না। আর তারও বাড়া কথা—ঘোড়ার দামই কসাকের কাছে সবচেয়ে বেশী।"

পেছনের পাহারাদার বাহিনীটা ইভান গোরার কম্প্যানী। সাপ্লাই ট্র্যান্সপোর্টের মালবাহী গাড়ীগুলোর প্রত্যেকটাতে আহত সৈন্য বোঝাই—সেগুলো ওরা রক্ষা করে। আহতদের ছাড়া যায় না, তাদের যে কোথাও রেখে যাবে এমন স্থানই নেই ঃ আহত হয়ে যারা যুদ্ধের পর বেঁচে থাকে তাদের গায়ে লাল তারার চিহ্ন দেখলেই শত্রুরা তাদের কাপড় চোপড় সব খুলে নেয়, তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে—তা সে পদাতিক দলের হাতেই পড়ুক, আর অশ্বারোহী দলের হাতেই পড়ুক। এই পৈশাচিক কাণ্ড সারার পর ঘোড়ার কেশরে তলোয়ার মুছে নিয়ে কসাকের দল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়—বীভৎস, বিকলাঙ্গ মৃতদেহগুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকায়।

ভেশেন্‌স্‌কায়া, কুর্মোইয়ার্স্কায়া, এতাউলভ্‌স্‌কায়া, পাসম্‌কিন্‌স্কায়া, নিস্‌নে-চির্স্কায়া, উস্ত-মেদ্‌ভেদিন্‌স্কায়া প্রমুখ সমৃদ্ধিশালী কসাক গ্রাম-

গুলিতে হিংস্র শত্রুতার ঝড় বয়ে যাচ্ছে—এমনধারা শত্রুতা দন অঞ্চলে কেউ কখনো দেখেনি। উত্তেজনাসৃষ্টিকারীরা সব এসে হাজির হল নভোচের্কাস্ক থেকে, স্বয়ং ক্রাসনভ এসে কয়েকটি গ্রামে ঘুরে গেলেন। গির্জায় গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি তুলে আহ্বান করা হল "দন রক্ষকমণ্ডলী"-কে। অতীত দিনের কায়দায় টুপি খুলে আভূমি প্রণত হয়ে আন্দোলনকারীর দল কসাকদের কাছে আবেদন জানাল—তলোয়ার ধার দাও, রেকাবে পা উঠাও। "তোমাদের দিন এসেছে, এবার ওঠো, দনভূমিকে মুক্ত কর!......বজ্রপাতের মতো আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো জারিত্‌সিনের ওপর, কমিউনিস্টদের বস্‌মায়েসির আড্ডা চুরমার করে দেব, লাল মহামারীটাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেব দনভূমি থেকে।......দনের সুখ-সমৃদ্ধি ওরা চায় না! ওরা চায়—আমাদের গরু ভেড়া সব কেড়ে নিয়ে যাবে, আমাদের জমি তুলে দেবে তুলা আর ওরেলের মুঝিক্‌দের হাতে, বে-ইজ্জত করবে আমাদের মা-বৌকে। কসাক ভাইসব, দন মাটির জানের জান তোমরা—তোমাদের ওরা পাঠিয়ে দিতে চায় খনিতে গোলামি করতে, সারা জীবন ধরে গোলামি করতে।......ভগবানের মন্দির কলুষিত হতে দিও না, মাতৃভূমির ধর্ম-বেদী রক্ষা কর! জীবনের পরোয়া কোরো না।......বিরাট দন বাহিনীর আতামান সাহেব জারিতসিন শহর তোমাদের হাতেই ছেড়ে দেবেন, তিন দিন তিন রাত্রি ধরে তোমরাই হবে সে শহরের মালিক।"

কম্প্যানী কম্যাণ্ডার ইভান গোরার দীর্ঘ দেহ, মাংসল কাঁধ, কিন্তু ঘুমের অভাবে মুখটা মলিন। কসাক অশ্বারোহী দল থেকে থেকে দিকপ্রান্তে মায়া জাগায়—সে দৃশ্য দেখে দেখে গোরার অভ্যাস হয়ে গেছে। ওদের চালচলন ও বোঝে তাই নিজের সৈন্যদের খামোখা আড়াল নেবার জন্যে ছুটতে দেয় না; বলে, মার্চ করে চলে যাও, ডাইনে-বাঁয়ে চাওয়ার দরকার নেই। প্রথমে সাংলাইয়ের গাড়ীর সার—চাকায় চাকায় ঠোকাঠুকি লাগিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে। তারপর ছিন্নবাস, বিশীর্ণ মানুষের দল—পায়ের নীচে মাটির দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে ভারী পা ফেলে টলে টলে চলে। সকলের শেষে ইভান গোরা, ঠিক মাতালের মত ওর পা কাঁপে। মাস ছয়েক আগেও ওর দেহে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু সেই যে 'মজুত দখলের' ফসল আদায় করতে গিয়ে গোলাবাড়ীর মধ্যে এক কুড়ুলের বাড়ি খেল, খেয়ে মাথায় ঘা হ'ল—আর তারপর লিখাইয়ার যুদ্ধে ফের যে চোট পেল—তাতে ওকে কাহিল করে ফেলেছে। ও এখন হাঁটছে—মাঝে মাঝে বেশ জীবন্ত, আবার মাঝে মাঝে যেন একেবারে তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সুমুখ দিয়ে কত সুখস্মৃতি ভেসে যায়ঃ গ্রীষ্মের গোধূলি বেলায় কাঠের গুঁড়ির ওপর লোকে বসে আছে, মাথার ওপরে পাক খাচ্ছে একটা বাদুড়।......... ছাপা ছিটের ওয়াড় পরানো বালিশ একটা—কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ডক পাতার গাদার ভেতর—আর তার ওপর আগ্রিপিনার হাসি মুখ। এই সব স্বপ্ন

ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় ও থেমে পড়ে, কাঁধের স্ট্র্যাপটা ঠিক করে নেয়, ঘুমে ভারী চোখের পাতাটাকে জোর করে খুলে সামনে চেয়ে দেখেঃ মানুষেরা পা টেনে টেনে চলেছে, গাড়ীর মধ্যে আহত লোকেদের মাথাগুলো উঠছে আর পড়ছে। পোড়ামাটির সমতল স্তেপটা যেন ভাসছে, দুলছে—কখনো বাদামী, কখনো বর্ণহীন, কখনো বিষণ্ণ। স্তেপটা বোধ হয় ওর অস্তিত্বের অন্তরেই প্রবেশ করে বসেছে—যতদূরেই চাও ও ছাড়া একটা গাছও চোখে পড়বে না, এমন কি একটা টেলিগ্রাফের থামও দেখা যাবে না। হোঁচট খেয়ে ও মাথাটা নাড়ল।......ওঃ যদি একবার চুপি চুপি গাড়ীটার কাছে যাওয়া যেত, গাড়ীর কাণায় হাত রেখে চলতে চলতেই যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমিয়ে নেওয়া যেত!

আবার? স্তেপের প্রান্তে ছোট ছোট অশ্বারোহী মূর্তি, গুলির আওয়াজ, কানের পাশ দিয়ে নিরীহ বুলেটের শোঁ শোঁ শব্দ.........

"জাগো, কমরেডস্, জাগো! এটেন্শন! গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে পোড়ো না!"

ওর বৌ আগ্রিপিনার হাতে চোট লেগেছিল, সে গাড়ীতে চলেছে। আর দাশা আর কুজমা কুজমিচ হাঁটছে একটা গাড়ীর পেছন পেছন।

টানা টানা চীৎকার শব্দ অন্ধকার ভেদ করে। গাড়ীগুলো থামে। অম্নি একটা গাড়ীর কোণায় ঠেস দিয়ে হাতের ওপর মাথাটা এলিয়ে দেয় দাশা। তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পায় ইভান গোরা কাছে এসেছে, চাপা সুরে আগ্রিপিনার সঙ্গে কথা বলছে—আগ্রিপিনা ঐ গাড়ীতেই বসে......

"একটা যদি সিগ্রেট পেতাম—আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে........."

"থামলাম কেন আমরা?"

"একটু জিরোনো হবে—পাঁচটা পর্যন্ত।"

"কে বলে গেল?"

"একজন মেসেঞ্জার এসেছিল।"

"তোমার মাথাটা আমার কোলের ওপর রাখ, ইভান—একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"ঘুমিয়ে নেব! ঘুমোতে ওরা দিল আর কি! আমাদের লোকজন সব অবসাদে ভেঙে পড়ছে। তুমি ঘুমোওনি কেন, আগ্রিপিনা? হাত ব্যথা করে?"

"হ্যাঁ।"

আগ্রিপিনাকে ওর নিজের কাছে টেনে নেয়, খুব আস্তে ক্যাঁচ কোঁচ করে ওঠে গাড়ীটা। ক্লান্ত ঘোড়ার মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইভান।

"মেসেঞ্জার বলছিলঃ 'কালাচ আর নিঝ্নে-চির্সকায়ার ওখানে শত্রুরা দলে দলে দন নদী পার হচ্ছে—কী দৃশ্য একবার দেখে আসুন গিয়ে! ওদের পেছনে ঝাণ্ডা হাতে পাদ্রীর দল, আর ভদকা বোঝাই মালের গাড়ী—গাড়ীর পর গাড়ী। মদে চুর হয়ে কসাকগুলো আক্রমণে ধেয়ে আসে, পাকা কসাই বেটারা'......!"

"ধর, রুটিটুকু খাও ইভান।"

আস্তে আস্তে রুটি চিবোয় ইভান। কষ্টে-সৃষ্টে রুটিটা গিলে ফেলে ধরা গলায় বল্লঃ

"এবার দনের ধারে পেঁাছেছি। কাছাকাছি তো একটা ফেরী নৌকা থাকার কথা, কসাকরা নিশ্চয়ই সেটাকে ওপারে ঠেলে দিয়েছে। বোধ হয় এই জন্যেই আমাদের থামতে হয়েছে।"

গাড়ীটা আবার সোজা হল—পিছু হটে ঠকর ঠকর করতে করতে চলে গেল ইভান। মানুষ, ঘোড়া সবার ওপরই নামল নিস্তব্ধতা। জামার হাতায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাশা। প্রেমাস্পদের সাথে চাপা ভালবাসার এমনই একটা মুহূর্তের জন্যে ও কী না দিতে পারে। ওরে ঈর্ষাজর্জর হৃদয়! আগে ভাবিসনি কেন একথা! কিসেরই বা তোর অভাব ছিল? ওর দয়িত, ওর প্রিয়তম—তাকে যে ও কাছে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে.........হারিয়েছে চিরদিনের মতো। "ইভান ইলিয়িচ," বলে এখন যতই ডাকুক, "ভানিয়া, ভানিয়ুশা" বলে যতই চীৎকার করুক, সে আর আসবে না......

কুজমা কুজমিচের ডাকে ঘুম ভেঙে দাশা দেখে সে একটা গাড়ীর নীচে শুয়ে আছে, কুঁকড়ি শুঁকড়ি হবে। গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভোরের আলোয় আকাশে রং ধরেছে—ফিকে সবুজ রং। ঠাণ্ডার চোটে দাঁত ঠকঠক করতে করতে দাশা আঙুলের ওপর ফুঁ পাড়ে।

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, ব্যাগ নিয়ে জলদি এসো, জখমী লোক আছে......"

নীচে নদীর ধার থেকে গুলি চলছিল—প্রত্যুষের স্তব্ধতার মধ্যে তার আওয়াজ কেমন ফাঁপা শোনায়। ঠাণ্ডা মাটিতে ঐটুকু ঘুমিয়েই দাশার হাত-পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, টেনে-হেঁচড়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে নার্সের ব্যাজটা ঠিক করে দিয়ে সামনে দৌড়ে গেল কুজমা কুজমিচ, ফিরে এসে বল্ল ঃ

"আর একটু তাড়াতাড়ি, চাঁদমণি, জলদি করো! আমাদের লোকজন এখানে কাছেই কোথাও আছে।......কে যেন গোঙাচ্ছে শুনতে পাচ্ছ? পাচ্ছ না?"

আবার দৌড়ে গেল, তারপর থেমে ঘাড়টা বেঁকিয়ে চারিদিকে চাইল। ওর হান্ফানানির দিকে নজরও দেয়নি দাশা—তবে ও যে এত ভীতু তা দেখে ঘেন্না না করে পারল না।

"নীচু হয়ে পড়, লক্ষ্মীমণি, বুলেটের শোঁ শোঁ শুনছ না?"

সবটাই অলীক কল্পনা—আসলে না ছিল আহতের কাতরানি, না ছিল বুলেটের শোঁ শোঁ। আকাশের আভায় রং ধরল আরও উষ্ণ। সামনে শাদার ঝিলিমিলি, যেন নদীটা কূল ছাপিয়ে চলে এসেছে। ওটা হল শরতের ঘন কুয়াশা—নদীতীরের নিষ্পত্র উইলো শাখায় আর নদীর জলের ওপর সে কুয়াশা ঝুঁকে পড়েছে। ইভান গোরাকে ওর মধ্যে দেখাচ্ছে যেন কোমর পর্যন্ত দুধে ঢাকা। আর একটু দূরে উঁচু টুপী-পরা একজন সৈন্য, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন—সবাইয়েরই শুধু কোমরের ওপরের অংশ দেখা যায়। ডনের দক্ষিণ-পাড়টা উঁচু—ওরা সেই পাড়ের দিকে চেয়ে আছে। সেখানে কুয়াশা

পৌঁছায়নি, অন্ধকার অন্ধকার ঝোপঝাড়ের পেছন দিয়ে স্তব্ধ বাতাসে অসংখ্য ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

কুজমা কুজমিচও তাদের দেখতে পেল।

“দেখ, দেখ দারিয়া দ্মিত্রেভ্না!” উত্তেজিতভাবে ও বকবক করে উঠল। “আর্মির পিছে পিছে ওরা এসেছে লুঠের জন্যে। আরে গাড়ীগুলো একবার দেখ! বাপরে, একেবারে হাজার হাজার! ঠিক সেই অতীত কালের ভবঘুরে জাতের মতো! দেখ দেখ! জিনখোলা ঘোড়া, গাড়ী।......আগুনের ধারে শুয়ে রয়েছে দাড়িওলা লোকগুলো, দেখেছ? ঐ যে যাদের বুটের ডগায় ছোরা গোঁজা? সত্যি একবার চেয়ে দেখ দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, এমন দৃশ্য জীবনে আর দেখবে না।”

দাশা কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না—না গাড়ী, না ঘোড়া, না আগুনের ধারের কসাক। তবু ওর রক্ত জল হয়ে আসে। ইভান গোরা ঘুরে দাঁড়াল, হাতের ইঙ্গিতে ওদের বল্ল কুয়াশার মধ্যে বসে পড়তে। কুজমা কুজমিচ শুরু করল বিড়বিড় করতে, মনে হল যেন কোন্ রুদ্ধশ্বাস কাহিনীর পাতা থেকে মুখ তুলে কথা বলছেঃ

“আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এ দৃশ্য দেখানো দরকার। তাই না? এ একেবারে স্বপ্নের মতো! বুদ্ধিজীবী বাবুরা বলতেন, শাসনতন্ত্র দাও আমাদের, আমরা রুশ জনসাধারণকে শাসন করব।......তাই না?......ওঃ রুশ জনসাধারণকে নিয়ে ওরা কী গল্পই না বানাতঃ জনসাধারণ নাকি অলস, তারা নাকি মুখ বুজে সয়, আর ধর্মের জন্যে মরে! বটে! বটে! এবার একবার সেই জনসাধারণের দিকে চেয়ে দেখতো বাপু! কুয়াশায় কোমর পর্যন্ত ঢেকে ওরা লক্ষ্য স্থির রেখেছে শত্রুর ওপর—ওরা বুদ্ধিমান অথচ ভয়ংকর, নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।......এ এক নতুন দৈত্য—কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াচ্ছে আজ, হাতে বাঁধছে লোহার দস্তানা—ইতিহাসে এ শক্তির পরিচয় ছিল না এতকাল.........”

মেশিনগান আর রাইফেল থেকে গুলীবর্ষণের দূরাগত শব্দ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা কথার মাঝখানেই থেমে পড়ল কুজমা কুচমিচ। ওর থেকে আগে দাঁড়িয়েছিল ইভান গোরা, সে মাথা ফেরাল। নদীপথে আরও একটু দূরে দুটো ফাঁপা বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি জাগল, সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার প্রান্তদেশে বিচ্ছুরিত হল আবছা লাল আভা একটা। দূর থেকে চীৎকারের শব্দ আসে, গুলীর আওয়াজ আবার বেজে ওঠে—এবার আরও ঘন ঘন।

“‘আরে, আমাদের ওরা ওপারের ফেরী-বোটটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সত্যি বলছি!” কুয়াশা থেকে মাথাটা জাগিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল কুজমা কুজমিচ। “ওঃ হো-হো-হো, ওখানে সব একেবারে কচুকাটা, কচুকাটা।......”

একদল সৈন্য নিয়ে ইভান গোরা নীচু হয়ে ছুটল নদীর পাড় লক্ষ্য করে, ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল আগাছার ঝোপঝাড়ের মধ্যে। সূর্যোদয়ের

ছটা তখন সারা দিগন্তে। কুয়াশাটা পাতলা হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে উইলো-গাছের রিক্ত শাখায় ফালির মতো ঝুলে আছে। হঠাৎ কুয়াশা-ঢাকা নদী-পাড়ের আড়াল থেকে এমন ভীষণ আর্তনাদ আসতে লাগল যে, হাতের মুঠোয় কান চেপে ধরল দাশা। কুজমা কুজমিচ তো শুয়েই পড়ল—একেবারে সটান জমির ওপর।

ধপাধপ মারের শব্দ, অস্ত্রের ঠোকাঠুকি, গুলীর আওয়াজ, বিকট বিকট আর্তনাদ, জলের ছপ ছপ ধ্বনি, হাত বোমার বিস্ফোরণ।......

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর থেকে বাইরে এল ইভান গোরা। চলতে চলতে হাঁ করে বাতাস গিলছে, আবার ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে দিচ্ছে। মাথায় টুপি নেই, কিন্তু হাতে দুটো ছুঁচলো কসাক টুপি, তাতে লাল বন্ধনী। দাশার কাছে এসে সে বল্লঃ

"আমি স্ট্রেচার পাঠিয়ে দিচ্ছি—আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন নদীর ওখানে চলে যান—সেখানে দুজন কমরেডের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে......"

হাতের টুপি দুটোর দিকে চেয়ে একটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আর অন্যটা এক ঝটকায় বসিয়ে দিল কপালের ওপর।

"ওরা ভেবেছিল নৌকো করে আমাদের পাশের দিকটায় পৌঁছে যাবে—শুয়োরের বাচ্চা শালারা।..... যান যান, কোনো ভয় নেই, ওদিকে সব শেষ হয়ে গেছে।......"

॥ পাঁচ ॥

প্রকাণ্ড দন আর্মির ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক রেজিমেন্টগুলো দন নদী পার হচ্ছে। তিনটে ভাসানো পুল—তার ওপর দিয়ে লোকে ওপারে যায়; অনেকে আবার বোটে কিংবা খেয়া নৌকাতেও নদী পার হয়। নিঝ্‌নে-চির্সকায়া গ্রাম থেকে কালাচ গ্রাম পর্যন্ত নদীর দুধারেই পারাপারির শব্দে মুখরিত। একেবারে যুদ্ধের কায়দায় ব্যূহ রচনা ক'রে নদী পার হল ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলো। সওয়ারদের পরণে নতুন ইউনিফর্ম। মাথার ওপর বাঁকা ক'রে বসানো গোল টুপি। গানে-গাথায় বিখ্যাত ওদের চুলের ঝুঁটি—ঠিক চিরাচরিত প্রথায় কপালের ওপর ঝুলছে। অশ্বারোহীদের বর্শাগ্র থেকে ধ্বজা পত পত করে, ভীরু তির্যক দৃষ্টিতে ধূসর দনের দিকে তাকায় বাচ্ছা ঘোড়াগুলো, তাদের ক্ষুরের নীচে পুলের তক্তার মধ্যে জল ছিটকে ছিটকে আসে।

লম্বা লম্বা বোট বোঝাই ক'রে পদাতিক সৈন্যরা নদী পার হচ্ছে। এরা সব অজাতশ্মশ্রু যুবক—গাড়ীঘোড়া আর কসাকের জটলা দেখে একেবারে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। বোট থেকে লাফ দিয়ে জলে নেমে খাড়া পাড় বেয়ে তারা ওপরে উঠে যায়, তারপর সার বেঁধে লাইন দেয়। পায়ের সাহায্যে রাইফেলের কুঁদো মাটিতে দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপি নামিয়ে ফেলে। ওদের সামনে দীর্ঘকেশ ডীকনেরা ধূপদান ঝন্‌ ঝন্‌ করতে করতে প্রচণ্ড স্বরে চীৎকার করছে; পুরোহিতেরা সৈন্যদের আশীর্বাদ করছে। সালঙ্কার পোষাক-পরিচ্ছদে পুরোহিতদের দেখাচ্ছে ঠিক সোনালি ঘণ্টার মতো।

হোয়াইট সৈন্যদের কম্যাণ্ডার জেনারেল মামন্তভ ঘোড়ায় চড়ে একটা উঁচু সমাধি স্তূপের ওপর থেকে সৈন্যদের নদী পারাপার দেখছিলেন। তাঁর পেছনে তাঁর সিনিয়র অফিসার কয়েকজন, তারপর তাঁর পতাকাবাহী আর এসকর্ট। জেনারেলকে সবাই দেখতে পাচ্ছে। কালো কসাক ক্লোক গায়ে দিয়ে ঠিক পাথরের মূর্তির মতোই তিনি তাঁর শ্বেতাভ-ধূসরবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন। ঘোড়াটি অধৈর্যভাবে খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। ঢাকের বাজনার তালে তালে গান গাইতে গাইতে সৈন্যরা সামনে দিয়ে চলে গেল—বাদ্য-পরিচালকদের ছড়ির মাথায় লোমের গুচ্ছ বাতাসে উঠছে আর পড়ছে। পূর্বদিকে বাদামী স্তেপের ওপর ভারী ভারী কামান গর্জন করে, কিন্তু অগ্রসরমান সৈন্যদের পায়ের ধূলোয় কামানগুলো দেখা যায় না।

হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে (হাতের কব্জি থেকে একটা চাবুক ঝুলছে) কম্যাণ্ডার ওপরে তাকিয়ে দেখলেন—ঢালু ডানাওলা প্লেনগুলো আকাশে ভাসছে।

ঘোঁৎ করে নীচে এসে প্লেনগুলো একে একে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—চেয়ে চেয়ে দেখলেন কম্যান্ডার সাহেব। প্লেনের সংখ্যাও গুণে নিলেন।

সমাধিস্তূপের সামনে দিয়ে ছোট ছোট কতকগুলো ঘোড়া প্রকান্ড প্রকান্ড হাউইটজার কামান ছুটিয়ে নিয়ে গেল—কামানগুলোর চোঙ আর বর্ম একেবারে ঝকঝক করছে। ঘোড়াগুলোর গায়ে রুক্ষ্ম লোম, পায়ের পেছনে ঝাঁকড়া চুলের গোছা, জুড়ি ঠিক মেলেনি। খুব ছুটছে ঘোড়াগুলো—তেজ দেখাবার জন্যে দাড়িওলা ড্রাইভারের দল চাবুক নেড়ে নেড়ে আরও উৎসাহিত করছে। ঘোড়ার পায়ের ধুলো মেলাতে না মেলাতে ছুটে এল মস্ত বড় বড় ট্যাংক—রিভেটকরা লোহার পাত দিয়ে তৈরি, সামনের স্প্রকেটগুলো ওপরে ওঁচানো। ইস্পাতের দশটা রাক্ষস, গুণে দেখলেন মামন্তভ—এই দিয়ে লাল কুত্তাগুলোকে জারিত্‌সিনের ধুলোয় পিষে ফেলতে হবে। সমাধিস্তূপের পাশ দিয়ে দুল্‌কি চালে ঘোড়া নামিয়ে এনে নদীতীর বরাবর জোরে ঘোড়া ছোটালেন জেনারেল। একটু পেছনেই ওঁর পতাকাবাহীও ঘোড়া ছুটিয়েছে—তার ঘন নীল পতাকাটা ওঁর মাথার ওপর পত পত করছে।

দলে দলে নতুন সৈন্য এসে বোটে চাপে। ঘোড়ার ঘাস আর আরও সব দরকারী জিনিস খেয়া ক'রে ওপারে নেওয়া হয়। মালের গাড়ী, হাল্কা হাল্কা যাত্রীগাড়ী, প্রকান্ড প্রকান্ড ঘাসের গাড়ী—যে রকম গাড়ীতে মাঠ থেকে আঁটি বোঝাই করে গোলায় নেওয়া হয়—সব খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে। গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে এখানে ওখানে সম্ভ্রান্তমূর্তি ভদ্রলোকেরা অপেক্ষা করছেন—খেয়া নৌকায় পার হবেন। কেউ পায়চারি করছেন, কেউ বা বসে আছেন, আগুনের পাশে বসে খাওয়া দাওয়া করছেন। এঁরা সব কসাক বানিয়া; প্রতি কসাক গ্রাম থেকেই এমনিধারা বানিয়াদের পাঠায়—সৈন্যদলে নিজ গ্রামের লোকজনদের বৈষয়িক ব্যাপার স্যাপার দেখাশোনা করবেন। এঁরা কিছুই বাদ দেন না; পশুর খাদ্য, গরু, ছাগল, টাকা, শস্য কিংবা কাপড়চোপড়, কম্বল, গদি, পালকের বিছানা, আয়না, বন্দুক প্রমুখ ব্যবহার্য দ্রব্য—যা কিছুই হোক, সব রকম লুটের মালই এঁরা গ্রহণ করেন। এই সব জিনিস থেকে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রামের ফৌজী ইউনিটকে খাদ্য আর ঘাসবিচালি সরবরাহ করেন; প্রয়োজন হলে কাপড়-চোপড় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিও জুগিয়ে থাকেন। যা কিছু বাকী থাকে তার ফর্দ লিখে গাড়ী বোঝাই করে গ্রামে পাঠিয়ে দেন—পাহারা দিতে সংগে যায় মেয়েরা আর বাচ্চারা।

মমন্তভ রিশ্‌কভ গ্রাম পার হলেন। গ্রামটা ছোট্ট, ঘরবাড়ীর অর্ধেকই আগুনে জ্বলে গেছে, গোলাটোলা সব একেবারে পুড়ে ছাই। গ্রাম পার হয়ে বাঁক ঘুরে রেল লাইন ধরলেন মামন্তভ—দক্ষিণ দিক থেকে একটা সাঁজোয়া ট্রেন আসবার কথা।

বারোটি অশ্বারোহী আর আটটি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে দন আর্মি। পাঁচটি স্তম্ভের আকারে সে আর্মি অগ্রসর হচ্ছে।

পাঁচটি স্তম্ভই ছুটেছে তীব্র গতিতে—জারিত্‌সিনের শেষ রক্ষা-ব্যূহ তাদের লক্ষ্য। দক্ষিণ আর উত্তরের ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে লাল ফৌজের দশম আর্মি তখন পিছু হটছে, দ্রুত সংকুচিত যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ঘন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর্মির পাঁচটি ডিভিশনেই সৈন্যসংখ্যা ভীষণ কমে গেছে—শেষ শক্তি আর শেষ গোলাবারুদ নিয়েই তাদের যুঝতে হচ্ছে।

এমন দিনে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সমর পরিষদের তরফ থেকে ১০ম আর্মিকে চূড়ান্ত রকম সাহায্য দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিষদ তখন নাশকতার রাহুগ্রাসে—গোপন মুখোসের সুচতুর আবরণে সে নাশকতা সুরক্ষিত। সমর পরিষদ কিছুতেই নড়তে চায় না, খালি জিদ ধ'রে বসে থাকে যে, জারিত্‌সিনের লড়াই এমন কিছু গুরুতর নয়, জারিত্‌সিন সমর পরিষদের মনোভাব নাকি শুধু আতঙ্কের অভিব্যক্তি। এইভাবে নাশকতা রূপ গ্রহণ করছিল।

সুতরাং জারিতসিনকে তার নিজের শক্তি দিয়েই হোয়াইটদের আক্রমণ রোধ করতে হবে।

১০ম আর্মির সমর পরিষদ তখন দুটি আদেশ জারি করলেন ঃ স্টীমার, মালবোট, খেয়া-নৌকা ইত্যাদি যা কিছু আছে সব জারিতসিন থেকে দূরে উত্তরে পাঠিয়ে দাও, যাতে ভল্‌গার বাঁ ধার ধ'রে কারও পিছু হটবার পথ না থাকে—এই হল প্রথম আদেশ। আর দ্বিতীয় আদেশটি আর্মির প্রতি ঃ যে যেখানে আছে, নতুন আদেশ না আসা পর্যন্ত কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করবে না—এর অন্যথা করলে মৃত্যুদণ্ড।

তেলেগিনের কামানের ব্যাটারীতে সকালটা শান্তিতেই কাটল। দিগন্তে কোথায় যেন কামান গর্জন করছে, কিন্তু সমতল প্রান্তরে মানুষ-জন কেউ নেই। জাহাজীরা মাটির নীচে একটা আশ্রয় বানাতে ব্যস্ত। আনিসিয়া গিয়েছিল স্টেশনে, অনুমতি না নিয়েই। তিন ঘণ্টা পরে যখন ফিরল তখন ওর কাঁধের ওপর দুটো বস্তা, তার চাপে ও প্রায় কুঁজো হয়ে গেছে। একটা বস্তায় রুটি, আর একটায় তরমুজ। কামান দুটোর মাঝখানটাতে বস্তা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে ও রুটি কাটল, তারপর তরমুজগুলোকে চার-ফালা করল। বলল ঃ "খাও!" নম্র অথচ সন্তুষ্ট মূর্তিতে এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—বুভুক্ষু নাবিকের দল কিভাবে গোগ্রাসে তরমুজ গিলছে। গালের জল মোছারও তর সয় না ওদের—খাচ্ছে আর খুশিমনে জোরে জোরে ডাকছে ঃ

"আনিসিয়া, আনিসিয়া!"

"আনিসিয়া জিন্দাবাদ!"

"ওর আর জুড়ি মিলবে না!"

শারিগিনের ধরণ-ধারণ ভারিক্কি গোছের—নিজস্ব মন্তব্য তাকে একটা করতেই হবে। বলল ঃ

“ওর উদ্যোগ আছে, বুঝলে? উদ্যোগই তো আসল কথা।”

তরমুজ থেকে মুখ তুলে একসঙ্গে হো হো শব্দে হেসে উঠল জাহাজীরা। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে উঠে দাঁড়াল শারিগিন, কোদালটা তুলে নিয়ে বলল ঃ “কমরেডস্, আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আনিসিয়ার জন্যে মাটির নীচে একটা আশ্রয় [illegible] দেখাশোনা করা আমাদের কর্তব্য.....”

হাসি তো হেসে নেওয়া গেছে, এবার নাবিকেরা ছোট একটা পরিখা খুঁড়তে লেগে গেল—ব্যাটারীর পেছনে নালার মধ্যে। গোলাগুলী চললে আনিসিয়া তাতে আশ্রয় নেবে। খোঁড়ার কাজ শেষ হলে, তারপর আর ওদের কিচ্ছু করার থাকল না। স্টীমার থেকে নামানো স্তূপাকার গোলাগুলো কামান দুটোর দুধারে সার করে সাজান হয়ে গেছে। রাইফেল-টাইফেল সব পরিষ্কার—ব্যাটালিয়ন পরিচালনার ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থাও সাপঝকভ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। জাহাজীরা আর কি করে গর্তগুলোর আশেপাশে শুয়ে শুয়ে রোদই পোহায়। জেনারেল মামন্তভ, আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আমরা এখন প্রস্তুত!

কামানের গাড়ীর ওপর বসে আছে ইভান ইলিয়িচ; একটা শুকনো ডাঁটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তাতে কামড় বসাচ্ছে। বড় বড় তর্কের ও ধার ধারে না। দেশের দূর দূরান্ত থেকে এই যে মানুষগুলি ওর চারপাশে জমল, এত বিসদৃশ হয়েও যারা এত সহজে তাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ জড়িয়ে নিল একই সূত্রে—তাদের নিয়ে গড়া এই ছোট্ট পৃথিবীটাই ওর একান্ত আপনার। তাদের কথাই ও ভাবছে। সার্গি সার্গিয়েভিচ সাপঝকভকেই ধর ঃ সারাক্ষণ ও খালি চুলবুল করে যত সব আজগুবি কল্পনা নিয়ে—মনে হয় ওকে ওর পাশের মানুষদের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার মত শক্ত বাঁধন বুঝি নেই। হঠাৎ দেখা গেল, ওকে যেন সবারই দরকার। আর ও-ও যেন ওদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ—দিব্যি নিশ্চিন্তি চাকার পাশে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে, শ্বাস পড়ছে আস্তে আস্তে। কিংবা ধর শারিগিন ঃ উচ্চাশা আছে, তবে বুদ্ধিশুদ্ধিতে এমন কিছু তালেবর নয়; চতুরতাহীন স্বচ্ছ প্রকৃতি, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ঐ যে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর থুতনিটা রেখে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। নয়তো জাদুইভিতের ঃ বালির ওপরে কী আরামেই গা ছেড়ে দিয়েছে; আদিম ধাঁচের সুন্দর মুখটা সূর্যের দিকে ফেরানো; চতুর, সাহসী, হিসাবী লোক—যদি বেঁচে থাকে তো নিজের খামারে ফিরে যাবে। আর এক দৈত্য হল লাতুগিন—এসেছে কারঝেনেৎস বন অঞ্চল থেকে—এখন নাক ডাকাচ্ছে প্রচণ্ড শব্দে, মুখের ওপর টুপিটা চাপা। ওর চরিত্রে চতুরতা অনেক বেশী, কিন্তু শঠতার লেশ নেই—ওর কাছে তার প্রয়োজনও নেই; রিভলবার আর হাতবোমা নিয়ে কোন্ স্বর্গে ও আজ চড়াও করছে তা ও জানেই না......

বারোজন লোক—তারা তাদের জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে ইভান

ইলিয়িচের হাতে। খুব সংকট মুহূর্তেই সমর পরিষদের কাছ থেকে ও ব্যাটারীটার ভার পেয়েছে।......অঙ্ক ও কিছু কিছু জানে সত্যি, তাহলেও ওর খুব জোর দিয়ে বলা উচিত ছিল যে, ব্যাটারী পরিচালনা করা ওর কর্ম নয়......

“গাগিন, সাইট-কোণ মাপতে পারে এমন কেউ আছে এখানে? আমাদের কাছে পাল্লা মাপার যন্ত্র নেই, জান তো?”

সুড়ঙ্গাবাসের দেওয়ালে একটা তাক মতো অংশের ওপর দাঁড়িয়ে রক্ষা-প্রাচীরের ওপরে স্তেপের দিকে চেয়ে ছিল গাগিন। সে মুখ ফেরাল।

“পাল্লা মাপার যন্ত্র!” অপ্রসন্ন মুখে কথাটার পুনরাবৃত্তি ক’রে কটমট্ চোখে গাগিন চাইল তেলেগিনের দিকে। “পাল্লা মাপার যন্ত্র কি করবেন? কম্যান্ড পোস্ট থেকে টেলিফোনেই তো ওরা এঙ্গল্ বলে দেবে!”

“ও, তাহলে ঠিক আছে!”

এঙ্গল্, টাইম ফিউজ, ফায়ারিং ডেটা—ও-সব আমাদের জানা আছে। কিন্তু কথা তো তা নয় কমরেড তেলেগিন।......যুদ্ধটা হবে ভয়ঙ্কর—পাল্লা টাল্লা মেপে কুল পাবেন না; এ যুদ্ধের জন্যে চাই রাগ, প্রচণ্ড রাগ.........একেবারে শেষ গোলা পর্যন্ত নিঃশেষে দেগে যেতে হবে, তাতে যদি নাড়ীভুঁড়ি সব ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কুছ্ পরোয়া নেই। সেই কথাই ভাবুন এখন।......আসুন ওপরে আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি!”

তাকের ওপর ওর পাশে উঠে এল তেলেগিন। কামান দাগার শব্দ আরও জোরে শোনা যায়, যেন কাছিয়ে আসছে। দক্ষিণ আর পূব দিকে আকাশটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে—মেঘের মতো ধোঁয়া। গাগিনের আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে ও দেখতে পেল—এক দল লোক আর এক সার গাড়ী উত্তর দিক থেকে গুটি গুটি চলেছে সমতলভূমির ওপর দিয়ে।

“আমাদের লোকেরা পালাচ্ছে,” বলল গাগিন। দক্ষিণে সারেপ্তার ওধারে ব্যাঙের ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে—সেদিকে ঘাড়টা হেলান। “অনেকক্ষণ ধ’রে ওদের দেখছি আমি—ও জায়গাটার ওপর দিয়ে হাজার হাজার লোক ছুটে পালিয়েছে। সত্যি হাজার হাজার।......বিস্ফোরণগুলো দেখছেন? এর আগে একটাও হয়নি। ওরা ভারী কামান দাগছে। জেনারেল সকাল বেলাই এখানে এসে পেঁছাবে, দেখে নেবেন।”

ইভান ইলিয়িচ তার ব্যাটারির সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আর একবার পরিদর্শন করল। ফের গুণে দেখল গোলা আর কার্তুজ কত আছে ঃ কার্তুজ আছে রাইফেল পিছু মাত্র দু ক্লিপ। ব্যাটারির জায়গাটা বড় খোলা—এই জন্যে ওর বিশেষ দুর্ভাবনা। কয়েক শো ফুট দূরে কতকগুলো পরিখা দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি কাটা হয়েছে, কিন্তু পরিখার মধ্যে লোকজন কোথায়? লাল ফৌজের ইউনিটগুলো পরিখা থেকে আরও অনেক দূরে। সাপঝকভের গায়ের কাছে বসে পড়ল তেলেগিন। সার্গি সার্গিয়েভিচের মুখটা কুঁচকে রয়েছে—মনে হয় ঘুম দেওয়াটাও যেন ওর পক্ষে সহজ কাজ নয়।

"জাগালাম বলে কিছু মনে ক'রো না সার্গি সার্গিয়েভিচ—কিন্তু ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডারের সঙ্গে আমাকে কনেকশন দিতে হবে যে!"

ঝাপসা চোখ মেলে চাইল সাপঝকভ।

"কি দরকার? আদেশ দিয়ে দিয়েছে—গোলা দাগতে হবে না। সময় হ'লে ওরাই আমাদের জানাবে।......এত ভাবছ কি?" চাকাটার কাছে ও সরে গিয়ে হাই তুল্ল—অবশ্য বোঝা যায় যে ওটা শুধু ছল। "আরে শুয়ে পড়ে ঘুম দাও না কেন? অমন আর কিছু নেই।"

তাকের ওখানটায় ফিরে গিয়ে ইভান ইলিয়িচ অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—হাতটা পাঁচিলের ওপর। দিগন্তের ওপারে কোথায় যেন অসংখ্য কসাক সওয়ারের ঘোড়ার খুরে খুরে কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে—তারি মধ্যে ডুবে যাচ্ছে জর্দা রংয়ের প্রকাণ্ড সূর্যটা। মাটির ওপর রাত্রির ছায়া নেমেছে, সৈন্য চলাচল আর দেখা যায় না। সন্ধ্যাতারাটা স্বচ্ছ, তার নীচে সূর্যাস্তের আকাশের গায়ে কত ছবি জেগে ওঠে। প্রথমে দেখা যায় যেন সবুজ মহাসমুদ্রের তীরে কোন্ এক অদ্ভুত দেশ; তারপর ভেসে ওঠে চীনের প্যাগোডা; ওর একটা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে প্রথমে দেখায় যেন ঘোড়া, দুমাথাওয়ালা, তারপর যেন একটি মেয়ে, হাত কচলাচ্ছে।......

মনে হয়, গর্ত থেকে বেরিয়ে পা তুল্লেই ও বুঝি সেই পরম সুন্দর দেশে স্বপ্নের মতো উড়ে চলে যাবে। এমন সময়ে এ ছবি এসে উদয় হল—এর নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে; জীবন মরণ যুদ্ধের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে এ ছবি নিশ্চয়ই তেলেগিনের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ!

"আরে ও সব ছাড়!" ইভান ইলিয়িচের কাঁধে হাত রেখে বল্ল সার্গি সার্গিয়েভিচ। "ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের ছবি দেখাটা হচ্ছে ভাববাদ, স্রেফ ভাববাদ।......একটা সিগ্রেট বানানো যাক, কি বল? হাসপাতালে থাকার সময় এক পুরিয়া তামাক হাতিয়েছিলাম—ঠিক মরার আগে টানব বলে রেখে দিয়েছি......"

চিরকালের মতোই আজও ওর কণ্ঠে ব্যঙের সুর—কিন্তু মুখের বলিরেখায় আর ঘোলাটে চোখ দুটিতে বিষণ্ণতাও লুকিয়ে ছিল। সিগ্রেট বানিয়ে দুজনেই ধরাল। তেলেগিন ধোঁয়া ছাড়ে কিন্তু ভেতরে টানে না, আর সাপঝকভ একেবারে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে হাঁসফাস করে ওঠে।

"মরার কথাটা বার বার বলছ কেন?" নীচু স্বরে তেলেগিন শুধাল।

"মৃত্যুকে আমি ভয় পেতে শুরু করেছি......মস্তিষ্কে বুলেট লাগবে সেই ভয়। অন্য কোথাও হলে তেমন কিছু নয়, কিন্তু মাথাটার জন্যে সত্যিই ভয় করে। মাথাটা তো শুধু বন্দুকের নিশানা নয়, তার চেয়ে ভাল কাজের জন্যেই ওটা তৈরী হয়েছিল। যা কিছু চিন্তা করেছি সব হারিয়ে যাবে, এ সহ্য করতে পারিনে।......"

“মৃত্যুকে সবাই ভয় করে সার্গি সার্গিয়েভিচ, কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই......”

“আমি কি ভাবি সে কথা তো তুমি কখনো নিজেকে শুধাতে যাওনি। সাপঝকভটা এনার্কিস্ট, গেলাসে গেলাসে ভদকা ওড়ায়—ব্যস আমার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান ঐ পর্যন্তই। ...কিন্তু তুমি তো আমার কাছে কাঁচের মানুষ, একেবারে এপিঠ থেকে ওপিঠ পর্যন্ত বুঝতে পারি। যারা বেঁচে থাকার তাদের কাছে তোমার বাণী আমি পৌঁছে দিতে পারব, কিন্তু আমার বেলায় তুমি তা পারবে না। সেই তো দুঃখ।......ওঃ ইভান, তোমাকে আমার হিংসে হয়!”

“আমার মধ্যে আবার হিংসে করার কি পেলে?”

“কী স্বচ্ছ তুমি ঃ কর্তব্য, একনিষ্ঠ প্রেম, আর আত্মসমালোচনা; বিশ্বস্ত সেবক, সহৃদয়তম সঙ্গী। তোমার স্ত্রীকে একটু থিতিয়ে নিতে দাও—দেখবে সে তোমাকে একেবারে ভজনা করবে। জীবনটা যে তোমার কাছে এত সরল মনে হয় তার আর একটা কারণ হল, তুমি বেশ সেকেলে ধরণের মানুষ।”

“প্রশংসাপত্রের জন্যে ধন্যবাদ!”

“আমার কথা বলব ইভান? গতবার গ্রীষ্মকালে গিমজা যদি আমাকে গুলী করে মারত তাহলে বাঁচতাম।......কী প্রতীক্ষাই আমরা করেছি বিপ্লবের জন্যে, অধীর আগ্রহে সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠেছে।......পৃথিবীর মুখের ওপর আমরা ছুঁড়ে মেরেছি আইডিয়া, এক গাদা ধ্যান-ধারণা; বলেছি—ঐ আসছে, দর্শনের স্বর্ণযুগ আসছে, স্বাধীনতার সর্বোচ্চ শিখরে আমরা পৌঁছলাম বলে! আর বাস্তবে? বাস্তবে শুধু সর্বনাশ, ভয়ঙ্কর সর্বনাশ।......”

অশ্লীল শব্দের তোড়ে ওর বাকী কথা চাপা পড়ে গেল।

এমন জোরে ও কপালে করাঘাত হানল যে টুপিটা মাথার পেছনে গড়িয়ে পড়ল।......

“এই বিষয়ে আমি একটা জবানবন্দী দিতে চাই, সমগ্র মানুষ জাতির কাছে—হ্যাঁ, ওর চেয়ে কম শ্রোতা হলে চলবে না......পৈশাচিক জবানবন্দী—ভাল কোরো না, চুলোয় যাক ভাল! কোরো, অনিষ্ট কোরো।......কিন্তু এ জবানবন্দীর পাণ্ডুলিপি নেই, লেখা হয়নি এখনো।......আফশোষ......”

তখন অন্ধকার। দিগন্তে আগুনের শিখা—ধোঁয়াটে রক্তিম আভা ওপরে উঠে পাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে দক্ষিণে সারেপতার দিকে। কত গোলাবাড়ী জ্বলছে, তার আলোয় দ্রুত অগ্রগামী শত্রুর পথ আলোকিত হয়ে উঠছে। কথার দিকে তেলেগিনের আর তেমন খেয়াল নেই; কারণ দূরে পশ্চিম আকাশে হাউই উঠছে, জ্বলজ্বলে মাথাওলা সাপের মতো। হাউইগুলো সবুজ রংয়ের, এক এক বারে তিনটে করে আকাশে ওঠে।

কাঁপা কাঁপা সুরে সার্গি সার্গিয়েভিচ কথা বলেই চলে, আতসবাজির

খেলাটা কিছুতেই দেখবে না বলে যেন মনস্থির করেছে। তেলেগিনের গা কিন্তু শিউরে ওঠে, চেষ্টা করেও সামলাতে পারে না।

"না তো আমরা কি শুধু খাওয়ার জন্যেই বেঁচে আছি? তা যদি হয় তবে বুলেটটা যেন আমার মাথার খুলি চুরমার করে দিয়ে যায়; আর আমার মস্তিষ্ক, যেটাকে বিশ্বজগতের মতো প্রকাণ্ড ভেবে ভুল করেছিলাম, সেটা যেন শূন্যে মিলিয়ে যায় সাবানের ফেনার মতো।......এক চাকা কার্বন, এক চাকা নাইট্রোজেন আর অমনি আরো কিছু জঞ্জাল, এই নিয়ে জীবন, বুঝেছ।...... শাদাসিধে অণু থেকে তৈরী হয় যত সব জটিল অণু, তার থেকে আরও জটিল, তার থেকে আবার আরও ভয়ঙ্কর জটিল।......তারপর—সব ফেটে চৌচির। নাইট্রোজেন, কার্বন আর অন্য জঞ্জালগুলো ফের তাদের আদিম অবস্থায় ফিরে যেতে শুরু করে। ব্যাপারটা স্রেফ এইটুকু, বুঝলে ইভান।......বিপ্লবের সঙ্গে এ সবের সম্বন্ধ কোথায়?"

"কী যে বাজে বকো, সার্গি সার্গিয়েভিচ! বিপ্লবই তো মানুষকে তুচ্ছতা থেকে উঁচুতে তুলে ধরে।......"

"আমাকে ঘাঁটিওনা! তোমাকে তো বলছিনে—বিপ্লবের তুমি বোঝ কচু! সব ফর্সা, মাটিতে গুঁড়িয়ে গেছে সব—নাকের সামনে যা তাও দেখতে পাও না? ইভান দি টেরিব্‌ল্‌-এর আগে যে রুশিয়া, সোবিয়েত রুশিয়া তো তার চেয়ে বড় নয়।......মানুষের হাড়ে শাদা হয়ে যাবে কত পথ, গেল বলে।......আর তারপর কার্বন আর নাইট্রোজেন চাকাদেরই তো দিন মানে—কাল সকালে যারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে তাদের......"

দুহাত পেছনে জুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তেলেগিন, মুখে শব্দ নেই। আগুনের দীপ্তিতে ওর মুখে লালচে আভা, কিন্তু ভঙ্গী বোঝা শক্ত।

"ইভান।......যদি বাঁচতেই হয় তবে শুধু অপরূপ ভবিষ্যতের আশায় বাঁচো, প্রাণ ধরো বিরাট, চিরস্থায়ী স্বাধীনতার জন্যে—যেখানে ব্যক্তিমাত্রেই নিজেকে গোটা বিশ্বজগতের সঙ্গে সমান বলে ভাবতে পাবে—তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না, কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না।......ওঃ কত রাত্রি ধরেই না এই কথা বলেছিলাম আমার সাথীদের! মহাত্মা হোমারের মাথার ওপর যে তারা জ্বল জ্বল করছে, সেই তারাই তো ছিল তাদেরও আকাশে।......তাঁবুর ধারে ওরা যে আগুন জ্বালত, স্মৃতিহীন কাল ধ'রে সেই আগুনই কি পথ দেখিয়ে আসেনি? ......ভবিষ্যতের কথা বলতাম আর শুনত সঙ্গীরা—সেই তারা চমকে উঠত ওদের চোখে চোখে, সেই আগুন ঠিকরে পড়ত ওদের সঙ্গীনে সঙ্গীনে। আর আজ? আজ তাদের লাশ ছড়িয়ে রয়েছে স্তেপের ওপর। আমার রেজিমেণ্টকে তো আমি জয়ের পথে নিয়ে যেতে পারিনি। আমি তাদের ঠকিয়েছি, হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি!"

ডান দিকে গজ পঞ্চাশেক দূরে শান্ত্রীর চ্যালেঞ্জ বেজে ওঠে, তারপর নীচু স্বরে কথাবার্তা শোনা যায়। মাথাটা ঘুরিয়ে শব্দের দিকে চাইল তেলেগিন।

ওদিকে গাগিন আছে শান্ত্রীর ডিউটিতে, তার সঙ্গেই সৈন্যদের কেউ কথা বলছে নিশ্চয়।

"আচ্ছা ইভান, এই ভবিষ্যৎটা যদি শুধু রূপকথা হয়? দূরাতিদূর স্তেপভূমিতে বলবার জন্যেই যদি এ গল্প বানানো হয়ে থাকে? ওরকম ভবিষ্যৎ যদি না-ই থাকে? তা যদি হয়, তাহলে বিভীষিকা ঘুরে বেড়াবে সারা পৃথিবীর ওপর।" একেবারে তেলেগিনের কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বলে চলল সাপঝকভঃ "বিভীষিকা এসে গেছে, কিন্তু এখনও কেউ তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে না। বিভীষিকা এখন সবে দুশমনের শক্তি পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। যা আসছে তার তুলনায় গত চার বছরের হত্যাকাণ্ড কিছুই নয়। এখানে, সারা দুনিয়ার বিপ্লবকে ধ্বংস করাই এ বিভীষিকার প্রধান লক্ষ্য। তারপর ব্যক্তিত্বের গলায় সর্বজনীন সামরিক বন্ধন—মাথা মোড়ানো, হাতে দড়ি। আর পৃথিবীর ধূসর ভগ্নস্তূপের ওপর বিভীষিকার রাজত্ব—স্ফীত, জয়োদ্ধত। তার চেয়ে কসাকের তলোয়ারের খোঁচায় এখনি মরে যাওয়াও ভাল......"

"আরে, সার্গি সাগিয়েভিচ, তোমার এখন সত্যিকারের প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্রাম, আর উপযুক্ত চিকিৎসা," তেলেগিন বলল।

"এ ছাড়া আর কিছুই বলবে না তুমি, তা জানতাম।"

গাগিন গর্তের মধ্যে নামছে, সঙ্গে একজন সামরিক অফিসার—ঢ্যাঙ্গা, একটু কুঁজোও। এই যন্ত্রণাদায়ক তর্ক থেকে অব্যাহতি পেয়ে তেলেগিন যেন একেবারে বেঁচে গেল। আগন্তুকের সারা গায়ে কাদার ছিটে, গ্রেটকোটের ধারটা একদম ছিঁড়ে গেছে। মাথায় কসাক সৈন্যদের টুপি—দেখে একটু আশ্চর্য লাগে। গলাটা ধরা ধরা, মনে হয় যেন হপ্তাখানেক ধরে পেঁকো জলার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসেছিল।

"শুভেচ্ছা, কমরেড কম্যাণ্ডার! আপনাদের কী অবস্থা—গোলাটোলা যথেষ্ট আছে তো?"

"শুভেচ্ছা!" জবাব দিল তেলেগিন। "আপনি কে জানতে পারি?"

"কাচালিন রেজিমেণ্ট থেকে একটা কম্প্যানি নিয়ে এসেছি আমি—আপনাদের সামনের জায়গাটায় আমাকে স্থান নিতে হবে। আমিই কম্যাণ্ডার।"

"খুব ভাল কথা! আমার একটু কেমন কেমন লাগছিল—অতগুলো পরিখা রয়েছে অথচ তাতে থাকবার লোক দেখিনে।......"

"আমরাই ওখানে বসতে এলাম। কিছু আহত লোক আছে আমাদের সঙ্গে, তাদের ট্রেণে তুলে দেব। কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে রুটি চাইতে গিয়েছিলাম—কিন্তু তিনি বললেন, কাল পর্যন্ত কিছু পাওয়া যাবে না। সে তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কম্প্যানি যে তিনদিন ধরে কিছুই খায়নি। আপনার কাছেও বোধ হয় কিছু নেই, না কি আছে কিছু? যদি ওদের এক স্লাইস করেও রুটি দেওয়া যেত, মানে খাবারের গন্ধটাও পেত যদি। যা দেবেন কাল ফিরিয়ে দেব...... কিংবা চান তো আপনাদের একটা গরু দিয়ে দিতে পারি।"

"ইভান ইলিয়িচ!"

ডাক শুনে তেলেগিন সেদিকে ফিরল। ঠিক ছায়ার মতো নিঃশব্দে কাছে এসে আনিসিয়া সব কথা শুনেছে। "আমি যা জমিয়ে রেখেছি, তিন দিনের পক্ষে তা যথেষ্ট," সে বলল। "ও'দের আমরা কিছু দিয়ে দিতে পারি। কাল আর কিছু জোগাড় করব'খন......"

চট করে একটু হাসল তেলেগিন।

"বেশ, কমরেড কমান্ডারকে কিছু রুটি দিয়ে দাও।......"

এত সহজে রুটি পাবে কম্প্যানি কমান্ডার, তা ভাবতেও পারেনি।

"সত্যিই?" বলে সে চেঁচিয়ে উঠল। "অনেক, অনেক ধন্যবাদ।" আনিসিয়ার আনা রুটিগুলো তখনি বগলদাবা করে ফেলল, কিন্তু গেল না, তখনি চলে যাওয়া উচিত হয় না। ঘুমে আড়ষ্ট নাবিকরা উঠে বসে ওর দিকে চেয়ে দেখল—জীর্ণ বসন, ধুলোমাখা লোক একটা। ও তখন ওর রেজিমেণ্টের কীর্তি-কাহিনী শুনিয়ে চলেছেঃ দশ দিন ধরে রেজিমেণ্টটা শত্রুর বেষ্টনী ভাঙতে ভাঙতে এসেছে, তবু একটি কামানও খোয়া যেতে দেয়নি, আহতদের গাড়ীও ছাড়েনি একটিও। কিন্তু ওর কথাবার্তা এত ভাঙা ভাঙা, এত অসংবদ্ধ যে, নাবিকদের কয়েকজন বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

"আগে ঘুমিয়ে নিন গে, তারপর বলতে আসবেন," ওর দিকে নিরুৎসাহ দৃষ্টি হেনে লাতুগিন বলল। "আচ্ছা, ঐ যে দূরে খুব জোর আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি জন্যে বলতে পারেন?" বলে সারেপ্‌তার দিকে হাতটা ছুড়ে দিল।

"হ্যাঁ পারি," জবাব দিল ইভান গোরা। "স্টেশনে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে ঐ ধার থেকেই এসেছে, তখুনি। জেনারেল দেনিসভ সারেপতার ওপর চড়াও করছে। লোকে বলছে, এমন ভীষণ গোলাবর্ষণ নাকি কখনো দেখেনি, জার্মান যুদ্ধের সময়ও দেখেনি। সব যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছে কামান দেগে। আর নালার ভেতর থেকে বন্যার মত বেরিয়ে আসছে কসাকের দল—ওঃ সে কী দৃশ্য! ওদের মুখ দিয়ে একেবারে ফেনা ছুটছে।...... সব একদম কচুকাটা—ওরা বন্দীটন্দী নেয় না।......সরোজভের ডিভিশনে অর্ধেকই সাবাড় হয়ে গেছে।......ওদিকে শত্রুরা ধেয়েছে ভল্‌গা পানে—সারেপতা আর চাপুর্নিকের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে ভল্‌গা ধরবে এই ওদের ইচ্ছা। তা যদি পারে, তাহলেই আমাদের কম্ম কাবার!"

মাথা নেড়ে নাবিকদের বিদায় জানিয়ে গর্ত থেকে ও বেরিয়ে গেল।

"আপনাদের রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার কে?" পেছন থেকে ডাক দিল তেলেগিন।

"পিওত্‌র নিকোলোয়েভিচ মেল্‌শিন!" অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চীৎকার স্বরে জবাব দিল ইভান গোরা।

॥ ছয় ॥

দেনিসভের পঞ্চম কলমের চাপে পড়ে মরোজভের ডিভিশন পশ্চাদ্বর্তন করছে—সারা রাত, তারপর সারা দিন।

হ্রদ অঞ্চলের চাপুর্নিকি গ্রাম আর সারেপ্‌তা তাদের লক্ষ্য। প্রান্তরে শত শত মৃতদেহ। জেনারেল দেনিসভ প্রতিপক্ষকে এক মুহূর্তও শান্তি দেয় না। রেডরা একটা আক্রমণ হটিয়ে দিতে না দিতে শুরু হয় আর একটা। ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে গোঁ গোঁ করে ছুটে এসে গোলা ফাটে, বিস্ফোরণে জমি কেঁপে ওঠে, উৎক্ষিপ্ত মাটির নীচে মানুষ চাপা পড়ে যায়। কসাকদের কামানগুলো যখন মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়, তখনি লালফৌজের লোকেরা ট্রেঞ্চের বাইরে মুখ বার করে; রক্তাক্ত মুখ—রাগে আর যন্ত্রণায় বিকৃত।

নালার ভেতর থেকে, পাহাড়ের মাথা থেকে হঠাৎ ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসে দলে দলে, ছুটতে ছুটতে ছড়িয়ে পড়ে লাইনের আকারে, ঘোড়ার পায়ে পায়ে ধুলো উড়ে যায় ঘূর্ণির মতো।...... তাতারদের মতো উন্মাদ চীৎকার তুলে ওরা মাথার ওপর তরোয়াল ঘোরায়।

বাদামী রংয়ের ঘোড়ার পিঠে কালো পোষাক-পরা ঘোড়সওয়ারের দল ছুটে আসে বন্যার মতো, উষ্ণ রক্তে তরবারি সিক্ত করার উন্মাদ আগ্রহে তারা একেবারে ঘোড়ার কেশরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এই বন্যার সামনে লালফৌজের একটি মানুষও যদি ভয় পেত, কিংবা আতঙ্কে ছুটে পালাত তাহলে তাদের গোটা লাইনই ধ্বসে যেত, খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেত মানুষগুলো, পিষে যেত ঘোড়ার পায়ের তলায়।......

সারেপতার ফলের বাগান আর চাপুর্নিকি গ্রামের গোলাবাড়ী—একেবারে এতদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে এসেছে মরোজভ ডিভিশনের দু পাশের বাহিনী দুটিকে—তবু তারা অসমসাহসে দাঁড়িয়ে লড়ছে। কিন্তু অসহ্য চাপে হাতের পেশী যেমন নুয়ে পড়ে তেমনি ধারা অনিবার্যভাবেই বাহিনীর মাঝের অংশটা দেবে গেছে ভ্‌ল্‌গামুখো। আর ঠিক এখানেই, মাঝের অংশের এই সামনের সারিতেই দেখতে পাওয়া যায় ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারকে। তাঁর সঙ্গে তাঁর কমিসার, তাঁর এইড, আর তাঁর আর্দালির দল। নিজের নিজের ঘোড়া শুইয়ে রেখে ওঁর পিছনে তারা মাটিতে বসে আছে। অনবরত দু পাশ থেকে নতুন সৈন্য এনে নিহতদের স্থান পূরণ করছেন কম্যাণ্ডার সাহেব, কিন্তু তার সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসছে। জারিতসিনে রিজার্ভ সৈন্য নেই সেকথা তাঁর জানাই ছিল, তাই আর্মি কম্যাণ্ডারের কাছে আর নতুন সৈন্য চাইতে যাননি।

রক্ষাব্যূহের প্রধান লাইনে সেদিন সকালে এক দুর্ঘটনা ঘটেছেঃ আশেপাশের গ্রাম আর খামার থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে যে দুটো কৃষক রেজিমেণ্ট তৈরী করা হয়েছিল তার লোকজন সব হঠাৎ পরিখা থেকে বেরিয়ে পড়ে, মাথার ওপর রাইফেল তুলে ধরে রওনা দেয়—হোয়াইটদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। প্রথম কৃষক রেজিমেণ্টের কিছু কম্যাণ্ডার খাবার জায়গার কাছটায় দাঁড়িয়েছিল, আচমকা তারা গিয়ে রেজিমেণ্টের কমিসারকে আর ক'জন কমিউনিস্টকে ঘিরে ফেলে—তারপর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গুলী করে। ঐ সময়ই দ্বিতীয় কৃষক রেজিমেণ্টেও কম্যাণ্ডার, কমিসার আর কিছু কমিউনিস্টকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা। বিশ্বস্ত থাকে শুধু দুটি কম্প্যানী, বিশ্বাসঘাতকদের লক্ষ্য ক'রে তারা বন্দুক চালায়। সাদা ঝাণ্ডা নিয়ে বিশ্বাসঘাতকেরা শত্রুর কাছে ছুটে পালাচ্ছিল—দূর থেকে তাই দেখে মামন্তভের সৈন্যেরা ভাবল ওরা বুঝি আক্রমণ করতে আসছে, তাই এন্তার গুলী চালাতে শুরু করে দেয়। কৃষক রেজিমেণ্ট দুটোর বাদবাকী সৈন্যসামন্ত তখন একেবারে বিহ্বল অবস্থায় রাইফেল টাইফেল ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। তক্ষুণি তাদের ঘেরাও করে পেছনে চালান করা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগ এখন অনাবৃত, প্রায় চার মাইল পর্যন্ত কোনো আবরণ নেই।

বিপদের সঙ্কেত বেজে উঠল জারিত্সিনে—সঙ্কেত বাজল ইঞ্জিনীয়ারিং আর গোলাবারুদের কারখানায়, সঙ্কেত বাজল বিভিন্ন করাত কলে। সমর পরিষদ পাঠাল কমিউনিস্টদের। সারা কারখানা ঘুরে ঘুরে তারা আহ্বান জানালঃ

"কমরেড্‌স্‌, কাজ ছেড়ে অস্ত্র ধর—যাও যুদ্ধসীমান্ত রক্ষা কর!"

কারখানায়—শ্রমিকদের মধ্যে তখন আছে শুধু বুড়োহাবড়া, কাণাখোঁড়া, আর বাচ্চার দল। যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে মেসিন টেসিন তারা থামিয়ে দিল, ফার্নেস দিল নিভিয়ে, তারপর ছুটল স্টোররুমের দিকে—সেখানে যার যার প্রত্যেকের রাইফেল জমা আছে। কারখানার ফটকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে মার্চ করে চল্ল তারা।

শহরের সীমানায় ছোট ছোট ঘরবাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে ওদের বৌ-ঝি আর মায়ের দল, স্বামী-পুত্রের হাতে গুঁজে দেয় ছোট ছোট খাবারের পুঁটুলী। এলোমেলো দলগুলির পেছনে পেছনে অনেকে চলে সেই স্টেশন পর্যন্ত; কেউ কেউ আবার আরও দূর—একেবারে যুদ্ধের লাইন পর্যন্ত—সেখানে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ ধ'রে। শেষকালে কম্যাণ্ডার এসে নিজের বুকে হাত রেখে অনুরোধ জানাল—তোমরা ঘরে যাও; এখানে তোমাদের থাকার দরকার নেই, তা ছাড়া থাকলে অসুবিধাও বটে—ঢিবির ওপরে তোমাদের দেখে মামন্তভের গোলন্দাজেরা খুব ভাল নিশানা পেয়ে যাচ্ছে। তখন তারা গেল।

ফাঁকের মধ্যে দিয়ে হোয়াইটরা ঢুকে পড়তে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা

হবার আগেই জারিতসিনের তিন হাজার শ্রমিক সে ফাঁক ভরিয়ে দিল, নিজেদের বিপুল ক্ষতি সহ্য ক'রে হটিয়ে দিল শত্রুকে।

শত্রুর অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর দুর্দান্ত যুগ্ম-আক্রমণের সঙ্গে যুঝছে মরোজভ ডিভিশন—এমন সময় এই ঘটনা ঘটে। ডিভিশনের মাঝের ইউনিটগুলো তখন প্রায় ভল্‌গার পাড় পর্যন্ত হটে এসেছে। সারেপতার রাস্তায় রাস্তায় গোলা পড়তে শুরু করেছে। চাপুর্নিকি গ্রাম জ্বলছে—আগুনের শিখায় খড়ের চাল পুড়ছে, এমন কি হ্রদের ধারে নল খাগড়া বনেও সে আগুন ছড়িয়ে গেছে।

দূরবীণ লাগিয়ে ডিভিশন কম্যাণ্ডার প্রান্তর পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। দিগন্তের ওপারে সূর্য তখন ডোবে ডোবে।

ওঁর একেবারে চোখের সামনেই কসাক স্কোয়াড্রনগুলো আসে যায়, গতিবিধি গোপন করারও বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। ওদের ঘোড়াগুলোর অশান্ত ভাব দেখে কম্যাণ্ডারের অভিজ্ঞ চোখ বলে দিল যে, এগুলো একেবারে তাজা ইউনিট, চূড়ান্ত আক্রমণের আয়োজন করছে। মনে মনে বল্লেন কম্যাণ্ডারঃ সূর্য-বিদায়ের আগেই ইতিহাসের পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে সমস্ত মরোজভ ডিভিশনের ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু হয়ে যাবে—আর সে যাত্রার নায়কত্ব করবে মরোজভ ডিভিশনের কম্যাণ্ডার।

দূরবীণ ছেড়ে দিয়ে পকেটের ভেতর থেকে তিনি একটা ছোট পাইপ বার করে নিলেন। একটুখানি সারাতভ তামাক ধীরে ধীরে পাইপে ভরে নিয়ে দেশলাইয়ের খোঁজে গ্রেটকোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু দেশলাই নেই একটা পকেটেও। ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে দেখলেনঃ সামনে শুয়ে আছে তাঁর সৈন্য সামন্ত, প্রত্যেকের সুমুখেই ছোট ছোট মাটির ঢিবি; একজনের শার্টে কালো রং, রংটা ক্রমেই ছড়াচ্ছে, বোকার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আর একজন তার রাইফেলের কুঁদোয় গাল ঘসছে।

ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পাইপটা মাটিতে পড়ল, নাগদোলার ঝোপ পর্যন্ত গড়িয়ে গেল—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। দূরবীণটা তুলে নিয়ে তিনি আবার চোখে লাগালেন। লাগাতেই হাত দুটো হঠাৎ কেঁপে উঠল। দূরবীণে দেখা যাচ্ছে—দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আরো নতুন ঘোড়সওয়ার সৈন্য এসে জমেছে, বিপুল সংখ্যায়।......উনি যখন পাইপ ভরছিলেন তখনই ওরা এসেছে নিশ্চয়।......নীচু নীচু পাহাড়ের পেছন থেকে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসছে—তাদের ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে ওড়ানো ধুলো-বালি তেরছা সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। “এমনধারা একটা ফৌজ তো আমাদের একেবারে ছাতু করে দিতে পারে,” মনে মনে ভাবলেন কম্যাণ্ডার; দূরবীণ থেকে যেন জোর করেই চোখ নামিয়ে নিলেন মুহূর্তের জন্যে। ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে তখন চাপা উত্তেজনার গভীর নিস্তব্ধতা, শক্ত হাতে রাইফেল চেপে ধরে লোকজন

সব একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবেগের সঙ্গে কী যেন বলবেন বলে ডিভিশনাল কম্যান্ডার মুখ খুলতে গেছেন, এমন সময় কানে এল দূরাগত কামানের শব্দ।

আবার দূরবীণটা চোখে চেপে ধরলেন। আরে একি কাণ্ড? মাঠের ওপর কসাক স্কোয়াড্রনগুলো দল ভেঙ্গে লাইনের আকারে তীর বেগে ঘোড়া ছোটাল—তাদের আতামানের চকমকে ঝাণ্ডা তাদের মাঝখানে। তারপর বোঁ করে ঘুরে তারা এগিয়ে গেল সামনে—পাহাড়ের পেছন থেকে ঐযে নতুন অশ্বারোহী বাহিনী দুর্দান্ত গতিতে নেমে আসছে তাদের ওরা প্রতিরোধ করবে। বর্শা উদ্যত করে ঘনসন্নিবিষ্ট কসাকের দল প্রথমে ঘোড়াগুলোকে একটু পিছিয়ে নিল, তারপর হঠাৎ ছোটাল সামনের দিকে। সামনা সামনি হল দুই পক্ষ, সাপটে ধরল পরস্পরকে। সংঘর্ষস্থলে ধুলো উড়ল ঠিক মেঘের মতো।

আরও কাছের জিনিস দেখা যায় এমনভাবে দূরবীণের কাঁচ ঘুরিয়ে নিয়ে ডিভিশনাল কমান্ডার দেখতে পেলেন—কসাক পদাতিক বাহিনী এতক্ষণ মাটিতে সটান শুয়ে ছিল, কিন্তু এবার তারা আতঙ্কে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

“ওহো!” কমান্ডার মনে মনে বল্লেন, “সমর পরিষদের চেয়ারম্যান যে টেলিফোনে বার বার বলেছিলেন, জান থাকা পর্যন্ত মাটি ছেড়ো না—সে বুঝি এই জন্যেই।......এটা নিশ্চয় দ্‌মিত্রি শেলেস্তের লৌহ ডিভিশন।......”

যে অশ্বারোহী বাহিনী কসাকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের পেছনে পেছনে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এল লৌহ ডিভিশনের পদাতিক বাহিনী। আর তাদেরও পেছনে একেবারে চক্রবাল রেখার কাছটাতে ধুলোর ভেতর দিয়ে দেখা গেল উটের পর উট, গাড়ীর পর গাড়ী আর প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো বিস্তর লোকজন। এই বিরাট চমু হল লৌহ ডিভিশনের সাপ্লাই বাহিনীঃ ওদের সঙ্গে এসেছে বস্তা বস্তা গম, পালকে পাল গরু-ভেড়া, পিপে পিপে মদ আর অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষ—একটু পরেই সে কথা বোঝা গেল।

এই যুদ্ধে বহু কসাক প্রাণ হারাল। হোয়াইটদের পরাজিত অশ্বারোহী বাহিনী পালাল পশ্চিম দিকে। ওদের পদাতিক বাহিনীটা কিন্তু আটকা পড়ে গিয়েছিল—এক দিকে লৌহ ডিভিশন আর এক দিকে মরোজভ ডিভিশন এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে পদাতিক বাহিনীর খানিকটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল, বাকী অংশ হল বন্দী। যুদ্ধ চলেছিল এক ঘণ্টা। সব শেষ হলে ডিভিশনাল কমান্ডার ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে চল্লেন মাঠের ওপর দিয়ে। মানুষ আর ঘোড়ার মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। জায়গায় জায়গায় মাটি তখনও ধোঁয়াচ্ছে। যে সব আহত সিপাহীকে তখনো স্ট্রেচারে ক'রে সরানো হয়নি তাদের কাতর শব্দ শোনা যাচ্ছে এখানে ওখানে। ডিভিশনাল কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে একদল ঘোড়সওয়ার আসছিল ঘোড়া ছুটিয়ে। তাদের একজনের পরণে কুবান পোষাক। লোকটির কোটের ওপর সারি সারি কার্তুজের গর্ত, বেল্টের

সামনের দিকে একটা প্রকাণ্ড ছোরা গোঁজা, আর কাঁধের পেছন থেকে ঝুলছে মস্তাকবরণের প্রান্তভাগটুকু। নিজের ঘোড়াটাকে খোঁচাতে খোঁচাতে তিনি সবেগে ছুটে এলেন ডিভিশনাল কমাণ্ডারের দিকে। কাছে পৌঁছবামাত্র ঘোড়ার লাগাম টেনে কর্কশ ভারিক্কি সুরে বল্লেনঃ

"শুভেচ্ছা কমরেড! কার সঙ্গে কথা বলছি আমি?"

"আপনি কথা বলছেন মরোজভ দন ডিভিশনাল কমাণ্ডারের সঙ্গে। শুভদিন কমরেড! আপনি কে বলুন তো?"

"আমি কে?" মুখ টিপে হাসলেন অশ্বারোহী। "ভাল করে দেখে নিন! আমি সেই লোক যাকে ডাকাত বলে ফর্মাণ জারি করেছিলেন ১১শ আর্মির কমাণ্ডার, যাকে নেভিন্নমিস্‌কায়াতে গুলী করে মারার কথা। কিন্তু সেই আমিই হাজির হয়ে গেলাম জারিত্সিনে—দেখছেন তো! আর হাজির না হলে কি হত তা তো বুঝতেই পারছি।"

এই অহঙ্কারী জবাব শুনে ডিভিশনাল কমাণ্ডারের বড় ভাল লাগল না। ভ্রূ কুঁচকে তিনি বল্লেনঃ

"আপনি নিশ্চয় দ্‌মিত্রি শেলেস্ত......"

"হ্যাঁ ঐ নামেই আমাকে ডেকে এসেছে চিরকাল। আচ্ছা, এখন দেখিয়ে দিন তো, সমর পরিষদকে কোথা থেকে ফোন করতে পারি!"

"আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি—সমর পরিষদ সবই জানেন।"

"আপনি কি বলেছেন তাতে আমার কি? আমার গলাটা শুনুক ওরা!" উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন দ্‌মিত্রি শেলেস্ত। কয়লার মতো কালো ঘোড়াটার গায়ে এমন জোরে জুতোর কাঁটা দিয়ে ঠোক্কর মারলেন যে ঘোড়াটা একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

॥ সাত ॥

সেদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পর ইভান ইলিয়িচ একটা চিট পাঠাল কর্ণেল মেল্‌শিনের নামেঃ "পিওত্‌র্‌ নিকোলাইয়েভিচ, আমি এখানে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুব সুখী হব।......" সেই পিওনের হাতেই মেলশিনের জবাব এলঃ "বহুৎ আচ্ছা। হাত খালি হওয়া মাত্র যাচ্ছি আমি। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ......হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার......"

এই পর্যন্ত লিখে মেলশিনের পেন্সিলটা নিশ্চয় ভেঙ্গে গিয়েছিল, কিংবা সে হয়তো অন্ধকারের মধ্যেই লিখে দিয়েছিল, তাই পড়ার চেষ্টায় পর পর কয়েকটা কাঠি খরচ করেও ওর শেষ কথাগুলো ইভান ইলিয়িচ আর পড়তে পারল না।......

কিন্তু এল না মেলশিন। মাঝ রাতের পর হাউইয়ের আলোয় স্তেপভূমি আলোকিত হয়ে উঠল। ব্যাটারীতে আদেশ পৌঁছাল—প্রস্তুত থাক।

"তাহলে কমরেড্‌স—এই হচ্ছে শুরু," তেলেগিন বল্ল তার লোকজনকে। "আচ্ছা এখন—প্রথম কথা মনে রাখবে, একটা গোলাও যেন নষ্ট না হয়......আর তারপর, বুঝেছ ভাইসব, আর্মি কমান্ডারের আদেশটা যেন ভুলো নাঃ বিশেষ নির্দেশ না পেলে পিছু হটা চলবে না এক পাও! এবং তারপর—মানে, যুদ্ধে কি হবে তা তো বলা যায় না, আর যদি......(কী ঘোড়ার ডিম অতগুলো 'তারপর' 'তারপর', ঢোকাচ্ছি? সে শুধাল নিজেকে)। ১৯১৫ সালে ওরা আমাদের পেছনে মেশিনগান বসিয়েছিল—চাষীরা যে 'পিতৃতুল্য' জারের জন্যে প্রাণ দেবে সে কথা জেনারেল মশায়েরা বিশ্বাস করতে পারেন নি।......তবু দেখ, পরিখার মধ্যে থেকে তারা জার নিকোলাইকে শাপান্ত করত সত্যি, কিন্তু তারা বুঝতে তো পারত যে রাশিয়া তাদের স্বদেশ। ...তখনকার রাশিয়ানদের সেই সঙ্গীন চড়ানো আক্রমণের মতো ভয়ঙ্কর জিনিষ কেউ দেখেনি কখনো......"

"কী আমাদের বলতে চাইছেন কমান্ডার?" ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল লাতুগিন। "আসল কথাটা কি? বলুন না?"

ইভান ইলিয়িচ বলেই চলে, যেন ওর কথা শুনতে পায়নিঃ

"আজ আমাদের পেছনে মেশিনগান লাগায়নি।......শুধু নিজের গা বাঁচাবার জন্যে......বিপ্লবের প্রতি যদি আমরা বিশ্বাসহন্তা হই, তবে তা মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্ট—এই কথাই আমরা ভাবব, জনে জনে। চূড়ান্ত মুহূর্তে পায়ের তলে মাটি যখন কেঁপে উঠবে, সে সময় আর্মি কমান্ডারের আদেশটাকে যেন আমরা

এই ভাবেই বুঝে নিতে পারি।......লোকে বলে এমন মানুষও নাকি আছে যারা ভয়ের অর্থই জানে না। কথাটা একদম বাজে, ভয় আছে নিশ্চয়ই; মাথা তুলে দাঁড়ায়ও—নিজ হাতেই তার ঘাড় মটকে দিতে হয় বারে বারে। মৃত্যুর চেয়ে অপমানকেই ভয় করা উচিত অনেক বেশী। সত্যিকারের যুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা হয়নি এমনধারা কমরেডও তো আছে আমাদের মধ্যে—সেই জন্যেই একথা বলছি, বুঝেছ কমরেড লাতুগিন। ......তাছাড়া এমন কমরেডও আছে যাদের মনের জোর কম। পাকা যোদ্ধারই কত সময় মাথার ঠিক থাকে না।......তাই তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আমার, মানে তোমাদের কমান্ডারের বুক যদি কখনও কেঁপে ওঠে, ধর যদি আমি কখনও ব্যাটারি ছেড়ে পালাই—তাহলে আদেশ দিয়ে রাখছি তোমরা তক্ষুনি আমাকে গুলী করে মেরে ফেলো। আর অন্য কাউকে যদি এমনি ধারা পালাতে দেখি, আমি নিজে তাকে গুলী করব।......ব্যস, আর কিছু না।...সকাল হওয়ার আগে কেউ যেন সিগ্রেট-টিগ্রেট না জ্বালায়।......"

একটু কেশে নিয়ে কামান দুটোর পেছনে ও কয়েক মিনিট পায়চারি করল। কত কথাই বলবার ছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে ঠিক বেরুল না তো......

"কমরেড্‌স্‌, আমি তো কথাবার্তা বন্ধ করতে বলিনি......"

"কমরেড তেলেগিন!" আবার সেই লাতুগিনের গলা, হাত দুটো পেছনে করে ওর দিকে এগিয়ে গেল তেলেগিন।

"কমরেড তেলেগিন, আর্মিতে আসার আগে খালি পায়ে খালি গায়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, ঝগড়া করেছি সবার সঙ্গে।......ডকে খালাসির কাজ করেছি, দোকানদারদের ওখানে কাঠ চেলা করেছি, পায়খানাও সাফ করেছি; এক মোহান্ত মশায়ের গাড়ীতে সহিসও হয়েছিলাম, কিন্তু ঝগড়া করে চলে এলাম—একেবারে জোলো সুপ খেতে দিত কিনা। চোরের দলেও ভিড়েছিলাম একবার।......কোথায় না গিয়েছি! বোকাও ছিলাম বটে! আর তেম্‌নি ঝগড়াটে! মাতাল অবস্থায় কতবার যে আমাকে মেরে তুলো ধুনে ছেড়েছে......"

"নিশ্চয় ছুঁড়ীর ব্যাপারে—বাজি রেখে বলতে পারি", মাঝখানে ফোড়ন দিল বাইকভ। দূরে একটা রকেটের আবছা আলোয় ওর মোটা গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে ছোট ছোট দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

"মাঝে মাঝে ছুঁড়ীর ব্যাপারে সত্যি......কিন্তু কথাটা তা নয়। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছেঃ আপনি আসল কথাটাই ছেড়ে গেছেন কমরেড তেলেগিন—শুধু ধানাই পানাই করছেন।......বিপ্লবী কর্তব্য—কথাটা ঠিক সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় এ কর্তব্য আমরা ঘাড়ে নিই কেন? বলুন সে কথা! পারবেন না? যা খেয়ে আমাদের থাকতে হ'ত তা তো আপনি খাননি কখনো। তপ্ত কস্টিকে সেদ্ধ হয়ে এসেছি আমরা, আমাদের আত্মাটার পর্যন্ত ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। যা আমরা সয়েছি তা জানোয়ারেও সইতে পারত না বলে মনে হবে আপনার। আপনি হলে এতদিন কবে জোয়ালে কাঁধ লাগিয়ে

দিতেন, বোঝা বইতেন জোহুকুমের মতো।......চটবেন না, একটু স্পষ্ট কথাই না হয় শুনলেন! অন্যের জন্যে খেটে খেটে আমার মায়ের হাড় কালি হল কেন? গ্রীসের রাণীর তুলনায় সে খারাপ কিসে?”

“এই সেরেছে!” বলে গোঁ গোঁ করে উঠল বাইকভ। “গ্রীসের রাণীকে আমরা দেখেছিলাম এথেন্সে, সেই কবে ১৯১৩ সালে। এখন আবার তাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?”

“আমার বাবাকে থাকতে হ'ত শুয়োরের মত—তারপর একদিন পুলিশ এসে তাঁকে মেরে শুইয়ে দিল, গায়ে থুতু দিল। কেন? কেন আমাকে ওরা কুত্তার বাচ্চা বলে ডাকে?”

“উঁহু, এ ঠিক হচ্ছে না,” বল্লে শারিগিন। এক গাদা গোলার পাশে ও নিজের জায়গায় বসেছিল, এবার হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল।

“এরকম শৃঙ্খলাহীন পদ্ধতিতে বল্লে চলবে না লাতুগিন। কুত্তার বাচ্চা, গ্রীসের রাণী, এসব কি বকছ? ওসব তো ভিতের ওপরকার অংশ মাত্র, আসল কথা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। তুমি কি? সর্বহারা না শ্রেণীচ্যুত? সে সম্বন্ধেই মনস্থির করে ফেল......”

“চুলোয় যাও তুমি! আমি হচ্ছি সৃষ্টির কর্তা!” বলে চেঁচিয়ে উঠল লাতুগিন। “ওর মানে মাথায় ঢোকে? না, এখনো অত বড় হননি? একটা বইয়ে পড়েছিলামঃ ‘সৃষ্টির কর্তা মানুষ!’ সেই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি কামানের পাশে। সৃষ্টিকর্তার বাস আমাদেরই ভেতর। কর্তব্য, কর্তব্য, ভয়, ভয়! আরে, জেনারেল মামন্তভ কোন্ ছার, স্বয়ং ভগবানের ওপরই তো আমি আজ চড়াও করতে চলেছি—তার হাড়মাস একেবারে চিবিয়ে খাব।...এই তোমার ভিতের ওপরতলা, বুঝেছ চাঁদ।”

“একটু চুপ করুন কমরেড্‌স!” ফীল্ড টেলিফোনের ওখান থেকে সার্গি-সার্গিয়েভিচ হাঁকল। “শুনুন! সারেপ্‌তাতে আমাদের জয় হয়েছে, দারুণ জয়। শত্রুর দুটো ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট আর একটা পদাতিক কসাক রেজিমেণ্ট একেবারে ছত্রভঙ্গ; দেড় হাজার শত্রু সৈন্য নিহত, আটশো বন্দী......”

সারেপ্‌তায় সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে গেল আগুনের মতো। একটা ঘটনা বলিঃ—১০ম আর্মির একটা ইউনিট—বুদিওনির ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড হোয়াইট আর্মির ৫ম কলামের চাপে মূল আর্মি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন তারা চেষ্টা করতে থাকে যাতে সাল্‌স্ক স্তেপ থেকে জারিতসিনের দিকে কেটে বেরিয়ে আসা যায়। পথের অসহ্য কষ্টে তাদের মানুষ, ঘোড়া সব একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, এমন সময় একটা রেলের স্টেশনে ওরা হঠাৎ মরোজভের সদর দপ্তরের সঙ্গে টেলিফোনে কনেকশন পেয়ে গেল। ওদিক থেকে ভেসে এল জোর গলার শব্দ, আনন্দে উৎফুল্ল অথচ তার মধ্যে মধ্যে বেশ ঝাঁঝালো ধরণের মন্তব্যঃ “তোমরা ঘুমচ্ছ নাকি? আরে, বিচ্ছু বেটাদের দু দুটো ঘোড়সওয়ার ডিভিশন একেবারে কুমড়ো বলি হয়ে গেছে সারেপ্‌তায়,

তাও শোনিনি? চলে এসো না, বন্দী টন্দী গুণতে একটু সাহায্য করবে?" খবরটা খুব বাড়ানো বটে—কিন্তু এই দারুণ খবর শুনবামাত্র গোটা ব্রিগেডটাই মার্চ শুরু করল,, আহতদের গাড়ী আর মালপত্র সব পাহারায় ছেড়ে রেখে সোজা পাড়ি দিল একশো মাইল উত্তরে—জেনারেল দেনিসভের 'বিচ্ছুগুলোর' সঙ্গে মোকাবিলা করবে।

যাই হোক, সারেপ্‌তাতে ওটা তো শুধু স্থানীয় সাফল্য। জারিতসিনের আশেপাশে যেখানে প্রধান ঘাঁটি, সেখানকার অবস্থা ওতে আরও কঠিনই হয়ে উঠল। কৃষক রেজিমেণ্ট দুটিতে সেদিন যে ঘটনা ঘটেছিল, তার সুযোগ নিয়ে মামন্তভ তাড়াতাড়ি নতুন কৌশল খাটালেন। ঝটিকাবাহিনীগুলিকে রাতারাতি নতুন ক'রে গড়ে তুলে ভোরবেলা তাঁর আক্রমণের সবটা ভারই চাপিয়ে দিলেন রণক্ষেত্রের এই চার মাইল অংশের ওপর। এটাই সবচেয়ে দুর্বল অংশ—শ্রমিকদের ভলাণ্টিয়ার ডিট্যাচমেণ্টের সাহায্যে কোনোরকমে ঠেকো দেওয়া আছে।

যে প্রান্তরের ওপর দিয়ে দন আর্মির শ্রেষ্ঠ অংশ অগ্রসর হয়ে আসছে—পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গভীর নালা সে প্রান্তরটাকে ভাগ করে দিয়েছে। তারপর যুদ্ধসীমানা কেটে বেরিয়ে নালা দুটো পৌঁছে গেছে একেবারে শহর পর্যন্ত। এই নালা ধ'রে ধ'রে কসাক ঘোড়সওয়ার দল চলেছে সোজা লাল ফৌজের পরিখার দিকে। মনে হয়, সারা প্রান্তর ছেয়ে যেন অসংখ্য উই-ঢিবি এগোচ্ছে মন্থরগতিতে। ওগুলো সব পদাতিক বাহিনী, গুটি গুটি অগ্রসর হয়ে আসছে। তাদের সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্যাংক অন্ধের মতো গুঁড়ি মেরে মেরে চলে—একবার আগে, একবার পিছে। মালবাহী যেসব গাড়ী স্তেপ ধরে ধরে জারিতসিনমুখো রওনা হয়েছে, কিংবা জারিতসিন থেকে বেরিয়েছে, সেগুলোর মাথার ওপর হাওয়াই জাহাজ। গোলন্দাজ ব্যাটারির ওপরও হাওয়াই জাহাজ। জাহাজগুলো মাথার ওপর পাক দিতে দিতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট বোমা ফেলে—দেখতে ঠিক নাসপাতির মতো। প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়ে বোমাগুলা।

মামন্তভের নিজের সাঁজোয়া ট্রেন থেকে আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। ওর ডাইনে বাঁয়ে সারা প্রান্তর জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মালগাড়ী, গ্রাম থেকে এসেছে গাড়ীগুলো। ধুরোয় ধুরোয় লাগালাগি করে ওগুলো সৈন্যদলের পিছু ঘেঁষে এগোয়। শহর তখন কসাক বানিয়াদের নজরে এসে গেছে—শহরের গম্বুজ আর ফ্যাক্টরি চিমনি, শহরতলীর আগুনের ধোঁয়া—সবই দেখা যাচ্ছে। দেখে দেখে বানিয়া মশাইদের ঘন ভ্রু-ওলা চোখগুলো একেবারে চক্‌চক্‌ করে ওঠে। ওঠবারই কথা—ওঁদের গায়ের চামড়া পর্যন্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রেই তো শুধু ধোঁয়া আর চর্বি আর আলকাতরার গন্ধ।

স্তেপের ওপর দিয়ে শব্দ করতে করতে গোলা ছুটে যায়। গোলার বজ্র গর্জন লাল ফৌজের ঘাঁটিগুলোকে ঘিরে ধরে, ফোয়ারার মতো মাটি ছিটকে

ছিটকে পড়ে অনবরত। উন্মাদ ধ্বনি তুলে নালার গহ্বর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে অশ্বারোহী সৈন্যদল, ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকে চায় না, ঘোড়া সমেত কাঁটা তারের বেড়াগুলো লাফিয়ে পার হয়ে তারা মাতালের মতো তীব্র উত্তেজনায় ট্রেঞ্চের দিকে ঘোড়া হাঁকায়। গায়ে হয়তো গুলি বিঁধেছে, তবু সেই মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যেই ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ হতে তলোয়ার দিয়ে হাওয়ায় আঘাত করতে করতে ছুটে চলে ঘোড়সওয়ার, এমনি তাদের উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ মুখ গুজড়ে পড়ে জিনের ওপর, উন্মত্ত আক্ষেপেই যেন হাত দুটো সামনে ছুড়ে দেয়। তারপর পিছনের পায়ে দাঁড়ানো, সন্ত্রস্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

ঘাপটি মেরে এগোতে এগোতে হঠাৎ ধেয়ে এল পদাতিক বাহিনী। রেডদের পরিখার ওখানে হাতাহাতি যুদ্ধ—অশ্বারোহী, পদাতিক সব মিলে মিশে একাকার। মামন্তভ সেদিন হুকুম দিয়েছিলেন, সব কসাকই যেন ফৌজী টুপীর বন্ধনীতে শাদা শাদা ফিতে বেঁধে নেয়—নইলে যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে নিজের তরফেই আক্রমণ করে বসতে পারে। এ যুদ্ধে দুপক্ষই রাশিয়ান। অজানা কিন্তু অভিনব। জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করবে সেই আশায় লড়ছে এক পক্ষ; আর অপর পক্ষ যুদ্ধে নেমেছে যাতে পুরনো জীবনধারাই অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই জন্যেই এ যুদ্ধ আরও বেশী ভয়ংকর, আরও বেশী একরোখা।

তরঙ্গে তরঙ্গে আক্রমণ আসে, কিন্তু রেড পক্ষের ছোট ছোট সাঁজোয়া ট্রেনের আঘাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। জারিতসিনের কারখানায় তাড়াতাড়ি জোড়াতালি দিয়ে এই ট্রেনগুলো তৈরী করা হয়েছিল—দু'ধারে দুটো পেট্রোলের গাড়ী কিংবা মালগাড়ী আর মধ্যেখানে একটা ইঞ্জিন, ব্যস্। যুদ্ধক্ষেত্রের দুপাশে মণ্ডলাকার লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনগুলো আসে যায়, মেশিনগান আর কামান নিয়ে একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ে। গোলা ফাটছে, গাড়ীর বুলেটচিহ্নিত দেওয়াল থেকে বাষ্প উঠছে—তারই ভেতর দিয়ে ছুট দেয় ট্রেনগুলো; মান্ধাতা আমলের ক্ষুদে ক্ষুদে ইঞ্জিন থেকে শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে নিয়ে বাঁকাচোরা লাইনের ওপর ধেয়ে চলে, ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে পৌঁছে দেয় জল আর গোলাবারুদ।

“শুয়ে পড়!”

একেবারে কাছেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। তার ধাক্কায় লোক সব চোখে অন্ধকার দেখে, বুকের খাঁচাটা যেন একেবারে বসে যায়। পরমুহূর্তে পিঠের ওপর, মাথার ওপর ধপাধপ পড়তে থাকে মাটির চাবড়া—হাত দিয়ে ওরা সেগুলো ঠেকাবার চেষ্টা করে।

“কামান পাকড়ো! নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়াও!” বলে চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠল তেলেগিন। ধূলিজালের ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল—একটা কামান জখম হওয়ায় তার চাকাখানা আকাশে উঠে গেছে, লোকজন সব হন্তদন্ত হয়ে সেদিকেই ছুটছে। ...মরেনি কেউ—ঐ যে লাতুগিন, বাইকভ্,

গাগিন, জাদুইভিতের—আরে শারিগিন কই? ওহো, ঐ যে ওখানে! অন্য কামানটার ক্ষতি হয়নি—সেটার কাছে রয়েছে পেশেন্‌কিন, ভ্‌লাসভ......ইভানভ অমন মাথা দোলাচ্ছে কেন?......

"বাঁয়ে! ছয়, আশি! সাইট, ছয়, শূন্য ব্যাটারী গোলা দাগো," ধ্বসে-পড়া সুড়ঙ্গ থেকে মুখ বাড়িয়ে কর্কশ গলায় জানাল সাপঝকভ—টেলিফোনের রিসিভারটি তার কানে আঁটা।

ধুলোয় কাশতে কাশতে ঐ আদেশেরই পুনরাবৃত্তি করল তেলেগিন। অমনি বাইকভের হাতে একটা গোলা ঠেলে দিল শারিগিন। ফিউজটা দেখে নিয়ে বাইকভ আবার সেটাকে গাগিনের দিকে ঠেলে দিল—গাগিনই কামানে গোলা ভরছে। জাদুইভিতের কামানের ঢাকনা খুলে দিতে লাতুগিন কামানটাকে বসিয়ে নিল, তারপর হাত ওঠাল।

"গোলা দাগো!

কামানগুলোর চোঙ্গা কেঁপে উঠল থর থর ক'রে, বুম বুম শব্দে গোলা বেরুতে লাগল।......তেলেগিনের লোকজনের দ্রুত চঞ্চলতা হঠাৎ। একেবারে স্তব্ধ—সিনেমা ছবির মাঝপথে ফিল্ম ছিঁড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।...... ঐ আসছে আবার......আবার সেই দ্রুত ধাবমান ছায়া, তারপর সেই বজ্রপাত —ঠিক ওদের পাশেই মাটির মধ্যে।

"শুয়ে পড়!"

আবার সেই বজ্রনাদ, অগ্ন্যুৎপাত, শ্বাসরোধ। ...ওদের মনে হয়, রাগে শিরাগুলোও যেন ফেটে যাবে। কিন্তু কি করা? শত্রুপক্ষের হাতে অজস্র গোলা, অথচ ওদের নিজেদের সম্বল ফুরিয়ে এল বলে; তাছাড়া পর্যবেক্ষণ মঞ্চে যে ট্যারা-চোখ আহম্মখটা বসে আছে, সে বেটা আর কিছুতেই শত্রু ব্যাটারির পাল্লা খুঁজে পায় না......

এবার লাতুগিন চোট পেয়েছে। মাটিতে বসে পড়ে সে যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে। ওর পাশে আনিসিয়া—ক্ষিপ্র, লঘু হাতে ওর জ্যাকেট আর সিঙ্গ্‌লেট্ খুলে ফেলে কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। আনিসিয়া যে কোথা থেকে উড়ে এল, কেউ জানে না। লাতুগিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলছে, "এস ভাই—চল আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" লাতুগিনের খালি গা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু তবু সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আনিসিয়াকে। রাগের চোটে ওর লোমটোম সব খাড়া হয়ে উঠেছে। সত্যিই যেন কার হাড় চিবোচ্ছে এমনভাবে গর গর করতে করতে ও একেবারে কামানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই অসমান কামান প্রতিযোগিতার শুরু থেকে এতক্ষণ ধরে সবার মনেই রাগ ফুটছিল টগবগ করে। এবার সেই অসহ্য রাগের সান্ত্বনার পালা। একটু আগে ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার প্রশ্ন করেছিলেন—আর কত গোলা হাতে আছে; সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করছে সাপঝকভ। তার ফোলা

ফোলা চোখের পাতা বেয়ে ময়লা জল পড়ছে টপ টপ করে। কান থেকে রিসিভারটা নামিয়ে এনে ও তাতে মাঝে মাঝে ফুঁ পাড়ছে। হঠাৎ মনে হল কী যেন ঘটেছে, আবহাওয়াটা পর্যন্ত বদলে গেছে। চারি দিক এত নিস্তব্ধ যে, মনে হয় নিস্তব্ধতাটাই যেন লোকের কানের মধ্যে বাজছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তেলেগিন, বুকে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল পাঁচিলের ধারে। খুব সময়েই পৌঁছেছিল বটে—দেরী হলে আর দেখতে পেত না। সামনে চেয়ে দেখে দুর্দান্ত আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেছে. একেবারে সর্বগ্রাসী আক্রমণ বলেই মনে হয়। কালো হয়ে জমাট বেঁধেছে কসাক অশ্বারোহী আর পদাতিক দল—খোলা চোখেই তা বোঝা যায়। তার মাঝে এখানে ওখানে সোনালী পতাকার ছটা। মোটরে ক'রে যে সব পাদ্রী পুরোহিতকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হ'য়েছিল, তারা সৈন্যদের আশীর্বাদ দিচ্ছে। একেবারে রেড ব্যাটারির চোখের সামনে।...

পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে জাহাজীরাও। তাদের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইকভ তাদের হাসাবার চেষ্টা করেঃ "আরে এস এস, দেবদূত ভায়াদের ওপর গোলা দাগা যাক—খোলা সাইটেই চলবে।"

কিন্তু কেউ হাসে না। হঠাৎ লাতুগিন বলে ওঠে আদেশের সুরেঃ

"কমাণ্ডার, কামানটা বাইরে নিয়ে চলুন না! ইঁদুরের মতো গর্তের ভেতর কুঁকড়ে থেকে কি লাভ?"

"ঘোড়া না হলে তো কামান সরানো যাবে না লাতুগিন।"

"যাবে, নিশ্চয় যাবে!"

"যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কোন্ সাহসে কমাণ্ডারের সঙ্গে তর্ক কর তুমি! বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত একেবারে!" বলে চীৎকার করে উঠল শারিগিন। চীৎকারটা ছেলেমানুষের মতো, কিন্তু এত আকস্মিক আর এমন রুক্ষ যে নাবিকরা ওর দিকে কটমট ক'রে চাইল। দুহাতে দু মুঠো বালি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে প্রচণ্ডভাবে গাল ঘষতে লেগে গেল শারিগিন। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে—শুধু চোখের পাতা দুটো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল রোদে-পোড়া গালের ওপর।

পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে কামানের কাছে পৌঁছাল তেলেগিন, একটা চাকার ওপর হাত রাখল।

"কমরেড্স, লাতুগিনের প্রস্তাবটা ভালই," বল্ল সে। "মাটি খুঁড়ে চেষ্টা করেই দেখা যাক না।"

নাবিকরা এতক্ষণ ওর গতিবিধি মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল। কথাটি না বলে এবার তারা ঝুঁকে পড়ল কোদালের ওপর। যেখান থেকে কামানটা বাইরে টেনে নিতে সুবিধা হবে, সে রকম একটা জায়গা দেখে ওরা গর্তের গায়ে ঢালু বানাতে লেগে গেল।

"তেলেগিন!" ভাঙ্গা ভাঙ্গা, টান টান গলায় হাঁকল সাপঝকভ।

“তেলেগিন, কমাণ্ডার জানতে চান—বিনা ঘোড়া কামানটাকে বাইরে টেনে আনা যাবে কি?”

“হ্যাঁ যাবে, বলে দাও।”

তেলেগিনের সুরে স্থির আত্মবিশ্বাস। ওদিকে লাতুগিনের কাঁধে অসহ্য যন্ত্রণা, ব্যাণ্ডেজ ভেদ করে জখম থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে মাটি খুঁড়ে চলেছে। খুঁড়তে খুঁড়তে বাইকভকে কনুইয়ের ঠেলা দিল।

“বুদ্ধিজীবীদের কী দর, বল না!”

“এর পরের বার ওরা চালুনি করে জল আনতেও শিখবে,” বাইকভ জবাব দিল। “শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু ওরা শিখবে বলেই মনে হয়!”

হঠাৎ ঝড়ের মতো গোলাবর্ষণের শব্দে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে যায়। পাঁচিলের ওপর ছুটে গেল তেলেগিন। অজস্র ধারায় সৈন্য নামছে প্রান্তরের মধ্যে। ডান দিকে কমাণ্ডার আলাবিয়েভের (সেদিনের লড়াইয়ে ইনি নাম করেন) সাঁজোয়া ট্রেণগুলো ওদের গতিপথের মাঝখান দিয়েই নীচু লাইন ধ'রে ছুটোছুটি করছে—কখনো সিটি বাজাচ্ছে, কখনো ধক ধক করছে, কখনো বা কটা রংয়ের ধোঁয়া ছাড়ছে। সবচেয়ে কাছে যে ইউনিটটা তেলেগিনদের রক্ষা করছে তার দিকে তেলেগিনের দৃষ্টি নিবন্ধ। সেটা কাচালিন রেজিমেণ্টের একটা কম্প্যানী। কাঁটা-তারের ওপারে ট্রেঞ্চ নামধারী সামান্য সামান্য গর্তের মধ্যে তাদের সৈন্যেরা শুয়ে আছে। তেলেগিন চেয়ে থাকতে থাকতে ওদের কাছে একটা জলের গাড়ী পেঁৗছাল, কিন্তু ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পেয়েছে, জলের পিপে উল্টে ফেলে গাড়ীশুদ্ধ চম্পট দিল। আগের দিন তেলেগিনের কাছে সেই যে সৃষ্টিছাড়া অতিথিটি এসেছিল—সেই যে ঢেঙাপানা ইভান গোরা—তেলেগিন দেখল সেই লোকটি গুঁড়ি মেরে ট্রেঞ্চ বরাবর ছুটছে। সৈন্যদের হাতে গুলীর শেষ ক্লিপটা সে তুলে দিয়ে আসছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।......

তেলেগিনের ব্যাটারি আর ঐ কম্প্যানী—দুইয়েরই বাঁ পাশে প্রায় সিকি মাইল দূরে সেই নালাটা—যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যেটা একেবারে শহর পর্যন্ত চলে গেছে। নালার ওপর গুলী চলেছে সারা দিন ধরে। কসাকরা এবার জমাট জমায়েতের কায়দা ছেড়ে লাইনের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, একেবারে নালার ধার পর্যন্ত ছাপিয়ে আসছে, দূর থেকে তা দেখা যায়। ইভান গোরার সৈন্যসামন্তদের মধ্যে বর্ধমান উত্তেজনা লক্ষ্য ক'রে ইভান ইলিয়িচ বুঝতে পারল যে, নালা বরাবর কসাকরা নিশ্চয়ই আরও এগিয়ে আসবে, তারপর ট্রেঞ্চগুলোর ওপর আক্রমণ করবে পেছন থেকে—পাশ থেকে ব্যাটারির ওপরও ঘা দেবে। তা যদি হয় তাহলে সর্বনাশ। দেখা গেল ওর আন্দাজই ঠিক।......

হঠাৎ নালার ভেতর থেকে ছুটে এল ঘোড়সওয়ারের দল—একেবারে রেডদের ঘাঁটির গায়েই—তারপর দুই বিপরীত দিকে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ চল্ল

ইভান গোরার পেছন দিকে, আর এক ভাগ ঘোড়া ছোটাতে লাগল ব্যাটারিমুখো। কামানের কাছে ছুটে এল তেলেগিন। হাঁপাতে হাঁপাতে, খিস্তি করতে করতে নাবিকরা তখন গর্তের মধ্যে থেকে একটা কামান টেনে তুলছে ঢিবির ওপর। কিন্তু বালি সরে সরে যায়, চাকাগুলো খালি খালি বালির মধ্যে আটকে যেতে থাকে।

"কসাকরা আসছে!" বল্ল তেলেগিন। শান্ত স্বরেই বলার চেষ্টা করল। "আনো, ওটাকে বাইরে আনো" বলে এমন জোরে চাকাটা চেপে ধরল যে মনে হল যেন পিঠের পেশীগুলো পট পট করে ছিঁড়ে যাবে। "জলদি করো! গ্রেপশট দাগো!"

কসাকদের চীৎকার তখন কানে পৌঁছে গেছে। এমন পাগলের মতো সে চীৎকার, মনে হয় কে যেন ওদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। গাড়ীর নীচে ঢুকে পড়ে গাগিন কামানটাকে কাঁধে চড়ালঃ "সব কই মিল্‌কে, হেঁইও!" বালির ভেতর থেকে সবলে উত্তোলিত হয়ে কামানটা এসে ধপ করে নামল ঢিবির ওপর—মুখটা নীচের দিকে। প্রকাণ্ড হাত দিয়ে একটা গোলা তুলে নিয়ে গাগিন সেটাকে ধীরেসুস্থে ব্রীচের মধ্যে পুরতে লাগল—দেখলে মনে হয় যেন ওর একটু তাড়াতাড়ি নেই। জন ত্রিশেক ঘোড়সওয়ার—ঘোড়ার কাঁধের ওপর নুয়ে পড়ে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ধেয়ে আসছে ব্যাটারি লক্ষ্য করে। কিন্তু তাদের সুমুখে লকলকে আগুনের জিহ্বা আর গ্রেপশটের বিস্ফোরণ। কতকগুলো ঘোড়া পিছু হটল, কতকগুলো ফিরে পালাল—তবু জনবারো সওয়ার তাদের ঘোড়াগুলোকে রুখতে পারল না, ছুটে এল ঢিবির দিকে।

জাহাজীদের চাপা আক্রোশ এতক্ষণে মুক্তির পথ পেয়েছে। খালি গায়ে হেঁড়ে আওয়াজ করতে করতে লাতুগিনই সব প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর বুকে, ঢেউ-খেলানো ছোরাটা সজোরে বসিয়ে দিল এক কসাকের কোটের ভেতর, তার বুটিদার পেটীর নিচে।......ঘোড়ার পায়ের তলে পড়েছিল জাদুইভিতের, পড়বামাত্র ঘোড়ার পেটটা সে চিরে দু ফাঁক করে দিল; সওয়ারটাকেও মাটিতে নামার ফুরসৎ দেয়নি, এক ছোরার ঘায়ে সেও সাবাড়। তলোয়ারের খোঁচা এড়িয়ে এড়িয়ে গাগিন গিয়ে জাপটে ধরল ইয়া লম্বা এক কর্ণেটকে—লড়াই বাধল নভগোরদ আর দনের মানুষে। দনওলাকে বজ্র আঁটুনীতে বেঁধে রেখে তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামাল গাগিন, তারপর মেরে শুইয়ে দিল। বাকী সবাই বন্দুক ছুঁড়তে লাগল, কামানের আড়াল থেকে। তেলেগিনের অভ্যাসই হচ্ছে এ রকম সময় একেবারে ধীর স্থির থাকে (ওর আবেগ আসবে পরে ঘটনার শেষে) —ধীর স্থির গতিতেই সে অতি সুশৃঙ্খলভাবে গুলী চালিয়ে গেল, একটার পর একটা, ট্রিগার থেকে আঙুলটা একবার নামালও না। লড়াই অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষঃ ঢিবির ওপর চারজন কসাকের মৃতদেহ, আর দুজন ছুটে পালাবার সময় গুলিতে মারা গেছে।

আগের আগের আক্রমণের মতোই সেদিনের শেষ আক্রমণও প্রতিহত হয়েছে। লাল ফৌজের যুদ্ধের লাইন শত্রুরা ভাঙ্গতে পারেনি; খালি একটি জায়গায় তাদের পদাতিক কলাম দুটো রেড ডিভিশনের মাঝখানে গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে—সে জায়গাটা ছিল রেড বাহিনীর দুর্বলতম অংশ। সন্ধ্যা নামল। কামানের চোঙ্গাগুলো আগুন গরম, ঘোড়াগুলো ক্লান্তিতে ধুঁকছে। শত্রু অশ্বারোহীদের তীব্র উত্তেজনা তখন কমে এসেছে, পদাতিক দলকে আক্রমণে পাঠাতেও শত্রুপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। যুদ্ধ থামল, প্রান্তরের ওপর গোলাগুলীর আওয়াজ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হল! এখন সে প্রান্তরে শুধু স্ট্রেচার-ওলাদের নিঃশব্দ পদক্ষেপ—তারা খুঁজে খুঁজে আহতদের তুলে নিচ্ছে।

ব্যাটারি আর ট্রেঞ্চের ওখানে জল এল পিপে ভর্তি, গাড়ী বোঝাই ক'রে এল রুটী আর তরমুজ—ফেরার পথে আবার সেই গাড়ীতে আহতদের নিয়ে গেল। ১০ম আর্মির প্রত্যেক ইউনিটেই ক্ষতি যা হয়েছে ভয়ঙ্কর। তারচেয়ে আরও খারাপ কথা হচ্ছে যে, যা কিছু রিজার্ভ ফৌজ সব ওদিন নামানো হয়ে গেছে, শহর থেকেও আর নতুন লোক পাওয়ার আশা নেই।

ভরোপনভো স্টেশনের ঠিক বাইরে রেলগাড়ীর একটা যাত্রীবাহী কোচ দাঁড়িয়ে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আর্মি কম্যাণ্ডার সেখানে পৌঁছালেন। ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামলেন, যারা তাড়াতাড়ি ওঁর সঙ্গে মিলতে আসছিল এক এক করে তাদের দিকে চাইলেন। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আর্মি-আর্টিলারীর কম্যাণ্ডার। তেলেগিনের ব্যাটারীর ওখানে যে-লোকটি নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন এ সেই লোক—সেই গোলাপী গাল, সেই ঢেঙ্গা দাড়িওলা চেহারা। দ্বিতীয় জন সাঁজোয়া ট্রেনের কমাণ্ডার আলাবিয়েভ। দেখলে মনে হয় উনি যেন ছাত্র, উত্তেজনায় রঙ্গীন হয়ে এই মাত্র ব্যারিকেড থেকে ফিরছেন। আর্মি কমাণ্ডারের চোখের পানে চেয়ে দুই কমরেডই মৃদু হাসি হাসলেন। সেদিনের যুদ্ধে একাধিক সঙ্গীন আক্রমণে আর্মি কমাণ্ডার ভাগ নিয়েছিলেন—বুলেটের গুলীতে তাঁর কোট ফুটো হয়ে গেছে, কাঁধে ঝোলানো কার্বাইনের কুঁদোটা থেঁতলে গেছে। তাই ফ্রণ্ট লাইন থেকে তাঁকে নিরাপদে ফিরতে দেখে অন্য দু কমরেডই খুব খুশী।

সেলুন গাড়ীর ভেতরে এসে আর্মি কমাণ্ডার জল খেতে চাইলেন, মগ কয়েক জল খেয়ে ফেল্লেন ঢক ঢক করে। তারপর একটা সিগ্রেট চেয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন দু একবার। চোখ দুটো জ্বালা করছে। কিন্তু চোখের সামনে একটু ঘোর ঘোর লাগা মাত্র তৎক্ষণাৎ সিগ্রেটটা টেবিলের ধারে রেখে দিয়ে এক তাড়া রিপোর্টের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। হ্যাঁ......ক্ষয় ক্ষতি খুব হয়েছে, খুবই। আর পরদিনের জন্যে যা গোলাবারুদ আছে তাও বেশী নয়। অতি সামান্য। ইনি একটা ম্যাপ খুলে ধরলেন, তিনজনেই ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপের ওপর। পেন্সিলের টুকরো দিয়ে ধীরে ধীরে একটা লাইন টেনে গেলেন কমাণ্ডার। দেখা গেল

সেদিনের লড়াইয়ের ফলে যুদ্ধের লাইনে ভাঙ্গন হয়েছে যৎসামান্য—বরং সারেপতা-তে লাইনটা বেঁকে একেবারে হোয়াইট লাইনের মধ্যেই অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে গেছে। কিন্তু আগের দিন যুদ্ধক্ষেত্রে যে-অংশের কৃষক রেজিমেণ্ট-দুটোর দুর্ঘটনা ঘটে, সে-অংশে যুদ্ধের লাইনটা একেবারে খাড়াভাবে পিছু হটে এসেছে জারিতসিনের দিকে। আর্মি কমাণ্ডারের পেন্সিলের গতি আরও মন্দ হয়ে এল। বল্লেন, "আচ্ছা এসো, আর একবার দাগা বুলিয়ে দেখা যাক।" না, রিপোর্টে কোনো ভুল নেই। জারিতসিন থেকে ছ' মাইল দূরে সেই নালার গহ্বরের মধ্যে এসে পেন্সিলটা থামল, তারপর হঠাৎ খাড়াভাবে পিছু হটে এল পশ্চিম মুখে। দেখতে একটা গোঁজের মতো। পেন্সিল ম্যাপের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে কম্যাণ্ডার হাতের পিঠটা ঠুকলেন গোঁজের ওপর।

"এইখানেই হেস্তনেস্ত হবে।"

আর্টিলারি কমাণ্ডার নাছোড়বান্দা। ভ্রূ কুঁচকে অন্য দিকে চেয়ে বল্লেনঃ

"রাত্তিরে যদি যথেষ্ট গোলা পাই তাহলে ঐ গোঁজ আমি গিলে ফেলব, কথা দিচ্ছি।"

সাঁজোয়া ট্রেণের কমাণ্ডার জানালেন, "সৈন্যদের মনোবল খুব ভালঃ ওরা যদি কিছু খেতে পায়, আর দু এক ঘণ্টা ঘুমতে পায়, তাহলে শত্রুকে ঠিক রোখা যাবে।"

"শুধু রুখলেই চলবে না", আর্মি কমাণ্ডার বল্লেন। "ওদের চুরমার করে দিতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের লাইনটা তেমন সুবিধা নয়। এঞ্জিন জোড়া হয়েছে? আচ্ছা, চলি তাহলে......"

তিনি আরও কয়েক মুহূর্ত বসে থাকলেন—ক্লান্তিতে যেন অবসন্ন। তারপর উঠে পড়ে কমরেডদের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেনঃ

"আচ্ছা, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই......!"

আর্টিলারি কমাণ্ডার আর সাঁজোয়া ট্রেন কমাণ্ডার দুজনে পর্যবেক্ষণ মঞ্চে ফিরে গেলেন। মঞ্চটা রেলের জলের ট্যাঙ্কের গম্বুজ, আকাশে মাথা তুলে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। মাটি আর আকাশ থেকে ওর ওপর অগ্নিবর্ষণ চলেছে সারা দিন ধ'রে। গম্বুজের মাথায় (সেখানে টেলিফোন বসানো) উঠে ওঁরা দেখলেন, ওঁদের রাতের খানা হাজির—দুজনের জন্যে দু চাকা বাসি রুটি আর আধখানা কাঁচা তরমুজ। আর্টিলারি কমাণ্ডার দিব্যি খোশমেজাজ, মোটাসোটা মানুষ—এত সামান্য রেশন দেখে তাঁর বেশ কষ্ট লাগে।

"এর নাম তরমুজ?" ইটের দেওয়ালে একটা ফাঁক, তার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন। "তরমুজ কাটতে যদি ছুরি চালাতে হয়, তাহলে সে তরমুজ কোনো কর্মের নয়। ঘুষি মারলেই দুখানা হয়ে যাবে, তবে তো তরমুজ।" বিচিগুলো থু থু করে ফেলে দিতে দিতে চোখ দুটো কুঁচকে নীচে মাঠের দিকে চাইলেন। অস্তসূর্যের আলোয় মাঠটা তখন বহু দূর পর্যন্ত

দেখা যায়। "এক বাটি কোফ্‌তা-কারি—হ্যাঁ তাহলে পেট ভরত বটে। আজ রাত্রে পিছু হটার হুকুম আসবে বলেই বোধ হচ্ছে......তোমার কি মনে হয়, ভাসিলি?"

"পিছু হটব? রেলওয়েটা ছেড়ে চলে যাব? পাগল হলে নাকি?"

"আর তুমি পাগল হওনি? না হওতো শত্রুকে ভেতরে ঢুকে পড়তে দিলে কি বলে? তোমার সাঁজোয়া গাড়ী ফাড়ী করছিল কি?"

কথা বলতে বলতে আর্টিলারি কমান্ডার মাঝে মাঝে দুটো আঙ্গুল বেঁকিয়ে চোখের সামনে ধরছেন; নয়তো হাত-সমান দূরে একটা দেশলাইয়ের বাক্স ধরছেন। এইভাবেই তিনি এংগ্‌ল্‌ আর দূরত্ব হিসাব করছিলেন—পঞ্চাশ ফুট এদিক ওদিক বাদ দিলে সে হিসাব নির্ভুল।

"বা রে, ওদের যে জঙ্গী-এঞ্জিনীয়ার সঙ্গে ছিল—গোটা বারো জায়গায় লাইন তো তারা উড়িয়ে দিয়েছিল।"

"তাহলেও ওদের গোঁজ ঢোকাতে দেওয়া উচিত হয়নি তোমার", গোঁ ধরে বল্লেন আর্টিলারি কমান্ডার। "আরে, আরে, এদিকে তাকাও! কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

সে দৃশ্য শুধু সুশিক্ষিত, প্রখর দৃষ্টির কাছেই ধরা পড়ে। পশ্চিমমুখী বাদামী প্রান্তরটা তখন আর তেমন নীরব বা নির্জন নয়—প্রান্তরের ওপর সতর্ক গতিবিধি শুরু হয়েছে। মাঠের প্রত্যেকটি টিলা আর অসমান অংশ থেকে মাটির ওপর লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে—ঠিক হাজার হাজার উইঢিবির মতো—কিন্তু ঐ ছায়ার মধ্যে কতকগুলি আবার ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করছে।

"সাহায্যকারী ফৌজ", বল্লেন আর্টিলারি কমান্ডার। "গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে—ওঃ আবার বাহার কত!......দেখ, আমার দূরবীণ দিয়ে দেখ।......ঐ যে পটিগুলো, সোণার মতো ঝকঝক করছে—দেখতে পাচ্ছ?"

"পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অফিসারদের কাঁধের পটি বলেই তো মনে হয়।"

"অফিসারদের পটি—হ্যাঁ, তাই বটে। দেখ দেখ, হতভাগাগুলোর দিকে চাও! ঠিক মাকড়সার মতো বুকে হাঁটছে! এতগুলো অফিসারের পটি—আশ্চর্য তো!......অফিসার ছাড়া আর কিছু তো দেখছিনে।......"

"সত্যি আশ্চর্য!"

"পরশুই না স্তালিন বলেছিলেন, এমনিধারা ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত থেকো? সেই ব্যাপার বলেই তো মনে হয়।......"

বক্তার দিকে চাইলেন আলাবিয়েভ। টুপি খুলে জটপড়া চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে মাথা চুলকোলেন। তাঁর ধূসর চোখের দীপ্তি তখন ম্লান, মাথাটা আনত।

"হ্যাঁ", অস্ফুট স্বরে আলাবিয়েভ বল্লেন। "ওরা আজ এত সকাল সকাল

যুদ্ধ থামাল কেন, এবার বুঝলাম। এ তো হবারই কথা। ভোগান্তি আছে কপালে।”

টেলিফোনের ধারে চেয়ার ছিল। ঝট করে সেই চেয়ারে বসে উনি কয়েকটা ফোন করলেন। তারপর মাথার পেছনের টুপিটা চাপিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে গেলেন।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রান্তর পর্যবেক্ষণ করলেন আর্টিলারি কমাণ্ডার। তারপর সমর পরিষদকে ফোন ক'রে স্পষ্ট অথচ অনুচ্চ স্বরে জানালেনঃ

“কমরেড স্তালিন, কসাকদের একটা অফিসার ব্রিগেড এসেছে।”

জবাব পেলেনঃ

“জানি। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা মেসেজ যাচ্ছে।”

সত্যি, একটু পরেই একটা মোটর ভট ভট আওয়াজ এল, সাইকেলটা ব্যাকফায়ার করছে। জীর্ণ সিঁড়িতে খটাখট ওঠার শব্দ—তারপর সিঁড়িমুখের ভেতর দিয়ে দেহটা কষ্টেসৃষ্টে গলিয়ে একজন লোক ওপরে উঠে এল। কালো চামড়ার পোষাকে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। আর্টিলারি কমাণ্ডার নিজে বেশ লম্বা, কিন্তু এ লোকটা একেবারে তাঁরও মাথা ছাড়িয়ে।

“আর্টিলারি কমাণ্ডারকে কোথায় পাওয়া যাবে?”

“আমিই আর্টিলারি কমাণ্ডার”—এ উত্তরে কিন্তু সাইকেলওয়ালার মন ভরে না—আরও পরিচয়-চিহ্ন চাই তার। ওকে পরিচয়ের কাগজ দেওয়া হ'ল—দেশলাই জ্বালিয়ে সেটা পড়ল, কাঠিটা একেবারে আঙুল পর্যন্ত পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত পড়ল। পড়ার পর তবে মেসেজটা ছাড়ল, তাও অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে। তারপর খটখট সিঁড়ি বেয়ে ফের নীচে।

খামের মধ্যে ভাঁজ করা একখানা হলদে, খসখসে কাগজ—তার ওপর সমর পরিষদের চেয়ারম্যানের হস্তলিপিঃ

“যত কামান আর গোলাবারুদ আছে সব (‘সব’ কথাটা আণ্ডারলাইন করা) ভরোপনভো-সাদোভায়া এলাকার চার মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত করবেন, ভোর হবার আগেই। স্থান পরিবর্তনের সময় যাতে শত্রুর দৃষ্টি না পড়ে সে বিষয়ে যথাসম্ভব সাবধান থাকবেন।”

এই অপ্রত্যাশিত, ভয়ঙ্কর আদেশটি আর্টিলারি কমাণ্ডার পড়লেন, বার বার পড়লেন। প্রচণ্ড ঝুঁকি—তা ছাড়া এ আদেশ পালন করাও খুবই দুঃসাধ্য। কারণ আদেশটির অর্থ হচ্ছেঃ যুদ্ধক্ষেত্রের ছোট্ট একটি অংশে (গোঁজের মতো সেই যে অংশটি, যার মধ্যে শত্রুরা ঢুকে পড়েছে) কেন্দ্রীভূত করতে হবে সাতাশ ব্যাটারীর সাতাশটাই—দু দুশো কামান। কিন্তু শত্রু যদি ঠিক ওখানেই না আঘাত করে, যদি একটু ডাইনে বা বাঁয়ে যায়, কিংবা যা আরও ভয়ের কথা—যদি সারেবাকায় তার গুমরাকে পার্শ্বদেশ আক্রমণ করে, তাহলে কি হবে? তখন তো ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে একেবারে শেষ!

অত্যন্ত চঞ্চল মনে আর্টিলারি কমাণ্ডার টেলিফোনে বসলেন—এক এক করে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারদের ডেকে বলে দিলেন তারা কোন্ পথ ধরে যাবে, গোব্দা গোব্দা বিরাট সাজসরঞ্জাম সব কোথায় তুলবে, ইত্যাদি। হাজার হাজার সৈন্য, ঘোড়া, আর্মি মালগাড়ী, গ্রাম্য মালগাড়ী ,তাঁবু—সব বোঝাই ক'রে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারপর ফের মাল নামিয়ে নতুন জায়গায় সাজাতে হবে, মাটি সরিয়ে নিয়ে খুঁড়ে কামান বসাতে হবে, তার খাটাতে হবে —কত কাজ—ভোর হবার আগে এই ক' ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ করতে হবে।

টেলিফোনে বসেই নীচের দিকে চেঁচিয়ে আর্টিলারি কমাণ্ডার বল্লেন—"একটা লণ্ঠন আনো, ডেসপ্যাচ-রাইডাররা সব ঘোড়াটোড়া নিয়ে প্রস্তুত থাকো।" জামার কলারের বোতাম খুলে নেড়া মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর ছোট ছোট হুকুমনামা শুনিয়ে বল্লেন—"লিখে নাও।" হুকুম হাতে পেয়ে ডেসপ্যাচ রাইভাররা ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে নামল, লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সেয়ানা লোক আর্টিলারি কমাণ্ডার—হুকুমে লিখে দিয়েছেন যে, যেসব জায়গা থেকে ব্যাটারি সরিয়ে নেওয়া হবে সেসব জায়গায় যেন আগুন জ্বেলে রাখা হয়। বেশী আগুন নয়—এই যাতে স্বাভাবিক মতো আলো হয়, ব্যস্ শীতের রাতে লাল ফৌজের লোকেরা আগুন পোহাচ্ছে—এই কথাই শত্রুপক্ষ ভাবতে থাকুক!

স্তালিনের নির্দেশটা আর একবার পড়ে নিয়ে উনি ভাবলেন, ফৌজের দু'পাশ একেবারে অরক্ষিত রাখা উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত মনে মনে ঠিকই করে ফেল্লেন যে, সারেপতা আর লুমরাকে ত্রিশটা কামান রেখে দেওয়া যাক। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডাররা রিপোর্ট পাঠালঃ ঘোড়ার জুড়ি সব রেডি, গোলাগুলি আর প্রাথমিক শুশ্রূষার সজসরঞ্জাম বোঝাই করা সারা, এখানে ওখানে আগুনও জ্বালিয়ে রাখা হয়ে গেছে হুকুম মতো। তখন আর্টিলারি কমাণ্ডার তাঁর মান্ধাতা আমলের গাড়ীতে উঠে জারিত্সিন সদর দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। পেট্রোল আর স্পিরিট মেশানো এক অপূর্ব বস্তু জ্বালিয়ে ঝরঝর ক'রে চলে গাড়ীটা, ঠিক যেন জিপ্সীদের গাড়ী।

অন্ধকার, জনশূন্য রাস্তা দিয়ে ভীষণ শব্দ তুলে গাড়ী এসে থামল সেই বণিকের অট্টালিকার সামনে—যেখানে সদর দপ্তরের ঘাঁটি। সিঁড়িতে আলো নেই। তবু সেই সিঁড়ি বেয়েই বোঁ বোঁ শব্দে তেতলায় উঠে একটা বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন আর্টিলারি কমাণ্ডার। ঘরে গথিক কায়দার জানালা, মাথার ওপর ছাতটা ওক কাঠে মোড়া। কিন্তু আলোর মধ্যে শুধু দুটি বাতিঃ একটা বাতি লম্বা টেবিলের ওপর, সেখানে কাগজপত্র ছড়ানো; আর দেওয়ালে ম্যাপের সুমুখে দাঁড়িয়ে অন্য বাতিটা উঁচু করে ধ'রে আছেন আর্মি কম্যাণ্ডার। তাঁর পাশে সমর পরিষদের সভাপতি; কাল যুদ্ধের জন্যে কোন্ সৈন্য কোথায় দাঁড়াবে, রং-পেন্সিল দিয়ে তাই দাগিয়ে দিচ্ছেন।

এঁরা দুজনেই আর্টিলারি কমাণ্ডারের পুরানো কমরেড। এঁরা ছাড়া

আর কেউ সে ঘরে নেই—তবু সামরিক কায়দাদুরস্ত ভাবেই উনি ভেতরে ঢুকলেন—পা জুড়ে বুক টান করে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট দিলেন যে. হুকুমের প্রথম ভাগ তামিল হয়েছে। বাতি নামিয়ে আর্মি কমাণ্ডার মুখ ফেরালেন। আর ম্যাপ ছেড়ে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন সমর পরিষদের সভাপতি।

"কুড়িটা ব্যাটারি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝের অংশে সরিয়ে নেওয়া হবে, ভোরের আগেই," আর্টিলারি কমাণ্ডার জানালেন। "আর ফৌজের পাশের দিকে, সারেপতায় আর গুমরাকে, সাতটা ব্যাটারি রেখে দিয়েছি।"

সভাপতি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছিলেন। মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে যখন তিনি কথা বল্লেন তখন তাঁর স্বর শান্ত, কিন্তু তাতে একটু কঠোরতার আমেজ ছিল।

"পাশের দিকটা আবার কোথায়? এর সংগে সারেপ্‌তা আর গুমরাকের কি সম্বন্ধ? অর্ডারে পাশের দিক সম্বন্ধে কোনো কথা নেই—তুমি অর্ডারটা ভুল বুঝেছ।"

"মোটেই না। আমার বুঝতে কসুর হয়নি একটুও।"

"অর্ডারে লেখা ছিল," (ও'র চোখের নীচের পাতাটা কাঁপল, চোখ দুটো কুঁচকে এল) "অর্ডারে স্পষ্ট লেখা ছিলঃ সমস্ত আর্টিলারি, সমস্ত, মানে শেষ কামানটা পর্যন্ত—কেন্দ্রীভূত করতে হবে মাঝের অংশে।"

আর্টিলারি কমাণ্ডার আর্মি কমাণ্ডারের চোখের দিকে চাইলেন—কিন্তু সে চোখেও শুধু গভীর তিরস্কার।

"কমরেড্‌স্‌!" আবেগভরে বলে উঠলেন আর্টিলারি কমাণ্ডার, "এরকম অর্ডার মানে সর্বস্ব বাজি রাখা—এর অর্থ, হয় জীবন না হয় মৃত্যু।"

"হ্যাঁ, তাই," সায় দিলেন সভাপতি।

"তাই," প্রতিধ্বনি তুললেন আর্মি কমাণ্ডার।

"আমাদের পাশের দিক যদি একেবারে অরক্ষিত করে রেখে দিই, তাহলে মাঝের অংশে বিরাট বাহিনী জমিয়ে লাভ কি হবে? শত্রু যে শুধু মাঝের অংশেই ব্যূহ ভাঙতে আসবে তার গ্যারাণ্টি আছে? যদি আর কোনো জায়গায় লড়াই লাগায় তখন কি হবে? খালি পদাতিক সৈন্যের সাধ্য নেই যে, একলা তাদের ঠেকায়, আজকের যুদ্ধে পদাতিকরা একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তখন আর ব্যাটারীগুলোকে নতুন করে সাজাবার সময় থাকবে না। এইজন্যেই আমি ভয় পাচ্ছি।......সাঁজোয়া গাড়ী থেকে এখন আর আমরা সাহায্য পাচ্ছিনে—তা ছাড়া পদাতিক বাহিনীকে রাত্তির বেলা তো রেললাইন ছেড়ে আসতেই হবে।......এই জন্যেই আমি ভয় পাচ্ছি।"

"কিছুতে ভয় পেলে চলবে না!" হাতের মুঠিটা বার বার টেবিলে ঠুকলেন সভাপতি। "ভয় পেলে চলবে না। ইতস্তত করলে চলবে না। কাল হোয়াইটরা ঠিক ঐ মাঝের অংশেই সমস্ত শক্তি ঢেলে দিতে বাধ্য একথা তুমি বোঝ না? গতকাল যুদ্ধটা যেভাবে চলেছে তাতে এ একেবারে অবশ্যম্ভাবী।

সারেপতার কথা ধর; সেখানে তারা প্রচণ্ড মার খেয়েছে, দ্বিতীয় বার আর সেখানে আক্রমণ করতে চাইবে না; আর বুদিওনির ব্রিগেড যে তাদের পঞ্চম কলমের পেছনে পৌঁছে গেছে তাও তো তারা জানে। তারপর গতকাল মাঝের অংশে তাদের সাফল্যের কথা ধর—আমাদের লাইনের মধ্যে একেবারে গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। আর সব শেষ কথা (তা বলে সামান্য কথা না) হলঃ ভরোপনভো-সাদোভায়া অঞ্চলে অঞ্চলগত সুবিধা—নালা রয়েছে, জারিৎসিন পর্যন্ত ওদের রাস্তা একেবারে সোজা। কসাকদের বদলিতে একটা অফিসার ব্রিগেড এসেছে, তুমি নিজেই বল্লে। তার থেকে নিজেই সিদ্ধান্ত টানো। অফিসার ব্রিগেড মানে বারো হাজার ভলাণ্টিয়ার, নিয়মিত সৈন্য-বাহিনীর অফিসার সব, পাকা যোদ্ধা তারা। শুধু লোক দেখাবার জন্যে তো আর মামন্তভ এরকম একটা ইউনিটকে যুদ্ধে নামাবে না।.. ...সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গতভাবেই আমরা নিশ্চয় ধ'রে নিতে পারি যে, মাঝের অংশেই আক্রমণ আসবে।”

“সন্ধ্যাবেলার রিপোর্টগুলোতেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়,” বল্লেন আর্মি কমাণ্ডার। “হোয়াইটরা তাদের দক্ষিণ আর পশ্চিম আক্রমণ-রেখা থেকে চৌদ্দ পনেরটা রেজিমেণ্ট সরিয়ে নিয়েছে, এখন সেগুলোকে স্তেপ পার করিয়ে আনছে। এ তবু অফিসার ব্রিগেডটাকে না ধরেই।......”

“এইভাবে,” বল্লেন সভাপতি, “শত্রু নিজেই এখন এক অবস্থা সৃষ্টি করছে যে, আমরা যদি অবিচলিত সাহস আর দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে সে তার প্রধান শক্তিটাকেই আমাদের হাতে তুলে দেবে—ধ্বংসের জন্যে। শুধু ওদের আক্রমণ প্রতিহত করাই আমাদের কাজ নয়, দন আর্মির প্রাণকেন্দ্রটাকেই কাল ধ্বংস করে ফেলতে হবে।......”

আর্টিলারির কমাণ্ডারের মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বসে পড়ে হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বল্লেনঃ

“দারুণ সাহসের সঙ্গে প্ল্যান বানানো হয়েছে তো! একেবারে নির্ভীক পরিকল্পনা। আমার কিছু বলার নেই। এমন আপ্যায়িত করব বেটাদের যে, এখান থেকে দন পর্যন্ত একেবারে পাগলা কুকুরের মতো ছুটবে।”

যুদ্ধের ম্যাপের কাছে বাতিটা রাখলেন সভাপতি। আর্টিলারি কম্যাণ্ডার তাঁকে বুঝিয়ে যেতে লাগলেন—কিভাবে তিনি ব্যাটারিগুলো বসাতে চান—একেবারে গায়ে গায়ে ধুরোয় ধুরোয় লাগালাগি করে বসানো হবে। কটা থাক থাকবে তাও তিনি বলে গেলেন।

“গর্তের মধ্যে যেও না,” আর্মি কমাণ্ডার তাঁকে পরামর্শ দিলেন। “খোলা জায়গায় ঢিবির ওপর কামান বসিও। আমরা পদাতিক বাহিনীকে একেবারে ব্যাটারি পর্যন্ত এগিয়ে নেব। যাও, গিয়ে কমাণ্ডারদের ফোন করগে।”

কয়েক মিনিট পরে, ত্রিশ মাইল ব্যাপী যুদ্ধ-সীমানা জুড়ে সর্বত্র গতি চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল—নীরব, দ্রুত চাঞ্চল্য। শারদ আকাশে তখন অপ্রত্যাশিত

ঔজ্জ্বল্য, তারায় তারায় ছায়াপথ একেবারে ঝকমক করছে। ঝকঝকে আকাশের নীচে অন্ধকার প্রান্তরের ওপর দিয়ে কামান আর হাউইটজার টানতে টানতে ঘোড়ার দল ছুটে চলে। ষোল ষোলটা ঘোড়ায় মিলে ভারী কামানগুলো টেনে নেয় আরও আস্তে আস্তে, মালের গাড়ী দৌড়ায়—কোনোটার দু চাকা কোনটার চার চাকা।। পদাতিক দলগুলোকে চুপচাপ সরিয়ে নিয়ে সঙ্কুচিত অর্ধ-গোলাকার রক্ষাব্যূহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হল।

তুষার-ধূসর প্রান্তরের ওপর সূর্যোদয়ের সঙ্কেত বেজে ওঠে—বিউগ্‌ল্‌ বাদকেরা কসাক রেজিমেণ্টগুলিকে যুদ্ধের ডাক শোনাচ্ছে। সূর্য উঠছে ভল্‌গা স্তেপের কিনারা ঘেঁষে। দূরে কামানের গর্জন আর মেশিনগানের পট পট শব্দ। কিন্তু লাল ফৌজের সীমান্ত নীরব। সে সীমান্তের ওপর গভীর ছায়া পড়েছে, সূর্যটা সীমান্তের পেছনে। সমস্ত ব্যাটারিতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। শ্রাপনেল গোলার চারটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মারফৎ সঙ্কেত জানানো হবে।

একেবারে দিকচক্রবালের ওখান থেকেই হোয়াইটদের আক্রমণ আরম্ভ, ঝড়ের মতো গোলাবর্ষণ ক'রে সে আক্রমণ শুরু হল। জীবজন্তু যা ছিল সব ভয়ে জড়সড়—কুঁকড়ে শুঁকড়ে মাটিতে পড়ে আছে। ছোট্ট ঢিবি হোক, অতি সামান্য গর্ত হোক—যে যেখানে আড়াল পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে। প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ বিদীর্ণ ক'রে মাঝে মাঝে একটা উন্মাদ আর্তনাদ ওঠে, প্রায়ই দেখা যায় যে, হয় একটা গাড়ীর চাকা, না হয় একটা জ্বলন্ত গ্রেটকোট মাটি থেকে বাতাসে উড়ে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে জমি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে মাটির চাবড়া কতকগুলো। আর্টিলারির গোলাবর্ষণ মারফৎ প্রস্তুতি চল্ল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। লোকে যখন সাহস করে মাথা তুল্ল, দেখতে পেল সৈন্যে সৈন্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সারা প্রান্তর। প্রথমে কয়েক থাক পুরু ক'রে সাজানো অফিসারদের লাইন—সবার আগে তারাই আসছে মার্চ করে; সমান ক'রে বেয়নেট হাতে ধরে, ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে, আড়াল নেবারও চেষ্টা করে না। এদের পেছনে অফিসার ব্যাটেলিয়নের বারোটা কলাম—সাজানোর ধরণ দেখে মনে হয়, যেন কুচকাওয়াজ দেখাতে চলেছে। তাদের মাথার ওপরে উঁচু হয়ে পত পত করছে দুটো রেজিমেণ্টাল পতাকা। অবিশ্রাম ড্রামের শব্দ, তার সঙ্গে শিঙ্গা বাজছে করুণ সুরে। আর পদাতিক বাহিনীর পেছনে কালো কালো অসংখ্য কসাক স্কোয়াড্রন—সমুদ্র-তরঙ্গের মতো যেন ফুঁসে উঠেছে।

"ইভান ইলিয়িচ, ঐ যে, ঐ আমাদের শ্রেণীশত্রু! বীরপুঙ্গবদের বাহার কত! সুন্দর জুতো, সুন্দর পোষাক, পেটভর্তি গোস্ত্‌......"

"অত সুন্দর পোষাক নষ্ট করে দিতে হবে, আহাহা কি দুঃখের কথা!"

"ফাজলামি রাখো কমরেড্‌স্‌! খুব হুঁসিয়ার থাকা চাই।"

"আমরা বক বক করছি মন চাঙ্গা রাখার জন্যে, কমরেড তেলেগিন।"

শত্রুপক্ষের সামনের সারিগুলিতে গতি আরও দ্রুত হয়ে উঠল—এখন তাদের দূরত্ব তিনশো গজের বেশী নয়।......ওদের মুখগুলো চেনা যাচ্ছে। এমন মুখ যেন আর কখনো না দেখতে হয়! ঘৃণায় বিবর্ণ কোটরাগত চক্ষু। ঝট করে মুখ খুলে হঠাৎ জয়ধ্বনি করে উঠবে, সেই চেষ্টায় পেশীর ওপর মুখের চামড়াটা টান টান করে রেখেছে......

গম্বুজের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে অনেকখানি মুখ বাড়িয়ে আছেন আর্টিলারি কমান্ডার। ‘চার রাউন্ড শ্রাপনেল’ সঙ্কেতটা যাতে টেলিফোন অপারেটরকে জানিয়ে দিতে পারেন, তারই প্রস্তুতি হিসাবে হাতটা পেছন দিকে ছড়িয়ে দিলেন। শত্রুদের লাইন, কলাম সব তখন শিংগা আর ড্রামের তালে তালে দুলে দুলে এগুচ্ছে—আর এক মিনিটের মধ্যে তারা রেল লাইনটা পার হবে, তারই জন্যে উনি অপেক্ষা করে রইলেন।......আর এক মিনিট...... হারামজাদারা দৌড় শুরু না করা পর্যন্ত!

“কমরেড কম্প্যানি কমান্ডার, আমি পারছিনে, আর সহ্য করতে পারছিনে।......”

“যা, ট্রেঞ্চে ফিরে যা, শালা বেজম্মা কোথাকার!”

“আমার বমি আসছে, আমাকে ছেড়ে দাও, একটুখানি ছেড়ে দাও......।”

“গুলী করে ঠাণ্ডা করে দেব বলছি, শালা বেজম্মা! ”

“নে রাইফেল তুলে নে!”

আর্টিলারী কমান্ডার মনে মনে বল্লেনঃ ওদের প্রথম সার যেই ঐ খুঁটিটার কাছে পৌঁছবে, বাস তখুনি।......দুলতে দুলতে সামনের দলের লাইনটা তখন বেঁকে পড়েছে—রেলের স্লীপারে হোঁচট খেতে খেতে যেভাবে পারে আগে বাড়ছে। নড়বড়ে খুঁটিটা যাতে ভাল করে দেখা যায়, সেজন্যে কমান্ডার কুঁচকে চাইলেন—খুঁটির ডগা থেকে এক টুকরো কাঁটা তার ঝুলছে!......ঐ খুঁটিটার ওপর নির্ভর করছে সারা আক্রমণের সমস্ত ফলাফল, নির্ভর করছে যুদ্ধের জয়-পরাজয়, জারিৎসিনের ভালমন্দ। আরে শুধু তাই বা কেন, বিপ্লবেরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওর ওপর। ঐ যে, ট্যানবুট পরা ঐ লোকটাই সবার আগে পা চালিয়ে খুঁটিটা পার হল।......কমান্ডারের হাতটা পেছন দিকে মুঠিবাঁধা ছিল; মুঠি খুলে আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে নিলেন, তারপর দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতেই টেলিফোন অপারেটারের কানে কথাটা ছুড়ে দিলেনঃ “সংকেত!”

অগ্রসরমান সৈন্যদলের মাথা ছাড়িয়ে পর পর চারটে শ্রাপনেল বিস্ফোরণের ধোঁয়া উঠল পরিষ্কার আকাশের গায়ে, পেঁজা তুলোর মতো। ভয়ংকর বজ্রনাদে বাতাস কাঁপছে, ইঁট-গাঁথা গম্বুজটা দুলছে। রিসিভার ছেড়ে অপারেটার কানে হাত চাপা দিয়েছে। আর কমান্ডার পা ঠুকে ঠুকে লাফাচ্ছেন ঠিক নাচের মতো—হাত নাড়ার ধরণ দেখে মনে হবে উনি যেন অর্কেষ্ট্রা মাষ্টার।......

ধূসর সবুজ ব্যাটালিয়নগুলির ভয়ঙ্কর যাত্রাচ্ছন্দে মুহূর্ত পূর্বেও যে-

প্রান্তর ছিল মুখরিত, সে-প্রান্তর এখন এক প্রকাণ্ড জ্বালামুখী গহ্বর মাত্র। ধুলো আর ধোঁয়া ভেদ করে দেখা যায়—অগ্রসরমান শত্রু সারিগুলি বজ্রাহতের মতো ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। তাদের পেছনের লাইনে তখন প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা আর ধাক্কাধাক্কি। রেল লাইনের যে দিকে শত্রু নেই, সেদিক ধ'রে সাঁজোয়া গাড়ীগুলো শত্রুর পেছনে ধাওয়া শুরু করে দিয়েছে। ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে লালফৌজের কম্প্যানিগুলো প্রতিআক্রমণে ছুটল। অপারেটরের রিসিভার ছিনিয়ে নিলেন আর্টিলারি কমাণ্ডারঃ “এবার শত্রুর পেছনে গোলা লাগাও!” ঝড়ের মতো অগ্নিবর্ষণের ফলে হোয়াইটদের পশ্চাদ্বর্তনের পথ যেই বন্ধ হয়েছে অমনি মেশিনগান নিয়ে লরীর পর লরী ছুটল শত্রুসারির মাঝখানে। তারপর একেবারে খাণ্ডবদাহন।

॥ আট ॥

ছোট্ট উঠোনের মাঝখানে ওষুধপত্রের লেবেল আঁটা একটা বাক্স—তার ওপর বসে আছে দাশা। একটু আগেই ঠান্ডা জলে হাত ঘষেছিল, তাই হাত দুখানি লাল। চোখ বুঁজে কোলের ওপর হাত রেখে দাশা মুখটি তুলে ধরেছে অক্টোবর-সূর্যের পানে। ছাতের ছায়াটার ওপারেই আকাসিয়া ঝোপ; ঝোপের নেড়া নেড়া ডালপালার ওপর কয়েকটি সুপুষ্ট চড়াই পাখী পালক ফুলিয়ে ঠোঁট দিয়ে ঘষে ঘষে পরিপাটি করে রাখছে। সাদা একতলা বাড়ীটার সামনের রাস্তায় পাখীগুলো খুব কষে যব খেয়েছে, ঘোড়ার লিদও সাবড়েছে—কে কত খেয়েছে এখন তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বড়াই করছে। এমন সময় কতকগুলো মালের গাড়ী এসে থামল, ওরা সবাই ভয় পেয়ে পাশের বার্চ গাছটার ডালে উড়ে গেল। চড়াই পাখীর কিচির মিচির শব্দ শুনে দাশার মনে হয় যেন গান শুনছে. ভারি মিষ্টি, সান্ত্বনার গান, নানা সুরে খালি একটি কথা ঃ যা ঘটে ঘটুক, আমরা কিন্তু হাল ছাড়ব না জীবনের।

ওর পরনে হাসপাতালের সাদা, রক্তলাগা সেমিজ, কপালের ওপর টাইট করে বাঁধা একটা তিন-কোণা রুমাল, তার প্রান্তভাগটা ঘাড়ের পেছনে ঝুলে আছে। গোলাবর্ষণের ফলে জানালার কাঁচটাচ সব ঝন-ঝন করে উঠত, এখন তা বন্ধ: এরোপ্লেন থেকে পড়ন্ত বোমার ফাঁকা বিস্ফোরণের শব্দও আর কাণে আসে না। গত দুদিনের বিভীষিকা কমে কমে এখন চড়াই পাখীর কিচির-মিচিরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই ক্ষুদে ক্ষুদে ডানাওয়ালা জীবগুলো খেয়ে দেয়ে পেট ফুলিয়ে যেভাবে মানুষকে তাচ্ছিল্য দেখায়—সত্যি, ভাবতে গেলে বেশ অপমানই লাগে। পাখীগুলো বলে ঃ কিচি-মিচি, কিচি-মিচি, চড়াই পাখী দেখতে ছোট কিন্তু বুদ্ধিতে বড়। আমরা গোবর গাদায় খুঁটে বেড়াই, মাদী চড়াইয়ের মাথার ওপর দিয়ে ডালে ডালে লাফিয়ে ফিরি, গান গেয়ে বিদায় জানাই অস্তাচলের সূর্যকে, আর তারপর ঘুম দিই সেই সকাল পর্যন্ত—জীবনের জ্ঞান-কান্ড সবই তো এর মধ্যে।

গেটের গোড়ায় গাড়ী থামে। সে শব্দ দাশার কাণে আসে।......আরও সব আহতদের নিয়ে এসে ভেতরে রাখছে। চোখের পাতা ভেদ করে লালচে আলো পৌঁছায়, কিন্তু দাশা এত ক্লান্ত যে চোখ খোলার চেষ্টাও করে না। যখন দরকার হবে ডাক্তারই ডেকে পাঠাবেন।......ভারী ভালো লোক ডাক্তারটি—গলার স্বর যদিও রুক্ষ, কিন্তু দৃষ্টি কী সদয়। “যান, এক্ষুনি উঠোনে চলে যান, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না”, বলে তিনি বকেছিলেন। “কি চেহারা হয়েছে আপনার।

যান কোথায় একটু বসুন গিয়ে। দরকার হলে ডেকে দেব'খুনি।" কত চমৎকার লোকই না আছে এ দুনিয়ায়, তা যাই বল বাপু! উনি যদি সিগ্রেট খেতে বাইরে আসেন তো বেশ হয়, ভাবল দাশা। তাহলে চড়াই পাখী নিয়ে এতক্ষণ ও যা তত্ত্বচিন্তা করল—ওটা বেশ গভীর তত্ত্ব বলে ভেবে ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—সে সব ওঁকে শোনাতে পারে। উনি যদি সত্যিই ওকে আকর্ষণীয় বলে মনে করেন, তাতে কিছু ক্ষতি আছে কি? দাশা একবার দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল, তারপর আর একবার বেশ জোরে। চকিতের জন্যেও যদি কেউ সহৃদয় দৃষ্টি তুলে ধরে, তবে অসহ্যও সহ্য করা যাবে। কারণ, মানুষের আত্মার যা কিছু শক্তি, নিজের ওপর যা কিছু বিশ্বাস সব যে তখন প্রাণ পেয়ে ওঠে।......নতুন করে আবার বাঁচা যায়। ওরে চড়াই, সে কথা তো তোরা বুঝবিনে......

কিন্তু ডাক্তার না; মাটির নীচের তলায় রান্নাঘরের ওধার থেকে বেরিয়ে এলেন আরেক জন—তাঁর মুখের চেহারা পাণ্ডুর সচকিত, চোখ দুটি করুণ। পরণে শিক্ষা বিভাগের সরকারী ইউনিফর্ম, তবে বন্ধনীটি এখন নেই। ইঁট বাঁধানো সিঁড়ির অর্ধেক দূর পর্যন্ত উঠে সরু গলাটা বাড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন। চড়াই পাখীর কিচির-মিচির ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

"কী ভয়ংকর!" বলে উঠলেন ভদ্রলোক। "একেবারে দুঃস্বপ্ন! বিকার।"

কানের ওপর হাত চাপা দিয়ে আবার তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলেন। নীচু, তেরছা সূর্য কিরণ পড়েছে ওঁর সরু হাড়-বার করা নাকের ওপর, ছেলেমানুষের মতো মুখটার ওপর।

"হায় ভগবান এর কি শেষ নেই? আপনি কখনো শব্দ-বিকারে ভুগেছেন?" আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন দাশাকে। "কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলেও চিনি আপনাকে।......যুদ্ধের আগে আপনাকে পিতার্সবুর্গে দেখেছি—সেই যে 'দার্শনিক সান্ধ্য মজলিস' বসত সেইখানে। তখন আপনার বয়স কম ছিল বটে, কিন্তু এখন আপনাকে দেখতে আরও ভাল লাগে, আরও আগ্রহ জাগে। দূরে যেন ধ্বস নেমেছে এমনিভাবে আরম্ভ হয় শব্দবিকার—প্রথমে শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু কী জোরেই না কাছে ছুটে আসে। তারপর কেমন একটা বেসুরো গুণ গুণ—যেন এ দুনিয়ার নয়—সেটা ক্রমেই চড়তে থাকে, শেষে মনে হয় কান, মাথা সব একেবারে শব্দে ভরে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি যে, ওটা আসলে কিছুই নয়, তবু শব্দটা যেন একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে।... মনে হবে এই নরকের বাজনা বুঝি আর কিছুতেই সহ্য করা যায় না, যায় না...... এমনি মনে হতে হতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ি, ব্যস বাঁচোয়া।......আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি—এ সব শেষ হবে কবে?"

রোদের দিকে পিঠ করে তিনি দাশার সামনে দাঁড়ালেন—সরু আঙুলগুলো টেনে টেনে মটকালেন।

"কাদা, খানিকটা কাদা যোগাড় করতে হবে আমাকে—কাদা দিয়ে উনুনটা সারাতে হবে—আমাদের নীচের তলায় হাঁকিয়ে দিয়েছে কিনা! বলেছে

আমরা নাকি 'গর-মেহনতী শ্রেণী'।......সারা জীবন হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন আমার বাবা, জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই বাড়ীটি করেছিলেন।......কিন্তু সে কথা ওদের বোঝান তো? নীচের তলাটায় যত পোড়া ইঁটের গাদা, জানালাগুলো একেবারে ফুটপাথের সঙ্গে লাগানো—তাও আবার এমন ময়লা যে আলোই আসে না। আমার বইপত্র সব এক কোণে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মার পঞ্চান্ন বছর বয়স, তায় বুকের অসুখ; আর বোনটা তো ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে হাঁটতেই পারে না। তার ওপর শীত আসছে......হায় ভগবান!"

দাশার মনে হয়, লোকটা এক এক ক'রে আঙুল ক'টা ছিঁড়ে ফেলবে না তো—সেই যে আর্ট থিয়েটারের 'ব্লু বার্ড' নাটকে 'চিনির' আত্মাপুরুষ যেমন ছিঁড়েছিল।

"যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না।......ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিক ফ্যাকাল্টি থেকে ডিগ্রী নিয়ে ডক্টরেট থীসিস প্রায় শেষ করেছিলাম।......এই হতচ্ছাড়া বিতিকিচ্ছিরি শহরে মেয়ে-স্কুলের মাস্টারীও করলাম তিন বছর ধরে-মা বোনের অসুখের জন্য এ শহর ছাড়ারও উপায় নেই।......আর এখন শুনতে হচ্ছে, যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না—কপালে এও ছিল! হাতে একটা কোদাল গুঁজে দিয়ে জবরদস্তি পাঠিয়ে দিল ট্রেঞ্চ খুঁড়তে, বল্ল কিনা বিপ্লবকে সেলাম করো। স্বাধীনতার ওপর পাশবিক অত্যাচার, তাই দেখেই সেলাম করো!......কড়াপড়া হাতের জয় হোক! কলুষিত বিজ্ঞানের জয় হোক। আর যদি না মানি? অভিজাত শ্রেণী কিংবা ধনিক শ্রেণীতে আমার জন্ম নয়, ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডেরও আমি মেম্বর নই নিশ্চয়। ছাত্র-মিছিল করতে গিয়ে ইঁট খেয়েছিলাম তার দাগ আজও রয়েছে। কিন্তু যে বিপ্লব আমাকে মাটির নীচে নির্বাসন দেয় সে বিপ্লবকে আমি সেলাম করতে চাইনে।......বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে বিজয়ীর দল পা ফেলে চলবে, আর তাদের পায়ের নীচে বসে ধুলোভরা জানলা দিয়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো—এইজন্যেই কি মস্তিষ্কে উৎকর্ষ সাধন করেছিলাম? আত্মহত্যা করার অধিকারও আমার নেই—মা বোনকে দেখতে হবে যে। স্বপ্নেই কি পরিত্রাণ আছে—কোথায় যাই! কোথায় লুকোই, কিছু ভেবে পাই না।......'পবিত্র শিখাটিকে চল আমরা বহন করে নিয়ে যাই!' কিন্তু কোথায়? নির্জন গুহা কি আর আছে পৃথিবীতে?......"

কথা না তো যেন খই ফুটছে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও ফিরছে ঘুর ঘুর ক'রে। ওঁর কথা শেষ পর্যন্ত শুনে যায় দাশা—বিস্ময় বা সহানুভূতি কোনো অনুভূতিই জাগে না। নীচের তলার রান্নাঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা এই স্নায়ুজর্জর লোকটা যেন গত ক'দিনের বিভীষিকার ছবিতে শেষ দাগ বুলিয়ে গেল—ক'দিনের কোলাহল আর অগ্নিবর্ষণ আর আহতের চীৎকারধ্বনির পর এ যেন অবশ্যম্ভাবী।

"আপনি কিজন্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক—কণ্ঠস্বরে তখন নিত্যকার বদমেজাজি সুর ফিরে এসেছে।

"শুধু কি নির্বুদ্ধিতার জন্যেই? না কি ভয়ে? না খিদের তাড়ায়? দুদিন ধরে আমি আপনাকে করছি তা বলেই রাখি; ভুলতে তো পারিনে, পিতার্সবুর্গে সেই 'দার্শনিক আড্ডায়' আপনাকে দেখে কী মুগ্ধ হয়ে থাকতাম; কিন্তু নীরবে আপনার কাছে যাবার কিংবা আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সাহস হয়নি কখনো।......ব্লকের 'অজ্ঞাত মহিলা'* যে রকম, আপনিও ছিলেন প্রায় সেই রকম......("প্রায় কেন?" ভাবে দাশা)। রূপকথার রাজকুমারী, বসে বসে শুধু সোনালি পর্দায় নক্সা আঁকবেন—তা না আপনি নোংরা সেমিজ পরে আহতদের ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছেন, হাত দুটোতে কড়া পড়িয়ে ফেলেছেন।...... কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! দেখে নিন, বিপ্লবের আসল রূপটা কি রকম দেখে নিন!"

হঠাৎ রাগে ফুলে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে দাশা বাড়ীর ভেতর চলে গেল—ফ্যাকাশে-মুখ স্নায়ুরোগীটাকে একটা কথাও জবাব দিল না। ভেতরে রোগী আর আয়োডোফর্মের অসুস্থ গন্ধ—তাজা হাওয়া থেকে সোজা ভেতরে আসায় মাথা একেবারে ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। প্রত্যেক ঘরেই আহত রোগী, এবড়ো খেবড়ো তক্তার খাটিয়ায় ঘেঁষা-ঘেঁষি করে শুয়ে আছে।

ডাক্তারকে দেখতে পেল অপারেশন ঘরে। ঘরটি ছিল মেয়ে স্কুলের সেই মাষ্টারের ঘর—বিতাড়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঐ ঘরে বসেই থিসিস লিখতেন।......ডাক্তার তখন হাওয়ায় হাত শুকোচ্ছিলেন, লোমশ হাত দুটি প্রায় কাঁধ পর্যন্ত খোলা। দাশাকে দেখে চোখ টিপলেন। চোখটা কটা।

"কি, একটু ঘুমিয়েছেন? একটা মনের মতো অপারেশন করলাম এই মাত্র —একটি ছেলের ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে চার মিটার আন্দাজ কেটে একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি।......মাস খানেকের মধ্যে ওকে নিয়ে বসে ভদকা খেতে পারব। আর দেখুন, একজন কমাণ্ডারকে নিয়ে এল এখুনি—ভীষণ শক লেগেছে।......ওর ওপর চালিয়েছি কর্পূর; এখনো জ্ঞান ফেরেনি, তবে হার্টটা ডিউটি দিচ্ছে ঠিকই।......নাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখবেন, যদি দেখেন দুর্বল হয়ে পড়েছে তাহলে আর এক দফা কর্পূর চালিয়ে দেবেন।......"

তোয়ালেখানা কাঁধে ফেলে তিনি দাশাকে একটা খাটের কাছে নিয়ে এলেন। খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে ইভান তেলেগিন। চোখটোখ এঁটে বন্ধ করা, মনে হয় কে বুঝি ওর চোখের ওপর ধাঁধালো আলো ফেলেছে। বিকৃত ভঙ্গিতে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপা। জ্ঞানহীন অবস্থা, বাঁ হাতটা বুকের ওপর পড়ে আছে। ডাক্তার সে হাতটা তুলে ধরলেন। নাড়ী দেখে তারপর কব্জিটা ধরে আস্তে নাড়া দিলেন।

"দেখুন এটা কেমন ঢিলে হয়ে এসেছে—একটু আগেও একেবারে টান টান ছিল।......মাঝে মাঝে শকের পরিচয় পাওয়া যায় অতি অদ্ভুত ধরনের।......

---

* এ. এ. ব্লক-এর একটি কবিতা

এ সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি।......শিশুদের আক্ষেপের নিয়ম আর এর নিয়ম প্রায় একই......কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী আকস্মিক চাপ সইতে পারে না......”

কথার মাঝখানে ডাক্তার থেমে পড়লেন—মৃদু শকের আঘাতে তিনি নিজেই এখন অভিভূত।......রোগশয্যার পাশে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না। ডাক্তার রোগীর হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলেন—সেই অচৈতন্য হাতের ওপর সে নিজের মুখটা চেপে ধরেছে।

॥ নয় ॥

হোটেলের আরামহীন শয়নকক্ষে একদিন সকালে ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিনের ঘুম ভাঙল। তখন বেশ বেলা হয়েছে। নোংরা জানলাটার ওপর কাগজ মারা, সে কাগজ কালক্রমে হলদে হয়ে এসেছে। খাটখানা ছোট, কম্বলটম্বল জরাজীর্ণ। ওর ট্রেন ছাড়বে সেই রাতের বেলা, সামনে পড়ে রয়েছে লম্বা, ফাঁকা দিনটা। বাক্সে সিগ্রেট আছে আর একটি। সিগ্রেটের গোড়াটা বুড়ো আঙুল আর সামনের আঙুলের মধ্যে চেপে ধরে ও তাতে আগুন ধরাল। পেশীবহুল, সরু হাতটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। হাতের চামড়া কেমন খসখসে হয়ে গেছে।......খুঁজে খুঁজেও কাতিয়ার কোনো খবর পায়নি রশচিন।......এদিকে ছুটিও ফুরিয়ে গেছে, এবার কুবানে ওর রেজিমেণ্টে ফিরে যেতে হবে। দুদিন পরে ট্রেন থেকে নেমে ব্রিচ্‌কা গাড়ীতে চাপবে। গাড়ীর ফৌজী গাড়োয়ানের সঙ্গে কথাটাও না বলে রশচিন গাড়ী ক'রে চলবে স্তেপের ওপর দিয়ে। গ্রামের বড় রাস্তার গর্তগুলো তখন বৃষ্টি-জলে ভর্তি—নভেম্বরের নিরর্থক বৃষ্টিজল। গর্তের মধ্যে বসে যাবে গাড়ীর চাকা। একেবারে কাদার ওপরই নেমে পড়ে ও ড্রাইভারকে বলবে—মালপত্র কুটিরে নিয়ে যাও। তারপর সদর দপ্তরের দিকে হেঁটে পাড়ি দেবে (আগেকার গ্রাম-পঞ্চায়েতেই সদর দপ্তরের আড্ডা), যাবে মেজর জেনারেল সুভেদের কাছে—তিনি রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার।

দেখবে, নিরেট জেনারেল সাহেব তখন ফিটফাট হয়ে বসে সিম্‌বলিস্টদের লেখা পড়ছেনঃ সলোগব্‌-এর 'অগ্নিচক্র', নয়তো গুমিলেভ-এর 'মুণিমুক্তা'। রিপোর্ট হয়ে গেলে ভাদিম পেত্রোভিচ একটা প্লেটুনের ভার পাবে। কম্প্যানিও পেতে পারে। আবার সেই পুরোনো বাঁধা গৎঃ ড্রিল, তারপর অফিসারদের মজলিস। মজলিসে সবাই খালি জিজ্ঞাসা করবে মদ আর মেয়েমানুষের কথা, ওর রোগা শরীর, পাকা চুল আর নিরানন্দ মুখভাব নিয়ে কত ঠাট্টা করবে। কুটীরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করে কাটবে সন্ধ্যাটা। দশটা বাজলে আর্দালি এসে চুপচাপ বুট খুলে দিয়ে যাবে।......এ রকম হতে পারে; কিংবা আর একটা সম্ভাবনাও আছে—হয়তো দেখবে যে রেজিমেণ্ট এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেছে, লড়াইয়ে নেমেছে।......

স্তূপীকৃত উত্তরে মেঘের ছায়ায় প্রাণহীন স্তেপের ছবিটা ও মনে মনে কল্পনা করেঃ ভস্মসাৎ বাড়ীঘরের ছাইগাদার মধ্যে থেকে রান্নাঘরের চিমনিগুলো মাথা জাগিয়েছে; গাড়ীঘোড়া সব পাঁকের মধ্যে—জখ্‌মি মানুষে ভর্তি; এখানে ওখানে ঘোড়ার লাশ; আর তারপর এই স্তেপের যা চূড়ান্ত নির্যাস সেই দৃশ্য—

পরিখায় পরিখায় মানুষ কিলবিল করছে, রক্তে-ভেজা কাপড়চোপড় আর মলমূত্রের মাঝখানে শুয়ে পড়ে আছে।......রশচিন ভাবতে চেষ্টা করল ঃ ও যেন এক পেশাদার আশাবাদী, কিংবা রোমান্টিক অদৃষ্টবাদী—সুপরিকল্পিত ঘৃণার উদাহরণই যেন ও স্থাপন করতে যাচ্ছে। কিন্তু সে ঘৃণার অনুভূতি লোপ পেয়েছে বহু দিন আগেই। মানুষের কথা ভাবলে ওর এখন শুধু বিরক্তি আসে, গা বমি বমি করে, আর কিচ্ছু বোধ হয় না।

বিছানার ওপর উঠে বসে শার্টের বোতাম নাড়তে নাড়তে পায়জামাটার খোঁজে ও হাত বাড়িয়ে দিল। সেটা মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল—তার পকেটে তামাক থাকতে পারে এই আশা। কিন্তু পায়জামা না তুলে আবার গড়িয়ে পড়ল বালিশের ওপর, মাথার নীচে হাত দুটো জোড় করে রাখল।

“এরকম ভাবে আর আমি চলতে পারিনে”, মৃদু স্বরে ও বল্ল। নিজের গলার শব্দে ওর নিজেরই রাগ ধরে, বলার ধরন দেখে নিজেরই গা ঘুলিয়ে ওঠে। “......কেন ‘পারিনে’? ‘পারিনে’ মানে কি? লোকে পারে না এমন জিনিস নেই! এমন কি, কোমরবন্ধের এক দিকটা দরজার হ্যান্ডেলে লাগিয়ে অন্য দিকটা দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া—তাও পারে।......নাও, নাও, রশচিন, সত্যি কথা বল! এত সব ঢং-ঢাং কেন বাপু? আর সবাইয়ের মতো তুমিও একটা আস্ত জানোয়ার।”

প্রতিশোধপরায়ণ উত্তেজনার সঙ্গে ও এবার মনে মনে পরিক্রমা শুরু করল—এখানে এই একাতেরিনোস্লাভে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারই পরিক্রমা; বাস্তু হারানোর অবিরাম লাঞ্ছনাচিহ্ন মুখে বয়ে কত নারী সম্ভ্রমের দীন লুণ্ঠনাবশেষ তবু আঁকড়ে থাকে, লক্ষ্যহীনভাবে ফেরে হোটেল থেকে হোটেলান্তরে, “কিনুন” বলে তুলে ধরে তুচ্ছ কিন্তু স্মৃতিধন্য কত টুকিটাকি জিনিসপত্র। সরকারী সম্পত্তির হুণ্ডী কেনাবেচায় যারা বিশেষজ্ঞ, সুপুষ্ট দেহ আর নীলাভ গাল নিয়ে যারা গাঁক গাঁক করে হেঁকে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে মাখামাখি, গলাগলি করেন জেনারেল সাহেবরা। তারপর হেঁড়ে-গলা পাড়াগেঁয়ে জমিদার বাবুরা—জমিদারী ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে এসেছেন, উদ্ভ্রান্ত স্ত্রী আর রোগা, মেচেতাপড়া, আশাহত কন্যাদের নিয়ে ঠেসেঠুসে ঢুকেছেন হোটেলের ঘরে; অনবরত কিছু কিছু ধার করেন আর হোটেলের রেস্তোরাঁয় চর্বচোষ্য আহার করেন—মফঃস্বলের কায়দায় খানা বানাবার তরকিব বাতলান বাবুর্চিকে; বিপ্লবকে এঁরা বলেন, ‘যাচ্ছেতাই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড’। গোলাপী আশার আমেজে দিনগুলি কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় তাঁদের কসুর নেই,—একেবারে চরম কালেও রুশ অভিজাত শ্রেণীর মন থেকে আশা তো কখনোও লোপ পায়নি। রশচিনের মনে পড়ে, হোটেলের সামনের হলে মানুষের জটলা—রকমারি মানুষ, তাদের সামাজিক মর্যাদা দ্রুত ক্ষীয়মান। শুধু মোহর-আঁকা বোতাম বা চুড়োতোলা টুপি দেখেই এখনো তাদের চেনা যায়; ঐ যে গুমুরে ছোকরাটা, বোধ হয় কোনো ভাগ্যবান মুনাফাখোরই হবে, তার কাছে জং-ধরা ঘড়িটা বেচতে চাইছেন ভদ্রলোক

—বোঝা যায় তিনি নিশ্চয়ই আগে সরকারী ব্যারিস্টার ট্যারিস্টার ছিলেন। আর এদিকে হাঁপানিগ্রস্ত পাকাচুল ভদ্রলোকটি লাঠি ভর করে দাঁড়িয়েছেন—এককালে উনি ছিলেন ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের বড়কর্তা। নিজের কাছে দামী জিনিস যা কিছু ছিল সে সব আগেই বিক্রি করে ফেলেছেন, এখন হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে শুধু ওদের আঙুলগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকেন—কত শাঁসালো লেনদেনের ব্যাপারে কী দারুণ কায়দায়ই না কড়কড়ে নোটগুলো ওরা নাড়াচাড়া করছে, চেয়ে চেয়ে তাই দেখেন। তারপর চটপটে মুনাফাবাজের দল, তাদের নিখুঁত বেশভূষা আর আঙুলে আঙুলে সঙ্কেত, চোখে চোখে সন্ধানী দৃষ্টি—তারা সদরদরজা দিয়ে আসে আর যায়, দল বেঁধে এক পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন সুরে ফিসফিস করে, তারপর দেবদূত মার্কারির মতো ডানায় ভর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় আবার; ওরা হ'ল বাণিজ্য আর সৌভাগ্যের দেবতা। হোটেলের হলে বসেই আপনি গবর্ণমেণ্ট-সাপ্লাইয়ের গতিবিধি ধরতে পারবেন, কিংবা কবে কোন মেশিন-তেলের ট্যাঙ্ক বে-পাত্তা হয়ে গেছে তারও হদিস্ খুঁজে পাবেন; ডলারের হালচালও ওখানেই জানা যাবে—পশ্চিম সীমান্তে ফরাসীরা আক্রমণ করল, না জার্মানরা, তারই ভিত্তিতে ডলারের বিনিময়-মূল্য ওঠে আর নামে দিনের মধ্যে কয়েক বার ক'রে।......কিন্তু এ হ'ল উচ্চাঙ্গের মুদ্রানীতি; ও সময়ে হলের ক্ষুদে ক্ষুদে ফাটকাবাজরা সব সরে দাঁড়ায়, অর্থজগতের রাঘববোয়ালদের দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

রাঘববোয়াল মহাশয় হলে ঢোকেন—গায়ে খুব লম্বা কোট, মাথায় ছুঁচলো টুপি নয়তো ট্রিলবি হ্যাট (একেবারে পেছন দিক পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হয়েছে), হাতে ছাতা, চিকণ দাড়িটি এসে পড়েছে শার্টের বুকের ওপর। এ দাড়ি মহাপবিত্র—ঘোরতর চিন্তায় মনকে কেন্দ্রীভূত করার সময় দাড়ির মালিক এর এক গাছি মাত্র চুল স্পর্শ করেন, মনন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্যে দাড়িগাছটিকে আস্তে আস্তে পাকিয়ে যান। উনি ভাবুক মানুষ—ওঁর চোখের মধ্যে পাবেন তীব্র আধ্যাত্মিক জীবনের অনুভূতি, অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীর সঙ্গে সে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই। পার্থিব উদ্যমের যা সারাৎসার, অর্থাৎ স্থায়ী কারেন্সী, তারই উত্থানপতনে কি কি উপাদান ক্রিয়া করে—দিন রাত তিনি শুধু তাই অন্বেষণ ও অনুধাবন করছেন, তারপর উপাদানগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়ে তুলছেন।

হোটেলের হলে আর চারপাশের রাস্তায় এক রকম খেলা চলে, মহা প্যাঁচালো খেলা। সরকারী হেতমান কর্তৃপক্ষ আর জার্মান দখলদার কমাণ্ড—দু-তরফ থেকেই এ খেলা নিষিদ্ধ। হোটেলের দরজা থেকে নিকটতম বাঁক পর্যন্ত যে বাঁধানো ফুটপাথটুকু তার ওপর খেলোয়াড়েরা অনবরত চলছে ফিরছে। চোখের ইঙ্গিতে বা আঙুলের সঙ্কেতে ওদের কেনাবেচা, মাঝে মাঝে দু' একটা কথাও বলে। কারো কাছে এক পয়সারও কারেন্সী পাবেন না, সে সব নিরাপদে কোথাও লুকানো আছে; এ শহরে কত কারেন্সী আছে তা কেউ জানেও না। বাট্টার হারে যা তফাৎ দাঁড়াবে সেটাই হল এ খেলার বাজি। হিসাবপত্র চুকিয়ে

দেওয়া হয় হেতমান ব্যাঙ্কনোটে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কেউ হয়তো লাখপতি হল, কেউবা লাখপতি থেকে পথের ভিখারী। যার বরাত ফেরে, সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সে গিয়ে বসে কাফের মধ্যে, এন্তার ওড়ায় কেক আর একর্ণ কফি। আর যে হারে, অশান্ত চিত্তে সে বুলেভারের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ঝরা পাতা আর ছেঁড়া কাগজ ওড়ানো শীতের হাওয়ায় তার লম্বা কোটের প্রান্ত দুলতে থাকে।

যে যে শহর বিপ্লবীদের হাত থেকে খসে পড়েছে তার প্রত্যেকটাতে লোভী, কোলাহলকারী মানুষের পাল গরু-ভেড়ার মত রব তুলে ফেরে, নিজেদের খেয়ালখুশী মাফিক খানা খায়, শরাপ ওড়ায়, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ করে, প্রতারণা চালায়, নয়তো ফাটকা খেলে। এই হোটেলে যারা বাস করে তারাও ওদেরই দলে; যারা ফুটপাথে গাদাগাদি করে, কাফে আর তামাকের দোকান আর জর্জিয়ান ভোজনালয়ে ভিড় জমায়—পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা চালায় আর পরস্পরের পকেট কাটে—তারাও ওদের দলে। এই জানোয়ারের পালগুলিকে রক্ষা করার জন্যেই বন্দুক বেয়নেটের আয়োজন, এদের জন্যেই প্রতিদিন নতুন নতুন শহর দখল করে আনতে হয় শত্রুর হাত থেকে; অখণ্ড, মহান, ঐক্যবদ্ধ রুশিয়াকে যে আজ বলশেভিক পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে মুক্ত করতে হচ্ছে সেও তো এদেরই জন্যে।

"সব মিথ্যে, সব ফক্কিকারি!" জোরে বলে ওঠে ভাদিম পেত্রোভিচ। "আচ্ছা, যদি সৈন্যদল ছেড়ে পালাই!"

কথাটা ও মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকে—জীবনে এই প্রথম বার নৈতিক সংযমের বাঁধন আলগা করে দিয়েছে। এতদিন যা জানত না, মনের ভেতর সেই গভীর নীচতার সন্ধান পেয়ে কেমন যেন পৈশাচিক তৃপ্তি অনুভব করে। সত্যি সত্যি হেসেই উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে। হঠাৎ অলৌকিক রহস্যের সন্ধান পেয়ে গেলে যে শক্তি অনুভব করা যায়, যে শক্তি বুঝতে পারা যায় প্রলোভনের কাছে প্রথম ধরা দেওয়ার সময়—সেই প্রচণ্ড শক্তিই ছিল ওর এই সব ভাবনা চিন্তার পেছনে।

"যে সব মহৎ জিনিষের জন্যে তুমি সারা জীবন ছুটলে, একবার, একটু থামলেও না, সে জিনিসগুলো কি? রুচিবান মনে করতে নিজেকে, বাস করতে সুসভ্য সমাজে, এমন কি মনের পরিসর বাড়াবার জন্যে রেজিমেণ্ট ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়েও গিয়েছিলে। ......যৌবনকালে কল্পনা করতে তুমি বুঝি 'যুদ্ধ আর শান্তি' উপন্যাসের আন্দ্রেই বল্‌কন্‌স্কি। সেই নৈতিক আবেগের তৃপ্তিকেই তুমি যথেষ্ট মনে করতে, ভাবতে তুমি একেবারে খাঁটি। নোংরা সন্দেহজনক কিছু দেখলেই বিরক্তিতে সরে দাঁড়াতে—যেভাবে নর্দমার কাছ থেকে লোকে সরে দাঁড়ায়। বিবাহিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলে মাত্র তিনবার; তাও তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা যেই সুরুচির শেষ পর্যায়ে পেঁছে গেল, থরোথরো কৌতূহল যখনি কামালিঙ্গনের গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হতে চল্ল—ঠিক তখনই সম্পর্কচ্ছেদ করলে তাদের সঙ্গে।......এখন এস, হিসেব চোকাও। এই নির্দোষ জীবন আর উন্নত আচরণ নিয়ে কোথায় এসে ঠেকেছ তুমি—? গৃহ-

দাহের পর তুমি আজ ভস্মাবশেষ মাত্র; ভেতরের মানুষটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, শুধু তার কঙ্কাল পড়ে আছে......!”

এম্‌নিভাবে হিসাবনিকাশ শেষ ক'রে ভাদিম পেত্রোভিচ খুব খুঁটিয়ে ভাবতে লাগল—সৈন্যদল ছেড়ে পালানোর উপায় কি? বিদেশে চলে যাব? কিন্তু পৃথিবীময়ই তো এখন যুদ্ধের দুর্ভোগ। সন্দেহজনক চেহারার বিদেশীদের খোঁজে গোয়েন্দা ঘুরছে সর্বত্র—বিদেশীদের ধরে ধরে জেলে পুরছে, তারপর ফাঁসিতে চড়াচ্ছে।......পৃথিবীর যেখানেই যাও, দেখতে পাবে হাসিখুশি ছেলেদের সব জাহাজে ওঠাচ্ছে। ছেলেরা আনন্দে গান গায়ঃ “জার্মান জানোয়ারগুলোকে সাবাড় করতে আর কতক্ষণ—তারপর বঁধু, তোমার কাছেই তো ফিরে আসছি।” তারপর মাঝ-সমুদ্রে টর্পেডোর ঘা খেয়ে হিমশীতল জলের মধ্যে আকুলিবিকুলি করে সেই জোয়ান ছেলের দল—জাহাজ আর নেই, জলের ওপর শুধু একটু তেল ভাসছে। ইয়োরোপে দেখঃ শববস্ত্রের মতো ফোলানো খাকি স্যুট প'রে কাতারে কাতারে অসংখ্য জোয়ান মার্চ ক'রে চলে—আশাহীন, প্রতিবাদহীন জড়ের মতো; তাদের যুঝতে হবে মেশিনগান আর ট্রেঞ্চ মর্টারের সঙ্গে, মাইন থ্রোয়ার আর ফ্লেম থ্রোয়ারের সঙ্গে—সামনে, পেছনে দুদিক থেকেই চলবে গুলী। নাঃ বিদেশে যাওয়ার ধারণাটা ছাড়তে হল। তার বদলে ধর ওদেসা গেলাম, পাসপোর্ট জাল করে নিয়ে কোনো খাবারের দোকানে ওয়েটারের কাজ পেলাম।......পেলে কি হবে, কারো না কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়, আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, “আরে রশ্‌চিন নাকি, সত্যি? আহা, কী দুঃখের কথা!” অল্পস্বল্প ফাটকা খেলব? চুরি করব এক-আধটু? না, ওতে প্রাণের জোর লাগে। স্ত্রীলোকের স্কন্ধে ভর করব? সে বয়স আর নেই! আচ্ছা ধর চূড়ান্ত জয় পর্যন্ত যে করেই হোক বেঁচেই রইলাম।...সোশ্যালিস্টরা ফাঁসিতে ঝুল্‌ল, মুঝিকগুলো চাবুক খেল—ইংরেজরা আমাদের কসুর মাফ করার পর একটু কিন্তু কিন্তু করেই, আবার না হয় আমরা শুধু করলাম। জার্মানদের হাঁকিয়ে দেবার জন্যে ভলগার ওপারে গিয়ে আর্মি গড়ে তুল্লাম, অস্ত্রশস্ত্র সব দেওয়া হল সৈন্যদের...তারপর হঠাৎ একদিন সৈন্যরা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল অফিসারদের বিরুদ্ধে—তখন? তখন আবার কেঁচে গণ্ডূষ। ওদিকে বেচারী কাতিয়া, কাতিয়া আমার, তাকে তো খুঁজে পাব না। ঘরদোর ভাঙ্গা; কোন্‌ দূর স্টেশন থেকে সে হয়তো শেষ আর্তনাদ তুলবে। ঘুমন্ত, বিকারগ্রস্ত, আর মৃত মানুষের ভিড়ের ভেতর থেকে ডাকবেঃ ‘ভাদিম! ভাদিম!’ তাহলে বাকী থাকছে শুধু একটি উপায়—গলায় দড়ি দেওয়া, এই মুহূর্তে।...ভয় করে? একটুও না! কিন্তু ও চেষ্টাও করতে হবে ভাবলে কেমন যেন অপমান লাগে...

ওর হাত দুখানা বরফের মতো হিম, ঘাড়ে হাত দিয়ে তা বেশ টের পায়। কিন্তু কোনো মীমাংসায়ই পৌঁছাতে পারে না। ক্ষুদে ক্ষুদে পোকার সার যেন সারা গায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, মাছির মতো; ওর ইচ্ছাশক্তি, ওর আত্মাটা পর্যন্ত

চুরি করে পালাচ্ছে।...অন্ধকার হয়ে গেলে উঠব, মনে মনে ও বল্ল, পাজামা পরে হে'টে স্টেশনে যাব, পথে হয়তো সিগ্রেটও কিন্‌ব।...থাকব, বে'চেই থাকব—আমার মতো মানুষকে তলোয়ারে কাটে না, বুলেটেও ছোঁয় না। এমন কি টাইফাসের উকুনও কামড়ায় না...

দুটি ক্রুদ্ধ পরুষ কণ্ঠে তুমুল ঝগড়া চলেছে অনেকক্ষণ ধরে, তার আওয়াজ আসছে। দেওয়ালের মাঝখানে যে দরজাটা আলমারি দিয়ে আটকানো, সেখান দিয়েই আসছিল আওয়াজটা। দুজনের একজন খালি চে'চিয়ে চে'চিয়ে উঠছেঃ "আরে শুনুন না মিঃ পাপ্‌রিকাকি, আমি যদি ভগবান হতাম...।" কিন্তু অন্য-জন ওকে আর শেষ করতে দেয় না, বাধা দিয়ে বলেঃ "আরে শোনো গাবেল, তুমি ভগবান নও, তুমি একটা গণ্ডমূর্খ! কাগজে বার হবার এক ঘণ্টা আগেই যে-লোক ক্রুপ ইস্পাতের শেয়ার কিনে ফেলে সে পাগল ছাড়া আর কি...।" "কিন্তু শুনুন, আমি তো বলিনি যে আমি ভগবান!" "শোনো গাবেল, যা লোকসান করালে আমার, তা তোমার যথাসর্বস্ব কেন, তোমার প্রাণ দিলেও মিটবে না।"

এই কথাবার্তার টুকরোটাকরা অংশ জবরদস্তি ভাদিম পেত্রোভিচের কাণে এসে ধাক্কা দেয়। "ধেৎ তেরি!" ও বলে মনে মনে, "দরজার ভেতর দিয়ে গুলী চালাতে ইচ্ছে করে।" কিন্তু হঠাৎ ছুটোছুটির শব্দ আসে, বারান্দাপথে ঢুকবার দরজাটার ওখানে উত্তেজিত গলার স্বর শোনা যায়ঃ "ডাক্তার, ডাক্তার ডাকো জল্‌দি!" "ডাক্তারে কি করবে? ওর দেহ তো হিম হয়ে গেছে।" "কি ব্যাপার? এমন হল কি করে?" "কি করে হল সে খোঁজে তোমার দরকার কি বাপু, চুপ থাক!"

স্বরগুলো থেমে আসে, তারপর বুটজুতোর কাঁটার শব্দ শোনা যায়।

"দেখুন ইনস্পেক্টর সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন, আচ্ছা উনি কি সত্যিই অস্ট্রিয়ান সম্রাটের ভাইপো?

"হ্যাঁ সত্যি! সব সত্যি। এখন আপনারা দয়া করে বারান্দাটা ছেড়ে দিন!"

তারপর একেবারে দরজার গায়ে চাপা সুরে দুজনের কথাবার্তাঃ

"না, আত্মহত্যা নয়। ওর নিজের এইড্‌-ই ওকে গুলি করে মেরেছে। ও বলশেভিক ছিল কিনা।"

"কি বলছ? অস্ট্রিয়ান অফিসার কখনো বলশেভিক হয়?"

"হবে না কেন? ওরা যে সর্বত্র।...শুধু ভিয়েনা নয়, বার্লিন পর্যন্ত ওদের দখলে এসেছে কাল থেকে..."

"হায় ভগবান! কথাটা যেন মাথায়ই ঢুকছে না!"

"হ্যাঁ—পালাতে হবে, আর কোনো পথ নেই।"

"যাবার জায়গাটা কোথায় বলতে পার?"

"খোদা জানে! কোনো দ্বীপ টীপ কোথাও..."

"ঠিক বলেছ!...কার কাছে যেন শুনলাম কালকে যে, ডাচ ইন্দোনেশিয়ায় অনেক দ্বীপ আছে—সে সব দ্বীপে নাকি রুটি-ফলের গাছও আছে। আর কাপড়চোপড় তো দরকারই হয় না। কিন্তু সে দেশে যায় কি ক'রে?"

হোটেলের বুটপালিশ ছোকরাটা—খাঁদা নাক আর আকর্ণবিস্তৃত মুখের হাঁ, দেখে মনে হয় সব সময়ই যেন দাঁত বার করে হাসছে—সেই ছোকরাটা হঠাৎ একেবারে কড়া না নেড়েই ঘরের মধ্যে ধেয়ে এল।

"ইস্পিশাল বেরিয়েছে! জার্মানিতে বিপ্লব! জার্মানিতে বিপ্লব! তিন রুবল সার!"

কাগজটা একেবারে রুশ্‌চিনের বুকের ওপর ছুড়ে দিল—সাহেবের চোখ দুটো যে জ্বলছে, মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সেদিকে ফিরেও চাইল না। "জানলার ওপর থেকে পয়সা নিয়ে নিচ্ছি। কাগজটা পড়ে দেখুন সাব!"

ঘরের বাইরে ছুট দিয়ে চলে গেল ছেলেটা। ভাদিম পেত্রোভিচের বুকে যেন হাতুড়ি পেটে, কিন্তু ঘন-ছাপা খবরের কাগজটা খোলে না. বুকের ওপরই পড়ে থাকে বহুক্ষণ।......জার্মানিতে বিপ্লব! গাড়ীর মাথায় চেপে চেপে সৈন্যেরা চলেছে, রেল স্টেশন-ফেশন সব চুরমার, মানুষের ভিড় আর উন্মাদ সংগীত, স্মৃতিস্তম্ভের ওপরে উঠে বক্তারা বক্তৃতা করছে, হাতের আক্ষেপে বাতাসকে যেন চিরে চিরে ফেলছে। তার সঙ্গে চীৎকার "স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!" ক্ষুধার অন্ন, নিজের দেশ, কর্তব্যের অনুভূতি—এ সবের জায়গায় যেন স্বাধীনতা বসিয়ে দিলেই চলবে! বহু শতাব্দীর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র—সে রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় জীবনের যে নিয়মিত গতি—তার বদলে যেন স্বাধীনতা বসিয়ে দেবে! বিপ্লব! নোংরা পথঘাট, পার্কে পার্কে আলুথালু মেয়ের দল।...বিস্ময়-বর্জিত শহর আর তার রৌদ্রবৃষ্টিজীর্ণ গৃহশীর্ষ—যে-মানুষ ঘরের জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে থাকবে, কী অবর্ণনীয় অপ্রসন্নতা তার অদৃষ্টে লেখা।... সূর্যটা পর্যন্ত যেন উঁচুতে উঠে যাবে, চোখে আর নাগাল পাবে না।... যে-মানুষ তার ব্যক্তিত্ব, তার স্বাধীনতা, তার দুঃখ আর অহংকার সারা জীবন ধ'রে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে চেয়েছে, প্রাণপণে চেয়েছে—তার জীবনে কী বিষণ্ণতাই না ছেয়ে যাবে।...

ভাদিম পেত্রোভিচের হঠাৎ খেয়াল হল সে নিজের সঙ্গেই বকে চলেছে। নাঃ এ যে একেবারে খোলা চোখে বিকারের ঘোর। খবরের কাগজটা খুলে ধরল ভাদিম। পাতা জুড়ে বড় বড় হরফে জার্মানিতে বিপ্লবের খবর। কম্পিয়েন বনের মধ্যে অস্ত্র সংবরণ সংক্রান্ত আলোচনার সংবাদ সর্বপ্রথমেঃ একটা আর্টিলারি সাইডিংয়ে জেনারেল ওয়েগাঁর ট্রেন—জার্মান প্রতিনিধিরা সেখানে এসে হাজির হন, জানতে চান ফরাসীরা কি প্রস্তাব দিচ্ছেন।

কিন্তু জেনারেল তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাননি, বসতেও বলেননি—অবিচল

আক্রোশের সঙ্গে জবাব দিয়েছেন, "আমার তো কোনো প্রস্তাব নেই।... জার্মানিকে আমরা হাত জোড় করিয়ে ছাড়ব।"

যে সব নেতার জন্যে জার্মানির আজ এই অপমান, সে সব নেতার পতন হয় সেইদিনই। বার্লিনে 'শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধি-সোবিয়েত' গড়ে ওঠে। স্পা শহরের সদর দপ্তর ছেড়ে চুপি চুপি হল্যান্ডে পালান কাইজার—সীমান্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ ফৌজের এক লেফটেনান্টের হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

ক' মিনিটের মধ্যেই ভাদিম পেত্রোভিচ কাপড়চোপড় সব পরে ফেল্ল, ওভারকোটের বেল্ট বাঁধল টাইট ক'রে, তারপর মাথায় টুপি চাড়িয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাগজটা আগাগোড়া আর একবার পড়ে নিল। এক তাড়া দোমড়ানো নোট পকেটে গুঁজে হোটেল থেকে পথে নামল।

একটা মোটাসোটা লোক. দেখলে মনে হয় যেন ডুবুরির খোলস থেকে কষ্টে-সৃষ্টে বেরিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে এল এইমাত্র,—সে লোকটা ঠিক তখনি হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। লাল মুখটা ফুলে উঠেছে, চোখের মণি দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মোটা, শুকনো ঠোঁট জোড়া খোলে আর বোজে, বার বার চীৎকার করেঃ "ক্রুপ ইস্পাত পাবেন আমার কাছে, ক্রুপ ইস্পাত।"......ওর চেয়েও নিরেট যদি কেউ থাকে, তাকেই খুঁজে বার করবার আকুল আগ্রহে বার বার পথিকদের দিকে চাইছে।...

হঠাৎ অস্ট্রিয়ান সৈন্যদের ধাক্কা লেগে লোকটা একেবারে দেওয়াল-সই। রাইফেল কাঁধে গ্রুপের পর গ্রুপ অস্ট্রিয়ান সৈন্য পার হয়ে যাচ্ছে, তাদের রাইফেলের মুখ নীচের দিকে।...এটা বিপ্লবের প্রতীক; বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই মানুষ আর মানুষের সঙ্গে হানাহানি করবে না, তারই ঘোষণা।... ছিপছিপে চেহারার একজন তরুণ অফিসার, মুখে রেশমের মতো নরম গোঁফ আর বাঁ কাঁধের বন্ধনীতে একটা লাল ফিতে গোঁজা—মাথা উঁচু করে সে ওদের পাশে পাশে পা ঠুকে ঠুকে চলেছে। তার মনের মধ্যে কিন্তু প্রচণ্ড টানাটানি, সুকুমার মুখশ্রীর কাতর ব্যঞ্জনায় সে টানাটানির ছায়া দেখা যায়। ছেলেটি ফৌজে ঢুকেছে যুদ্ধের সময়ে; আনকোরা নতুন পোশাকে তলোয়ার ঝন্‌ঝন্‌ করতে করতে হাস্যচপল ভিয়েনার রাস্তায় রাস্তায় (আহা কী চটুল সেখানকার মেয়েরা!) বাহার দিয়ে বেড়াবার কোনো সুযোগই হয়তো পায়নি। অদৃষ্টক্রমে ওকে এখন সৈন্য-কমিটির সভ্য হতে হয়েছে,—ওর অল্প বয়স আর মধুর স্বভাব দেখে সৈন্যরা ওকেই ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে। চারিদিক থেকে লোকের হিংসা আর উপহাসের দৃষ্টি মাথায় ক'রে ও এখন নিজের কম্প্যানী নিয়ে স্টেশনে চলেছে—ওরা এ শহর ছেড়ে যাবে।...আর ভিয়েনায়? সেখানে এখন বিশৃঙ্খলা আর অন্নাভাব, রাস্তায় রাস্তায় সেখানে এখন প্রতিরোধের বেড়া তুলেছে শ্রমিকরা।...

এই উদ্ধত ইয়োরোপীয়ানদের যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রশচিন।

এ দৃশ্য দেখে ওরও ভাল লাগে, প্রতিশোধ মেশানো ভাললাগা। “আহা-হা, বেশী দিন আর উক্রাইনের হাঁস মুরগি ধ্বংস করতে পেলে না।...আখেরে ব্রেস্তলিতভ্স্কের মজা তা হলে তেমন নয়, কি বল!” কিন্তু হঠাৎ ভ্রূভঙ্গী ক'রে ও থেমে গেলঃ “আরে বাপু, তাতে তোমার কি? মস্কোতে ওরা অবিশ্যি আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি, তোমাকে তো আবার সেই নোংরা ট্রেঞ্চের দুর্গন্ধই শুঁকতে হবে, তোমার প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে।”...ওঃ হো প্রতিবিপ্লবী কথাটা শেষকালে নিজেই মুখে আনল! শুধু তাই নয়, একেবারে সিনিকের মতো অবিচল ভঙ্গীতে কথাটা উচ্চারণ করল! ভাবতেই রশচিনের মুখটা আরও বিকৃত হয়ে উঠল।...ওর মনে যে আবেগের সংঘাত ঐ কথাটাই তো তার হেতু। ওর চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্দৃষ্টি কাতিয়ার—রস্তভে ওদের সেই ভীষণ ঝগড়ার সময় সে বলেছিলঃ “সমস্ত মন দিয়ে যদি তুমি অনুভব কর যে তোমার উদ্দেশ্যই ন্যায়সঙ্গত, তা হলে যাও, মানুষ মারোগে যাও।” প্রতিবিপ্লবী বলা আর বিশ্বাসঘাতক কিংবা বেইমান বলা একই কথা—এই তো ইমানদার বুদ্ধিজীবীদের চিরাচরিত ধারণা।......আজ এমন ধারা মনের ভাব নিয়ে ও বেঁচে থাকবে কি করে?

গ্রেট কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একাতেরিনিন্স্কি বুলভারের জমকালো পথ ধরে ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, মনে ভাবে চলার ভঙ্গীটাও যেন বেইমান বদমায়েসের মতোই—তেম্নি লেংচে লেংচে, পা ঘষে ঘষে। একটা নাপিতের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে, দরজার একপাশে সরু আয়নার মধ্যে ও নিজের চেহারাটা দেখতে পেল—অজান্তেই চাইল সে দিকে। আয়নায় প্রতিফলিত ওর মুখটা মৃত্যুর মতো বিবর্ণ—তিক্ত বিষণ্ণ মৃদু হাসি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। ভাদিম ভেতরে ঢুকল, গ্রেটকোট শুদ্ধই বসে পড়ল চেয়ারের ওপর। “দাড়ি কামাব!” এখানেও যা দেখে তাতেই বিতৃষ্ণা ধরে যায়ঃ ঘরটা নীচু, তার ওপরে গুমোট; খেলো ওয়াল পেপার, দেওয়ালের ওপর ফুলে উঠেছে; আর নাপিতটা নিজেই বা কি—খুশ্কিভরা চুলের মধ্যে চিরুণী গোঁজা, নরম তেলচিটে হাত, হাত থেকে একটা মাথা ঘোরানো মিষ্টি গন্ধ আসছে...

গাহকের দাড়ি কামানো শুরু করার জন্যে নাপিতের ব্যস্ততা নেই একটুও; সে শুধু সাবানে ফেনা তোলে আর বক বক করে চলেঃ

“গোদের ওপর আবার বিষফোঁড়া!...চার বছর ধ'রে তো লড়াই চল্ল, তারপর এখন আবার বিপ্লব নইলে নাকি চলবেই না।...ওরা সব ভাবছিল কি? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারত!” ক্ষুরটা খুলে সে এবার হিংস্রভাবে ধার দিতে শুরু করে। “ওদিকে উঁচুদরের রাজনীতি আর এদিকে আমাদের ছাপোষা ব্যবসা, দুয়ের মধ্যে যা তফাত তাই থেকে পার তো কামিয়ে খাও।” ঈষদুষ্ণ ফেনাটা এবার ভাদিম পেত্রোভিচের গালে মাখাতে শুরু করেছে। “আজ সারাদিনের মধ্যে আপনাকে দিয়েই বউনি। লোকের মাথা-টাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। কাইজার উইলহেল্ম পিঠটান দিলেন হল্যাণ্ডে, ব্যস্ অমনি এ শহরে কারও আর

দাড়ি কামাবার দরকার নেই। কেন জানেন? শুনুন বলি। বলশেভিক আর মাখনোর ভয়ে ওরা একেবারে তটস্থ—ভয়ে ভয়ে খোঁচাখোঁচা দাড়ি রাখছে, ভাবছে মজুরের মতো দেখাবে।” রশ্‌চিনের গালের ওপর খ্যাঁশ্‌ করে ক্ষুরটা চালায় এবার। “মাফ করবেন, আপনার নাকের ডগাটা ধরলে অসুবিধা হবে? কেউ কেউ ঐরকমই চায়। আমি কাজ শিখেছিলাম কুর্স্ক-এ। আমার ওস্তাদ একটু সেকেলে ধরনের—গাহকের মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিতেন, কিন্তু বাবুদের বেলায় আঙুল নয়, শশা। আঙুল দিয়ে দশ কোপেক, শশা দিয়ে বারো—হ্যাঁ তা তখনকার দিনের পক্ষে ন্যায্য দাম। আর একবার ক্ষুর টেনে দিই—দাঁড়ান না, অনেক সময় আছে। আপনি আসার ঠিক আগে একটা পাগল এসেছিল। পাপরিকাকি—চেনেন নাকি লোকটাকে? মস্ত বড় টাকার কুমীর। উত্তেজনার চোটে একেবারে তড়বড় করছে, কামানোই যায় না; তার ওপর গালে একটা ব্রণ, বুরুশ ছোঁয়ালেও ব্যথা পায়। ব্রণটা আজ সারা গায়ে বেরিয়ে গেছে, বেঁচেছে লোকটা। আহা, কী সুখবরই শোনাল আমাকে! বল্ল ঃ জার্মানরা উক্রাইন থেকে ডেরাডান্ডা তুলছে, বলশেভিকরা বেলগোরদমুখো চড়াও শুরু করেছে, আর বেলাইয়া ৎসারকভে নাকি এক নতুন উক্রাইনী সরকার কায়েম হয়েছে—তার নাম হল ডিরেক্টরেট। এর আগে রাদা দেখলাম, সোবিয়েৎ দেখলাম, হেৎমানও দেখলাম, কিন্তু ডিরেক্টরেট দেখিনি বটে। পেৎলুরা আর ভিন্নিচেংকো—এই দুজন ওর মাতব্বর। কিয়েভে আমার দোকানে ওঁরা গাহক ছিলেন, সেই ১৯১৬ সালে। জেম্‌স্ত্‌ভো ইউনিয়নে হিসেব রাখার কাজ করতেন পেৎলুরা; আর ভিন্নিচেংকো তো লেখক, ওঁর নাটক কতবার দেখেছি। অবিশ্যি এমন কিছু নাটক নয়। এই ধরুন ঃ অমুক মেয়েটা তমুক আর্টিস্টকে ধোঁকা দিল, বুঝলেন কিনা, লেগে গেল ঝগড়া—তারপর ভালবাসার লোক এল মেয়েটার কাছে, ব্যস্‌ তাকে নিয়ে ঘরে দরজা দিলেন মেমসাহেব। আর আর্টিস্ট, তার কান্ডকারখানাই আলাদা! ঘরে ঢুকে লোকটাকে হাঁকিয়ে দেবার ইচ্ছেও নেই, আবার ছুঁড়িটাকে ছাড়ারও ইচ্ছে নেই। বসে বসে খালি নিজের কব্জিই কামড়ায়, শিরাটিরা সব ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার। হাতটাকে চিরদিনের মতো অথর্ব বানিয়ে ফেল্ল মশাই—স্রেফ মেয়েটার ওপর রাগের ঝাল ঝাড়বার জন্যে। কতবার ভিন্নিচেংকোর দাড়ি কামিয়ে দিয়েছি—ওঁর চামড়াটা ছিল থলথলে, আর লোমের গর্তগুলো ইয়া বড় বড়। পাপরিকাকি বল্ল, ডিরেক্টরেট নাকি চাষীদের কাছে আপীল করেছে যে, হেৎমান স্করোপাদ্‌স্কিকে হাঁকিয়ে দিতে হবে।...বাস্তবিক হেৎমানের নিজের ঝামেলাও বড় কম নয়!”

ভাদিম পেত্রোভিচের দাড়িতে দ্বিতীয়বার ক্ষুর বোলানো হল। কিন্তু তার অপরিচ্ছন্ন, পাক-ধরা চুলের দিকে টেরা চোখে চেয়ে নাপিতমশায়ের মোটেই পছন্দ হয় না। “আসুন না আপনার চুল কেটে দিই—‘আল্লা বক্স’ কায়দায় কেটে দেব। বিলিতী কলপ এখনো আছে একটু আমার কাছে—‘দাঁড়কাকের ডানা’—যদি বলেন তো...। এক ঝাঁকড়া পাকা চুল রেখে লাভ কি?” (“একদম ন্যাড়া

করে দাও", দাঁতে দাঁত চেপে রশ্‌চিন বল্ল) "এই যে এক্ষুনি দিচ্ছি স্যর!" বলে কানের পাশে কাঁচিটাকে খোলে আর বোজায়, যেন পাঁয়তারা কষছে। "আপনাকে বলি কাপ্তেন সাহেব ঃ জীবনে আমার শুধু একটি সাধ আছে ঃ ছোট্ট কোনো শহর, রাস্তায় তেলের বাতি জ্বলে—এমন ধারা শহরেই থাকতে চাই। তা সে যত দূরে হোক ক্ষতি নেই। কি আর লাগে একটা মানুষের?... এই জনা বারো গাহক পেলেই ব্যস্‌। কাজ শেষ ক'রে পাইপটি ধরাব, তারপর দরজার চৌকাঠে বসে থাকব। না থাকবে অশান্তি, না থাকবে গোলমাল, আসবে যাবে শুধু বুড়োধুড়ো নিরীহ লোকজন। উঠে দাঁড়িয়ে তাদের নমস্কার করব, তারাও নমস্কার করবে। আজকাল আমাদের মতো সামান্য লোকের কথা কেউ ভাবে না, গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না। কিন্তু আমরা যদি না থাকতাম তাহলে—তাহলে আপনার ঐ ঝাঁকড়া পাকা চুল বাড়তেই থাকত। একবার চেয়ে দেখুন—যখন দোকানে এলেন কী ছিরি নিয়ে এসেছিলেন, আর এখন কেমন খোলতাই করে দিয়েছি বলুন তো!"

আয়নায় নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখল রশ্‌চিন। চকচকে ন্যাড়া মাথাটার বৈশিষ্ট্য আছে, বড় দরের চিন্তা-ভাবনা রাখার পক্ষে প্রচুর জায়গা। গালের হাড় দুটো সামান্য উঁচু। ঐ হাড় থেকে শুরু করে একেবারে থুতনি পর্যন্ত অতি মোলায়েমভাবে ছুঁচলো হয়ে এসেছে সরু মুখখানা। আর থুতনি, সেটা খুব দৃঢ় না হতে পারে, তা বলে দুর্বল কোনো মতেই বলা চলে না। নাকের মাঝখানটায় সংকুচিত ঘন ভ্রূজোড়া কী খেয়ালে যেন রগের দিকে এগিয়ে গেছে, তার ফলে ছোট ছোট চোখ দুটির কঠোরতা একটু কমেছে। ফোলা ফোলা চোখের মণি, তাই চোখ দুটো দেখলে কালো বলেই মনে হয়। তবে এ চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। হুঃ, কি এমন খারাপ চেহারা বাপু, অত লজ্জা পাওয়ার কি আছে? তবে ঐ মুখটা, হ্যাঁ মুখটাই সর্বনাশ করেছে। চোখ দুটো ধোঁকা দিতে পারে, মিথ্যা রহস্য সৃষ্টি করতে পারে—কিন্তু মুখটা তো বদলানো যাবে না।...দেখ না একবার, ছিরিছাঁদ কিছু নেই অথচ নড়ছে অনবরত—ঠিক যেন খোলাছাড়া শামুক।......বিতিকিচ্ছিরি! ফাউস্ট হওয়া তোমার কর্ম নয়, বুঝলে ভাদিম পেত্রোভিচ...

ও উঠে পড়ল। বুলেটচিহ্নিত নোংরা ফীল্ড টুপিটা বাঁকা ক'রে মাথায় চড়িয়ে নাপিতকে ভাল রকম বখশিস দিল, তারপর বেরিয়ে গেল।...তখনও কিছু স্থির করতে পারেনি...কিন্তু পা-টা তখন আর নড়বড়ে মনে হয় না, খোয়াতে হোঁচটও খায় না। খেউরি হওয়ার পর মানুষের কী পরিবর্তন হয় দেখ তো! হতাশার গভীর অন্ধকার ভেদ করে ওর মনের মধ্যে তখন আত্মমর্যাদার একটুখানি অনুভূতি প্রবেশ করতে পেরেছে।

জানলায় জানলায় আলো জ্বলে ওঠে। পত্রহীন পপলার গাছের মধ্যে দিয়ে হা-হা ক'রে হাওয়া বয়ে যায়। গাছগুলোর মাথা তখন অন্ধকারে মিশে গেছে। রাস্তার ওপারে গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে একটা জোর আলো পড়েছে। সে

আলোয় 'বি-বা-বে' 'রেস্তোরাঁ-কাবারের' দরজা দেখা যায়, অদ্ভুত রং দরজাটার। রেস্তোরাঁটার নামডাক আছে, জর্জিয়ান কায়দার 'মাট্‌ন্‌ গ্রিল্‌'-এর জন্যে বিখ্যাত। খাবারের কথা ভাবতে ভাদিম পেত্রোভিচের পেটটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, কাল থেকে কিছু খায়নি। ক্ষুধার অনুভূতিটা বেশ জোরালো, জীবন্ত; অনুভূতিটা জেগে উঠতে উঠতেই ওর মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা সব দূরে ঠেলে দিল। দৃঢ়চিত্তে ও পা বাড়াল আলো-ঝলমল দরজার দিকে। ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় গাছের কাছ থেকে এগিয়ে এল শাদা ঘাগরাপরা অদ্ভুতদর্শন একটি প্রাণী, ওর পথ আটকাবার চেষ্টা করল। চলে যেতে যেতেও ভাদিম শুনল পেছন থেকে প্রাণীটির চাপা গলার কাতর শব্দ আসছে ঃ "এস না গো অফিসার, আমার সঙ্গে গেলে খুব মজা পাবে!"

একটা লম্বা নীচু ঘরে 'বি-বা-বো' কাবারে। সম্প্রতি ঘরটাকে চিত্রবিচিত্র করে সাজিয়েছেন ভালেৎ, তিনি এক বিখ্যাত 'বামপন্থী' শিল্পী, পেত্রোগ্রাদ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন। ছাতের নীচু সীলিংয়ে কালো রং, তার ওপর কাটা কাগজের রুপোলী তারা। নর বা নারীদেহের চতুর্ভুজ প্রহসনের মতো কতকগুলো ছায়ামূর্তি দেওয়ালে আঁকা—কোনোটা হলদে, কোনোটা জর্দা, কোনোটা বা ইট রংয়ের। দেখলে মনে হয় সেগুলোকে যেন ঝড়ে তাড়া করেছে, পাগলের মতো হাত পা ছড়িয়ে কালো দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুটছে। রেস্তোরাঁর পক্ষে প্রাচীরচিত্রগুলি খুবই গুরুগম্ভীর—দেওয়ালের ওপর উলঙ্গ মানুষগুলো তো কামোত্তেজনায় ছুটছে না, ছুটছে আতঙ্কে। যে পুঁজিদার ভদ্রলোক এই কারবারে টাকা খাটিয়েছেন—আমাদের সেই পাপরিকাকি—তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল ঃ "এই রং-জোবড়ানো ছবির মানে বোঝে কোন্‌ শালা, আমার তো দেখেই মাথা ঘুরছে—কিন্তু লোকে এগুলো পছন্দ করে......"

খাওয়ার পর মদ নিয়ে বসে রইল রশ্‌চিন। ওর ট্রেন ছাড়বে সকাল চারটেয়। ঠিক করল তিনটে পর্যন্ত রেস্তোরাঁয় বসে থাকবে—তারপর দেখা যাবে কেমন লাগে।.........ঈষৎ গরমের আমেজে ওর মেজাজ বেশ শরীফ, মাথার মধ্যে সামান্য একটু ভোঁ ভোঁ করছে।

মস্কোর স্বর্গ 'ইয়ার রেস্তোরাঁ' আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তবু তাতার ওয়েটারটা এসেছে সেখান থেকেই। লোকটা অনবরত ওর টেবিলে এসে শ্যাম্পেনের বালতি থেকে বোতল বার করে, আর মদ ঢালবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকে ঃ

"আপনার কাছে এতবার আসছি, কিছু মনে করবেন ভাদিম পেত্রোভিচ।...... মস্কোর কথা মনে আছে? আ-হা! আর এখানে কিভাবে থাকতে হচ্ছে দেখছেন তো! উঃ কী বিতিকিচ্ছিরি লোক সব, ঘুমের মধ্যেও গা রি-রি করে ওঠে।......"

শহরের হাওয়ায় হাওয়ায় উদ্বেগ। দূরে অলিগলির অন্ধকারে মাঝে মাঝে

বন্দুকের শব্দ হয়, কিন্তু হেৎমানের সওয়ার-পুলিশ সে শব্দ শুনেও শোনে না, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় লাটসাহেবের বাড়ির দিকে। এদিকে আজ আবার ব্ল্যাক-মার্কেটে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও রেস্তোরাঁ একেবারে জমজমাট। কাবারের নাচগান তখনও আরম্ভ হয়নি। একটা রোগা প্যাকাটে ছোকরা, ঘাড়টা বকের মতো, পাতলা চুলগুলো ঢেউ খেলিয়ে পেছন দিকে নেমে গেছে—ছোট্ট স্টেজের ওপর পিয়ানো নিয়ে বসেছে। পাঁচমিশেলী কমেডির সুর বাজাচ্ছে।

রশ্‌চিনের টেবিলের চারধারে হট্টগোল আর মাতালের হল্লা। পাড়াগেঁয়ে জমিদারবাবুদের অনেকেই এখন আর হোটেল-জীবনের একঘেয়েমি সহ্য করতে পারছেন না, কন্যারত্নগুলির হা-হুতাশও অসহ্য লাগছে—তাই এখানে বসে তাঁরা মন ঠাণ্ডা করছেন, বাটি বাটি ভদ্‌কা পার করছেন......

এক ভদ্রলোক, গায়ের রং পীচ ফলের মতো লাল টকটকে, তিনি মন্তব্য করলেনঃ "জার্মানদের এবার বারোটা বেজেছে, আলবাৎ বেজেছে! নতুন বছর পড়তে না পড়তে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী মস্কো পৌঁছে যাবে দেখে নেবেন। তখন সবাই মিলে স্কচ হুইস্কি খাওয়া যাবে। আরে বাবা, মন্দের মধ্যেও কিছু ভাল থাকেই।" সুঠাম দন্তপংক্তি বিকশিত করে ভদ্রমহোদয় হেসে উঠলেন। "তাহলে, জার্মান বিপ্লবেরই জিন্দাবাদ করা যেতে পারে, কি বলেন!"

কোটরগত চোখে ব্যঙ্গের ঝিলিক মেরে আর এক ভদ্রলোক হাত তুল্লেন মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। তাঁর দেহটি কাঠির মতো কিন্তু সাজসজ্জা অতি পরিপাটি। বল্লেনঃ

"সবাই নিশ্চয় জানেন, হাউস অফ লর্ডস্‌-এ লর্ড চ্যান্সেলার মশাই বসেন পশমের বস্তার ওপর—স্রেফ সাদাসিধে বস্তা, বুঝেছেন।......কিন্তু সিমবির্স্কে এসেম্বলির সামনে উঠোনে যে শ্বেতপাথরের স্তম্ভ আছে তাই দেখিয়ে আমাদের সিমবির্স্কওয়ালা অভিজাত বাবুরা গর্ব করে বলতেন, কালান্তর পর্যন্ত নাকি তাঁদের বনিয়াদ কেউ টলাতে পারবে না। বলতেন আর বার্ডক গাছের ছায়ায় বসে দিব্যি আরামে ঢুলতেন।......কিন্তু রুশ অভিজাতদের দিন যে এবার ফুরোলো—পশমের বস্তা ছিল না বলেই ফুরোলো। তেমনি আমাদের 'রুশিয়া মায়ের' দিনও ফুরিয়েছে, বুঝলেন মশাইরা।...'গলুপভের নগরীর গল্পে' শেষ পৃষ্ঠাও আজ সাঙ্গ, বাতিল হয়ে গেছে বইটা। জনৈক মহাপণ্ডিত অবিশ্যি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এসব ব্যাপার ঘটবে রবিবারে ঝড়বিদ্যুতের মধ্যে—কিন্তু তা হয়নি। ঈশ্বর থুঃ করলেন, ব্যস বুং করে বাতি নিভে গেল।......যা সামান্য জমিজমা ছিল বিক্রী করে দিয়েছি সেই চোদ্দ সালে—তখন থেকেই আমি সারা পৃথিবীর নাগরিক।...... ঐ পথই সব চেয়ে নিরাপদ......"

"আরে ভাই, আপনি অক্সফোর্ড-ফেরতা, আপনার পক্ষে ওসব সাজে। কিন্তু তিন তিনটি কন্যা নিয়ে আমি কি করি? যাই কোথায়?"

গোলাপী গালওয়ালা ভদ্রলোক সশব্দে নিশ্বাস ফেলে পানপাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। "হুঁ, আর ঐ যে বল্লেন রুশিয়ার কর্ম কাবার, ও কথাটাও আমি

মানতে পারছিনে—ইংরেজী শিখে বদহজম হয়েছে বলেই আপনি ওসব কথা বলছেন। না হয় নায়েব-গোমস্তার চাকরি করব, কিংবা তিন একর জমিতেই নিজের হাতে চাষ করে চালাব—তা বলে রুশিয়ার প্রতি আমার বিশ্বাস তো ছাড়তে পারব না!”

এক গ্লাস ভদকা ঢাললেন, তারপর পাশের ভদ্রলোকের দিকে বপুখানি ঘুরিয়ে নিলেনঃ “ওদের নিয়ে কি করি বলুন? লম্বা তালগাছের মতো, পিজবোর্ডের মতো ফ্ল্যাট, মুখে মেচেতা, মনে সেণ্টিমেণ্টাল—ঠিক যেন তুর্গেনিভের নভেলের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে—তা আবার আজকালকার দিনে! ওদের গর্ভধারিণীর জন্যেই তো সব, তবে আমারও কিছু দোষ আছে স্বীকার করি। ‘মহিলা উচ্চশিক্ষা স্কুলে’ যেতে চেয়েছিল বড় মেয়েটি, আমরাই বারণ করলাম—তবে ও যা কুঁড়ে, গেলেও কিছু হত না।...আর ছোটটি তো একেবারে থিয়েটারের জন্য পাগল, সত্যি ও ফার্স্ট ক্লাস অভিনেত্রী হতে পারত।......কী আহাম্মকি, আমরাই ওকে ফিরিয়ে আনলাম, তার জন্যে ভয় দেখাতে পর্যন্ত কসুর করিনি। মানে বাপের প্রতাপ দেখিয়ে ছাড়লাম—এই বিংশ শতাব্দীতে! আমাদেরই অপরিণামদর্শিতা, আর কি? পশমের বস্তায় বসে থেকে ইংরেজরা তিন তিন বছর পর্যন্ত ভবিষ্যত দেখে রাখে, সে কথা সত্যি।......আর আমরা দেখি—এ ঋতু থেকে ও ঋতু, ব্যস।” গেলাসটা পার করে দিলেন, গলচর্ম কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে মন্তব্য যোগ করলেনঃ “তবে যাহোক করে উতরে যাব আমরা, সব ঠিক হো যায়গা।”

খাবার টেবিলে তৃতীয় ব্যক্তিটি নেশায় একেবারে চুর—সে শুধু দাঁত কিড়মিড় করে আর টেবিলের ওপর ফুলদান থেকে অ্যাস্টার ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খায়। চারপাশের কথাবার্তা সে কিছুই শোনেনি—ঘোলাটে চোখ মেলে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে শুধু পাশের টেবিলের দিকে। সে টেবিলে বসেছে একটি সুন্দরী মেয়ে, মাথায় সোনালি চুলে প্লেন খোঁপা বাঁধা—আর তার সামনে আধা-মিলিটারি পোষাক পরা এক দীর্ঘকায় যুবক। আশেপাশের লোকগুলি যেন ছায়ামূর্তি মাত্র—যুবকটি তাদের খেয়ালের মধ্যেও আনে না, হাতের ওপর গাল রেখে নীরবে শুধু কাঁদে আর কাঁদে। নীলনয়না মেয়েটার সুগোল মুখখানি উদ্বেগে কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে; ছেলেটির হাতে সে আস্তে আস্তে হাত বুলোয়, আর মাঝে মাঝে তার হাতটা তুলে নিয়ে চুমু এঁকে দেয়; যুবকটির গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত, সচকিত সুরে ফিসফিস করে কি যেন বলে। যুবক ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ায়, ঘুমের ঘোরে কথা বলার মত একঘেয়ে, নিস্তেজ সুরে জবাব দেয়। ওর জবাবটা রশচিনের কানে এলঃ

“আমাকে ছেড়ে দাও জেনা, ঘাঁটিও না! আমার আর কিছু দরকার নেই, কাউকে দরকার নেই—না তোমাকে না নিজেকে।”

ও কথা ওর না বল্লেও চলত—রাত্রিটা ওর কেমন কাটবে তা বোঝাই যাচ্ছিল।

মেয়েটির মধ্যে কী যেন দেখে ভাদিমের কাতিয়ার কথা মনে পড়ল—মেয়েটির মুখ নয় তার মৃদু, স্নেহার্দ্র ভঙ্গী দেখেই মনে পড়ল।...,কোথায় কোন্ রেলওয়ে জংশনে টাইফাস রোগে লোক মরছে. ওরও হয়তো সেখানেই দিন ফুরোবে।...দুটি

বাচ্চা ছোকরা ভেতরে এসে তাড়াতাড়ি একটা খালি টেবিলে বসে পড়ল, যুগলমূর্তি আড়াল হয়ে গেল। ছোকরা দুজনেরই সিধে তেড়ী, পোকাপড়া দাঁত, আর ময়লা আঙুলে হীরের আংটি।...ওদের একজন গর্ব করে অপরজনকে বলছে, "মারুসিয়া শালা এক ডাণ্ডায় একেবারে কাত, তারপর পায়ের তলে পিষে পিষে মাগীর হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে দিয়েছি।......"

"আপনার টেবিলে বসতে পারি, কাপ্তেন সাহেব?"

রশচিন নীরবে ঘাড় হেলায়। ইস্পাত ফ্রেমের চশমাপরা একটা লোক এসে বসল, গোবদা গোবদা পা দুখানা গুঁজে দিল চেয়ারের নীচে। তার পরণে জার্মান ল্যাণ্ডস্টার্ম বাহিনীর সবুজাভ ছাই রংয়ের টাইট উর্দি। ভাঙাভাঙা রুশ ভাষায় ওয়েটারকে বল্লঃ

"আমাকে কিছু খাবার দাও—কত কাল যে খাইনি। আর বীয়ার আনো, বীয়ার!"

রোগা গাল ফুলিয়ে দেখিয়ে দিল কি ভাবে বীয়ার টানবে, দিয়ে হাসল। ওর নীল চোখ দুটো পাখীর চোখের মত নির্বিকার। সেই চোখ থেকে বিস্ময়ের দৃষ্টি হানল গোমড়া-মুখ রশ্‌চিনের দিকে।

"কাপ্তেন সাহেব কি জার্মান জানেন?"

"জানি।"

"আমি থাকতে কি আপনার অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে না হয় অন্য টেবিলে যাই।"

"উঁহুঁ, অসুবিধা হচ্ছে না।"

এবারে রশ্‌চিনের জবাবটা তত কর্কশ নয়। এক ধরণের লম্বাটে মুখ আছে জার্মানদের—মুখের হাঁ-টা ছোট, ভেতরে ঢোকা—বুড়ো বয়স পর্যন্ত সে মুখের ছেলেমানুষী ভাব আর লালচে আভা অক্ষুণ্ণ থাকে—ল্যাণ্ডস্টার্ম সিপাইটির মুখও সেই ধরণের। নাকটা সামান্য ওপর দিকে বাঁকানো, যেন সমস্ত মানুষের প্রতি সহৃদয় কৌতূহল অনুভব করছে।

"আমরা সেপাই, আমাদের রেস্তোরাঁয় যাওয়ার হুকুম ছিল না", সে বল্ল। "কিন্তু কাল থেকে জার্মান ডিসিপ্লিনের সুবুদ্ধি হয়েছে।"

রশচিনের মুখে বিষণ্ণ হাসি। জার্মান সেপাই তার ধারণাটা আরও সবিস্তার ব্যাখ্যা করল, তাড়াতাড়ি। কড়া নখওলা তর্জনীটা মতাভিমানী পণ্ডিতের মত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথার ওপর জোর দিলঃ

"নিয়ম-শৃঙ্খলা যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তবেই তা সামাজিক ব্যবস্থাকে রূপ দিতে পারে, প্রগতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে পারে। গভীর সামাজিক আন্দোলন থেকেই এই রকম যুক্তিসঙ্গত শৃঙ্খলার জন্ম। কিন্তু শৃঙ্খলা যদি শুধু বাধ্যতা আদায়ের যন্ত্র হয় তাহলে তাকে আর শৃঙ্খলা বলা চলে না......"

ওর ধারণাগুলো খানিকটা অস্পষ্ট। তবু ব্যাখ্যা শেষ করে ও খুশী মুখে মাথা নাড়াল।

"আপনারা কি সব জার্মানি চলে যাচ্ছেন?" জিজ্ঞাসা করে রশ্‌চিন।

"হ্যাঁ। আমাদের ইউনিট একটা কমিটি নির্বাচন করেছে। একটা প্রস্তাবও নিয়েছে—নীতির সঙ্গে সে প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে তা আমি আনন্দের সঙ্গেই বলছি। অবিশ্যি তার জন্যে যথেষ্ট যুঝতে হয়েছিল।"

"বেশ বেশ। একটা রুশ বচন শোনাই আপনাকে: 'আচ্ছা, তাহলে আমরা আর আপনাদের ধ'রে রাখব না'।"

"আমি একটু একটু রুশ শিখেছি—কথাটার মানে তো 'এখান থেকে এখুনি দূর হও'......!"

"হ্যাঁ ঐ রকমই।......আপনি তো বেশ বোঝেন-সোঝেন দেখছি, তাহলে আর ভান করার কি দরকার? শত্রু হিসেবে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এখন শত্রুর মতোই বিদায় নিন......"

"হুঁ, তা,", চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে সিপাহী বল্ল, "সে কথা অস্বীকার করে লাভ হবে না।—বরং বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হবে।"

পাতলা ঠোঁটে আর একবার মৃদু হেসে বিষয়টা ও সাঙ্গ করে দিল। ওর সামনে খাবার আর বীয়ার হাজির। কিছুক্ষণ কথাবার্তা কইতে পারবে না বলে মাফ চেয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে ও একটা গ্রিল্ করা মাট্ন্ (শাশলিক) নিয়ে শুরু করল। মাংসের প্রত্যেকটা টুকরো, তার সঙ্গে প্রতি গ্রাস শাদা রুটি আর গ্রিল্-টমাটো এমন ক'রে চিবোয় দেখলে মনে হয়, যেন ভক্তিভরে সেগুলোর পুজো করছে।

"খাসা জিনিস", সিপাহী বল্ল। রশাচিনের ক্রুদ্ধ, অন্ধকার চোখ দেখে ও একটু অস্বস্তি বোধ করছে। খুঁটে খুঁটে শেষ টুকরো পর্যন্ত সব শেষ করল। এক চিল্তে রুটি ঘষতে ঘষতে প্লেটটা যখন একেবারে ঝক্ঝক্ করে উঠল, তখন রুটির চিল্তেটা গপ করে মুখে পুরে দিল। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে ধীরে ধীরে পান করল—চোখ দুটো আধ বোজা।

"আমরা জার্মানরা খাওয়াদাওয়া নিয়ে মোটেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিনে। উপোস করতে কী কষ্ট তা জার্মানরা দেখেছে, বোধহয় আরও কিছু দিন দেখবে। খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে তারপর।"

লম্বা তর্জনীটা আবার উঠলঃ

"ইতিহাসের তখন প্রভাত বেলা। আদিম কায়দায় প্রকৃতির দান কুড়িয়ে বেড়াবার বদলে মানুষজাতি তখন প্রকৃতির হাত থেকে সে দান ছিনিয়ে নেবার অবস্থায় চলেছে। সে সময় খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠিন, আর বিপদজনক। খাওয়াটা তখন থেকেই এক পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেউ খেয়েছে, তার মানে সে অপরের জীবন, অপরের শক্তি অধিকার করেছে। যাদুমন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করার ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রজালের ধারণা—ঐখান থেকেই তার উৎপত্তি। সমস্ত রকম রহস্যবাদী ধর্মাচারের মূলে আছে আহার গ্রহণের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান। ভগবানের দেহ আহার করা হয়। প্যানকেক-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে একবার এক রুশ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়ে-

ছিল—ভারী কৌতূহলজনক সে আলাপ, নোট ক'রে রেখে দিয়েছি। সূর্য-ভক্ষণের পরব হচ্ছে শ্রোভ্‌টাইড। প্রথমে নৃত্যানুষ্ঠানের সাহায্যে সূর্যকে সম্মোহিত করা হত, তারপর প্যানকেকের আকারে তার প্রতিমূর্তি আহার করা হত। মনোবিজ্ঞান আলোচনায় স্লাভ্ জাতির লক্ষ্য বরাবরই খুব উঁচু, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।" হাসতে হাসতে সিপাহী তার জামার ধাতুনির্মিত বোতাম খুলে একটা মোটা নোটবই বার করে আনল। ঘষা চামড়ার বাঁধাই নোটবইটা; মাস দুই আগে রেলে চলার সময় 'আমিয়ানাস মার্সেল্লিনাস' থেকে একটা অংশ কাতিয়া রুশ্‌চিনকে পড়ে শোনাবার জন্যে সে এই নোটবইটাই বার করেছিল। টেবিলের ওপর বইটা সামনে রেখে সে সযত্নে পাতা উল্টে যেতে লাগল। নোট, উদ্ধৃতি, ঠিকানা ইত্যাদিতে পাতাগুলো একেবারে ভরা......

"এই দেখুন," বলে একটা পৃষ্ঠার ওপর আঙুল রাখল। কিন্তু ঐ কোটেশনে রুশ্‌চিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি; ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে ঠিক ওর ওপরে একটা লেখা দেখে। লেখাটা কাতিয়ার হাতে: "একাতোরিনা দ্‌মিত্রেভ্‌না রশ্‌চিন, একাতোরিনোস্লাভ, পোস্ত রেস্তান্ত*।"

"এটা কোথায় পেলেন?" ধরা গলায় রশ্‌চিন জিজ্ঞাসা করল।

ওর মুখে রক্ত চড়ে গেছে, হাত দিয়ে জামার কলারটা আলগা করতে চেষ্টা করছে। সিপাহী ভাবল রুশ অফিসার বুঝি অন্য হাত দিয়ে রিভলবারই বার করে—দিনকাল যা গরম।......কিন্তু অফিসারের উদ্‌ভ্রান্ত চোখে শুধু যন্ত্রণা আর মিনতির ছবি, আর কিছু নয়।......অতি কোমল সুরে লান্ডস্টার্ম সিপাহী বল্ল:

"মহিলাটি আপনার পরিচিত তা বুঝতে পারছি। ও'র সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু খবর দিতে পারি।"

"আমি ওঁকে চিনি......"

"আমার কাহিনীটা কিন্তু দুঃখের......"

"দুঃখের? কেন? মহিলাটি কি মারা গেছেন?"

"সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারিনে। কুশল সংবাদই আমি প্রত্যাশা করে থাকতে চাই।......যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি যে, যদিও মানুষ অতি সহজে আঘাত পায়, যন্ত্রণায় কাতর হয়, তবু তার বেঁচে থাকার ক্ষমতা অসাধারণ।......এর কারণ হল—।" ওর তর্জনী আবার উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু যন্ত্রণাবিকৃত মুখে বাধা দিল রুশ্‌চিন:

"বলুন, বলুন, ওর সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হল, তারপর ওর কপালে কি ঘটল?"

"দেখা হয়েছিল ট্রেনে।......ঠিক তার আগেই একাতোরিনা দ্‌মিত্রেভ্‌নার স্বামীবিয়োগ ঘটেছে। স্বামীকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন......"

"ইচ্ছে করে তাকে মিথ্যে খবর দিয়েছিল! আমি মরিনি, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।"

---

*পোস্ত রেস্তান্ত=যাঁর নামে চিঠি তিনি নিজে এসে ডাকঘর থেকে নিয়ে যাবেন।

জার্মান সিপাহী ধপ্ করে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। ওর ছোট্ট মুখ আর পাখির মতো চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠেছে। ঠক্ করে টেবিলে চাপড় মেরে বল্ল:

“যে রেস্তোরাঁ জীবনে কখনো দেখিনি সেই রেস্তোরাঁয় এলাম, টেবিলটায় বসলাম, বার করলাম নোটবইটা......ব্যস্ অমনি মরা মানুষ বেঁচে উঠল। আপনি এই মহিলার স্বামী? উনি আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন। সে সময় আপনার চেহারাও আন্দাজ করেছি—ঠিক যেমন দেখছি তেমনই।...একি কামেরাদ রশ্চিন, অমন করবেন না, না, না, অমন করা ঠিক হবে না......”

স্খলিত স্বরে কথা বলতে বলতে পাতলা ঠোঁট দুটো ও জোরে বন্ধ করল, তারপর কড়া অথচ উৎসুক দৃষ্টিতে ভাদিম পেত্রোভিচের চোখের দিকে চাইল। ভাদিমের চোখে তখন জল ছাপিয়ে উঠেছে। সহৃদয় ভঙ্গিতে বাঁকানো সিপাহীর নাক, তার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে।

“ট্রেনটা একাতোরিনোস্লাভ পৌঁছানোর আগেই আমাকে নেমে যেতে হয়। সেই সময় আপনার স্ত্রী তাঁর ঠিকানা লিখে দেন। ঠিকানার জন্যে আমিই জিদ্ করেছিলাম; উড়ন্ত পাখির মতো ওঁকে হারিয়ে ফেলব—মন তা চায়নি। একসঙ্গে ট্রেনে যাওয়ার সময় ওঁর মনটাকে একটু চাঙ্গা করে তুলতে পেরেছিলাম বলেই মনে হয়। উনি খুবই বুদ্ধিমতী। মনের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়নি বটে, তাহলেও মনটা খুব স্বচ্ছ—মহান, উন্নত ধারণা গ্রহণ করার জন্যে সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকে। ওঁকে বল্লাম: “আমাদের কালে দুঃখই তো লক্ষ লক্ষ মেয়ের অদৃষ্টলিপি—এই দুঃখ আর দুর্দৈবকে একটা সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আপনার দুঃখই আপনাকে শক্তি দিক।’ ‘শক্তি নিয়ে আমি কি করব?’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ‘আপনি কি ভাবেন যে, আমি বেঁচে থাকতে চাই?’ ‘হ্যাঁ চান’, বল্লাম তাঁকে। ‘আপনি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকতে চান। যত জিনিস আছে তার মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই সবচেয়ে দরকারী। চারিদিকে যখন শুধু মৃত্যু, দুঃখ আর দুর্দৈবই দেখি তখন আমাদের বোঝা উচিত যে, এ সবের কারণ এখনও দূর করা যায়নি সে আমাদেরই দোষ। মানুষের মতো এমন একটা বিস্ময়কর জিনিস—পৃথিবীটাকে যে সেই মানুষের উপযোগী সুখ-শান্তিময় আশ্রয় ক’রে গড়ে তুলতে পারিনি, সে দোষ আমাদেরই তা বোঝা উচিত। আমাদের পেছনে রয়েছে চিরন্তন স্তব্ধতা, সামনেও। যে সামান্য সময় আমাদের হাতে আছে তার মধ্যে আমাদের এমন ক’রে বাঁচতে হবে যাতে এই স্বল্পস্থায়ী মুহূর্তের সুখটুকু দিয়েই ঐ স্তব্ধতার অতল গহ্বর ভরে দেওয়া যায়; এভাবে বাঁচাই আমাদের কর্তব্য।’......তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একথা বলেছিলাম।......তারপর ট্রেন ছেড়ে আমার ইউনিটে চলে যাই। ঐ রাত্রেই আমরা খবর পাই যে, আপনার স্ত্রীর ট্রেনটাকে মাখনোর দল আটক করেছিল, লুটপাট করার পর সমস্ত যাত্রীকে নিয়ে চলে গেছে—কিন্তু কোন্ দিকে তা জানতে পারিনি। আমি যা জানি সবই বল্লাম, কামেরাদ রশ্চিন।”

ছোট্ট স্টেজটার ওপর নাচগান শুরু হচ্ছে। পাতলা-চুলো পিয়ানো বাজিয়ে আর তার পিয়ানো উইংস্-এর আড়ালে। মস্কোর বিখ্যাত বিদূষক দন লিমানাদো এসে দাঁড়িয়েছেন স্টেজের ওপর। দন লিমানাদোর চেহারা সুন্দর, চোখে রং মাখা, বয়সটা বোঝা শক্ত। ওঁর গায়ে ডিনার জ্যাকেট, মাথায় শক্ত খড়ের টুপি কপাল পর্যন্ত নামানো।

"ভদ্রমহোদয়গণ, জার্মান বিপ্লবের জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন" বলে চেঁচিয়ে উঠে মহা-আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি নিজেরই করমর্দন করলেন। "এই তো গেছলুম রেল ইস্টিশনে। জার্মান ওবরলিউটেনাণ্ট সায়েবকে ডেকে বল্লুম 'বলি ও সায়েব, আচো কেমন?' 'আচি ভাল', সায়েব বল্ল, 'তা তুমি কেমন?' 'আমিও আচি ভাল', বল্লুম। 'শীত পড়ে গ্যালো, খোড়ো টুপিতে তো আর শীত মানে না। কিন্তু শীতের টুপি ফেলে এয়েচি মস্কোতে, একোন আর পাই কি ক'রে?' 'শীতের টুপি কিনে ফ্যালো না একটা,' সায়েব বল্ল। 'শীতের টুপি কিনব বলে জম্মো জম্মো কন্নু এক হাজার মার্ক,' বল্লুম আমি, 'আর আজ কিনা তার বদলে দিল মাত্তর পাঁচ রুবল্!' 'চুপ, চুপ, চুপ' সায়েব বল্ল। 'চুপ, চুপ, চুপ', বল্লুম আমি। এর্মনি ডাঁয়ড়ে ডাঁয়রে এ কতা, সে কতা, কত কতাই কইচি দুজনে—আর ওদিকে সায়েবের সোন্যরা সব উটচে গাড়ীর ছাতে। 'আপনারা চল্লে নাকি সায়েব?' জিজ্ঞেস কল্লুম। 'ধরেচ ঠিক,' সায়েব বল্ল। 'আর ফিরবে না?' বল্লুম আমি। 'আর ফিরব না', সায়েব বল্ল। 'আহা, বড় কষ্ট লাগে', বল্লুম আমি। 'উপায় নেই', সায়েব বল্ল। 'উপায় নেই কতাটার মানে কি হল?' বল্লুম আমি। 'মানে হল কতাটার মানে হয় না,' সায়েব বল্ল। 'চুপ, চুপ, চুপ,' বল্লুম আমি। 'ভেবেছিলুম তোমাদের ওধারে বুঝি এ সব হবে না।' তারপর গাড়ীর ছাত থেকে হল্লা করে গান ধল্ল সোন্যরা—'আপেল বঁধু'—আমিও অম্‌নি পড়লুম কেটে।……চাদ্দিকে ঘোর অন্ধকার, বাতাস গোঁ গোঁ কচ্চে, গুলি চলচে অলিতেগলিতে—আমার আবার একেনে আসার টাইম হয়ে গ্যাচে, তার ওপর বুকটা কেমন হাঁকুপাঁকু করে। কি করি, ধল্লুম গান।"

অর্মনি উইংসের আড়াল থেকে পিয়ানো গম্ গম্ করে উঠল। শূন্যে এক লাফ দিয়ে তারপর পা-টা ঘষতে ঘষতে গান ধরে দিল দন লিমানাদোঃ

ওগো আমার আপেল বঁধু
রাত যে বড় কালো!
এখন কোথায় যাই,
পথ কি ক'রে পাই,
সেই কথাটা বলো!

স্টেজের দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়াল রশ্‌চিন। অনন্যসাধারণ জার্মান সিপাহীটির চোখে চোখ রেখে বল্লঃ

"মাখনো এখন কোন্ জেলায় হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে বলতে পারেন?"

“আমাদের শেষ রিপোর্টে শুনেছি, অস্ট্রিয়ান সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন-পথে মাখনো ভয়ঙ্কর গোলমাল লাগিয়েছে—এখানে ওখানে জার্মান ইউনিটকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। ...গুলিয়াই-পলিয়েতেই ও আবার সদর দপ্তর খুলে বসেছে......।”

॥ দশ ॥

কাচালিন রেজিমেণ্টে আরও নূতন সৈন্য দরকার, এখনকার সৈন্যদের বিশ্রাম দেওয়াও খুবই দরকার। তাই নভেম্বরের গোড়ার দিকে রেজিমেণ্টটাকে সৈন্যবাহিনীর পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লড়াইয়ের শেষে ও রেজিমেণ্টে শ' তিনেক লোকও বাকী ছিল কিনা সন্দেহ। পিওতর্ নিকোলাইয়েভিচ মেলশিন একটা ব্রিগেডের ভার পেলেন—পেয়ে তাঁর নিজেরই বেশ অবাক লাগল। যাই হোক সদর দপ্তরের কাছে তিনি সুপারিশ করলেন যে, তেলেগিনকে (সে তখন হাসপাতালে) কাচালিন রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হোক। তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর হল। রেজিমেণ্টের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড (দ্বিতীয় অধিনায়ক) নিযুক্ত হল সাপঝকভ, আর ইভান গোরা হল রেজিমেণ্টাল কমিসার। তেলেগিনের ব্যাটারিটা তখন রেজিমেণ্টের আর্টিলারির অন্তর্ভুক্ত।

বর্ষা শুরু হয়েছে। পাকশালার চিমনীর ধোঁয়া আর ভিজে কাপড়ের গন্ধে দিনগুলো ভারাক্রান্ত। বাড়ীঘরের ছাত দিয়ে জল ঝরে, জলে ভিজে ভিজে ছাত-টাত সব কালো দেখায়। মাটি হয়েছে কাদা—ড্রিল করে সৈন্যরা যখন ফিরে আসে তখন তাদের বুটটুট সব একেবারে কাদায় ভর্তি। কিন্তু রক্তারক্তির ফসল তখন প্রায় ঘরে উঠে গেছে—নদীর দক্ষিণ তীর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দন আর্মিটাকে। লোকে বলছে, জারিতসিনে দু' দুবার জবর মার খেতে হয়েছে শুনে আতামান ক্রাস্নভ নাকি হতাশায় মাথা কুটছে।

সারা দিনের যত কাজ—ড্রিল, তারপর রাজনীতির পড়াশোনা, তারপর 'নিরক্ষরতা-মোচন' মণ্ডলী—ইত্যাদি সব কাজ সাঙ্গ হবার পর কন্কনে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে লাল ফৌজের লোকেরা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কেউ যায় বন্ধুবান্ধবের ওখানে, কেউ যায় নতুন পাতানো ধর্মবাপ বা ধর্মমায়ের কাছে। যাদের আত্মীয়-বন্ধু কিছু নেই তারা এমনিই গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ায়, কিংবা কোনো শুকনো জায়গা দেখে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি ক'রে গ্রামের মেয়েদের মন ভোলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সব হাসি-মস্করার শেষে প্রায়ই ঝগড়া বেধে যায়, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড তিক্ততা জাগে—কারণ মেজাজ সবারই খিঁচড়ে আছে।

তেলেগিনের ব্যাটারিতে যে দশজন নাবিক ছিল তার মধ্যে তিনজন নিহত আর দু'জন সাংঘাতিক রকম আহত। বাকি খালি পাঁচজন। একটা ভাল কসাক খামারে ওরা বাসা পেয়েছে, খামারের মালিক আগেই খামার ছেড়ে পালিয়েছিল। আনিসিয়াও আছে ওদের সঙ্গে। কম্প্যানির সরকারী খাতায় এখন তার নাম উঠেছে, 'অযোদ্ধা' তালিকায়। সে ড্রিল করে, চাঁদমারিতে যায়, রাজনৈতিক

বৈঠকে যোগ দেয়—সিপাহীদের সঙ্গে তার সমান অধিকার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ফৌজী উর্দি গায়ে চড়িয়েছে, কিন্তু সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলি কাটতে রাজি হয়নি। গত অক্টোবরের অগ্নিপরীক্ষায় এত মৃত্যু, এত বীভৎসতা চোখে দেখার পর সে তার প্রতিকারহীন দুঃখস্রোত অতিক্রম করেছে—আকণ্ঠনিমজ্জিত মানুষ যেভাবে নদী অতিক্রম করে। মুখটা আর একটু কঠিন হলেও ওর তারুণ্য ফিরে এসেছে, কুৎসিত বলিরেখাগুলিও মুছে গেছে। বাহিনীর পেছনে বিশ্রামের রেশন খেতে পেয়ে গালে আবার রং লেগেছে, মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠেছে, গতিতে এসেছে লঘু চঞ্চলতা; মনে হয়, ওর সমগ্র সত্তাই যেন এখন সতেজ আর নির্মল হয়ে উঠেছে। রাত্রিবেলা সুতপ্ত কুটিরের মধ্যে প্রচণ্ড নাসিকাধ্বনি তুলে নাবিকেরা যখন ঘুমোতে থাকে, ও তখন চুপি চুপি বসে তাদের কাপড় কাচে, পোশাক-আশাক সেলাই বা রিফু করে রাখে। ধূসর ঊষায় ঘুম ভাঙানোর বিউগ্‌ল বেজে যায়, ও হয়তো তখনো কাজই করছে।

কম্প্যানীর আর একটি নতুন সম্পত্তি হল কুজমা কুজমিচ নেফেদভ। রেজিমেণ্টের অতিরিক্ত কেরানি হিসেবে সে কাজ পেয়েছে। ১৬ই আর ১৭ই অক্টোবর যখন লড়াইয়ের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ—সে সময় ও শুধু বীরত্বেরই পরিচয় দেয়নি, গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে আহতদের বয়ে নিয়ে যাবার কাজে একেবারে বেপরোয়া সাহসও দেখিয়েছিল। সকলেই তা লক্ষ্য করে। তারপর যখন ধ্বংসাবশিষ্ট কাচালিন রেজিমেণ্ট প্রতি-আক্রমণে অগ্রসর হয় কিংবা যখন বিশ্রামের জন্যে দনের ধারে সরে আসে, তখনও কুজমা পিছিয়ে থাকেনি।

ইভান গোরার সঙ্গে হঠাৎ একদিন ওর সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল ফিল্ড কিচেনটার ওখানে। কুজমার রোগা শরীরটা তখন ভিজে ঢোল, গাময় কাদা লেগেছে। ভাবটা বেশ উত্তেজিত। গোরা ওকে ডাকলঃ

“আচ্ছা নেফেদভ, আপনাকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? আমি আপনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনে। একে নামকাটা পাদরি, তার ওপর বুড়ো মানুষ। আপনি আমাদের সঙ্গে লেগে আছেন কেন বলুন দিকি?”

কুজমার ছালওঠা নাক বেয়ে একটা বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে আসছিল। জোরে নিশ্বাস ছেড়ে সেটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে করতে ফূর্তিবাজ কটা চোখে ও একবার কমিসারের দিকে চেয়ে নিল।

“স্নেহের টানে লেগে থাকাই আমার স্বভাব, ইভান স্তেপানোভিচ—আমি লোকের অনুরক্ত হয়ে পড়ি। আমি যাব কোথায়? মানুষের সঙ্গ আর পাব কোথায়? আমি ভাবুক লোক, বুঝলেন......”

“সে কথা নয়, শুনুন—”

“রেজিমেণ্টের রেশনের কথা যদি বলেন”, (হাতের টাইটম্বুর পাত্রটি কুজমা তুলে ধরে)—“এই যে শুয়োরের চর্বি আর জোলো সুপ—এ আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করছি। আর নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করেছি এ দোষ বোধহয় কেউ দেবে না। আমার এই বুট আর পায়জামা দেখুন—যুদ্ধের সময়

নিজ হাতে খুলে এনেছি শত্রুর গা থেকে।...আমি তো কিছু চাচ্ছিনে। কারও ঘাড়ে বোঝা হয়েও চাপিনি। ভবিষ্যতেও আমি কাজে লাগতে পারব সে আশা আমার আছে। একজন চিন্তাশীল মানুষ নিয়ে বিপ্লবের কোনো দরকার আছে, না নেই? আছে। কিছু লেখাপড়া জানে এমন একজন কেরানি আপনার চাই—বেশ এই আমি আছি—লেখাপড়া জানি, এমন কি লাটিন কি গ্রীক ভাষাতেও লিখতে পারি। ...কত কাজে লাগানো যেতে পারে আমাকে।......"

"আর যাই হোক, লোকটার যদি বুদ্ধি থাকে, যদি কাজ করতে চায় তাহলে ওকে কাজে লাগাই না কেন?" ভাবল ইভান গোরা।

মুখে বল্ল. "ব্যাপার কি জানেন? আপনি যে শ্রেণী থেকে এসেছেন তাতেই আমাদের খটকা লাগে—ভয় হয়, আমাদের সঙ্গীদের মাথায় অন্যরকম ধ্যান-ধারণা ঢোকাতে শুরু করে দেবেন না তো..."

"এক কালে আলেয়ার পেছনে ছুটেছিলাম বৈকি", বাধা দিয়ে বল্ল কুজমা কুজমিচ। "তা অস্বীকার করে লাভ নেই। আমাকে ভুল পথে চালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার প্রচার করতে যাব, সে ভয় করবেন না—ভগবানের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে..."

"ঝগড়া হয়ে গেছে?" কথাটার পুনরাবৃত্তি করল ইভান গোরা। "সত্যি? বেশ তাহলে সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে আসবেন, কথা হবে।"

গোধূলি সময়ে কমিসারের ঘরে উপস্থিত হয়ে কুজমা দেখল, গ্রেট কোট আর ফৌজী টুপি পরে জানলার ধারে কমিসার বসে আছে; বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, আর নিজের অজ্ঞাতেই ঠোঁট নাড়ছে। কাগজ ভাঁজ করে রেখে সে উঠে দাঁড়াল, অতিথিকে ঘরে ঢুকিয়ে খিল দিল দরজায়।

"বসুন। এখানে এক ব্যাপার হয়েছে, খারাপ ব্যাপার, বুঝেছেন! মুখ না খুলে থাকতে পারবেন তো? যদি বকর বকর করেন, তা হলে কিন্তু পস্তাবেন। আমার কাছে সবাইয়ের হাঁড়ির খবর, রাত্রে কোন্ সেপাই কি স্বপ্ন দেখে সে খবরও পাই আমি......"

খবরের কাগজের একপাশ থেকে সরু এক চিল্‌তে কাগজ ছিঁড়ে নিল। তারপর আনাড়ি হাতে কাগজটা পাকাতে পাকাতে গলা ঝাড়ল।

"ফসল কাটা এখন শেষ, গোলায় তোলাও শেষ হল। অবিশ্যি সামরিক পরিস্থিতির জন্যে ঝাড়াই মাড়াইয়ে একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ওপর লোকের ভরসা আছে, আসল কথা তো সেইটাই। সোবিয়েত রাজ আর যাচ্ছে না, তা তারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত।...বেশ, এ পর্যন্ত ভালই।...কিন্তু 'হোলি ভেল'-এর পরব যে এল বলে......"

ঝট্ করে একবার কুজমা কুজমিচের দিকে তাকিয়ে নিল ইভান গোরা। একটু অপ্রস্তুত ভাব। নাক কুঁচকে কুঁচকে জোরে শ্বাস টানল।

"হোলি ভেল পরবের আর দেরি নেই।......লোকের মন থেকে কুসংস্কার এখনও যায়নি।......রাতারাতি ডিক্রি জারি করে তো আর কুসংস্কার তুলে দিতে

পারে না।......তুলে দিতে সময় লাগে, বুঝেছেন।......যাক সে কথা।......মেয়েগুলোর তো মহা অভিমান—পরব এসে গেল, কিন্তু ঘটক কই? কাল স্পাসকোই গাঁয়ে গেছি। মেয়েছেলেরা আমার গাড়ী আটকাল—খালি কাঁদে আর বকে আর হাসে। সোবিয়েতের ওপর ওদের দরদ আছে, কিন্তু হোলি ভেল্-এর ব্যাপার-স্যাপার ভুলতে পারে না।......গাঁ-টার অবস্থা ভাল—শস্য আছে অনেক, আজ পর্যন্ত ওদের ওপর কোনো ফসল ট্যাক্সও ধার্য হয়নি। বেশ সাবধানে ওদের পটাতে হবে—যাতে আপনা থেকেই ফসল নিয়ে আসে।......কিন্তু ওদের মধ্যে প্রচার করার জুতই পেলাম না, মেয়েগুলো খালি লাগাম ধরে ঝোলে আর চেঁচায়—পুরুত চাই, আমাদের পুরুত এনে দাও। লজ্জা দিতে গেলামঃ বল্লাম—তোমাদের পুরুতরা তো সব জেনারেল মামন্তভের আরতি করতে গেল, আবারও পুরুত চাও!...'তারা তো হোয়াইট পুরুত', ওরা বল্লে। 'আমরা নিজেরাই তাদের গাঁ-ছাড়া করেছি—এখন আপনারা একজন রেড পুরুত পাঠিয়ে দিন......বিয়েশাদী দিতে হবে, সবুর করে করে কাহিল হয়ে গেল যে মেয়েগুলো। তাছাড়া কোলের ছেলে রয়েছে গণ্ডা গণ্ডা—তাদের নামকরণ অনুষ্ঠান করতে হবে না?'......উঃ, ওর পর সারাদিন ধরে মাথাটা শুধু বন্ বন্ করছে, সত্যি বলছি...এমনি মাথা খারাপ করে দিয়েছিল মেয়েগুলো! কিন্তু আমি কি করে পুরুত পাঠাই? তবু সমস্যাটার একটা সমাধান তো করতে হবে। নইলে ওরা পাঁচ মাথা এক করে করে শেষ পর্যন্ত নভোচেরকাস্ক থেকে পুরোনো পুরুতটাকেই ডেকে আনবে।...আর তাহলেই গোলমাল।...কুজমা কুজমিচ, এসব ব্যাপারের আপনি তো সবই জানেন—আমাকে এখন বাঁচান দিকি। গাড়িটা নিয়ে গাঁয়ে চলে যান, মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখুন। ...কিন্তু আমাকে জড়াবেন না। ছুঁড়ীগুলো, বুঝলেন কিনা পেকে একেবারে টস টস করছে, পেড়ে নিলেই হয়।" নিজের বুকের দিকে দেখাল ইভান গোরা। "যা বলুন তা বলুন, এ তো মানুষেরই স্বভাব—তাই না? যাবেন আপনি?"

"আনন্দের সঙ্গে" জবাব দিল কুজমা। ঠোঁট কুঁচকে মাথাটা হেলাল।

"কী একঘেয়ে কথাই যে তুমি বল শারিগিন, লোকে ভাববে তোমার ঘিলুটিলু বুঝি সব শুকিয়ে গেছে। তোমার কথা শুনলে পাগল না হয়ে উপায় নেই!"

টুপিটা তুলে নিয়ে বাঁকা করে মাথায় দিল লাতুগিন—খাঁজটা পড়ল কানের ওপর। বেঞ্চ থেকে না উঠেই পা দুটো একটু সরিয়ে বসল। চোখের তারা দুটো ঘুরতে ঘুরতে এসে থামল আনিসিয়ার মুখের ওপর।

গভীর মনঃসংযোগের চেষ্টায় আনিসিয়ার ভ্রূ কুঁচকে গেছে। পড়া শুনবার সময় কোনো একটা জিনিসের ওপর, যেমন ধর দেওয়ালের পেরেকটার ওপর দৃষ্টি স্থির করে বসবে—এই ওর অভ্যাস; তেমনি ভাবেই বসেছে আনিসিয়া। ওর অশিক্ষিত মস্তিষ্কের পক্ষে মূর্তিহীন ধারণাগুলো বুঝে ওঠা কঠিন। ওগুলো

ওর কাছে যেন বিদেশী শব্দ—মাঝে মাঝে শুধু তার এক এক টুকরো বা একটুখানি ঝিলিক চৈতন্যের মধ্যে ধরা পড়ে। 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা শুনলে শুকনো খসখসে কিছু একটা জিনিসের ছবি ওর চোখে ভাসে—মনে হয় কড়া-পড়া হাতের ওপর দিয়ে খসখস করে কে যেন একটা লাল ফিতে টেনে নিচ্ছে। ঐ ফিতেটাকে ও স্বপ্নে দেখতে পায়, প্রায়ই। রাজা নেবুচাড্‌নেজার-এর একখানা পুরোনো, পোকাকাটা ছবি—'সাম্রাজ্যবাদ' বল্লে নেবুচাড্‌নেজারের সেই ছবিটাই ওর মনে আসেঃ রাজার মাথায় মুকুট, গায়ে উজ্জ্বল নীল আংরাখা; দেওয়ালের ওপর লেখা শব্দ ক'টি—'মিনে, তেকিল, উপারশিন'—দেখে রাজার হাত থেকে খসে পড়েছে রাজদণ্ড আর রাজবর্তুল.........

কিন্তু আনিসিয়া খুবই অধ্যবসায়ী, অসম্পূর্ণ ধারণাগুলির ত্রুটি দূর করার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত নেই। মুখের ওপর লাতুগিনের স্থির দৃষ্টি অনুভব করতে পারলেও দেওয়ালের পেরেক থেকে চোখ ফেরায় না আনিসিয়া—অতি ধীরে হাঁটু দুটো এক করে আনে, ব্যস।

"আমার কথা কি এতই নীরস লাতুগিন? যে প্রবন্ধটা পড়া হচ্ছে সেটা বেরিয়েছে 'ইজভেস্তিয়া' কাগজে। তোমার কি ওটা ভাল লাগছে না?" শারিগিন জিজ্ঞাসা করে। "নিজেকে যদি তুমি বিপ্লবের সৈনিক বলে মনে কর, তবে প্রত্যেক বার বন্দুকে গুলী ভরার সময় তোমাকে তখনকার পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে আবার আমাদের সাধারণ লক্ষ্যও মনে রাখতে হবে।"

কথা ক'টি বলে শারিগিন তার সুন্দর নীল চোখের সকরুণ দৃষ্টি মেলে দেয় আনিসিয়ার দিকে। আনিসিয়ার একাগ্র দৃষ্টি কিন্তু পেরেকের ওপর। বাইকভ তার ফাঁপা স্বরে হঠাৎ বলে উঠল, বেশ জোর দিয়েই বলে উঠলঃ

"আরে বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার কি কাজে লাগবে? শুধু ঝোপঝাড়ে বেধে ছিঁড়ে যাবে। যারা মুখ্যু, খালি বাজে সময় নষ্ট করে, তাদের কাছে পড়া মানেই যন্ত্রণা।"

"খাসা বলেছ!" সমান গম্ভীরভাবে জবাব দিল লাতুগিন। "কিন্তু যত খাসা তত সত্যি বলে তো মনে হয় না। মুখ্যু ফাঁকিবাজদের যে পড়তেই কষ্ট লাগে তা নয়। যে-পড়ায় ফল আছে সে পড়াকে আমি শ্রদ্ধা করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন্‌টা হাতীর শুঁড় আর কোন্‌টা লেজ তাও যখন বোঝা যায় না তখনই বিরক্ত লাগে। সাচ্চা কথা ঠিক মেয়েমানুষের মতো—একেবারে জড়িয়ে ধরে আগুন জেবলে দেয়; সে কথা শোনার জন্যে মানুষ জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়েও হেঁটে যাবে।......সে কথাই তোমার কাছে শুনতে চাই শারিগিন।......কিন্তু তুমি খালি ঘ্যান ঘ্যান কর—'বিশ্ব-সর্বহারা আর সমাজতন্ত্র'।......এ দুইয়ের জন্যে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত! এসব কথা আমি শুনতেও তো চাই—কিন্তু এমন ভাবে বল যাতে বুঝতে পারি। বাড়ি বানাবার জন্যে যে গাছ কাটব, সে গাছটা কোথায় বলে দাও—সিল্ক শার্ট পরে যে মাঠে বেড়াব সে মাঠটা কোন্‌খানে তা আমি জানতে

চাই।......ভূমণ্ডলের গ্লোবটা নিয়ে মাথায় এক বাড়ি দিলে তবে তোমার শিক্ষা হবে কি করে 'বিশ্ব বিপ্লব'-এর কথা বলতে হয়।"

ওর শক্তিমান চওড়া মুখ, জাত-ষাঁড়ের মতো ফাঁক ফাঁক করে বসানো চোখ জোড়া—সেদিকে চাইল আনিসিয়া। ক্রুদ্ধ মনে নিজেকেই বল্ল—ও মুখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকার চেয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়াও ভাল।

লাতুগিনের ধরণধারণ কেউই পছন্দ করে না—না গাগিন, না জাদুইভিতের, না বাইকভ। খড়ের চালে বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শান্ত আলাপ-আলোচনা ওদের ভাল লাগে। অবিশ্যি শারিগিন ছেলেমানুষ, যা শিখেছে তা এখনো ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেনি। সেজন্যে মাঝে মাঝে আনাড়ির মতো বোঝাতে যায়, সহজ কথা কিছুতেই ব্যবহার করে না—ভাবে ফাঁদে পড়ে যাবে বুঝি; সুপরীক্ষিত বিদেশী শব্দ পেলেই ওর সব চেয়ে সুবিধা।......কিন্তু তা বলে অমন একজন সাচ্চা কমরেডকে নিয়ে লাতুগিন মস্করা করে কোন্ অধিকারে? তা ছাড়া লাতুগিনের মারমুখী ভাবের পেছনে আসল কারণ সম্পূর্ণ আলাদা তা সবাই জানে —সে কারণটাও ওদের কারোরই ভাল লাগে না।

"কামসার একটা খাদ্য-বাহিনী তৈরী করছেন", ওকে গাগিন বল্ল। "তাঁকে গিয়ে বল বাহিনীতে তোমাকে নিয়ে নিন। বসে বসে তোমার বিরক্তি ধরে, সত্যি সে তো ভাল কথা নয়। তুমি যে বাসি মেরে গেলে ভায়া......", বলে বাইকভ দাড়ি নেড়ে নেড়ে হাসে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জাদুইভিতেরও শক্ত শক্ত দাঁত বার করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আনিসিয়া লজ্জায় লাল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সেটা গায়ে দেয়, তারপর কসে বেল্ট বেঁধে ঘর থেকে চলে যায়। সবাইয়েরই কেমন কিন্তু কিন্তু ভাব। মৃদু হেসে কাগজটা গুটিয়ে ফেলে শারিগিন।

"চল, দুজনে কথাটা আলোচনা করিগে," বল্ল লাতুগিনকে। চোখ কুঁচকে লাতুগিনও বল্ল, "চল।"

অন্ধকারের মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ে—গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণা এসে মুখে লাগে। লাতুগিনের মুখে অবজ্ঞার মৃদু হাসি—সে হাসি না দেখেই অনুভব করতে পারে শারিগিন, বোঝে যে ও নিজে কিছু বলতে আরম্ভ করা মাত্র লাতুগিন জবাব দেবে তীব্র বিদ্রূপ আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে।......শারিগিন চাইছিল যে, সহযোদ্ধার নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের কথাটা সে তুলবে শান্তভাবে; উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে পচা বুর্জোয়া স্বভাব পেয়েছি তা থেকে মুক্ত হওয়ার দরকার কতখানি তা বুঝিয়ে দেবে—ব্যস।......কিন্তু সে কথা না বলে রাত্রির ভিজে বাতাসে একটা গভীর নিশ্বাস টেনে ও হট্ করে বলে ফেল্লঃ

"আনিসিয়াকে ছেড়ে দাও......ওকে নিয়ে তুমি শুধু খেলা করছ......এ অন্যায় ......জঘন্য......"

তারপর আর একটি কথাও নয়। বিষয়টা এভাবে ঘুরতে দেখে লাতুগিন একেবারে হতবাক—নিশ্চল হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। উপযুক্ত জবাব আর

ভেবে পায় না। বলে দেবে কিঃ "ওরে বেটা আহাম্মক, ওরে দুগ্ধপোষ্য, শুচিবায়ু-গ্রস্ত—আমার ওপর সর্দারি করার ভার তোকে কে দিল?" নাকি বলবেঃ "দেখ, অমন কথা বলতে এসেছে অনেকেই, কিন্তু অক্ষত দেহে তাদের ফিরতে হয়নি, বুঝেছ?" কিন্তু যেটাই বলুক তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে—লাতুগিন একটা জানোয়ার।......ওর প্রতি ভয়ঙ্কর অন্যায় করা হয়েছে—এই ধারণায় ওর মন জ্বলে ওঠে। আগের দিন হলে মারদাঙ্গা করে তখুনি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ত।......কিন্তু এবার চোখ কুঁচকে কুঁচকে দাঁতে দাঁত ঘষে অনুভব করল...এখন আর ওভাবে ফয়সালা করা চলে না.........

"বেশ!" ও বল্ল। "যে রক্ত ঢাললাম তা বৃথাই গেছে এই তুমি বলতে চাও? বলতে চাও যে আজও আমি একটা ভবঘুরে, গুণ্ডা, কুকুরের বাচ্চা—তাই না? মিশা, একথা জানিয়ে দিলে সেজন্য ধন্যবাদ!"

গেটের দিকে ফিরে প্রচণ্ড হিংস্রতায় ঘুষি মারতে লাগল জালিটার ওপর।

ইভান ইলিয়িচের দেহে ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে আসছে। (স্নায়বিক শকের আঘাত তো ছিলই, তা ছাড়া গোলা ফাটার সময় দেহের বহু জায়গা লোহার টুকরোর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল)। গোড়ার দিকে একবারও জ্ঞান হত না। শেষে চেতনাহীনতার বদলে এল ঘুম, আর মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য খাওয়া। এর পর থেকে ওর মনে হতে লাগল যেন ভারি আরামে, ভারি শান্তিতে সময় কাটছে। চোখে ব্যান্ডেজ, ঘরের জানলায় পুরু পর্দা—ঘরটাতে শুধু ওই একা। মাঝে মাঝে কার যেন লঘু পদধ্বনি, পত্রমর্মরের মতো মৃদু গুঞ্জন কানে আসে—চামচের টুংটুং, ঘাগরার খসখস শব্দ শুনতে পায়। পেছনে কোথায় একটা ঘড়ি টিকটিক করে, অনবরত, কখনো জোরে, কখনো আস্তে। বাইরের জগতের চেতনা শুধু এইটুকুই; আর তার সঙ্গে একটা অনুভূতি—কে যেন কাছে আছে—তার সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এখনও চোখে দেখা যায় না। ও যদি শুধু একটু দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, অমনি বাতাসে একটা অতি সূক্ষ্ম গতিচাঞ্চল্য জেগে ওঠে—সেই 'কে যেন' মানুষটি ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে—অস্পষ্ট, তাজা সুগন্ধির সৌরভ ছড়ায়।

মাঝে মাঝে আর কে একজন, প্রথমের চেয়ে অনেক রুক্ষ—গায়ে কড়া ঘামের গন্ধ আর তার চেয়েও কড়া তামাকের গন্ধ—তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয়।

"কি, নাড়ী কেমন?"

যিনি কোমল তাঁর উত্তরটা অস্ফুট ফিস ফিস শব্দ মাত্র। কিন্তু যিনি রুক্ষ তিনি প্রসন্ন মনে গম্ গম্ শব্দে বলে ওঠেনঃ

"চমৎকার! শরীরটা বেশ শক্ত ধাতুতে গড়া! এখন দেখবেন যাতে এঁর

কাছে একেবারে কোনো গোলমাল না হয়, বাইরে থেকে উত্তেজনার কোনো কারণ এসে পেঁাছতে না পারে। এটাই প্রধান কথা......”

ইভান ইলিয়িচ মনে মনে কটা কথা তৈরী করেঃ “তুমিই বাপু বাইরের উত্তেজনা।......ঘ্যান ঘ্যান থামিয়ে, যাও দেখি।......আর তুমি, ও লক্ষ্মী, একটু ঝুঁকে এসো—একটা কিছু না হয় পাট ক'রে দাও, কিংবা হাতে যদি হাত বুলিয়ে দাও, তাহলে আরও ভাল। ......দেখেছ, শুধু ভেবেছি আর ও বুঝে নিয়েছে। কে এ নার্স? এমন মিষ্টি মেয়ে পেল কোথায়?”

ওর কথা বলা মানা। কিন্তু ভাবতে মানা করে কে? উদ্বেগ নেই, আত্মগ্লানি নেই, অথচ নিজেকে নিজের কাছে একলা পেয়েছে—এমন সৌভাগ্য এল আজ বহুদিন পরে। এত বছর ধরে সাচ্চা, কঠোর মেহনতের পর এ এক মস্ত বড় পুরস্কার। জীবনে কোনোদিন ও বেইমানি করেনি; তাই ওর বিবেক এখন নিশ্চিন্ত পড়ে পড়ে ঝিমোয়—বৃষ্টির দিনে মিনি বেড়ালটার মতো। ভাবনা চিন্তা সব যেন কোন্ আজগুবি দুনিয়ার। গ্রীষ্মের দিনের উত্তর দেশের রোদ—সে কথাটাই ফিরে ফিরে মনে আসে। মনে আসে নিরুত্তাপ দিনের পিতার্সবুর্গ; বাত্যাহত পথের গায়ে নীলাভ অ্যাসফল্টের ওপর সে রোদ ছড়িয়ে গেছে বন্যার মতো।......কত ভাবনা, কত অভিজ্ঞতাই না সঞ্চিত হয়েছে পিতার্সবুর্গে। তারপর বন্ধ চোখের সামনেই ভেসে ওঠে একটা কাঠের বাড়ি, তার জানলা, জানলার সার্সিতে বুদ্বুদগুলোর ওপর সূর্যের মিহি আলো, আর তারও পেছনে কি যেন, কি যেন......। কিন্তু স্মৃতি এবার ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যায়—স্মৃতির ক্ষণিক স্পর্শে যে করুণ দুঃখটুকু জেগে উঠেছিল শুধু তারই রেশ থেকে যায়, আর কিছু নয়......

বহু-বিস্মৃত গান একটি, তার কথাগুলি ফিরে ফিরে মনে পড়ে। গানটি কোথায় শুনেছিল ঠিক স্মরণ নেই। ক্রেস্‌তভ্‌কা নদীর ধারে নোভাইয়া দেরেভ্‌নিয়া-তে একবার গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গিয়েছিল—সেখানেই বোধ হয় শুনেছিল গানটা। নীলাভ গোধূলি বেলায় চাপা সুরে এ গান গেয়েছিল কৃশতনু স্বপ্নাবিষ্ট এক জিপসী মেয়ে—ঝঙ্কার তুলেছিল গিটারের তারে। গানের কথাগুলি বিদ্রূপে ভরা; শ্রোতাকে বলছে—ডাইনে ঘোরো, তারপর বাঁয়ে, তারপর অন্ধকার গলিপথ ধ'রে বাড়িটার চারপাশে; ঘুরতে ঘুরতে ডানদিকে দেখবে একটা দরজা—সে দরজা দিয়ে পেঁাছাবে চিলেকোঠায়। গানের শেষ কথা ছিল সাবধান বাণী—যা খোঁজ তা পাবে না কোনো দিন।

শ্রোতারা চেয়ারে বসে আছে, মুখে শব্দ নেই, তাদের সামনে মেয়েটি গান গেয়েছিল। মানুষের জীবনের সার্থকতা যার মধ্যে; সেই চিরন্তন কামনার গান!......খোঁজ খোঁজ, চিলেকোঠার ভেতর খুঁজে দেখ, থাকতেও পারে। হায় নির্বোধ, নেশায় পেয়েছে তোমাদের। কাকে খোঁজো? উত্তরের সূর্যাস্তের দিকে চলেছ দীর্ঘ পথ ধরে, হাওয়ার বেগে পায়ের তলে ঘূর্ণি উড়ছে ধুলোয় ধুলোয়—আর খুঁজে চলেছ, খুঁজেই চলেছ......বুদ্বুদ আঁকা সার্সিগুলো

কোথায়, কোথায় সেই ছোট্ট জানলাটা? ঐখানে ঐ জানালার ধারে কি আসন পেতেছে প্রিয়া? ছাপা ছিটের জামাটি পরে, পা দুটি গুটিয়ে নিয়ে বই পড়ছে—সে কি প্রিয়া? সে বইয়ে তোমার কথা লেখা, খুঁজতে খুঁজতে তুমি আসবে? নাঃ সব বাজে কথা......তুমি তো খোঁজ শুধু নিজেকেই।

নিস্তব্ধ অন্ধকারে ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের তালে তালে ইভান ইলিয়িচ ঝিমোয় আর স্বপ্ন দেখে ঃ কড়া পাহারার চাপে পড়ে ওর আত্মমূল্যবোধ এতদিন মনের গভীরে লুকিয়ে ছিল; এখন দেহে জীবন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বোধ জাগতে শুরু করে। মানুষের কাছে যে স্মৃতি তার শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, যা তার প্রিয়তম, পবিত্রতম—পৃথিবীর পথ-পরিক্রমায় যে স্মৃতি হারিয়ে যায়, আর প্রায় ফেরেই না—আজ এই আধা-আজগুবি দুনিয়ার মধ্যে সেই স্মৃতিগুলিই যেন ওর সঞ্চয়। স্বাস্থ্য ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওর আত্মমূল্যবোধও ফিরে আসে। বেশ রুচি ক'রে খাওয়াদাওয়া করে, নার্সের অগোচরে বেশ আরামে গা-ও ছড়িয়ে দেয়। একদিন দিব্যি এক ঘুমের পর ইভান উঠল; তারপর দানাদার গমের পায়েস খেয়ে আরামসে বালিশে ঠেস দিয়ে বেশ আশ্চর্যরকম জোর গলায় বলে উঠলঃ

"প্রিয় সিস্টার, আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা কইতে পারি? এম্‌নি, বাজে গল্পসল্প, বুঝেছেন?"

নার্স তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে। ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে বলে ওঠে, "চুপ, চুপ!" ওর মুখের ওপর হাতের তালু চাপা দিয়ে বল্ল, 'চুপ'!"

কিন্তু নার্স হাত তুলে নিতেই আবার কথা বল্ল ইভান; বেশ খুনসুটির সুরেই বল্ল ঃ

"তাহলে আপনিই কথা বলুন! কী সুন্দর ছোট্ট হাতটি আপনার! আপনার বয়স কত? নামটি কি?"

পর পর ক'টা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল নার্স—যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কিংবা যেন দম আটকে গেছে। নার্স একটু কেমনধারা। ইভান তাকে বলতে চাইলঃ "ঘুম ভাঙ্গার পর হঠাৎ আমার মনে হল......যে-মানুষ নিজেকে ভালবাসে না কাউকে সে ভালবাসতে পারে না। তাহলে অমন লোক থেকে লাভ কি? যেমন ধরুন, যারা ইতর, কাপুরুষ তারা নিজেকে ভালবাসে না।......তাদের ভাল ঘুম হয় না, সারা গা খালি চুলকায়—কখনো রাগে ফোঁসে, কখনো বা ভয়ে কাঁপতে থকে।......মানুষের নিজেকে ভালবাসা উচিত; যে-জিনিস দেখে অপরে তাকে ভালবাসবে—বিশেষ করে মেয়েরা ভালবাসবে, প্রিয়তমা ভালবাসবে—নিজের মধ্যে সে-জিনিসটাকেই মানুষের ভালবাসা উচিত।......"

কিন্তু এসব কোনো কথাই বলা হল না। নার্স ঘরের বাইরে চলে গেল, আবার একটু পরেই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। এ সেই ডাক্তার—বাইরের উত্তেজনার বিরুদ্ধে যাঁর যুদ্ধ। আগের চেয়েও জোরে জোরে তিনি বকবক লাগালেনঃ

"চুল্‌বুল চুল্‌বুল লাগে নাকি ভায়া? উঁহু।......হ্যাঁ দু একটা কথা, যা খুব জরুরি, তা চলতে পারে।......দস্তুরমতো মেরামত করে আপনাকে আপনার রেজিমেণ্টের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে—এ আমার কর্তব্য। আর আপনার কর্তব্য হল—যত শীঘ্র সম্ভব সুস্থ হয়ে ওঠা; বুঝলেন ভায়া।......ওঁকে ঘুমের বড়ি দিন নার্স।"

"রোকো দোস্ত, বাকী পথ আমি হেঁটেই যাব", কুজ্মা কুজ্মিচ বল্ল।

"হাঁটবে কেন?"

"বাবা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। আমি ওখানে যাব তীর্থযাত্রীর মতো, বুঝেছ?"

"তোমার ব্যাপার, যা তুমি বোঝ......"

মোটাসোটা ঘোড়াটাকে থামিয়ে দেয় লাতুগিন। ওপরে প্রাচীন উইলো গাছ থেকে পাতা ঝরা শুরু হয়েছে, নীচে একটা বাঁধ; সেই বাঁধের পাশে খানাখন্দওলা রাস্তাটা, তার মাঝখানে ওরা দাঁড়িয়ে। পুকুরের ওপারে স্পাসকোই গ্রাম। পুকুরের সমতল কিনারা পর্যন্ত নেমে এসেছে গাঁয়ের ঝাড়াই ঘরগুলো—ভেতরে তাজা খড়ের গাদা। মাটকোঠার মাথায় খাসা তপ্ত আর পরিপাটি ছনের ছাউনি—তার ওপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

"আহা, গ্রামময় সামোগন (মদ) চোলাইয়ের গন্ধ", বলে শ্বাস ফেলে লাতুগিন। বাঁধের ওপর দিয়ে গদাইলস্করি চালে হাঁসের পাল চলেছে, দিব্যি চিকণ হাঁসগুলো, সেদিকে ওর নজর গেল। গাড়ি নিয়ে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালের গোদা মদ্দা হাঁসটার পছন্দ হয় না, থেমে পড়ে। অমনি ওর পেছন পেছন গোটা পঞ্চাশেক মাদী হাঁসও থেমে পড়ে। প্যাঁক প্যাঁক করে কত সলা-পরামর্শ হয়, তারপর হেলে দুলে বাঁধের ঢালুটার দিকে চলে—পেটে-জমিতে প্রায় একসই। শেষ পর্যন্ত হাল্‌কা হাওয়ার ধাক্কায়ই যেন সর্‌ সর্‌ করে কালো জলে নেমে যায়, অপর পারে জলা জমিটার দিকে রওনা হয়।

"আহাহা, সাত সের হবে এক একটা—কী হাঁসই রে!" বলে লাতুগিন "রোস্ট কর, রোস্ট কর বলেই ডাকছে যেন মাইরী!"

"কেটে পড় দোস্ত, কেটে পড়!"

তাড়াতাড়ি বিদায় নমস্কার জানায় কুজমা কুজমিচ। "হ্যাঁ, আর কমিসারকে বলে দিও—আমি আপাতত এখানে থাকছি—ঘুরে টুরে দেখব কি ব্যাপার। খাদ্যবাহিনী নিয়ে তোমরা এসো—এক হপ্তা পরে। ভাবসাব ক'রেই সব গুছিয়ে নেব।"

"কুজমা, এখানে তো দেদার টানবে বাবা!"

"ওসব জিনিস কখনো ছুঁইওনে আমি, বুঝেছ দোস্ত। এখন যাও, ঘোড়া ফেরাও—নইলে কে হয়তো আমাদের একসঙ্গে দেখে ফেলবে......"

গাড়ী ঘোরালো লাতুগিন। ঘোড়াটার মোটা পাছার ওপরে মহারাগে কঞ্চির বাড়ি কষিয়ে হাঁকিয়ে চলে গেল, পিছু ফিরে চাইলও না একবার। গাঁয়ে যাবার জন্যে কুজমা কুজমিচ তখন বাঁধ পার হচ্ছে। বহুদিন আগে পাদ্রির জোব্বা থেকে জামা বানিয়েছিল, কালে কালে সেটা সবুজ হয়ে গেছে। ছাপানো রুমাল দিয়ে সেই জামাটাকে ও কোমরের সঙ্গে বেঁধেছে, রেড আর্মির চটের কিটব্যাগ ঝুলিয়েছে কাঁধে, আর মাথায় উঁচু ক্রাউনমার্কা টুপি—পোড়াকপালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্মৃতি সে টুপিটা। মোদ্দা কথা, ওর বেশভূষা ঠিক যেমনটি চাই তেমনিই।

গ্রাম দেশে শরতের শেষ দিকটা বড়ই একঘেয়ে। ফাঁকা সব্জি ক্ষেতে ওল্টানো চাবড়াগুলোর ওপর চেরি আর আপেলের ঝরা-পাতা গাদা হয়ে আছে, সন্ধ্যার হিমে সেগুলো ভিজে উঠেছে। সূর্যমুখী ফুল আর নেই (কুঁড়েঘরের ছোট ছোট জানলার গায়ে সূর্যমুখীই বুঝি সূর্যের আলো টেনে নিয়ে আসে—লোকের এই ধারণা)—পচা ডাঁটিগুলো শুধু মাটির ওপর মাথা জাগায়। একেবারে ঘরের দোর পর্যন্ত সর্বত্র কাদায় কাদাময়। রংচটা খড়খড়িগুলো ক্যাঁচকোচ, ঝন্ঝন্ করে ওঠে। জানলার বাইরে চেয়ে দেখতে ইচ্ছেই করে না। যদি চাও তো শুধু একটা বিরসবদন কাক দেখতে পাবে—ওয়াট্লের বেড়ার ওপর। খুঁটে খাবার মতো কিছু যদি ফেলে দেয় চাষী-বৌ সেই আশায় বসে আছে।...

"জড়ের জীবন ওদের, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর গা চুলকোয়। তীব্র অনুভূতি-গুলো সব সুপ্ত, এমন কি ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দৌড়ও অতি সামান্য।...... অথচ ওদের প্রত্যেকেই তো আরিস্টট্ল কি পুশকিনের সঙ্গে এক ছাঁচে গড়া। প্রত্যেকেরই দু-দুটো চোখ—নতুন থেকে নতুনতর কত বিস্ময় পৃথিবীতে তা তো সেই চোখ মেলেই দেখতে পারে।......কাঁধের ওপর মাথাও আছে—সেটাই তো সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের জিনিস।......" (এই বলে উঁচু টুপিপরা মাথাটা যেন শূন্যেই ছুড়ে ফেলে কুজমা)। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনায় মাথাটা অবিশ্যি কিছুই নয়, ওটা নেই বলেই ধরা যায়। কিন্তু গোটা জগতের সঙ্গে তুলনা করলে এই মাথাটা অবিশ্যি নেই বলেই ধরতে পার। কিন্তু গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই তো আবার এই মাথার মধ্যে—বাইবেলের ঈশ্বরও যে রহস্যের সন্ধান পায় না তার সন্ধান বার হয় এই মাথা থেকেই।......তাহলে জানালার বাইরে কাক দেখে দেখে জীবনটা নষ্ট করে লাভ কি?"

এমনিধারা চিন্তায় মশগুল কুজমা কুজমিচ পরম সন্তোষে ঠোঁট চকচক করতে করতে চলেছে। নীচু নীচু ওয়াট্লের বেড়া, তারপর ছোট ছোট কুঁড়েঘর—ছনের ছাউনির গুরুভারে ঘরগুলো যেন বসে গেছে—সে সব ও পার হয়ে যায়। চলতে চলতে একটি মেয়ে সামনে পড়ল—হাই বুট আর খাটো শীপস্কিন জ্যাকেট প'রে বাঁকে ক'রে দু বালতি জল নিয়ে যাচ্ছে। লম্বাচওড়া, সমুন্নত গড়ন মেয়েটির। কিন্তু ভাবগতিক সুবিধা নয়।

"শুভদিন! তোমার নাম নাদেঝদা তো? ঠিক বলিনি?"

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চওড়া মুখটা ধীরে ধীরে ওর দিকে ফেরাল।

"হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?"

"আমি দৈবজ্ঞ।"

"দৈবজ্ঞ আর নেই আজকাল। চালাকি রেখে সরে পড় দেখি বাপু!"

"আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?" বলে কুজমা কুজমিচ। "বেশ আমি স্তেপে ফিরে গিয়ে সমাধিস্তূপ গুণে বেড়াব। একলা মানুষের পক্ষে পথটা দূর, বড্ড দূর। বড্ড দূর, সত্যি, ভগবানের দিব্যি......"

মেয়েটির ঠোঁটদুটি একটু কাঁপে। চলে যাওয়ার ভাব করে আবার থেমে পড়ে। আগন্তুকের শেয়ানা, হাসি-হাসি মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়। কুজমা কুজমিচ হাত দুটো সামনে ছড়িয়ে দিল ঝট ক'রে।

"যখন ঘুম পায় তখন আমার খড়ের গাদা আছে। ক্ষিদে পেলে কিছু না কিছু চুরি করে আনতে পারব নিশ্চয়ই। ......ওসব তো আমি চাই না বাছা। ছুঁচলো পাথরের ওপর খালি পায়ে হেঁটেছেন কত অবতার—তা বলে ধর্মপ্রচারে কি ক্ষান্ত দিয়েছেন? মহাত্মারা সব থামের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেন—পঙ্গপাল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন।......পঙ্গপাল কি জান? ফড়িং।......এত কষ্ট তাঁরা সয়ে গেছেন কেন? বল, বল না! ওই দেখ, তুমি ভাবতে লেগে গেছ।......" (ঠোঁট বার ক'রে কুজমা এগিয়ে আসে) "মানুষকে ভালবাসতেন তাঁরা।......অলৌকিক কাণ্ড এই মানুষ, প্রত্যেক মানুষ। আর নাদেঝদা তুমি তো ডবল অলৌকিক।...... আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান? তোমাদের গম ঝাড়া সারা, সামোগনও তৈরী, শুয়োর-মাংস রোস্টের সুগন্ধ ছ'ড়াচ্ছে......যা চাই তা সবই আছে তোমাদের।...... কিন্তু আলো নেই...আলো।"

"কেরোসিন বেচতে এসেছ নাকি গো?" ঘাড় বেঁকিয়ে ওর দিকে চেয়ে মেয়েটা বলে। ওর আত্মবিশ্বাস খানিকটা ঢিলে হয়ে এসেছে।

"উঁহু, আমি কিছু বেচতে আসিনি। ভিক্ষেটিক্ষেও চাইনে। আনন্দ পাব বলে এলাম তোমাদের কাছে, তোমাদেরও আনন্দ দিতে চাই।"

মেয়েটি চুপচাপ; ধূসর জলাশয়ের মতো টানা চোখে আর একটা দৃষ্টি হানে শুধু। হাঁটু নুইয়ে বালতি দুটো মাটিতে বসিয়ে বাঁকটা তার ওপর আড়াআড়ি করে রাখে।

"গাঁয়ে সবাই মনমরা, আনন্দ আর আমাদের কেউ দিতে পারছে না।......তা আপনি কেমন ক'রে দিতে চাও?"

"যখন বলছি তখন উপায় একটা জানি নিশ্চয়। আমি যে নামকাটা পাদরি।"

মেয়েটি একেবারে হাঁ। হাঁ-টা এত সুন্দর, আর দাঁতগুলি এমন ধবধবে সাদা, এত সমানভাবে পংক্তিবাঁধা, যে খুশিতে কুজমা কুজমিচ পা ঠোকে আর কি! সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখে দূর-দূর ভাবও হঠাৎ একেবারে খসে পড়ল—যেন হাওয়ায় উড়ে গেছে।

"তাই নাকি!" বলে সে চেঁচিয়ে উঠে বুকের ওপর হাত রাখে—ওখানটা

এত টাইট যে, বোতামের নীচে জ্যাকেটটা ফাঁক হয়ে গেছে। "তাই নাকি!" বলে মেয়েটি আবার চেঁচায়, চওড়া উরু-জোড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে। "তবে আমাদের ঘরে এস না গো।......বাবা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। গির্জার চাবি তো তাঁরই হাতে।......"

"না, সে হবে না। তোমাদেরই আমার কাছে আসতে হবে—বুঝলে গো কালো ভুরুওয়ালী......"

চোখের ইশারা করে অমায়িক ভঙ্গিতে ঘাড়টা পেছনে হেলিয়ে দেয় কুজমা, তারপর গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলে। দরিদ্রতম কুটির কোন্‌টি তারই সন্ধানে চোখ মেলে রেখেছে।

অবশেষে একদিন চোখ থেকে ব্যাণ্ডেজ সরানো হ'ল। তখন সন্ধ্যা। আধখোলা দরজার পেছনে নার্সের ভীরু ফিসফিস আওয়াজ শোনা যায়—কি যেন বলছে ..ডাক্তার ক'বারই বললেন, "দূর! মানুষ তো আর চারা নয়। যা বলছি তাই করুন.... বিছানার ধারে ফিরে এসে নার্স নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল—এত নীচু যে ওর চিকণ চুলের ছোঁয়া লেগে ইভান ইলিয়িচের নাকটা সুড়সুড় করে ওঠে। তারপর ও ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে দিল। তখন আর খসখস কি ফিসফাস শব্দ নয়, দ্বিধায় ক্ষীণ হলেও ওর কণ্ঠস্বরই পৌঁছায় ইভান ইলিয়িচের কানে। ও কণ্ঠস্বর ইভান ইলিয়িচ এই প্রথম শুনলঃ

"আলোটা অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করে একদম স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন।"

এত দীর্ঘদিন ধ'রে অন্ধকারে থাকার পর প্রথম চোখ খুলতে একটু ভয় ভয় করে বৈকি। যা দেখে সবই ঝাপ্‌সা। পর্দার বদলে জানলায় যে কম্বল ঝুলত তার এক কোণা তুলে দেওয়া হয়েছে, তাই ঘরটা আধো আলো, আধো অন্ধকার। খাটের পায়ের দিকে ছোট একটা টেবিলের ধারে নার্স বসে আছে। ইলিয়িচ ওর মুখের চেহারা ঠিক ঠাওর করতে পারে না, কারণ একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে কি করতে করতে সে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

ইভান ইলিয়িচ চিৎ হয়ে শুয়ে রইল, মুখে মৃদু হাসি, মাথার ওপর ছাতটা ঢালু—নিশ্চয়ই ওখান দিয়ে চিলে কোঠার সিঁড়ি—আর বুদ্‌বুদ-আঁকা জানালাটাও ওখানেই। এমন সুন্দর জায়গা ওর কাছে আশাতীত।......হঠাৎ আর এক জায়গার স্মৃতি চুপি চুপি মনের মধ্যে উঁকি দেয়, মনে হয় নতুন-গজানো চামড়াটা কে যেন ঘায়ের ওপর থেকে টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে। স্মৃতিতে জাগে ধোঁয়া আর ভীম গর্জনের শব্দ, গহ্বরের পর গহ্বর যেন মাটি খুবলে বের করে এনেছে, আর গন্ধকের রংয়ে রঙীন বিস্ফোরণ একটা—বিস্ফোরণে চোখটা ঝলসে উঠে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল।......"না, না, ও না", বলে মনে মনে—স্মৃতিগুলো মাথার মধ্যে

ঢুকে বসার আগেই চেষ্টা করে তাড়িয়ে দিতে।......কানের মধ্যে আবার সেই ঘড়ির টিক টিক—জীবনের মসৃণ অবকাশগুলোকে মেপে মেপে চলেছে, অনায়াসে।......

“নার্স”, বলে ডাকে ইভান ইলিয়িচ। “আপনাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিনে।”

নার্স ঘাড় হেলায়। হাঁটু গড়াতে গড়াতে ব্যাণ্ডেজটা খুলে পড়েছিল, আবার সেটাকে জড়াতে থাকে। ওর চলন তো বেশ হাল্‌কা, নিশ্চয়ই বয়স বেশী নয়।......কিন্তু কত অভিজ্ঞতা! ওর মুখটা দেখতে চায়, কিন্তু অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসে। নার্সের গায়ে মোটা লিনেনের লম্বা জামা আর ঘাড় পর্যন্ত রুমালে ঢাকা—ঠিক যেন স্ফিংক্‌স মূর্তির মস্তকাবরণ—সেই জামা আর রুমালের অস্পষ্ট ছায়াছবি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

“আহা বুঝেছি, বুঝেছি......বেচারীর মুখে বোধহয় বসন্তের দাগ; কিংবা দেখতে হয়তো কুৎসিত। আমি ওর কাছে কত কৃতজ্ঞ তা অবশ্য বুঝছে নিশ্চয়।” ইভান ইলিয়িচ লম্বা শ্বাস ফেলে। “আহা, এ রকম মেয়ে অনেক আছে—কোমল আর অনুরক্ত—চরম মুহূর্তে পর্যন্তও সঙ্গের সাথী। এর নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধি আছে—সাদামাটা চেহারার মেয়েরা বুদ্ধিমতীই হয়।......এমন ধারা মেয়েদেরই বিয়ে করতে হয়, ভালওবাসতে হয়।......কিন্তু লোকে যে কী! মুখটি সুন্দর চাই, পুতুলের মতো চোখের পাতা চাই, পাশে শুয়ে ফিসফিস করে আবোলতাবোল বকা চাই—তারই জন্যে মরে তারা। দাশার কথা আলাদা, শুধু তার রূপের জন্যে তো তাকে ভালবাসিনি......।” চোখ বুজে হাতের ওপর গাল রাখে ইভান ইলিয়িচ। নিজেকে শোনায়, “মিথ্যে কথা, অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যেই তাকে ভালবেসেছিলে তুমি। আর সেটাই সে চায়নি......।”

নার্স নিশ্চয় ভেবেছিল যে ও ঘুমিয়ে পড়েছে—তাই নিঃশব্দে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। অনেকক্ষণ বাইরে। শেষকালে দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল, হলদে রঙের নিষ্প্রভ আলো দেখা গেল। ইভান ইলিয়িচ নড়ে না, আধখানা চোখ খুলে চায়। দেখে দাশা ভেতরে আসছে—পরনে সাদা পোশাক আর মাথায় মস্তকাবরণ, নার্সদের মতো। তার হাতে ছোট্ট একটা টিনের বাতি—স্বচ্ছ, রক্তাভ আঙুল দিয়ে শিখাটিকে ঘিরে রেখেছে। দাশাকে দেখে একটুও আশ্চর্য হয় না ইলিয়িচ, তবে বিশ্বাস করে না যে এ দাশা সত্যি দাশা।

বাতিটা টেবিলে রেখে পলতে কমিয়ে দিল দাশা, তারপর বসে বসে চেয়ে রইল ইভান ইলিয়িচের দিকে। ছোট্ট মেয়ে সবে টাইফাস থেকে উঠলে মুখের চেহারা যেমন হয়, ওর মুখটাও তেমন। ঈষৎ ফোলানো ঠোঁটের দুপাশে দুটি রেখার আভাস। এক ধারের গালে আর চোখে আলো পড়েছে, মনে হয় চোখটি যেন খুব বড়, খুব শান্ত; বিন্দুর মতো বাতিটার প্রতিবিম্ব জ্বলছে চোখের মণিতে। ও বোধহয় অনেক রাত জাগবে—তাই হাঁটুর ওপর কনুই, আর হাতের তালুতে থুতনি রেখে প্রস্তুত হয়েই বসেছে। দাশা ছাড়া আর কেউ তো অমন বসতে পারে না

......পিতার্সবুর্গে তেলেগিনের ফ্ল্যাটে সেদিনের সেই সন্ধ্যা—‘গতানু-

গতিকতাবিরোধী সংগ্রাম কেন্দ্রে’ দাশাকে যেদিন তেলেগিন প্রথম দেখেছিল : ওকে লেগেছিল বসন্তের মতো অপরূপ। কালো ছিটের পোশাকে গরম বোধ হওয়াতে দাশার গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে, আর ঘরের মধ্যে অভিযান করেছে অতি সূক্ষ্ম কোমল সুগন্ধ : সেই ঘর, যেখানে কাঠের গুঁড়ির ওপর তক্তা পাতা—কবিরা বসেছেন ‘মহান পাষণ্ডাচারে’। হাতের ছোট্ট মুঠিটির ওপর ওর থুতনি—পুরন্ত, সূক্ষ্মাগ্র ঠোঁটে এসে ঠেকেছে কনিষ্ঠ আঙুলের ডগাটুকু—আড়ম্বরপূর্ণ কবিতা শুনছে বসে বসে। ওর বসার আসনটি নিজের ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তেলেগিন, পরে......

দুটি হৃদ্‌স্পন্দনের মাঝখানে এতগুলি স্মৃতি ঝিলিক মেরে যায়। বুকের মধ্যে হৃদয়টা আঘাত করে জোরে, আরও জোরে—যেন মধ্যরাত্রে পাহারাদারের ঘণ্টার শব্দ। খাটের পায়ের কাছে টুলের ওপর যে মেয়েটি—সে কি দাশা হতে পারে? স্থির হয়ে শুয়ে অর্ধনিমীলিত চোখের আড়াল থেকে সাগ্রহে দাশার পানে চেয়ে থাকে তেলেগিন।......দাশা নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছিল—কারণ সে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল......

“নার্স!” চক্ষু বিস্ফারিত করে তেলেগিন চেঁচিয়ে ওঠে, চেষ্টা করে উঠে বসতে। অস্ফুট চীৎকারের শব্দে দাশা ওর কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল—সে চীৎকারে আনন্দের সঙ্গে চমক মেশানো।......ওর দুই কাঁধ দু হাতে ঘিরে ধরেছে তেলেগিন—স্বপ্ন হয়ে আবার না মিলিয়ে যায়।......হ্যাঁ দাশাই—রোগা, ঠুনকো, কিন্তু জীবন্ত! ওর মুখটা মুখে চেপে ধরে তেলেগিন—অনুভব করে কেমন ক’রে কাঁপছে দাশার ঠোঁট দুটি, দাশার সর্বাঙ্গ।......ওর মাথাটা দু হাতে নিয়ে একটু দূরে সরিয়ে ধরে—আরও ভাল করে মুখটি দেখবার জন্যে। ঐ মুখটি যে প্রিয়র চেয়েও প্রিয়, নতুন হতেও নতুনতরো, আশাতীত রকমের সুন্দর চিরকাল। আর দাশা, চোখ বুজে একই কথা বলে বার বার:

“আমি তোমার কাছে আছি—সব ঠিক হয়ে গেছে......”

দুঃখেকষ্টে দাশার মুখের কোণে চুলের মতো সূক্ষ্ম দুটি রেখা পড়েছে; সেই মুখে ও চুমু দেয়, চুমু দেয় দাশার নিমীলিত চোখে।

“এখন স্থির হও ইভান, প্রিয়তম,” মৃদু স্বরে ও বলে। “আমি আর কখনো যাব না, তোমার সঙ্গে থাকব চিরদিন, চিরকাল......”

সন্ধ্যার মধ্যেই সারা গ্রামে রটে গেছে—ঐ যে আনা ব্রেখ্‌ঝিল্‌নায়া নামে গরীব বিধবা—তার ঘরে এক অতিথি এসেছে; গাঁয়ের পথে নাদিয়া ভ্লাসোভাকে দেখে অতিথি নাকি তাকে খবর দিয়েছিল যে সে পাদ্রী, এসেছে রেডদের কাছ থেকে, এবার ওদের সবাইয়ের মনের ভার ঘুচিয়ে দেবে। জোয়ান, বুড়ি প্রত্যেকটি মেয়েলোকই বিশ্বাস করেছে কথাটা। নাদিয়ার জিভ তো হায়রাণ, বার বার একই কাহিনী শোনাতে হচ্ছে : বালতি নিয়ে যেতে যেতে কেমন যেন গা’টা চমকে

চমকে উঠেছিল, তারপর হঠাৎ লোকটির ডাক শুনলঃ “নাদেঝদা!” (এই পর্যন্ত এলেই ওর মহিলা শ্রোতারা কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে ওঠে: “কী আশ্চর্যি, ওর নাম জানল কেমন করে?”)। “ও যে জ্যোতিষ!” খাঁটি রুশিয়ানের মতো মুখটা তার—লাল টকটকে—আর চুল একেবারে কাঁধ পর্যন্ত। দীনদরিদ্দির বেশ, কিন্তু খেতে পায় না বলে তো মনে হয় না; তার ওপর হাসিমস্করার ঝুড়ি, হেঁয়ালিতে কথা কয়......”

মেয়েদের কলরবলর শুনে পুরুষেরা হাসে। “আহা জ্যোতিষ মশাই গাঁয়ের এ মুড়ো থেকে সে মুড়ো পয্যন্ত আগুন লাগিয়ে দেবে না তো।......ও যদি সত্যিই পাদরি হত তাহলে ধনীর ঘরেই যেত সব প্রথমে।......ত্রেখ্‌ঝিল্‌নাইয়ার ঘরে তো তেলাপোকারও খাবার জোটে না।......না গা না, ওকে গ্রাম-সোবিয়েতে নিয়ে যেতে হবে, কাগজপত্র আছে কিনা দেখাক।......হয়তো বেটা লুটেরাদেরই গুপ্তচর।......যদি তাই হয় তখন কি করবে?”

“ঢের হয়েছে, এবার নাক সিঁটকোনা থামাও,” জনৈকা গিন্নী বল্লেন তাঁর কত্তাকে। “তোমাদের কথা শুনলে লোকের হাসি পায়।” অমনি সব মেয়েই এ কথায় একবাক্যে সমর্থন জানায়। “বিপ্লব হবার আগে তোমাদের হুকুম শুনেছি!” নির্ভয়ে চোখ ঝলসিয়ে গিন্নী বলে চলেন, “সে সব হুকুম থেকে কখনো কিছু ভাল হয়েছে?” ইয়া মোটা মাজার ওপর হাত রেখে দাঁড়ান এবার। “তোমাদের মাথাও যেমন, আমাদের মাথাও তেমন—আর আমাদের বুদ্ধি তোমাদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী। দেখ গা বাছারা”—বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সম্বোধন করেন, “আমার নাদিয়ার দিকে একবার শুধু চেয়ে দেখ তোমরা! বেলাউসে তো আর আঁটে না......। খালি খালি আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আর আমায় ডেকে ডেকে বলে, ‘মাগো, আমার কি হবে গো?’ তা ছুঁড়ি কি করে বল দিকি—সেই সামনে বছরের পুণ্যে পর্যন্ত আবার বসে থাকবে নাকি?” এবার স্বামীর দিকে ফিরে: “সে লোকটি তোমার এখানে মাংসের রোস্ট সাবড়াতে আসেনি কেন জানতে চাও? যীশু কি শুধু বড়লোকদের কাছে গেছলেন নাকি? দুখিনী আনার কাছেই তো ও যাবে, ও যে রেড পাদরি; ও তোমার মাংসের রোস্টের পিত্যেশ করে না, আমাদের দুন্দশার কথা ভাবে।”

কত্তা আর কি করেন—গিন্নীর সামনে হাতটা দুলিয়ে ওখান থেকে সটকান। সন্ধ্যে বেলা আনার কুঁড়ের বাইরে যত রাজ্যের মেয়েদের জটলা—তাদের মুখপাত্রেরা ভেতরে গেছে। ঘরে ঢোকার আগে পাশের বাড়ীর ছোট্ট একটি মেয়ে মুখপাত্রদের খবর দিল : সেদিন সকালে আনা ত্রেখ্‌ঝিল্‌নায়া তার চানের ঘরটা নাকি গরম করে দেয় (চানের ঘর মানে পুকুরপাড়ে কুঁড়ে ঘরগুলোর পেছনে কালিপড়া অখাদ্য ঝোপড়ি একটা) আর পাদরি মশাই সেখানে চান করে। তারপর আনা তার স্বর্গত স্বামীর একটা পরিষ্কার শার্ট পরতে দিয়েছে ওকে। চান টান সেরে আনা আর পাদরি দুজনে বসে ওষুধপাতার চা খেয়েছে (গ্রাম দেশে এই পানীয়ই চায়ের স্থান পূর্ণ করে)।

হ্যাঁ তো, ঐ তো রং-ওঠা নীল শার্ট পরে বেঞ্চিতে বসে আছে পাদরি মশাই—হাত দুটো টেবিলের ওপর। সত্যি বলেছে নায়িদা—ওর মুখটা এমন লাল, যে দেখবে সেই ভয় পাবে—কিন্তু খোশমেজাজী হাসি উঁকি দেয় ঠোঁটের কোণে। কাঠকুটোর আগুনে ডিম ভাজছে আনা; উনুনের ধোঁয়ার চোঙা আর সামোভারের মধ্যে একটা নল লাগানো, নলের ফুটো দিয়ে গমগমে নীল আগুন চোখে পড়ে।

মুখপাত্র তিনজন। ভেতরে ঢুকে মাথা নুইয়ে বল্লেন: "শুভদিন!" তারপর দরজার কাছে বেঞ্চের ওপর বসলেন। তাঁরা কোনো প্রশ্ন করেন না, কিন্তু একটি জিনিসও যে তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে তার জো-টি নেই।

"আপনারা কি মনে ক'রে?" হঠাৎ জোরে বলে ওঠে কুজমা কুজমিচ। মুখপাত্ররা চোখ মিটমিট করেন। তারপর একজন, তিনি নাদেঝ্দার মা, অতি মিষ্টি সুরে জবাব দেন :

"পুরোনো আচারটাচার সব নাকি উঠে গেছে শুনি। কিন্তু বাবা, পুরোনো আচারই আমাদের পছন্দ। এ-ই লম্বা জীবনে বিয়ে তো একবারই হয়।......কি বলেন বাবা।"

"যত বেশী বাঁচবেন, সম্পত্তিও ততই বাড়বে", কুজমা বলে। "তো দেরি কিসের?"

"না না আমাদের ভয় করবেন না, আমরা সোবিয়েতেরই পক্ষে। আমরা গ্রাম-সোবিয়েত নির্বাচন করেছি, ভোটও দিয়েছি সোবিয়েত-রাজত্বের জন্যে, গির্জার দর্জায় একেবারে সীল এ'টে দিয়েছি আমরা, প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে পাদরিটাকে জেলার গোয়েন্দা অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে,—বে-আইনীভাবে ও নিজের কাছে একটা মেশিনগান রেখে দিয়েছে কিনা।"

"ওহো!" বলে কুজমা কুজমিচ। "আপনাদের পাদরি দেখছি ওস্তাদ লোক।"

"পাদরিটা আমাদের কী ভয়ই দেখাত তা যদি জানতেন। বলত ঃ 'ওরে খৃস্টবিরোধীর দল, জানলা থেকে তোদের মিটিংয়ের ওপর ম্যাক্সিম গানের গুলি চালাব।' এম্‌নি কত চেষ্টা করত যাতে আমরা ভয় পাই।......তা আমাদের কুমারী মেয়েরাও আর সকলের সঙ্গে এক দিকেই ভোট দিয়েছে। কিন্তু 'হোলি ভেলের ভোজ'পরব আসছে, গির্জায়ই বিয়েটা হয় এই ওদের ইচ্ছে। ওরা সবাই মিলে একেবারে এক-জোট, এক গোঁ—ছুঁড়ীরা জোট বাঁধলে ছাড়ান কী শক্ত তা তো জানেনই বাবা। এখন বলুন দেখি কি করি আমরা। সত্যি কি আপনি নাম-কাটা পাদরি?"

"খুব সত্যি", জবাব দেয় কুজমা কুজমিচ।

"নাম কাটা গেল কি জন্যে?"

"স্বাধীন চিন্তার জন্যে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে।"

ভয়ে ভয়ে মুখপাত্ররা এ ওর মুখ চায়। দুজনের কানে ফিসফিস করে

নাদেঝ্‌দার মা, তারা আবার ওকে কি বলে কানে কানে। তারপর নাদেঝদার মা কথা বল্ল, সুর একটু চড়া এবারঃ

"আপনি বিয়ে দিলে তাহলে আসল বিয়ে হবে না?"

"কেন হবে না? মেয়েদের ইচ্ছে নিয়ে কথা।......বিয়ে দিয়ে খাতায় একেবারে রেজিস্ট্রি করে দেব—'সার্বভৌম সভা'রও সাধ্য নেই যে, সে বিয়ে ভাঙে। কনের মাথায় এমন মুকুট পরিয়ে দেব, মনে হবে যেন রুইতনের বিবিটা। বর-কনেকে বেদী প্রদক্ষিণ করাব—সওয়ালজবাব, মন্ত্রতন্ত্র, যা যা পড়াতে হয় সব পড়িয়ে দেব—তারপর নিশ্চিন্ত মনে খাও দাও, ফুর্তি করো। আর কি চাই?"

দ্বিতীয় মুখপাত্র বল্লেনঃ

"খোকাখুকী কত রয়েছে—তাদের না হয়েছে বাপ্‌তাইজ, না হয়েছে নামকরণ।"

"কত?"

"অনেক। যদি চান গুনিয়ে দেব 'খুনি।"

"তা বাপ্‌তাইজ হয়নি বলে কি কিছু কম মেই টানে তারা?"

মুখপাত্রদের মধ্যে আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি, কাঁধ ঝাড়াঝাড়ি। বিধবা গৃহকর্ত্রী ডিম-ভাজার কড়াটা টেবিলের ওপর রেখে উনুনের ধারে ফিরে গেল—তারপর নির্বিকারভাবে চেয়ে রইল কুজমা কুজমিচের দিকে। কুজমা তখন ভাজা ডিমগুলো মুখে তুলছে, চামচ দিয়ে—খাওয়ার আরামে চোখ দুটো বুঁজে এসেছে।

"হুঁ, তা বাপতাইজ ক্রিয়াটা ঠিক মতো হবে তো?"

"মনে হবে মহাত্মা ভ্লাদিমিরি স্বয়ং এসে করে গেছেন।"

"তা আপনার তো সহকারী ডীকন নেই, মন্ত্র-গানের দোয়ার টোয়ারও নেই—আপনি ক্রিয়াকর্ম সারবেন কি ক'রে?"

"ওসব আমার কি দরকার? হরেক রকম গলা করে আমি একাই সব সেরে নেব।"

এবার নাদেঝ্‌দার মা একেবারে ওর পাশে ঘেঁষে এলেন, টেবিলে হাত বাজিয়ে বল্লেনঃ

"আপনার দক্ষিণা কি খুব বেশী?"

তখনি জবাব দেয় না কুজমা। নাদেঝ্‌দার মা বড় বড় শ্বাস ফেলছেন, হাতটা বুঝি একটু কেঁপে উঠছে। দরজার কাছ থেকে অন্য দুজন উদ্‌গ্রীবভাবে ঘাড় বাড়িয়ে দিয়েছেন।

"এক পয়সাও চাইনে আমি, বুঝলেন! আমি পয়সার জন্য আসিনি। লাইসেন্স তৈরী করার জন্যে গ্রাম সোবিয়েতের কেরানিকে যা দেবার দেবেন—ব্যস আর কিছু লাগবে না।"

খুবই লোভনীয় কথা, কিন্তু ভয়ও লাগে। লোকটা মানুষ বেশে নেকড়ে নয়তো? এই তো মোটে দু হপ্তার আগের কথা—গাঁ তখনও আতামান মামন্তভের

দখলে—ঠিক এমনি একটা লোক এসেছিল গাঁয়ে। খালি পায়ে গালোশ পরা, দাড়ি একেবারে চোখ পর্যন্ত। দিন তখন শেষ—বাড়ির সামনে বসে লোকজন জিরোচ্ছে—লোকটা সেখানে হাজির। ওকে দেখে দেখে লোকের চোখ সয়ে যেতেই বসে পড়েছে আকিম দাদুর পাশে। ভেবেছিল কেউ বুঝি একটা বিড়ি দেবে, কিন্তু কেউ দেয় না। তখন ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বুড়োর কানে কানে ফুসফুসঃ "আরে, পুরানো সিপাহী, আমাকে চেন না?" "না মশায়।" তখন আরও গুহ্য কায়দায় ফিসফিস করেঃ "তবে শোনো—আমি হচ্ছি সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাই। একাতারিনবুর্গে ওরা যাকে কোতল করেছে, সে আমি নয়। গোপনে গোপনে ঘুরে বেড়াই আমি, সময় হলে সবাইকে জানিয়ে দেব।" ......আকিম দাদু আবার কানে খাটো—কি বলছে স্পষ্ট শুনতে পায় না—তাই লোকটাকেও গলা চড়াতে হয়। আর যায় কোথা, গাঁয়ের লোক তো আর বুদ্ধু নয়, লোকটাকে ধরে টেনে নিয়ে চল্ল বাঁধের পাড়ে—জলে চুবিয়ে শেষ করবে। "ভাই সব! ভাই সব! আমি শুধু মস্করা কচ্ছিলাম" বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কোনো রকমে লোকটা প্রাণে বাঁচে।

"আপনাকে তো আহাম্মকের মতো দেখায় না বাপু—তাছাড়া আহাম্মকদের দিন তো আর নেই", নাদেঝ্‌দার মা বলেন। গরমে তিনি তখন জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেলেছেন। "তা আপনি টাকা পয়সা নেবেন না কেন? আপনার মনের ইচ্ছেটা কি? আপনাকে বিশ্বাসই বা করি কি করে?"

"আমি নুন ভালবাসি। যে যে খামারে বিয়ে দেব কিংবা বাপ্‌তাইজ করাব সেখানে তারা যেন একটু করে নুন দেয় আমাকে।" চামচ নামিয়ে বিধবা আনার দিকে চায় কুজমা কুজমিচ। "সামোভারটা আন তো গা! আচ্ছা এর দিকে চেয়ে দেখুন—" মুখপাত্রদের সম্বোধন ক'রে আনার দিকে আঙুল হেলায়। আনা রোগা, বুকটা সমতল, আনত কালো মুখ—সেলাইকরা ঘাগরাটা গোটানো। "ও আমাকে বিশ্বাস করে—যেখানে যাব সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। আর আপনারা যারা খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বাগিয়েছেন—আপনারা শুধু লোকের মধ্যে খারাপই খুঁজে বেড়ান—বদমায়েস বদমায়েস বলে সব সময়েই সন্দেহ আপনাদের। আপনারা কুলাকের গুষ্ঠি—দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল। আমাকে চটাবেন না—যদি চটান তাহলে ভোর হবামাত্র আমি রওনা দেব—যাবার জায়গার অভাব কি?"

টেবিলের ওপর সামোভার রাখে আনা। ও হাসছে, শাদামাটা অস্থিচর্মসার মুখটি আনন্দ-উদ্ভাসিত—মুখপাত্র গিন্নীরা তা দেখতে পান। ওর সর্বাঙ্গে শ্যেনদৃষ্টি বুলিয়ে নেন নাদেঝ্‌দার মা।

"রাজি!"—বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন কুজমা কুজমিচের দিকে। "রাগ করবেন না। আপনার যা চাই সব যদি এখানেই পান তবে দূরে যাওয়ার কি দরকার?"

পরদিন ভোরবেলা ঘণ্টাঘরের মাথায় চড়ে প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল কুজমা কুজমিচ। গাঁ-ময় ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দ, বুড়োবুড়ী সব জানালায় জানালায়

হাজির। আরও দুবার বাজানোর পর কুজমা এবার ছোট ছোট ঘণ্টাগুলোর দড়ি ধরে দ্রুত তালে বাজিয়ে চল্ল—তারপর আবার সেই দেড়শো-মণী ঘণ্টা—ঢং ঢং! ধার্মিক লোকেরা কপালে হাত ঠেকাতে না ঠেকাতে আবার টুং টাং টুং টাং। নামকাটা পাদরির ঘণ্টা চলেছে নাচের তালে।

গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে খুব সম্মানী ক'জন ঘরের বাইরে এসে নামঞ্জুরের ভঙ্গীতে ঘণ্টাঘরের দিকে চোখ তুল্লেন।

“ভাঁড়ামি লাগিয়েছে পাদরিটা।”

“চুল ধরে টেনে নামিয়ে ওকে গাঁ থেকে বার করে দেওয়া উচিত।”

“বার করে দেবে! ও-ই তোমাদের বার করে ছাড়বে!”

“তা ও করছে মন্দ না।......যাই বল, মেয়েদেরও ভাল লাগছে, গিন্নীদেরও। তারা যেমন চায় তেমন ধারা ও করবেই বা না কেন?”

নিমন্ত্রিত, রবাহূত—গাঁয়ের যে যেখানে ছিল—পরবের ফুর্তিটুর্তির জন্যে সবাই তোড়জোড় করছে। কুয়াশাভরা দিনটা, ঘাসে ঘাসে জমাট শিশির। বাতাসে ছড়িয়েছে তাজা রুটির গন্ধ, আর রোস্ট-করা মাংসের খুসবু। খামারে খামারে কী ব্যস্ততা। হাঁস মুরগি সব ঝাঁপ ঠেলে ছুটে পালাতে চায়—প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক কলরব ওঠে।......একটা ঘরে হয়তো বর—তাজা·দাড়ি কামানো, বেশভূষা সারা—ঠাকুরের আইকন* যে কোণায় যাকে সেখানে বেঞ্চে বসে মদালস ভঙ্গীতে গা এলিয়ে দিয়েছে—খায় না, ধূমপান পর্যন্ত করে না। আর এক ঘরে কনে সাজানো হচ্ছে। এ রকম সময়ে বুড়ীদের না হলে চলে না সে কথা বুড়ীরা ভাল মতোই জানে;—বুড়ীরা কনেকে শেখাচ্ছে—ঠিক কীভাবে কাঁদতে হয়:

কান্না শুনে ভাবছ বুঝি জংলা পাখির গান,
তা নয় লো, কন্যে কেঁদে শ্বশুরবাড়ী যান।

শ্মশানের সুরে একটা গান গায় এক বুড়ী। চামড়া-কোঁচকানো গলাটা হাতের তালুতে ঠেস দিয়ে বিষণ্ণ গলায় ধুয়া ধরে আরেক জনঃ

সূয্যি মামা, আলোর ধামা, বিদায় নিলুম গো!
পিতা মাতা সবার কাছে বিদায় নিলুম গো!
মদের লেগে, টাকার লেগে বিয়ে দিলে মোরে
এখন আমায় চল্ল নিয়ে ভিন্ গেরামে, দূরে।

কিন্তু কনেরা কেউ কাঁদতে চায় না—কাঁদার কথা শুনেই ঝাঁকিয়ে ওঠে।

“ও ঠান্‌দি, ও সব ছিল তোমাদের কালে—দূরদেশে, বিদেশে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। এখন তো সবটাই এক দেশ—সোবিয়েত দেশ।”

ঘরে ঘরে রান্না আর পিঠে গড়ার ধূম। ঝাঁটা-বাড়ুন নিয়ে মেয়েদের ছুটোছুটি। ঘটকরা এ বাড়ী ও বাড়ী করে—এরই মধ্যে ওদের গা থেকে সুরার গন্ধ

---

* আইকন=কুমারী মেরী প্রভৃতির প্রতিকৃতি।

আসছে, বেশ কড়া রকম। গির্জাপ্রাঙ্গণে দুজন একর্ডিয়ন-বাজিয়ে যন্ত্রের কর্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে। যুবকযুবতীরা সেখানে জড়ো হতে শুরু করেছে।

ঠিক এম্‌নি সময় গাড়ী ক'রে পোস্টাফিস থেকে এসে নামলেন গ্রাম-সোবিয়েত সভাপতি স্তেপান পেত্রোভিচ নেদোইয়েশকাশি। উনি লড়াইয়েরও বীর, সেণ্ট জর্জ পদক পেয়েছেন চার চার বার, লড়াই করতে গিয়ে বিকলাঙ্গও হতে হয়েছে। ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু উনি যেন শুনতেই পান না এমনিভাবে সে-দিকে দৃক্‌পাতও না করে সোজা গিয়ে গ্রাম-সোবিয়েতের দরজা খুলে ভেতরে চলে গেলেন। তক্ষুনি আবার বেরিয়ে এলেন এক তা কাগজ আর একটা হাতুড়ি নিয়ে। দু কোণে পেরেক ঠুকে কাগজটা দরজায় লটকানো হল; তারপর টকরো কাগজে জড়ানো একটা সীলমোহর পকেট থেকে বার করে তার ওপর ফুঁ দিলেন, সীল লাগিয়ে দিলেন সইয়ের ওপর। কাগজে নোটিশ:

"স্পাসকোই গ্রামের নাগরিকবৃন্দ! জার্মানিতে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে অদ্য বেলা এগারোটায় একটি মিটিং ডাকা যাইতেছে।"

অমনি লোকের ভিড় জমে গ্রাম সোবিয়েতে। গির্জার সামনে উঠোন খালি—ঘণ্টাঘরের মাথা থেকে তাই দেখে কুজমা কুজমিচ ঘণ্টা থামাল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে। নাদেঝদার বাপ গির্জার মুরুব্বিদের অন্যতম—ঝালর লাগানো নীল পোশাকটা গায়ে চড়িয়েছিলেন। দুম করে বাতিবাক্সটা বন্ধ করে বল্লেন:

"নেড়ী কুত্তার বাচ্চা ঐ স্তেপান নেদোইয়েশ্‌কাশি, গেল বছর গরমের সময় এক হপ্তা ধরে আমার পেছনে লেগেছিল—ওর ঘরের ছাউনি করার জন্যে দুশো রুবল দিতে হবে। ল্যাংড়া বেটা ভেবেছে এবার শোধ নেবে। বিয়ের উৎসব টুৎসব সব মাটি করে দিতে চায়।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"হ্যাঁ: কোন্‌ না কোন্‌ জায়গায় আবার বিপ্লব বেধেছে—জার্মানিতে বুঝি? স্তেপান মিটিং ডেকেছে—রাজনীতি না হলে পাঁচ মিনিটও কি চলে ওর? কী নিরেট, হায় ভগবান......"

গ্রাম সোবিয়েতের বারান্দা থেকে লোকের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন স্তেপান পেত্রোভিচ্‌—ঘুষির চোটে বাতাসে যেন চাবুক লাগছে, কাঠের পাটা তক্তার ওপর ঠক্‌ঠক্‌ করছে। বড় বড় হাড়ওলা চওড়া মুখ স্তেপানের, ঠোঁট দুটো ঢিলে, খোঁচা খোঁচা বিরল গোঁফ।

"সোবিয়েত শক্তির অনুকূলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আজ মোড় ঘুরছে!" বলে তিনি চেঁচিয়ে বক্তৃতা করছেন, এই সময়ে কুজমা কুজমিচ ঠেলে ঠুলে বারান্দার কাছে এগিয়ে এল। "আমাদের প্রতি জার্মানরা তাদের মেহনত-ক্লিষ্ট হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কমরেডস্‌, এতে আমাদের বিপ্লবের খুবই সাহায্য হবে। জার্মানদের খুব চিনি, জার্মানিতে গিয়েছিলাম তো আমি। একটা কথা আপনাদের জানিয়ে দিতে পারি: ওরা কঞ্জুষ, মেপে মেপে খায় সত্যি, কিন্তু ওদের অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল। এ কথাটা ভেবে দেখা উচিত, কমরেড্‌স।

ওদের ওখানে আমাদের মতো গ্রামেও জলের কল আছে, পয়ঃপ্রণালী আছে—সেই প্রণালী বেয়ে যত সার সব্জি ক্ষেতে পড়ে—টেলিফোন আছে, ঘরে ঘরে গ্যাস আছে, গ্রামে নাপিতের দোকান আছে, বীয়ারখানা আছে—তাতে আবার বিলিয়ার্ড খেলার ঘরও আছে।......ইস্কুল টিস্কুলের কথা তো ধরছিই না।......প্রত্যেকেই লিখতে পড়তে জানে সে কথাও ধরছি না। ওখানে প্রতি ঘরে সাইকেল, প্রতি ঘরে গ্রামোফোন......"

ভিড়ের মধ্যে এক পশলা গুঞ্জন শোনা যায়। কে একজন হাততালি দেয়, তারপর সবাই।

"ইস্ট প্রুশিয়াতে জার্মান গোলার ধাক্কায়ই আমার নীচের অঙ্গ উড়ে যায়। তাহলেও বর্তমান মুহূর্তে আমি ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির ওপরে উঠতে পারি..."

মরিয়া হয়ে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে—গলাটা তরুণ ঃ

"আর একটু খোলসা করে বলুন!"

"আমার অঙ্গহানির দুর্ভোগ—তার জন্যে জার্মান জনসাধারণকে দোষ দিইনে। দোষ তো তাদের নয়, দোষ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের...গলা কাটতে হবে তাদেরই—দোমনা করলে চলবে না।......এ কথা প্রথম বুঝেছিলাম আমরা, রুশরা—কিন্তু এখন জার্মানরা পর্যন্ত বুঝেছে। কমরেড্‌স্‌, এই মিটিং থেকেই আমরা স্লোগান তুলছি—দু জাতিরই কাছে ঃ "বিশ্ব বিপ্লব জিন্দাবাদ!"

'জিন্দাবাদ', বলে তরুণ গলার চীৎকার শোনা যায়। তারপর আবার হাততালি। "স্থানীয় ব্যাপার নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। আমাদের ইস্কুলের ছাত দিয়ে জল পড়ে, ছাতটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে ও সম্বন্ধে। কিন্তু চাঁদা উঠেছে? কাঠের টালি কেনা হয়েছে? আপনারাই বলুন! হয়নি। কিন্তু পরব মানাবার পয়সা তো আপনাদের বেশ জোটে! পাদ্রীর জন্যে তো টাকার অভাব হয় না! উঃ আপনাদের ঘণ্টার ঘ্যানঘ্যানিতে দশ মাইল দূরের মানুষ পর্যন্ত জ্বালাতন।... জার্মানরা যে তাদের মেহনতী হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, সে কি এই জন্যে? আমি প্রস্তাব করি ঃ স্কুলের মেরামতি, শিক্ষয়িত্রীর মাইনা, খাতা-পেন্সিল কেনার খরচ—ইত্যাদির জন্যে চার হাজার ন' শ সাত রুব্‌ল সাত কোপেক যতক্ষণ আদায় না হচ্ছে—ততক্ষণ বিয়েশাদীও হতে পারবে না, ঘণ্টাও বাজানো চলবে না......"

দারুণ ফল হল সভাপতির বক্তৃতায়। প্রথম ও প্রধান কথা—বক্তৃতা শুনে লোকের লজ্জাবোধ জাগল। ওর পরে আরও ক'জন বক্তা। তাঁদের বক্তৃতা সভাপতির কথারই প্রতিধ্বনি—তবে তাঁরা একটা কথা যোগ করলেন যে, বিয়ের আয়োজন যখন হয়েই গেছে তখন বিয়েতে দেরী করার অর্থ হয় না। সুতরাং টাকাটা এখুনি তুলে ফেলতে হবে—তবে সকলের কাছে সমান নিলে কি চলে?... ষোলটা অবস্থাপন্ন খামারে বিয়ে, তারাই টাকাটা দিক। সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবই গৃহীত হল।

প্রস্তাবের খবর শুনে কনেদের মধ্যে মহা-হৈচৈ—বাপ-মাকে বকে বকে আর আস্ত রাখে না। সুড়সুড় করে ভিজে আঙুলে টাকা গুণে গুণে গ্রাম সোবিয়েতে পৌঁছে দিল বাপের দল। স্তেপান পেত্রোভিচ তাদের রসিদ দিয়ে শুধু একটি কথাই বল্লেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে লাগিয়ে দিন গে!"

কনেদের নিয়ে গির্জায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যার কাছাকাছি। ওঃ কনেদের জাঁকজমকের কত ঘটা ঃ লোমের কলার আর লোমের লাইনিং দেওয়া কোট, সোনা-রূপোর পাড় বসানো ঘোমটা, উঁচু-গোড়ালি জুতো—মনে হয় যেন বুড়ো আঙুলের ডগার ওপরই হাঁটছে—সব দেখে শুনে লোকে তো একেবারে থ'। তারপর বারান্দায় এসে কনেরা যখন গা থেকে চাদর সরাল—আরে বাপরে, পোযাকের সে কী বাহার। এমন সব পোষাক দেখেছ কখনো? রংয়ে রংয়ে ছয়লাপ, পাছার ওখানে এমন টাইট যে, সেলাইয়ের মুখের কাছে বুঝি ফেটেই পড়ে! কুঁচি দেওয়া মুড়ির কিনারাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। আর গলা একদম খোলা—তার ওপর আবার নাদেঝ্দা ভ্লাসভার হাত একেবারে কাঁধ পর্যন্ত খালি!

"দেখ, দেখ, অল্গা গোলোঘ্ভাস্তভাকে যে চেনাই যায় না!" "আরে স্তেশ্কাকে দেখেছ?" "এত সব জিনিষ পেল কোথায়?" "কে না জানে? বাপ-বেটা মিলে গরুর গাড়ীতে ক'রে পাঁচ পাঁচ বার নভাচের্কাস্ক গেল, ময়দা আর চর্বি নিয়ে। ওর বদলেই তো এত সব জিনিষ পেয়েছে, নভোচের্কাস্কের বিবিদের কাছ থেকে..."

সবজান্তা কেউ কেউ মন্তব্য করেন ঃ

"লাটবাড়ীর নাচও দেখেছি, কিন্তু এর কাছে সেও কিছু না!"

"নাচ! আরে নভোচের্কাস্কে রোমানভ বংশের তিনশো বছরকী উৎসব হ'ল, গির্জায় এসে জমলেন রাজ্যের যত সব সম্ভ্রান্ত মহিলা—এলেন গাড়ীতে, পা রাখলেন গালিচার ওপর—কিন্তু তবু এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না..."

কুজমার গায়ে অনুষ্ঠানের সাড়ম্বর পরিচ্ছদ নেই, সাধারণ লম্বা জামা আর টেকো মাথায় তেলচিটে পাদ্রী টুপি—এই পরেই সে উপস্থিত। (আগেকার পাদ্রী গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালিয়েছিল তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে গির্জার পোষাক-আশাকও চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল)। সার সার সুন্দরী কনে—সুপুষ্ট বুক, গোলাপী গণ্ডদেশ—কুজমা তাদের দিকে চোখ রাখল। বরদের মুখভাব সন্ত্রস্ত; তাই কনেদের চেয়ে ওদের ছোটই দেখাল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সন্তোষ জানিয়ে কুজমা ঠান্ডা হাত দুটো ঘষল—তারপর আরম্ভ করল অনুষ্ঠান। স্ফূর্তির চোটে কথার কী তোড়—কখনো অস্ফুট বকবক শব্দ, কখনো হেঁড়ে-গলা ডীকনের অনুকরণ, কখনো বা সুর করে করে মন্ত্রোচ্চারণ—কিন্তু সব ঠিক নিয়মমাফিক—যেমন লেখা আছে তেমনই—একটি বর্ণ, একটি শব্দও বাদ নেই।

অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলে নববিবাহিতদের পরস্পরকে চুম্বন করতে বল্ল কুজমা কুজমিচ। তারপর তাদের সম্বোধন করল ঃ

"আগের দিনে তোমাদের রূপকথা শোনানো হত, আমি কিন্তু গল্প বলব সত্যি জীবন থেকেই। বিপ্লবের পনের বছর আগে দূর এক গাঁয়ে পাদ্রী ছিলাম আমি। মনে তখন প্রচণ্ড গোলমাল। আমি রাশিয়ান, তাঁর ওপর অশান্ত মতি—কিছু আর পছন্দ হয় না, মেনেও নিতে পারি না—যা দেখি তাই খারাপ লাগে, সব ব্যাপারেই মাথা গলাতে যাই। আমি তখন ন্যায় বিচার খুঁজে বেড়াচ্ছি কিনা! তারপর এক ঘটনা ঘটল, সব সন্দেহ মিটে গেল। একদিন এক অন্ধ, বুড়ো মানুষ ছোট একটি ছেলের হাত ধরে আমার কাছে এসে উপস্থিত। কাঠের জুতোয় জড়ানো নেকড়ার ভেতর থেকে তিনি তিন রুব্‌ল নোট বার করলেন একখানা, নোটটাও বহু পুরোনো। নোটটি আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করে তারপর আমার কাছে এগিয়ে ধরলেন, বল্লেন, 'আমার গিন্নীর নামে দিয়ে যাচ্ছি, তার আত্মার জন্যে প্রার্থনা করবেন...।' 'ও টাকা রেখে দিন দাদু', আমি বল্লাম, 'এমনিই আমি আপনার স্ত্রীর নামে প্রার্থনা জানাব।......আপনি কি অনেক দূর থেকে আসছেন?' 'দূর? পথেই লেগেছে দশ দিন।' 'আপনার বয়স হল কত?' 'এখন আর হিসেব রাখিনে, তবে একশো পার হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।' 'ছেলেপিলে কটি?' 'একটিও নেই, সব গেছে। বাকি ছিল শুধু গিন্নী—ষাট বছর একসঙ্গে ঘর কল্লাম, ভালবাসতাম দুজন দুজনকে,—আহা কী ভালই ছিল সে—আমারও ওকে কী ভালই লাগত—তারপর মারা গেল...।' 'তাহলে এখন ভিক্ষে করেই চালাতে হয়?' 'তা হয়...দয়া করে...এই তিন রুব্‌ল নিন, ওর নামে মন্ত্র পড়ে দেবেন।' 'টাকার জন্যে ভাববেন না,' বল্লাম আমি। 'আচ্ছা নামটি কি বলুন তো?' 'কার নাম?' 'আপনার স্ত্রী।' আমার দিকে স্থির হয়ে রইল তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ দুটো। 'তার নাম? মনে তো নেই, ভুলে গেছি।...যখন ওর বয়েস কম তখন ওকে ডাকতাম 'ছোট বৌ', তারপর 'ওগো', আর তারপর যখন বুড়ো হল তখন শুধু 'গিন্নী', ব্যস।...' 'নাম না জানলে আত্মার জন্যে প্রার্থনা করব কি করে?' একথা শুনে তিনি ঐখানেই লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, অনেকক্ষণ। বল্লেন, 'ভুলেই তো গেছি বটে। গরীব মানুষ, জীবনে কত কষ্ট। আচ্ছা বেশ, আমি ফিরে যাচ্ছি, জেনে আসব—কারও কারও তো মনে থাকতে পারে।'......শরৎকালে বুড়ো মানুষটি ফিরে এলেন আবার, সে-ই তিন রুব্‌ল নোটখানাই ফের বার করলেন জুতো থেকে ঃ "জেনে এসেছি', বল্লেন তিনি। 'গাঁয়ের একজন মানুষই বলতে পারল ঃ ওর নাম ছিল পেত্রোভ্‌না, বাপের নাম পেত্রো।'

কুণ্ঠিত অধর আর আনত চোখে দাঁড়িয়ে থাকে ষোলটি কন্যা।

তাদের পাশে তরুণ বয়সী বরের দল, টাইট কলারের চাপে মুখ লাল, তারাও দাঁড়িয়ে থাকে নিথর, নিস্তব্ধ। জমায়েতের মধ্যেও শব্দ নেই, মন দিয়ে শুনছে সবাই।

"আগাছা-পাতার মতো জন্মাত রুশেরা, নিজের নিজের নামেরও ঠিক থাকত না। জমিদার বাবুরা সব ছিলেন লাটসাহেব। আর ঝেঁটিয়ে টাকা তুলে

আনতেন কারবারী মহাজনেরা, মুঠো মুঠো টাকা। আমরা পাদ্রী-পুরুতরা সব ধুনুচি নেড়ে নেড়ে ফিরতাম। সুন্দরী মালক্ষ্মীরা শোনো, সেদিনের সেই অভিশপ্ত যুগে শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের অনুভূতি তোমরা কিছুতেই পেতে না, আগাছার তলায় ফুলের মতো ফুটবার আগেই শুকিয়ে যেতে।”

বোধ হয় ভাবতে ভাবতেই এখানটায় এসে কুজমা কুজমিচ একটু থামে, টুপিটা সরিয়ে টাক চুলকে নেয়।

“এখন আমরা যেতে পারি?” মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করে নাদেঝ্দা ভ্লাসোভা।

“একটু সবুর কর।...কিন্তু সত্যি ন্যায়-বিচার কাকে বলে তাও তো দেখলাম আজ জীবনের এই শেষ প্রান্তে। যে-বিচারের কথা নেক্রাসভ* লিখে গেছেন, সে বিচার নয়। তাঁর লেখা বই পড়েছ আশা করি। কিংবা কোনো দিন সন্ধ্যায় হয়তো নদীর ধারে বসে যে-বিচারের স্বপ্ন দেখেছি, অথবা খোলা আগুনের ধারে মাছ ধরতে ধরতে আর মশা তাড়াতে তাড়াতে যে-বিচারের কল্পনা করেছি—সে-বিচারও নয়। ন্যায়বিচার—সে তো আক্রমণে এগিয়ে আসে, ভয় জাগায়, আপোস মানে না। ......সত্যি বলছি, ন্যায়বিচারে আমি নিজেই কতবার ভয় পেয়েছি।...... যখন মেশিনগানের গুলি চলে, খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়সওয়ারেরা ধেয়ে আসে তোমার দিকে, তখন দার্শনিক তত্ত্ব তো আর বিশেষ কাজে লাগে না।” (চাপা হাসির ঢেউ শ্রোতাদের ভিতর।) “বিচার ওখানেও (গির্জার গম্বুজ দেখায়) পাবে না. তোমাদের চারদিকেও কোথাও পাবে না। ওরে মানুষ, ওরে বীর, বিচার তো তোরাই! প্রাণ খুলে চাও. আর লড়ো! আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছ কেন? আমার কথা বোঝা যায় না? তোমাদের আনন্দ করতে শেখাব, সেজন্যেই তো আমি এসেছি। আজ তোমরা”—বলে নাম ধরে ধরে দেখায়, “ওলিয়া, নাদিয়া, স্তেশা, কাতেরিনা—তোমরা সবাই নেচে নেচে মেঝে একেবারে ক্ষইয়ে ফেল: নিকোলাই, ফেদর. ইভান ওদের চোখগুলো একেবারে জ্বলে উঠুক পাগলের মতো। ব্যস্......উপদেশামৃত সাঙ্গ......”

জমায়েতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পোশাক ঘরে চলে গেল কুজমা কুজমিচ।

রেজিমেণ্টাল কমিসার ইভান গোরা জারিত্সিন থেকে সবে ফিরল। জারিতসিনের ওঁরা ওকে জানান যে, পেত্রোগ্রাদ আর মস্কো থেকে যেসব খাদ্য-অভিযান বাহিনী পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো অনেকক্ষেত্রেই ঠিক মতো কাজ করে উঠতে পারছে না। ঐ সব বাহিনীর লোকজন অনেকে অনভিজ্ঞ, তার ওপর ক্ষুধার জ্বালায় তিক্তবিরক্ত—গ্রামের লোকেরা হাঁস মুরগি খায় দেখে তারা একেবারে পাগল হয়ে ওঠে। বাহিনীর একটা তো একদম উবেই গেল, চিহ্নমাত্র

---

* নেক্রাসভ (১৮২১-১৮৭৭)—রুশ দেশের বড় কবি, গণতান্ত্রিক-বিপ্লবী।

নেই। পেত্রোগ্রাদের তিনজন শ্রমিক নিয়ে আরেকটা বাহিনী—সেটাকে পাওয়া গেল ভরোনেঝ রেল স্টেশনে সীল করা মালগাড়ীর ভিতর—তিনজনেরই পেট একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় চেরা, তার মধ্যে চাল ভরে দিয়েছে। একজনের কপালে কাগজ মারা ঃ “ঠেসে ঠেসে খাও।”

জারিতসিনের কমরেডদের সাহায্য করবে বলে কমিসার কথা দিয়ে এসেছে। ফিরে আসার পর নতুন বাহিনী তৈরী করার জন্যে সে লোক খুঁজতে লেগে গেছে, তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনাও শুরু করেছে। ঠিক করেছে যে, লাতুগিন, বাইকভ আর জাদুইভিতের যাবে স্পাসকোই, তাই নিজের ঘরে তাদের ডেকে পাঠিয়েছে। আগ্রিপিনা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর আজকাল ঠাণ্ডা, আসবাবশূন্য ঘরটাতে রোজ ঝাড়ু পড়ে। ঘরের চৌকাঠে পাপোষও পড়েছে, আর টেবিলের ওপর উঠেছে ফুলকাটা তোয়ালে। টোকো, ঘরোয়া তামাকের গন্ধ আর নেই, তার বদলে তাজা রুটির খুশবু।......কমরেডরা যেন ভাল করে পা মুছে ঘরে ঢোকে—জানিয়ে দিল ইভান গোরা।

“বসো,” বল্লে গোরা। “কি সুখবর আছে তোমাদের?”

“তোমার কি আছে?” জবাবে শুধাল লাতুগিন।

“কেন, আমি যে শুনলাম, ফসল আনতে যাবার জন্যে আমাদের ছেলেদের নাকি আগ্রহ নেই?”

“আগ্রহ আছে কি না আছে তাতে কি আসে যায়? কাজটা করতে হবে, সুতরাং যাবেও তারা। তা বলে কাজটা আমরা পছন্দ করব, সে আশা কর কি ক'রে?”

“কিন্তু, কাজটা যে বড় কঠিন।”

জানলার দিকে পিছন দিয়ে বসে ইভান গোরা, জাদুইভিতেরের দিকে চায়। বিষণ্ণভাবে টেবিলে আঙুল ঠক ঠক করছে জাদুইভিতের।

“তুমি তো বাপু চাষী—তোমার মতটা কি বল দিকি?”

“স্পাসকোই থেকে তোমাদের গম চাই কত?”

“প্রচুর। ওখানে একশো বাষট্টিটা খামার—তার থেকে সাড়ে চার হাজার পুড* ফসল চাই-ই। তোমাদের অবিশ্যি ধনী আর গরীবে তফাৎ করতে হবে।”

“অত দেবে কিনা সন্দেহ।”

“ঐজন্যেই তো পাঠাচ্ছি তোমাদের—ওদের মত করাতে হবে। যাওয়ার সময় সঙ্গে কোনো হাতিয়ার নেবে না, বুঝেছ কমরেডস্।”

“অস্ত্রে আবার আমাদের কি কাজ?” ফোড়ন দিল লাতুগিন।

“আরে অস্ত্র না থাকলেই তো ওদের সঙ্গে কথা বলা সুবিধা,” চোখ ঠেরে বল্লে বাইকভ। “শত্রুর কাছে তো যাচ্ছিনে, যাচ্ছি আপনজনের কাছে।”

“আপনজনের কাছে, আবার শত্রুদেরও কাছে,” কঠোর স্বরে জানান ইভান গোরা।

---

* এক পুড=৩৬ পাউণ্ড

"শোনো কমিসার," জাদুইভিতের বল্ল—"আমি তা বলে কাজ এড়াতে চেষ্টা করছিনে, কিন্তু জবরদস্তি অন্য লোকের গোলায় ঢোকা কি আমাদের কাজ? জঘন্য ব্যাপার।"

"আর তুমি, তুমি কি বল লাতুগিন?"

"জেরার ধাক্কায় আমার স্বরূপ বার করতে চেষ্টা কোরো না ইভান। আমরা ফসল এনে দেব বলছি, তাহলেই হবে তো।"

"আর বাইকভ তুমি?"

"হোয়াইট সাগর অঞ্চলের মানুষ আমি, অপরের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস আছে।"

"কমরেডস্, তোমাদের ডেকেছি কেন বলি," মস্ত হাত দুখানা টেবিলের ওপর রেখে শান্ত স্বরে শুরু করল ইভান গোরা—যেমন ক'রে বাপ ছেলেদের বোঝায়। "শস্যের ওপর একচেটে দখল—এটাই হ'ল বিপ্লবের মেরুদণ্ড। এখন যদি একচেটে অধিকার তুলে নেওয়া হয়, তাহলে তোমরা যত রক্তই ঢাল, যত মেহনতই কর—কুলাকই হবে মালিক। আর পুরোনো দিনে যে কুলাককে দেখেছ—তোবড়ানো সামোভার সম্বল মামুলি কারবারী—এ কুলাক আর সে কুলাক থাকবে না। এরা হবে ষোলো আনা কুলাক—মহা-শেয়ানা, টনটনে বিষয়বুদ্ধি।"

"কুলাক কে?" জোরে বলে ওঠে জাদুইভিতের। "সেটাই বল দেখি! আমার খামারে দুটো গরু আছে। আমি তাহলে কী?"

"গরু নয়, ক্ষমতায় কে বসবে—এটাই প্রশ্ন। গাঁয়ের কুলাক দিনের পর দিন ধরে শুধু এই-ই ভাবছে। মুনিষ-মজুর বিদেয় করে দিয়েছে, গরুবাছুর জবাই করে ফেলেছে, এবার শরৎকালে জমি পর্যন্ত চাষ করেনি—মিটিংয়ে মিটিংয়ে হৈ-চৈ করে বেড়ায়, ভোট দেয় সোবিয়েতকে। কুলাকরা আজকাল মহা-চটপটে, ঠিক পিশুর মতো।"

"বেশ কথা ইভান। আচ্ছা ধর আমি দেশে গেলাম, গরু কিনলাম আর একটা। তখন আমাকে কি বলবে?"

"তোমাকে জোর করে লালফৌজে এনেছে, না নিজের ইচ্ছেয় এসেছ?"

"নিজের ইচ্ছেয়ই নিশ্চয়।" উত্তর দেয় জাদুইভিতের।

"তাহলে আর তুমি গরু কিনতে যাচ্ছ না।"

"কেন? কেন কিনব না তা তো বুঝিনে।"

"কারণ তোমার স্বার্থ আরও বড়। ঐ বলদজোড়ার জন্যে তো আর রাইফেল ঘাড়ে করনি।"

"ও? ও ঠিক বলদ্ কিনবে দেখে নিও," লাতুগিন বল্লে। "ওর পেছনে লাগলে কেন? বলে যাও।"

হাসতে হাসতে ইভান গোরা মাথা নাড়ে।

"তর্ক করব না......তবে লোকের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় সেটা ভাবতে

ভাল লাগে।......আচ্ছা, তাহলে শোনো......এই শ্রেণীর লক্ষ্য কি? শস্যের কারবারটা নিজেদের হাতে আনাই কুলাকদের লক্ষ্য। বিপ্লব কুলাকের চোখ খুলে দিয়েছে। কুলাক তো আর এখন গ্রামের মুদী নয়, শরাপখানার স্বপ্নে সে আর দিন কাটায় না—গ্রেন-এলিভেটর, মালের স্টীমার এই সবই এখন তার স্বপ্নের বিষয়। বিপ্লবের রাশ যদি ওরা একবার হাতে পায় তাহলে, জাদুইভিতের, খাটুনির চোটে তোমাকে একেবারে রক্ত ঘামিয়ে ছাড়বে; তখন তোমার বলদ হবে ওদের বলদ। এমন কি শস্যের একচেটে ব্যবস্থাটা পর্যন্ত নিজেদের কাজে লাগিয়ে নেবে, ওরা সে আশাও রাখে। একটা ঘটনা মনে পড়ছেঃ খাদ্য-অভিযান বাহিনী নিয়ে এক গাঁয়ে গেছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না—এমন একগুঁয়ে বিরোধী ভাব যে রাজি করানো প্রায় অসম্ভব। বাপুলিন ওখানকার স্থানীয় পরগাছা। জীর্ণ কোট আর তালিমারা জুতো পরে সেও হাজির—একেবারে বিনয় আর ভদ্রতার অবতার। কিন্তু বেটা বসে বসে খালি দাড়ির ডগাটা কাটে, দাঁত দিয়ে।......আমি ভাবি, 'মতলব কি?' ওর গোলায় গেলাম—গোলা একেবারে ফাঁকা। মাটিও খুঁড়লাম, তবু কিছু মেলে না। খামারের উঠোনে আছে একটা ফকরে ঘোড়া, আর চাল থেকে ঝুলছে খান দুই গরুর চামড়া, ব্যস্‌ আর কিছু নেই। বেটা কুকুরের বাচ্চা করেছে কি জান? আমাদের আসার খবর আঁচ পেয়ে ঘুরে ঘুরে চাষীদের বলেছেঃ 'আহা হা, সোবিয়েত রাজ তোমাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করছে জারের পুলিসও তেমন কখনো করেনি।' আরও বলেছে, 'আমার কি, আমি তো শহরে গিয়ে মেয়ের কাছে থাকতে পারি—জামাই হলেন এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান; কিন্তু তোমরা বেচারীরা শীত-কালটা টিঁকবে কি করে? যা পাচ্ছে তাই নিয়ে যাচ্ছে বলশেভিকরা—চালের খড়গুলো পর্যন্ত নিয়ে যাবে লালফৌজের জন্যে।......দাতাদের ভগবান ভালবাসেন—তা ভাই সব, তোমরা আমার গোলা থেকে যা আছে সব নিয়ে এস, একদানাও রেখো না। যদি বাঁচি, পরে হিসেবনিকেশ করা যাবে।' বেটা রসিদ নিতে ভোলেনি, তাহলেও সবাই ভাবল লোকটা পরম উপকারী।......আমাদের তো ফাঁকি দিলই, চাষীদের কাছ থেকেও যা দিয়েছে তার ডবল আদায় করে ছাড়বে। এ রকম লোক তুচ্ছ নয়, এরা সংখ্যায় অনেক, আছেও সর্বত্র। দস্তুর-মতো শক্ত মাটি এরা। একশো বছর ধ'রে এই কুলাকের হাত ফিরেই এসেছে কৃষকের প্রতিটি গ্রাস। প্রত্যেকের কাছে ঠিক কি কি পাওয়া যেতে পারে সে খবর এদের নখদর্পণে। বুঝলে ভাই সব, শস্যের একচেটিয়া দখলের নীতি হল মূলনীতি, দূরদর্শী নীতি। নীতিটা কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্‌ জিনিস কঠিন নয়? কখনো হাল চলেনি যে জমিতে সে জমি চাষ করা তো শক্ত হবেই। সহজ শুধু বালালাইকা বাজিয়ে ঘুরে বেড়ানো।......এ নীতি যদি চাষীর মাথায় না ঢোকে, তবে তার জন্যে প্রথম দায়িত্ব, প্রধান দায়িত্ব হবে তোমাদেরই। যে সব খামারের অবস্থা ভাল সেখানে গিয়ে মালিককে বলবে, 'আপনাদের গোলা খুলে দিন!' প্রত্যেকটি দানাই তাদের মনে হবে যেন এক

এক ফোঁটা চোখের জল। কিন্তু তোমাদের কাছে প্রতিটি দানাই মহা-পবিত্র, মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে উৎসর্গীকৃত।"

"গ্রাম-সোবিয়েতের চাবি কোথায়?"

"সভাপতির কাছে বোধ হয়।"

"আর সভাপতি, তিনি কোন্‌খানে?"

"বিয়ের ভোজবাড়ীতেই আছেন এখনো।"

গাড়ী থেকে নামল লাতুগিন, বাইকভ আর জাদুইভিতের। কিন্তু তারপর কি করা? যে লোকটাকে প্রশ্ন করেছিল সে টলতে টলতে চলেছে—তার সামনে পথটা এক একবার বোঁ করে ওপরে ওঠে, আবার যেন গভীর গর্তে নেমে চলে যায়। টলতে টলতে লোকটা শেষ পর্যন্ত আড়ালে গেল। ওরা তখন বসল গ্রাম-সোবিয়েতের সিঁড়িতে—সিগ্রেট ধরিয়ে ধূমপানের ইচ্ছা। কনকনে হাওয়ায় আকাশে মেঘ ছুটছে—সে হাওয়া ওদের মুখে এসে লাগে। তুষারের পাঁজে ভেসে ভেসে নেবে আসে, গায়ে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে কালো রাস্তার গর্তগুলো তুষারে বোঝাই হয়ে গেল, চারিদিকে সব কিছুই মনে হল আরও নিরানন্দ হয়ে উঠেছে।

"কমিসারের বিবরণ শুনলে তলোয়ারের জন্যে হাত নিসপিস করে," বল্লে জাদুইভিতের, "কিন্তু আসলে দেখছি গ্রামটা অতি সাধারণ। সেই শত্রুবেটারা, তারা কোথায়? শোনো, শোনো, আবার গান!"

খান দশেক বাড়ী দূরে একটা ছোট জনতা। যারা নিমন্ত্রিত হয়নি কিংবা বাড়ীর মধ্যে জায়গা পায়নি তারাই বোধহয়। ভেতর থেকে পা ঠোকার শব্দ আসে বাড়ীটার ভেতর থেকে, একর্ডিয়নের টানা টানা সুরও শোনা যায়—নেশাচ্ছন্ন বাদকের হাত যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত একর্ডিয়নের তার টেনে ধরা হয়েছে।

"পা ভিজবে বলেই ভয় পাচ্ছ কমরেড, কিন্তু আমাদের যে একেবারে তলা পর্যন্ত ডুব দিতে হবে", লাতুগিন বল্ল। "বিপ্লব আমাদের কাছে আরও গভীরতা দাবি করে, সে কথা তো কমিসারই বলেছেন।"

"গভীর, গভীর! আর কত গভীরে যাব? যা পাই তাই আমরা ওল্টাই, পাল্টাই, কিন্তু যাই করি, লোককে তো সেই আগের মতোই প্রাণধারণ করতে হবে, বীজ বুনতে হবে, সন্তানের জন্ম দিতে হবে। সে সব হবে কবে?"

"যম জানে! আমায় শুধোও কেন?"

লাতুগিন ভীষণ বিরক্ত—খড়ের ডগা দাঁতে কাটছে। জাদুইভিতের চাষীর মতোই একরোখা। আগের দিন কমিসার যা বলেছেন, চোখমুখ কুঁচকে সেই কথাটার ওপরই মন এঁটে রেখেছে—কেউ যে ওকে বাধা দেবে বা বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবে সেটি হচ্ছে না। খুলেই বল্ল বাইকভ:

"এমন ক'রে কাজ হবে না দোস্ত। সভাপতিকে খুঁজে বার করার কি হল?"

ব'লে উঠে দাঁড়াতেই লাতুগিন ধমক দেয়ঃ

"তোমার যেতে হবে না।"

"তার মানে? কেন, যাব না কেন?"

"তোমাকে কারণ বলার দরকার দেখিনে।"

তখন জাদুইভিতের বল্লে, বেশ জোর দিয়েঃ

"গেলে আমরা সবাই যাব, একসঙ্গে। চল সভাপতিকে খুঁজে বের করি গে!"

"আমি যাচ্ছিনে।"

"তোমাকে যা বলা হবে তা করতে হবে।"

"আরে ছাড়ো লাতুগিন", বাইকভের গলা, সুরটা আপোসের। "খানা-টেবিলের ধারে-কাছেও যাব না, এক বিন্দু স্পর্শও করব না—সভাপতিকে দরজার কাছেই ডেকে আনা যাবে।"

সভাপতির খোঁজে চল্ল সবাই। দু দু দিন আত্মরক্ষা করেছিলেন স্তেপান পেত্রোভিচ, কিন্তু তিন দিনের দিন ভাবলেন—গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংযোগ হারাবার ভয় রয়েছে। কাজেই, কাঠের পা থেকে কাদাটাদা মোছা হল, সবচেয়ে ভাল কালো পাজামা জোড়া কোমরে উঠল, তারপর গোঁফে এক মোচড় দিয়ে গম্ভীরভাবে গ্রামে চক্কর লাগালেন।

"এই যে উনি এসেছেন, বাঁচা গেল! আসুন আসুন, ভেতরে আসুন স্তেপান পেত্রোভিচ......"

ঘরে ঘরে গৃহকর্তাদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা—আলিঙ্গন আর আন্তরিক করমর্দন। লোকে হৈ হৈ করে ওঠেঃ "বড় চেয়ারটা দাও, সভাপতি মশায়ের জন্যে"—ঠাকুরমূর্তির নীচে সেই কোণটাতে নিয়ে গিয়ে বসায়। সসারভর্তি মণ্ড, বেশ পুরু করে নুন ছড়ানো, তাই নিয়ে ঘটক হাজির—মুক্তি মূল্য চাই। এক রুবল্ দেন স্তেপান—ওর বেশী দেওয়া ও'র নিয়মই নেই। কাণায় কাণায় ভর্তি ভদকার গ্লাস নিয়ে আসে, তা গ্রহণ করেন, এক টুকরো শুঁটকি মাছ মুখে দেন। কিন্তু ও হরি! তৃতীয় দিনে উৎসব শেষ হয়ে আসবে ভেবেছিলেন তার তো কোনো লক্ষণ নেই। আসল যা উৎসব—নাচ, গান, বুকে বুক মেলানো, মনে মন মেলানো, অভিমান আর মানভঞ্জন—তৃতীয় দিনে এ সব তো সবে শুরু।

এদের জান কী কড়া! গত ক' বছরে কত না সয়েছে! প্রথম জারের আমলে, সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার জবরদস্তি হুকুম—শেষ পর্যন্ত চুয়ান্ন বছরের বুড়োকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে—লাঙ্গল চালাতে হয়েছে মেয়েদেরই, নইলে লোক কোথায়? আর সে কি যেমন তেমন লাঙ্গল! উত্তর দেশে এক ঘোড়ার লাঙ্গল, মেয়েরা চালাতে পারে, কিন্তু এ অঞ্চলে দামী জমি তাই ভারী লাঙ্গল-বলদ লাগে দু জোড়া, কখনো কখনো তিন জোড়াও। সে শরৎকালের কথা

আজও ভোলেনি মেয়েরা। স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জায় কত লোক মারা গেল। গাঁয়ে আগুন লাগল দু দু বার। তারপর মহাযুদ্ধ থেকে লোকজন ফিরেছে কি না ফিরেছে, অমনি হুকুম এল ক্রাসনভের ফৌজে যাও; তার সঙ্গে আরো হুকুমঃ লেভি দিতে হবে, ঘরে ঘরে কসাকদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কসাকদের আবার হাতটান দোষ আছে, জানই তো! তোমার সঙ্গে হয়তো খুব ভাব, কিন্তু ঘোড়ায় উঠেছে কি ব্যস—সামনে যদি শুয়োরটা পড়ল তো কসাকের বাচ্চা আর থাকতে পারে না—খ্যাঁচ করে একেবারে বর্শার ডগায়।

এ সব অতীতের কথা অবশ্য। এখন গবর্ণমেণ্ট নিজেদের হাতে, বকেয়া খাজনা সব মকুব হয়ে গেছে, বাড়তি জমিও ভাগে পড়েছে—এখন প্রাণ খুলে ফুর্তি করতে চায় সবাই।

স্তেপান পেত্রোভিচ এক এক বাড়ী যান, নেহাৎ ভদ্রতার জন্যে যতটুকু সময় থাকা দরকার ঠিক ততটুকুই থাকেন, তারপর আর এক ভোজবাজী। ঠাকুরমূর্তির নীচে কোণটাতে বসে বর-কনের মা-বাপের সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে আলাপ করেন। ঘরোয়া যুদ্ধের কথা বলেনঃ এখন দনের উত্তরে যুদ্ধ চলেছে, ভরোনেঝ আর কামিশিনের চার পাশে—ক্রাস্নভ সেখানে ৮ম আর ৯ম আর্মির ওপর হাতুড়ি পিটছে। "ও বেয়াই, ও বেয়ান, ও ঘটক মশাই—তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আমাদের খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার, যেন আচমকা বেকায়দায় না ফেলতে পারে। সোবিয়েত সরকারকে আমাদের সাহায্য দিতে হবে......।" আবার গেরস্থালির এটা ওটা সে সব কথাও বাদ যায় না গেরস্থরা সব অবাক—অমুকের খামারে কত ধান, তমুকের গোয়ালে কটা গরু, কে কোথায় মাল গায়েব করছে—সব্বাইয়ের হাঁড়ির খবরও পেত্রোভিচের নখদর্পণে!

কাঠের পা টেনে টেনে এবাড়ী ওবাড়ী করা, প্রত্যেকবার নতুন ক'রে সম্ভাষণ, আলিঙ্গন আর উপবেশন—উনি হায়রাণ হয়ে পড়ছিলেন। এক বাড়ীতে ঘটকের হাত থেকে মণ্ডর প্লেটটা হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে শেষ ক'রে দিলেন—মণ্ডটা নুনে পোড়া তাই সই। তারপর মিলিটারি গ্রেটকোটের পকেটে হাত দিয়ে এক গোছা দোমড়ানো-শোমড়ানো নোট বার করলেন—আর নেই, ঐ শেষ। নোটের গোছা ঘটকের হাতে গুঁজে দিয়ে বড় এক গ্লাস 'সামোগন' পার করে দিলেন ঢক ঢক করে। কাদ্রিল নাচের ঠাসাঠাসি ভিড়—নাচছে দশ দশ জোড়া নাচিয়ে—তার মধ্যে থেকে কনেকে ডাক দিয়ে (কনে আজ তিনদিন ধরে নাচছে—গুমশো গরম, তারি মধ্যে) বল্লেন ঃ

"চালাও, আরও জোরে কদমে চালাও স্তেপানিদা!"

এমন সময় শুনলেন, লাল ফৌজের তিনজন লোক নাকি ও'র খোঁজ করছে। "তাদের ভেতরে আসতে বল!" "বলেছিলাম, কিন্তু ওরা ভেতরে আসতে রাজি নয়।"

টেবিলে হাতের ভর দিয়ে, মাথাটা নীচু ক'রে স্তেপান পেত্রোভিচ সামান্যক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর অতিথির ভিড় ঠেলে ঠেলে দরজার কাছে পৌঁছে দেখেন, সত্যিই তিনজন লোক অপেক্ষা করছে। তাদের মূর্তি গম্ভীর।

"কে আপনারা?" স্তেপান পেত্রোভিচের গলার স্বর ধীরস্থির।

"খাদ্য-অভিযান বাহিনী।"

লাতুগিনের জবাবে ধমকের সুর—ভাবে যে, সভাপতি হকচকিয়ে যাবে অন্ততপক্ষে। স্তেপান পেত্রোভিচের গায়ে ভুর ভুর সুরার গন্ধ—কড়া অথচ এমন মধুর যে বাইকভ কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায়। কিন্তু পেত্রোভিচ হকচকান না মোটেই।

"আপনারা ঠিক সময়ে এসেছেন—কতদিন ধরে আশায় আশায় রয়েছি। এই শোনো তো", বলে আধখোলা দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন। দরজার পেছনে নানান্ রকমের শব্দ শোনা যায়—চীৎকার, থালাবাটির ঝনঝনানি, নাচিয়েদের খটখটানি—এমনি সব শব্দ। "গানবাজনা একটু থামাও দেখি!" তখন তিনি এমন টলছেন যে, বাইকভকেই এগিয়ে এসে সামলাতে হল। "কমরেড্স!" বলে চল্লেন পেত্রোভিচ, "আপনারা স্পাসকোই গ্রাম-সোবিয়েতে এসেছেন, জানেন তা!" দরজার হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের ভেতর আওয়াজ পাঠালেন—আগের চেয়েও চূড়ান্ত সুরেঃ "নাগরিক ভাই সব—মিটিংয়ে চলুন, সবাইকে যেতে হবে।"

বেরিয়ে উঠোনে। প্রৌঢ়গোছের তিনজন কৃষক সেখানে খোলা গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে কসাকের গান গাইছে—তিনজনের গলা তিন পর্দায়। আর দুজন হাত ধরাধরি ক'রে তুমুল তর্কে ব্যস্ত। অন্য আর একজন, সে খালি চারদিক ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে—বাড়ী যাবে, কিন্তু খোলা গেটটা যে কিছুতেই খুঁজে পায় না! এখানে এবং গেটের বাইরে যেখানে একর্ডিয়নের তালে তালে নাচ চলেছিল সেখানেও—দু জায়গায়ই স্তেপান পেত্রোভিচ তাঁর আদেশ আবার শুনিয়ে দিলেন—সবাই গ্রাম-সোবিয়েতে চলে যাও, দেরী কোরো না।

কাঠের পা নিয়ে বেগে ছোটার চোটে বরফ-জমা মাটি একেবারে ফাঁক—ছুটতে ছুটতেই তিনি বলে চলেনঃ

"ছুটির সময় ছুটি, কাজের সময় কাজ।......ফর্দ টর্দ সব তৈরী, কার কত জমা তারও হিসেব হয়ে গেছে।......জারিতসিনে তার পাঠিয়ে দিনঃ মাল সরবরাহ সম্পূর্ণ—"

মিটিংটা অন্তত কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখুন, গাঁয়ের লোককে নেশা ছাড়াবার সময় দিতে হবে তো—বলে বাইকভ আর জাদুইভিতের বোঝাতে যায়, কিন্তু উনি খালি বলেনঃ "যার বুদ্ধি আছে মাতাল অবস্থায় তার বুদ্ধি হয় ডবল। আমাকে শেখাবেন না মশাই। আজ যা হবে, তেমনটি আর কাল হবে না। এদের মধ্যে এমন ক'জন লোক আছে যাদের ভেবেচিন্তে দেখার সময় দিলে চলবেই না।"

গ্রাম-সোবিয়েতের বাইরে লোক জমা হচ্ছে। স্তেপান পেত্রোভিচ ইতিমধ্যে খাদ্য বাহিনীর কমরেডদের সামনে তাঁর খাতাপত্র, ফর্দটর্দ সব নিয়ে হাজির করেছেন, আগ্রহের সঙ্গে ফিসফিস করতে করতে মন্তব্য শুনিয়ে যাচ্ছেনঃ

"কুলাক খামার আছে তিনটেঃ এক নম্বর কিরত্‌স্‌চুকার খামার—লোকটা ডাকাত, ১৯০৭ সালে ডাকহরকরাকে খুন করে ডাক লুট করে; দশ বছর ধরে লুটের টাকা বেমালুম লুকিয়ে রেখেছিল। গোলমাল মিটেমুটে গেলে গোলাবাড়ী বানিয়েছে, পাথরে বাঁধানো; একটা দোকানও দিয়েছে। যুদ্ধের সময় ফৌজে চামড়া সাপ্লাই করত, টাকা কামিয়েছে বিস্তর। শুধু স্পাসকোইতেই গরু ছাগল যা ছিল তার অর্ধেক ও জবাই করে ফেলেছে। এখন ভাবছে একটা কো-অপারেটিভ করে তাদের হাতে দোকানটা সরিয়ে দেবে। ওর ফন্দী ফিকিরের খবর পাব শিগগিরই। ও বলে ওর নাকি যক্ষ্মা হয়েছে, রাতের বেলায় চোখে নাকি সর্ষে ফুল দেখে। ভয়ংকর সাংঘাতিক লোক। দু নম্বর কুলাক খামার মিলভিদভের। খনিতে ঠিকাদারি করত, কিন্তু যুদ্ধের আগে গাঁয়ে এসে একটা শুঁড়িখানা আর একটা বন্ধকী দোকান খুলে ফেল্ল, চুপে চুপে।......বেটা সুদখোর মাকড়সা, আস্ত জানোয়ার একটা—গাঁটাকে একেবারে চুষে খেয়েছে। জার দ্বিতীয় নিকোলাই সেজে একটা লোক এসেছিল গাঁয়ে, পরে জানলাম ঐ বেটাই পাঠিয়েছিল তাকে।......তিন নম্বর, মিকিতেংকোর খামার—গরু ছাগলের ব্যবসা ওদের, বহু দিনের। এককালে ওর নিজেরই কত মাল-বোট ছিল, দনে পাড়ি দিত। এ ছাড়া এদের আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি নিয়ে আরও গোটা দশেক খামার—তাও হিসেবে ধরতে পারেন। ...ক'ঘর অতি সাবধানী মুঝিকও আছে, তারা বলেঃ 'কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, শেষ পর্যন্ত কে-বা রাজি হয়—কে জানে? কাউকে না চটানোই বুদ্ধিমানের কাজ।' শত্রু-ব্যূহের অংশ এরা সব।......আর এই যে এরা," বলে ফর্দের নীচে পর্যন্ত আঙুল বুলিয়ে দেখালেন, "এরা আমাদের পক্ষে। গাঁয়ে এখন ঘোরতর অবস্থা—হয় আমাকে সাবাড় করবে ওরা, আর না হয় ওদের দু'চার জনের ফুটানি শেষ হবে আমারই হাতে......"

সোবিয়েতের চারপাশে গ্রামবাসীদের ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি। কেউ নেশায় চুর, কেউ প্রকৃতিস্থ। ভিড়ের ভেতর থেকে অনর্গল কথাবার্তার গর্জন ওঠে। জানলার বাইরে চেয়ে চাপা সুরে একটা জাহাজী ছড়া আওড়ায় বাইকভঃ

বালুর ওপর গাংচিলেরা পাতে যখন ঠাঁই
দরিয়া-ঘোরা লোকের লেগে দুঃখু আছে ভাই।
যদ্দিন না গাংচিলেরা ফিরবে সমুদ্দুরে
বিপাকেতে পড়তে হবে তুফানে আর ঝড়ে॥

তারপর কমরেডদের ডেকে বলেঃ "চল, চল বারান্দায় বেরিয়ে চল, নইলে গোলমাল হবে!"

পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা—মুখে মেচেতার দাগ, চোখ দুটি নীল—সে সবজান্তা। ছুটতে ছুটতে আনা ব্রেখ্‌হিলনাইয়ার ঘরে ঢুকে এক নিশ্বাসে সব বলে গেলঃ

"মা গো মা, সোবিয়েতের ওখানে কী কাণ্ড একবার দেখুন গিয়ে—মুঝিকরা সব বেড়ার বাঁশটাঁশ খুলে তৈরী......"

স্থির চোখদুটো একবার বুলিয়েই যা দেখবার সব দেখে নিয়েছে মেয়েটাঃ আনার পায়ে সাদা মোজা আর স্প্রিং-লাগানো জুতো, গায়ে সেই পাটকিলে রংয়ের জামাটা—সোয়ামী বেঁচে থাকতে সেটা একবারই মাত্র গায়ে উঠেছিল; বিছানার ধারে বসে আনা, ঘোমটা খোলা; আর হাঁটু দুমড়ে বিছানায় শুয়ে আছে সেই নামকাটা পাদ্রী—তাকে আর একটা ফর্সা শার্ট দিয়েছে আনা—কালো কালো ফোঁটাকাটা শার্ট। আনার হাত পাদ্রীর হাতে।

আনা মহা অপ্রস্তুত। "লোকের বাড়ির ভেতর অমন ছুটে আসিস, সাহস তো কম নয়!" বলে খেঁকিয়ে ওঠে। মেয়েটা ভয়ে চুপ, এক ছুটে চম্পট দিল। কিন্তু ওর আওয়াজে কুজমা কুজমিচের ঘুম ভেঙে গেছে। গত ক'দিনে কুজমার দম প্রায় শেষ—প্রচুর পানভোজন আর তার চেয়েও প্রচুর বক্তৃতা—দম ফুরোবে না? ওর উপদেশামৃতের প্রতিটি কথা চাষীদের মনে গেঁথে গেছে; কয়েক জায়গায় একটু দুর্বোধ্য বটে, কিন্তু সেজন্যেই তো ভক্তি আরও বাড়ে। যেখানেই যায়, ঐ ন্যায়বিচারের কথা নিয়েই আলোচনা করতে হয় সবার আগে—চাষীদের অন্তরের বিষয় যে এটা। ভোজটেবিল খালি, শুধু গুরুজনস্থানীয় বয়স্ক লোকেরা বসে আছেন—সুরার প্রতিক্রিয়ায় একটু প্রগল্ভতার আমেজও লেগেছে—এরকম সময়েই ওঠে কথাটা। জামার আস্তিনের ঘষায় হাড় আর মাংসের টুকরোগুলো সরিয়ে দিয়ে কেউ না কেউ নিশ্চয় বলে উঠবেঃ

"কুজমা কুজমিচ, আপনার কথায় মনে ব্যথা লাগে।......ন্যায়বিচার কোথাও নেই এ আবার কেমন কথা! পৃথিবীটা কি তাহলে জঙ্গল?"

বাধা দিয়ে বলবে আর একজনঃ

"হ্যাঁ, আমাদের একালের ছেলেমেয়েদের কথা যদি ধরেন"—বলে মাথা নাড়িয়ে ঘরের ওমুড়োর দিকে ইঙ্গিত করেন—সেমুড়োয় ঘাগরা ঘুরছে, বিনুনী আর চুলের ফিতে উড়ছে নাচের তালে তালে, লাল টকটকে মুখগুলো পাক খাচ্ছে হরদম। "ও'দের তো ছোঁবার জো নেই। ছুঁতে গেলেই শুনবেন, আমরা এখন যা খুশী করতে পারি। ঈশ্বর মানিনে, জার খতম, বাপমায়েরা বুদ্ধু, ওঃ কী মজা!...... ওদের বাঁধার তো আর কিছু রইল না। তাহলে কী আঁকড়ে থাকবে মানুষ? তার ওপর আবার আপনি এসে বলছেন—ন্যায়বিচারটিচার কিছু নেই!"

এবার পাকা-দাড়ি এগিয়ে আসেনঃ

"মানুষেই যদি বিচার তৈরী করে—তাহলে জোর যার মুল্লুক তার, আইনও তারই হবে। তখন আবার আমরা যে কে সেই—ডালপালা একদম ছাঁটাই।......"

"আপনার জোর আছে?" ও'কে শুধাল কুজমা।

"আছে......কিন্তু রুব্লের জোর আরও বেশী। সারা জীবনই তো রুবলের কাছে হার মেনে এলাম।"

"কখনো কারো কাছে নালিশ করেছিলেন?"

"নালিশ—কার কাছে?"

"কীভ-পেচের্স্ক মঠে তীর্থ করতে গেছেন কখনো?"

"না, একবারও যাইনি।"

"হুঁ, তাহলে ন্যায়বিচার নেই-ই।"

"কে বলে নেই? রাগে টগবগ করে ফুটছিলাম—রাইফেল নিয়ে ফিরলাম যুদ্ধ থেকে—মাঠের আলের ওপর দাঁড়িয়ে দিলাম হাঁকঃ 'ভেবেছিলে আমি মরে গেছি, না? এখন আমার আট একর দাও তো দেখি!' "

"দিল?"

"আলবৎ!"

"বিচার আছে তাহলে?"

"ও কি বিচার, ও তো স্রেফ রাইফেলের ভয়! না ভাই, আমি কারও ক্ষতি করতে যাব না, আর কেউও যেন আমার ক্ষতি করতে না আসে। কিন্তু বুড়ো আকিমের পানে চেয়ে দেখ তো—ওর কেউ নেই, কাজ করার ক্ষমতাটুকুও নেই আর......অপরের দরজায় বসে ভিক্ষার বিস্বাদ অন্ন মুখে তোলে। এত যে খাটল তার কী ফল পেল ও? একটা কুঁড়ে ঘর তো ছিল, কিন্তু ঋণের দায়ে তাও গেল মিলভিদভের গর্ভে। আর আমি নিজে? যা করেছি তাতে কি লাভ পাব?......পঞ্চাশ বছর ধ'রে যা খাটা খেটেছি তাতে চারখানা পাকা দালান দিতে পারতাম—অথচ অবস্থা দেখুন, অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ...... মেহনত টেহনত সব যেন সুখের পায়রা—আমার ঘর থেকে উড়ে পালিয়ে ডিম দেয় অপরের ঘরে! আপনি যখন বল্লেন, 'ওরে মানুষ, ওরে বীর, বিচার তো তোদেরই মধ্যে'—তখন ভারী ভাল লাগল। মরতে আমি ভয় করিনে, কুজমা কুজমিচ, আর এখনও স্বচ্ছন্দে পনের বুশেল ঘাড়ে করে নিতে পারি—কিন্তু বিচার তো পাইনে। কার কাছে কত রুব্‌ল আছে সে হিসেব না করে, কে কত মেহনত করেছে তাই দিয়েই যদি মানুষের হিসেব হয়—সেই হবে বিচার।...... এটা কি ক'রে করা যায় বলুন তো? সোবিয়েত গবর্নমেণ্ট যদি করে দিতে পারে তাহলে আমরা কী কৃতজ্ঞই যে হব......"

"আরে সোবিয়েত গবর্ণমেণ্টের আইনই তাই, তাও জানেন না? আচ্ছা লোক তো আপনি!"

"না বাপু, আমাদের এখানে সে আইন পৌঁছায়নি এখনো।"

কুজমা কুজমিচ এত চালাক, তবু এমন ধারা কথার তো ঝট করে জবাব দিতে পারে না! একথা ভেবে কুজমার বিরক্ত লাগে। চাষীদের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কথা বলা অনেক সহজ। টেবিল ঘিরে এই সব আলাপ আলোচনার মধ্যে একটা সন্তোষের সুর বাজে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মেশানো থাকে আর একটা সুর—অসন্তোষ আর বিক্ষোভ আর প্রত্যাশার সুর। বিপ্লবের ফলে আমূল এক পরিবর্তন আসবে—এই যেন ওদের অস্ফুট প্রত্যাশা—আর সেই পরিবর্তন এগিয়ে আনতে পারলেই ওরা যেন সুখী হয়।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ওর একেবারে শোচনীয় অবস্থা—নিজেকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে এল আনার কুটীরে। বেঞ্চের ধারে মেঝের ওপর ধপ করে বসে

গাল চাপড়ায়, হাতে মুখ ঢাকে, হাসে আর বার বার বলে ঃ "আর জোরটোর শেষ, এবার বুড়ো হয়ে গেলাম আনা।"

কথাটি না ক'য়ে আনা ওকে চানের ঘরে নিয়ে গেল—সেই পুকুরের ধারে ঘর। গরম জলের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি ক'রে—নিজের হাতে সাবান মাখাল। কুজমা কুজমিচের মুখটাই শুধু বুড়ো দেখায়, গা-টা কিন্তু খাসা চিকণ, ধবধবে। মাছের মত তড়াক ক'রে তক্তার ওপর লাফিয়ে উঠে কুজমা যখন বল্ল "পাতা দিয়ে একটু হাওয়া করতো লক্ষ্মীটি"—তখন আনার মনটা যেন একেবারে গলে গেল।

চান করে ঠান্ডা হয়ে এক ঘুম—একেবারে বেলা পর্যন্ত। ঘুম ভেঙে উঠে একটু দুধ খায়, তারপর বলে, "আমার ওপর রাগ কোরোনা আনা, মাথাটা বড় ধরেছে"—ব'লে আবার ঘুম। কিন্তু পাশের বাড়ীর ছোট মেয়েটা দৌড়ে এসে যখন জাগিয়ে দিল—তখন ও ফের সেই আগের মানুষ, সদা-প্রফুল্ল।

"বাচ্চা মেয়েটা কি বলে?"

"বল্ল—ফসলের জন্যে লাল ফৌজ থেকে কজন লোক এসেছে, মিটিং বসেছিল, তারপর নাকি মহা-গন্ডগোল।"

"সর্বনাশ! ওরা তো আমাদেরই লোক।"

কুজমা কুজমিচ তাড়াতাড়ি কাপড় পরে, আর ভ্রূ কুঁচকে নীরবে চেয়ে থাকে আনা। হঠাৎ আবার এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলে সেই ছোট মেয়েটাই দেখা দিল—এবার শুধু মাথাটা বাড়িয়েছে।

"ওঃ সবাই মিলে কী মারামারি—কত লোকের যে মাথা ফাটল! ভ্যাসিখা দিদি তার কত্তাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, মা মা, কত্তার সব্বাঙ্গে রক্তে একেবারে রক্তারক্তি।...দিদির চেঁচানিতে রাস্তা বুঝি ভেঙেই পড়ে, খালি তোমাদের গাল পাড়ছে।...ঘোড়া জুততে যাচ্ছিল মিত্রোফান, কিন্তু ওরা কি ছাড়ে—গেট দিয়ে টেনে বার ক'রে এমন মার দিল, বাপরে বাপ!"

ফের দে চম্পট। ওর পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত গেছে কুজমা, তীক্ষ্ণ সুরে চেঁচিয়ে উঠল আনা ঃ "তোমাকে যেতে দেব না!"

উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে আনা—লম্বা, রোগা; পুরুষের মতো কাঁধ দুটো উঁচিয়ে মাথাটা পেছনে হেলিয়েছে, যেন আক্রমণের মোকাবিলা করছে।

ওর হাতে জোরে চাপ দেয় কুজমা ঃ

"আনা, পাগলামি কর তো ডান্ডা খাবে! শান্ত হও, আমি এই এলাম বলে।......সঙ্গে কমরেডদেরও নিয়ে আসব—খানা খাবে। কিছু পিঠে তৈরী করে রেখো তো—শুনছ? চুপ, থামো বলছি!"

দাঁতে দাঁত চাপে আনা ঃ

"তাই হবে, ঠাকুর মশাই।"

গ্রাম সোবিয়েতে যাওয়া আসার পথে যা যা দেখছে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাচ্চা মেয়েটা সে খবর শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কান্ডটা আরও ভয়ঙ্কর হলেই ও আরও খুশী হত। তা বলে মিটিংয়ে গোলমালের অভাব ছিল না। শস্য

দেওয়ার কথা নিয়ে বিশেষ খুব তর্কাতর্কি হয়নি—"দিতে হবে তো দিতে হবে", এই ভাব! কোন্ খামার কত দেবে তার ফর্দ পড়া হ'ল। চুপচাপ শুনে গিয়ে লোকে বল্ল আর একবার পড়। তারপর ভিড়ের মধ্যে টুকরোটাকরা মন্তব্য উঠল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য জেগেছে—কিছু লোক বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে, আর কিছু লোক বেঁকছে বাঁ দিকে—ওয়াট্লের বেড়াঘেরা সব্জিখেতটা সেই দিকে।

"এ ভয়ানক অন্যায়!" —গুরুগম্ভীর চিৎকার শুনে সবাই বোঝে মিকিতেংকোর গলা। "মোটেই নয় ঃ মোটেই নয়!" জবাব আসে বহু কণ্ঠে। একজন লোক—মুখে দাড়ি, জামার হাতা ছেঁড়া—মাথার টুপিটা পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পুরোনো দুঃখের কথা—বলতে আরম্ভ করল ঃ

"খেটে খেটে পেলাম কোন্ কচু? বলি ওরা ভেবেছে কি? এক টুকরো রুটির জন্যে ওর দরজায় ধন্না দিতে হবে? এই তোমার সোবিয়েৎ রাজত্ব?"

ওকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে আসে আর একজন। রাগে মুখ কালো করে সে যা বল্ল তা আরও ভয়ঙ্কর। ভিড়ের ভেতরকার কিছু লোক একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল; তারা একছুটে বেড়ার ধারে গিয়ে টেনে টেনে বাঁশগুলো বার করল, তারপর হামলা করল মিটিংয়ের পেছনে। লাতুগিন, জাদুইভিতের...আর বাইকভ অমনি এক লাফে বারান্দা থেকে সোজা ভিড়ের মাঝখানে—ধাক্কিয়ে লোকজনকে ছিতরেবিতরে দেয়, তাদের হাত থেকে বাঁশ ছিনিয়ে নিতে নিতে চীৎকার করে' ঃ "ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না, সব ঠিক আছে! ধেৎতেরি নিকুচি করেছে, মিটিং ভাঙেনি বলছি, মিটিং চলছে!..." আক্রমণকারীদের সংখ্যা বেশী নয়; তাই অল্পেই ঝটাপটি থেমে গেল। ওদের মধ্যে কয়েকজন পালাল, কয়েকজনকে লোকে ধাওয়া করে নিয়ে গেল রাস্তা পর্যন্ত, আর আরও কয়েকজন চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল মাটিতে—মাটিতে তখন গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমেছে......।

কুজমা তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চায়, তাই বেড়ার ধাপটাপ ডিঙিয়ে সব্জিখেতের আল-টাল পার হয়ে চলেছে; কিন্তু শেষকালে দেখে যে, পথ হারিয়ে অচেনা কোন্ বাড়ীর উঠোনে এসে হাজির। সেখানে মেয়েদের জটলা ঃ একজন তীব্র স্বরে বিলাপ করছে আর সবাই শুনছে মন দিয়ে। কুজমা কুজমিচকে দেখামাত্র সবাই একসঙ্গে বকর বকর করে উঠল। তারপর এগিয়ে এলেন নাদেঝ্দোর-মা ভারভারা ভ্যাসোভা, ক্যাম্বিশের জ্যাকেটের হাতাটাতা গুটিয়ে একেবারে মারমূর্তি। তাঁর পেছনে পেছনে আর সবাই।

"ও, এই জন্যেই তুমি আমাদের পয়সা নাওনি, বেটা নামকাটা পাদরি!" ভারভারা বল্লেন। "গোমুখ্য আমরা, তাই ওর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। সবাইকে মদে চুর ক'রে গোটা গাঁয়ের হাঁড়ির খবর বের করে নিল গো... সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ল, বেটা বজ্জাতের ধাড়ি...কমিউনিস্টদের ফাঁদে ফাঁসিয়ে দিতে এসেছে আমাদের।......আরে হাঁদীরা, তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? মার, মেরে ফেল বেটাকে......।"

“আমাকে মারতে এস না বলছি,” বলে আর পিছু হটে কুজমা কুজমিচ। “মজা টের পাবে সব! খবর্দার গায়ে হাত দিও না!”

“বটে! আমাদের বেলায় কি ছেড়ে কথা কয়েছিলে নাকি?”

মেয়েরা তখন মহা-গরম। মাথা থেকে রুমাল টেনে নামিয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে হৈ চৈ করে—এই নামকাটা পাদরির জন্যেই ওদের ‘লোভ’ বেড়েছে, গ্রাম-সোবিয়েতে মারামারি লেগেছে, আরও কত কি হয়েছে। এমনকি কদিন ধরে লোকে যে হাঁস আর শুয়োর গিলে গিলে শেষ করল তার জন্যেও ও-ই দায়ী। বেড়ার ওপর ওকে একেবারে কোণঠাসা করে চেপে ধরল সবাই। ওদেরকে আগের মত যাদু করার জন্যে কত চেষ্টা করে কুজমা—জোর করে হাসে, মধুর আপোসের সুরে কথা বলে (“আহা-হা, তোমাদের মেজাজ একটু গরম হয়ে গেছে—তা এস না বন্ধুভাবে ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখি, হৈ-হৈয়ে কি লাভ?”)—কিন্তু ভবি ভোলে না। আক্রমণের নেতৃত্বে ভারভারা ভ্লাসোভা—এগিয়ে এসে ওর দু পাশের চুল ধরে এই টান—বাকী সবাই মিলে পিঠের ওপর দুম্ দুম্ কিল বৃষ্টি। শুয়ে পড়ে দু হাত দিয়ে গা বাঁচানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই—ভাবে কুজমা। ওঃ পাঁজরগুলো বুঝি ফাটলো এবার! “যাকগে, ভোঁতা-মোঁতা, কিছু দিয়ে বাড়ি না কষালে বাঁচি”—বলে মনে মনে ভাবছে কুজমা—অমনি তখুনি পৈশাচিক সুরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—“নেকড়ে বেটাকে ডাণ্ডা কষাও, ডাণ্ডা!”

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল কুজমা। এমন সময় হঠাৎ দেখে ছাড়া পেয়ে গেছে। মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বার হচ্ছে বুঝতে পেরে প্রাণপণ চেষ্টায় সে শব্দ ও থামিয়ে ফেল্ল। কে যেন ওকে তুলে ধরে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। চোখ থেকে বরফ আর খড়কুটোর জঞ্জাল সরিয়ে ফেলে কুজমা চোখ চেয়ে দেখে—আনা; আর তার ঘাগরার আড়ালে আর একটা মেচেতাপড়া মুখ, পাশের বাড়ীর সেই ছোট মেয়েটা—মহা-খুশী। তারপর লাতুগিন, বাইকভ, জাদুইভিতের।

“খুব লাগেনি তো?” জিজ্ঞাসা করে লাতুগিন। “কে আছ, এর জন্যে এক গ্লাস সামোগন নিয়ে এস, জল্দি! তারপর কুজমা, তুমি তো খাসা কাজ করছে! তোমার ধর্মবিরোধী প্রচারে ধন্যবাদ জানিয়ে মিটিংয়ে প্রস্তাব পাশ হল।”

“কী নীরস আর কাঠখোট্টাই ছিলাম এতদিন—মানে সেই পেত্রোগ্রাদে ছাড়াছাড়ির পর থেকে—তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না দাশা।...না না ছিলামই তো—তাতে আপত্তি কর কেন! একটা অবচেতন জীবন আছে আমাদের সকলের মধ্যে। ওটা যেন একটা রোগ—একেবারে অবসন্ন করে রাখে, মনে হয় তুষের আগুনে তিলে তিলে জ্বলছি।...কারণটা অবিশ্যি বোঝা শক্ত নয়—তুমি আর তখন আমাকে ভালবাস না, আর আমি......”

দ্রুত বেগে ওর দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে আনে দাশা। দাশার চোখ দুটি—যে চোখ আজও ওর মনে কী এক বিস্ময় জাগিয়ে তোলে—সেই ধূসর সজল চোখ দুটির পানে চেয়ে ও বোঝে যে, ভুল করেছিল। তার ভালবাসায় তো ছেদ পড়েনি। দাশার চাহনি মুহূর্তের মতো মূক করে ফেলে ইলিয়িচকে; তারপর হাসির রেখায় ওষ্ঠ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—সে হাসিতে বুদ্ধির পরিচয় থাক বা না থাক, উচ্ছল আনন্দে তা ছিল পরিপূর্ণ। দাশা একটা ছোট ঝুড়ি বোঝাই করতে ব্যস্ত। সেদিন সকলে গোটা ছয়েক ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে ঘুরে বরাদ্দ হিসাবে ইলিয়িচ যা যা জিনিস পেয়েছে, সেগুলোই বোঝাই হচ্ছে।

বরাদ্দের মধ্যে কতকগুলো বেশ কাজের জিনিস, দরকারে লাগবে। মোজা আছে. পোষাক করার মতো ক'গজ কাপড় আছে, কয়েকটা অতি সুন্দর আণ্ডার-ওয়্যারও আছে—কিশোরী মেয়ের গায়ে দিব্যি ফিট করবে; তা দাশা যা পাতলা —কিশোরী বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। এর ওপর আবার বুট এক জোড়া—পেয়ে ইভান ইলিয়িচ তো আনন্দে আটখানা, মনে হয় যেন শত্রুর ব্যাটারিটাকেই দখল করে এনেছে। তবে আর যেসব জিনিস, সেগুলো ওদের সামরিক জীবনে কি কাজে লাগবে ঠিক ভেবে পায় না। চেয়েছিল বিছানার চাদর, তার বদলে পেয়েছে ঃ একটা চীনেমাটির কুকুর, চীনেমাটির বেড়ালছানা, গোটাকয়েক চুল কোঁকড়ানোর যন্ত্র, ক্রিমিয়ার ছবি আঁকা পোস্ট কার্ড খানকয়েক, আর এক জোড়া চোলী—তিমির হাড়ে গাঁথা ফার্স্ট ক্লাস জিনিস—তবে এত বড় যে দাশার গায়ে ডবল করে জড়িয়ে দেওয়া যায়।...

"দাশামণি, মনে আছে যেদিন তোমার কাছে বিদায় নিই? সেই যে সেই ইস্টিশানে।...তুমি বল্লে, 'বিদায়, চিরবিদায়!'—তাই না? কিংবা তোমার কথাটা হয়তো ঠিক ধরতে পারিনি—আমার মনও তখন একেবারে হতাশায় মগ্ন।...কত দুর্বল, কী বিবর্ণ তোমাকে দেখতে লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন দূরে সরে গেছ, আর ভালবাস না......"

"কী যা-তা বল!" মুখ না ফিরিয়েই দাশা বলে। পথ চলার সময় বেড়ালটা ভেঙে যেতে পারে, তাই ও তখন সেটাকে মোজার মধ্যে পুরছে। জিনিসপত্র সম্বন্ধে ও একটু উদাসীনই, তবে বেড়াল আর কুকুরটা কেন যেন মনে লেগে গেছে। ভারী মিষ্টি বেড়ালছানাটা। লম্বা কানওলা কুকুরটাও বেশ, দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মতবিরোধ আর আবেগোন্মত্ততার ঝোড়ো মেঘ কালো হয়ে এসেছে জীবনের ওপর—কী প্রকাণ্ড, কী কঠোর, কী সর্বনাশা জীবনটা। এর মাঝখানে পুতুল দুটো যেন নিজের ইচ্ছায়ই ওর কাছে এসে পৌঁছেছে—সরল হাসি দিয়ে ছোট্ট এক দুনিয়া বানিয়ে দেবে।...

"সত্যি হোক, মিথ্যে হোক তোমার ঐ ছবিই তো মনে রইল। ঐ ছবি নিয়ে পেত্রোগ্রাদ ছাড়লাম, ঐ ছবি নিয়ে দিন কাটালাম।...আমার জীবনে হৃদয়ের মতোই জেগে রইলে তুমি।...ঠিক করলাম একলা থাকব, অবিবাহিতের মতো।..."

ঘরের মধ্যে ও চলছে ফিরছে এমনভাবে যেন দাশা ঠিক মাঝখানে থাকে।

দাশার মাথায় রুমাল খোলা। আর্টিলারি কমাণ্ডের ডিপো থেকে লাল ফিতে পাওয়া গিয়েছিল—তাই দিয়ে ঢেউ-খেলানো সোনালি চুলগুলি ঘাড়ের ওপর ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। টুলে বসানো ঝুড়ির ওপর ঝুঁকতে ঝুঁকতে মাঝে মাঝে সোজা হয়, কোমরে হাত দিয়ে ভাবে। নার্সের সাদা পোষাকই ওকে যা মানিয়েছে, কোথায় লাগে জমকালো বেশভূষা। পোষাকটা আবার কায়দা ক'রে বাঁধা, কোমরের কাছে। কোমরের এই বাঁধুনি আর লাল ফিতের কায়দা কোনোটাই যে আকাশ থেকে পড়েনি তা বলা বাহুল্য।

"বিপদ হোক, মৃত্যু হোক মন ছিল একেবারে নির্বিকার—হয় মরব, না হয় মরব না, ব্যস! আশ্চর্য, না দাশা? অবিশ্যি যুদ্ধের সময় ওটা কোনো সাহসের পরিচয় নয়, ও শুধু অদৃষ্টবাদিতা। কিন্তু এখন যদি অতীতের দিকে ফিরে চাই, ভয় হয়। আজ আমি চাই হাজার বছরের পরমায়ু—শুধু তোমাকে ছোঁব, চেয়ে চেয়ে দেখব, এই এখনকার মতো......"

"আহা, হাজার বছর পরে আমার কি ছিরিই হবে।... ও হরি, এটা নিয়ে কি করি বল তো ইভান!" আবার চোলীটার ভাঁজ খুলে গায়ের সঙ্গে মাপে "এর মধ্যে তো তিনজন আঁটতে পারে। এটা না নেওয়াই ভাল, তাই না?"

"কিন্তু যদি মোটা হও, তখন তো কাজে লাগবে।"

"ধ্যেৎ! আমি কি কখনো চোলী পরি? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে—চোলীটার কাঁটাটাটা খুলে কেটে নিলে তোমার জন্যে একটা সুন্দর ওয়েস্ট কোট হবে।"

ওর দু হাতই জোড়া। সেই সুযোগে চুপি চুপি পেছনে এসে ওকে আদর ক'রে কাছে টেনে নেয় ইভান।

"কথাটা সত্যি তাহলে? বল সত্যি..."

"নিশ্চয়! এ পৃথিবীতে তুমিই তো আমার সব—তুমি ছাড়া আমি কী, কিছুই নয়।...পথে বার হয়েছিলাম, সেও তোমারই খোঁজে। একটু ভাব না কেন, ইভান!" কাঁটা ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে যায়। "নিজের গায়ে কত জোর তা তো আর তোমার খেয়াল থাকে না, কোন্ দিন হয়তো চেপেই মেরে ফেলবে আমাকে।...রোসো, কি যেন ভুললাম। যাকগে, এখন আর কিছু করার সময় নেই।"

"কি চাও বলনা—একেবারে উড়ে গিয়ে এনে দিচ্ছি!"

"একটা স্পঞ্জ পেলে মন্দ হ'ত না।"

"স্পঞ্জ!"

গ্রেট কোটটা ঝুলছিল। এক ছুটে গিয়ে তার পকেটে হাত ঢোকায়—বার করে আনে একটা স্পঞ্জ, আরও ক'টা আজেবাজে জিনিস।

"এই নাও স্পঞ্জ। আর এটা কি দেখ তো দাশা। কি কাজে লাগে কেউ বলতে পারল না, তবু ছাড়িনি, নিয়ে এলাম।"

"ওঃ, ভারী সুন্দর জিনিস ইভান—এটা রবারের রোলার, মুখ মাসাজ করতে হয়। লক্ষ্মী ছেলে, ঠিক এই জিনিসই তো চাইছিলাম!"

ঝুড়ি ভরা শেষ ক'রে দাশা চলে আসে ইভানের কাছে। খাটের কিনারায়

সমাসীন ইভান, যে কোন মুহূর্তে যেন লাফ দিয়ে উঠতে প্রস্তুত। দু হাতে ইভানের মুখটি তুলে ধরে দাশা, একাগ্রদৃষ্টিতে চোখে চোখ রেখে বলে ঃ

"একটা প্রতিজ্ঞা করেছি আমি—এই নতুন জীবনে কোনো কিছুর জন্যেই আর অপেক্ষা ক'রে বসে থাকব না। আমি তো সল্‌ভীগ* নই—সমুদ্রের ঝাপ্‌সা কুয়াশা ভেদ করার চেষ্টায় আমার কি দরকার? শুধু ভালবাসা, শুধু কাজ, আর কিছু নয়।...আমি যেমন, সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করো। তোমার বিশ্বস্ত সহধর্মিণী হব—সুখে, দুঃখে। জীবন আমরা শুরু করব একেবারে সেই গোড়া থেকে।..."

এমন সময় ডাক্তার সাহেব একেবারে ঘরের ভেতর হাজির—গলাখাঁকারি দেওয়া তাঁর নিয়মে নেই। সাম্প্রতিকতম খবরের কাগজ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের তাজা খবর শুনিয়ে যান—ঘরটা গম্‌গম্‌ ক'রে ওঠে ঃ

"এডমিরাল কোলচাক—যিনি ওম্‌স্ক-এর ডিরেক্টরেট ভেঙে দিয়ে পাইকারী হারে জবাই করেছিলেন মজুরদের—তাঁকেই নাকি রুশিয়ার শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করা হয়েছে—একেবারে সারা রুশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি! ফরাসী, ইংরেজ দুপক্ষই তাঁর রাজত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।......খবরটা কেমন লাগে? তাঁর আর্মির সৈন্যসংখ্যা ছ' লক্ষ। অবিশ্যি দূরপ্রাচ্যটা তিনি অনুগ্রহ ক'রে ছেড়ে দিচ্ছেন—জাপানীদের হাতে! আর এটা শুনুন ঃ ইংরেজ আর ফরাসীদের যুক্ত নৌবহর হাজির হয়েছে সেবাস্তোপোল আর নভোরসিস্ক-এর কাছে।... মিত্রশক্তি! দেখুন একবার, কাদের জন্যে আমরা যুদ্ধ জিতলাম, বোকার মতো রক্ত ঢাললাম।" হিংস্রভাবে ঠোঁট বাঁকান ডাক্তার। "বিদেশীর হস্তক্ষেপ—প্রকাশ্য, নির্লজ্জ! অত ভীষণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবেন না, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ না।... আপনার কর্তাটিকে নিয়ে আমার ওখানে আসুন, বর্শ খাওয়াব।...সেই যে বেয়নেটের ঘা নিয়ে একটি লোক এসেছিল, মনে আছে? সে পাঠিয়ে দিয়েছে—বাঁধাকপি, হাঁস, আর শুওরের মাংস—থলি ভর্তি।...নাঃ এ বড় খারাপ ইভান ইলিয়িচ, আমার সেরা নার্সটিকেই 'আপনি নিয়ে চল্লেন, একেবারে আমার নাকের ওপর দিয়ে।......যাকগে' আজ দুজনে মিলে খুব ভদকা খাওয়া যাবে—চুলোয় যাক হস্তক্ষেপওয়ালারা......"

---

* ইবসেনের কাব্য-নাটক পিটার গিন্টের একটি চরিত্র

॥ এগার ॥

সামান্য সম্বল জুটলেই ভাদিম পেত্রোভিচের দ্বিধা কাটত। তাই দৈবাৎ যখন কাতিয়াকে সন্ধান করার সূত্র সামনে হাজির হ'ল তখন দ্বিধা কাটাবার সম্বলও জুটল। মানুষ এমনি করেই কল্পনার জাল বোনে। সমুদ্রতীরে কোনো নারীর পদচিহ্ন হয়তো চোখে পড়েছে, ব্যস্ অমনি সেই নারীকে ঘিরে মস্ত এক রোমান্স কল্পনা করে, ভাবে সমুদ্রকল্লোলের তালে তালে যে পা ফেলে গেল সে না জানি কত সুন্দরী। ঈর্ষাখিন্ন, নিগ্রহজর্জর প্রেম ভাদিমের—সে প্রেম ওকে যেন ফের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ওর নিরাশ ভাবনা আর দুর্বলচিত্ত দুঃখ তখন দূর হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে সবই সহজ, সবই একেবারে সুস্পষ্ট।

জার্মাণ সিপাহীটির সঙ্গে আলাপের পর সেই রাত্রেই রওনা দিল একাতেরিনোস্লাভ থেকে। সঙ্গে শুধু একপ্রস্থ কাপড় আর কিটব্যাগ—সুটকেস হোটেলেই রইল। গাড়িতে উঠে কাঁধ থেকে অফিসারের বন্ধনী আর টুপি থেকে অফিসারের ফিতে খুলে নিল, পদবী-চিহ্ন ছিঁড়ে ফেলে বাঁ হাতের আস্তিন থেকে--তারপর জানলা দিয়ে সবগুলোই একেবারে গাড়ির বাইরে। 'বি-বা-বো' রেস্তোরাঁয় বসে বসে সেই রাত্রি পর্যন্তও যা কিছু মনে হয়েছিল আত্মসম্মানের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, সে সবও যেন ঐ চটকদার খেলনাগুলোর সঙ্গে কোথায় উড়ে গেল। অন্ধকার গাড়িটা প্রায় খালি। পা দুটো বেশ ছড়ানো, হাত দুটো বেল্টে গোঁজা—এই অবস্থায় ও চেপে বসে রইল বাঙ্কের উপরে। বন্য আনন্দে মনটা উচ্ছ্বসিত এই তো মুক্তি! ট্রেন ওকে দ্রুতগতিতে পৌঁছে দিচ্ছে কাতিয়ার কাছে। যাই ঘটে থাকুক কাতিয়ার ভাগ্যে, ও তার কাছে পৌঁছাবেই—তাতে যদি দেহটা কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তবু ক্ষতি নেই।

একাতেরিনোস্লাভের স্টেশন মাস্টার সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে এখান থেকে রস্তভ পর্যন্ত পথের মাঝামাঝি ডাকাতদলগুলো আবার লুটপাট শুরু করেছে—এই গাড়ির পর পূর্বদিকে আর গাড়িই যাবে না। আরও জানিয়েছিলেন যে, গাড়িটা গুলিয়াই পলিয়ে হয়ে নীচের ব্রাঞ্চ লাইনে যাবে, না ইউজভকা হয়ে ওপরের লাইনে যাবে—তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। স্টেশনে গার্ডের চারদিকে প্যাসেঞ্জারেরা যখন ভিড় করে এল, তখন গার্ড আবার ডাকাতদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দিলেনঃ খামারের মালগাড়ি আর ব্রিশ্‌কা গাড়ি নিয়ে তারা নাকি লুটের সন্ধানে স্তেপের ওপর দিয়ে ছুটে ছুটে আসে। জমিদারি এস্টেটে (যেসব এস্টেটে জমিদারেরা বোকার মতো এস্টেটেই থেকে গেছে), আগুন জ্বালিয়ে দেয়, মিলিটারী মালখানা আর কারখানার ওপর বেপরোয়া হামলা চালায় আর শহরের কাছে এলে বাইরে বাইরে ওৎ পেতে থাকে।

"আতামানদের লীডার না থাকলে তো এত ভয় ছিল না", ভরাট গলায় বলেন গার্ড সাহেব। "কিন্তু ওদের লীডার জুটেছে—সব আতামানের ওপর সর্দার আতামান মাখনো। লোকটা খুব জনপ্রিয়। ওর নিজের রাজ্য আছে, আবার রাজধানীও আছে—গুলিয়াই-পালিয়ে। তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট করার লোক সে নয়। ট্রেন এলে ছেড়ে দেয়—তার আগে দেখে নেয় অবিশ্যি—কাউকে হয়তো টেনেই নিয়ে গেল—ওখানেই ঐ লাইনের ওপর তার কর্মকাবার। এই তো গেলবারের কথা—গাড়িশুদ্ধ প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখি মাখনো, ঘণ্টাটার নীচে দাঁড়িয়ে চুরুট টানছে। লাফিয়ে নেমে কাছে গেলাম—সেলাম ঠুকলাম। কড়া আওয়াজে কি বল্ল জানেন! 'কপাল থেকে হাত নামিয়ে নিন, আমি ভগবান নই, জারও নই......। গাড়িতে কেউ কমিউনিস্ট আছে?' 'না স্যর', জবাব দিলাম। 'হোয়াইট গার্ড কেউ?' 'না স্যর, এ অঞ্চলের লোক ছাড়া আব কেউ নেই।' 'টাকা?' ওরে বাপরে, বুকটা আমার এমন ধড়ফড় করতে লাগল, মনে হল বুঝি ফেটেই যাবে। 'আমার সঙ্গে আসুন না', বল্লাম, 'নিজের চোখেই দেখে যান। লাগেজ ভ্যান, ডাক গাড়ি দুই-ই একদম খালি।' 'বেশ তাহলে ট্রেন ছাড়তে বলুন।'"

ছোট ছোট স্টপেজে গাড়ি থেমেই থাকে—গাড়ির চাকায় শব্দ নেই, গতি নেই, খালি ভাবনা কি হয় কি হয়—স্নায়ুগুলো যেন টনটন করে ওঠে। গাড়ির শেষ দিকে গিয়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ায় ভাদিম পেত্রোভিচ—অন্ধকার প্লাটফর্মের উপর কিংবা লাইনের ধারে কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। অন্ধকারের মধ্যে দেখা যায় শুধু তেলের বাতির একটুখানি হলদে আলো, আর আবছা চেহারার দুজন মানুষ—তারা বসে আছে। একজন ট্রেনের গার্ড আরেকজন টেলিগ্রাফ অপারেটর, কোটের কলারে নাক পর্যন্ত ঢেকে বসে আছে—সারা রাত বসে থাকবে, উপায় নেই। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা কবেই বা লাভ কি? পরের স্টেশন থেকে সিগন্যাল এলে তবে তো ট্রেন ছাড়বে—তা পরের স্টেশনে কেউ জ্যান্ত আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

বুকের মধ্যে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া টেনে নেয় ভাদিম—সমস্ত দেহটা যেন চড়া সুরে বাঁধা, পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে। অন্ধকার নভেম্বরের ঝোড়ো হাওয়া আর সারা রুশিয়ার সীমাহীন মরুভূমি—দুইয়ের মধ্যে জীবনের বিন্দু শুধু একটি। সে বিন্দু এক উষ্ণ নারীদেহ, ওর প্রাণের প্রিয়তম।......চুড়ান্ত আকুলতায় ওকে দুহাতে চেপে ধরেছিল কাতিয়া—অথচ সেই হাত ও সেদিন নির্দয়ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল! সঙ্গীহীন কাতিয়াকে ফেলে রেখে এল সেই অপরিচিত শহরে। শুধু প্রতিহিংসা আর তিরস্কারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় এ কী পাগলামি করে বসল এক উন্মাদ মুহূর্তে! আজ যদি তাকে খুঁজেও পায়, যদি নিজেকে লুটিয়ে দেয় তার পায়ের কাছে, নিঃশব্দে (কথা বলার মুখ কোথায়?), চুমু এঁকে দিতে চায় কাতিয়ার মোজাপরা পা দুটিতে—আহা, সেলাই করে করে সে মোজার হয়তো আর কিছুই বাকী নেই—তাহলেই কি ক্ষমা পাবে? এমন ধারা বিশ্বাসঘাতকতার তো মার্জনা নেই।

গাড়ির শেষে সিঁড়িতে একা একা দাঁড়িয়ে এমনই চিন্তায় উৎকণ্ঠ ভাদিম

পেত্রোভিচ ভ্রূকুঞ্চিত মুখে বিড় বিড় শব্দ করে। অফিস থেকে বেরিয়ে গার্ড এসে দাঁড়ালেন গাড়ির পাশে—ভাবটা এমন যেন দুরন্ত অতিক্রম করার সমস্যা-টমস্যার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধই নেই। খুব বেশী দেরী হবে কিনা ভাদিমের এই প্রশ্নে গার্ড নিরুত্তর, একটু কাঁধ ঝাঁকি দিতেও রাজি নন। হাতের ধোঁয়াটে লণ্ঠনটা হাওয়ায় দোলে, আলো পড়ে কালো কোটের কিনারায়। এমন সময় হঠাৎ অফিসের জানলা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, মিটমিটে আলোটাও নেই। একটা দরজা যেন সজোরে বন্ধ হল। টেলিগ্রাফ অপারেটর গার্ডের কাছ এসে হাজির, দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সিগন্যালটার দিকে—

"নিভিয়ে ফেলুন!" অপারেটরের ফিসফিস আওয়াজ।

লম্বা জুলফিওলা ফুলন্ত মুখের কাছে লণ্ঠনটা তুলে ধরে তাতে জোর ফুঁ লাগান গার্ডসাহেব, তারপর দুজনে মিলে গাড়িতে উঠে গাড়ির উল্টা দিকের দরজাটা খুলে ধরেন।

"পালান!" গার্ড বল্লেন রশচিনকে। বলে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গার্ডসাহেব দে-ছুট।

রশচিনও এক লাফে ওদের পেছনে। একবার লাইনে হোচট খায়, আর একবার স্লীপারের গাদায় আটকা পড়ে—এমনি করে শেষ পর্যন্ত একটা মাঠের মাঝখানে পৌঁছাল। সেখানটা তত অন্ধকার নয়, সামনে দুজন লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাদের নাগাল ধরে ফেল্ল রশচিন।

"এখানে কতকগুলো গর্ত পাওয়া যাবে", টেলিগ্রাফ অপারেটর বল্ল। "ধেৎতেরি অন্ধকারের নিকুচি করেছে! বালি তোলার গর্ত ওগুলো—যখন দরকার হয় আমি ওর মধ্যেই লুকোই........."

গর্তগুলো আর একটু বাঁ দিকে। একটা পগার মতো—তারই মধ্যে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নামেন রশচিন, সঙ্গীদের পিছে পিছে। শাপান্ত করতে করতে আরও দুজন নামে—এঞ্জিন ড্রাইভার আর কয়লাওয়ালা নেমে এল গর্তের ভেতর। গভীর শ্বাস ছাড়লেন গার্ডসাহেবঃ

"এ চাকরী ছেড়ে দেব। এর নাম রেল চলাচল? ছোঃ ঘেন্না ধরে গেল।"

"চুপ!" অপারেটরের গলা। "ওরা আসছে যে, ঐ যে শয়তানগুলো!"

এবার স্তেপের ওধার থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর চাকার ঘড়ঘড় শোনা যায়।

"আচ্ছা এখানে গোলমাল করছে ওরা কারা?" গার্ড প্রশ্ন করেন টেলিগ্রাফ অপারেটরকে। "আবার কি সেই 'মৃত্যুর ঘোড়সওয়ার' নাকি?"

"না সে তো দিব্রিভস্ক্ বনে। মারুমিয়ার দলবল হবে হয়তো। কিন্তু তাই বা কি করে হবে, তার সঙ্গে তো মশাল থাকে সব সময়।...এ বোধ হয় এখানকারই কোন ক্ষুদে আতামান......"

"উঁহু!" ইঞ্জিন ড্রাইভার বলে, "এ ঐ খুনেটা, মাক্‌সিউতাটা নিশ্চয়—ওতো মাখনোর আতামানদের মধ্যে।"

তারপর দীর্ঘশ্বাস।

"আ হা হা, তিন নম্বর গাড়িতে একজন ইহুদী রয়েছে, তার সঙ্গে আবার একগাদা সুটকেস। তাকে তো সাবধান করে আসিনি। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে!"

ঝড়ের আগে হাওয়ার মতো ক্ষুরের শব্দ আরো কাছে আসে। স্টেশনের বাইরে পাথর বাঁধানো রাস্তার ওপর চাকার ঘর্ঘর, খোয়ার ওপর শব্দ তুলে গাড়িগুলো পৌঁছে গেছে। "চলে এসো! চলে এসো!" বলে চীৎকার, তারপর কাঁচ ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ, গুলীর আওয়াজ, কার যেন স্বল্পক্ষণস্থায়ী আর্তনাদ, লোহার গায়ে উপর্যুপরি আঘাতের শব্দ।......হাতে ফুঁ দিতে দিতে গার্ডসাহেব বলেন:

"গাড়ির জানলার কাঁচ না ভাঙলে আর চলবে কেন? নচ্ছার মাতাল যতসব!"

হৈ চৈ, গোলমাল টৌলমাল সব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর স্বরে কে হাঁকল: "সওয়ার হো যাও!" গাড়ির ঘড়ঘড়ানি, ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি, চাকার গুড়গুড় শব্দ—আতামানের দল স্তেপের দিকে ফিরে চলেছে। গর্ত থেকে উঠে ওরা পাঁচজন ধীরে ধীরে অন্ধকার ট্রেনের কাছে ফিরে আসে। তারপর যে যার আপন জায়গায়: তেলের বাতিটা জ্বালিয়ে টেলিগ্রাফ অপারেটর পরবর্তী স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, গাড়ির কোনো জরুরী অংশ খোয়া গেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কয়লাওয়ালা, রশচিন ফিরে যায় নিজের গাড়িতে, আর গার্ডসাহেব—তার পায়ের নীচে ভীষণ কাঁচের মড়মড় শব্দ—বিড় বিড় করে বলেন:

"যা ভেবেছিলাম তাই—বেচারীকে একেবারে নিকেশ করেছে।...কেন বাপু, শুধু ওর ব্যাগগুলো নিয়ে গেলেই তো হতো? মানুষকে মেরে ফেলার কি দরকার?"

আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। অবশেষে হুস্‌ করে গার্ডসাহেবের বাঁশী বাজে, শূন্য স্তেপের মধ্যে ইঞ্জিনটা যেন ক্রুদ্ধস্বরে আর্তনাদ তোলে, ট্রেন চলতে আরম্ভ করে। ট্রেনের লক্ষ্য গুলিয়াই পলিয়ে।

জানলার নীচে ফোল্ডিং টেবিলের ওপর কনুই রেখে বসেছে ভাদিম পেত্রোভিচ্‌, মুখটা হাতের তালুতে ঢাকা, একাগ্র মনে সমস্যার সমাধান খুঁজছে: বিশ্বাসঘাতক অর্নলি-র কাছে ওর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর দিনই রস্তভ ছেড়ে চলে যায় কাতিয়া। তার মানে, ট্রেনে ঐ জার্মাণ সৈন্যটার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল আরও দু'দিন পরে।......সে সময় ওর সান্ত্বনা পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল স্বীকার করি......জার্মাণ সিপাহী ওকে সান্ত্বনা দিতে গেল—তা যে কোনো ভবিষ্যৎ পুরস্কারের আশায় নয় তা-ও স্বীকার করি। কিন্তু একেবারে অপরিচিত একজন মানুষ, তার নোটবুকে এমন নিখুঁতভাবে নাম ঠিকানা লিখে দেওয়া, কমা-ফুলস্টপ পর্যন্ত ভুল নেই—তাও আবার প্রিয়তমকে হারানোর ঠিক পর দিনই—এ বড় আশ্চর্য! কাতিয়ার স্বামী, তার প্রিয়তম তখন মৃত, পূতিগন্ধময় শব-দেহটা পড়ে আছে কোথায় কোনখানে—ওর সারা দুনিয়াটাই কি তখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়নি?......এ অবস্থায় অন্তত কয়েকদিন দারুণ হতাশায় ডুবে

থাকাই স্বাভাবিক। অথচ সে তখন ঠিকানা দিচ্ছে 'কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার', মানে নিজে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসবে। তাহলে আশার কোনো সূত্র খুঁজে পেয়েছিল নিশ্চয়।... ..এ তো বড় রহস্যের কথা!

"সিটিজেন, আপনার পরিচয়পত্র দেখাবেন অনুগ্রহ করে—" গার্ড সাহেব উপস্থিত। রশ্‌চিনের সামনে বসে লণ্ঠনটা পাশে রাখেন। "আর গুলিয়াই-পলিয়ে আসতে দেরী নেই, ওটা পার হলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবেন।"

"আমি ওখানেই নামব।"

"সে তো আরও ভাল।......কিন্তু প্যাসেঞ্জারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে যে আমাকে।"

"কাগজপত্র কিচ্ছু নেই আমার কাছে।"

"কিচ্ছু নেই?"

"সব ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।"

"তাহলে তো আপনার নামে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে।"

"করতে হয় করুন গিয়ে, চুলোয় যান।"

"এমন সময় চুলোর কথা তোলেন কেন? আপনি কি অফিসার?"

খুব হুঁশিয়ার রশচিন, দাঁতে দাঁত চেপে টান টান ভাবে জবাব দেয়ঃ

"আমি এনার্কিষ্ট।"

"ওহো, তাই বলুন! আপনাদের কত লোককে নিয়ে এসেছি একাতেরিনোস্লাভ থেকে।" ইঞ্জিন থেকে আগুনের ফুলকি উড়ে আসে, সেদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন গার্ড সাহেব অনেকক্ষণ, লণ্ঠনটা ঝোলে দু'পায়ের মাঝখানে। অবশেষে কথা বার হয়, গলার স্বরটা নীচুঃ "আপনি শিক্ষিত লোক, আচ্ছা বলুন তো আমাদের কি করা উচিত।......এই তো এর আগের জার্নিতে এক এনার্কিষ্ট-এর সঙ্গে কথা হল—উস্কোখুস্কো পাকা চুল ভদ্রলোকের, মুখ ভার করেই আছেন। 'রেলওয়ে আমাদের দরকার নেই', তিনি বললেন। 'সব আমরা ভেঙে চুরমার করে দেব, লোকের আর মনেই থাকবে না এ সব জিনিসের কথা। রেলওয়ে থেকেই আসে গোলামি আর পুঁজিদারি। সব আমরা সমান ভাগ করে দেব। কারও কর্তৃত্ব-টর্তৃত্ব চাইনে আমরা, মানুষ থাকবে স্বাধীনভাবে, যেমন পশুরা থাকে।......' ধন্যবাদ! তিরিশ বচ্ছর ট্রেণ চালিয়ে তাগানরগ-এ একখানা ঘর বানিয়েছি, গিন্নীকে নিয়ে মাথা গুঁজতে পারব; একটা ছাগল পুষেছি, সবজি-ক্ষেতও আছে একটুখানি, আর দুটো কুল গাছ। এই তো আমার মোট পুঁজি। স্বাধীনতা নিয়ে করব কি? পাহাড়ের ধারে ছাগল চরাব? আচ্ছা পুরনো আমলে নিয়মশৃঙ্খলা ছিল কিনা? বলুন, ছিল কিনা? অবিশ্যি শোষণও ছিল, তাতো অস্বীকার করছিনে। ফার্স্ট ক্লাশ কামরার কথা মনে করুন—কেমন খাসা শান্ত-শিষ্ট প্যাসেঞ্জার সব, কেউ চুরুট সেবন করছেন, কেউ বা অতি ভদ্রভাবে ঢুলছেন। তারা যে শোষণকারী তা বোঝা যেত, কিন্তু তা বলে গালাগালি, খারাপ কথা এসব কিচ্ছু পাবেন না! টুপিটি তুলে নীরবে চলে যান, ব্যাস! আর থার্ড

ক্লাশে গেলেই দেখবেন মুঝিকরা সব গাদাগাদি ঠাসাঠাসি, আদব কায়দার ধার ধারতে হবে না আপনাকে।...অবস্থা এমনই ছিল, হ্যাঁ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তবু এক টুকরো মুরগীর ঠ্যাং তো জুটত, দু' চারটে আন্ডা, একটু শুয়োরের মাংস তাও জুটত; আর রুটি? আহা, রোল করা কী পাঁউরুটিই ছিল!" একটু থামেন, উড়ন্ত ফুলকির দিকে তখনও দৃষ্টি নিবন্ধ। "লাগেজ ভ্যান-এ এক্সল গরম হয়ে গেছে—তেলের অভাব। রেল চলাচলের বারোটা এমনিই বাজবে. এনার্কিস্টদের আর আসতে হবে না। আচ্ছা, এর পরে কি হবে বলতে পারেন? জারের বদলে 'রাদা' পেলাম, রাদার বদলে 'হেৎমান'। এখন হেৎমান ছেড়ে কাকে ধরি? মাখনো-কে? তাহলে শুনুন গল্প বলি ঃ এক জায়গায় এক বেকুব ছিল, বেটা লাঙগলের ফলা বানাবে! কিন্তু লোহাটা আগুনে আছে তো আছেই, অর্ধেক একেবারে গলে জল। তখন ভাবল, আচ্ছা তাহলে কুড়ুল বানাই। কিন্তু বাকি লোহারও অর্ধেক গলে গেছে. যা আছে তা দিয়ে বড় জোর একটা তুরপুন বানান যায়। তাও আবার পিটিয়ে পিটিয়ে এমন অবস্থা করল যেন সূঁচের টুকরো, বাকী সব খতম। আমাদেরও সেই দশা। না আছে শৃঙখলা, না আছে মালিক, না আছে শ্রদ্ধা-ভক্তি! গুলিয়াই-পলিয়ে যাচ্ছেন তো—'স্বাধীন এনার্কিস্ট রাজত্বে' লোকের কি অবস্থা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন। আমার কাছে শুধু এইটুকু শুনে যান ঃ ওরা রসের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছে মশাই—এমন কান্ডকারখানা জন্মে দেখিনি। সারা জেলাটাই নাকি 'মদের জেলা'—একেবারে ফর্মাণ জারি করে দিয়েছে। আর ছুঁড়ীই বা কত, এই তো আমার ট্রেণেই নিয়ে গেছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ...বুড়ো মানুষ আমি, কিছু মনে করবেন না কমরেড এনার্কিণ্ট, কিন্তু বলি শুনুন ঃ রুশিয়ায় এবার দফা রফা..."

গরমের সময় কিছু সংখ্যক অবস্থাপন্ন কৃষক আতামান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল—এখন তাদের মাথায় ঘরে ফেরার চিন্তা। অনেকবার অনেক লুটপাটে হকের পাওনা হিসেবে ওরা যে বখরা পেয়েছে, সে সব ওরা এবার গাড়ীতে বোঝাই করেছে। নানান্ রকমের স্থানীয় মুদ্রা বদলে জারের রুবল জমিয়েছে। তারপর মালপত্রের ওপর এঁটেসেঁটে তেরপল ঢাকা দিয়ে, গাড়ীর পেছনের ধুরো থেকে কেটলি ঝুলিয়ে, জোয়ান ঘোড়াগুলোকে চুপিচুপি জুড়েছে গাড়ীতে—নিজের নিজের গ্রামের দিকে রওনা দেবে। গ্রামের ঘরে ঘরে আগে জার্মান সৈন্য বসানো ছিল, এখন তো আর নেই। কেউ কেউ আবার সোজা আতামানের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে, দু' কথায় বিদায়বার্তা জানাচ্ছে ঃ

"আমাকে আর সৈন্যের মধ্যে ধরবেন না।"

"কি হল, ব্যাপার কি?"

"বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে—খেতে-শুতেও রুচি লাগে না। যখন দরকার হবে ডেকে পাঠাবেন, আবার আসব।"

আলেক্সি ক্লাসিল্‌নিকভ্‌-এর মনও ওদিকে টানে। ওর ভাইয়ের বৌ মাত্রিয়োনা—তাকে জিজ্ঞাসা করে, এমন কি কাতিয়া রশ্‌চিনকেও জিজ্ঞাসা করে—তারা কি বলে, এখনো কি দেশে ফেরার সময় হয়নি? গেলে অবিশ্যি মুশকিলও হতে পারে। জার্মানরা তো সহজে ছাড়ে না—জার্মান কর্পোরালের খুনের জন্যে যদি ওদের দায়ী করে? সবার চোখ এড়িয়ে তো আর ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে-তে ঢোকা সম্ভব নয়! আবার অন্য দিকটাও ভাব! ফিরে গিয়ে যদি দেখি ঘরবাড়ী সব জ্বলে পুড়ে বরবাদ হয়ে গেছে, তাহলে তো সবই ফের নতুন করে বানাতে হবে। সে কাজে দেরী করলে চলে না, এই শরতেই সেরে ফেলা দরকার।

মাখনো-বাহিনীর লুটের মাল থেকে আলেক্সি ক্লাসিল্‌নিকভের ভাগে পড়েছিলঃ পাঁচটা ঘোড়া আর তিন গাড়ী ভর্তি কাপড়চোপড়, ছিট, গেরস্থালির জিনিসপত্তর—এম্‌নি সব। এর বেশীর ভাগই মাত্রিয়োনার সংগ্রহ, আলেক্সির ভাগ অল্প। মাত্রিয়োনার ফিটফাট সাজপোষাক, সুন্দর চেহারা, ক্ষুরধার জিহ্বা—তাই নিয়ে নির্ভয়ে সে গিয়ে হাজির হয়েছে ভাগবাঁটোয়ারার বৈঠকে। ডিট্যাচমেণ্টের আতামান হোক বা মাখনো নিজেই হোক—ভাগাভাগি যেই করুক, সে যা চায় তা আদায় না করে ছাড়েনি। একটা শাল, কিংবা একটা গ্রেটকোট নয়তো ক' গজ কাপড়—তাই নিয়ে হয়তো কোনো দুঃসাহসী চাষী ওর সঙ্গে রেষারেষি লাগাতে গিয়েছে—অম্‌নি ও সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলেছে, "আরে আমি মেয়েমানুষ' তোমার চেয়ে এ সব জিনিসে আমার দরকার বেশী! তুমি তো ডাকাত, স্রেফ মদের দামেই এটাকে বেচে দেবে—আজ রাতে আমার কাছেই নিয়ে আসবে বেচতে, দেখে নিও।" ওর ছিনিয়ে নেওয়া দেখে লোকজন সবাই হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে।......মাত্রিয়োনা আবার মালও কেনে, জিনিসের বদলে জিনিস নেয়—সেজন্যে ওর গাড়ীর ওপর মদের পিপে হরদম মজুদ।

ভেবে মাথা খুঁড়ে খুঁড়েও আলেক্সি কিনারা পায় না। অবশেষে এক আনন্দের সংবাদ এলঃ জার্মানরা তো বটেই, স্করপাদ্‌স্কির নিজের সৈন্যেরাও তাকে ছেড়ে গেছে, তাই হেৎমানগিরিতে সে ইস্তফা দিয়েছে। কিয়েভে প্রবেশ করেছে পেৎলুরার সৈন্যদল, সেখানে তারা 'গণতান্ত্রিক ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেছে। ঠিক একই সময়ে সোবিয়েত সীমান্ত থেকে এগিয়ে এসেছে ইউক্রেনের লাল ফৌজ। বাস্তবিকই শুভ সংবাদ।

গভীর রাত্রে স্তেপ থেকে ঘোড়াগুলোকে চুপি চুপি তাড়িয়ে নিয়ে এল আলেক্সি। মাত্রিয়োনা আর কাতিয়াকে ঘুম থেকে তুলে বল্ল—তোমরা খানা তৈরী কর, ততক্ষণে আমি ঘোড়াটোড়া জুতে ফেলছি। অনেক দূরের পথ, তাই পেট পুরে খেয়ে নিল। তারপর ভোর হবার আগেই যাত্রা শুরু। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধ'রে তারা চলেছে ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামের দিকে—যেখানে তাদের ঘর।

গাড়ীর ওপর বসে আছে কাতিয়া রুশ্‌চিন—গায়ে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে তেলমাখানো বুট, পুরুন্ত গাল দুটিতে আপেলের মতো লাল আভা। অতি-সুকুমার অভিজাত মহিলা রূপে যে-কাতিয়া একদিন জীবনের সামান্যতম উত্থানপতনেও ভয়ার্ত পদ্মকীটের মতো কুণ্ঠিত হয়ে উঠত—সে-কাতিয়াকে এই নতুন কাতিয়ার মধ্যে চিনে ওঠা কঠিন। সামনের গাড়ীর চালক আলেক্সি—মাঝে মাঝে প্রায়ই সে তার তেজী, কালো জুড়ি ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয়, জোরে ছোটে ঘোড়া দুটো। ঘাসের রাস্তায় হেলান দিয়ে কাতিয়াও তার ঘোড়ার ওপর চাবুক চালায়, নইলে সামনের গাড়ী থেকে বড্ড পেছনে পড়ে যাবে। আর সবার শেষ গাড়ীতে মাত্রিয়োনা। হেঁটেই চলুক বা গাড়ীতেই চলুক, অন্য কারো হাতে মাল ছেড়ে দেবার পাত্রী সে নয়।

নির্জন স্তেপভূমি। পাহাড়ী নালার গায়ে ফোকরে ফোকরে শাদা বরফের রেখা—খড়িমাটির সমতলভূমি থেকে হাওয়ায় উড়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দূর দিগন্তে গেরুয়া রংয়ের পিরামিড দেখা যায়—ওগুলো খনির ধারে মাটির ঢিবি। দখলকারী সৈন্যের উপস্থিতি থেকে এ সব এলাকা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু জীবনচাঞ্চল্য শুরু হয়নি এখনো। এখানকার খনি আর কারখানা থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই গিয়ে রেড সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, এখন তারা জারিতসিনে লড়াইয়ে ব্যস্ত। আরও অনেকে পালিয়েছে উত্তরমুখো—সেখানে সোবিয়েত সীমান্তে ইউক্রেনীয় রেড আর্মির ব্যাটালিয়ন গঠন করা হচ্ছে। রাস্তাঘাট সব ডক-পাতায় ভর্তি, উপেক্ষিত শস্যক্ষেতে আগাছা গজিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে ঘোড়ার কঙ্কাল পড়ে আছে দেখা যায়—কঙ্কালের হাড়গুলো হলদে হয়ে আসছে। বাড়ীঘর প্রায় নেই-ই।

মানুষজন যথাসম্ভব এড়িয়ে চলো ('মানুষের কাছ থেকে কখনো ভাল-র আশা করো না')—বলে বলে ক্রমাগত হুঁশিয়ার করে মাত্রিয়োনা। কিন্তু আলেক্সি শুধু হাসে, ওকে খেঁকশেয়ালী বলে ঠাট্টা করে। "আরে মাত্রিয়োনা, তুমি ছিলে মধুর মতো মিষ্টি, আর এখন একেবারে বুনো জানোয়ার বনে গেলে? নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখ তো?"

একটা খড় মুখে দিয়ে দুলতে দুলতে গাড়ীতে চলে কাতিয়া—চিন্তার সময় একেবারে অফুরন্ত। ও-ও যে লুটেরই মাল, তিন গাড়ী বোঝাই সম্পত্তির মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে দামী সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত, তা ও বেশ বোঝে। বোঝে যে, ও হচ্ছে আলেক্সি ইভানোভিচের বিজয়মাল্য—তার গলায় পরাবার জন্যেই ওকে ভ্লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামে নিয়ে চলেছে। পুরোনো পৃথিবীর ভগ্নস্তূপ থেকে ওকে নিয়ে এসেছে বন্দিনীর মতো, তা ছাড়া আর কি? আলেক্সি ইভানোভিচের যে বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তারই ওপর আবার সে সুন্দর নতুন ঘর বানাবে, বাইরের পৃথিবীর বিরুদ্ধে শক্ত বেড়া তুলবে ঘরের চারিদিকে, ধনরত্ন সব লুকোবে মাটির নীচে। তারপর একদিন দুঢ়স্বরে

জানাবেঃ "একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভনা, আর শুধু একটি জিনিস বাকী। সে সম্বন্ধে তোমাকেই তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

জীবনটা যেন কোন্‌ শহরের ভস্মস্তূপ—তলোয়ারের চোটে আর আগুনের হল্‌কায় ছারখার হয়ে গেছে, মাথা জাগিয়ে আছে শুধু পোড়া চিম্‌নিগুলো। ওর আত্মীয়, বন্ধু, কেউই আর আজ নেই—হয় মরেছে, না হয় নিখোঁজ হয়ে গেছে।

মাত্রিয়োনার স্বামী সেমিযন সেদিন সামারা থেকে চিঠি লিখেছে, পাঁচ কথার মধ্যে এটাও জানিয়েছে যে, লিখিত ঠিকানা মতো সে সেই আগেকার দ্‌ভরিয়ানস্কোয়া স্ট্রীটে গিয়ে ডাঃ বুলাভিনের খোঁজ করেছিল—কিন্তু তিনি আর ওখানে থাকেন না, মেয়ে নিয়ে কোথায় গেছেন তাও কেউ বলতে পারল না। পথহারানো বেড়ালছানার মতো এখন কাতিয়ার অবস্থা—আলেক্সি আর মাত্রিয়োনা ছাড়া আর তো কেউ নেই যে ওকে একটু ভালবাসবে, যত্ন-আত্তি করবে। ওরা যদি কিছু চায়, তা না দিয়ে কেমন ক'রে পারবে কাতিয়া?

অতিক্রান্ত জীবনের এক একটা বছর যেন এক একটা শতাব্দী—তেমনি দীর্ঘ আর ঘটনাভারাক্রান্ত। মনে হয় কেঁদে কেঁদে এতদিনে ওর চোখ অন্ধ হয়ে আসা উচিত ছিল, চুল পেকে একেবারে বুড়ী হয়ে গেলেই ভাল ছিল। কিন্তু তা তো হয়নি—বরং হিমশীতল হাওয়া এসে গালে রং ধরিয়ে দিয়ে গেছে, শীপস্কিন কোটের নীচে জেগেছে যৌবনের উষ্ণতা। অম্লান যৌবনের এই যে অনুভূতি—এতে বিরক্তিই ধরে। ওর প্রাণ যে বুড়িয়ে গেছে। না কি, তাও মিথ্যে?

ভগবান ওদের এক সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন, স্বয়ং ভগবান ছাড়া কেউ সে বাঁধন খুলতে পারবে না—কাতিয়াকে এ কথা জানিয়ে দিতে কখনো কসুর করে না মাত্রিয়োনা। আলেক্সি অবিশ্যি এমন ধারা কথা চাপাতে আসে না। তাহলেও বার বার কয়েকবার সে কাতিয়াকে ভয়ংকর বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, তার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ঝুঁকিও নিয়েছে; এমন কাজ করেছে যা লোকে আপন অভীপ্সিতার জন্যেই ক'রে থাকে। ওকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে ভাষা খুঁজে পেত না কাতিয়া। এ রকম অকৃতজ্ঞতার কথা কি মুখ দিয়ে বার করা যায়? যতদিন সম্ভব এসব ব্যাপার মুলতুবী থাকবে—শুধু এই ওর আশা। কী যেন একটা আকর্ষণ আছে আলেক্সির মধ্যেঃ মনে হয় ওর সরল, অমার্জিত মুখখানি যেন সদা-সর্বদাই সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। মাথায় যেন ঝাঁকড়া চুল, প্রশস্ত বুক, ঋজু মেরুদন্ড—আলেক্সির দেহে শক্তি আছে। চিত্তও প্রশান্ত—বিপদে বুদ্ধি হারায় না, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। কাতিয়ার প্রতি ওর ব্যবহার খুবই সহৃদয়, তবে স্নেহপরায়ণভাবে মাঝে মাঝে একটু খুনশুটিও করে। কিন্তু এমন দিন আসছে যেদিন কাতিয়াকে ওর অঙ্কশায়িনী হতে হবে—একথা ভাবতেই কাতিয়ার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, ইচ্ছে করে গাড়ীর ভেতরকার ঘাস-গাদার মধ্যে একেবারে ডুবে যায়।

একদিন ওরা রাস্তা ছেড়ে একটা পাহাড়ী নদীর ধারে বসেছে, খাওয়া দাওয়া সারবে। ওখানে নদীটা একটু চওড়া, পুকুরের মতো। পুকুরের ধারে নল-খাগড়াগুলো কে যেন পায়ে দলে গেছে—আর তার মধ্যে থেকে মাথা জাগিয়ে আছে একটা বিধ্বস্ত বায়ুচালিত যাঁতাকল—শুধু তার খুঁটিগুলো দেখা যায়। জ্বালানি কুড়িয়ে আনতে গেছে মাত্রিয়োনা, আর কাতিয়া গেছে নদীতে—বাসন-কোশন ধুয়ে আনবে। একটু পরে আলেক্সি এসে উপস্থিত। টুপি আর দস্তানা ঘাসের ওপর ফেলে, জলের ধারে কাতিয়ার পাশে বসে সে মুখে চোখে জল দিল, তারপর জামার হাতায় মুখ মুছল।

"আপনার হাত যে জমে যাবে", আলেক্সি বল্লে।

হাঁড়িটা মাটিতে নামিয়ে হাঁটুর ওপর দাঁড়াল কাতিয়া। হাত দুটোর হাড় পর্যন্ত যেন জমে গেছে। জল ঝেড়ে ফেলে আলেক্সির মতো ও-ও হাত মুছতে লাগল শীপস্কিন জামার ওপর।

"আগের দিনে লোকে আপনার হাতে চুমু দিত বোধ হয়", আলেক্সি বল্ল। ওর গলার স্বরটা চড়া তারের মতো, কর্কশ, উদ্ধত।

ওর দিকে দ্রুত স্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কাতিয়া, যেন জানতে চায় কি হল। নিজের সৌন্দর্যের শক্তি কতখানি কাতিয়া তা কোনদিনই টের পায়নি। তবে ও যে সুশ্রী সে কথা ও সরল মনেই জানত, এমন কি অনেক সময় নিজেকে খুব সুশ্রী বলেও মনে করত। গাছতলায় রুপালি শিশিরের গায়ে রাত-প্রভাতের রক্তাভ সূর্যকিরণ যখন ঝলমলিয়ে ওঠে তখন পাখী যেমন তার পক্ষ-সংস্কার ক'রে সুদর্শন হতে চায়, তেমনি ও-ও চাইত অপরের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে-সৌন্দর্য দেখে আলেক্সি ইভানোভিচ আর ওর দিকে চাইতে পারছে না, উত্তেজনা-প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, সে সৌন্দর্যের কথা ওর জানা ছিল না।

"হাতে তেল মাখবেন, বুঝলেন! আমার গাড়ীতে এক শিশি সূর্যমুখী তেল আছে। তেল না মাখলে হাত ফেটে যাবে।"

কড়া গোঁফের নীচে ওর পুরন্ত ঠোঁট দুটি—তাতে আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ খুনশুটির হাসি ফিরে এসেছে। স্বস্তির লম্বা শ্বাস ফেল্ল কাতিয়া। ও যা চায় না তা যে কত কাছে এসে গিয়েছিল সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ওর মাথায় ঢোকেনি। একটু আগে গাড়ীর ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে ঢিকিয়ে চলার তন্দ্রাই বোধ হয় আলেক্সিকে অভিভূত করে কিংবা স্তেপভূমির সর্বব্যাপী শান্তিই হয়তো ওর মনটাকে আচ্ছন্ন করে দেয়; যে কারণেই হোক মাত্রিয়োনা কাঠ কুড়োতে চলে যাওয়ার পর কাতিয়ার দিক থেকে ও আর কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারেনি—কাতিয়া জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে আর ও চেয়ে চেয়ে তাই দেখেছে। গাঁয়ের মেয়ে যখন জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে কাপড় কাচে, গোটানো ঘাগরার নীচে তার লোভনীয় অনাবৃত পা দুটি দেখা যায়—তখন শব্দ শুনে পাশের বাড়ীর ছেলেটি চুপি চুপি এগিয়ে আসে; মদির গন্ধ হঠাৎ ছেয়ে

যায় বাতাসে, সাগ্রহে শ্বাস টানতে টানতে, ডক পাতা আর কাঁটা ঝোপ মাড়িয়ে অগ্রসর হয় ছেলেটি। ঠিক তেমনিভাবেই কাতিয়াকে অনুসরণ করেছিল আলেক্সি। কিন্তু কাছে গিয়ে থামতে হল। ভয়ে নয়, ও বড় সহজে ভয় খায় না—থামতে হ'ল শুধু এই কারণে যে, কাতিয়ার স্থির সুন্দর চোখের একটিমাত্র চাহনিতেই সে জানিয়ে দিতে পেরেছিলঃ “এ তো ভাল কাজ নয়, এমন করলে চলবে না।”

জীবনে এর চেয়ে আরও কত কঠিন মুহূর্ত এসেছে, আলেক্সি কিন্তু বিহ্বল হয়নি কোনো দিন। তবু আজ হাতটা কাঁপে, মনে হয় যেন ভারী পাথর ওপরে ওঠাচ্ছে। মাটির ওপর থেকে ও হাঁড়িটা তুলে নিল।

“চলুন চলুন, রান্না চড়ানো যাক।” গাড়ীর কাছে ফিরে গেল দুজনে। “একাতেরিনা দ্মিত্রেভনা, আপনার দু দুবার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ছেলেপিলে নেই কেন?”

“কালধর্ম আর কি। আমার প্রথম স্বামী ছিলেন ছেলেপিলে হওয়ার বিপক্ষে, আমিও অত শত বুঝিনি।”

“আর ভাদিম পেত্রোভিচ—তিনিও কি ছেলেপিলে চাইতেন না?”

ভ্রূকুঞ্চিত করে নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিল কাতিয়া।

“অনেক দিন ভেবেছি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব......মানে আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে। এই প্রেম করার ব্যাপারটা আরম্ভ করে কিভাবে? আপনার স্বামীরা, প্রণয়ীরা—তারা কি সোজাসুজি এসে হাতে চুমু দিত? না কি প্রথমে খালি ধানাইপানাই-ই করত? কায়দাটা কি রকম বলুন না! বাবু লোকেরা কেমন করে প্রেম করে?”

ওরা তখন গাড়ীর কাছে। একটা গাড়ীর ওপর ঘোড়ার সাজটাজ কতকগুলো পড়ে ছিল। দস্তুরমতো গায়ের জোর খাটিয়ে আলেক্সি সেগুলোকে মাটিতে ফেল্ল, তারপর গাড়ীর তলা থেকে ঘোড়ার গলাসিটা বার ক'রে এনে তার ওপর গাড়ীর বোমটা ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল; বোমের মুড়ো থেকে ঝুলিয়ে দিল রান্নার পাত্রটা।

“বাবু-ঘরের মেয়ে আপনি, আর আমি হচ্ছি চাষাভূষো মানুষ......একেবারে সরু পথের মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি দুজনে। ফেরার তো আর আপনার পথ নেই, ও সব চুকে বুকে গেছে। হিসাবনিকাশের যেটুকু বাকি সেটুকুও শীগ্গিরই চুকিয়ে নেওয়া যাবে। নতুন স্বামী খুঁজে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই আপনার......।”

“আপনার মনে কি ব্যথা দিয়েছি, আলেক্সি ইভানোভিচ?”

“না......ব্যথা বরং আমিই দিতে চাই, আপনাকে......কিন্তু তার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিনে।......আমি চাষাভূষো মানুষ, মুখ্যুসুখ্যু।......ওঃ তাই তো, একেবারে আকাট মুখ্যু তো আমি—এই কথাটাই বুঝিনি এতদিন! আপনি

স্রেফ তক্কে তক্কে আছেন, সুযোগ পেলেই দেশ ছেড়ে পালাবেন, তাই না? বিদেশে পৌঁছতে পারলেই কেল্লা মাত, কি বলেন......”

“ছিঃ! আমি কী করেছি যে এমন অপবাদ দিলেন? আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন সে কথা কি কখনো ভুলতে পারি......

“খুব পারেন।......মাত্রিয়োনাকে দেখেছেন তো, মানুষকে কি রকম সন্দেহ করে? লোকের ওপর আমারও বিশ্বাস নেই। সেই ১৯১৪ থেকে লড়ে আসছি—শুধু রক্ত আর রক্ত। মানুষ তো সব এখন বুনো জানোয়ার। আগেও হয়তো তাই ছিল, কিন্তু জানতাম না। সবাই ওৎ পেতে আছে পাশের লোকটাকে কবে বাগে পায়।......আমি, আমিও তো একটা জানোয়ার। নিরীহ গোবেচারীর মতো চাইছেন কি, জানেন না সে কথা? আমারও ইচ্ছে হয় কোঠা-দালান বানাব, ছেলেপিলেকে ফরাসী শেখাব, আপনার চেয়েও সুন্দরভাবে তারা উচ্চারণ করবে—পার্দঁ,’ ‘মেয়ার্সি’......”

এক বোঝা ডালপালা, কাঠকুটো নিয়ে মাত্রিয়োনা ফিরে এল। ঝোলানো হাঁড়ির নীচে সেগুলো ঢেলে দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইল—একবার আলেক্সির দিকে, একবার কাতিয়ার দিকে।

“ওকে কষ্ট দিও না আলেক্সি,” কোমল স্বরে বল্লে মাত্রিয়োনা। “ঘোড়াকে জল খাইয়েছ?”

ঘুরে দাঁড়িয়ে আলেক্সি ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। হাঁড়ির নীচে কাঠকুটরোগুলো খুঁচিয়ে দিতে দিতে মাত্রিয়োনা বল্ল:

“ও তোমাকে ভালবাসে।......কত মেয়ে দেখালাম ওকে—তা কাউকে কি মনে ধরল? উঁ হুঁ! তোমাদের এ ব্যাপার কোথায় গড়াবে কে জানে—সহজ তো নয়—না তোমার পক্ষে, না ওর পক্ষে......।”

কাতিয়া কি বলে শোনার জন্যে একটু থামল। কিন্তু কাতিয়া নিস্তব্ধ। রুটি আর চর্বি বার করে মাটিতে একটা কাপড় বিছাল, তারপর রুটি কাটতে শুরু করল। মুখে কথা নেই।

“কিছু বল না বাপু!”

মাথা-নীচু করে রুটিই কেটে চলে কাতিয়া। চোখের জলের ধারা নেমেছে দু গাল বেয়ে।

কৃষ্ণসাগর থেকে আজভ হ্রদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি, তার নাম ‘একাতেরিনোস্লাভ অঞ্চল’। অতীতের বন্য প্রান্তর আজ এক নতুন দেশ। একদিন ছিল যেদিন এই প্রান্তরের কাঁধ-সমান উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে ঝাঁকড়া-চুলো টাট্টু ঘোড়া ছুটিয়েছে লিথিয়ান অশ্বারোহীর দল—দীর্ঘকেশ, খর্বকায়, হৃষ্টপুষ্ট। এই প্রান্তরে এসেছে গ্রীক বণিকগোষ্ঠী, রক্ষীদল সঙ্গে নিয়ে

প্রান্তর অতিক্রম ক'রে তারা গেছে অল্‌ভিঅপল থেকে তানাইস। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়ে সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রান্তর মথিত করে ফিরেছে গং মানুষেরা—তাদের সামনে ছুটেছে গৃহপালিত পশুর দল। চীনের উত্তর সীমান্ত থেকে বিভীষিকা ছড়াতে ছড়াতে এসেছে বহুভাষাভাষী হুনেরা—ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মতো—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সে বিভীষিকার সাক্ষ্য বহন করেছে জনহীন স্তেপভূমি। রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে 'খাজার' জাতের লোকেরা, ডোরাকাটা তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করেছে এই স্তেপের বুকে—দার্বেন্ত থেকে নীপার যাওয়ার পথে। খোরেজম্‌এর রেশমী পোশাকপরা পলভ্‌ৎজি অধিজাতির লোকেরা—পালে পালে ঘোড়া আর উট সঙ্গে নিয়ে এই প্রান্তরে বিচরণ করেছে, কখনো কখনো পাড়ি দিয়েছে সেই স্‌ভিয়াতোস্লাভের প্রাচীর পর্যন্ত। আরও পরবর্তী কালে দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে প্রান্তর দলিত মথিত করে বারে বারে ছুটে গেছে তাতার অশ্বারোহী বাহিনী—তারা গেছে মস্কো আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে।

তারপর একদিন জনধারার এই তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে এসেছে, পিছনে রেখে গেছে শুধু অসংখ্য সমাধিস্তূপ, আর তার ওপর এখানে ওখানে কতগুলো পাথরের দেবমূর্তি—চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা মুখ, ছোট্ট ছোট্ট হাত, পেটের ওপর জড়ো করা। একাতেরিনোস্লাভ স্তেপভূমিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি—ইউক্রেন আর রুশিয়া থেকে এসেছে চাষীরা, দন আর কুবান থেকে এসেছে কসাকের দল, উপনিবেশ স্থাপনের আশায় এসেছে জার্মানরা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রাম, অসংখ্য খামারবাড়ী সবই একেবারে নতুন; তাদের না ছিল পুরুষপরম্পরাগত ঐতিহ্য, না ছিল প্রাচীন লোকসঙ্গীত, আর না ছিল জলপথ কিংবা পুষ্পিত উদ্যান। এ এলাকা গমের এলাকা, আর জমিদারের এলাকা। এলাকার জমিদারদের বিষয়বুদ্ধি ছিল টনটনে, আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম কি রকম ওঠানামা করে সে খবর তাদের নখদর্পণে। জলাজমির মধ্যে ছোট্ট গাইচুর নদী, জলধারা কখনো অতি ক্ষীণ কখনো বন্যাপ্লাবিত, তারই ধারে এলোমেলো গড়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যহীন ছোট শহর গুলিয়াই-পলিয়ে—সে শহরও নতুন।

গ্রাম থেকে স্তেপ বরাবর পাঁচ-ছ' মাইল গেলে তারপর গুলিয়াই-পলিয়ে। সেখানে গোচারণের মাঠের ধারে প্রকাণ্ড বাজার। একটা ফিটনে চড়ে রশ্‌চিন বাজারে পৌঁছাল। গাঁ থেকে গাড়ী ভর্তি মাল নিয়ে এসে পা ছড়িয়ে বসে বিক্রী করছে একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি মহা-বাচাল—তার সঙ্গে দরকষাকষি লাগিয়ে দিল রশ্‌চিন—রোস্ট-করা মুরগি কিনবে। এ কাজে স্ত্রীলোকটি নেহাৎ অনভিজ্ঞ, তাই ঝট্‌ করে চটে ওঠে। মালগুলো একবার হয়তো খরিদ্দারের নাকের সামনেই তুলে ধরে, আবার পরক্ষণেই তীব্রস্বরে গাল-মন্দ করতে করতে খরিদ্দারের হাত থেকে সব ছিনিয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে চায়—গাড়ী থেকে কে বুঝি কি তুলে নিল খালি সেই

ভয়। রোস্ট-করা মুরগির জন্যে পাঁচ রুব্‌ল,—কমটম নেই, কিছুতেই নেই—হঠাৎ আবার মত বদলে বলে না, রুব্‌ল টুব্‌ল দিলে হবে না. মুরগির বদলে সুতো চাই, এক রীল সুতো।

“দূর আহাম্মক, টাকা নিলে কি ক্ষতি?” রশ্‌চিন বলে। “টাকা দিলেই তো সুতো কিনতে পারবে—ঐ যে ওখানে সুতো বিক্রী হচ্ছে।”

“রাখো কর্তা তোমার টাকা রাখো—মালের কাছ থেকে সরে পড় দেখি। গাড়ী ছেড়ে আমি সুতো আনতে যাই আর কি......”

পা থেকে মাথা পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জিত একটা লোক—পরনে মিলিটারি পোশাক, কপালে চুলের ঝুঁটি—দুটো সুতোর রীল নিয়ে হাত খেলাতে খেলাতে সারা বাজার চষে বেড়াচ্ছে। রশচিন তার কাছে উপস্থিত হল, কিন্তু সে লোকটা শুধু ঢুলু ঢুলু চোখে চায়, ফোলা ঠোঁটে বিড় বিড় করে বলে ঃ

“হবে না। মদ পেলে ছাড়ব।”

মুরগি আর কেনা হল না রশচিনের। মাল দিয়ে মাল নেওয়া—সাবেক কায়দার এই লেন-দেন ছাড়া বাজারে আর কিছু নেই বল্লেই হয়। যে জিনিসের যত চাহিদা তার দামও তত ঃ দুটো সূঁচের বদলে একটা শুয়োর ছানা পাবেন, তার ওপর আবার ফাউ-ও। অথচ একটা ছেঁড়া পায়জামা কিনতে গেলে খরিন্দারকে একদম ফতুর ক'রে ছাড়বে। অসংখ্য গাড়ী ঘিরে শত শত মানুষের ভিড়—কেনাবেচা, চেঁচামেচি, গালাগালি, হৈ-চৈ। একটা টুল কিংবা হয়তো শুধু একটা গাড়ীর চাকাই—তার ওপর নাপিতের ব্যবসার যন্ত্রপাতি সব সামনে বিছানো; ওধারে ফটোগ্রাফার—হাতে-গরম ফটো পাবেন—একেবারে আপনার হাতে—তখনো জল শুকোয়নি। একদল শ্রোতা জমা ক'রে অন্ধ বাদকেরা বেহালা বাজাচ্ছে. হাঁ-করা আহাম্মকদের পকেটেও অবিচলিত চিত্তে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।......এত লোক, সব কিন্তু একেবারে তৈরী; গোলাগুলী চলতে দেখলেই সব ফেলে রেখে দৌড় দেবে, কোনো কিছুর আড়ালে আশ্রয় নেবে। গুলী না চল্লে গুলিয়াই-পালিয়েতে বাজারই হয় না। গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে ভাদিম পেত্রোভিচ। একটা ঘোড়ার দোলা, তার চারপাশে যত নিষ্কর্মা মানুষ; সবাইয়ের গালে গালপাট্টা, কারও গায়ে হুসারের জামা, কারও জাহাজী কুর্তা, কারও বা অশ্বারোহী দলের আঙগরাখা—হাতবোমা, বন্দুক আর তলোয়ারের ছড়াছড়ি—কাঠের ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহা-আড়ম্বরে তারা সবাই পাক খাচ্ছে। লম্বা লম্বা গলাওলা কিম্ভুত-কিমাকার ঘোড়াগুলো, পা দেখলে মনে হয় যেন সারাক্ষণই ছুটছে। আরোহীদের কেউ কেউ আবার হেঁড়ে গলায় হুকুম ছাড়েঃ “জোরসে চলো! জোরসে!” নেংটিপরা দুটো ছেলে দোলা ঠেলতে ঠেলতে গলদঘর্ম। চালু গানের সুর বাজাচ্ছে দু'জন একর্ডিয়ন বাজিয়ে; যন্ত্রটা ওরা টেনে টেনে এমন লম্বা করে, মনে হয় যেন ‘স্বাধীন মাখনো-ওয়ালাদের’ বে-পরোয়া প্রাণের সবটুকু প্রসার আর স্পর্ধাই যন্ত্রের মধ্যে ভরে নেবে। দোলায় উঠবে বলে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা চেঁচায়,

“হয়েছে, হয়েছে, এবার নেমে পড়।” “চালাও, চালাও, জোরসে চালাও,” দোলার ওপরের লোকেরা হাঁকে। নাগরদোলার বেগ এখন প্রচণ্ড—একজনের মাথার টুপি উড়ে একেবারে মাটিতে, উৎসাহের চোটে আর একজন তলোয়ার বার ক'রে এমনভাবে ঘোরায় যেন শত্রুরই মাথা কাটছে। যারা উঠবে বলে দাঁড়িয়েছিল, তারা এবার একেবারে দোলার ওপর চড়ে বসে, টেনে টেনে নামিয়ে দেয় আরোহীদের। অমনি প্রচণ্ড হৈ-চৈ, ঘুষোঘুষি, উৎকট শিস দেওয়ার শব্দ—কিন্তু তারই মধ্যে নাগরদোলা আবার ঘুরতে শুরু করে, কোমরে হাত দিয়ে নতুন সওয়ারের দল ঘুরপাক খায়, উত্তেজনায় তাদের নাসারন্ধ্র লাল হয়ে ফুলে ওঠে।

এতগুলি মানুষের মুখ, তার মধ্যে বুদ্ধিমান মুখ একটিও না দেখতে পেয়ে ভাদিম ফিরে চল্ল। ফেরিওলার কাছ থেকে ক্রীমচীজের পুর দেওয়া পাই কিনে খেতে খেতে পথ চলে ভাদিম—পাথরবাঁধানো চওড়া পথ। রাত্রে থাকার মতো একটা জায়গা তো চাই। সঙ্গে টাকা পয়সা খুবই সামান্য। পাই কিনতে যা দাম লাগল তাই যদি এখানকার দরদাম হয় তাহলে সঙ্গের পয়সায় তো হপ্তাখানেকও চলবে না। ব্যবসায়ীদের দোতলা কোঠা বাড়ী, মুদীর দোকান, রং-করা সাইনবোর্ড—অন্যমনস্কভাবে এই সব দেখতে দেখতে আর পাইটা চিবোতে চিবোতে চলেছে ভাদিম। ভাবছে, তাও অন্যমনস্কভাবে; উদ্দাম স্বাধীনতার আশায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ার পর থেকে জীবনের খুঁটিনাটিগুলো আর ওকে বিচলিত করতে পারে না।

ঢলঢলে চাকাওলা সাইকেলে চড়ে কে যেন আসে ওর দিকে। তার পেছনে দুজন ঘোড়সওয়ার—তাদের গায়ে সারকাসিয়ান পশমের আঙরাখা, মাথায় ইয়া বাকা টুপি, ভেড়ার লোমের। সাইকেলওলার পরিচ্ছদ হলঃ হাই স্কুলের কুর্তা, ছাই রংয়ের পায়জামা, আর মাথায় স্কুলের ছেলেদের চুড়োতোলা টুপি—নীলের ওপর সাদা ডোরা। লোকটি দেখতে রোগা আর বেঁটে; টুপির নীচে দিয়ে চুলগুলো একেবারে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। সাইকেলওলার কাছে এসে তার ভিজে মুখ আর অদৃশ্যপ্রায় ভ্রু-জোড়া দেখে রশ্চিন অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ঢলঢলে সাইকেলে বসে থাকাই দায়, তবু তার ওপর থেকেই লোকটি স্থির, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল রশ্চিনকে লক্ষ্য করে। ওর মুখ হলুদবর্ণ, সেঁকা আপেলের মতো বলি-কুঞ্চিত। তীক্ষ্ণ ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে লোকটি তারপর সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে গেল।

ঘোড়সওয়ার দু'জনের একজন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ছুটতে ছুটতে একটু পরেই ভাদিমের পাশে এসে উপস্থিত। জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে ভাদিমের দিকে চায়, চোখ দুটো বন বন ক'রে ঘোরে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত।

“কি হ'ল?” রশ্চিন শুধাল।

“আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?”

"আমি কে?" কড়া মদ আর রসুনের গন্ধে পিছু হটতে হটতে রশচিন বল্ল। "আমি স্বাধীন মানুষ। এসেছি একাতেরিনোস্লাভ থেকে।"

"একাতেরিনোস্লাভ? তা এখানে কি করা হচ্ছে? চোখ রাঙিয়ে ঘোড়সওয়ার বল্ল।

"এখানে আমার স্ত্রীকে খুঁজতে এসেছি।"

"স্ত্রীকে খুঁজতে? কাঁধের অফিসার-স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ফেলেছেন কেন?"

রাগে কেঁপে উঠলেও যথাসম্ভব শান্তভাবে জবাব দিল রশচিন ঃ

"ছিঁড়েছি আমার খুশী, আপনাকে খবর দেওয়া দরকার মনে করিনি।"

"খুব সাহস তো আপনার।"

"ভয় দেখাবেন না, আমাকে ভয় দেখানো সহজ নয়।"

রশচিনের মুখের ওপর চোখ বুলোল ঘোড়সওয়ার, মুখেই যেন জবাব খুঁজে পাবে। হঠাৎ সোজা হয়ে ঘোড়ার গায়ে কাঁটার ঘা মারল লোকটা—সরু, কোঁচকানো মুখে উদ্ধত, বিকৃত হাসি হেসে ঘোড়া ছোটাল সাইকেলওয়ালার দিকে। উত্তেজনায় হোঁচট খেতে খেতে রশচিন এগিয়েই চল্ল।

কিন্তু ওরা তিনজন তখুনি আবার ওর পাশে হাজির। স্কুলের ছাত্রের টুপি-পরা সাইকেলওলা চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে উঠল ঃ

"বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বললেন না—কিন্তু লেভ্‌কার কাছে নিয়ে গেলে কথা ঠিক বেরুবে, দেখে নিও।"

হো হো করে ইতরের মতো হেসে উঠল তিনজনে। রশচিন তখন বন্দী—ওরা ওকে দুপাশ থেকে চেপে ধরেছে। প্রচণ্ড জোরে প্যাডেল করতে করতে মাতাল সাইকেলওলা একেবারে সবার আগে। 'চলো', বলে হাঁক ছাড়ে ঘোড়সওয়ার দুজন—দুই ঘোড়ার মাঝখানে রশচিনকে ছুটিয়েই নিয়ে চলে। পালানোর চেষ্টা করা বা প্রতিবাদ করা বৃথা তা তো বোঝাই যাচ্ছে। চলতে চলতে ওরা একটা কোঠাবাড়ীর সামনে এসে থামল—বাড়ীটার সুমুখ দিকে একটুখানি বাগান, পায়ে পায়ে মাড়ানো-খোঁড়ানো। বাড়ীর জানলাটানলা সব খড়িঘষা। দরজার মাথায় কালো নিশান, তার নীচে একখানা প্লাইউড তক্তায় লেখা আছে ঃ "শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, মাখনো গণবিপ্লবী সেনাবাহিনী।"

ধাক্কা মারতে মারতে রশচিনকে বাড়ীর ভেতর ঢোকাল, অন্ধকার গলিপথ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল একটা আবর্জনাময় নোংরা ঘরের মধ্যে—সে ঘরের টোকো গন্ধে দম আটকে আসে। রশচিন তখন রাগে এমন আত্মহারা যে, সে সব কথা পরে আর তার মনেই থাকেনি। ওরা আসার একটু পরেই হেলতে দুলতে ঘরের মধ্যে ঢুকল আর একজন—নাদুসনুদুস চেহারা, চকচকে, হাসিহাসি মুখ। মফঃস্বলের অপেরা পার্টিতে কমিক গায়কেরা যেমন খাটো জামা পরে, ওর গায়ে তেমনি খাটো জামা।

"হুঁ, তা ব্যাপার কি?" একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর থেকে পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলে টেবিলের পাশে বসে পড়ল লোকটা।

"এই লোকটা গুপ্তচর কি না যাচাই করতে হবে, বড়কর্তার হুকুম", কোঁচকানো মুখওলা যে লোকটা রশচিনের সঙ্গে এসেছিল সে বল্ল।

"আচ্ছা এখন তুমি বেরিয়ে যাও, কমরেড কারেৎনিক", মোটা লোকটা হুকুম দিল। কারেৎনিক চলে গেলে রশচিনের দিকে ফিরে বল্ল, "বসুন!"

মোটাসোটা, হাসিমুখ লোকটাকে সম্বোধন ক'রে একটু বিচলিত সুরে রশচিন বল্ল, "দেখুন, আপনারা গোয়েন্দা বিভাগের লোক তা বুঝতে পারছি। আমি সব খুলে বলব, এখানে কেন এসেছি তাও বুঝিয়ে দেব। লুকোচুরির কিছু নেই আমার কাছে। আমি এখানে এসেছি এইজন্যে যে......"

ওর কথা কানেও আনে না লোকটা। বল্ল, "আমার দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখুন। আমার নাম লেভকা জাদভ, আমার কাছে মিছে কথা বলে লাভ নেই। আমি যা যা জিজ্ঞাসা করি শুধু তারই জবাব দেবেন, বুঝলেন?"

দক্ষিণ দেশে লেভ্‌কা জাদভের নামডাক প্রায় মাখনোর সঙ্গেই সমান। একেবারে জল্লাদ লোকটা। এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর যে, মাখনোই নাকি ওকে কতবার কেটে ফেলতে গেছে, তবে ওর বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করে শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করেছে—এই রকম জনশ্রুতি। রশচিনও ওর কথা জানত, তাই রশচিনের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল—জীবনে এই প্রথম। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রশচিন। আর লেভকা জাদভ বসে—দিব্যি গোলাপী চেহারা, কোঁকড়ানো চুল; অন্য মানুষটার ওপর ওর ক্ষমতা কী বিভীষিকা সৃষ্টি করছে, তাই দেখে ও আনন্দ উপভোগ করে।

"নিন, নিন' এখন বলে ফেলুন দেখি! আপনি কি দেনিকিনের অফিসার?"

"হ্যাঁ। আগে ছিলাম।"

"আগে ছিলেন, বটে, বটে?......কোথা থেকে আসা হয়েছে?"

"একাতেরিনোস্লাভ থেকে গুলিয়াই-পলিয়ে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম......"

"বটে, তাই নাকি?......এলেন রস্তভ থেকে আর বলছেন একাতেরিনোস্লাভ থেকে?"

"মোটেই না, আমি একাতেরিনোস্লাভ থেকেই এসেছি।"

টিকিটটা বার করার জন্যে তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ায়। মুহূর্তের জন্যে রক্তস্রোত আবার ঠাণ্ডা, হিম হয়ে আসে—টিকিটটা যদি ফেলে দিয়ে থাকে! না, পকেটেই আছে—তার সঙ্গে কাতিয়ার একখানা পুরোনো ফটো, ঝাপসা, দোমড়ানো। টিকিটখানা লেভকার দিকে এগিয়ে দিল রশচিন। লেভকার হাতে টিকিটের পরীক্ষা চল্ল অনেকক্ষণ—আলোর সামনে ধরে, উল্টেপাল্টে দেখে, ফের দেখে। কিন্তু টিকিট ঠিকই আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। লেভকা বোধহয় আগে থেকেই রায় ঠিক করে রেখেছিল, কি শাস্তি দেবে তাও ঠিক করেছিল; কিন্তু এবার একটু গোল বাধল—টিকিটে যে আগাগোড়া সবই পাল্টে দিচ্ছে। অবজ্ঞার হাসি থামিয়ে বিরক্তিতে ঠোঁট কোঁচকাতে কোঁচকাতে লেভকা প্রশ্ন করলঃ

“আপনি যদি দেনিকিনের সদর দপ্তরে ডেসপ্যাচ পৌঁছে দেবার জন্যে যাত্রা করে থাকেন তবে গুলিয়াই-পলিয়েতে নামলেন কেন?”

“আমি তো ডেসপ্যাচ নিয়ে যাচ্ছিনে! এখন আর আমি আর্মিতে নেই, দু’ মাস হল ছেড়ে দিয়েছি। আর্মি টিকেটও ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমি এখন স্বাধীন মানুষ, স্বাধীনভাবেই এসেছি এখানে......”

লেভকার কুটিল দৃষ্টি রশচিনের মুখের ওপর স্থির-নিবদ্ধ। মনুষ্যত্ব কিংবা বিচারবুদ্ধির কণামাত্র নেই সে দৃষ্টিতে। তাই দেখে রশচিন তার সমস্ত শক্তি সংহত করল—উত্তেজনা দমন করতে হবে, জবাব দেওয়ার আগে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। আর্মি ছেড়ে চলে এল কেন, যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য ভাবে সে কথা বোঝাতে আরম্ভ করেছে—বাধা দিয়ে নীচু স্বরে লেভকা বলে উঠল:

“চুপ কর শুওরের বাচ্চা। আর যদি মিথ্যে বলিস তো ঠেলা বুঝিয়ে দেব। ‘সডম’ ‘গমোরাকে’ কী ঠেলা দিয়েছিল জানিস তো, তার চেয়েও ভয়ংকর ঠেলা খাবি......”

চোরের মতো এক টান দিয়ে কাতিয়ার ফটোটা ছিনিয়ে নিল রশচিনের হাত থেকে। নারীদেহের ওস্তাদ সমঝদারের মতো মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ফটোগ্রাফটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ফটোর ওপর টোকা দিতে দিতে বল্ল:

“ছুঁড়িটা কে হে?”

“আমার স্ত্রীর ফটো। ওর জন্যেই এখানে এসেছি। দাও, আমার ফটো ফিরিয়ে দাও!”

“তোমার লাশের ওপর ফটো রেখে দেব, বুঝেছ।” মোটা, তেলা হাতটা ফটোর ওপর রাখল লেভকা। “এস বাপু, এখন গোয়েন্দা দপ্তরের কিছু খবর বল তো।”

“আমি আর কোনো কথা বলব না”

“বলবে, বলবে বৈকি। আমার কাছে কেউ কথা না বলে পার পায় না!”

অনায়াস ভঙ্গীতে একটুখানি উঁচু হয়ে উঠল লেভকা। ওর হাতটা যেন বেড়ালের থাবা। দুম করে এক ঘুষি ঝাড়ল ভাদিমের ওপর। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘুষিটা একেবারে রগে গিয়ে লেগেছে। ঘুষির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে ভাদিম মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রের শত্রুদের তখন ধারণা যে, তাদের আক্রমণের চোটে সোবিয়েতের পতন একবারে অত্যাসন্ন।

তা সত্ত্বেও ধীরস্থির গতিতে অগ্রসর হয় সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র। জনগণের সমস্ত আত্মিক আর মানসিক বল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত অবদান, সে সবই সংগঠিত করে প্রজাতন্ত্র তখন শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত—এবার আক্রমণের পালা শুরু করতে হবে। বলশেভিকদের সামরিক পরিকল্পনা এইরকম: দেশরক্ষার কাজ সর্বপ্রথম, আর সব কাজ তারপরে; গভীর সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করার কাজে কিন্তু এক

মুহূর্তও ঢিলা দিলে চলবে না! নীতিগুলিকে আজ নির্ভয়ে মানুষের মনে গেঁথে দিয়ে যেতে হবে—সে নীতির সার্থকতা আসবে আগামী দিনে। তারপর দ্বিতীয় কর্তব্য হলঃ ত্রিশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রেড আর্মি গড়ে তোলা, উত্তর দেশে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করা, সাইবেরিয়া আর দক্ষিণ উরাল পর্যন্ত আক্রমণের ধাক্কা পৌঁছে দেওয়া। তাছাড়া দুটি দিকে প্রধান আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে—দন অঞ্চলে ক্রাসনভের কসাকদের বিরুদ্ধে আর উত্তর ককেসাসে দেনিকিনের বিরুদ্ধে।

চতুর্দিকে হোয়াইট গার্ড বাহিনী পরিবেষ্টিত রুশ সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র যে রণাঙ্গন সৃষ্টি করেছে তা প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ। কিছু দিন হল ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই রণাঙ্গনটি বড়ই জটিল।

ইউক্রেনের উর্বর ভূমিতে যুদ্ধের রূপটা অসাধারণ রকমের হিংস্র। অল্পদিন আগেকার জার্মান দখলদারী, তারপর হেৎমান কর্তৃত্ব, সেই সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জমিদারশ্রেণীর প্রচণ্ড আক্রোশ—এই সব মিলিয়ে ওখানকার জনসংখ্যার মধ্যে শ্রেণী বিভেদ খুবই গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দনবাস অঞ্চলের মজুর, খনি-শ্রমিক, ভূমিপ্রত্যাশী কৃষক, জনমজুর—এদের টান সোবিয়েত শক্তির দিকে। আর অন্যদিকে ধনী চাষী এবং ধনিক সম্প্রদায়। বিপ্লবী কমিটি, গরীব চাষী কমিটি, কার্যকরী কমিটি, কমিসার, শস্যের লেভি—এই সবের ভয়ে তটস্থ হয়ে ধনী চাষী আর ধনিকেরা 'স্বাধীন ইউক্রেনীয়ন ডিরেক্টরেট' এর পক্ষাবলম্বন করতে চলেছে, ডিরেক্টরেটের নেতা পেৎলুরাকেই তারা চায়। ইউক্রেনীয় বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ—সোবিয়েত বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষের বিরুদ্ধে যাদের জবাব শুধু এইটুকুই যে, "আমরা মস্কোওয়ালাদের চাই না, চুলোয় যাক মস্কোওলা"—তারাও সমর্থন করত পেৎলুরাকে। তিনশো বছর ধরে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইউক্রেনের জনসাধারণ কঠোর ইতিহাস রচনা করেছে; কিন্তু বুদ্ধিজীবী বাবুর দল ইউক্রেনের রোমান্টিক জাতীয় পরিচ্ছদ গায়ে চাপিয়ে তার আড়ালে জাতীয় ইতিহাসের উলঙ্গ কঠোরতাটাই যেন বেমালুম চাপা দিতে চাইতেন। মশগুল হয়ে ভাবতে চাইতেনঃ আহা, কী সুন্দর ইউক্রেনের ঢিলা পায়জামা ('কৃষ্ণসাগরের মতো সুপ্রশান্ত') কী সুন্দর কসাক আংরাখা আর বাঁকা তলোয়ার, কী বাহার এই প্রলম্বিত কেশাগ্রগুচ্ছে!

হেৎমানকে তাড়িয়ে কিয়েভ ডিরেক্টরেটে আসন গেড়ে বসল পেৎলুরা—ঘোষণা করে দিল যে, এ এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। তারপর সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরর্থক সংগ্রাম শুরু করল। ওর তাঁবে সৈন্য ছিল কয়েক ডিভিশন; তার মধ্যে কিছু হেৎমানের সৈন্য, এদিকে চলে এসেছে; কিছু গ্যালিসিয়ান, তারা ধীর, স্থির, সুশৃঙ্খল—স্বাধীন ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন এতদিনে সত্য হবে এই বিশ্বাসে উন্মুখ; তা ছাড়া চোর, ডাকাত ইত্যাদি সামাজিক আবর্জনাও কিছু জুটেছিল তা বলা বাহুল্য—লুটপাটই তাদের পেশা। যাই হোক, পেৎলুরার দৌড় শুধু লম্বা ফর্মান জারি করা পর্যন্ত। ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় এমন কিছু

বাস্তব উপহার দিয়ে ইউক্রেনের বিক্ষুব্ধ, দ্বিধাবিভক্ত কৃষক সম্প্রদায়কে কাছে টানবে সে বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান তার কোথায়? তাই উপস্থিত শক্তি ছাড়া নতুন আর কোনো শক্তি আকর্ষণ করবার উপায় পেৎলুরার ছিল না।

ডিসেম্বর মাসে পল্তাভা অঞ্চলের সুদ্‌জা শহরে ইউক্রেনের সোবিয়েত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হল, গোপনে। জারিত্‌সিন সমর পরিষদের সভাপতি মহাশয় দশম আর্মির কম্যাণ্ডার ভরশিলভকে সুদ্‌জা পাঠিয়ে দিলেন—তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টে আসন গ্রহণ করবেন। সুদ্‌জাতে বিপ্লবী সমর পরিষদ গঠিত হল।

এই সব ঘটনার অনেক আগে কুর্স্ক শহরে ইউক্রেনিয়ান ইউক্রেনের যে সব চাষী শাস্তি আর ফাঁসির হাত এড়িয়ে পালিয়ে আসে, প্রধানত তাদের নিয়েই এই বাহিনী গঠিত। সুদ্‌জায় যখন সমর পরিষদ প্রতিষ্ঠা হয় এই বাহিনী তখন আক্রমণে নেমে গেছে—আক্রমণ চালাচ্ছে পশ্চিমে কিয়েভ অভিমুখে আর দক্ষিণে নার্কেভ ও একাতেরিনোস্লাভ অভিমুখে। দু ডিভিশন অবিশ্যি যথেষ্ট নয়—তারা তাই আশা রাখত যে, গেরিলা বাহিনীগুলির সাহায্যও পাওয়া যাবে। এই সব গেরিলা বাহিনীর মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী ছিল মাখনোর ডিট্যাচমেণ্ট।

মাখনো এদিকে রঙ্গরসে মত্ত। বের্দিয়ান্‌স্‌ক শহর লুটপাট করার সময় ছাত্রদের ইউনিফর্ম পেয়েছিল একটা—সেটা পরে সাইকেল চড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। নয়তো ওর এইড কারেতনিককে সঙ্গে নিয়ে পথে পথে একর্ডিয়ন বাজায় আর গান গায়। আবার কখনো হয়তো বাজারে গিয়েই হাজির হয়—মুখটা ফ্যাকাশে, বদমেজাজী ধরণধারণ—কারো না কারো সঙ্গে ঝগড়া বাধানোর ইচ্ছা। কিন্তু কেউ কাছে ঘেঁষবে না—ওর ট্রাউজার-পকেট থেকে কি রকম ঝট করে রিভলভারের গুলী চলতে পারে তা তো তারা জানে। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান যারা মাখনোর নিজেরই দলবলের লোক, কি ভগবান, কি শয়তান কাউকেই যারা ভয় করে না—তারা পর্যন্ত যেই দেখেছে যে মাখনো আসছে নাগরদোলার দিকে—অমনি দোলার ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে সোজা পিট্টান। বড় কর্তা আর কি করে—শুধু কারেতেনিককে সঙ্গে নিয়েই ঘুরপাক খায়। মাথা একেবারে ভোঁ ভোঁ করে না ওঠা পর্যন্ত ঘুরপাকই খেতে থাকে।

গুলিয়াই-পলিয়েতে জোর গুজব: মাখনো আজকাল ভীষণ মদ খাওয়া ধরেছে, মদের জন্য নাকি সৈন্যদলটাকে বিক্রীও করে ফেলতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব যে ওরই চালাকি সে কথা আর ক'জন বোঝে? শিকারীর আক্রমণে অভ্যস্ত বুনো জন্তুর মতোই ও ছিল ধূর্ত, গোপনস্বভাব, পিচ্ছিল।

এ খেলা শুধু সময়ের জন্যে। খুব গুরুতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে ওর সামনে। একাতেরিনোস্লাভ অঞ্চলে এখন আর জার্মান নেই, হেৎমানের দলবলও নেই—তাদের সঙ্গে লড়াই তো শেষ। ওদিকে

জমিদাররা সব সরে পড়েছে। ছোট ছোট যত শহর ছিল, সে সব লুটপাট করার কাজও খতম। এখন তিন দিক থেকে নতুন শত্রু—ক্রিমিয়া আর কুবান থেকে ভলান্টিয়ার আর্মি, উত্তর দিক থেকে বলশেভিকরা, আর নীপারের দিক থেকে পেৎলুরার দলবল (অল্প দিন হল তারা একাতেরিনোস্লাভ দখল করেছে)। এর মধ্যে কোন্ শত্রু সবচেয়ে সাংঘাতিক, মেশিনগান এখন কোন্ দিকে ঘুরিয়ে ধরতে হবে? এ সব প্রশ্নের মীমাংসা চাই, এখুনি। মাখনোর সৈন্যদলে ক্ষয় ধরেছে, ভিত্তিও পর্যন্ত নড়ে যাবে বলে ভয় হয়। সৈন্যদলের মধ্যে যারা চাষী তারা বলেঃ "বাঁচা গেল, বলশেভিকরা এবার ইউক্রেনে আসছে। তাহলে আর কি, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারব। আর লড়াইয়ের শখ যাদের মেটেনি তারা টুপিতে লাল তারা চড়িয়ে দিক, ব্যস তাহলেই হবে।" সৈন্যদলের কেন্দ্রবিন্দু হল 'ক্রোপটকিন ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড' দলটা; মাথাগরম লোক তারা, যুদ্ধই এখন তাদের পেশা। স্বাধীনভাবে ঘোড়ার পিঠে পিঠে ঘুরে বেড়ানো এমন মজা যে, ওদের দ্বারা আর কোনো কাজ হবার উপায় নেই। ওরা বলেঃ "কত্তা যদি আমাদের বলশেভিকদের কাছে বেচে দিতে চায়—তাহলে গোটা আর্মির চোখের সামনে কত্তার গলাই কেটে ফেলব আমরা, বুঝলে বাছাধন। একাতেরিনোস্লাভ কবল করল পেৎলুরা, আর আমরা শুধু বসে বসে দেখছি।......খাবার নেই, কাপড় নেই, জুতো নেই, কিছু নেই—আর দু দিন বাদে নেকড়েগুলোর সঙ্গে সঙ্গে স্তেপে স্তেপে চীৎকার করে ফিরতে হবে।......চলো, একাতেরিনোস্লাভ চলো, ভাইসব।"

ইউক্রেনের রেড আর্মির কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের প্রতিনিধি একজন নাবিক, নাম চুগাই। সে আজ তিন দিন ধরে গুলিয়াই-পলিয়ে শহরে; নেশার ঘুম কাটিয়ে মাখনো তার সঙ্গে কখন আলাপ করে, তারই জন্যে অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছে। ঠিক একই সময়ে মাখনোর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন আর একজন, খার্কভ থেকে। বিখ্যাত দার্শনিক তিনি, 'তক্সিন' নামে যে সংযুক্ত এনার্কিস্ট সংঘ, তার সেক্রেটারিয়েটের সদস্য। ওদিকে মাখনোর অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা যত সব স্থানীয় এনার্কিস্ট, যারা মাখনোর সামরিক-রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য, তারা এখানে ওখানে কর্তার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে, ঈর্ষাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে বোঝাচ্ছে—আর কারো কথা শুনবেন না, ব্যক্তি-সত্তার পরম স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবেন না কিছুতেই।

যে সিদ্ধান্ত আর্মির কাছে মনঃপূত হবে এমনধারা কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর তার গৌরব দুই-ই ধ্বংস হয়ে যাবে—একথা মাখনো ভালভাবেই জানে। ওর সামনে পথ শুধু দুটি; হয় বলশেভিকদের কাছে মাথা নুইয়ে কমাণ্ডার-ইন-চীফের হুকুম তামিল করে যেতে হবে, তারপর এক অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তে যথেচ্ছাচারিতার অপরাধে গুলি খেয়ে মরতে হবে; আর না হয় প্রতিনিধি চুগাইকে সাবাড় করে ফেলে ইউক্রেনে লাগিয়ে দিতে হবে কৃষক বিদ্রোহ—সে বিদ্রোহ হবে সকল রকম

কর্তৃত্বেরই বিরুদ্ধে। কিন্তু তার কি সময় হয়েছে? ভুল হয়ে যাবে না তো?

এই সব ভাবনা চিন্তা অতি গোপন। কুকুরের মতো প্রভুভক্ত যে লেভকা আর আরেৎনিক তাদের কাছেও এসব কথা বললে বিপদ আছে। মতলবের পর মতলব গজগজ করে ওর মাথার মধ্যে। গোটা আর্মিটা ওর মুখ চেয়ে আছে মুখ চেয়ে আছে প্রতিনিধি চুগাই, আর সেই শ্রদ্ধেয়, সুবিখ্যাত এনার্কিস্ট মহাশয়—যিনি খারখভ থেকে এসেছেন। কড়া মদ টানে মাখনো কিন্তু আত্মসংযম হারায় না। ইচ্ছে করেই বোকা সাজে, জঘন্য দুর্ব্যবহার করে, কিন্তু সব দেখে, সব বোঝে, কিছুই বাদ যায় না। উত্তপ্ত ক্রোধে ওর মন পরিপূর্ণ।

অফিসারের গ্রেটকোট পরা সেই অচেনা লোকটা—যে নাকি একাতেরিনোস্লাভ থেকে এসেছে—তাকে গ্রেপ্তার করে নেভকার কাছে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিল মাখনো। একটু পরে সাইকেল হাতে নিয়ে সে নিজেই সেখানে হাজির—'শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র যে ঘরে সওয়াল জবাব চলছে সোজা সেই ঘরে উপস্থিত। কপালদোষে রশচিনকে বেকায়দা ঘুষি মেরে তারপর সমানে টেবিলের ধারে বসে আছে লেভ্‌কা—হাতের একটা মুঠোর ওপরে আর একটা মুঠো, তার ওপরে থুত্‌নি। ভূলুণ্ঠিত দেহটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলো মাখনো। সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল।

"কি করেছ ওকে?"

"একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছি মাত্র।" জবাব দিল লেভকা।

"আহাম্মক......একেবারে মেরে ফেলেছ নাকি?"

"তা কি জানি—আমি তো আর ডাক্তার নই।"

"ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছ?" (লেভকা কাঁধ কোঁচকায়)। "লোকটা কি একাতেরিনোস্লাভ থেকেই এসেছে? কি বল্ল? দেনিকিনের গুপ্তচর নাকি?"

মাখনো এমন অসহ্য দৃষ্টিতে লেভকার মুখটা খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করে যে লেভকা স্থির হতে পারে না, মহা-অস্বস্তিতে চোখ দুটো ঘোরাতেই থাকে।

"ওর কাপড়চোপড়ের মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই গোপন খবর লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় সে খবর? সাবধান লেভকা, তোমার মাথা যাবে মনে রেখো।"

"আহা, আমি তো সবে শুরু করেছিলাম, নেস্তর ইভানোভিচ। এমন একটা তাগড়া শুয়োর, সে যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবে তা কি করে বুঝব......"

এমন সময় রশচিনের মুখ থেকে গোঙানির শব্দ শোনা গেল। তারপর ও পা দুটো গুটিয়ে নিল।

"দেখুন, দেখুন! ও শুধু নার্ভের ধাক্কায় কাহিল হয়েছিল!" লেভকার গলায় উল্লাসধ্বনি।

মাখনো আবার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত দিতে যাবে এমন সময় টেবিলের ওপর কাতিয়ার ফটোটা চোখে পড়ল।

“এটা কি ওর কাছ থেকে নিয়েছিলে? এ কে? ওর স্ত্রী?”

যে সব লোকের ইচ্ছাশক্তি খুব দৃঢ়, যারা একাগ্রচিত্ত, সন্দেহবাদী অথচ বিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন—তাদের সকলেরই স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হয়। নেস্তর ইভানোভিচেরও তাই। সেই যে কাতিয়া যখন প্রথম ওর সামনে এসেছিল (যখন তাকে নখ পালিশ করতে বলেছিল মাখনো) সে কথা ওর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল। মাঝপথে আলেক্সি ইভানোভিচের হস্তক্ষেপের কথা, তারপর এই সুন্দরী মেয়েটির সম্বন্ধে আরও যা যা শুনেছে—সে সবই ওর মনে পড়ল। ফটোটা পকেটে পুরে বাইসাইকেল ঠেলতে শুরু করল। কিন্তু ঠিক তখনি রশচিনের চোখেমুখে আবার জীবনের চিহ্ন দেখা দিল, ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে এল।

“ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো”, বল্ল মাখনো। “আমি নিজেই পরীক্ষা করব।”

গত ক'দিনের অমিতাচারের মধ্যেও নেস্তর ইভানোভিচের মনের ভিতর একটা ধারণা একেবারে বদ্ধমূল ছিল। সে ধারণা হ'ল ঃ আর্মি নিয়ে একাতেরিনোস্লাভ চড়াও করতে হবে, প্রচণ্ড আক্রমণে শহর দখল ক'রে তারপর দুমা-ভবনের* ওপর উড়িয়ে দিতে হবে এনার্কিস্ট পতাকা। এমন ধারা লুটের আশা তো সৈন্যদের কাছে এক নতুন প্রেরণা, গোটা আর্মিটাই আবার জমাট বেঁধে থাকে। সম্পদশালী নগর একাতেরিনোস্লাভ—কাপড়চোপড় আর চটকদার জিনিসপত্র যা আছে সেখানে তাতে সারা প্রদেশের খাঁই মেটে। কী কাণ্ডই না হবে! গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লরী বোঝাই কাপড় আর ছিট, বস্তা বস্তা চিনি—একেবারে উজাড় করে দেওয়া যাবে! চুলের ফিতে, মিলিটারি লেস, জুতো, মোজা—কী চাও তোমরা মেয়েরা, এই নাও। “এই নাও জুতো, কত্তা উপহার পাঠিয়েছে! চেয়ে দেখ, এর নাম স্বাধীন জীবন—গবর্নমেণ্ট নেই, জমিদার নেই, বুর্জোয়া নেই,—নেই সোবিয়েত, নেই চেকা* কিছু নেই......”

বাকী আর সব কথা তখনও স্থির করতে পারেনি। কিন্তু এখন কাতিয়ার ফটোখানা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত যেন মাথার মধ্যে লাফিয়ে ওঠে। মন তখন আনন্দে উৎফুল্ল, কিন্তু বাইরে তার কোনো চিহ্ন নেই। সাইকেল চড়ে রওনা দিল মাখনো—রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটা লম্বা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। মস্ত বড় বড় জানলা সে বাড়ীতে। সামনে কতকগুলো পপ্‌লার গাছ, পাতাটাতা সব ঝরে গেছে। এটা স্কুলবাড়ী, এখন সামরিক হেড কোয়ার্টার। আর তার এড্‌রা ওখানেই থাকে, একখানি মাত্র ঘর ওদের।

ঘণ্টাখানেক পরে রশ্‌চিনকে নিয়ে এল ওর কাছে। আগে আগে লেভকা। পেছনে মাখনোরই দলের আর একজন, তার মাথায় কালোফিতে জড়ানো দামী

---

* দুমা=পার্লামেণ্ট ধরণের প্রতিষ্ঠান

* চেকা=সোবিয়েৎ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ

লোমের টুপি—কোন্ পাদরির কোট কলার কেটে বানিয়েছে; রশ্চিনের পিঠে রিভলবারের নল চেপে ধরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে লোকটা। ছিট-মোড়া সোফার ওপর মাখনোর আসন—সোফার স্প্রিংগুলো ছিট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

"এ সব কী কাণ্ড?" বলে চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে উঠল মাখনো।

"পুলিশ, পুলিশ খেলা পেয়েছ নাকি, না জারের পুলিশ সেজে মজা দেখছ তোমরা? বন্দুক নামাও! বেরিয়ে যাও এখান থেকে!"

কোটরাগত চক্ষু আর ফ্যাকাশে মুখ মাখনোর। মুখটা হঠাৎ উঁচু করে একেবারে খিঁচিয়ে ওঠে। হুড়মুড় শব্দে পাহারাওলা অমনি দে-দৌড়। সোফা থেকে উঠে পড়ল মাখনো। হাড্ডিসার হাত, তাই দিয়েই দমাদ্দম ঘুষি লাগাল লেভকার নাকে, ঠোঁটে, মুখে, সর্বত্র।

"কশাই কোথাকার!" কর্কশ গলায় মাখনোর সে কী চীৎকার। "মাতাল, রাণ্ডীবাজ কাহাঁকা! আমাদের এই মহৎ ব্রত—তাতে তুই কালি দিচ্ছিস! নাম ডোবাচ্ছিস আমার!"

লেভকা জাদভ তার বুড়ো কত্তাকে ভালো করেই চেনে। কত্তার রাগ পুরো মাত্রায় চড়বার আগেই সে পগার পার। আরও ঘুষি যাতে গায়ে না লাগে সেজন্যে কাঁধ আর হাত দিয়ে গলা, মুখ আড়াল ক'রে একছুটে একেবারে দরজার ওপারে। যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

মাখনোর কপাল ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। টুপি খুলে ফেলে সোফায় বসল। ওর চেহারাটা তখন ঠিক ধর্মোন্মাদ পাদ্রীর মতো, হাতে একটি জপের মালা থাকলেই ষোল কথা পূর্ণ হ'ত।

"আসুন, বসুন", লম্বা হাত নাড়িয়ে রশচিনকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। "আপনাকে হয়তো গুলী করেই মারতে হবে, কিন্তু তাই বলে মানুষের মর্যাদায় হাত দেবে? কী লজ্জা! নিন, একটা সিগ্রেট ধরান। আপনি কি গুপ্তচর?"

"না", সিগ্রেট নিতে নিতে অস্পষ্ট সুরে রশচিন জবাব দিল। মুখে মৃদু হাসি।

"ভলাণ্টিয়ার অফিসার?"

"সৈন্যদল ছেড়ে দিয়েছি, ওদের সংগে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এসব কথা বলে কি লাভ, আপনি তো আর বিশ্বাস করবেন না।"

"আমার কাছে কেউ মিথ্যে বলে না" মাখনো তার নিজস্ব চড়া সুরে জানিয়ে দিল। এ এক অদ্ভুত সুর, সা-রে-গা-মা দিয়ে এ সুর ব্যক্ত করা অসম্ভব। রশচিনের মনে হল, বুঝি বা কোন্ শিক্‌রে পাখীর কর্কশ চীৎকার। "আমার কাছে কেউ মিথ্যে বলে না", ফের জানিয়ে দিল মাখনো। ওর উত্তপ্ত, পলকহীন চোখে ইচ্ছাশক্তির এমন এক সুদৃঢ় অভিব্যক্তি—যে সে চোখে চোখ রাখা যায় না, জল ভরে আসে। কিন্তু রশচিন অটল। সদ্যপ্রাপ্ত আঘাতের যন্ত্রণায় মাথাটা

ফেটে যাচ্ছে, তবু সে যন্ত্রণা সে অতিক্রম করল—চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হল।

"ভলান্টিয়ার আর্মি সম্বন্ধে খবর চান তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তবে আমার খবর পুরোনো, দু' মাস আগে আর্মি থেকে ছুটি নিয়ে গেছি। একটা ভুল করেছিলাম এবার বসন্তকালে—জীবন দিয়েই সে ভুলের দাম দিতে হবে। আপনি আমাকে গুলি করে মারতে চান? যে ভুল আমি নিজে করেছি তার জন্যে প্রাণ তো আমাকে দিতেই হবে একদিন, আজ হোক, না হয় কাল..."

মাখনোর চোখে হাসির ঝিলিক, মুহূর্ত পরে আবার মিলিয়ে গেল। "ও আমার কথা বিশ্বাস করছে না," ভাবল ভাদিম। "অন্যভাবে দেখতে হবে।" সিগ্রেটে দীর্ঘ টান দিয়ে টেবিলের কিনারায় রেখে দিল, তারপর বেল্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বলে চলল:

"আমি হোয়াইটদের দলে পড়লাম কি করে, আগে তাই বলি। ঢালু বেয়ে আপেল গড়িয়ে পড়ে না? ঠিক তেমনি করে। আমরা ছিলাম...যাকে বলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, মানে রুশিয়ার ছাঁকা সারটুকু। মিখাইলভ্স্কি, কান্ট, ক্রোপৎকিন—সব আমাদের কণ্ঠস্থ। পরম আশ্বাসে কত যে বই পড়েছি—বেবেল পর্যন্ত বাদ যায়নি। তারপর আলোচনা রাতের পর রাত। আলোচনা হত আলেকসাই বরভয়*-এর সঙ্গে। (রশচিন যা আশা করেছিল তাই: বরভয়ের নাম শুনে মাখনোর চোখ দুটো যেন ভিজে আসে, তখনকার মতো ওকে একদম বোকা বোকা দেখায়।) "উৎসাহে, আশায় আমাদের হৃদয় তখন পূর্ণ। এল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব! এ কী বিষণ্ণ পরিণতি! কোথায় আলো ঝলমল উৎসবের স্বপ্ন, না কোথায় এই নোংরা রাস্তার সারি, আর গাদা গাদা সূর্যমুখী বীচির খোসা, চারিদিকে শুধু জাহাজের খালাসী আর নোংরা নোংরা সেপাইয়ের দল। মহা-দেশ না ছাই—স্রেফ চটকানো ময়দা, ভাতের মাড়, লবণহীন, বিস্বাদ..."

সোফার ওপর নড়েচড়ে মাখনো, কেমন যেন অস্বস্তির ভাব। তারপর হাঁটু দুটো দু হাতে জড়িয়ে ধরে কখন যে শান্ত হয়ে বসেছে, নিজেই টের পায়নি।

চড়ুইভাতিতে গেলে লোকে যেভাবে বসে মাঠের মাঝখানে, ওর বসার কায়দাটাও সেই রকম। চোখের ভাবও আর আগের মতো নেই, একেবারে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

"দেখাই গেল যে, বুদ্ধিজীবীদের ওর মধ্যে স্থান নেই। তারপর অক্টোবর। তখন তো একেবারে গোবরগাদায়—বুদ্ধিজীবীদের ঘাড়টি ধরে আর গাদায় ফেলে,...ব্যস। ভলান্টিয়ার আর্মিটা হচ্ছে সারা রুশিয়ার গোবরগাদা। সৃষ্টিশীল কোনো কিছুই নেই ওর মধ্যে, এমন কি পুনর্গঠনেরও কিছু নেই,

---

* ঐ সময়কার এনার্কিষ্ট পণ্ডিত; মাখনোর এনার্কিষ্ট সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।

থাকতেই পারে না। কিন্তু ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে, যথেষ্ট আছে।... একথা বুঝতে এত দেরী হ'ল সেই তো দুঃখ...তবু যে বুঝলাম সেও ভাল।... এই হ'ল ব্যাপার, বুঝলেন নেস্তর ইভানোভিচ......।" (খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাদিম ওকে নাম ধরে ডেকে বসল)। "আমার মৃত্যু হওয়াই উচিত—তা ছাড়া বাঁচার বড় সাধও নেই। কিন্তু একজন আছে...যে আমার কাছে সমস্ত মতামতের চেয়ে বড়, বিবেকবুদ্ধির চেয়েও প্রিয়তর...সেইজন্যেই তো আজও মরতে পারিনি।"

"এই নাকি সে?" ফটোটা দেখিয়ে হঠাৎ শুধাল মাখনো।

"হ্যাঁ, সে-ই।"

"নিন ধরুন, এ ফটোতে আমার কোনো কাজ নেই..."

জামার ভেতরের পকেটে ফটোটা রেখে দিয়ে রশচিন সিগ্রেটটা তুলে নিল, ধরাল আবার। হাত কাঁপেনি কিন্তু। কাহিনীরও খেই হারায় নি।

"কাজে কাজেই, আত্মপরিচয়ের দলিল ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিলাম। তারপর এখানে পৌঁছালাম ওর পদচিহ্ন অনুসরণ করে। এখন যখন ধরছি জীবনের পথই, তখন জীবনদর্শন, মতাদর্শ সে সবও চাই আবার—শুধু দাস্যবৃত্তি করতেই তো আসিনি।...মানতে পারি খালি একটি জিনিস...তাও একেবারে পরম নিরাকারভাবে...সে হল স্বাধীনতা—অসীম, উদ্দাম স্বাধীনতা।...পাগলের কথা? অসম্ভব? হোক! মরতে যখন হবেই তখন এমন কিছুর জন্যে মরা যাক, কল্পনাও যার নাগাল পায় না।"

"বেশ বেশ! তা এখন ডেসপ্যাচটা কোথায় লুকিয়েছেন বার করুন দেখি!" খুব শান্তভাবে মাখনো বলল।

কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে পড়ে এদিকে মাথা ফেরাল রশচিন। হাতের ভঙ্গিতে কেমন একটা হতাশ, দুর্বল ভাব। আর মাখনো বসে রইল সোফার ওপর, নড়নচড়ন নেই। ঘরের এক কোণে এলোমেলো জিনিসের গাদা—অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম, কাগজের ঠোঙা, আরও কত কি। মাখনো হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—খুঁজে খুঁজে ঐ মালের গাদা থেকে দু' বোতল মদ আর গোটাকয়েক টিনের কৌটা বের করে এনে রাখল টেবিলের ওপর। সার্ডিন মাছের কৌটাটা খুলতে খুলতে বল্লেঃ "আপনাকে আমার সেনানীমণ্ডলীতে ভর্তি করে নিচ্ছি। আপনার স্ত্রী, তিনি আছেন ক্রামিলনিকভদের সঙ্গে—৬নং কম্প্যানী, প্রথলাদ্নি খামার বাড়ী।...শুনুন, বলশেভিকদের একজন প্রতিনিধি এখানে আসবে, এখুনি। তার যেন এই ধারণা হয় যে আমি বুঝি ভলাণ্টিয়ার আর্মির সঙ্গে আপোসের কথাবার্তা চালাচ্ছি। ওকে বোকা বোঝানোই আপনার কাজ। বুঝেছেন? আপনি তাস খেলা জানেন?"

ভাদিম পেত্রোভিচ এবার সত্যিই একেবারে হতভম্ব। চুপচাপ শুধু চোখের পাতা নাড়ে—কি হল, কেন হল সে সব কথা বুঝবার চেষ্টাও করে না। ওদিকে সার্ডিনের টিনটা তখন খোলা হয়ে গেছে। মাখনো এবার পকেট থেকে একটা

ছুরি বার করল—ঝিনুক-বসানো শতমুখী ছুরি। তাই দিয়ে টিন খুলে চল্ল, একটার পর একটা—কোনোটাতে আনারস, কোনোটাতে হাঁসের মেটের সিঙ্গাড়া, কোনোটাতে বা গলদাচিংড়ি—ভুরভুর গন্ধে ঘর একেবারে মাত।

"যখন ইচ্ছে তখনই আপনাকে গুলি করে মারতে পারি—কিন্তু আপাতত কাজেই লাগাতে চাই," হতভম্ব রশচিনকে যেন বুঝিয়েই দিচ্ছে মাখনো: "আপনি সেনানীমণ্ডলীর স্টাফ অফিসার ছিলেন? না কি লাইনে থাকতেন?"

"মহাযুদ্ধের সময় জেনারেল এভার্টের স্টাফে ছিলাম..."

"...আর এখন আপনি বুড়ো কত্তা মাখনোর স্টাফে থাকবেন।...জারের আমলে যখন জেলে ছিলাম—সেপাইরা মাথা আর ঠ্যাং ধরে শূন্যে তুলত, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিত পাথরের মেঝের ওপর।...জনসাধারণের নেতা তৈরি হয় এমনি-ভাবেই। বুঝেছেন?"

মেঝের ওপর সেই একরাশ জিনিসপত্রের মাঝখানে একটা হলদে রঙের বাক্স। তার ভেতর থেকে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে। উবু হয়ে মাটিতে বসে রিসিভার তুলে নিল মাখনো। ক্যাঁক ক্যাঁক গলায় আওয়াজ দিল—"হ্যাঁ, বলে দাও যে তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

প্রতিনিধি চুগাই বেশ ধীর, স্থির, শক্ত লোক। গায়ে রীফার জ্যাকেট—পুরোনো বটে, তাহলেও বেশ কাচাকোচা ফিটফাট্। জাহাজী টুপিটা মাথার পেছন দিকে বেঁকিয়ে হাতের তাসগুলো এমনভাবে ধরে আছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। ওর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, বৈশিষ্ট্যময়—নেস্তর ইভানোভিচ যে চালই চালুক ওর দৃষ্টি এড়ায় না। উঁচু উঁচু গালের হাড়, ছোট্ট কালো গোঁফ, নির্বিকার প্রশস্ত মুখমণ্ডল—তাতে ভাবের কোন অভিব্যক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু দেহের ওজন আছে, ওজনের চাপে বেণ্টউড চেয়ারটা মাঝে মাঝে ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে। ওর জাহাজী পাজামা শুদ্ধ পা দুটো বুটের মধ্যে ঢোকানো। সাতটা হাঁ-করা ড্রাগনের মাথার ওপর ও যদি গিয়ে বাবু হয়ে বসে, তাহলে মনে হবে যেন বুনোদেরই কোন দেবমূর্তি।

খেলা চলছিল। খেলার নাম 'ছাগল'; হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের ভয় আর যন্ত্রণা ভুলবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রেই এ খেলার সৃষ্টি। অতিথিরা ঘরে ঢুকলে নেস্তার ইভানোভিচ কোথায় উঠে দাঁড়াবে, হাত মেলাবে, তা না, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল—আসুন 'নাইন' খেলা যাক (যেন এই খেলার জন্যেই অতিথিদের ডেকে এনেছে)। বিদ্যুৎগতিতে তাস বাঁটে নেস্তর—হাত চলছে কি না চলছে বোঝাই দায়। তারপর হাজার রুব্‌ল নোট একখানা ঠপ্ করে টেবিলে ফেলে তার ওপর গলদাচিংড়ীর টিনটা চাপা দিল। চুগাইয়ের হাতে দুখানা তাস—সেও কিন্তু তাস দুখানাকে রেখে দিলে ঐ টিনেরই নীচে।

"ভয় করে নাকি?"—মাখনো প্রশ্ন করে।

"না, ভয় নয়। 'নাইন' খেলা যে জানিনে। তার চেয়ে আসুন 'ছাগল' খেলা যাক!"

তাসের হাতটা টেবিলের নীচে ধরে পা ছড়িয়ে বসেছে মাখনো। পিঠ দরজার দিকে—কাজেই পেছনটা ফাঁকা (এটা সহজেই চুগাইয়ের নজরে পড়ে)। মাখনোর বাঁ-পাশে রশচিন। 'টক্‌সিন' সঙ্ঘের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য লিঅন চর্নি ডান পাশে। চর্নির বয়স আন্দাজ করা শক্ত; শুঁটকো একরত্তি চেহারা; বুকের খাঁচাটা এত সরু যে তার মধ্যে ফুসফুসের জায়গা আছে কিনা সন্দেহ হয়। স্রেফ মনের তেজেই তিনি বেঁচে আছেন, বাঁচার আর কোন সম্বল তো দেখা যায় না। গায়ের জ্যাকেটটা দলানো কোঁচকানো, তার ওপর এখানে ওখানে মরামাস আর পাকা চুল। হাতে তাস ধরেছেন, কিন্তু মনটা এমনই অন্যমনস্ক যে, সবাই তাস দেখতে পাচ্ছে।

চুগাইয়ের সঙ্গে কঠিন লড়াই লড়তে হবে ভেবে উনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। মাখনো আর তার সৈন্যদলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব; ওঁর ধারণা যে, সেই রকম প্রভুত্ব বিস্তারের ইচ্ছা নিয়েই চুগাই এখানে এসেছে। টিনের কৌটায় যেমন ডিনামাইট ঠাসা থাকে, লিঅন চর্নির ভাবনা-চিন্তাও তেম্‌নি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত। কোথায় বলশেভিকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে আশা করে এলেন—তা না তার বদলে তাস নিয়ে 'ছাগল' খেলা! উনি একটু হকচকিয়ে গেলেন—হাত থেকে তাস ফেলে দেন, নয়তো ভুল তাস খেলে বসেন—মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেছে। পর পর চারবার ওঁকেই 'ছাগল' হতে হল। "ব্যা, ব্যা, রাম-ছাগল" বলে ওঁকে ভেঙ্গায় মাখনো। আবার হাসেও। কিন্তু সে হাসি শুধু মুখের নীচের অংশে।

এক এক দান খেলার শেষে মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় মাখনো—ভঙ্গীটা অনেকটা বাঁদরের মতো। সকলের কাপে, গেলাসে মদ ঢালে আর চেয়ে চেয়ে দেখে সবাই সমান খাচ্ছে তো! কথাবার্তাও চলে—মামুলি খোসগল্প, আর কিছু নয়। মনে হয় বুঝি কোন্ স্যাঁৎসেঁতে, ঠাণ্ডা রাত্রে সত্যি সত্যিই ক'জন বন্ধু বসেছে একসঙ্গে, গল্পে-গুজবে সময় কাটাচ্ছে—আর ওদিকে বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে অন্ধকার সার্সির গায়ে, বাড়ির সামনে নিষ্পত্র পপলার-শীর্ষে দোলা লাগিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বিলাপ করছে—পথহারা আত্মার আর্তরবের মতো।

মাখনোর খেলা সময়ের খেলা। কিন্তু দেরী হলে চুগাইয়েরই বা ক্ষতি কি? 'যা থাকে কপালে' বলে ও এখন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। গৃহকর্তার আকারে ইঙ্গিতে যখন বোঝা গেল যে, দলের চার নম্বর খেলোয়াড়—ঐ যে চোখে কালি, পাকা চুল, কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক যিনি কথাই বলেন না, তিনি দেনিকিনের অফিসার—তখন অঘটন ঘটলেও চুগাই বিস্মিত হ'ত না। ওদিকে লিঅন চর্নিই সবার আগে ভেঙ্গে পড়বেন তা এখন প্রায় বোঝাই যাচ্ছে—পকেট থেকে নোংরা রুমাল বার ক'রে জ্বরগ্রস্তের মতো সেটাকে তিনি দলা পাকাচ্ছেন, আর প্রত্যেকবার মদ খাওয়ার পর নাকে-চোখে ঘষছেন। সত্যি, যা ভাবা গিয়েছিল

তাই—লিঅন চর্নি হঠাৎ একেবারে ফেটে পড়লেন; স্বভাবকোপন ভঙ্গীতে হাতের ছড়ানো তাসগুলো হেলাতে হেলাতে চুগাইকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেনঃ

"আপনাদের বলশেভিকদের সঙ্গে আমাদের তর্ক চলছে বহুদিন, একেবারে সেই পারীর সময় থেকে। সে তর্ক শেষ হয়নি; লেনিনের কথা যে ঠিক, তা তো আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। সামন্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্র, তার বদলে আপনারা চান শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র তো রাষ্ট্রই—এক শক্তির জায়গায় আর এক শক্তি, ব্যস। বড়লোকের পোষাক খুলে নিয়ে কৃষকের ফতুয়া চড়ালেই একেবারে শ্রেণীহীন সমাজ হয়ে গেল আর কি! বলিহারী বুদ্ধি!"

অবজ্ঞার হাসি হেসে শুকনো ঠোঁট মোছেন রুমাল দিয়ে। চুগাইয়ের মুখে কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই। শুধু একবার গলদাচিংড়ির টিনটার দিকে চাইল—তারপর টিনটাকে কাছে টেনে এনে কাঁটা দিয়ে চিংড়ি তুলতে তুলতে বল্লঃ

"হুঁ, তা আপনারা তাহলে কি চান? 'শৃঙ্খলার জন্মদায়িনী অরাজকতা'—তাই না?"

"ধ্বংস!" সাপের মতো ফোঁস করে উঠলেন লিঅন চর্নি, ছাই রংয়ের ছাগল দাড়িটা যেন যুদ্ধ ঘোষণা করছে। হ্যাঁ, ধ্বংস! এই পাপ সমাজটাকে একেবারে নির্মমভাবে ধ্বংস করতে হবে, মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে—একটা ইঁটও যেন আস্ত না থাকে! এই সমাজের সর্বনেশে বীজ থেকে যেন আর কোনোদিন কিছু না গজাতে পারে—না রাষ্ট্র, না রাজশক্তি, না মূলধন, না শহর, না কারখানা।"

"তাহলে থাকবে কে, আপনার ঐ মরুভূমিতে?"

"জনসাধারণ!"

"জনসাধারণ!" চুগাইয়ের দিকে থুতনি উঁচিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে মাখনো। "স্বাধীন জনসাধারণ!"

চুগাই বল্লঃ "চীৎকার দিয়ে শুরু করলে, চিৎপাত দিয়ে শেষ করতে হবে।" বোতল থেকে সবাইয়ের গ্লাস ভ'রে দিয়ে (লিঅন চর্নি নিজের গ্লাসটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন, খানিকটা মদ উছলে পড়ল) ফের বল্লঃ "ধ্বংস করা তো সহজ। কিন্তু বেঁচে থাকবেন কি করে তাই বলুন?"

নেস্তর ইভানোভিচ জবাব দেবার আগেই মাঝে পড়লেন লিঅন চর্নি। বল্লেনঃ

"ধ্বংস করতেই তো বেরিয়েছি আমরা। সে ধ্বংস নির্মম, ভয়ঙ্কর, চূড়ান্ত। আমাদের কালের মানুষের যত শক্তি, যত আবেগ—সব ঢেলে দিতে হবে এরই পেছনে। জাহাজী মশায়, আপনি তো বন্দী—যত সব অনড়, ক্ষুদ্রমনা ভাবনা-চিন্তার ক্রীতদাস। রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর মানুষ বাঁচবে কি করে তাই জিজ্ঞাসা করছেন? বাঁচবে কি করে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"

অমনি চেপে ধরল মাখনোঃ

"না, এখানে আপনার সঙ্গে মতে মেলে না কমরেড চর্নি। ছোটখাট কারবার তো আমি ধ্বংস করিনে, চাষীদের কো-অপারেটিভ, ক্ষেত-খামার—এসবও না।"

“আপনিও তাহলে কাপুরুষ? এই বলশেভিকের মতোই কাপুরুষ?”

“আরে ছোঃ, কাপুরুষ বলছেন নেস্তর ইভানোভিচকে!” বলে নেস্তর ইভানোভিচের কথায় চোখ টিপে সায় দিল চুগাই। নেস্তরের ভিজে ভিজে মুখটা আগুনের মতো টকটকে। “নেস্তর ইভানোভিচ প্রাণের মায়া করেন নি কখনো—তা কে না জানে? অত সহজে ওঁকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। দস্তুরমতো লড়তে হবে।”

“লড়বেন? বেশ, একটু চেষ্টা করেই দেখুন না!” বল্লেন লিঅন চর্নি। গলার স্বর হঠাৎ একেবারে শান্ত, এমন কি দাড়িগুলো পর্যন্ত মসৃণ হয়ে এসেছে। বেশ আগ্রহের সঙ্গে হাঁসের মেটে নিয়ে পড়লেন এবার, তবে মনটা যেন অন্য কোথায়।

ছাতের দিকে চেয়ে রশচিন ধূমপানে রত, মুখভাব নির্বিকার। সেদিকে তির্যক দৃষ্টি হানে চুগাই। ছাতাপড়া বড় বড় দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসছে মাখনো।

“ওঃ হো, এদের তলে তলে সাঁট আছে”, মনে মনে বল্লে চুগাই। ওর চাপে চেয়ারটা মড় মড় করে উঠল। কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ—মাখনোকে সংযুক্ত সংগ্রামে রাজি করাতে হবে, বিশেষ করে একাতেরিনোস্লাভের ওপর যুক্ত আক্রমণে নামাতে হবে। এ কাজের ভার চুগাইয়ের কাঁধে। এখন ও যদি এই এনার্কিস্টের কাছে—বেটা নিশ্চয়ই মোটা মোটা বই পড়েছে ডজন ডজন—তর্কে হেরে যায়, তাহলে খুব ভয়ের কথা, ওর বিরুদ্ধে মারাত্মক ‘সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত’ গৃহীত হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আর ঐ যে স্বল্পভাষী দেনিকিন অফিসারটা—যার মুখ দেখলেই বোঝা যায় লেখাপড়াওলা ভদ্দর লোকের ছেলে—ও লোকটাও যেন কেমন কেমন। রশচিন যে মাখনোর স্টাফে আছে সে কথা চুগাই অবশ্য এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি।

“আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই”, চুগাই বল্ল।

“বেশ তো, করুন না।” আহারে ব্যস্ত লিঅন চর্নি বল্লেন।

“কমরেড লেনিন বলেছেন: ছ মাসের মধ্যে রেড আর্মির সৈন্য হবে তিরিশ লক্ষ। আচ্ছা চর্নি সাহেব, এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি কি তিরিশ লক্ষ এনার্কিস্টকে সৈন্য দলে নিয়ে আসতে পারতেন?”

“নিশ্চয় পারতাম।”

“তাহলে এ কাজের জন্যে আপনার নিশ্চয়ই লোকজনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে, আছে না?”

হাতের কাঁটাটা মাখনোর দিকে প্রসারিত করে চর্নি বল্লেন:

“এই তো আমার লোকজন।”

“বেশ। এই ব্যক্তিটির কথাই ধরা যাক। ত্রিশ লক্ষ সিপাহীর মতো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এ সব আপনারা তাহলে নেস্তর ইভানোভিচকে দিচ্ছেন। সাজসরঞ্জাম, রসদ, ঘোড়ার খাদ্য এ সবও দিচ্ছেন। এ রকম একটা আর্মির জন্যে

ঘোড়াই তো চাই লাখ পাঁচেক। এত সব জিনিষ আপনাদের আছে বলতে চান?"

মেটের টিনটা তখন খালি। সেটাকে দূরে সরিয়ে দিলেন লিঅন চর্নি। কুঞ্চিত কপালে সরু সরু রেখা ফুটে উঠল।

"অঙ্কের ভয় দেখাবেন না জাহাজী সাহেব। আপনার অঙ্ক-টঙ্ক সব ফাঁকা। শতচ্ছিন্ন পুরানো রুশিয়াকেই আপনার ঐ অঙ্ক দিয়ে যেভাবে জোড়াতালি লাগাবার চেষ্টা করছেন, দেখলে করুণা হয়! স্রেফ প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ! রেড আর্মিতে তিরিশ লক্ষ সৈন্য! বাপরে কি হবে! আচ্ছা ধরলাম আপনারা তিরিশ লক্ষই জোটালেন। আপনার ঐ লক্ষ লক্ষ চাষী-মালদারের দল বুকে রেড স্টার লাগিয়ে খাড়াই থাকবে—আর পবিত্র, সত্য বিপ্লব তাদের মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। আমাদের আর্মি......", ছোট্ট মুঠো দিয়ে টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে আবার বল্লেন, "সমগ্র মানুষ জাতিই আমাদের আর্মি আর আমাদের গোলাবারুদ হল মানুষের মহৎ ক্রোধ। কোনো রকমের রাষ্ট্রই আর মানুষ আজ সহ্য করতে প্রস্তুত নয়—তা সে ধনবাদী রাষ্ট্র হোক, কি সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যই হোক।...সূর্য, মাটি আর মানুষ! আগুন লাগিয়ে দাও, আরিষ্টট্ল্ থেকে মার্কস পর্যন্ত দর্শনের যা কিছু গ্রন্থ সব আগুন লাগিয়ে দাও। আর্মি চাই! পাঁচ লক্ষ ঘোড়া চাই! ছোঃ সার্জেণ্ট মেজরের গোঁফ পর্যন্তই আপনার কল্পনার দৌড়। নিনগে আপনার আর্মি আর ঘোড়া! কোটি কোটি মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেব আমরা। আর যদি কিছু না থাকে, শুধু নখ আর দাঁত আর পাথর থাকে, তাই দিয়েই আপনাদের আর্মিকে হটিয়ে দেব—সভ্যতা-টভ্যতা যা কিছু আঁকড়ে থাকতে চান আপনারা, সে সব মাটিতে মিশিয়ে দেব একেবারে......"

"বুড়ো বক্তৃতাবাগীশ!" চুগাই ভাবল। এর আগে টান টান হয়ে বসে চর্নির কথা এক মনে শুনছিল মাখনো, কিন্তু এখন ওর কাঁধ জোড়া ঝুলে পড়েছে, তোবড়ানো গাল দুটো রক্তহীন, বিবর্ণ। মাস্টার মশাই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন তাই ও আর মাষ্টার মশাইয়ের কথা বুঝতে পারে না। চুগাই এটা লক্ষ্য করেছিল। সে বল্ল ঃ

"আপনাকে আর একটা কথা শোধাতে চাই লিঅন চর্নি......"

"কি, বলে ফেলুন!"

"আপনার কথা যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয়, সর্বজনীন সৈন্য সংগ্রহের জন্যে কোনো ব্যবস্থা করছেন না আপনারা। কিন্তু যে জিনিষই হোক, আরম্ভ করতে গেলে একটা কিছু দিয়ে শুরু করতেই হয়। বোমা ফাটানোর আগে ফিউজ চাই, আগুন জ্বালাতে গেলে চাই দেশলাই। তো আপনারা কোন্ ফিউজ লাগাবেন ভেবেছেন? কর্মী কোথায় আপনাদের? মাখনো আপনাদের কর্মী?" (লিঅন চর্নির চোখ ঘুরছে—ফাঁদটা কোথায়?) "মাখনোর সৈন্যদল লড়াইয়ের জন্যে পাগল, তা জানি, কিন্তু ওতে এনার্কিস্টের সংখ্যা এমন আর কি? এ আর্মি তো আপনাদের আর্মি নয়।"

পকেট থেকে মাখনো বন্দুক বার করছে না তো—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল চুগাই। নাঃ মাখনো বসে আছে, একেবারে চুপচাপ। লিঅন চর্নির মুখে অবজ্ঞার মৃদু হাসি ঃ

“নাঃ, আপনাকে দেখছি একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে পড়ানো সুরু করতে হবে জাহাজী মশাই।”

“তাই পড়ান না।”

“সমাজের আইনে যাদের আশ্রয় নেই, তারাই আমাদের ফিউজ, আমাদের কর্মী। জনজীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অভিব্যক্তি হল—দস্যুবৃত্তি।...এটা বুঝতেই হবে। দস্যু যে সে তো সব রকম রাষ্ট্রেরই ঘোরতর শত্রু, আপনাদের ঐ সোশালিজমেরও, বুঝলেন।......একটা জাতির মধ্যে প্রাণ আছে কিনা তার প্রমাণ ঐ দস্যুবৃত্তি। সত্যিকারের দস্যু কখনো মানিয়ে নেয় না, পোষও মানে না—ধ্বংসের জন্যেই সে ধ্বংস করে চলে। সমাজের সমস্ত উপাদানের মধ্যে শুধু সে-ই হ'ল সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক। চোখ খুলে চেয়ে দেখুন!”

কথা নয় তো, যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, আবেগ দিয়ে ঠাসা। মাখনো ইত্যবসরে দরজার দিকে এগিয়ে গেছে, পা টিপে টিপে। দরজা খুলে গলি-পথটা দেখে নিয়ে আবার টেবিলের ধারে ফিরে এল। রশচিনের দৃষ্টিতে এখন খানিকটা কৌতূহল জেগেছে, ছিটগ্রস্ত লিঅন চর্নির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে—বুড়ো যা বলছে তা কি ওর অন্তরের কথা? না শুধু ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা?

“জাহাজী মশাই, আপনি একেবারে আঁতকে উঠেছেন তা আপনার চোখ মিট মিট করা দেখেই বুঝছি”. জোরে বল্লেন লিঅন চর্নি। “আপনার ধর্মবুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে গেছে, না? তাহলে শুনে রাখুন ঃ কলম, দোয়াত সব আমরা ভেঙেচুরে শেষ করেছি—এবার আর কালি নয়, রক্ত গড়াবে, রক্ত! কালের ঘণ্টা বেজেছে, কথা এখন রূপ নিচ্ছে কাজে। প্রাথমিক আন্দোলন হিসাবে দস্যুবৃত্তির আজ গুরুতর প্রয়োজন; এমন চরম সময়েও সে কথা যে না বোঝে, দস্যুবৃত্তির পক্ষে না দাঁড়ায়—তার স্থান বিপ্লববিরোধী শিবিরে......”

চোখ কুঁচকে দাঁতে নখ কাটে মাখনো। রশচিন ভাবে ঃ “না, বুড়োর জ্ঞান তো বেশ টনটনে।” টেবিলের ওপর ঝুঁকে কনুইয়ে ভর দিয়ে বসেছে চুগাই—একটা আঙুল উঁচু করে তুলে ধরা, যেন ওর ওপরই লিঅন চর্নিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে বলছে।

“তিন নম্বর প্রশ্ন। আচ্ছা বেশ, ধরুন আপনার কর্মীটর্মী সব যোগাড় হল, তাদের কাজও সব সারা হল, মানে সবই তখন একেবারে ওলটপালট, লণ্ড-ভণ্ড। তা এ সব তো শেষ হবে এক সময় না এক সময়? নিশ্চয় হবে। আপনার সমাজ-তাড়ানো লোকেরা (আমরা তাদের ডাকাত বলি) তখন আয়েসী হয়ে গেছে, কাজ করতে পারে না। সুতরাং তারা কাজ করবে না। করবেই বা কেন? মনের মতো যা পায় তুলে নেয়, এ তো তাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাহলে তখন কি হবে? তাদের হয়ে কি অন্য লোকে খাটবে? খাটবে না, তা

তো আপনিই বলছেন। কিন্তু লুটপাট করার মতো জিনিষ তো কিছু নেই আর। তাহলে কি করবেন তখন? পাহাড়ের মাথা থেকে ঠেলে ঠেলে ফেলে দেবেন নাকি আপনার ডাকাতদের? মেরে ফেলবেন তাদের? এই প্রশ্নের জবাব দিন......"

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ—চুগাইয়ের উত্তোলিত তর্জনী আর বাঁকানো নখের ওপরই যেন সকলের মনোযোগ একেবারে কেন্দ্রীভূত। খর্বাকার লিঅন চর্নি উঠে দাঁড়ালেন (বসে থাকার সময় ওঁকে আরও লম্বা দেখাচ্ছিল)। দেখলে মনে হবে বুঝি আপোষহীন দার্শনিক চিন্তারই প্রতিমূর্তি। মাখনোর দিকে ফিরে হাতের ইঙ্গিতে চুগাইকে দেখিয়ে বল্লেন:

"মারুন, একে গুলি করে মারুন!...এ চর, উত্তেজনা সৃষ্টি করতে এসেছে..."

অমনি এক লাফে মাখনো একেবারে দরজার ধারে, সেই ফাঁকা জায়গাটাতে চুগাইয়ের জ্যাকেটের নীচে 'মজার' পিস্তল—ও তাড়াতাড়ি সেটাতে হাত দিল। রশচিন টেবিল থেকে পিছু হটতে গিয়েছিল, কিসে যেন বেধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসে পড়ল সোফার ওপর। যাই হোক, অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু কেউই আর বার করল না—বার করলে গুলি না চালিয়ে উপায় থাকবে না তা তো প্রত্যেকেই বোঝে!

"ছিঃ খুড়ো!" উপদেশের সুরে চুগাই বল্ল। "তর্ক ছেড়ে শস্তায় কিস্তিমাত করতে চান? চর বলার মজাটা টের পাইয়ে দেব নাকি?" (বলে ঘুষি ওঁচান—ঘুষির বহর দেখে চর্নির তো চক্ষুস্থির।) "যাই হোক, আপনার যে দেড় ইঞ্চি ছাতি—ওভাবে আর দিলাম না জবাবটা। ...কিন্তু এর পর থেকে একটু মুখ সামলে, বুঝলেন খুড়ো!"

মাখনো এবারও চুপচাপ, গুরুদেবের পক্ষ নিয়ে হাতও ওঠাল না। চোখ নামালেন লিঅন চর্নি—যেন দাড়ির আড়ালে আশ্রয় নিতে চান। ওঁর বীভার লোমের কলার লাগানো কোট—এখন অবশ্য বীভার বলে চেনা যায় না—আর তেমনি জরাজীর্ণ মখমলের টুপি—দুটোই তুলে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পরাজয় স্বীকার করেছেন, কিন্তু মরদের মতো।

"হুঁ—তারপর?" মাখনো বল্ল। ও তখন টেবিলের কাছে ফিরে এসে ফের হাত লাগিয়েছে বোতলে। "কমরেড রশচিন, যে অফিসার বাইরে ডিউটিতে আছে তাকে গিয়ে বলুন—সে আপনার শোবার জায়গা দেখিয়ে দেবে।"

সেলাম করে বেরিয়ে গেল রশচিন। যেতে যেতে কানে এল মাখনোর গলা. চুগাইকে বলছে মাখনো:

"এ বলে মাখনো, ও বলে মাখনো—তা আপনিই বা মাখনোকে কি বলতে চান শুনি!"

॥ বারো ॥

ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামে নিজের বাড়ীতে ফিরল আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ। বাড়ীর ভস্মস্তূপের ওপর তখন তুষারে তুষারে ছেয়ে গেছে। আলেক্সি সেখানে পায়চারি করে। প্রতিবেশীর রান্নাঘর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ আসে। আলেক্সি চেয়ে চেয়ে দেখেঃ শীত তো সবে শুরু, কিন্তু হাঁসগুলো এখনি দিব্যি পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে—ডানা মেলে প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চলেছে হিমঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে—কখনো ছুট দেয়, কখনো বা আকাশে ওড়ে। যতই এসব জিনিস নজরে পড়ে ততই আলেক্সি টের পায় যে, দস্যুজীবনে ওর একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে।

আর্মির মালটানা গাড়ীতে চড়ে স্তেপের ওপর দিয়ে সেই যে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, সেই যে ধু ধু করে জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম—সে সব জিনিস চাষীর পোষায় না। ধীর, মন্থর গতিতে জমির কথা ভাববে, জমির কাজে হাত লাগাবে—তবেই না চাষীর জীবন। একটু খাটতে পারলেই হল, মা বসুমতী একেবারে ছাপ্পর ফুঁড়ে দেবেন। মাখনোর সঙ্গে থেকে থেকে চাষবাসের ভাবনা-চিন্তা আলেক্সি ভুলেই গিয়েছিল—এখন আবার নতুন করে ভাবতে ভারী ভাল লাগে। শীত-গ্রীষ্মের কঠোরতাবর্জিত মেদুর, ধূসর দিনগুলি—মন্থরগতি তুষারকণিকা ভেসে আসে ক্বচিৎ কখনো—গ্রামীন নিস্তব্ধতা, ধোঁয়ার মধ্যে সুপরিচিত ঘর-মুখো গন্ধ—এসবই তার ভাল লাগে, যা দেখে তাতেই যেন কী আনন্দ মাখানো আছে! পায়চারি করে আর মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে কুড়িয়ে তোলে—হয়তো একটা পেরেক, নয়তো জং-ধরা এক টুকরো টিন, কিংবা একটা লোহার টুকরো—তুলে তুলে দূরে ফেলে দেয়। এক জায়গায় জমে জমে সেগুলো ঢের হয়ে ওঠে। তিন গাড়ী লুটের মাল এনেছে বটে, কিন্তু সে মালের প্রতি লোভ তত নয়। এখন আর পদে পদে কড়াক্রান্তি হিসেব করে চলতে হবে না, নতুন করে ঘর বানিয়ে নিশ্চিন্তে চাষবাস করতে পারবে, একথা ভেবেই ওর পরম সুখ। অবিশ্যি কাজ অনেক—প্রথম খুঁটিটা পোঁতার দিন থেকে শুরু করে সেই রুটি বানানোর দিন পর্যন্ত কাজের আর অন্ত থাকবে না। তারপর একদিন—নিজের মাঠের গম, তারই সুগন্ধ রুটি উনুন থেকে সেঁকে তুলবে মাত্রিয়োনা। বলবে, "সবে হল উনুনটা, কিন্তু এরি মধ্যে রুটি কেমন ফুলছে, দেখ!" এ কথা ভেবেও সুখ পায় আলেক্সি। ঘাবড়াও কেন? বেঁচে থাক্ চাষীর মেহনত—সবই আবার ফলে ফুলে শ্রীমন্ত হয়ে উঠবে।......

পোড়া বাড়ীর ছাইয়ের মধ্যে জুতো দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে একখানা কুড়ুল বেরিয়ে এল—তার হাতলের প্রায় সবটাই পুড়ে গেছে। ওটাকে অনেকক্ষণ চেয়ে

চেয়ে দেখল। তারপর মনে মনে হাসতে হাসতে আর ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলে উঠলঃ আরে সেইটাই, ঠিক সেইটাই! যত নষ্টের মূল ঐ কুড়ুলটাই! ওর মনে পড়ল ঃ মাত্রিয়োনার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে আলেক্সির ভাই সেমিয়ন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক পাগলের মতো। দাওয়ায় ছিল কুড়ুলটা—দরজার ধারে সেই কাঠের গুঁড়িটার গায়ে আটকানো—আলেক্সিই তো রেখে গিয়েছিল। ওটা সেমিয়নের চোখে পড়ে গেল তাই-তো! নইলে এ সব কিছুই বোধহয় ঘটত না।

মরচে-ধরা কুড়ুলটা গাদার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলেক্সি। "আহা, সেমিয়ন! তুমি যদি আজ এখানে থাকতে, কত সুবিধাই না হত—তর্ তর্ করে কাজ এগিয়ে চলত।......সত্যি! সোরগোল, উত্তেজনা তো কত দেখলাম, আর নয় ভাই......"

মাথা নীচু করে হাঁটে। মনটা তখন ভাবনার রাজ্যে। গুলিয়াই-পলিয়ে থাকতেই সেমিয়নের চিঠি পেয়েছিল; সে লিখেছেঃ "মাত্রিয়োনাকে বোলো, ছোঁড়াদের কাছ থেকে যেন দূর থাকে, লক্ষ্মী মেয়ের মতো। ও সব জিনিস ভাল নয়—তা ছাড়া ও সব করার সময়ও নয় এখন। হ্যাঁ, আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই, তখন ও যা ইচ্ছে করতে পারে।......কিন্তু আজকের মতো এমন দিনে মানুষকে সব সইতে হবে, দাঁতে দাঁত চেপে সইতে হবে। তোমাদের কথা ভাবি—শুধু যখন স্বপ্ন দেখি। মিথ্যে আশা কোরো না, আমার ফিরতে দেরী আছে—ঘরোয়া যুদ্ধের শেষ কবে তা তো এখনো বলা যায় না......"

গা ঝাড়া দিল আলেক্সি। হাত্তেরি ঘরোয়া যুদ্ধের নিকুচি করেছে! আর ভবিষ্যতের আশায় চেয়ে থেকে লাভই বা কি? চোখটা ঘুরে ঘুরে আবার সেই শান্ত ছবির ওপর ফিরে আসেঃ ওয়াট্ল্ বেড়ার পেছনে এখানে ওখানে গেরস্ত ঘরের ধোঁয়া উঠছে, পাতাঝরা ফল বাগিচা আর কুঁড়ে ঘরের ওপর দিয়ে শান্ত গতিতে উড়ে চলে যাচ্ছে। ছন আর খড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ছাওয়া ঘরগুলো—শীত আসবে, তার আগেই মৌজের ব্যবস্থা পাকা করে নিচ্ছে চাষীরা। ঠিকই করছে। বড় জোর আর দু হপ্তা, তার পরই তো লাল ফৌজ এখানে পৌঁছে যাবে। ঘরোয়া যুদ্ধ কবে শেষ হবে কে জানে—অম্নি বল্লেই হল! সেমিয়নের যত সব গাঁজাখুরি কথা! কে আবার আসতে যাবে আমাদের এই জায়গায়? "আহা সেমিয়ন! কাস্পিয়ানে ডেস্ট্রয়ারের বুকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে অস্থির বেচারা, ওর মাথায় খুন চড়ে গেছে! ও কি করে বুঝবে......"

আলেক্সির মন তবুও অশান্ত। তামাকের থলিটা বার করতে যাবে, হঠাৎ মনে পড়ল সিগ্রেট বানানোর কাগজ তো নেই। একটা খিস্তি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। গ্রীষ্মকালে ফৌজী ডাক্তারের কাছে শুনেছিল যে, মাখনোর সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্নায়ু রোগে ভোগে। মানে চেহারা টেহারা ঠিক থাকে, ভাত-রুটিও টানে বেশ, কিন্তু স্নায়ুগুলো একেবারে টান টান—ঠিক যেন বেহালার তার। "স্নায়ু না কচু!" গজ গজ করে উঠল আলেক্সি। "আগে তো বাবা এ সব কখনো

শুনিনি!" রান্নাঘরের পোড়া চিমনীটা মাথা জাগিয়েছিল ছাইগাদার ওপর, একা একা; সেটার ভিত শক্ত কি না দেখবার জন্যে জোর ঠেলা লাগাল আলেক্সি, প্রাণপণ শক্তিতে—চিমনীটাও অমনি নড়ে উঠল......স্নায়ুই বটে!

আলেক্সির এক বিধবা আত্মীয়া—তাঁর ওখানে উঠেছে তিনজন—আলেক্সি, মাত্রিয়োনা আর কাতিয়া। সে বাসায় জায়গা কম, অসুবিধা খুব—তবে উনুনের পাড়টা চুণকাম করে নিয়েছে মাত্রিয়োনা, মাটির মেঝেতে বেশ করে কাদাও লেপেছে। ঝাপসা কাঁচওলা ক্ষুদে ক্ষুদে জানলা—তাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে লেসের পর্দা। একগাড়ী, দুগাড়ী, যেখানে যা মালপত্তর পায় কিনে রাখে আলেক্সি এমনি করে ওর ভাঁড়ারে আলু জমেছে, ময়দা জমেছে, আর ঘোড়ার খাবার যা জমেছে তাতে এবারের মতো হয়ে যাবে। ওর কাছে দর কষাকষি পাবেন না, কঞ্জুষিপনা পাবেন না, এমন কি খুব যদি ধরে করে পড়েন তো একটু নুনও দিয়ে দিতে পারে—আজকাল নুনই যে সোনার চেয়েও দামী। আলেক্সি জানে যে, গাঁয়ের লোকের চোখে ওর পয়সা ফাঁকির পয়সা; ওর তিন গাড়ী মাল আর পাঁচটা ঘোড়া—তার জন্যে ওদের চোখ টাটাবে অনেক দিন পর্যন্ত।

কিভাবে ও বাড়ীটা তৈরি করবে সে কথা যখন ওদের বোঝাতে গেল তখন আরও মুশ্‌কিল। পার্কের ঢালু জমিতে পাতা-ঝরা গাছপালার মাঝখানে ঐ যে ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ীটা খালি পড়ে রয়েছে—ওরই একটা অংশ ভেঙে আনতে চায় আলেক্সি। প্রকান্ড বাড়ীটাতে অবিশ্যি কিছুই নেই আর—থামটাম সব খসে খসে পড়ছে, শার্সিহীন জানলাগুলো হাঁ করে আছে। কিন্তু যে দিকে নায়েব থাকত, সে দিকে হাত দেয়নি কেউ। ঐ অংশটাকে ভেঙে নিয়ে আলেক্সির পোড়া ভিটের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া খুবই সহজ।

কিন্তু কৃষকদের মনে ভয়—অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। গাঁয়ের ওপর শাসন চালাবার কেউ নেই ঃ তাড়া খেয়ে পালিয়েছে হেৎমান; পেৎলুরার দলবল এখনও টিঁকে আছে বটে, তবে সে শুধু শহরে; আর রেড-রা তো এসেই পৌঁছায়নি। কিন্তু মাথার ওপর কেউ নেই এটাই কেমন অদ্ভুত লাগে—এ রকম কখনো দেখেনি বলেই হয়তো। ধরুন যদি পরে এর জন্যে ওদেরই জবাবদিহি করতে হয়, বলা তো যায় না।......সুতরাং স্থির হল যে, গ্রামের একজন মোড়ল চাই, নির্বাচন করে ঠিক করতে হবে। কিন্তু প্রধান হতে কেউ রাজি নয়। যারা একটু বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে, টাকা-পয়সা আছে, তারা তো প্রস্তাব করলে উড়িয়েই দেয়—"কী যে বল! আমি ওসবের মধ্যে নেই বাপু!" একেবারে নিঃসম্বল, গরীবগুর্বো কাউকে এত বড় গদীতে বসাবে, তাতেও আবার কারও মন সরে না। সোবিয়েত অঞ্চল থেকে কত গুজব শোনা যায়ঃ এমনি ধারা গরীবগুর্বোকেই তারা নাকি গদীতে বসিয়েছিল, কিন্তু একবার নির্বাচন হল কি ব্যস্, কোথায় গেল তাদের বিনয় আর কোথায় গেল কি—দাপট দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক লোক খুঁজে খুঁজে বার করল মেয়েরা। মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে খবরটা একেবারে গাঁ-ময় ঃ বলি শুনেছ, আফানাসি ঠাকুর্দাকেই মোড়ল

বানাতে হবে, ঠাকুরের আদেশ। দুই ছেলের বৌ নিয়ে আরামে থাকেন ঠাকুর্দা (জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ছেলে দুটি মারা গেছে)! মাঠে ঘাটে খাটাখাটনির বালাই নেই, শুধু বাড়ীঘর, হাঁস মুরগি এইসব দেখাশুনা করেন আর বসে বসে বৌ দুটিকে ধমকান। বড় ছিদ্রান্বেষী, মনটাও ছোট। বয়েসকালে, মানে বহু বহু দিন আগে, উনি নাকি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন—জেনারেল স্কোবেলেভ-এর সঙ্গে।

মোড়লের গদিতে বসতে ঠাকুর্দার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেইঃ "তোমরা যে সম্মান দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ। তবে মনে রেখো, আমার কথা না শুনলে কিন্তু পার পাবে না!" ব্যস্, তখন থেকেই ওঁর দাড়িতে চেরা সিঁথি—ঠিক জেনারেল স্কোবেলেভের মতো—শীপস্কিন কোটটা নামিয়ে এনে একেবারে পাছার ওপর বেল্ট দিয়ে বাঁধা, হেজেল লাঠিতে ভর দিয়ে গাঁয়ের এদিকে ওদিকে চক্কর মারেন—খুঁজে খুঁজে দেখেন কোথাও কোনো খুঁত বার করা যায় কিনা। ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই টুপি তুলে সসম্মানে নমস্কার জানায় আলেক্সি। আর জাঁদরেল ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত করে ঠাকুর্দা শোধান ঃ

"বেশ, বেশ, তা কাজকর্ম কেমন চলছে?"

"ভালই চলছে আপনার আশীর্বাদে। মুশকিল শুধু একটা, জানেনই তো।"

"চাষীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারনি এখনো?"

"না, শুধু আপনিই ভরসা, একবার যদি সুবিধা মতো পায়ের ধুলো দেন!"

"হুঁঃ, তাতে যে তোমার বড্ড মান বেড়ে যাবে হে!"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আফানাসি আফানাসিয়েভিচ্‌কে লোভ দেখিয়ে ঘরে টেনে আনলে আলেক্সি। বুড়োর ছেলের বৌদের কাছে মাত্রিয়োনাকে পাঠিয়ে দিল—ওদের কাছ থেক হাঁস কিনে আনবে, সবচেয়ে পুরুষ্টু হাঁসটা, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে আসবেঃ পরদিন আলেক্সিদের ঘরে জন্মদিনের খানাপিনা আছে ...ছোট্ট ঘর তাই নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন করছে না কাউকে, তবে আত্মীয় বন্ধু কেউ যদি পায়ের ধুলো দেন সে তো সুখের কথা। ঠাকুর্দা আফানাসির কৌতূহল আর বাগ মানে না—শীতের সন্ধ্যা নামতে না নামতে জন্মদিনের ভোজসভায় এসে হাজির। আগুনের তাপে খাসা গরম ঘরটা; দরজা থেকে সোজা একেবারে টেবিল পর্যন্ত এক টুকরো গালিচাও বিছানো আছে। আর টেবিলের ওপর খাবার সাজানো থরে থরে, ভাল-মন্দ কত যে জিনিষ! অন্য অন্য বাড়ীতে কুপি জ্বলে, নয়তো পরিত্যক্ত টিনের পাত্রে সলতে ভাসে—আলোর চেয়ে কালিই বেশী। আর এখানে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় ওপর থেকে ল্যাম্প ঝুলছে, তেলের ল্যাম্প।

কর্তৃপক্ষজনোচিত গম্ভীর ভঙ্গীতে প্রবেশ করলেন আফানাসি ঠাকুর্দা। টুপি সরাতে প্রথমেই চোখে পড়ল সুন্দরী মাত্রিয়োনা, তার কোঁচকানো ঠোঁট, আর কঠিন, কালো চোখ। তারপর সেই অন্য মেয়েটি—গাঁময় যাকে নিয়ে

হৈচৈ পড়ে গেছে। সে মেয়েটিও পরমাসুন্দরী। তারই জন্মদিন। মাত্রিয়োনা, কাতিয়া—দুজনের পরণে শহুরে পোষাক—মাত্রিয়োনারটা লাল, কাতিয়ার কালো। গলাবন্ধ আর শীপস্কিন কোট খুলে ফেলে দাড়িটাকে তাড়াতাড়ি গালের দুপাশে চিরে দিলেন ঠাকুর্দা।

অভ্যর্থনার আয়োজন দেখে তিনি খুব খুশী। বল্লেনঃ “নমস্কার, আপনাদের সংগসুখ পেলাম, সেজন্যে ধন্যবাদ!”

খেতে বসলেন চারজনে। যুদ্ধের আগেকার ভদকা—টেবিলের তলা থেকে তবেই এক বোতল হাজির করল আলেক্সি। কথাবার্তা চল্ল—খাসা অমায়িক।

“আফানাসি আফানাসিয়েভিচ, আসুন আপনার সংগে পরিচয় করিয়ে দিইঃ—ইনি আমার বাগদত্তা, আজ ওঁর জন্মদিন। আশা করি ও আপনার সুনজরে পড়বে।”

“ও তাই বল! সুনজর তো অবশ্যই, মেয়েদের যে ভালবাসা দরকার। তা উনি এসেছেন কোথা থেকে?”

“উনি এক অফিসারের স্ত্রী, স্বামী মারা গেছেন। সৈন্যদলে আমি ওঁর স্বামীর আর্দালির কাজ করতাম।”

ঠাকুর্দা অবাক। “তাই নাকি, তাই নাকি!” বলেন আর ভাবেন—বেশ, বেশ, খুব গল্প করা যাবে বাড়ী গিয়ে। নিজেরও একটু অহঙ্কার ফলাতে ইচ্ছে হয়! “প্লেভ্‌নার যুদ্ধে যখন সেণ্ট জর্জ পদক পেলাম, বুঝলে, জেনারেল স্কোবেলেভ তাঁর আর্দালি করে দিলেন আমাকে। গোলা ফাটে, বন্দুক ছোটে, আর তার মধ্যে আমাকে নইলে তাঁর কাজই হয় না। বলেন, জোরসে ঘোড়া চালিয়ে যাও আফনকা! সত্যি, বড় ভালবাসতেন আমাকে।...হুঁ, তোমার কনে তাহলে বড় ঘরের মেয়ে? গাঁয়ের কাজকর্ম করতে বড় কষ্ট পাবে তো...”

“না না গাঁয়ের কাজ ওঁকে করতে হবে না। কাজ করার লোক রাখব—ভগবানের আশীর্বাদে সেটুকু ক্ষমতা আছে আমাদের...”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে।...তাহলে এস, কন্যার নামে একটু পান করা যাক—মিষ্টি মেয়ের শুভকামনায় তেতো মদ—কি বল?” চোঁ করে গেলাস পার করে দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন ঠাকুর্দা, হলদে রংয়ের গোঁফজোড়াটা মুছে নিলেন হাত দিয়ে। - “আমার ছেলের বৌয়েরা আজকাল কী ভারী ভারী বস্তা তোলে, দেখলে অবাক হয়ে যাবে। ছেলেদুটো যুদ্ধে যাওয়ার পর ওদের দিলাম ঠেলে—যাও পুরুষের কাজ করগে যাও। তখন যদি বেটীদের দেখতে! খালি বলে, ‘ওরে বাবা, আমাব ঘাড় ভেংগে যাবে—বাবারে এবার হাত দুটো গেল, পা গেল, আর পারিনে!’ হাসতে হাসতে মরি!” অট্টহাসি হাসলেন ঠাকুর্দা, একেবারে বোকার মতো। “আরে মেয়েমানুষকে কি করে চালাতে হয় তা আমি খুব জানি। সাধে কি আর জেনারেল স্কোবেলেভ আমাকে ‘রমণীমোহন’ বলে ডাকতেন?”

হাসি চাপতে চাপতে হঠাৎ উঠে গেল মাত্রিয়োনা—পর্দার আড়ালে উনুনের

ওপর হাঁসের রোস্ট চাপানো, সেটা নিয়ে আসবে। আনত চোখে টেবিলের ধারে বসে থাকে কাতিয়া—শান্ত, নম্র। গ্লাসগুলো ফের ভরে নিয়ে আবেগের সুরে আলেক্সি বল্ল ঃ "আমরা কিন্তু ও কথা ভাবিনে, আফানাসি মশাই। বিয়ে তো কাল ইচ্ছে করলে কালই—কিন্তু নতুন বৌকে তো আর এই খুপরীর মধ্যে থাকতে বলা যায় না! একটি খাট—উনি আর মাত্রিয়োনা দুজনে কোনো রকমে গুটিশুটি মেরে শোন। আর আমি ঐ মেঝের ওপর।...গ্রামের পাঁচজন এম্নি ব্যাভার করে—যেন আমরা এ গাঁয়ের কেউ নয়। সত্যি বড় দুঃখু হয়।...জমিদার বাড়ীর ও পাশটা নিয়ে কেন যে এত আপত্তি, বুঝিনে। ওটা তো এখানে কোনো কাজে লাগছে না—পুড়েই যেত, দৈবাৎ বেঁচে গেছে। ওটা কি কেউ চায়? না কি জমিদার বাবু ফিরে এসে গাঁয়ের লোককে ধন্যবাদ দেবেন সেই আশায় সবাই বসে আছে?"

"কেউ কেউ এই রকমই মনে করে," বলে সায় দিলেন আফানাসি। উনি তখন মাড়ির সাহায্যে হাঁসের ঠ্যাংটা কায়দা করতে ব্যস্ত।

"স্বয়ং শয়তানও আসতে পারে, কিন্তু জমিদারকে আর ফিরে আসতে হচ্ছে না। যাকগে, ও কথা ছেড়ে দিন। পঞ্চায়েতের কাছ থেকে বাড়ী যদি আমি কিনে নিই, তাহলে তার দায় দায়িত্ব সবই তো আমাতে বর্তাবে।" ঝট করে ওর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানল মাত্রিয়োনা। কিন্তু সেটা আলেক্সির গ্রাহ্যের মধ্যে এল না, বরং দড়াম ক'রে টেবিলে এক ঘুঁষি মেরে সে বল্লঃ "ওটা আমি কিনবই, নিশ্চয় কিনব! ধৈর্য টৈর্য আমার পোষায় না, বুঝলেন।...ওহো...যাকগে...আজকের শুভদিনের জন্যে একটু কিছু...মাত্রিয়োনা, আমার বালিশের নীচে একটা কাগজের মোড়ক আছে, নিয়ে এস তো।" (ভ্রূভংগী করে মাথা নাড়ে মাত্রিয়োনা।) "না, না, নিয়ে এস, কিপ্টেমি কোরোনা। প্রাণের চেয়ে তো আর ওটা বেশী দামী নয়।"

মোড়কটা এনে দিল মাত্রিয়োনা। কাগজ টাগজ খুলে ফেলতে দেখা গেল, মোড়কের আসল জিনিষ একটা ঘড়ি, বার্নিশ করা ইস্পাতের রিপীটার ঘড়ি, সংগে ইস্পাতের চেন। ঘড়িটাতে একটু নাড়া দিয়ে তারপর কানের কাছে ধরল আলেক্সি।

"ঘড়িটা পেয়ে গিয়াছিলাম স্রেফ বরাত জোরে—কাকে দিতে হবে আগে থেকেই যেন জানতাম। দয়া করে ঘড়িটা পরুন আফানাসি মশাই, ভগবান আপনার ভাল করবেন!"

"একি, একি, তোমরা আমাকে ঘুষ দিচ্ছ নাকি?" কঠোর স্বরে বল্লেন আফানাসি; কিন্তু আলেক্সি যখন ওঁর হাতের ওপর ঘড়িটা রাখল তখন হাতটা কেঁপেই উঠল।

"না, না, এ আমাদের হৃদয়ের উপহার—আমাদের মনে আঘাত দেবেন না ঠাকুর্দা।...এরকম টুকিটাকি জিনিষ ডজন ডজন আছে আমার কাছে, মদের বদলে অমন কত জিনিষই যে জোগাড় করেছিল মাত্রিয়োনা। ঘড়িটা ঘণ্টায়

ঘণ্টায় বাজে, সেজন্যেই এটার দাম। ভোর বেলা আর মুরগীর ডাক শোনার জন্যে কান পেতে থাকতে হবে না। এই স্প্রিংটা চেপে রাখবেন, ব্যস ঠিক সময় ঘড়ি বেজে উঠবে—বুট পরে সোজা রওনা দেবেন গোয়াল ঘরে...”

“আ-হা-হা,” বিরাট হাঁ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ঠাকুর্দা—দন্তহীন মাড়ি দেখা যায়। “আ-হা-হা, এটা থাকলে রোজ সকালে বৌ দুটোকে তুলে দেওয়া যায়। ধুম্‌সী মাগীদের খালি ঘুম—এবার থেকে আর বেশী ঘুমতে হবে না!”

শুঁটকো ঘাড়ে গলাবন্ধ জড়িয়ে নিয়ে বুড়ো আফানাসি শীপস্কিন কোটটা গায়ে চাপালেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন টলতে টলতে। আলোটা কমিয়ে দিল মাত্রিয়োনা। তারপর ও আর কাতিয়া দুজনে মিলে টেবিল-টেবিল ধোয়া-মোছা সারল। আলেক্সি বসেই আছে।

“পুরোনো ভদকাটা কি খুব কড়া ছিল—না কি অনেকদিন মদ খাইনি বলেই এমন হচ্ছে?” কাঁপা গলায় আলেক্সি বল্ল। “মাত্রিয়োনা, যাও না বাইরে গিয়ে গরু-টরুগুলো একবার দেখে এসো না!”

মাত্রিয়োনা নিরুত্তর, ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি। একটু পরে মুচকি হেসে কাতিয়ার দিকে চাইল।

“আপনার তো কিছু হদিসই পাইনে ছাই,” বলে চল্ল আলেক্সি। “কেন, আমরা কি আপনার যোগ্য নই? না কি, আপনিই একেবারে হাঁদাকান্ত?”

মাত্রিয়োনার চোখের কড়া ইঙ্গিত পেয়ে কাতিয়া চুপ করে থাকে বটে, কিন্তু গাল দুটোতে মনে হয় আগুন ধরে গেছে।

“না হয় একটু কাঁদতেন, কিংবা অমনি আর কিছু করতেন তাহলেও তো বুঝতাম,” ফের বল্ল আলেক্সি। “আপনার মতো আর কাউকে দেখিনি, কখ্‌খনো দেখিনি, খোদার কসম! সবার সামনে বল্লাম ও আমার বাগদত্তা—তবু একটু কাঁপলও না, চোখ নামিয়ে বেমালুম বসে রইল! না, না, ও রক্তমাংসের মানুষ নয়, ও পরী, হ্যাঁ পরী, আলবৎ বলছি! এদিকে এস তো মাত্রিয়োনা। ছেলেপিলেগুলো পর্যন্ত ওকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখায় তাও কি বোঝে না! ‘লুটের সঙ্গে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে আলেক্সি—তাসের বাজিতে ওকে জিতে এনেছে মাখনোর কাছ থেকে,’ এ কথা তো সবাই বলে।......কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না ওর।......না হোক, তা বলে আমিও নির্বিকার থাকতে পারব না।” হঠাৎ ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিল আলেক্সি, “হ্যাঁ, ও আমার বাগদত্তা। কেউ সে খবর জানল তো আমার ভারী বয়ে গেল!”

বিবর্ণ মুখ কাতিয়ার। তোয়ালে আর প্লেট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বাইরে যাবে। কিন্তু মাত্রিয়োনা বাধা দিল, কাঁধের ওপর জোরে চাপ দিয়ে ধরে রাখল।

“জীবনকে কোন্ দিক থেকে ধরতে হয় তা তো আমরা শিখেছি...... জীবনে প্রথম নরহত্যা করেছি সে-ই ১৯১৪-য়।” ক্ষণস্থায়ী হাসি হাসল আলেক্সি। “বসে বসে দেখছিলাম গুঁড়ি মেরে মেরে জার্মানটা এগিয়ে আসছে। মাথাটা একবার তুলেছে, অমনি ট্রিগারে টান দিলাম—ব্যস থপ করে কাত হয়ে পড়ে

গেল। অনেকক্ষণ রইলাম অপেক্ষা ক'রে, ওর আত্মাটা দেহ থেকে বেরিয়ে উড়ে যায় কিনা দেখতে হবে। তারপর আজ পর্যন্ত কত লোককেই তো মেরেছি, কারও আত্মা কিন্তু দেখিনি কখনো।......আচ্ছা এবার ক্ষান্ত দেওয়া যাক......যা শিক্ষা দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ। পুরোনো বাড়ীর ছাইগাদার ওপর আমরা নতুন বাড়ী বানাব। প্রথমে কাঠের বাড়ী, তারপর ইঁটের, আর তারপর যে বাড়ী বানাব, তার ছাত হবে সোনার। আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করা কিন্তু উচিত নয়, একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভনা। আমি তো তোমাকে জোর করে রাখিনি। যদি খারাপ লাগে, আমার ওপর যদি ঘেন্না হয়—নিজের পথ দেখতে পার। বাগদত্তা! কী আমার বাগ্‌দানের মজা রে!......"

কাতিয়ার গালের ওপর ঠোঁট বুলিয়ে কানে কানে বল্ল মাত্রিয়োনাঃ "ও এখন মাতাল, বুদ্ধিশুদ্ধি কি আর আছে? ওর কথা গ্রাহ্যও করো না।......" দড়ির ওপর তোয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে পর্দার পেছনে চলে গেল কাতিয়া। টেবিলের পাশে কাত হয়ে বসেই আছে আলেক্সি—পায়ের ওপর পা, প্রকাণ্ড হাতটা ঝুলছে অবশের মতো, গর্তে-পড়া চোখের দৃষ্টি মেলে কাতিয়াকে লক্ষ্য করছে। ফিরে এসে ওর সামনে টুলের ওপর বসল কাতিয়া। আলেক্সির দৃষ্টি স্থির, তাতে মাতলামির চিহ্ন মাত্র নেই। চোখ নামিয়ে নিল কাতিয়া।

"এবার একটা বোঝাপড়া করার সময় এসেছে, আলেক্সি ইভানোভিচ," কাতিয়া বল্ল। "আপনাকে আমি খুব ভাল লোক বলেই মনে করি। এই যে একসঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে ঘুরলাম এতদিন, তার মধ্যে আপনার কাছ থেকে খাঁটি সহৃদয়তা ছাড়া আর কিছু তো পাইনি। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।...... এই মাত্র আপনি যেসব কথা বল্লেন, তাতে আশ্চর্য হইনি। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম একথা এবার উঠবে।......কিন্তু আলেক্সি ইভানোভিচ, এখানে আসার পর থেকে কি যেন হয়েছে আপনার। আপনি যেন একেবারে বদলে গেছেন......"

আলেক্সি আগে গলাটা পরিষ্কার করে নিল। তারপর শুধালঃ

" 'বদলে গেছেন' মানে? ত্রিশ বছর ধ'রে যে আমি সেই আমি, আর আজ আপনি বলেন বদলে গেছি......"

"আমার জীবনটা......বুঝলেন আলেক্সি, জীবনটা এতদিন যেন স্বপ্নের ঘোরেই কাটিয়ে এসেছি। আমি ছিলাম বাড়ীর আদুরে বেড়াল—নিষ্প্রয়োজন, নিরর্থক।......কেউ কেউ আমাকে ভালবাসতে এসেছে তা সত্যি—কিন্তু সে আর কি—একটুখানি বিরক্তি, সামান্য একটু হতাশা, ব্যস্‌ শেষ। যুদ্ধ এসে ঘিরে ধরার পর তবে স্বপ্ন ভাঙলঃ দেখি চারদিকে শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, বুভুক্ষা, যন্ত্রণা, আর উদ্বাস্তু.........। নিষ্প্রয়োজন আদুরে বেড়াল—ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করতে করতে মরে যাওয়া ছাড়া তার আর তখন উপায় কি? মরেই যেতাম, কিন্তু ভাদিম এসে বাঁচাল। বল্ল, এ জীবনের সমগ্র তাৎপর্যই তো আমাদের প্রেম। ওর কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু ও যা খুঁজতে গেল সে তো শুধু প্রতিহিংসা, আর সর্বনাশ।...... অথচ ওর হৃদয় ছিল কোমল, ছিল না? এ আমি বুঝতে পারিনে.........।"

(টেবিলের ওপর টিনের ল্যাম্প ঝুলছে; মাথাটা তুলে স্তিমিত শিখার পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাতিয়া।) "ভাদিম মারা গেল।......তারপর আপনি আমাকে কুড়িয়ে আনলেন।"

"কুড়িয়ে আনলাম!" হেসে উঠল আলেক্সি। চোখ দুটো কিন্তু কাতিয়ার মুখের ওপর বাঁধা, একবারও সরায়নি। "আপনি কি পথ-হারানো বেড়াল? তাই মনে করেন নাকি নিজেকে?"

"হ্যাঁ, আমি তাই ছিলাম। তবে আর থাকতে চাইনে। আমি ছিলাম পরী—না ভালো, না মন্দ, না রুশ, না বিদেশী!" ওর ঠোঁটের কোণা একটু কুঁচকে উঠল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ভ্রূভংগী করল আলেক্সি। "তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি রুশ মেয়ে। সাধারণ রুশ মেয়ে, ব্যস আর কিছু নয়। এবার থেকে তাই থাকব, আর বদলাব না। আপনাদের সংগে ঘুরতে ঘুরতে দুঃখের জিনিষ অনেক দেখেছি, যা ভয়ংকর তাও দেখেছি।......সব কিছু সহ্য করেছি, নালিশ করিনি।......একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে : গাড়ী থেকে ঘোড়াটোড়া সব খুলে দেওয়া হচ্ছে এমন সময় ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে কিছু লোক এসে পৌঁছল। মহা-উত্তেজনা তাদের মধ্যে। রান্নার হাঁড়ি ফুটছে, তার চারপাশে জমা হয়ে কী হৈচৈ আর হাঁকডাক......"

"শুনছ মাত্রিয়োনা? উনি সেই......"

"হাঁড়ির চারপাশে ভিড় বাড়ে। গল্প চলে : কে কত দারুণ লড়াই করে এল তারই কাহিনী। কে ক'টা মাথা কেটেছে, ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে একেবারে শত্রুর ঘাড়ের ওপর, হাতাহাতি লড়াই করেছে—সেই সব গর্বের কথা। হয়তো তার অনেকখানিই বানানো।......তবু ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিরাট, যা শক্তিমান......"

"উনি কোন্ ঘটনার কথা বলছেন বুঝেছ মাত্রিয়োনা? সেই যে ভের্খনি গাঁয়ে জার্মানদের সংগে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের কথা। সত্যি, সে এক দারুণ যুদ্ধ!"

"গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন আপনি, মনে আছে। আপনার কাছে যেতেই ভয় হচ্ছিল......।" ওর গলার সুরে ছেদ পড়ল, বিস্ফারিত চোখ মেলে কী যেন দেখছে—দূরে, বহু দূরে। "আগে এমনি ছিল। তারপর এখানে আসার সময় মনে মনে বল্লাম : একটুখানি জমির ওপর গতানুগতিক জীবন, সে আর নয়—এবার শুরু করব এক বিরাট জীবন, নতুন জীবন। কিন্তু এখানে কি আছে? শুয়োর আর মুরগি আর একফালি সব্জিক্ষেত, ওপারে কাঠের বেড়া; আর তারপর দিন হতে দিনান্ত—আশাহীন, বর্ণহীন।........" (কপালে রেখা ফুটল কাতিয়ার। স্তেপের পথে চলতে চলতে যে মহাস্বপ্ন মনে হয়েছিল প্রায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, সে স্বপ্নকে ভাষা দেওয়ার ক্ষমতা কোথায়!) "এখানে এসে মনে হল উৎসব যেন শেষ হয়ে গেছে।......আজ আপনি বলে দিলেন, ইচ্ছে করেই বলে দিলেন যে, আমি আপনার বাগদত্তা। ব্যস, হিসেব কষা সব সাংগ! তারপর? তারপর সন্তানের জন্ম দেওয়া......। আপনার বাড়ী হবে, পয়সা হবে, পরে

হয়তো বড়লোকও হবেন আপনি। এ আমি সব জানি, তাই তো ওসব পেছনে রেখে এসেছি। এমনি ছিল পিতার্সবুর্গে, মস্কোয়, পারীতে। আজ আবার তারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে এই ভ্লাদিমিস্কোয়ে গ্রামে?.........”

হাত দুটি অবশ হয়ে পড়ে আছে কোলের ওপর। উষ্ণ বাদামি চুলে সোজা সিঁথি, মাথাটি ঈষৎ হেলানো। দেহের সমস্ত ভঙ্গীতে কী যে অসীম ক্লান্তি—আলেক্সি আর সেদিকে চেয়ে থাকতে পারে না, মুহূর্তের মতো চোখ নামিয়ে নেয়......উড়ে চলে গেছে বুলবুল, হাতের মুঠিতে বেঁধে রাখা গেল কই?

মৃদু স্বরে ও বল্লঃ “আপনার মাথায় কিচ্ছু নেই, একাতেরিনা দ্মিত্রেভনা, সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। রক্তস্রোতে ভাসতে চান নাকি, আমাদের ঐ সেমিয়নের মতো? আপনার কথা শুনলে অবাক হতে হয়......যাই হোক, যেতে আপনাকে দেব না কিছুতেই......”

॥ তেরো ॥

দাশা আর ইভান ইলিয়িচ রেজিমেণ্টে ফিরে গেছে, খামার বাড়ীর এলাকার মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে সংসার পেতেছে। ঘরটার ঠিক পাশে সদর দরজার ওপারে তেলেগিনের অফিস। অফিসের মধ্যে আছে টেলিফোন, ক্যাশ বাক্স আর রেজিমেণ্টের পতাকা, খাপে ঢাকা। কুঁড়ে ঘরটা অবশ্য দাশার খাস জমিদারী। তার আসবাব হল ঃ লম্বা রুশ চুল্লী একটা—তাতে রান্না হয় না, স্নান হয়; কসাক মেয়েদের কাছ থেকেই স্নানের ঐ কায়দাটা শিখেছে দাশা—ভেতরে খড় বিছিয়ে দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে চুল্লীর মধ্যে। এ ছাড়া আছে ঃ একটা খাট, দুটো শক্ত বালিশ, পাতলা কম্বল একখানা (ইভান ইলিয়িচ শোয় গ্রেটকোট মুড়ি দিয়ে); পরিষ্কার ঢাকনা দেওয়া টেবিল একটা—ওখানে ওদের খাওয়াদাওয়া হয়; একটা ছোট ঝোলানো আয়না; দরজার কোণে ঝাঁটা একটা; আর চুণকাম করা চুল্লীর গায়ে একটা খাঁজের মধ্যে চীনেমাটির সেই বেড়াল আর কুকুরছানা।

দু বছর আগে প্রেমে যখন ওদের আধ-পাগল অবস্থা, তখনও ওরা ঘর বেঁধেছিল প্রায় এমনিভাবেই। সেই ঘরে ওদের প্রথম রাত্রের অভিজ্ঞতা—সে কথা কখনো ভুলতে পারবে না দাশা। ফ্ল্যাটটা নতুন, তার জানালার ওপরে বৃষ্টি-ভেজা কামেনো-অস্ত্রভ স্ট্রীট। ওর কুমারী মন তখন ধীর স্থির, প্রশান্ত; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ইভান যেভাবে জানালার ধারে বসে রইল তাতে ও বুঝতে পারল যে, সে সঙ্কোচে মরে যাচ্ছে। ও তাই ঠিক করেছিল যে, নিজেই অগ্রণী হয়ে ইভানকে সুখী করবে। “এসো ইভান,” বলে ওই ডাকল, তারপর দুজনে মিলে এল শোবার ঘরে। সেখানে মেঝের ওপর একটা প্রকাণ্ড ভাস-এ একরাশ মিমোসা ফুল—কী মিষ্টি গন্ধ! আলমারির দরজা খুলে তারই আড়ালে ও কাপড় ছাড়ল, তারপর খালি পায়ে মেঝের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে লেপের তলায়। গলা দিয়ে বার হয়েছিল একটি কথা এক নিশ্বাসে ঃ “ইভান, তুমি আমাকে ভালবাস?”

প্রণয়সম্পর্কের বিষয় নিয়ে ওর আগে দাশা অযথা অনেক মাথা ঘামিয়েছিল বটে, কিন্তু আসলে ও বিষয়ে ওর প্রায় কোনোই ধারণা ছিল না। সে রাত্রে ইভান ইলিয়িচের সঙ্গে আদানপ্রদানে ওকে ব্যর্থতাই অনুভব করতে হয়েছিল। যার জন্যে এত কবিতা, এত কাহিনী, এত গান—সে কি এই? এ তো সে যাদু নয়, যে যাদুর শক্তিতে আনন্দ আর অশ্রু দুই ঝরে পড়ে; কাতিয়ার ফ্ল্যাটে একা একা পিয়ানোয় বসে যে-যাদুর স্বপ্ন দেখে ও গানের মাঝখানেই

চমকে উঠে পড়েছে......মনে হয়েছে যে, শরীরটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ আর শীতল না হলে ফুটন্ত আবেগের বাষ্পে শ্বাসই বুঝি রুদ্ধ হয়ে যেত।......এ তো সে যাদু নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই দাশা গর্ভবতী হল। তখন থেকেই ইভানকে ও দূরে দূরে রেখেছিল, যদিও তার প্রতি ভালবাসা এতটুকু কমেনি। দিন যায় —একে একে নেমে এল শরৎকালের সেই ভয়ংকর দিনগুলি ঃ কুয়াশামলিন পিতার্সবুর্গের অন্ধকার আর ক্ষুধার যন্ত্রণা, খালের ধারে সেই দারুণ অপঘাত, অকালে প্রসব বেদনা, তারপর শিশুর মৃত্যু। আর তার সঙ্গে সঙ্গে শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা—এ জীবন শেষ হোক। এর পরই ওরা পৃথক হয়ে গেল।

এখন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে সব কিছু। আগের দিনের তীব্র, ধোঁয়াটে আবেগে মনে হত সবই যেন এক পরম রহস্য; কিংবা সবই যেন এক অজানা পুরস্কার—যাদুকরের রঙচঙা বাক্সে লুকিয়ে আছে, কিন্তু তারপর দুঃখযন্ত্রণার কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে দুজনে—তাই ওদের এখনকার অনুভূতি আগের চেয়ে অনেক জটিল, অনেক গভীর। অবশ্য অতিক্রান্ত পথের ইতিহাস পরস্পরকে শোনাবার সময় পায়নি এখনো। ওদের ভালবাসা এখন ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায়, কোথাও আর ফাঁক নেই। অন্তত দাশা তাই ভাবে। ভাবে ঃ নভেম্বরের ঝড়-ঝাপটার পর শীতের গোড়ার দিকে যখন প্রথম তুষার পড়ে (তাজা তরমুজের মতো কী সুন্দর গন্ধ সে তুষারে), তুষারে তুষারে হিমার্ত স্তব্ধতা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর বাতাস হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ, স্পর্শসংবেদ্য—তখনকার সেই বাতাসের মতোই আজ ওদের ভালবাসা। ইভান সব জানে, সব পারে—যে কোনো প্রশ্ন, যে কোনো সন্দেহ মিটিয়ে দিতে পারে। যাদুকরের রঙচঙা পেটিটা দাশার চোখের সামনে আবার ভেসে ওঠে। কিন্তু এবার আর তাতে এমন কোনো একরোখা অনুভূতি নেই যা একেবারে অভিভূত করে দেয়; অনাড়ম্বর জীবনের সুখদুঃখ দিয়েই সে পেটি এখন পরিপূর্ণ।

ইভানের চরিত্রের একটা দিক কিন্তু দাশা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, মেনেও নিতে পারে না। সে হ'ল ইভানের সংযম। রাত্রে শোবার সময় ইভান যেন রোজই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। জুতোটুতো খোলার পরও চুপ ক'রে বসে থাকে বেঞ্চের ওপর, দাশার দিকে ফিরতে চায় না। “ঘুমিয়ে পড় দাশা, লক্ষ্মীমণি”, বলে কখনো আবার খালি পায়েই উঠে দাঁড়ায়, ঠান্ডার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যায় অফিস ঘরে। যখন ফেরে তখন একেবারে পা টিপে টিপে খাটের ওপর ওঠে, অতি সাবধানে—একটা স্প্রিংও যেন না নড়ে! বিছানার এক কোণায় শুয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ঘুমে একেবারে অচেতন।

কিন্তু দিনের বেলায় বেশ হাসিখুশী। চঞ্চল রক্তের ছাপ লেগে গাল দুটি টকটক করে, সতেজ গতিতে ছুটে আসে ছুটে যায়—চুমু দ্যায় দাশার গালে, দাশার উষ্ক চুলে—কী ফর্সা আর কী মিষ্টি সে চুল।

"নমস্কার, ফের নমস্কার, শ্রীমতী কমান্ডার মহাশয়া! তা আপনার হালচাল ভাল তো?"

দিনে তিরিশবার এই প্রশ্ন।

কমিসার ইভান গোরা দাশাকে বল্ল—"এখান থেকে লোকজন সংগ্রহ করে রেজিমেণ্টে একটা থিয়েটারের ব্যবস্থা করুন।"

দাশা তো একেবারে থ'। বলেছিল ঃ "কী সর্বনাশ, থিয়েটারের আমি কী জানি?" কিন্তু গোরা শোনেনি, পিট থাবড়ে বলেছিল ঃ

"পারবেন. পারবেন, ভুল করতে করতেই তো শেখে লোকে! এর চেয়ে আরও কত শক্ত কাজ করেছেন—করেন নি? রোজকার একঘেয়েমি আর ভাল লাগে না। বিপ্লবের তেজ এনে দিন, এমন কিছু সৃষ্টি করুন যাতে আবেগ আছে. মানুষের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে!"

থিয়েটারের জন্যে কমিসারের মহা তাড়া। জারিতসিন কমিসারিয়েটে অল্প যা কিছু সাজসরঞ্জাম, উর্দিটুর্দি ছিল, তার থেকেই কাচালিন রেজিমেণ্টের অভাব পূর্ণ করা হয়েছে; রেজিমেণ্ট এবার শীঘ্রই যুদ্ধে যাবে, তার জন্যে তৈরী হচ্ছে। দিনে দু' ঘণ্টা করে রাজনীতিক শিক্ষা, তার ওপর কঠোর মিলিটারি কুচকাওয়াজের ক্লান্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্যেরা খুব অশান্ত হয়ে উঠছিল। খামার বাড়ীতে পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, তার গুণ যাবে কোথায়? মিটিং বসল।

সার্গি সাপঝকভ দেখল এত বছর চুপ করে থাকার পর এই সুযোগ—মনের মধ্যে যত আইডিয়া গিজগিজ করছে সব এই মিটিংয়ে ছাড়তে হবে। শুরু করে দিল ঃ থিয়েটারে বিপ্লবী পরিবর্তন চাই, অভিনেতা আর শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান সব ভেঙে ফেলতে হবে; ভবিষ্যতে থিয়েটার হবে—হয় খোলা ময়দানে, নয়তো পঞ্চাশ হাজার লোক ধরে এমনধারা বিরাট হলের মধ্যে—এক একটা গোটা রেজিমেণ্ট সে থিয়েটারে পার্ট নেবে, কামান ছুটবে, বেলুন উঠবে, ঝরঝর করে জল পড়বে—সত্যিকারের জলপ্রপাত থেকে। নায়কনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে কোনো বিশেষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর আর দরকার হবে না, জনসাধারণই নায়কনায়িকার অংশ গ্রহণ করবে। দু হাত মেলে দিয়ে (মনে হয় যেন আকাশে উড়তে যাচ্ছে) লালফৌজের সিপাহীদের ডেকে বলে সাপঝকভ ঃ

"ভবিষ্যতের নাট্যকার, তোমরা সব কোথায়?" ওর সব কথাই যে সিপাহীরা বোঝে তা নয়, তার ওপর এমন অসম্ভব তোড়ে কথা বলে যে সব কথা ধরাও যায় না—তবু প্রফুল্ল মনেই ওর কথা শুনে যায় তারা। "আমাদের এই সীমাহীন যুগের আধুনিক শেক্সপীয়র—তোমরা কোথায়? মার্বেলের বেদী থেকে নেমে এসো নতুন যুগের সফোক্লিস—শিল্প আর সৃষ্টির উৎসবে যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। মানুষের স্বরূপ এমন করে কি দেখতে পেয়েছ আর কখনো? ভাব-রাজ্যের যত মণি-মুক্তো ইতিহাস আজ দুহাতে ছড়াচ্ছে—এমন কখনো দেখেছ?"

বক্তৃতা শুনে দাশা তো আরও জড়সড়। কিন্তু পালাবার পথ নেই।

সাপঝকভের সঙ্গে জারিতসিন গেল—বই, ক্যাম্বিশ, রং এসব তো জোগাড় করতে হবে। কিছু কিছু পাওয়াও গেল। সাপঝকভের কাছ থেকে পরামর্শ আসে এন্তার, অজস্র—তার খানিকটা কাজে লাগে, কিন্তু বেশীর ভাগই একেবারে উদ্ভট। ঠিক হলঃ ভণিতা টনিতা বাদ দিয়ে এবার সোজাসুজি অভিনেতা অভিনেত্রী যোগাড় করে ফেলা যাক—শিলারের 'দস্যু' নাটক মহড়া দেওয়া আরম্ভ করতে হবে অবিলম্বে।

তেলেগিন খুব খুশী। অবিশ্যি থিয়েটার দেখার আশায় ততটা নয়; ও খুশী এই জন্যে যে শেষ পর্যন্ত একটা কাজ খুঁজে পেয়েছে দাশা, কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছে—এই ছুটছে, এই বোঝাচ্ছে, এই বকছে, কখনো ব বিরক্তির চোটে কেঁদেই ফেলছে—মহা ব্যস্ত দাশা। আগের দিনে দাশার অভ্যাস ছিল, নিজের আবেগ-অনুভূতির ওপরই মনটাকে অযথা কেন্দ্রীভূত করে রাখত: অন্তরের সারল্যে তেলেগিন এখন খুশী মনে কল্পনা করে যে, দাশার পক্ষে আর আগের সেই অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

রেজিমেণ্ট থেকে হুকুম দিয়েছে—আগ্রিপিনা, আনিসিয়া, লাতুগিন (পাছে বাদ পড়ে যায় সেই ভয়ে লাতুগিন আবার কমিসারের কাছে সশরীরে আবেদন করেছিল), কুজমা কুজমিচ, বাইকভ এবং আরও ক'জন গাইয়ে বাজিয়ে—এদের সবাইকে থিয়েটার পার্টিতে যোগ দিতে হবে।

সেই রাত্রে একটা গোলাঘরের মধ্যে বসে একটুকরো বাতির ক্ষীণ আলোয় নাটকটা সবাইকে পড়ে শোনাল দাশা। অসংখ্য শ্রোতার শ্বাসপ্রশ্বাসের বাষ্পে যেন কুয়াশা জমেছে, অভিনেতাদের ভাল করে দেখাই যায় না। উঠন্ত ঝোড়ো হাওয়ায় দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে বরফের ছাঁট আসছে। দাশার গলার স্বর পরিষ্কার—বেসনভের আবৃত্তির ধরণ যতটুকু মনে আছে তাই নকল করতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে বেসনভ কিভাবে পড়তঃ কালো ফ্রক কোটের সামনের দিকে একটা হাত গুঁজে দিত, তারপর শব্দ উচ্চারণ করত একেবারে নৈর্ব্যক্তিক সুরে—এক একটা শব্দ যেন এক একটা বরফের টুকরো; আর চারপাশে আরাম-চেয়ারে বসে গুরুভার শ্বাস ফেলতেন সাহিত্যিক মহিলাবৃন্দ, উদগ্রীব হয়ে শুনতেন বেসনভের আবৃত্তি।...

বইটার অনেক জায়গায় অনেক কাটছাঁট করা সত্ত্বেও মোটেই জমছে না—অর্ধেক দূর পর্যন্ত পড়তে না পড়তে দাশা তা বুঝতে পারল। হড় হড় করে পড়া শেষ করল কোনো রকমে। বই বন্ধ করার পর কেউ আর কথাই বলে না, অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। শেষকালে দাশা বল্লঃ

"এই, এই হল শিলারের 'দস্যু'—এটাই আমাদের থিয়েটার হবে......"

লোকেরা এবার সিগ্রেট জ্বালাল। লাতুগিন না কে যেন বল্লঃ

"লেখকের বুদ্ধি তো বেশ সূক্ষ্ম!"

এবার কুজমা কুজমিচ। পকেট থেকে সেও একটা বাতির টুকরো বার করে জ্বালাল, তারপর গিয়ে বসল দাশার পাশে।

“কমরেডস্, নাটকের পরিচয় দিলেন দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা। এবার আমি আপনাদের পড়ে শোনাই!” সে বল্ল।

দাশার হাত থেকে বইটা নিয়ে খুব জোরে জোরে পড়া শুরু করল। গলার স্বরে আর দেহের ভঙ্গীতে কখনো বা বুড়ো কাউন্ট মুরের পুত্রশোক ফুটিয়ে তোলে; কখনো আবার নাক কুঁচকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সাপের মতো ছোবল মারেঃ “প্রিয়তম পুত্রকে উৎপাটিত করে আনব পিতার হৃদয় থেকে—যদি লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে, সে শিকলও টুকরো টুকরো করে ফেলব—তা যদি না পারি তবে আমার মতো আহাম্মক যেন আর কেউ না থাকে। ... ওরে বিবেক! তুই চড়াই পাখীকে জুজুর ভয় দেখা গিয়ে। ... ভাসুক যে ভাসতে জানে, কিন্তু যে জানে না সে তলিয়ে যাক...”

কালসাপ ফ্রান্‌জ্‌ মুরের কুটিল গতি যেন শ্রোতাদের মনশ্চক্ষে বিসর্পিত। কিন্তু সহসা কুজমার কণ্ঠ আরও জোরে বাজে: টাকের ওপর চুল সমান করে নিয়ে হিংস্র ভঙ্গীতে মুখাগ্র কুঞ্চিত করে—মহান ক্রোধের দীপ্তি ঝলমলিয়ে ওঠে চোখ দুটোতেঃ “ওরে মানুষ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক কুমীরের গোষ্ঠী! তোদের মুখে প্রেম, আর হাতে ঘাতকের ছুরি—সে ছুরি বসিয়ে দিতে চাস অপরের বুকে।...... চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক সব! মহৎ প্রাণের ধৈর্য! তুমি এবার জ্বলে ওঠো, আগুনের মতো জ্বলে ওঠো! শান্ত মেষপাল! আর নয়, এবার তোরা সিংহ হ'!”

মৃদুশব্দে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আনিসিয়ার বুক থেকে। কী যাদু এই বইতে! বইয়ের লাইন ধরে ধরে ধীরে এগিয়ে চলেছে কুজমার আঙুল, আলোয় ঝকমক করছে বইয়ের পাতা—আলোর দিকে সোজা ঝুঁকে পড়ে লাতুগিন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে যে-গর্জন সে যেন কার্ল মুরেরই গর্জন; শ্রোতাদের গভীরতম অস্তিত্বে নাড়া লাগে, বিদ্রোহী কার্ল মুরকে তারা খুব ভাল করেই চিনতে পারে। আহা, অন্যায়ের বর্ণনা দিতে দিতে মুরের মুখে শব্দের সে কী ঘটা! হ্যাঁ, নাটক তো এই—একেবারে গোড়া ধ'রে টান মারে!

নিভু নিভু বাতির আলোয় কুজমা যখন কার্লের শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করল—বধ্যভূমিতে ভয়ংকর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও যে-কার্ল সেই গরীব দিন-মজুরটার কথা ভোলেনি—তখন আনিসিয়া আর আগ্রিপিনা কাপড়ে চোখ মুছছে। “একেবারে জীবন্ত”, মন্তব্য করল লাতুগিন। অবিশ্যি সবাই এ বিষয়ে একমত যে উত্তেজনার মুহূর্তে হলেও কার্লের পক্ষে তাঁর প্রিয়তম আমালিয়াকে একেবারে মেরে ফেলা ঠিক হয়নি—ওকে দলের মধ্যে রেখে ওর চরিত্র সংশোধন করলেই ঠিক হত। এখানে শিলারের লেখাটা একটু বদলে দিতে হবে—নইলে এই সামান্য খুঁতের জন্যে এত ভাল নাটকটা হয়তো লাল ফৌজের মনে ধরবে না, এমন কি খারাপ ফলও হতে পারে। অমনি তখুনি আমালিয়ার প্রাণদণ্ড মকুব—

নতুন কথা জুড়ে দেওয়া হল কার্লের মুখেঃ "যাও হতভাগিনী, ঘরে যাও!" তারপর কাঁদতে কাঁদতে আমালিয়ার প্রস্থান।

আমালিয়ার পার্ট করবে আর্নিসিয়া, আর কার্লের পার্ট লাতুগিন। ঘৃণ্য কালসাপ ফ্রান্জ্—তার জন্যে প্রথমে বাইকভের নাম করা হয়েছিল। কিন্তু ও যদি আবেগ সংযত করতে না পারে, তাহলে লোকে হেসে উঠবে, বিশেষ ক'রে ওর দাড়ি দেখলে হাসির চোটে ঘর ভেঙে পড়বে। তাই ফ্রান্জের পার্ট দেওয়া হল কুজমাকে। দাড়ি, জুল্ফি কামিয়ে ওর বয়স কমিয়ে ফেলতে হবে, সে হুকুমও জারি হয়ে গেল। ভানিন নামে আর একজন সিপাহীর গলাটা খুব জোরালো। সেই হবে বুড়ো, কাউণ্ট ম্যাক্সিমিলিয়ান ভন মুর। ক'জন নওজোয়ান সিপাহী আর আগ্রিপিনা—বাকী পার্টগুলো কাড়াকাড়ি করে নিল তারাই। পাটের ফেঁসো আর প্রদীপের তেল নিয়ে এল কে যেন, জ্বলন্ত মশালে গোলাঘর একেবারে আলোয় আলোময়। তখনই মহড়া শুরু হয়ে গেল।

দাশা ঘরে ফিরতে ফিরতে প্রায় সকালই, কিন্তু তবু সে বসে বসে ইভানকে মহড়ার বিবরণ শুনিয়ে চলে। ইভানের আসন খাটের ধারে—কাঁধে কোট, খালি পা—হেসে একেবারে কুটপাট।......

"কার্ল মুরের পার্টে লাতুগিন!" বলে ইভান ফের হাসিতে গড়াগড়ি। 'ওঃ আর হাসিও না বাবা......হতভাগাটা কার্ল মুর সাজতে চায় কেন তাও জান না? আর্নিসিয়াকে ভজছে যে।......ওদিকে শারিগিন আবার বলেছে ওকে দেখে নেবে।......ফ্রান্জের পার্টে কুজমা? বেশ মানাবে।......তা ওদের পোষাকআশাক কোথায়? আর্মির জামা পরে তো আর পশ্চার টশ্চার করা যাবে না! পেত্রোগ্রাদের এক ব্যারিস্টার এখানে খামার বাড়ীতে আটকা পড়েছে—দেখি, সাপ্লাইয়ের ম্যানেজারকে তার কাছে পাঠিয়ে দেখি, গোটা দুই ফ্রক কোট আর টেল কোট দিতে পারে কি না।"

"নাঃ, তোমাকে কিছু বলে সুখ নেই, সবতাতেই এমন ঘোড়ার মত হাস' দেখি, ছাড় এখন!"

বিছানায় উঠে দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল দাশা—স্বামীর দিকে পেছন ফেরা। চুল্লী নিভে গেছে অনেক আগেই, তাই ঘরটা খুব ঠাণ্ডা। ইভান যখন ওর চারদিকে বেশ ক'রে কম্বল গুঁজে দিচ্ছে, গ্রেটকোট দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে পা দুটো—তখন দাশা আধ ঘুমন্ত। ঘুম চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লঃ "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রেজিমেণ্টে এখন থিয়েটার ছাড়া কথা নেই। জার্মান সাহিত্যের 'ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ' যুগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সাপঝকভ বল্লঃ ঘুম-ভাঙা ঈগল পাখীর মতো শিলার আর গয়েটে আর ক্লিঙ্গার—ফরাসী বিপ্লবের দূরাগত বিদ্যুতশিখায় যে ঝড়ের ইংগিত, ও'দের প্রতিভার ঝঞ্ঝা-গর্জনেও তারই নির্ঘোষ। অম্নি শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন, বৃষ্টিধারার মতো অনর্গল—অষ্টাদশ শতাব্দীর ওপর বিশেষ এক বক্তৃতামালারই ব্যবস্থা করতে হল। রাত জেগে জেগে কী খাটুনি সাপঝকভের। কুপির আলোয় বসে বসে মন থেকে নোট করে আর ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে

যায়—বই তো নেই, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্যে আছে শুধু ঘরোয়া তামাক। লেকচারের সময় আবার প্রশ্নের গোলাবর্ষণ—রেড সৈন্যদের জ্ঞান পিপাসার আর অন্ত নেই। সাপঝকভ কোনো বিষয়ের উল্লেখ করেছে কি ব্যস—সবটা বলতে হবে। একবার প্রসঙ্গক্রমে ডিসেম্ব্রিস্ট শব্দটা বলে ফেলেছিল। আর যাবে কোথায়, ডিসেম্ব্রিস্টদের সম্বন্ধে যা জানে সব বলতে হল।

শ্রান্তি ক্লান্তি নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা শোনে সবাই। ঘুমে যদি কেউ ঢুলেও পড়ে, তখনি আবার উঠে বসে। এমনি যাদু দূর অতীতের সেই কাহিনীতেঃ অজানা ভিন দেশে তাদেরই মতো মানুষ সব বর্শার মাথায় লাল টুপি তুলে দিয়ে এগিয়ে এসেছিল দুনিয়ার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। পেটে ভাত নেই পায়ে জুতো নেই—তবু জয়লাভের অপরিসীম আগ্রহে তারাই সৃষ্টি করল নতুন নতুন সামরিক কৌশল। তারপর জয় যখন হস্তগত, তখন এল বন্ধন; সময় মতো যাদের মাথা কাটা হয়নি, এ বন্ধন তাদেরই সৃষ্টি।

"ও মাক্সিমিলিয়াঁ রবস্পিয়ের!" বক্তৃতা-ক্লান্ত ভাঙা গলায় আক্ষেপ করে সাপঝকভ। "জয় তো তোমাদেরই হত, বিপ্লবকেও তোমরা রক্ষা করতে পারতে! কিন্তু পারী টাউন-হল থেকে কমিউনের কালো ঝাণ্ডা যেদিন টেনে নামালে সেদিন তোমাদের কপালও ভাঙল......"

বাইরে উঠোনে মুরগি ডাকতে আরম্ভ করেছে। কমিসার ইভান গোরা এসে সিংহনাদ ক'রে জানিয়ে দিলঃ

"সূর্যোদয়ের বিউগ্‌ল বাজতে আর তিন ঘণ্টা আছে, কমরেড্‌স!"

দাশা প্রম্পট্‌ করছিল। অভিনেতাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলঃ

"থামুন, থামুন, কমরেড ভানিন—আপনি যে মরা মানুষের মতো পার্ট করছেন! জোর ক'রে ক'রে কাশেন কেন? যত সব স্বাভাবিকতাবাদী ঢং—দেখলে বিরক্ত লাগে। এ সব আবার শিখলেন কোত্থেকে? আরে, আরও প্রাণ চাই, আবেগ চাই।......নিন ফের গোড়া থেকে শুরু করুন।"

জারিত্সিন থেকে যে সব বই আসে তার মধ্যে একটা পত্রিকা দাশার চোখে পড়ল। "কায়ার বদলে ছায়া" নামে কুগেলের লেখা একটা প্রবন্ধ বার হয়েছে তাতে।

প্রবন্ধটার মূল বিষয়বস্তু হল আর্ট থিয়েটারের বিরুদ্ধে এক কড়া সমালোচনা। রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত অভিনয়-শিল্পীরা তাঁদের অত্যুগ্র প্রতিভায় কিভাবে দর্শকদের হৃদয় মন জয় করেছিলেন সে কথা উল্লেখ করে প্রবন্ধ লেখক বলেছেন : মূর্তিপূজোর মন্দির ছিল তখনকার থিয়েটার—তার যবনিকা দেখলে মনে হত যেন চন্দ্রদেবী তানিথের রহস্যময় অবগুণ্ঠন। হায়! সে মহা-অভিনেতৃগোষ্ঠী লোপ পেয়ে গেছে—তাঁদের শেষ উত্তরাধিকারী মামন্ত দাল্‌স্কি আজ ট্রাজেডিয়ানের অঙ্গসজ্জা ছেড়ে তাস-খেলায় হাত পাকাচ্ছেন। মানুষের প্রাণের মধ্যে যাঁরা সাড়া জাগাতেন—সেই মহাত্মাদের বদলে এখন এসেছেন মহা-

পণ্ডিত প্রযোজক মশায়; মঞ্চের ওপর মানুষের অন্তরাত্মার আর্তনাদ আজ আর ফুটে ওঠে না, তার বদলে প্রযোজকের কৃপায় দেখতে পাবেন—মন-মেজাজের একটুখানি টুকরো, ঢেউখেলানো পর্দা, সত্যিকারের কাঠের দরজা, আর সত্যিকারের মশার ডাক!......“না”, বলে সজোরে মন্তব্য করেছেন প্রবন্ধ-লেখক, “থিয়েটারকে হতে হবে রাক্ষসের মতো, ঝাঁকড়াচুলো রাক্ষস—আবেগে থরোথরো!” এই প্রবন্ধ থেকে কতকগুলো টুকিটাকি কাজের কথা টুকে রেখে দিয়েছিল দাশা—রিহার্সালে কাজে লাগবে।

আর সবাইয়ের থেকে একটু তফাতে বসে লাতুগিন আর আনিসিয়া পার্ট বলার জন্যে অপেক্ষা করছে। মহড়ার ক'দিনে আনিসিয়া একটু কাহিল হয়ে গেছে—অন্য মানুষের খোলস চড়ানো তো সহজ নয়! আমালিয়ার বাস্তব রূপ কি করে কল্পনা করবে তাই ভেবে ভেবে ও অস্থির—খিদে টিদে কোথায় পালিয়েছে, খাবার দেখলে রাগই ধরে যায়। শেষকালে একদিন বইতে একখানা ছবি দেখে খেই পেল—আমালিয়ার ছবি, পরণে চওড়া স্কার্ট, মুখে বিষাদের ভাব, গালে হাত রেখে বসে আছে। আনিসিয়া বহুক্ষণ ধ'রে ছবির দিকে চায়, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হঠাৎ মনে হল, পেয়েছি, সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি: শোকের বন্যা এসে যেদিন আমাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল সেদিন আর জ্ঞান ছিল না, চোখের জলে অন্ধ হয়ে ফিরেছি—শুধু এপথ আর ওপথ। লক্ষ্যহীন সে যাত্রা—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—পায়ে পায়ে ঠোকর বেজেছে—হাত বাড়িয়ে দিয়েছি শুকনো এক টুকরো রুটির জন্যে।......না, আমালিয়ার এ ছবি ঠিক নয়। যত সিল্ক আর যত মখমলেই মোড়া থাক আমালিয়া, সে যদি আমার মতো দুঃখ পেত, তা হলে যন্ত্রণায় হাত মোচড়াতো, এই এমনি করে এমনিভাবে চোখ তুলত আকাশের দিকে, আছড়ে ফেলত লেসের আস্তিন পরা বাহু দুটি!

এমনি করে ক্রমে ক্রমে আনিসিয়ার মধ্যে নবজীবন পেল আমালিয়া ভন এঙ্গেলরাইখ, কার্ল মুরের প্রেয়সী। গতকাল রিহার্সালের সময় লাল তারা মার্কা চুড়ো-তোলা টুপিটা খুলে ফেলে এলোমেলো চুলগুলো সমান করে নিতে নিতে টুলের ওপর বসে পড়েছিল আনিসিয়া, তারপর সবাইকে একেবারে নিস্তব্ধ ক'রে দিয়ে গলায় তুলেছিল মর্মভেদী সুরঃ

“ওগো তোমার পায়ে পড়ি! দোহাই ঈশ্বর, দোহাই স্বর্গের যত দেবদেবী ......শুধু একটি মিনতি রাখো আমার।......না, না, ভালবাসা চাইব না আর ......শুধু মৃত্যু চাই......পরিত্যক্ত, পরিত্যক্ত!......এই একটি কথার শব্দ কী ভয়ঙ্কর তা তুমি কি বুঝবে?.........”

সেদিন সকালে ড্রিলের সময় আনিসিয়া বড্ড অন্যমনস্ক; সেকশন লীডার তো ওকে অতিরিক্ত খাটুনির শাস্তিই দিতে যাচ্ছিলেন—নেহাত কমিসারের

হস্তক্ষেপে তিরস্কার ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন ও শান্তভাবে বসে আছে লাতুগিনের পাশে। ওর ডাগর নীল চোখে স্বপ্নের আবেশ, ঠোঁট দুটি কখনো থরো থরো, কখনো মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল—নিঃশব্দে শব্দ রচনা করে চলেছে।

"সাশা বলে একটি মেয়ে, ঝলমলে চোখ—তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল," চাপা সুরে লাতুগিন ওকে শুনিয়ে চলেছে। "আমার বয়স তখন সবে চোদ্দ, আর ওর সতের। টকটকে হলদে বডিস প'রে ছোট্ট শালটা গায়ে জড়িয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ও যখন মাঠ থেকে ফিরত—জানিনে কী যাদু থাকত ওর চলার ভঙ্গীতে না আর কিছুতে—মনে হত—যেন একেবারে বুকের মধ্যে লেপ্‌টে যাবে। কিন্তু ওর বাড়ীর লোকেরা ওকে বেচে দিল এক বুড়োর কাছে—শুকিয়ে ঝরে গেল সাশা আমার। আমার মতো মানুষ অস্থির হবে, তা দেখে তা হলে আশ্চর্য হও কেন?" ওর কথা শুনতে শুনতে রংয়ের আমেজ লাগে আনিসিয়ার গাল দুটিতে, মনে হয় কথা না তো যেন আদরের মৃদু স্পর্শ। "যে-জীবন আমরা খুঁজে ফিরি, সে এক অপরূপ জীবন—সে জীবন কেউ কোনোদিন চেনেনি, জানেনি—বুঝলে আনিসিয়া-মণি! আর ভাবি শুধু একটি মেয়ের কথা, যে মেয়েকে বুঝি স্বপ্নেও দেখতে সাহস হয় না......"

"অমন মেয়ে কোথাও নেই।"

"তুমি কি ক'রে জানবে? অমন মেয়ে আছে, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপে থাকে তারা।"

লাতুগিনের বৃষস্কন্ধ চেহারা, দূর-সন্নিবিষ্ট চোখ দুটি—সেদিকে চেয়ে কী যেন আবার থর থর ক'রে ওঠে আনিসিয়ার মনে, সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে উষ্ণ মেদুর অনুভূতি ঢেউ খেলে যায়। কিন্তু নারীসুলভ বশ্যতার মদালস ভঙ্গি আর নয়, সে সব দিন চুকে গিয়ে ভালই হয়েছে। এখন ও প্রফুল্ল মনে মুচকি হাসে, বলেঃ

"সে দ্বীপে গেছেন কখনো?"

"না গেছি তো কি হয়েছে? সমুদ্রের 'লগ'-এ তো সব লেখাই আছে।"

"সমুদ্রের কোন্ লগ?"

"ঐ যে, যে-বইতে সমুদ্রের যত আশ্চর্য কথা সব লেখা থাকে।"

"উঃ, কি গুল্-ই চালাতে পারেন আপনি?"

"তুমি যদি কান দাও তবে কত গল্পই তো বানিয়ে যেতে পারি—আনিসিয়া! থাকগে, এবার তোমাকে সত্যি কথা শোনাই। অতীতে একদিন দুরভিসন্ধি পুষেছিলাম তোমার সম্বন্ধে। কিন্তু একজন এসে শুনিয়ে দিয়ে গেল আচ্ছা করে। অস্থানে পায়খানা করলে তারই ওপর বেড়ালের নাক রগড়ে রগড়ে যেমন বেড়ালকে শেখায়—তেম্‌নি করেই আমাকে রগড়ে দিয়ে

গিয়েছিল সে দিন।......বেশ। মানুষই তো সৃষ্টিকর্তা। যে শিক্ষা পেয়েছি তার জন্যে ধন্যবাদ।......"

আবার ওর দিকে চায় আনিসিয়া, কিন্তু এবার তার দৃষ্টিতে বিস্ময়। লাতুগিন ওদিকে এত জোরে কথা বলে যে টেবিলের ওপর পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে দাশা তাড়া লাগালঃ এখানে মহলা চলছে, দয়া করে গোলমাল করবেন না!"

"আমি কারঝেনেৎস-এর লোক, সেখানে 'স্কপ্‌ৎসি'* বলে একটা জাত আছে", ফিস ফিস করে চালিয়ে যায় লাতুগিন। "তারা নিজেদের খোজা করে ফেলে, নইলে নাকি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি রোধ করতে পারে না। ওদের একজন আমাকে বলেছিলঃ 'নন্দনের পাখীকে স্বপ্নে দেখি কতবার, কিন্তু যখন চোখ খুলি তখন সামনে শুধু দৈন্য, শুধু অন্ধকার।' ওরা ভয়ানক পাজী, বৌগুলোকে মেরে মেরে একেবারে আধমরা করে ফেলে।......তারপর একদিন গিয়ে হাজির হয় তাদের ঘোড়ার ডাক্তারের কাছে—তার নাম আবার 'শ্বেত কপোত' বলে 'কত্তা, রক্ষা করো!' সেও অমনি ফুৎকারে নিঃশেষ করে দেয় ওদের ভেতরের আগুন—যেন বাতি নিভিয়ে দিচ্ছে। বলে, 'খোজা বেটা, এবার শান্তিতে ঘরে যাও—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক!'......না, না, আনিসিয়া তুমি দেখে নিও—যদি রক্তের সমুদ্রে ডুব দিতে হয়, তুষানলে ধিকি ধিকি জ্বলতে হয় তাও সই, কিন্তু নন্দনের মহাবিহঙ্গকে ধরবই আমরা—জীবনের শেষ প্রান্তে উড়ে চলে গেলেও ছাড়ব না ছাড়ব না......"

আবার দাশার পেন্সিলের ঠকঠক শব্দঃ

"কমরেড্‌স, কার্ল আর আমালিয়া, শেষ দৃশ্য, স্টেজ রেডি করুন......"

গোলাবাড়ীর চিমনির ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তুহিনশীতল প্রভাতের রক্তাভা সবে দেখা দিয়েছে, এমন সময় রেজিমেণ্ট হেডকোয়ার্টারের কুঁড়ের দরজার সামনে তুষারকণিকাচ্ছন্ন ঘোড়ার পিঠ থেকে একজন ঘোড়সওয়ার লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত। ইভান ইলিয়িচ নিজেই একেবারে দরজা খুলে হাজির। ইভানের হাতে একখানা চিঠি দিল লোকটি। সেদিনই আশেপাশের গোলাবাড়ী থেকে গাড়ীটাড়ী যা পাওয়া যায়, সংগ্রহ করে রেজিমেণ্ট চল্ল যুদ্ধযাত্রায়।

দন আর্মি কর্তৃক জারিৎসিন পরিবেষ্টনের চেষ্টা শুরু হয়েছে সেই আগস্ট থেকে—এবার তার তৃতীয় দফা। সাঁড়াশির আকারে শহরটাকে ঘিরে ফেলেছেন জেনারেল মামন্তভ। জেনারেল তাতার্কিনের তিনটি অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট আরও তিরিশ মাইল উত্তরে অতর্কিত আক্রমণ চালাচ্ছিল, ব্যূহ ভেদ ক'রে তারা এখন ভল্গাতীরে দুবভ্‌কা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

---

* এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খোজা 'করার রীতি আছে।

পরদিন আবার জেনারেল পস্তভ্স্কি পরিচালিত অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ—দক্ষিণে সারেপ্তার কাছে। দ্মিত্রি শেলেস্তের লৌহ ডিভিশন—তারই কয়েকটা ইউনিটের হাতে সারেপ্তা রক্ষা করার ভার ছিল। শেলেস্ত নিজে তখন নেই সেখানে। সমর পরিষদের সঙ্গে তার ঝগড়া—সমর পরিষদ হুকুম দিয়েছে যে খেয়ালখুশী মতো লুটেপুটে খেলে চলবে না, বিনা হুকুমে কিছু করাও চলবে না। এখন গ্রেপ্তারের ভয়ে শেলেস্ত মস্কো পালিয়েছে, সেখানে গিয়ে নালিশ জানাবে। লৌহ ডিভিশনে তো তুমুল উত্তেজনাঃ কেউ বলে শেলেস্ত একেবারে আর্মি কম্যাণ্ডার হয়ে ফিরে আসবে, দেখে নিও; আবার কেউ বলে, না, ওকে গ্রেপ্তার করে রেখেছে, সদলবলে জারিত্সিন চড়াও করে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে আমাদের। তবে একটা যে গুজব রটেছে, তাতেই বিশ্বাস বেশীর ভাগ লোকের; গুজব হল, শেলেস্ত নাকি আস্ত্রাখান চম্পট দিয়েছে, সেখানে এক স্বাধীন আর্মি তৈরী করছে। অমনি হাজার দেড়েক ঘোড়সওয়ার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাঁটা দিল, ভলগা পার হয়ে নদীর বাঁ-ধার ধ'রে ধ'রে চল্ল আস্ত্রাখানমুখো। এদিকে পস্তভ্স্কির সঙ্গে যুদ্ধে লৌহ ডিভিশন একেবারে ছত্রভঙ্গ—সারেপ্তা দখল ক'রে জেনারেল পস্তভ্স্কি এখন দক্ষিণ দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছেন জারিত্সিনের ওপর।

পার্শ্বদেশে এমনি ধারা আক্রমণের আশঙ্কায় দশম আর্মির সমর পরিষদ একটা 'শক গ্রুপ' গঠন করেছিলেন—যে গ্রুপ দ্রুত আঘাত করতে পারবে। দনস্তাভরোপল অশ্বারোহী ব্রিগেড আর সেমিয়ন বুদিয়নির অশ্বারোহী ব্রিগেড —এই নিয়ে সেই শক গ্রুপ। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের এক জায়গায় একটা ফাটল থাকায় দু-বাহিনী সম্মিলিত হতে পারেনি—আক্রমণের সবটা চোটই সামলাতে হয়েছিল দনস্তাভরোপল ব্রিগেডকে। এখন দলবলসহ বুদিয়নি দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, ওদের পাশে পৌঁছাতে হবে।

শক গ্রুপ যেখানে জমা হবার কথা, কাচালিন রেজিমেণ্টটাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। দূরদিগন্তে একটা ঘোলাটে আলো—সেদিকে লক্ষ্য রেখে হিমধরা কুয়াশার মধ্যে রেজিমেণ্ট মার্চ করে সারাদিন, তারপর একটুখানি থেমে আবার সারা রাত। ঐ আলোটা যেন সূর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ; ওর ডান দিকে স্তরে স্তরে মেঘ জমেছে, তারই মধ্যে তামাটে রং ছড়িয়ে সূর্য উঠল অল্পক্ষণের জন্যে।

বরফ-ঢাকা স্তেপের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলেছে তেলেগিন, ইভান গোরা আর সাপঝকভ। ওদের পেছনে অসংখ্য মালটানা গাড়ী—সারের পর সার—তাতে চড়েছে লাল ফৌজের লোকজন, কামানবন্দুক, মালপত্তর ইত্যাদি। সামনে দূরে অশ্বারোহী স্কাউটদের ছায়ামূর্তি। গোলাবর্ষণের ক্রুদ্ধ গর্জন হঠাৎ কানে এল—বেশী দূর নয়, কাছেরই শব্দ। দুই কমাণ্ডার আর কমিসার তিনজনেই অবাক। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা রেজিমেণ্ট থেকে অনেকটা এগিয়ে গেল, তারপর এক জায়গায় থেমে খাপ থেকে ম্যাপ বার করল—পরামর্শ করতে হবে। রেজিমেণ্টের

নির্দেশিত গন্তব্যস্থল তখন অনেক দূর, তবে গোলাবর্ষণের শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, রণাঙ্গন কাছে এসে গেছে। গন্তব্যস্থলের সঙ্গে ওদের আবার যোগাযোগ নেই—না টেলিফোন মারফত, না ডেসপ্যাচ রাইডার মারফত। অবস্থা যদি এমনি অনিশ্চিত থাকে তাহলে কখন সর্বনাশ হয়ে যায় কে জানে।

“হতভাগা স্তেপটার জন্যেই তো যত গোলমাল—প্রকাণ্ড চাদরের ওপর আমরা যেন ক্ষুদে পিঁপড়ে”, গোরা বল্ল। “এখনো যদি কসাকদের নজরে না পড়ে থাকি তবে জোর বরাত বলতে হবে।”

“নজরে পড়েছি তা ধরেই নিতে পারেন,” তেলেগিন বল্ল। “খোঁজখবর বার করার ওদের সব নিজস্ব কায়দা আছে, গোলাবাড়ী ছাড়ার পর থেকেই ওরা আমাদের ওপর নজর রেখেছে।”

লম্বা টুপিটা একেবারে ভুরু পর্যন্ত নামিয়ে এনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সাপঝকভ—যেদিকে স্কাউটরা আছে সেই দিকে।

সামনের গাড়ীগুলো তখন ওদের ধ'রে ফেলেছে—ঘামেভেজা ঘোড়াগুলো সব হাঁপাচ্ছে। ফৌজীরা যারা গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিল, তেলেগিন তাদের হুকুম দিল—ছুটতে ছুটতে পেছনে চলে যাও—চেঁচিয়ে, হাত নাড়িয়ে পেছনের সবাইকে বলে দাও লাইন সোজা ক'রে ঘন হয়ে দাঁড়াতে। তারপর মালটানা গাড়ীর মধ্যে দিয়ে পথ করে চল্ল তেলেগিন, দূর থেকে দেখে কুজমা কুজমিচ—ছেঁড়া ন্যাকড়া-কানি দিয়ে গলাটা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বসে বসে গাড়ী চালাচ্ছে। গাড়ীর মধ্যে একগাদা থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম, তার ওপর বসে আছে দাশা। তার মাথায় ঘোমটা, গায়ে শীপস্কিনের সাদা কোট। লাল টুকটুকে মুখখানি আর ঘুমজড়ানো চোখ দুটি দেখলে মনে হয় যেন বাচ্চা মেয়ে। বরফ থেকে আলো ঠিকরে আসে, তাই চোখটা কুঁচকে নিয়ে চীৎকার করে কি যেন বলছে তেলেগিনকে। কিন্তু চারদিকের হৈ-হল্লা আর চাকার ক্যাঁচকোঁচানিতে তেলেগিন কিছুই শুনতে পায় না। কিছু পরে দেখে আগ্রিপিনা, তিনজন ফৌজীর সাথে বসে আছে। সেও চেঁচাচ্ছে, আর দস্তানা-পরা হাত তুলে আকাশে সেই আলোটার দিকে ইশারা করছে। আকাশে আবার ওর কি দরকার? পেছন দিকে মাথা হেলায় তেলেগিন। আকাশের গায়ে মেঘের কিনারা থেকে সূর্যকিরণ নেমে আসছে—ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট; আর সেই মেঘের নীচে ছোট্ট কালো পাখীর মতো একখানা এরোপ্লেন, পরিষ্কার দেখা যায়।

এতক্ষণে সবারই চোখ পড়েছে। ঘোড়ার গায়ে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিয়ে পথ করে ছুটল তেলেগিন, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিল: "এদিক ওদিক ছেতরে পড়ো সবাই!" ওদিকে রেকাবে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ভীমকায় ইভান গোরার ভীমগর্জন: “প্লেনের ওপর গুলি চালাও।” একখানা মালটানা গাড়ী দুদ্দাড় শব্দে তেলেগিনের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তার ওপর দাশা, আতঙ্কে চক্ষু বিস্ফারিত। লাগামের এদিকটা দিয়ে ঘোড়া দুটোকে এন্তার চাবকাচ্ছে কুজমা কুজমিচ। হঠাৎ এক পশলা গুলির শব্দ, একেবারে বেতালা। এঞ্জিন ঝক ঝক

করতে করতে এরোপ্লেনটা মেঘের পেছনে সরে গেল, তারপর ওর পেট থেকে বেরিয়ে এল ডিম, ডিমের পর ডিম। ডিমগুলো শোঁ শোঁ শব্দে মাটির দিকে ছোটে—যখন ফাটে তখন শাদা বরফের ওপর কালো ধোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়, থামের মতো।

লাল ফৌজের অনেকের কাছেই এ এক নতুন আতঙ্কের অভিজ্ঞতা। কতকগুলো গাড়ী তো ছুটতে ছুটতে একেবারে স্তেপের মধ্যে বহু দূরে চলে গেল। এবার বিউগিলের লম্বা, টানা আওয়াজ—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্র হবার জন্যে ডাক দিচ্ছে। যারা নতুন রিক্রুট তাদের চোখ তখনও আকাশের দিকে, উদ্বিগ্ন মনে অনেকক্ষণ ধ'রে মেঘগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছে।

এখন যে কোন মুহূর্তে কসাকরা আসতে পারে। ধুরোয় ধুরোয় লাগালাগি ক'রে ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে চলছে গাড়ীগুলো। কামানের ওপর থেকে তেরপলের ঢাকা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমকোণী চতুর্ভুজ ধরণের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা, কামানগুলো তার মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। সূর্যাস্ত নাগাত দূরে আকাশের গায়ে একটা গোলাবাড়ীর সীমারেখা দেখা গেল। দুজন স্কাউট সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এল সাপঝকভ। সাপঝকভের উৎসাহ যেন আর ধরে না: তেলেগিন আর ইভান গোরা যেখানে ছিল সেখানে পৌঁছে ভিজে চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বল্ল ঃ

"সব ঠিক হ্যায়। গোলাবাড়ীগুলোতে কেউ নেই—এক মেয়েছেলে আর ছেলেপিলে ছাড়া। কসাকরা আছে আরও চার মাইল দূরে, ওর পরের গ্রামটাতে।"

"কসাক? কী সুখবরই শোনালেন!" চটে মটে বলে ওঠে ইভান গোরা। "বলি, আমাদের তারা গেল কোথায়?"

"জানিনে, সত্যি জানিনে। তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, আর গোলাবাড়ীতে তো তারা যায়ইনি......"

"গোলাবাড়ীটা দখল করতে হবে," তেলেগিন বল্ল। "কিন্তু হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

জলে ভর্তি নালা একটা, তার কিনারা বরাবর গোলাবাড়ী। সন্ধ্যেবেলা ওরা সেটা দখল করল। কুটীরগুলোর জানলার খড়খড়িতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সৈন্যরা হায়দরী হাঁক ছাড়ে ঃ "এই কে আছ, বেরিয়ে এস বলছি", তারপর ভেতরে ঢোকে। ঘরগুলো অন্ধকার, তবে বেশ গরম। বেশীর ভাগই খালি। ব্যতিক্রম মাত্র দু একটা—কোনোটাতে হয়তো মা, ছেলে কোলে করে বসে আছে; কোনোটাতে বা থুথুড়ে বুড়ী, চুলার পেছনে গুঁড়িশুড়ি মেরে কি বিড়বিড় বকছে। পুরুষরা সব পালিয়ে গেছে পাশের গাঁয়ে। তেলেগিন হুকুম দিল, ট্রেঞ্চ কেটে ঘাঁটি গাড়ো। রাস্তার দু মুড়োয় সার সার গাড়ী সাজিয়ে বেড়া তোলা হ'ল। সকালের মধ্যে যুদ্ধের লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া দরকার, তাই সন্ধ্যার আগেই তেলেগিন সাপঝকভকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল—দূর

পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে আসবে। জনকয়েক ভলান্টিয়ার সাপঝকভের সাথী।

তেলেগিনদের রাত কাটল উদ্বেগে উদ্বেগে। কসাকরা অবশ্য রাত্রে লড়াই করতে চায় না, তবে মহা ফন্দীবাজ তো, কখন কি করে বসে কে জানে। গ্রামের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত টহল দেয় গোরা আর তেলেগিন। পুকুরের ওপর বরফ তখনো তেমন নিরাপদ নয়, তবু তার ওপর দিয়েই চলতে হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। উত্তর-পূব কোণে কামানের গর্জন তখন স্তব্ধ। একটা হাওয়া উঠেছে ভিজে ভিজে, তুষারও কিছুটা কমেছে। পায়ের তলে আর বরফ গুঁড়োনোর শব্দ হয় না। চিন্তিত মনে তেলেগিনের পাশে পাশে চলতে চলতে গুম গুম শব্দে বলে উঠল গোরাঃ

“একেবারে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি, হ্যাঁ ফাঁদেই। রেজিমেণ্ট নিয়ে জায়গায়ই পৌঁছতে পারলাম না, কী লজ্জা! ওরা খুঁজছে আমাদের আর আমরা খুঁজছি ওদের—জগাখিচুড়ী যাকে বলে। তা দোষটা কার? বলুন, কার দোষ?”

“চুপ করুন, দোষ কারও নয়।”

“কার ঘাড়ে দোষ পড়বে সবার আগে? পড়বে আমারই ঘাড়ে। তা পড়াই উচিত! এমনি কমিসার যে, স্তেপের মধ্যে তার রেজিমেণ্টই নিখোঁজ! কী কান্ড!”

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল ইভান গোরা। ওর বুকের ধুকধুক শব্দটা পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আবার এক পশলা গুলির আওয়াজ—আচমকা শুরু হয়ে আচমকাই থেমে যায়। লোকে ঘুম থেকে জেগে উঠে দৌড়ে বাইরে আসে, অন্ধকারের মধ্যে তাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। আর সব নিস্তব্ধ।

“জওয়ানেরা একটু উত্তেজিত হয়ে আছে”, তেলেগিন বল্ল। “গোলাগুলির মধ্যে তো এর আগে আসেনি কখনো! আসুন একটু ধূমপান করা যাক!”

ভোর হবার ঠিক আগে ও একবার নিজের ঘরে গেল। কত লোক ঘুমচ্ছে, তাদের পা-টা ডিঙিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পৌঁছাল উনুনের ধারে। অন্ধকারের মধ্যে দাশার হাতের স্পর্শ। আঙুল দিয়ে ওর গালে মৃদু আঘাত করে দাশা, আর দাশার উষ্ণ করতলে মুখটা চেপে ধরে তেলেগিন।

“ঘুমোওনি যে?”

“জান ইভান, আমি কি ভাবছিলাম? এই গোলাবাড়ীতে যদি বেশী দিন থাকতে হয়, তাহলে এখানে খোলা মাঠেই ‘দস্যু’ অভিনয় করা যাক না? গ্রেট-কোট পরেই করা চলবে। মঞ্চসজ্জাই তো আর সব নয়......”

“তা তো নয়ই, দাশেংকা।”

“সকলের এত উৎসাহ, এখন একেবারে ছেড়ে দিলে বড় দুঃখ হবে।”

“ঠিকই তো। কাল একবার খোঁজ ক'রে দেখব—একটা আটচালা টালা কি আর পাওয়া যাবে না! আচ্ছা এখন ঘুমোও তো, লক্ষ্মী সোনা।”

আবার বাইরে। ভিজে হাওয়ার মধ্যে প্রাণ ভ'রে শ্বাস টানে। এত দীর্ঘ

দিন যে-সুখের জন্য আকুল হয়ে ফিরল, সেই সুখই যে আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে এ কথাটা আর ওর কিছুতেই অভ্যাস হয় না। ঐ ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, ওখানেই তো আজ সুখের বাসা; তপ্ত উনুনের ধারে শীপস্কিন কোটের নীচে ঐ তো সুখ......কিন্তু ধারণাটা ওর এখনো রপ্ত হয় না।

"মনে দুর্ভাবনা তাই ঘুমতে পারছে না......কিন্তু সে সব কথা তুলবেও না! আমাকে দেখে খুশী, শুধু সেইটুকুই জানিয়ে দিল—মিষ্টি হাতখানি বাড়িয়ে দিল।......দাশা আমার অপরূপ!"

অন্ধকারের মধ্যে দাশা ওকে খুঁজে নিয়েছে, আদর ক'রে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, অধর স্পর্শ করেছে—ভাবতেই তেলেগিনের অন্তর উত্তাল হয়ে ওঠে, কন্‌কনে হাওয়ার মধ্যেও মুখটা যেন জ্বলতে থাকে।......ভুল হয়নি তো? "না হে বন্ধু, না, ওসব আবোলতাবোল ছাড় এখন।......ও তোমার বন্ধু, নিশ্চয় বন্ধু। বিশ্বস্তও নিশ্চয়ই।......এও তো তোমার ভাগ্য......"

পেত্রোগ্রাদের অন্ধকারে সেই যে কত সন্ধ্যার কথা, সে আর ও ভুলতে পারে না। একটা কেক নয়তো একটু মিষ্টি—কী কষ্টে না যোগাড় ক'রে নিয়ে ছুটে আসত দাশার কাছে! কিন্তু কী প্রতিক্রিয়া জাগাত দাশার মনে? শুধু বিরক্তি আর আতঙ্ক, আর কিচ্ছু নয়।......ওর নিজের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যাতে ঐ প্রতিক্রিয়াই জাগে। এখনও নিশ্চয় আছে। ওঃ ভগবান, কী ভালবাসায় ওকে ভালবেসেছি, কী চাওয়ায় না ওকে চেয়েছি!

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ইভান গোরা এসে উপস্থিত। তার হাতটার সব একেবারে পকেটের ভেতর।

"ওরা যদি সাপঝকভকে ধরে নিয়ে থাকে?"

"হ্যাঁ, তা ধরতে পারে। সূর্য উঠলে আর একটা দল পাঠাব।"

"এ সব বহু আগেই করা উচিত ছিল, বহু আগে!" পকেট থেকে একটা হাত বার করে এনে নিজের কপালে ঘুষি লাগায় ইভান গোরা। "ওহে কমিউনিস্ট, তোমার ওপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করা হয়েছিল, তুমি তার সম্মান রাখতে পারনি! বিভ্রাট থেকে যদি কোনো মতে উদ্ধারও পাই তবু নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না কখনো।......আমার মতো কমিসারকে ঐ খামারের এক কোণে নিয়ে গিয়ে একেবারে চিরবিদায় দিয়ে দেওয়া উচিত—ইচ্ছে করছে তাই করি।"

"যদি দোষের কথাই বলেন তবে আপনার যা দোষ আমারও তো তাই, ইভান স্তেপানোভিচ।"

"না, না! যাকগে. আসুন একটু ধূমপান করা যাক!"

সার্গি সাপঝকভ আর তার পাঁচজন স্কাউট সারা রাত ধ'রে স্তেপভূমি চ'ষে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রটা কাছাকাছিই কোথাও আছে সেই রকম সূত্র টুত্র বার করতে পারবে—এই ওদের আশা। কিন্তু দুর্ভেদ্য স্তেপ সাড়া দেয় না। দেশলাই জ্বেলে

কম্পাসের সাহায্যে ওরা দিক নির্ণয় করল। খিদের চোটে ঘোড়াগুলো একেবারে ধুঁকছে। যে ঘোড়াটার পিঠে মেশিনগান, সেটা তো খোঁড়া হয়ে গেছে, খালি লাগামে টান মারছে। সাপঝকভ হুকুম দিল—ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম খুলে ওদের বাঁধন টাঁধন আলগা করে দাও। ওরা থলি থেকে ক'মুঠো গম নিয়ে টুপিতে ঢালল, তারপর ঘোড়াগুলোকে হাওয়ার দিকে পেছন ক'রে দাঁড় করিয়ে খাওয়াতে লাগল।

“কমরেড কমাণ্ডার, যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারছি না কেন তার কারণটা খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হয়”, বল্ল শারিগিন। চির-অভ্যাস মতো ওর প্রতিটি শব্দই বেশ সযত্নে নির্বাচিত। “তারা নিশ্চয়ই কোনো এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। (ঠাণ্ডার চোটে ওর ঠোঁটজোড়া প্রায় অবশ। “আমাদের দুই বাহু এখন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এসে পড়েছে, ওদিকে কসাকরাও তাদের লোকজন সব একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করেছে—এ রকম তো হতে পারে।”

“উঃ, কসাক, কসাক, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক কুমীরের গোষ্ঠী! চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক সব!” গম্ভীর বদনে বলে উঠল লাতুগিন। তিনজন জোয়ান ফৌজী—তারা কসাক গাঁয়ের মানুষ—তারা তো হেসে কুটপাট। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল শারিগিন :

“সব সময় ঠাট্টা মানায় না কমরেড লাতুগিন। বাচাল স্বভাব একটু কমাতে শেখো, গুরুতর ব্যাপারে ও সব চলে না।”

শান্ত স্বরে সাপঝকভ বল্ল :

“আচ্ছা, আচ্ছা, ওতেই হবে। ঝগড়া টগড়া কোরোনো বাপু!”

খেতে খেতে ঘোড়াগুলো মাথা নাড়ে, ঘণ্টার শব্দ হয় টুং টুং টুং টুং। স্কাউটদের পিঠে রাইফেল, তার নলের মধ্যে দিয়ে শাঁ শাঁ ক'রে বাতাস বয়ে যায়।

গম থেকে মুখ তুলে লাতুগিনের ঘোড়াটা ঘাড় নাড়ছে, যেন লাতুগিনকে সেলামই করছে। “চোপ শয়তান। খা এখন, আর ঢং করতে হবে না”, বলে চীৎকার করে ওঠে লাতুগিন।

খানিকক্ষণ আগের কথা। গোলাবাড়ীর কুয়োর ধারে লাল ফৌজের লোকজন জমেছে, তাদরে ডেকে সাপঝকভ বলেছিল—ক'জন ভলাণ্টিয়ার চাই, পর্যবেক্ষণের কাজে যেতে হবে। তখন প্রথম সাড়া এসেছিল শারিগিনের কাছ থেক : “আমি যেতে পারি।” অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে আর একটু কথা যোগ করেছিল : “কমরেড কমাণ্ডার, ভাববেন না যেন যে, আমি বাহাদুরি দেখাচ্ছি। আপনি তো জানেন, আমি যখন তরুণ কমিউনিস্ট তখন আমারই......”

লাতুগিনও তখন কুয়োর ধারে, কামানটানা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফৌজীদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা, গালগল্প করছিল এমন সময় শারিগিনের কথা শুনতে পেল। শারিগিনের মুখ লাল, উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। তাই দেখে লাতুগিন মনে মনে ভাবে : “তবে রে বেটা খেঁদা-নেকো, আমার ওপর

টেক্কা দিবি? সেটি হচ্ছে না......।” কাঁধ ঝাড়া দিয়ে একেবারে সাপঝকভের সামনে হাজির :

“আমাকে নেবেন, সার্গি সার্গিয়েভিচ? আমি এক্ষুণি গিয়ে ব্যাটারি থেকে ছুটি নিয়ে আসতে পারি......।”

সারা রাস্তা খালি শারিগিনের পেছনে লাগে—ফৌজীরা সব হেসে অস্থির। হুঃ শারিগিন আমাকে বাচাল বল্ল? কমাণ্ডার বকল? বকুক গে! টুপির মধ্যে ক'টা দানা পড়ে ছিল, সেগুলো মুখে পুরে দিল লাতুগিন!

“বন্দী টন্দী কিছু একটা ধরে আনা দরকার। এলোমেলো স্তেপ চষে বেড়িয়ে লাভ কি? কাউকে ধরে আনতে পারলে খবর পাওয়া যেত যুদ্ধটা কোথায় চলছে।”

“ঠিক বলেছ”, সায় দিল শারিগিন। “বেশ কাজের মতো কথা।”

“চড়ো, ঘোড়ায় চড়ো, কমরেড্স!”

ফের মাথায় টুপি চড়ায় সাপঝকভ। জিন লাগাম সব কষে নিয়ে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে। তখন অন্ধকার একটু কমেছে, তুষারের চোট বেড়েছে। ভোরের আগে যে সবুজ আলো ফোটে, ধূসর মেঘের কিনারে কিনারে তারই রং ধরেছে। জিনের ওপর গুঁড়িশুড়ি মেরে ফৌজীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে।

“থাম, থাম! ঐ যে ব্যাটারা আসছে!” তাড়াতাড়ি মাথার ওপর দিয়ে বন্দুকটা খুলে আনতে গিয়ে লাতুগিনের টুপিটাই উড়ে গেল। “ছ' জন! সাত জন!” লাতুগিনের জাহাজী চোখে দৃষ্টি প্রখর—ঐ অস্পষ্ট সবুজ আলোয় দূরে কোথায় আবছা আবছা মানুষ নড়ছে তা শুধু ওর পক্ষেই দেখা সম্ভব। “আরো ধেৎ, এদিকে নয়—” যে স্কাউটরা ওর কাছে আসছিল তাদের খিঁচিয়ে ওঠে লাতুগিন। “ঐ যে ঐদিকে দেখ, এখনো ভাল দেখা যাচ্ছে না।”

তাড়াতাড়ি মেশিনগানটা নামায় ঘোড়ার পিঠ থেকে। ইতিমধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে পেঁৗছে গেছে। ঘোড়সওয়ারদের অস্পষ্ট চেহারাও চোখে পড়েছে। আবছা আলোয় কী প্রকাণ্ড দেখায় ঘোড়সওয়ারগুলোকে।

“এই ব্যাটারা, বন্দুক নামিয়ে এদিকে আয়, চুপচাপ ধরা দে বলছি,” লাতুগিনের সে কী বীভৎস গর্জন। ঘোড়ায় চড়ার আদবকায়দা ও আর রাখল না, বন্দুকের নল দিয়েই বাড়ি কষাল ঘোড়ার গায়ে। ছুট, ছুট। ওর পেছনে শারিগিন, সেও ঘোড়া ছোটাচ্ছে। “ফিরে আয়, ফিরে আয়,” বলে প্রাণপণে চীৎকার করে লাতুগিন। কসাকগুলোও স্কাউটই নিশ্চয়। মুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তারা সব দে ছুট। জিনে বসেই লাতুগিন গুলী ছুঁড়ল, পর পর কয়েকবার। যে কসাকটা সকলের শেষে ছিল (বাকী সবাই তখন প্রায় নজরের বাইরে) তার ঘোড়াটা ঘুরে পড়ে গেল হঠাৎ, পড়তে পড়তে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচাল কসাকটা। অমনি চোখের পলকে লাতুগিন আর শারিগিন দুজনেই তার ঘাড়ের ওপর। ভূপতিত ঘোড়ার পাশে বন্দী কসাকের সংগে লাতুগিন ধস্তাধস্তি করে আর চীৎকার দেয় :

"কমরেডস্, তোমরা সব এদিকে এস।" যখন সবাই এসে পেঁছাল তখন কসাকের ওপর সওয়ার হয়ে বসে ও তার হাত মোচড়াচ্ছে প্রাণপণে। "লোকটা দেখতে ছোট্ট, কিন্তু গায়ে ভীষণ জোর......।" বরফে গাল থুবড়ে কসাকটা তখন মাটিতে পড়ে আছে, চোখ কুঁচকে আওয়াজ করছে ঘোড়ার মতো।

ওকে উঠে বসতে হুকুম করে সবাই মিলে ধাক্কাধুক্কি দিয়ে চিৎ করে ফেলল। কসাকের মুখ থেকে গালাগালি ছুটল অজস্রধারায়, বেছে বেছে যত খারাপ কথা আছে তাই লাগায়। ওকে এখুনি মেরে ফেলুক তাই যেন ওর ইচ্ছা। সাপঝকভের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ; তলোয়ারের খাপ দিয়ে কসাককে এক বাড়ি কষিয়ে চীৎকার করে উঠল, "খাড়া হো যাও!" মাথা তুলে পাগলের মত ওর দিকে চাইল কসাকটা, তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো চেহারা লোকটার, কাঁধ দুটো ঢালু মতো, আর বিরাট দাড়ি, বরফে বোঝাই।

"মুখ না তো নর্দমা। চুপ কর্ বেটা তালপাতার সেপাই!" চীৎকার করে ওকে বল্ল সাপঝকভ। "জানিস, তোর সামনে রেজিমেণ্টের কমান্ডার দাঁড়িয়ে? যা বলি জবাব দে!"

কসাকের হাত দুটো মুচড়ে পিঠমোড়া করে বাঁধা। বাঁধন দড়িতে টান মারতে মারতে দাড়িওলা মুখ ফিরিয়ে লোকটা চাইল—যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে। কটা কটা গোল গোল চোখ মেলে একের পর এক প্রত্যেককে দেখে নেয়। ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে ঃ

"তোমাকে তো চিনি!" যাকে বলছে সে লালফৌজের সেপাই—বেশ হাসিখুশী, লাল টুকটুকে চেহারা। "তুমি না কুর্কিনের আপন ভাগনে? ছি, ছি, তোমার লজ্জাও নেই।"

"মাইরী! আমিও তো চিনি তোমাকে—তুমি হচ্ছ ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ..."

"নমস্কার, ভাসিলিয়েভিচ মশাই!" লাতুগিন বলে। "আপনার সঙ্গে দেখা হল, খুব সুখের কথা।" শুনে হাসিখুশী সেপাইটা তো হাসিতে ফাটো ফাটো। "ওহে দাড়িবাবা, সারা রাত ধরে তোমাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোন্ রেজিমেণ্টের লোক তুমি? কোন্ কোর্?"

এবার ওকে সরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করল সাপঝকভ—তার হাতে ম্যাপ খোলা। কসাকটা প্রথমে জবাব দিতেই চায় না। কিন্তু পরে বোধ হয় ভাবল যে, কথা বলে বলে সময় কাটিয়ে দিতে পারলে রেড হারামজাদারা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, তখন উদ্ধারের কোনো কিনারা হতে পারে। তাই জবাব দিয়ে চল্ল। জেনারেল তাতারকিন কর্তৃক যুদ্ধ-সীমান্তে ফাটল সৃষ্টি, তারপর দন-স্তাভরপল ব্রিগেড কর্তৃক জেনারেলের অগ্রগতির পথে বাধা প্রদান—এ সব খবর জানা গেল ওরই কাছে। দুবভ্কায় ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, হোয়াইট আর রেড দু পক্ষই সেখানে সমস্ত শক্তি জড়ো করছে—সে খবরও ওই দিল।

একটা সূত্র হাতে এল এতক্ষণে। ঠিক হল, একজন পাহারার সঙ্গে কসাকটাকে রেজিমেণ্টের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বাকী সবাই এগিয়ে চলুক দুবভ্কা

মুখো. প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে কমান্ডার ইন চীফকে গিয়ে খবর দিল যে, কাচালিন রেজিমেন্ট এসে পৌঁছে গেছে। এই সব ঠিকঠাক হওয়ার পর হঠাৎ সবাইয়ের খেয়াল হল—কই শারিগিনকে তো দেখা যাচ্ছে না!

লাতুগিন ডাক দিল। "মিশকা, ও মিশকা! ঘোড়াগুলোর সঙ্গে ঘুমোচ্ছ নাকি?"

লাতুগিনের ঘোড়াটা ওখানে দাঁড়িয়ে, আলগা লাগামটা তার পায়ের নীচে। ঘাড় কাত ক'রে ঝিমোচ্ছে আর একটা ঘোড়া—সেটার পেটের তলা দিয়ে শারিগিনের পা দুটো দেখা যায়। পা দুটো কি রকম যেন কুঁকড়ে গেছে। মুখ থুবড়ে জিনটাকে দু হাতে ধ'রে আছে শারিগিন।

কাঁধে হাত দিয়ে শারিগিনকে কাছে টেনে আনল লাতুগিন। উদ্বেগের সুরে বলে উঠল, "মিশকা! কি হয়েছে ভাই?"

পেছন দিকে টলতে টলতে লাতুগিনের গায়ের ওপর ঝুপ ক'রে পড়ে গেল শারিগিন। ওর মুখ একেবারে ছাইয়ের মতো। গ্রেট কোটটা রক্তে ভিজে গেছে, বুক থেকে বেল্ট পর্যন্ত সবখানি। ধীরে ধীরে শারিগিনকে বরফের ওপর শুইয়ে দিল লাতুগিন। তারপর তার পেটের কাপড় সরিয়ে দেখল—ছোরার ঘায়ে গভীর ক্ষত হয়েছে পেটের ওপর, রক্ত পড়ছে তখনও।

"এ তোর কাজ ইয়াকভ, ওরে বেটা ইয়াকভ!"

নিজের গ্রেটকোট আর জামা দুইই খুলে ফেলল লাতুগিন, কলারের গোড়া থেকে শার্ট ছিঁড়ে একটা ব্যান্ডেজ বানাল। তারপর ক্ষিপ্র হাতে ব্যান্ডেজ জড়াতে লাগল শারিগিনের পেটের ওপর।

"সার্গি সার্গিয়েভিচ, ওকে তো গোলাবাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে।"

"কিন্তু কি ক'রে......"

"কি ক'রে? আমি নিজে নিয়ে যাব। বন্দীটাকেও ছাড়ব না, ওটাকেও নিয়ে যাব ঠেলতে ঠেলতে।"

শারিগিনের মুখ মড়ার মতো। হঠাৎ তার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। চোখের তারা ডুবে গিয়েছিল পাতার নীচে, এবার তাতে জীবন ফিরে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে আসে চেতনা, বিস্ময়, আর ভয় ঃ ওর এই তরুণ, মজবুত দেহ—যে দেহে কখনো অসুখ ও বোধ করেনি—সে দেহটা এমন ক্ষতবিক্ষত হল কি ক'রে? কি হল?......

"কমরেডস, এখন কি করি ভাই?"

"আরে বরফ খাও ভায়া, বরফ!" বলে এক মুঠো বরফ নিয়ে লাতুগিন ওর ঠোঁটের ওপর ধরল।

শারিগিনের বিলি ব্যবস্থা, তারপর খোঁড়া ঘোড়ার পিঠ থেকে মেশিন গান নামিয়ে অন্য ঘোড়ার পিঠে চাপানো—এই সব করতে করতে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। হাওয়া উঠেছে ঝড়ের মতো। হাওয়ার চোটে নীচে দিয়ে ছুটছে এলোমেলো মেঘগুলো—বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। ঠান্ডা, হিম সে বৃষ্টি। ওরা

সব তখন ভয়ংকর ব্যস্ত। দক্ষিণ দিক থেকে ভাসমান কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একদল অশ্বারোহী সৈন্য যে কাছে এগিয়ে আসছে তা ওরা লক্ষ্যই করেনি।

সারা স্তেপ জুড়ে ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট শব্দ। দুলকি চালে দুলতে দুলতে বেরিয়ে গেল সার সার অশ্বারোহী সৈন্য। তাদের পেছনে আর্টিলারি, তারপর মেশিন গানের গাড়ী, এক এক গাড়ীতে চার চার ঘোড়া।

ঘোড়ার লাগামে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে স্কাউটরা চেয়ে দেখে। তখন আর পালানোর সময় নেই, যারা যাচ্ছিল তারা ওদের দেখতে পেয়েছে। তাদের সামনের দিক থেকে জন কুড়ি ঘোড়সওয়ার দল ছেড়ে এদিকে ছুটে এল। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইল সাপঝকভ, দেখে লাতুগিনের মুখ গম্ভীর পাংশুবর্ণ, ধীরে ধীরে তলোয়ার বার করছে। হাসিখুশী মুখ সেই যে সিপাইটি—লক্ষ্যহীনভাবে সে বন্দুকে টোটা ভরছে—মনে হয় তার মুখটা যেন যন্ত্রণায় বিকৃত।

ঘোড়সওয়ার দলে যিনি সবার আগে, তাঁর মাথায় সুন্দর খাঁজকাটা শীপস্কিন টুপি, গায়ে কসাকদের কালো জোব্বা—জোব্বার নীচে ওঁর ছোট্ট ঘোড়াটা একেবারে লেজ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। চেঁচিয়ে কি যেন বল্লেন তিনি, আঙুল দিয়ে দেখালেন স্কাউটদের দিকে। সাপঝকভ বন্দুক ছুঁড়ল। কিন্তু জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে লাতুগিন ওর হাত চেপে ধরল।

"আরে হাঁদার মতো করেন কি? গুলী ছুঁড়বেন না, ওরা আমাদের পক্ষের!"

ঘোড়সওয়ার দল ছুটে এসে ওদের ঘিরে ফেল্ল। জোব্বাপরা লম্বা লোকটি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে সাপঝকভের ঘাড়ের ওপর, জামার গলা ধরে এমন ঝাঁকানি লাগালেন যে, ওর দু পা থেকেই রেকাব খসে গেল।

"চোখে দেখতে পান না?" বলে হাঁক ছাড়েন। "কে আপনি? কোন্ ইউনিট আপনার?"

সাপঝকভ একেবারে থ। গোঁফ উঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে জোব্বাওয়ালার সে কী রাগ—তলোয়ারের হাতল দিয়ে সাপঝকভকে দু ঘা বসান আর কি।

"আমরা কাচালিন পদাতিক বাহিনীর লোক", উত্তর দেয় সাপঝকভ। "যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি।"

"কী চেষ্টাই করছেন! যুদ্ধক্ষেত্র তো এইখানে, এই আপনার পায়ের তলায়," গোঁফওলা বল্লেন। রাগ একটু পড়েছে, ঝন্‌ঝন ক'রে তলোয়ারটা খাপে ভরলেন। "উঠুন, ঘোড়ায় উঠে আসুন আমাদের সঙ্গে।"

"দেখুন, আমাদের মধ্যে একজন আহত......"

"বাপরে বাপরে! আপনাদের সবাইই কি সমান বোকা? আপনার আহত লোককে ঘোড়ায় তুলে আর কারও সঙ্গে দিন—ঐ যে ঐ লম্বা চওড়া লোকটা, ওর সঙ্গে দিন," বলে লাতুগিনকে নির্দেশ করলেন। "আর এই বীরটি ইনি কে?"

"ওকে আমরা বন্দী করেছি।"

"আমার কাছে দিন ওকে" (সাপঝকভ আমতা আমতা করে বোঝাতে যায়—বন্দীকে রেজিমেণ্টে রাখাই নিয়ম।) "নাঃ আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার

ধৈর্যে কুলোবে না। ব্রিগেডের চীফ অফ স্টাফই আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবেন—বোঝার শক্তি যে আপনার খুব বেশী তা তো মনে হয় না।" কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে জুব্বাটা সোজা করে নিলেন, তারপর ঘোড়া হাঁকালেন। নেচে কুঁদে চলে ঘোড়াটা, ক্ষুরে ক্ষুরে বরফ ছিটকে পড়ে। বাকী আর সবাইও তাঁর পেছনে ঘোড়া ছোটাল। সকলের শেষে লাতুগিন, তার গায়ে ভর দিয়ে শারিগিন, আর সেই বন্দী কসাক। কসাকের হাতের বাঁধন খোলা। লজ্জায় আর দুঃখে ভ্রূকুটি ক'রে সে নীচের দড়ির দিকে চেয়ে আছে।

মূল অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধ-যাত্রার কায়দায় দ্রুত ছুটে চলেছে, বৃষ্টি আর কুয়াশা ভেদ ক'রে তাদের আর প্রায় দেখাই যায় না। এ কোন্ বাহিনী—সংগী ঘোড়সওয়ারদের জিজ্ঞাসা করল সাপঝকভ। প্রশ্ন শুনে তারা তো অবাক।

"তাও জানেন না? আরে এ যে বুদিয়নির ব্রিগেড, সেমিয়ন মিখাইলোভিচ বুদিয়নি!"

"ঘুম হল, দারিয়া দ্মিত্রভ্না? অমন শুকনো কেন মুখটা? সকাল থেকে খাওনি কিছু? আহা হা! আরে আমি যে গরু দুয়ে দুধ পেয়েছিলাম এক ঘটি। তোমার জন্যেই তো আনতাম, সত্যি আনতাম, কিন্তু ওরা সব খেয়ে ফেল্ল। ওর মধ্যে একটু রুটি গুঁড়িয়ে দিয়ে ব্যস ঢক ঢক—সব শেষ। আমরা তিনজনে মিলে। পেট একেবারে ফাটো ফাটো......"

কুজমার খুশী আর ধরে না। ওর মুখের দিকে চাইতে দাশার এখন বাধ বাধ ঠেকে—দাড়ি-গোঁফ কামানোর পর থেকে ওর মুখটা কেমন অশ্লীল অশ্লীল দেখাচ্ছে। ছোট্ট তড়বড়ে থুতনিটা, তারপর ঠোঁট দুটো, সব একেবারে উলংগ—মনে হয় যেন আবরণের প্রত্যাশায় চেয়ে আছে।......অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছে দাশার—কুঁড়ে-ঘর, গোয়াল ঘর কোত্থাও কেউ নেই তখন। বাতাসে বরফ গলার গন্ধ। আর আস্তাবলের। ছনের চালে থোকা থোকা কুয়াশা। পাশের উঠোন থেকে ওকে দেখতে পেয়েছিল কুজমা। অমনি ঝটাপট বেড়া ডিঙিয়ে এসে নাচ লাগিয়ে দিয়েছে। ময়লা, ছোট ছোট হাত দুখানা কচলায় আর নাচে—দাশাকে ঘিরে ঘিরে।

"পয়লা নম্বর ঃ সব ঠিক হ্যায়, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না।......তোমার কত্তা গেছেন পুকুরের ও পাড়ে। ইতিমধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে—তুমি বেঘোরে ঘুমোচ্ছিলে তাই কোনো শব্দ পাওনি। আমাদের শক্তি কত, যাচাই করবে ভেবেছিল কসাকগুলো। কিন্তু এমন বেড়ন বেড়িয়েছি বেটাদের—পালাবার আর সবুর সয় না—এক ছুটে নিজেদের গাঁয়ে ফিরে গেছে। আমাদের পরিখা কাটার কাজ চলেছে এখনও। ব্যাটারির ওখানে গিয়েছিলাম একবার—কার্ল মুর এখনো পর্যবেক্ষণ থেকে ফেরেনি। আনিসিয়াকে দেখলাম, জলের গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিল। ওকে দেখলে অবাক হতে—মুখে কুলুপ আঁটা, নাক উঁচু, আমার সঙ্গে কথাও

বল্ল না। এই হল অদ্যকার সংবাদ, সংবাদের সার। হ্যাঁ, তুমি এবার ঘটিটা নিয়ে গরম জল ভ'রে আন, তারপর আমার সঙ্গে এসো, দুধ দুইবে। মন আর শরীর দুইই যদি শান্ত করতে চাও তো গরুর বাঁট ধর। বিশেষ করে তোমার মতো স্বপ্ন-দেখা বুদ্ধিজীবী যারা—অমন শান্তির জিনিস তারা আর কোথাও পাবে না।"

দাশা হেসে ওঠে। ও কিন্তু জোর দিয়ে বলে চলেঃ

"শিলার টিলার ভাল কথা। কিন্তু এদিকে আমাদের গোলার মালিকরা যে গরু-টরু সব ফেলে পালিয়েছে—এখন ঘাস দেওয়া, জল দেওয়া, দুধ দোয়া, এসবও কি পড়ে থাকবে? না, সে তো ভাল কথা নয়। যাও, একটা ঘটি নিয়ে এসো।"

"আমি তো দুধ দুইতে জানিনে কুজমা কুজমিচ।"

"এ তোমারই যোগ্য উত্তর। তুমি তো কিছুই করতে জানতে না দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না, ছুঁচও ফোটাতে জানতে না। স্বামীটিকে হারাতে বসেছিলে—সেও ঐ জানতে না বলেই। যাই হোক, গরু আমরা দুইবই। তারপর তোমাকে শিখিয়ে দেব কি ক'রে খড়কুটোর আগুনে ডিম ভাজতে হয়। দুধ দিয়ে প্যানকেক বানানোও শিখিয়ে দেব। ইভান ইলিয়িচ আসবে খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে। আর তার সুন্দরী পত্নী অমনি একেবারে ফ্রাইং প্যানটি হাতে তুলে দেবেন—আঃ তাতে চর্বির কী কলকল শব্দ। ওটা খেয়ে শেষ করতে না করতে আর এক ডিশ, এবার—প্যানকেক! ওর সামনে বসে খাওয়াবে, মুখে থাকবে শান্ত মৃদু হাসি! সে হাসির রহস্য ও কি বুঝবে, ভাববে বুঝি 'মোনা লিসার' হাসি। আমাদের রেড আর্মি কমান্ডারদের স্ত্রীরা সব এম্‌নিই হয়, বুঝলে?"

কুজমাই জিতল। যদি একটা কিছু ঢোকে ওর মাথায়, তো তখন আর উপায় নেই, মেনে নেওয়াই ভাল! গোয়ালঘরটা আধো অন্ধকার। ঘাগরা গুটিয়ে গরুর পাশে বসল দাশা। গরুটা গোঁতায় না, লাথিও ছোড়ে না। দাশার পাশে উবু হয়ে বসেছে কুজমা। তার নির্দেশ মতো গরুর বাঁটটা দাশা প্রথমে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিল, তারপর খসখসে বাঁট ধরে টান লাগাল। ওর ভয় হচ্ছিল—বাঁটটা বুঝি ছিঁড়ে আসে! কিন্তু কুজমা সাহস দেয়, খালি বলে, "টানো, আরও জোরে টানো, ভয় কি?" চওড়া পাছাওলা গাইটা এদিকে মাথা ঘোরায়, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ে। উষ্ণ, সুমিষ্ট নিঃশ্বাসে দাশার সর্বাঙ্গ ঢেকে যায়। সরু ধারায় চুরুং চুরুং শব্দ ক'রে দুধ পড়ে ঘটির তলে, মনে আসে ছেলেবেলার কথা। এই সেই 'নীচের তলার' ভাষাহীন দুনিয়া, 'সুখী' দুনিয়া। এ দুনিয়া সম্বন্ধে এতদিন দাশার কোনোই ধারণা ছিল না। ফিস ফিস ক'রে সে কথাই জানায় কুজমাকে। পেছন থেকে কুজমা উত্তর দেয়, তেমনি চাপা সুরেঃ

"কিন্তু এ কথা যেন কাউকে বোলো না—যে শুনবে সে শুধু হাসবে। বলবে, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না মরমী দুনিয়া আবিষ্কার করেছে—গোয়াল ঘরে! তোমার আঙুল ব্যথা করছে নাকি?"

"ভয়ঙ্কর ব্যথা করছে!"

"তো দাও, আমাকে দাও!......" (ওর জায়গায় বসল উবু হয়ে।) "এই যে, এই রকম ক'রে করতে হয়। হায় রে রুশিয়ার বুদ্ধিজীবী! চিরন্তন সত্য খুঁজতে গিয়ে শেষকালে পেল কি না—গরু।......"

"আর তোমার নিজের বেলায় কি?"

"আমার?" রাগের চোটে ওর দুধ দোয়াই বন্ধ হয়ে গেল।

"গোয়াল ঘরে বসে দর্শন চর্চা!"

"দেখ চাঁদু, আমি হচ্ছি নামকাটা পাদ্রী, আমার সঙ্গে তর্ক করতে যেও না।"

ঘটিটা তুলে নিয়ে ঘরে ফিরল দুজনে। কুজমা গেল কাঠ চেলা করতে।

"দার্শনিকপনা তো শুধু মনে মনে জাবর কাটা। জোহান জর্জ হামান—সেই যে যাঁকে সবাই 'উত্তরের যাদুকর' বলে নাম দিয়েছে—তিনি বলেছেন: 'আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, কিংবা বাইরে যে সব বস্তু আছে তাদের অস্তিত্ব—কোনোটারই কোনো প্রমাণ হয় না: শুধু বিশ্বাসের ওপরই এগুলি নির্ভরশীল......।' তার মানে কি এই যে, যখন বিশ্বাস থাকবে না তখন বাইরে কোনো দুনিয়াও থাকবে না? তুমিও থাকবে না, আমিও থাকব না? বলতে চাও কি যে এই কাঠের টুকরোটা আসলে নেই-ই? আমরা কি শূন্যে ডিম ভাজবার আয়োজন করছি?"

কাঠের টুকরোগুলো উনুনে সাজিয়ে কয়েকটা জ্বলন্ত অঙ্গার খুঁচড়ে নিল, তারপর ফুঁ দিতে লাগল।

"জীবন-দর্শন অবিশ্যি আর এক ব্যাপার দারিয়া দেবী। জীবনের অনুশীলন করো, জীবনকে বুঝতে শেখো, দখল করতে শেখো।......উচ্চতর মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে জীবনের গতিতে যদি হস্তক্ষেপ না কর, তাহলে জীবন চলবে অসৎ পথে। আমি বেঁচে আছি এ কথা অবিসংবাদী সত্য—আর আমার কাছে এ সত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। গোষ্ঠীবদ্ধ জীব আমি, কৌতূহলীও বটি—তাই সব কিছু দেখতে চাই, বুঝতে চাই। আমাদের কপালে কি ঘটছে, চারপাশে কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই খুব শীগ্গির বুঝে ফেলতে পারব। এ সব তো আর আপনা আপনি ঘটছে না, বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে ঘটানো হচ্ছে—তবে বুঝতে পারব না কেন? আমাদের কমিসারকে কিছুতেই ধরতে পারছিনে। যাকগে, তার সঙ্গে তো আমার দরকার নয়—আমি চাই সেই অসামরিক পোশাক পরা লোকটির সঙ্গে কথা বলতে—বাস্তবিক কী মাথা তার (কার কথা বলছি তা তো জান)......! আচ্ছা দারিয়া দ্মিত্রেভনা, ঝট করে একবার উঠোনটা ঘুরে এস দেখি। উঠোনের ওমুড়োয় একটা গোলা আছে—কালই দেখলাম—বুদ্ধি ক'রে তার দরজার তালাটাও ভেঙে রেখে দিয়েছি। ওখান থেকে কিছু ময়দা নিয়ে এসো, এই দু তিন মুঠো..."

প্রাতরাশ তৈরী। মিনিটে মিনিটে দাশা ভাবে, ঐ বুঝি ইভান এল, কিন্তু কোথায় ইভান? তার বদলে হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল একজন সিপাহী—কাঁধে রাইফেল আর একগাদা কার্তুজ।

"কমাণ্ডার বলে পাঠালেন আপনাদের এখুনি রেডি হতে হবে। গাড়ীতে ঘোড়া জুতে মালপত্র যা আছে সব তুলে ফেলুন।" ওর নাকের ডগাটা একটু ছোঁক ছোঁক করে উঠল। টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে রাইফেল হাতে একেবারে উনুনের পাশে উপস্থিত। যতগুলো প্যানকেক হাতে ধরে ততগুলো তুলে নিয়ে মাফ চাওয়ার ঢংয়ে একটু নাক নাড়ল, তারপর প্রস্থান। চীৎকার করে ডেকে ওকে থামাল দাশাঃ

"ব্যাপার কি, কি হয়েছে কমরেড?"

"জানেন না? ঐ যে জানলার বাইরে একটু মুখ বাড়ান, তাহলেই দেখতে পাবেন।"

বলতে না বলতে ধম্ করে একটা গোলা ফাটল একেবারে পাশে, বোধ হয় উঠোনেই। ঘরের জানলার সার্সিটার্সি সব ফেটে চৌচির।

দেনিকিনের জেনারেলদের মধ্যে ব্যারন র‍্যাংগেলের বয়স খুবই অল্প। তাহলেও তিনিই কথাটা ধরিয়ে দিলেন যে, জারিতসিন দখল করতে হবে, তা না হলে চলবে না। সদর দপ্তরের বিশেষজ্ঞ অফিসারেরা তখন পরিকল্পনা তৈরী করলেন—ডিসেম্বর মাসে জারিতসিন অভিমুখে অভিযান পরিচালিত হবে। আক্রমণ-পরিকল্পনা আতামান ক্রাসনভের কাছ থেকেও অনুমোদিত হল। উত্তর ককেশাসে রেডদের যারা লড়াইয়ে হারিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল মাই-মায়েভ্‌স্কির ডিভিশন। এখন সেই ডিভিশন চল্ল দন আর্মির সাহায্যে। ডিভিশনের তখন শক্তি বেড়েছে—কর্নিলভ, মার্কভ আর দ্রজদভস্কির ডিভিশন থেকে বাছা বাছা জঙ্গী ইউনিট এনে এতে যোগ করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে দন আর্মির অবস্থা দুর্বল, ইউক্রেন থেকে আক্রমণ এলে ঠেকাবার উপায় নেই। উত্তর সীমান্তও তথৈবচ; মজবুত গোছের একটা রক্ষীদল সেখানে রেখে আসা হয়েছে বটে, কিন্তু শুধু তাতে আর কি হবে? তাই মাই-মায়েভ্‌স্কি চল্লেন দনবাস অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে—দন আর্মির পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করবেন। ওদিকে দন আর্মির পঞ্চাশ হাজার বাছা বাছা সৈন্য, তারা জারিতসিন অভিমুখে অভিযান করে চলেছে।

ইতিমধ্যে প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনাও তৈরী হচ্ছিল—লাল ফৌজের সদর দপ্তর সে পরিকল্পনার রচয়িতা। অষ্টম ও নবম রেড আর্মি তখন দন জেলার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত; পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে যে, এই দুই আর্মি দন নদীর দু ধার ধ'রে জেলার অভ্যন্তরভাগে অভিযান করবে। তারা ক্রাসনভের হোয়াইট কসাকদের ঠেলতে ঠেলতে এনে ফেলবে একেবারে দশম আর্মির বন্দুকের সামনে। আর জারিতসিন অঞ্চলে যে দন আর্মি আছে সেটাকেও ক্রমে ক্রমে নিকাশ করে আনবে। শত্রু বাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পর রেড আর্মিগুলি ডান পাশ ধ'রে ঘুরবে, একেবারে উল্টোমুখো; তারপর যাত্রা করবে পশ্চিমে নীপার অভিমুখে—পেৎলুরার দলবল সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে ইউক্রেন থেকে।

পরিকল্পনার সামরিক মানচিত্রে কতরকমের দাগ কাটা হয়েছে; রেখা, বিন্দু, বৃত্ত, সংখ্যা—সংকেতের একেবারে ছড়াছড়ি। কিন্তু ওর প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বিন্দুই যে শ্রেণী-সংগ্রামের এক একটি কেন্দ্র, আর সে শ্রেণী সংগ্রাম যে তার নিজস্ব নিয়ম ও সম্ভাবনা অনুসারে বেড়ে চলেছে—এই গুরুতর কথাটাই পরিকল্পনা-রচয়িতারা হিসেবে ধরেন নি। ভিন্ন ভিন্ন রেখা আর বিন্দুর মধ্যে তফাৎও যথেষ্টঃ কোনোখান থেকে আসবে শক্তি—রেডদের রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড, ডিভিশন সবই নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। আবার অন্যখানে শুধু ক্ষয়ই হবে, রেডদের সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে।

হেড কোয়ার্টারের রেড আর্মি সঞ্চালন পরিকল্পনা গৃহযুদ্ধ কৌশলের অনুপযুক্ত; উত্তর থেকে সরিয়ে তাঁরা আর্মিগুলিকে পাঠালেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দন, খোপার আর মেদ্‌ভেদিৎসা নদী পার হয়ে, একের পর এক কসাক গ্রাম অতিক্রম করে অগ্রসর হল রেড আর্মি। এ সব গ্রাম শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং আক্রমণের শক্তি হ্রাস পেতে লাগল, গতিবেগ মন্থর হয়ে এল। শত্রুপক্ষের তখন পাঁয়তারা কষবার খুব সুবিধা—পাঁয়তারায় সময় কাটিয়ে কাটিয়ে শত্রুবাহিনী পুনর্গঠিত হয়ে উঠল।

প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সমর পরিষদের একেবারে মর্মস্থলে বসে বিশ্বাসঘাতকতার গোপন হস্ত আবার এমন চাল চালল যে, হেডকোয়ার্টারের ঐ ভ্রান্ত পরিকল্পনাই মঞ্জুর হয়ে এল সমর পরিষদ থেকে। প্রথম দৃষ্টিতে ভুলটাকে খুব সামান্যই মনে হবে, কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল এ এক মহা বিপদ।

লাল ফৌজের প্রতি-আক্রমণমূলক ডিসেম্বর অভিযান তখন শুরু হয়ে গেছে। প্রথম প্রতি-আক্রমণ দনবাসের পূর্ব দিকে। ওখানকার শিল্প আর খনি অঞ্চলের শ্রমিকেরা সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে প্রায় পা বাড়িয়েই বসে ছিল, রেড আর্মি কবে আসে শুধু তারই অপেক্ষা। কাজেই যাত্রা শুভ। কিন্তু ততক্ষণে দক্ষিণ দিক থেকে এসে পৌঁছেছে মায়েভ্‌স্কির ডিভিশন, তারা সারা জেলা চষে বেড়ায়, যাকে পায় তাকে ধ'রে চাবুক লাগায় নয়তো ফাঁসি দেয়। লাল ফৌজের দক্ষিণ বাহু অরক্ষিত হয়ে পড়ল, কাজেই প্রতি-আক্রমণও স্তব্ধ হয়ে এল। এবারও আঘাতের সবটা চোট বইতে হল দশম আর্মিকেই—আগস্ট থেকে নিয়ে এই

দু পক্ষের শক্তি সমান নয়, তফাৎ অনেক। শত্রুসৈন্যদের রসদ ভাল, সাজসরঞ্জাম ভাল, সংখ্যাও বেশী—তাই আক্রমণের জন্যে তারা একেবারে তৈরী। আর এ পক্ষে নতুন সৈন্য গেল মাত্র পাঁচ হাজার—তারা কারখানার মজুর, জারিতসিনের শেষ সম্বল। শূন্য স্থান পূর্ণ করল বিপ্লবের সৃষ্টিশীল প্রেরণা।

ঘরে তৈরী বর্শা হাতে নিয়ে ১৭৯২ সালে যুদ্ধে নেমেছিল ফরাসী দেশের জনসাধারণ—ইয়োরোপীয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জের সুশিক্ষিত ফৌজকে তারা ঘায়েল করবে। তারা ভুখা, নাঙ্গা, তবু তারাই আবিষ্কার করল তোপ দাগার তুফানী কায়দা। তার ওপর যুদ্ধশাস্ত্রের সমস্ত নিয়মকানুন লঙ্ঘন ক'রে জমাট-বাঁধা পদাতিক

বাহিনী নিয়ে তারা আক্রমণে এগিয়ে গেল—সে আক্রমণের চোটে সম্রাট ফ্রিডরিশের সুবিখ্যাত চতুষ্কোণ ব্যূহও ভেঙে চুরমার।

আর এবার রুশ জনসাধারণের হাতে সৃষ্টি হয়েছে ঘোড়সওয়ার দল গঠনের নতুন কৌশল। সাল্স্ক্ স্তেপের বুদিয়নি ব্রিগেড তার উদাহরণ। তারা দুর্দান্ত সাহসী, কিন্তু শুধু সাহসই তাদের একমাত্র শক্তি নয়। তাছাড়া হোয়াইট কসাকরাও বড় কম যায় না, এক কোপে শত্রু অশ্বারোহীর মাথা থেকে জিন পর্যন্ত কেটে দু ফাঁক করে দিতে পারে। বুদিয়নি ব্রিগেডের আসল শক্তি তার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আর আনুগত্য। ইয়া গোঁফওয়ালা ঝাণ্ডাদারটি থেকে সুরু করে মালটানা গাড়ীর বুড়ো, দাড়িওলা পাহারাদার পর্যন্ত প্রতিটি লোকের ভক্তি-শৃঙ্খলাই ব্রিগেডকে শক্তি দেয়। এক এক গ্রামের লোক নিয়ে ওর এক একটা স্কোয়াড্রন, এক একটা ট্রুপ।* বাচ্চা বেলায় যারা ছিল খেলার সাথী, মাঠে মাঠে ফড়িং ধরে বেড়িয়েছে, আজ তারাই ঘোড়া ছোটাচ্ছে পাশাপাশি; যুদ্ধের সারিতে দাঁড়িয়েছে ছেলে-ভাইপো, আর বাপ-কাকারা সব সাপ্লাইয়ের মালটানা গাড়ীতে। তিনশো ঘোড়সওয়ারের ডিট্যাচমেণ্ট নিয়ে প্লাতভ্স্কায়া গ্রাম থেকে সেমিয়ন বুদিয়নি যেদিন যাত্রা শুরু করেন, সেদিন থেকে এই আজ পর্যন্ত একটি লোকও দল ছেড়ে পালায়নি।...দল ছেড়ে যাবে কোথায়? নিজের গাঁয়ে কি নিজের খামারে ফিরলে তো আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

ব্রিগেডের নিয়ম ছিল—নিয়মটা অবশ্য অলিখিত, ব্রিগেডের খাতায় এ নিয়ম পাওয়া যাবে না—নিয়ম ছিল যে, দুটো ক'রে কোর্ট বসবে। একটা সরকারী, আর একটা বে-সরকারী। যুদ্ধে যদি কেউ ভীরুতা দেখিয়ে থাকে, আদেশ অমান্য করে থাকে, কিংবা পাশের লোকের পকেটে হাতটাই ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে—তো তার বিচারের জন্যে সরকারী আদালত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীকে দণ্ডদানের ভার সৈন্যেরা নিজেদের হাতে তুলে নিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি কোথাও জমা হয়ে তারা বিচারে বসত। অমুক অবস্থা কি তমুক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারী আদালত হয়তো কোনো আসামীকে খালাস দিয়েছে, কিন্তু কমরেডদের কঠোর বিচারে তার রেহাই নেই। কমরেডদের আদালত থেকে রায় বার হবার পর আসামীকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলবে—কি জানি!

যুদ্ধের সময়ে এই ব্রিগেডের সৈন্য-বিন্যাসের কায়দাও একেবারে নতুন ধরনের। অবশ্য এ সব কায়দাকানুনও বাহিনীর বিধিবিধানের মধ্যে খুঁজে পাবেন না। কুম্ভাকার স্কোয়াড্রনগুলো পর পর দুটি ঢেউয়ের মতো আক্রমণে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘবাহু, অভিজ্ঞ খড়্গধারীরাই প্রথমে—এরা সাধারণত পুরানো আর্মির ঘোড়সওয়ার দলের লোক। এদের সাথে তলোয়ার লড়াইয়ের সময় প্রায়ই দেখবেন—

---

* অশ্বারোহী বাহিনীর অধস্তন সংগঠন। স্কোয়াড্রনে সাধারণত দু কম্পানী (১২০—২০০) সৈন্য থাকে।

শত্রুর ঘোড়া ছুটছে, পিঠে তার মনিবের দেহের নীচের অংশটুকু মাত্র। এমনি এদের তলোয়ারের কোপ। অব্যর্থ-লক্ষ্য বাছা বাছা বন্দুকধারী চলে এদের পিছনে—সামনের এক একজন সওয়ারের পৃষ্ঠরক্ষী হিসাবে এক একজন বন্দুকধারী। এইভাবে কমরেডদের বন্দুকের পাহারায় সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে ঘোড়া ছোটায় সামনের সারির সৈন্যেরা, একবার পিছু ফিরেও চায় না। তলোয়ারের চোটে তারা শত্রুব্যূহের মধ্যে পথ কেটে নেয়। এ বাহিনীর প্রতিটি ইউনিট চেতনায় সমৃদ্ধ। আর ইউনিটের পর ইউনিট এক সূত্রে গ্রথিত ক'রে বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ, সমগ্র আক্রমণ। শত্রুসৈন্য সংখ্যায় দু গুণ হোক, তিন গুণ হোক, বুদিয়নি বাহিনীর কেন্দ্রীভূত আক্রমণ রোধ করতে পেরেছে এমন উদাহরণ একটিও পাওয়া যাবে না।

খামারবাড়ীর কয়েক জায়গায় আগুন লেগে গেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট ছাতগুলির মাঝখান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ওঠে, অগ্নিশিখা জিহ্বা বিস্তার করে—ভাসমান, আনত মেঘপুঞ্জের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয় আগুনের ফুলকি আর জ্বলন্ত খড়ের টুকরো। পায়রার দল উদ্‌ভ্রান্ত—গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে আগুনের মাঝখানে পড়ে যায়। গোয়ালের ভেতর থেকে গরুগুলো হাম্বা হাম্বা করে। একটা ষাঁড়—দড়ি ছিঁড়ে, বেড়াটেড়া ভেঙে ছুটতে ছুটতে একেবারে রাস্তার ওপর। কী গাঁক গাঁক ডাক তার। ছেলেপিলে সাপটে ধ'রে জ্বলন্ত ঘরের ভেতর থেকে মেয়েরা দৌড়ে আসে—পালাবার পথ খুঁজছে। গ্রামের ঠিক ওপারে কতকগুলো ঢিবি আর ছোট ছোট পাহাড়—সেগুলোর আড়াল থেকে কসাক কামানশ্রেণী অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে।

দুপুর বেলা কসাক সৈন্যদের প্রথম দেখা গেল; কিছু দূর অন্তর অন্তর কালো কালো বিন্দুর মতো তারা এগিয়ে আসছে। জ্বলন্ত খামারবাড়ীটা ঘিরে ফেলে কাচালিন রেজিমেণ্টের সৈন্যদের সব আগুনের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাবে এই তাদের ইচ্ছা। তাড়াতাড়ি গড়খাই খুঁড়ে তার মধ্যে স্থান নিয়েছে কাচালিন রেজিমেণ্ট। খামারবাড়ীর এক মুড়োয় কামারশালা, সেখান থেকে গড়খাই আরম্ভ। তারপর পুকুরের পাড় ধ'রে (হাতবোমা দিয়ে পুকুরের জমাট বরফ ভেঙে দেওয়া হয়েছে) চলতে চলতে উইণ্ডমিলের দিকে বেঁকে গেছে গড়খাই লাইন। উইণ্ডমিলটা একটা ঢিবির ওপর।

ঘোড়ায় চড়ে গড়খাই লাইন বরাবর চলেছে তেলেগিন আর গোরা। ওদের ঠিক পেছনে আগ্রিপিনা, কমিসার সাহেবের আর্দালি। তার মাথার ওপর শীপস্কিনের টুপি, ইয়া বাঁকা! বাঁকানোর কায়দাটা ও কসাকদের কাছ থেকে শিখেছে। আর টুপিতে খাঁজেরই বা কি বাহার! চলতে চলতে ওরা মাঝে মাঝে থামে— কখনো মেশিনগান স্কোয়াডের কাছে, কখনো বা কোনো প্লেটুনের কাছে। সরু সরু গড়খাই, কোমর পর্যন্ত উঁচু। তারই মধ্যে গুঁড়ি সুঁড়ি

মেরে বসে আছে সবাই। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। তেলেগিন দিব্যি গৌরকান্তি, হাসি হাসি মুখ। সারা রাত্রের ঝামেলার ফলে গোরার মুখটা অবিশ্যি কালো দেখায়, চোখ দুটোতেও কালি পড়েছে—তবু পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে বলে সেও এখন বেশ শান্ত। জিনের ওপর নড়ে চড়ে বসতে বসতে দস্তানা পরা হাত দিয়ে তেলেগিন মাঝে মাঝে ঠোঁট মোছে—মনে হয় যেন মুখের হাসিটাই মুছে ফেলতে চায়। কথা বলে গোলা ফাটার শব্দের ফাঁকে ফাঁকেঃ

"কমরেড্‌স্‌! শত্রুকে বেশ মোক্ষম ঘা দেওয়ার সুযোগ এসেছে। ভয় কোরো না, একদম শান্ত হয়ে গুলি চালাও। যাকে মারবে আগে থাকতে তাকে লক্ষ্য করে নেবে—যেন একটার বেশী বুলেট খরচ না হয়। কমিসার আর আমি, আমরা দুজনেই তোমাদের কাছ থেকে এমনি ধারা গুলিচালনাই দেখতে চাই। সংগীন আক্রমণের হুকুম শুনলে এক সঙ্গে সবাই মিলে চার্জ করবে—আক্রমণের পেছনে জান একেবারে ভ'রে নিতে হবে। ...কোনো অবস্থাতেই পিছু হটা চলবে না—এই আমার আদেশ।"

মাথা হেলিয়ে আওয়াজ তুল্ল কমিসার ইভান গোরাঃ

"কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ! বিশ্বের ধনবাদ ধ্বংস হোক!"

তারপর আবার আর একটা দলের কাছে। রোঁদ শেষ করে উইন্ডমিলের সামনে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। রাত্রিবেলা পাশের গ্রামে আরও বহু কামান ও সৈন্য আমদানী হয়েছে—সে খবর স্কাউটরা তখন পৌঁছে দিয়ে গেছে। কসাকদের আক্রমণ একেবারে বেপরোয়া। বোঝা যায় যে, তারা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক তখনি কাচালিন রেজিমেণ্ট হঠাৎ গোলাবাড়ীতে এসে হাজির হয়ে গেছে—এর জন্যে ওরা প্রস্তুত ছিল না। তাই একেবারে একঘায়ে রেডদের সাবাড় করে ফেলবে, এই বোধহয় ওদের ইচ্ছা।

উইন্ডমিলের ছাতের ফাঁকে বাতাস হিস্‌ হিস্‌ করে, কাঠের চাকায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়। মিলের ভেতরটাতে ইঁদুর আর ময়দার গন্ধ—বেশ ঘর ঘর আবহাওয়া। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইভান গোরা। এক জায়গায় দেওয়ালের কাঠ ফাঁক হয়ে গেছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে পূবে স্তেপের দিকে বার বার চেয়ে দেখে—সার্গি সার্গিয়েভিচ এল কি? নীচে টেলিফোনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন হুকুম শোনাচ্ছিল তেলেগিন। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে একেবারে ওপরে। দূরবীণ চোখে লাগিয়ে মহা ফূর্তিতে হাঁক ছাড়েঃ

"এখানেও আমরা জারিতসিন কায়দায় লড়ছি!"

"চুলোয় যাক আপনার কায়দা ফায়দা, এদিকে যে একেবারে ঘিরে ফেল্লে। ......হ্যাঁ, আর ওকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে, নিশ্চয়—দুটো তো বেজে গেল।"

"হুঃ, সার্গি সাপঝকভকে মারা অত সহজ নয়!"

"অত ফূর্তি কিসের?"

"আরে দাদা, লড়াইয়ের সময় তো মনে ফূর্তিই দরকার!"

ঝাড়াই করার জায়গায় মেঝেতে খড় ছিল, আগুন ধরে গেছে। মাটির ওপর

ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। ধোঁয়া ভেসে চলে কসাকদের ওদিকে। এবার লোকের চেহারা বোঝা যায়, থেমে থেমে দৌড়ে দৌড়ে এখানে ওখানে লোক এগিয়ে আসছে দেখা যায়। ওদের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রেডদের সামনের লাইন পিছু হটল. আশ্রয় নিল গড়খাইয়ের ভেতর। কাচালিন রেজিমেণ্টের গোটা লাইন তখন জ্বলন্ত গোলাবাড়ীর সীমানা ধ'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে গেছে—দেখতে অনেকটা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো। সারা লাইনের ওপর হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে এল।

"আঃ হা! ওরা যে শুয়ে পড়ল!" তেলেগিনের চীৎকার। "ওদের আর সহ্য হচ্ছে না—একেবারে কাঁচা তো! দেখুন. দেখুন, সব লাইনই যে শুয়ে পড়ছে!......যান তো ইভান ভাই. এক ছুটে ওদের বলে আসুন তো—হ্যাঁ. এমন ক'রে বলবেন যাতে বেশ বুঝতে পারে—বলে আসুন যে. ওরা যেন গুলি চালানো শুরু না করে!......আমার হুকুম না পেলে একটি গুলিও ছোঁড়া চলবে না, বলে দেবেন!"

"কমিসার আসছেন!" ভয়ের ঢং ক'রে হাঁক দেয় বাইকভ। "আপন আপন জায়গা পাকড়ো!"

কামানের প্রথম স্কোয়াডে আছে বাইকভ. জাদুইভিতের. গাগিন আর আনিসিয়া। আনিসিয়া বারুদওয়ালী। লাফিয়ে উঠে ওরা সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়ায়। একটা মাট-কোঠার পোড়া দেওয়াল. তার ওধার থেকে বেরিয়ে এল ইভান গোরা। তার ঠিক এক পা পেছনে আগ্রিপিনা। ব্যাটারি-রক্ষী স্কোয়াডের কাছে যাবে দুজনে। ফৌজের লোকদের সংগে ইভান গোরা কথা বলে. আর এটেনশন হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আনিসিয়া—সোজা. টান-টান ঠিক ধনুকের মতো। ওর হাতে খোলা রিভলভার. রিভলভারের মুখ অবশ্য নীচের দিকে।

"......বিশেষ হুকুম ছাড়া কেউ একটি গুলিও ছুঁড়বে না!" ইভান গোরার গলার শব্দ গম গম করে। "হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি কমরেডস্. যে হুকুম অমান্য করবে তাকে গুলি ক'রে মারা হবে. তখুনি।"

বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়ে বাইকভের দাড়ি ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। দাড়ি নেড়ে সে বলেঃ

"ভাইসব. ইস্তিরিটিকে দেখেছ তো. ঐ যে রিভলভার হাতে! খুব সাবধান, দরকার হলে ও একেবারে অম্লানবদনে গুলি চালাবে—হাতটা একটু কাঁপবেও না!"

"ওকে নিয়ে ঠাট্টা কেন বাপু?" আনিসিয়া জবাব দিল। "নিজের কাজ আগ্রিপিনা বেশ বোঝে!"

এবার কামানের দিকে। ইভান গোরার মুখভাব এমন গম্ভীর যে আর সকলেও একেবারে স্থির, নিস্তব্ধ। আগ্রিপিনা চলেছে স্বামীর পেছনে পেছনে, যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঢিলে ঢালা পেরেক আঁটা ক'খানা তক্তা আর কখানা

গরুর গাড়ীর চাকা, তাই মিলিয়ে একটা অদ্ভুত যন্ত্র খাড়া করা হয়েছে—তার ওপর বসেছে এক নম্বর কামান। যন্ত্রের নীচে খানকয়েক করাত, কুড়ুল কয়েকখানা, এক গাদা কাঠের চিলতে, আরও কত কি। বিকট দৈত্যটার দিকে চেয়ে চেয়ে ইভান গোরার তো চক্ষুস্থির। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করল:

“এটা আবার কি?”

“এ আমাদের নিজেদের আবিষ্কার, কমরেড কমিসার।” জবাব দিল বাইকভ। “যুদ্ধজাহাজে কামানের বুরুজ থাকে না? যেদিকে ইচ্ছে ঘোরানো যায়? অনেকটা সেইরকম জিনিস আর কি।”

“তা গরুর গাড়ীর চাকাগুলো কিসের জন্যে?”

“যাতে আরও তাড়াতাড়ি ঘোরে। খুব সুবিধা ওতে......”

“বটে! ও তাই বুঝি!” ইভান গোরা আগে বাড়ে। পেছনে আগ্রিপিনা। ওর দিকে চোখ টিপে বাইকভ বলেঃ

“ওর সংগে একসংগে রিহার্স্যাল দিই, বুঝলে কমরেড্‌স, কিন্তু ওকে দেখলে যা ভয় লাগে, বাব্বাঃ, কমিসারকেও অত ভয় করে না।......চোখ দুটো গোল গোল, ইঁদুরের মতো। সে চোখে দয়া-মায়া পাবে না এক ফোঁটাও।.. হায় নারী! আমরা তবে লড়ছি কিসের জন্যে?”

“সব ওঁকে দিয়ে এসেছি, দারিয়া দেবী।......আমাকে তো মিলের ভেতর যেতে দিল না।......উনি কিন্তু ওপর থেকেই ঘাড় নেড়ে জিগ্যেস করলেনঃ ‘সত্যি, দাশেংকা নিজে বানিয়েছে?’ আমি বল্লাম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই বানিয়েছে। কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!’ উনি বল্লেন, ‘না, না, ঠাণ্ডা প্যানকেকই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। ......ওকে আমার ভালবাসা জানাবেন......”

“যাঃ সব আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।”

“না না, বানানো নয়, মাইরি বলছি।......আর খবর শুনেছ? ঐ যে ইভানভ সাহেব, আমাদের ডাক্তার গো, সে ভদ্দরলোক ভয়ে একেবারে কাপড়ে চোপড়ে—একবার পায়খানায় যায়, একবার বমি করে, কী কাণ্ড!......কমিসার তো রেগে আগুন—বলে, ‘দাঁড়াও, ওর স্নায়ু টায়ু সব ভাল করে দিচ্ছি।’ কাপড় চোপড় খুলিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে গেছে কুয়োর পাড়ে—হুড় হুড় করে ঢালছে ঠাণ্ডা জল। ......ওর চীৎকার শুনছ? এই নিয়ে তিন বালতি হল। ওঃ হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। তবু আমি নিজেই তো একটা ভীতু মানুষ—তা তো তুমি জান।”

পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মতো দাশা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে—দরজা থেকে জানালা, আবার জানালা থেকে দরজা। পট্টী, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম তখন ঘরের ভেতর সাজানো। কার্বলিক আর আয়োডোফর্মের উগ্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কুজমা কুজমিচ ভ্যান ভ্যান করে চলেছে সমান তালে।

“ক'দিন ধরে প্রায় রোজই একটা স্বপ্ন দেখিঃ হাতে যেন রাইফেল নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে বুকে একেবারে ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে। তারপর গুলি করলাম, মানে ঘোড়া টিপছি প্রাণপণে, শালার বন্দুকের মধ্যেই যেন আমার ড্রায়নকাঠি এম্‌নিভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপছি, কিন্তু ঠিকমতো গুলি আর বার হয় না। ঘোড়াটা সরতেই চায় না, অতি আস্তে একটু একটু ক'রে এগোয়। যদি বা ধোঁয়া বেরুল তো সে এই এতটুকু। আর যাকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছি ... তার মুখটা কিন্তু কিছুতেই দেখতে পাইনে......সে লোকটা ক্রমেই যেন কাছিয়ে আসে—এতটুকু ছিল, দেখতে দেখতে একেবারে এই প্রকান্ড।......উঃ কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!”

“বাইরে সব চুপচাপ কেন?” দাশা শুধায়। আঙুল মটকাতে মটকাতে স দাঁড়ায় জানলার ধারে। তখন সন্ধ্যা নামছে......আগুন টাগুন সব নিভে এসেছে। কামানের গোলার হিস হিস, দুম দাম শব্দ আর শোনা যায় না। রাইফেলের আওয়াজও স্তব্ধ। গুটি গুটি এগোতে এগোতে কসাক সৈন্যরা গোলাবাড়ীটাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। জানলা থেকে সরে এল দাশা। তারপর আবার পায়চারি।

“অনেক লোক তো জখম হয়ে আসবে। আমরা সামলাব কি ক'রে?” দাশা শুধাল।

“কমিসার বলেছেন আগ্রিপিনাকে পাঠিয়ে দেবেন। ওকে পেলে খুব কাজ য়। আনিসিয়াকেও চেয়েছিলাম । বলেছিলাম, ‘ওর পক্ষে কামানের দলে থাকা তো ঠিক নয়। যত সব রোমাণ্টিক খেয়াল, তার থেকেই ওর কামানের বাতিক হয়েছে।’ সেকথা যাক। বল তো আমার এই স্বপ্ন দেখে কি বুঝলে?”

“সত্যি কথা বলুন—ইভান ইলিয়িচের কিছু হয়নি তো? আর সব ঠিক আছে তো?”

“আরে, তিনি তো ছাতের ফুটো দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন—একেবারে এক গাল হাসি! বল্লেন, আমরা জিতবই......”

“ও!” দাশা মাথা ঝাঁকি দেয়। গুটিসুটি মেরে ঐ যে হাজার হাজার লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠিক বুনো জানোয়ারের মতো, ওদের কথা ও ভাববে না, কিছুতেই ভাববে না—পণ করে দাশা। গোটা জিনিসটাই ওর কাছে মনে হয় অর্থহীন।......রাক্ষসী কল্পনাটাকে বর্তমানে টেনে আনবার জন্যে ও একবার প্রচন্ড চেষ্টা করল: টেবিলের ওপর এই যে এত তুচ্ছ জিনিস, এই যে ব্যান্ডেজ আর শিশি আর ছুরি, কাঁচি, যন্ত্রপাতি—এরই মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইল।......এতটুকু আয়োডিন? ভাল কথা নয়! কল্পনা বেচারী শান্ত শিষ্ট দাশার হুকুম দিব্যি তামিল করে; কিন্তু পর মুহূর্তেই যেন কোন্ অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, কুরে কুরে খায় দাশার হৃদয়টাকে। সরোবরের মতো জল টলমল করে দাশার চোখে।......যারা আমার এত আদরের, যারা ভাল, যারা নিরপরাধ, তাদের সকলকেই ওরা মেরে ফেলবে? কেন? কেন? ঘৃণার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি আছে? সেই নির্মম ঘৃণাই আজ ওকে চেপে

ধরেছে, ঘিরে ফেলেছে, সুযোগ পেলেই ওর বুকে একেবারে সংগীন বসি
দেবে—রুখতে গিয়ে আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠবে দাশার হাত দুটো।

"না, না—এ রকম হলে চলবে না," দাশা বলে উঠল। ওর বিস্ফারি চোখের উন্মাদ দৃষ্টি দেখে কুজমা তো সন্ত্রস্ত। "আমার দিকে হাঁ ক দেখছেন কি? আমার গা ঘোলাচ্ছে, বুঝেছেন? ঠিক ঐ ডাক্তারের মতে এ ঘৃণা আমি সহ্য করতে পারছিনে।......ভদ্র ঘরে মানুষ হয়েছি বলেই পারছিনে, এই তো বলবেন? বলুন তো!"

লক্ষ্যহীনভাবে বোতল আর পুরিয়াগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে দাশা বলেঃ "আর দেখুন, আপনার স্বপ্নের কথাই বা কেন শোনাতে আরম্ভ করলে তাও তো বুঝছিনে।"

"ওঃ-হো, দারিয়া দেবী! স্বপ্ন তো এখন সত্য হয়ে উঠল! এমন ঘৃণা আছে যা প্রেমের মতো, মনের মলিনতা সব দূর করে দেয়......ঘৃণা না তো যেন প্রশস্ত ললাটে প্রভাতের শুকতারা।......আবার আর এক রকম ঘৃণা আছে—পাশবিক পাথুরে ঘৃণা—একেবারে অন্তর্নাড়ী থেকে উঠে আসে। এই ঘৃণাকেই তো ভয় তোমার। আমারও ভয় হয়েছিল একবার—সেই চোদ্দ সালে যে কাহিনী শু ভয় পেয়েছিলাম সেটা বলিঃ রুশিয়ানরা যারা জার্মানিতে ছিল তারা তখন আটকা পড়ে পড়ে, দেশে ফেরার শেষ ট্রেন ধরতে ছুটে এসেছে।......আর গাড়ী দরজায় জার্মান পাহারাগুলো কি করছে জান? কচি কচি ছেলেপিলের হাতের ওপরই দরজা চেপে দিচ্ছে দড়াম দড়াম ক'রে।......আমার স্বপ্নের মানে বলব; তোমাকে বলি—কমিসারকে বা আর কাউকে একথা বলতে পারব না—শুধ তোমাকেই পারি—তাও কেবল এমনি ধারা মুহূর্তে। আমার আর শক্তি নেই ভাই, দুনিয়ার তীর্থযাত্রা একেবারে সাঙ্গ হয়ে গেছে।......" বলতে বলতে হঠাৎ একবার ফুঁপিয়ে উঠল কুজমা, তারপর শেষ করলঃ "আমার বন্দুকে শুধ ধোঁয়া, গুলি আর বেরুবে না।"

"আমি ওদের ঘৃণা করি," বলে দাশা হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, বার বা করাঘাত হানে বুকের ওপর। "দেখেছি, দেখেছি ওদের! চোখে খুনীর দৃষ্টি ব্রণক্ষত লোলুপ গালদুটো, থুতনি একেবারে ঝুলে পড়েছে—ওদের মুখে চেহারা আমি খুব চিনি।......জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই, একেবারে জানোয়ার পৃথিবীতে ওদের স্থান হতে পারে না!"

"আরে আস্তে, দারিয়া, আস্তে! চল তো দেখি জল ফুটল কিনা।"

হঠাৎ ঝট করে জানলার ধারে চলে গেল দাশা। বাইরে নীলাভ সন্ধ্যা আক্রমণের কায়দায় রাইফেল উঁচিয়ে কুঁজো হয়ে ছুটছে লালফৌজের সিপাহীরা ওদের মুখের ওপর উত্তেজনার ছাপ, তাও ও দেখতে পেল। হোঁচট খে একজন সৈন্য পড়ে যাচ্ছিল, পড়তে পড়তেই আবার ছুট দিল; তারপর টা সামলাবার চেষ্টায় দু বাহু ছড়িয়ে দিয়ে এদিকে মুখ ফেরাল—মুখে হা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

স্তেপের আকাশে হাউই উঠল একটা। সবুজ রংয়ের বিষাক্ত ফুলকি ঠিকরে পড়ল চারদিকে, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামল। ট্রেঞ্চের ভেতর সিপাহীরা কুঁজো হয়ে বসে আছে, তাদের পিঠে ছাই-রঙা জামার ওপর আলো পড়ল। আরও দেখা গেল যে, কসাক পদাতিকেরা একদম কাছে এসে গেছে—ব্যবধান পাঁচশো গজেরও কম। কসাকরা ঠিক তখনি উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছিল। একজন আবার মাথার ওপর তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছে। তারপর আলো মিলিয়ে গেল। সেই মুহূর্তের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে গর্জন উঠল, "হুররা"। ঝোড়ো হাওয়ার মতো সে গর্জন ক্রমবর্ধমান।

টুপি খুলে ভিজে চুলের ওপর হাত বুলিয়ে নেয় তেলেগিন। আগে থাকতে যা কিছু ভাবার বা করার ছিল সে সব হয়ে গেছে। এবার লড়াইয়ের মেজাজ শুরু হবে। দূরবীণ দিয়ে যতখানি দেখা যায় দেখে তেলেগিন স্থির করল, শত্রুর মজুত সৈন্য যখন এত ঘন তখন ওরা সংখ্যায় রেডদের চারগুণ হবে।

ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে মাথা আর ঘাড়টা একেবারে বার করে দিয়েছে। এমন সময় বন্দুকের অগ্নিরেখা সমস্ত খামার বাড়িটাকে ঘিরে ফেল্ল, তেলেগিনের মনে হল যেন পৃথিবীটা ঘুরপাক খাচ্ছে।......এক মুহূর্ত মাত্র—তারপরই তাকিয়ে দেখে, এখানে ওখানে ছোট ছোট দল বেঁধে লোকে চলেছে গড়খাইয়ের দিকে।......টুপি? টুপি কোথায় গেল? "পোড়া কপাল, এমন সুন্দর টুপিটা হারালাম?" ভাবে তেলেগিন। পরমুহূর্তেই এক লাফে সিঁড়ি পার হয়ে ঢিবি থেকে ছুট দিল গড়খাইয়ের দিকে।

কসাকদের আক্রমণের প্রথম চোট তখন ঠান্ডা—লড়াই চলছে শুধু কামারশালার কাছটাতে। ইভান ইলিয়িচও তাই ভেবেছিল। ওদিক থেকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের গর্জন শোনা যায়, দমাদ্দম হাত বোমা ফাটে, উন্মাদ চীৎকারের শব্দ ভেসে আসে। গোয়ালের মেটে দেওয়ালের কাছে সৈন্য মজুত থাকার কথা—কিন্তু সেখানে পৌঁছে ইভান দেখে কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা। রেড আর্মির লোকেরা আর আত্মসংবরণ করতে পারেনি, নিয়মকানুনের পরোয়া না ক'রে কামারশালার দিকে ছুটে গেছে—সেখানে কমরেডদের সাহায্য করতে হবে তো! ইভান গোরা যে ইভান গোরা, সেও ছুটেছে কামারশালামুখো। তার কাঁধে প্রকান্ড এক বস্তা হাত বোমা। বোমার ভারে ও একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে।

"কমিসার!" বলে চেঁচিয়ে উঠল ইভান ইলিয়িচ। "কি হচ্ছে এসব? শৃঙ্খলা টৃঙ্খলা গেল কোথায়? থামুন, থামুন, এসব চলবে না বলছি!"

ইভান গোরার মুখে কথা নেই—শুধু বস্তার নীচে থেকে হিংস্রদর্শন নাকটা বার করে দেখাল। আর একটু এগিয়ে দূর থেকে তেলেগিন দেখে—দাশা। একজন সিপাহী জখম হয়েছে।

হাঁটতে পারছে না, তাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে চলেছে। তেলেগিনের সামনে দিয়ে সে গেটের মধ্যে ঢুকল। থেমে পড়ল ইভান। আঙ্গুল ছড়িয়ে দিয়ে হাতটা

তুলে ধরল। তারপর গলা দিয়ে শব্দ বার হলঃ "ও, হ্যাঁ, সেইজন্যেই এসেছিলাম।..." ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ছোট্ ছোট্, এক ছুটে একেবারে ব্যাটারীর কাছে।

"কি হে, ব্যাটারীর খবর সব ভাল তো?"

"খুব ভাল! নমস্কার ইভান ইলিয়চ!"

"কমরেড্স, শ্রাপনেল গোলা দাগো—শত্রুর মজুত সৈন্যের ওপর ফেলা চাই..."

কাছে একটা কুটীরের ছাত। তার ওপর উঠে পড়ে দূরবীণ দিয়ে একদৃষ্টে দেখতে লাগল তেলেগিন। একটু আগে মিলের ওপর থেকে যেসব মজুত সৈন্য লক্ষ্য করেছিল, তারা ঘন হয়ে এগিয়ে আসছে—তাদের সংখ্যা বহু। তেলেগিন ছাতের ওপর থেকে হাঁক ছাড়লঃ "ঝপাঝপ গোলা দাগো!"

সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ ক'রে গোলা ছুটতে শুরু করে—একের পর এক, দ্রুত গতিতে। আক্রমণকারীর দল দ্বিগ্রাগ্রস্ত, কিন্তু তবু থামে না। গোলা ফাটছে—নীচে, আরও নীচে, একেবারে ওদের মাথার ওপব—তবু এগিয়ে আসে। সৈন্য না তো, যেন প্রাণহীন যন্ত্র! শোঁ ক'রে একটা হাউই উঠল—কালনাগিনীর মতো সহস্র ফণা তুলে ভাসতে লাগল সৈন্যদের মাথার ওপর। দুঃসাহসী অভিযানের পথ আলোকিত ক'রে হাউইটা যেন ওদের উৎসহ দিচ্ছেঃ "জোরসে চলো ভাই সব, জোরসে চলো—বলশেভিকদের রক্তে আজ স্নান করতে হবে।" কিন্তু এ আলো মেলাতে না মেলাতে ডাইনে পূব দিক থেকে আবার নতুন হাউই, পর পর তিনটে। সারা আকাশে রক্ত দীপ্তি ছড়িয়ে হাউইগুলো নামল। সে দীপ্তি মৃদু, কিন্তু করাল।

"পব পর তিনটে লাল হাউই ছেড়ে জবাব দাও!" বলে চীৎকার ক'রে উঠল তেলেগিন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা নালার ভেতর দিয়ে মার্চ করতে করতে বুদিয়নির দলবল এগিয়ে এসেছিল। তারা এখন কসাকদের বাম বাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আক্রমণ এত অপ্রত্যাশিত, এত হিংস্র যে, কসাক পদাতিক দল একেবারে এক মিনিটের মধ্যে ভেঙে চুরে একাকার। তারপর যা আরম্ভ হ'ল, অশ্বারোহী-তাড়িত পদাতিক সৈন্যের অদৃষ্টে তাই বোধ হয় সব চেয়ে ভয়ংকর পরিণতি। পদাতিক সৈন্যেরা পালাচ্ছে, আর তাদের পেছনে ধাওয়া করেছে তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার দল—পদাতিকদের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। গোলাবাড়ী থেকে হাউই উঠছে—সারা স্তেপ আলোয় আলোময়। চারদিকে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা, বন্ বন্ করে তলোয়ার ঘোরে, আর মানুষ মরে। ছুটতে ছুটতে রাইফেলও ফেলে দিয়ে সৈন্যেরা দু হাতে মাথা ঢাকে। কিন্তু অশ্ব আর অশ্বারোহীর কালো ছায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়? সাবলীল ভঙ্গীতে রেকাবে উঠে দাঁড়ায় বুদিয়নির ঘোড়সওয়ার, একটু পাশে হেলে, তারপর

কাঁধের উপর সমস্ত জোর দিয়ে তলোয়ার হানে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কসাকের দেহ, ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে গড়াগড়ি যায়।

কসাক সৈন্যেরা সব একেবারে ছত্রভঙ্গ, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দলে দলে পালাচ্ছে—তাই দেখে বুদিয়নি ঘোড়ার রাশ টানলেন। তলোয়ার ঘুরিয়ে হাঁক দিলেনঃ "আমার পেছনে!" জন পঞ্চাশেক সওয়ার যখন তাঁর পেছনে জমা হল, তাদের নিয়ে তিনি ঘোড়া ছোটালেন খামারবাড়ীর দিকে। জিনে ঠেস দিয়ে বসে ঘোড়া ছোটেন বুদিয়নি। হাত ভেরে গেছে, তাই তলোয়ারটা নীচে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। শীপস্কিনের রুপোলি টুপিটা পেছন দিকে ঠেলা—ঘর্মাক্ত কপালে যাতে হাওয়া লাগে। ও'র ঘোড়াটা খুব তেজী, তার সঙ্গে তাল রাখা শক্ত। বুদিয়নির সঙ্গীরা তাই বার বার নিজেদের ঘোড়ার গায়ে কাঁটার ঘা মারে। হাউইয়ের তারাগুলো তখনো নামছে—পুকুরে বরফের ফাটলে ফাটলে ছায়া পড়েছে। ও'রা সেখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন। ঘোড়ার পথ থেকে দৌড়ে সরে গেল কতকগুলো লোক, মাটিতে শুয়ে পড়ল। বুদিয়নির কিন্তু গ্রাহ্য নেই, তলোয়ার তুলে সঙ্গীদের কামারশালাটা দেখিয়ে দিলেন। সেখানে তখনও লড়াই চলেছে: একবার কাচালিন রেজিমেণ্ট সঙ্গীন চার্জ করে, আর একবার কসাকরা; একবার এদের পিছু হটে মাটিতে শুয়ে পড়তে হয়, আর একবার ওদের। বার বার এমনই।

বুদিয়নির সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ল। সামনে রুপোলি টুপি উঠছে নামছে, সেদিকে ওদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। লাগাম আলগা করে দিয়ে পুকুরের পাড় থেকে ওরা তীরবেগে নামতে লাগল কসাকদের লক্ষ্য ক'রে। হ্রেষারব করতে করতে ঘোড়াগুলো একেবারে ধেয়ে আসে—রাইফেল, সঙ্গীন, মেশিনগান কোনো কিছুরই বাধা মানে না। যারা তলোয়ারের নাগালে পড়ল তারা সব কচুকাটা। বুদিয়নি চলেছেন—খামারবাড়ীতে পে'ীছে তবে ঘোড়া থামালেন।

তাড়াতাড়ি তেলেগিন এসে সামনে দাঁড়াল। বুদিয়নি কিন্তু তখনি ওর অভিবাদনের জবাব দিলেন না, প্রথমে রুমাল দিয়ে তলোয়ার মুছলেন, রুমাল ফেলে দিয়ে পেতলের হাতলওলা প্রকাণ্ড তলোয়ারটা খাপে ভরলেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেনঃ

"নমস্কার কমরেড! আপনি কে জানতে পারি? ও, এই রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার? আমি ব্রিগেড কম্যাণ্ডার বুদিয়নি, এখন গ্রুপের চার্জে। আমার অর্ডার শুনুনঃ আহত লোকজন আর মালগাড়ী-টারী পাহারার জন্যে এক কম্প্যানি সৈন্য রেখে দিয়ে আপনার বাকী সৈন্য, কামান ইত্যাদি নিয়ে এখনি পাশের গ্রামের দিকে রওনা হোন, সে গ্রাম দখল করে সেখান থেকে কসাকদের দূর করে দিন।"

"বেশ, তাই হবে কমরেড!"

"একটু দাঁড়ান, কমরেড..."

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ঘোড়ার পেটির মধ্যে হাতটা চালিয়ে দিলেন

বুদিয়নি। ও'র জামার কফ ধ'রে চিনবার চেষ্টা করছিল ঘোড়াটা, তার মুখ চাপড়ে তারপর হাত মেলালেন তেলোগিনের সঙ্গে।

"আপনাদের হতাহত সংখ্যা কি খুব বেশী?"

"উঁহুঁ!"

"বেশ বেশ। তার মানে, আমরা না এলেও আপনারা নিজের শক্তিতেই যুঝতে পারতেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, পারতাম। পারব না কেন? গোলা-বারুদের তো আমাদের অভাব ছিল না।"

"ভাল কথা। আচ্ছা, এখন আপনি আসুন!"

"আমার পেটে আর ব্যথা নেই, আনিসিয়া—পেটটা আছে কিনা তাই বুঝতে পারছিনে। নাঃ জিনিষটা একদম যাচ্ছেতাই করে বানিয়েছে। শরীরের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী যন্ত্র, অথচ তারই কিনা রক্ষার ব্যবস্থা নেই, একদম নেই। ফলাটা আর কতটুকু ঢুকেছিল—এই ইঞ্চিখানেক, ব্যস। কিন্তু তাতেই এমন সর্বনাশ......একটু জল দাও. ...."

ওর বিছানার পাশে নীরবে বসে আছে আনিসিয়া। ভয়ানক ক্লান্ত। হাসপাতালটা এখন গ্রামে উঠে এসেছে। একটা দোতলা পাকা বাড়ী, সেটাই হাসপাতাল। যাদের জখম সামান্য, কিংবা যাদের নড়াবার উপায় নেই শুধু তারাই এখানে আছে। বাকী সবাই জারিৎসিনে, ক'দিন আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শারিগিন এখন মরণের পথে। কিন্তু জীবনকে ও বারে বারে আঁকড়ে ধরতে যায়, মরতে চায় না কিছুতেই। সে দৃশ্য এমন করুণ যে দেখে দেখে আনিসিয়া একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এখন আর ওকে সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করে না, শুধু পাশে বসে থাকে, আর শোনে।

এবার আনিসিয়া উঠল—সোরাই থেকে জল এনে ওকে খেতে দেবে। শারিগিনের মুখটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। শিশুর মতো নীল বড় বড় চোখ—আনিসিয়া যেদিকে চায় সেদিকে চেয়ে থাকে। আনিসিয়ার পরনে মেয়েদের কাপড়, তার ওপর ডাক্তারের আলখাল্লা। সোনালি চুল—আহা কতবার সে চুলের স্বপ্ন দেখেছে শারিগিন—বিনুনি করে খোঁপা বাঁধা। ও যদি চলে যায় ভেবে শারিগিন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ও চলে গেলে তো আর কিছু করার থাকবে না—শুধু বালিশে মাথা গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকতে হবে। রগের নীচে রক্তের দাপাদাপি, এলোমেলো—দাঁতে দাঁত চেপে শুধু তাই শুনতে হবে। তাই ওর কথার আর বিরাম নেই। নিভন্ত প্রদীপশিখা যেমন প্রদীপের কিনারা চুষে চুষে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তারপর আবার ঝিমিয়ে আসে, ওর ভাবনাগুলোও তেমনি—ওঠে আর পড়ে।

"আনিসিয়া, তখন তোমাকে একটুও সুন্দর দেখাত না; বয়সও মনে হত

ভরল।......হাতের ওপর গালটি রেখে শূন্য দৃষ্টি সামনে মেলে দিতে—সে দৃষ্টি শোকের ভারে মলিন।......আমি অবিশ্যি করুণা করার লোক নই—ওসব আমি ঝেড়ে ফেলেছি। যারা কোমল-হৃদয়, আসলে তারাই সবচেয়ে উদাসীন, সত্যি। জীবনে করুণা অনুভব করা যায় শুধু একবারই।......ব্যস্! তারপর কাঁটা ঘুরিয়ে দাও। নেহাইয়ের ওপর পেতে দিতে হবে হৃদয়টাকে, তারপর আগুনে পুড়িয়ে আবার রাখতে হবে হাতুড়ির নীচে।......তরুণ কমিউনিস্টদের এম্নিধারাই হওয়া দরকার। সেবার সেই স্টীমারে থাকতে চুপি চুপি সব কমরেডদের মিটিংয়ে ডাকলাম। বল্লাম—যারা বিপ্লবের যোদ্ধা, তোমার গায়ে হাত দেওয়া কি তাদের সাজে? ...রাঁধুনী ছুঁড়ি বলে কথাটা লাতুগিন তখনই তুল্ল। ...কী যে ঐ লাতুগিনটা! তোমার তো অমন জিনিসের দরকার নেই আনিসিয়া। ......বিপ্লব তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, বিকশিত হয়ে উঠেছে রূপ তোমার, কিন্তু সে কি ওর জন্যে? না ওর জন্যে নয়। এ যে বন্ধ গলি। না, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।......এর জন্যে আমাদের লড়তে হবে .....”

জীবনের কিনারায় এসে দাঁড়াল ওর শিখাটুকু—আসন্ন অন্ধকারের পরিধিটা একবার মেপে দেখল, তারপর স্তিমিত হয়ে এল। শুকনো জিভটা ঠোঁটের ওপর বোলায় শারিগিন। মুখের কাছে জলের মগটা তুলে ধরে আনিসিয়া। শারিগিন ফের কথা কয়ঃ

“কিসের জন্যে প্রাণ দিচ্ছি তা আমি জানি, এবিষয়ে মনে আমার কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আমার কথা তোমার মনে পড়বে—ভাবতে পারলে ভাল লাগত। .. আমার নিবাস পেত্রোগ্রাদ, ভার্সিলিয়েভ্স্কি আইল্যান্ড। বাবা ছুতোরের কাজ করেন, কারিগরি ইস্কুলে কাজ শিখে আমিও বাপের কাছেই কাজ করতাম। দুজনে মিলে দিনরাত খালি র‍্যাঁদাই চালাতাম, একটি কথা বলারও ফুরসৎ থাকত না।......তারপর বল্টিক সমুদ্রের ডকে, জাহাজ তৈরীর কারখানায়। সবচেয়ে বড় কথাটা জানলাম ওখানে থাকতেই, বুঝতে পারলাম জীবনের উদ্দেশ্য কি।......সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই তখন এত উত্তাপ যে মনে হত সবুর করতে করতে বুঝি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। ওপরে ওঠার ডাক পেয়েছি, নীচে থাকতে কি আর তখন এক মুহূর্তও সহ্য হয়? তারপর এল যুদ্ধ, হুকুম হল নৌ-বাহিনীতে যেতে হবে। কিন্তু দাঁতে দাঁত ঘষা ছাড়া কি আর করতে পারি? বুঝতে পারছ না আনিসিয়া? আমি যে তখন জীবন্ত মানুষের রূপ দেখছি। আর সে মানুষ তো আমাদেরই কল্পনা, আমাদেরই সৃষ্টি—সে মানুষের জন্যে সংগ্রাম করেছি তো আমরাই।......পীড়িত, ব্যথিত মন নিয়ে আবার তুমি যাযাবর হবে—সে আমি কেমন করে সইতাম? বিপ্লব তাহলে কিসের জন্যে? না, অমন করলে ভুল হত। অভিনেত্রীই হতে হবে তোমাকে।......সন্ধ্যা হলেই আমি তো সেই গোলাঘরের ধারে গিয়ে ধর্ণা দিতাম—দেখতাম আর শুনতাম! দোহাই ঈশ্বর।......দোহাই স্বর্গের যত দেবদেবী।......পরিত্যক্তা! পরিত্যক্তা! তোমার অভিনয় দেখলে আর্মির পর আর্মি সব অভিভূত হয়ে পড়বে। গৃহযুদ্ধ

তো একদিন না একদিন শেষ হবে, তখন তুমি হবে মস্ত বড় অভিনেত্রী।... ঐ তোমার জীবনের পথ। দুর্বল হয়োনা যেন। সে তো তোমায় কত গল্প শোনাবে, কিন্তু কান দিও না। ব্যক্তিগত জীবন তুমি চাইতে পার না, চাইবার কোনো অধিকার নেই—এই কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি আনিসিয়া মুখ ফিরিয়ে নিওনা, লক্ষ্মীটি। একটু জিরিয়ে নিই, তাহলে চিন্তাগুলোকে আবার গুছিয়ে নিতে পারব—আরও কি যেন তোমাকে বলব ভেবেছিলাম। ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু খুব দরকারী কথা......”

বালিশে মাথা রেখে ছটফট করতে করতে আবার শান্ত হয়ে আসে। অনেকক্ষণ একেবারে নিঃশব্দ। দেখে আনিসিয়া তাড়াতাড়ি ওর দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল চোখ দুটো আধবোঁজা, তাই চোখের তারা ঢেকে গেছে। ঊর্ধ্বমুখী চোখের দৃষ্টি কী করুণ—কথার চেয়েও সেই দৃষ্টিই যে আনিসিয়ার হৃদয়ে বারে বারে আঘাত করে। হঠাৎ ও সব বুঝতে পারল, বিকারের অস্পষ্ট ভাষায় কী বলতে চেয়েছে শারিগিন, সবই পরিষ্কার হয়ে এল। ঘুঁটের গাদার নীচে ওর সেই ছোট ছোট শিশু দুটি লেলিহান বহ্নিশিখার আতঙ্কে গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে তারাও নিশ্চয় এম্‌নিভাবেই ওকে ডেকেছিল। আহা, কচি কচি দুটি মুখ—এতদিন সে মুখ আনিসিয়া কল্পনায়ও আনতে ভয় পেত। মুখ দুটি আজ চোখের সামনে ভেসে উঠলঃ কী সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কেমন গোলগাল হাসিখুসি—চার বছরের পেত্রশকা আর ছোট্ট আনিউতা।......ওদের পরে এবার আবার আরেকজন যে ডাক দিল! না, একে ও বিদায় দেবে নিজের হাতে, সঙ্গে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

মৃদু হাতের স্পর্শে ওর জটপাকানো চুল সমান করে দেয় আনিসিয়া। শারিগিনের চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। রগের কাছটাতে নীল হয়ে আসছে....

॥ চোদ্দ ॥

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একাতেরিনা আলেক্সিয়েভ্না কোয়াশনিনার বাসায় গিয়ে কমান্ডার ইন চীফ দেনিকিন তাস খেলেন। মায়ের দিক থেকে একাতেরিনা ওঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। তাস খেলার অভ্যাস অবশ্য বহুদিনের, সেই একেবারে গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই অভ্যাসটা শুরু হয়েছে। আন্তন ইভানোভিচ দেনিকিন তখন জেনারেল স্টাফ একাডেমির * ছাত্র—একাতেরিনার বাসায় একটা ঘর নিয়ে থাকেন। বাসাটা ভাসিলিয়েভ্স্কি আইল্যান্ডের ফিফ্থ লাইনে, একতলার; খাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার ওপর পুরোনো দিনের পিতার্স-বুর্গ ফ্যাশানমাফিক কেতাদুরস্ত। তাস খেলা হত চার জনে, তার মধ্যে বর্তমানে শুধু ওঁরা দুজনই এখনো জীবিত। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আদেশে দুজনেই আজ একাতেরিনোদারে এসে ঠেকেছেন, ঈশ্বরের কৃপায় দেনিকিন হয়েছেন হোয়াইট বাহিনীর নেতা। আর একাতেরিনাও সংসার পেতেছেন এই একাতেরিনোদারেই—১৯১৮-র গোড়ার দিকেই তিনি পিতার্সবুর্গ থেকে পালিয়ে আসেন। এখানে তার অনাড়ম্বর সংসারে সঙ্গে আছে মেয়ে; তারও নাম একাতেরিনা।

কমান্ডার সাহেব অবশ্য অনেকবারই ওঁকে সাহায্য দিতে চেয়েছেন, তার জন্যে অছিলা দেখাতেও কসুর করেননি। কিন্তু ওঁর এক জবাবঃ "টাকায় বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, আন্তন ইভানোভিচ! আমাদের সম্পর্কের মধ্যে এসব জিনিস না আসাই ভাল।" সংসার খরচার জন্যে তিনি ঘরে বসে প্রুফটুফ দেখতেন। মূল্যবান অলঙ্কার তখনও দু'একখানা ছিল—বিপদ আপদে সেগুলিই সম্বল।

শুক্রবারের সন্ধ্যা একেবারে বাঁধা। অন্যলোক তো ছার, স্বয়ং চীফ অফ স্টাফ † জেনারেল রোমানভস্কিরও কখনো সাহস হয়নি যে, কম্যান্ডার ইন চীফের নিয়মিত তাস খেলার সময় তাঁকে ব্যস্ত করেন। শহরের দূর প্রান্তে একেবারে স্তেপের কাছাকাছি মামুলি কাঠের বাড়ী একটা—সন্ধ্যা আটটা বাজবামাত্র হুড-চড়ানো এক-ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়াত তার সামনে। গাড়ীর কোচম্যানের ইয়া দাড়ি, আর বুকের ওপর গোছা গোছা মেডেল; তাকে ডেকে কমান্ডার ইন চীফ বলে দিতেন, সে যেন আবার বারোটার সময় নিতে আসে। তার পর আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরের গেট পার হয়ে রকে উঠতেন। মনে হত বাড়ীর দরজা যেন আপনা আপনিই খুলে গেল।

প্রতি শুক্রবার ও-বাড়ীতে ডিটেকটিভ আসত, গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা

---

* সেনানীমণ্ডলীর সামরিক স্কুল।

† সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক

পাঠিয়ে দিতেন। দেনিকিনের চোখে যাতে না পড়ে তার জন্যে সে ডিটেকটিভদের কী চেষ্টা—কেউ হয়তো রান্নাঘরের চিমনি আড়াল দিয়ে ছাতের দুধারে প ঝুলিয়ে বসেছে, রাস্তার ওপারে বুড়ো পপলার গাছের আড়াল থেকে কেউ উঁকি দিচ্ছে, জনদুয়েক আবার উঠোনে রাবিশের গাদার আড়ালে লুকিয়েছে। মিলিটারির লোকেদের ডিটেকটিভ সহ্য হয় না, দেনিকিনেরও হত না। গোয়েন্দাগিরির দরকার আছে সত্যি, কিন্তু জিনিসটা বড় অপ্রীতিকর। এ বিষয়ে ভূতপূ জার, সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস কি মনে করতেন—একদিন খেলা থামিয়ে তার একটা গল্পই শুনিয়ে দিলেন দেনিকিন; জার্স্কোইয়ে মেলোর পার্কে একা এক বেড়াতে দ্বিতীয় নিকোলাই খুব ভালবাসতেন। যে যে পথ দিয়ে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা সেই সেই পথে একেবারে ভোরবেলা থেকেই ডিটেক্টিভ বসত- ঝোপে, ঝাড়ে, নয়তো ফুলগাছের আড়ালে তাদের ঘাঁটি। শীতকাল হলে তারা বরফের নীচে চাপাও পড়ে যেত কখনো কখনো, তাদের আর দেখাই যেত না। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সম্রাট শুনতে পেলেন, একটা ঝোপের আড়াল থেকে ভাঙা গলায় কে যেন বলছেঃ 'সাত নম্বর গেলেন।' ডিটেকটিভের খাতায় ওঁর নাম 'সাত নম্বর'ঃ শুনে সম্রাট মহা খাপ্পা, গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তাকে ডিশমিশই করে দিলেন। তারপর থেকে ওর নাম হল 'এক নম্বর'।

বাড়ীটির ছোট্ট হলে একটি মাত্র বাতি জ্বলে। হলে পেঁছে দেনিকিন প্রথমে তাঁর পেতলের গোড়ালি-আঁটা চামড়ার ওভার-শু খুলে রাখেন, তারপর গা থেকে মিলিটারি কাপড়ের লাল লাইনিং দেওয়া ওভারকোট নামিয়ে (কাপড়-জামা ছাড়ার ব্যাপারে তিনি কখনো কারো সাহায্য নিতেন না, মাথার চুলগুলি আঁচড়ে নেন (ব্যাক ব্রাশ করা চুল, অনেকটা সীসের মতো রং—চুলগুলি এখন পাতলা হয়ে আসছে)। এ সব শেষ হলে তখন এগিয়ে গিয়ে একাতেরিনা আলেকসিয়েভ্‌নার হস্ত চুম্বন করেন। ছোট্ট একাতেরিনার সুন্দর, কৃশ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু আদর করেন--খেলার অন্য দুজন সাথীকে শান্ত সুরে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানান। খেলার সাথীদের মধ্যে একজন ওঁর এডজুটেন্ট—প্রিন্স লবানভ-রস্তভ্‌স্কি। আর একজনের নাম ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ স্ত্রুপ। ইনি আগে কোনো মন্ত্রী দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন। ভদ্রলোক পিতাসবুর্গের পুরোনো বাসিন্দা, ভারি খোশমেজাজ।

ড্রইং রুমে তাসের টেবিল—সবুজ ঢাকনার ওপর পাখার আকারে তাস সাজানো, পাশে দুটি বাতি—সব একেবারে তৈরি। টেবিলের ঢাকনা সাফ করার জন্যে গোলাকার ছোট বুরুশ, আর খড়ি—সেগুলো দেখতে ঠিক আগের দিনের মতোই—সেই যে ভাসিলিভ্‌স্কি আইল্যাণ্ডের অতীত সুখস্মৃতি, তারই ঐতিহ্য বহন করছে।

সদা হাস্যময়ী একাতেরিনা হেলতে দুলতে টেবিলে গিয়ে বসেন। ওঁর পা দুটি খুব বেঁটে বেঁটে, আর পাছা-মাজা দুইই অসম্ভব রকম মোটা—দেখতে মনে হয়, যেন বজ্র-বাঁটুল। মুখখানি বেশ বড়, দিব্যি গোলগাল হাসিহাসি। একটু

আধো আধো কথা বলেন—অদ্ভুত শোনালেও বেশ ঘরোয়া ঘরোয়া লাগে। ছোট্ট টুলে পা রেখে চেয়ারে বসে খালি এপাশ ওপাশ করেন, ভারের চোটে চেয়ারটা মড় মড় করে ওঠে। তাস টেনে খেঁড়ু ঠিক করতে হবে, কিন্তু তার আগে উনি আন্দাজে খেঁড়ুর নাম বলে দেন। সে নাম যে কমান্ডার ইন চীফের তা একেবারে অবধারিত। গোলগাল হাত দুখানি নাকের কাছে তুলে হাততালি দিতে দিতে একাতেরিনা বলে ওঠেনঃ

"দেখলেন তো, কেমন আন্দাজ করেছিলাম। কাতিয়া, আন্তন ইভানোভিচ এবারও আমার খেঁড়ু হয়েছিল।......"

"চমৎকার!" গম্ভীর গলায় জবাব দিয়ে দেন ভাসিলি স্ত্রুপে। তারপর আসনে বসে একটা খড়ি আর বুরুশ তুলে নেন।

ভাসিলি সাহেব নির্বিকার, সর্বজ্ঞ, সুরসিক, কিন্তু সন্দেহবাদী। মুখখানা মড়ার মতো ফ্যাকাশে, তার ওপর বেশ কড়া মুখভাব—তাই ওঁকে বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়। খাস পিতাসবুর্গওলা, কাজেই তাস খেলা সম্পর্কে উপযুক্ত গাম্ভীর্যের অভাব নেই। তাসের টেবিলে উনি বেশ শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কথার জের টেনে তিনি ফের বলেনঃ

"সেই যে সেই উপাধিসর্বস্ব কাউন্সিলার সাহেব—হাত থেকে সবগুলো তুরুপের তাস মারা যাবার পর তিনি যা বলেছিলেন তাই বলি—চমৎকার!" বলে পালিস করা হাত দিয়ে দ্রুতগতিতে তাস বাঁটতে সুরু করেন।

চার নম্বর খেঁড়ু প্রিন্স লবানভ-রস্তভস্কি। বয়স অল্প বটে, কিন্তু তিনিও পাকা খেলোয়াড়। এডজুটেন্ট হিসেবে তাঁর ডিউটির মধ্যে এক এই তাস খেলা, আর তারপর কমান্ডার ইন চীফের কতকগুলি ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার তদ্বির করা। দপ্তরের কাজকর্মের জন্যে অন্য লোক আছে—তারা ওঁর চেয়ে আধুনিক ধরনের। লবানভ-রস্তভ্স্কি বংশের আর সকলের মতোই এঁরও চেহারা একদম সাদামাটা। লম্বাটে টাকপড়া মাথা, মামুলি মুখশ্রী, প্রকান্ড উঁচু কপাল। ওঁর একটা বদ অভ্যাস আছে—টেবিলের নীচে লম্বা লম্বা পা দুটো এমন এপাশ ওপাশ করেন মনে হয় যেন পায়খানার বেগ চেপেছে। কিন্তু খুঁত শুধু এই একটি—নইলে উনি খুব সভ্যভব্য ভদ্রলোক। ওঁকে কেউ কখনো নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে শোনেনি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে উনি আজেবাজে, আবোল-তাবোল জবাব দিয়ে দিতেন—জানতেন যে কাজের কথা নিয়ে কেউ ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসবে না। ওঁর আচরণে সৌজন্য ছিল, কিন্তু হীনতা ছিল না। গ্রীষ্মকালে যুদ্ধের সময় যথেষ্ট সাহসও দেখিয়েছিলেন, তারপর আহত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি দিয়েছে।

ওঁদের খেলা দেখলে মনে হয়, বুঝি পুজোর অনুষ্ঠানে বসেছেন। রাজনীতি কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ, এসব সম্বন্ধে ও সময় উচ্চবাচ্যও নেই। কথার মধ্যে খালি—"রুইতন...হরতন...নো ট্রাম্প...দুটো নো ট্রাম্প..."—ব্যস। মোমবাতি পট পট

করে, কাঁচের ছাইদানের কাণার ওপর সিগ্রেট থেকে ধোঁয়া ওঠে……অবশেষে শোনা যায় ঃ

“একাতেরিনা আলেক্‌সিয়েভ্‌না, এবার খেলা শেষ করা যাক, কি বলেন?”

“আহা-হা, কী আপশোষ……”

পাশে প্লাশ-মোড়া সোফার ওপর ছোট একাতেরিনা। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। ঘাড় হেঁট করে বসে পশম বোনেন, মাথা কিন্তু যেমন নীচু তেমনই নীচু। নিষ্প্রভ, নিরুজ্জ্বল একাতেরিনার চুল, চোখ, গায়ের রং। কিন্তু কোমল বঙ্কিম গ্রীবাটি আর সুন্দর হাত দুখানি দেখলে বোঝা যায়—প্রিয়স্পর্শের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় ওঁর উন্মুখ হয়ে আছে। একাতেরিনা খুব সহজেই প্রেমে কাতর হন। পঁচিশ বছর বয়স হল, কিন্তু প্রণয় ব্যাপারে একবারও কি সুখী হতে পারলেন? প্রথম প্রেমাস্পদ—এক যুবা পুরুষ, সে তো তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল। তারপর আর একজন—সে আবার অন্য স্ত্রীলোককে ভালবাসে—নিষ্ঠুরভাবে সে কথা জানিয়েও দিল। এখন উনি ঐ লবানভ-রুস্তভ্‌স্কিকে ভালবেসে ফেলেছেন—দেখতে খারাপ হলে কি হবে, কী ‘মনোমুগ্ধকর’ আচরণ তাঁর। রুস্তভ্‌স্কিও ওঁর প্রেমপ্রার্থী, তবে তার মধ্যে অনেকখানিই শুধু কৌতুক। যাই হোক, কমাণ্ডার ইন চীফ খুব খুশী হয়েছেন, একাতেরিনাকে যে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন। প্রাচীন দুনিয়ার কায়দায় একাতেরিনা বসে বসে স্বপ্ন দেখেন যে, রুস্তভ্‌স্কি একদিন হয়তো ভুলে সিগ্রেট কেস ফেলে চলে যাবেন—তারপর সকাল বেলা ঘোড়সওয়ার হয়ে এসে উপস্থিত হবেন একাতেরিনার জানলার সামনে; মা তখন বাড়ী নেই—জুতোয় আঁটা স্পারের ঘণ্টা টুংটুং করতে করতে ভেতরে আসবেন রুস্তভ্‌স্কি, বিরক্ত করার জন্যে মাফ চেয়ে অভিবাদন জানাবেন একাতেরিনাকে (সাদা কলার আর সাদা মণিবন্ধ লাগানো সেই যে কালো পশমের ড্রেসটা—সেটাই তখন একাতেরিনার পরণে)……তারপর ঠাট্টা-তামাসার মাঝখানে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবেন রুস্তভ্‌স্কি—একাতেরিনার মুখ দেখে তিনি যে তখন সবই বুঝেছেন। কম্পিত মনে দুজনে চলবেন ড্রইং রুমে. ….একাতেরিনার বাহু দুটি ধ'রে সহসা কাছে টেনে নেবেন রুস্তভ্‌স্কি, বলবেন ঃ “এর আগে তো তোমাকে বুঝিনি,” (আহা, কী আবেগ ওঁর কণ্ঠে) “সত্যিই তোমাকে বুঝতে পারিনি, মনে হচ্ছে এ যেন আর এক একাতেরিনা—যেন একেবারে তিলোত্তমা…।” একাতেরিনার কল্পনার পরিধি এ পর্যন্ত ওর চেয়ে বেশী দূর যায়নি কোনো দিন।……স্মিত হাসি হাসেন আর বসে বসে পশম বোনেন একাতেরিনা। সামনে বাতি দুটির মাঝখানে প্রিন্স বসে আছেন, কিন্তু মুখ তুলে সে দিকে চানও না। প্রিন্স যে ওখানে বসে আছেন, তাঁর দামী তামাকের সুমিষ্ট গন্ধ যে একাতেরিনার সম্মুখে সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে—তাতেই একাতেরিনার সুখ……

এই ছোট্ট দুনিয়া, পুরোনো রুশিয়ার এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ—প্রতি শুক্রবার

এখানে এসেই আশ্রয় নিতেন দেনিকিন, ভাবনাচিন্তার বোঝা নামিয়ে হাল্কা তেন।

সেদিন শুক্রবারে নিয়মরক্ষা হয়নি, কমাণ্ডার-ইন-চীফ দেরীতে পেঁছেছেন। মনে হয় দেনিকিন যেন একটু চিন্তিত, অন্যমনস্ক। পায়ের কাছে একটা বেড়াল ঘুর ঘুর করছিল, ওভারকোট খুলতে খুলতে তার থাবাটাই মাড়িয়ে ফেল্লেন। বেড়ালটার বিকট চীৎকার আর থামে না—তাকে ধ'রে রান্নাঘরে নিয়ে চলে গেলেন রস্তভ্‌স্কি। হেসে উঠলেন বড় একাতেরিনা।

"বেড়াল টেড়াল সব মহা-আপদ," মন্তব্য কল্লেন ভাসিলি। দেনিকিন ড্রইং রুমে যাবেন বলে সবাই অপেক্ষা করছে, দেনিকিন কিন্তু নড়েন না। নিশ্চিন্ত মনে ওভারকোট রেখে দিয়ে তারপরও দাঁড়িয়েই আছেন—ছুচলো, পাকা পাকা দাড়ির চুল ধ'রে নাড়াচাড়া করছেন। সবার মুখ এবার গম্ভীর হয়ে এল—কেমন যেন উদ্বিগ্ন থমথমে ভাব। এমন সময় প্রিন্স ফিরে এসে খবর দিলেন, বেড়ালের কোনো চোট টোট লাগেনি……

"ওঃ হো!" বল্লেন দেনিকিন, "ভাল কথা।……তা আর দেরী করে কি হবে?"

সেদিন কিন্তু ভাল খেলতে পারলেন না—কেবল ভুল তাস ফেলেন আর খালি খালি জানলার দিকে চান—জানলা যদিও খড়খড়ি বন্ধ। নিঃশব্দে উঠলেন ছোট একাতেরিনা, কাঁধের ওপর কোট চাপিয়ে বাইরে দেখতে গেলেন - ডিটেকটিভরা ঠিক এসেছে কি না। ছাতের ওপর চিমনির আড়ালে একজন ডিটেকটিভের ঘাঁটি। মর্মভেদী কন্‌কনে হাওয়া সেখানে শোঁ শোঁ করে, মাথার ওপর ঝাপসা চাঁদটা মেঘের আড়ালে একেবারে ডুব মেরে দেয়। দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠক করতে করতে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বল্ল লোকটাঃ "দিদিমণি, আপনার পায়ে পড়ি, একটু ভদকা দিয়ে যান!"

বাড়ীর সামনে একটা মোটর গাড়ী এসে থামল—তখন রাত প্রায় দশটা। টেবিলের ওপর তাস রেখে দিলেন কমাণ্ডার-ইন-চীফ—সতর্ক চোখ দুটি যেন ঝক-ঝক করে উঠল। গর্বিত চালে ঘরে ঢুকলেন জেনারেল রোমানভ্‌স্কি। লম্বা নধরকান্তি চেহারা, গায়ে অফিসারের গ্রেটকোট, মাথার কসাক হুডটা কাঁধে নামানো, তার দুই মুড়ো বুকের ওপর বাঁধা, আড়াআড়ি ভাবে। জুতোর স্পারে স্পারে শুকনো, টুং টুং শব্দ তুলে তিনি উপবিষ্ট সকলকে টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন।

"আপনাকে নিতে এসেছি, আন্তন ইভানোভিচ!"

"খবর কি, ওরা নামল?"

"হ্যাঁ, নেমেছে।"

"আমাকে এখন একটু মাফ করবেন, জরুরি কাজ," তাড়াতাড়ি বল্লেন দেনিকিন। "তবে আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব।"

হলে গিয়ে ওভারকোট পরবেন, হাতটা যেন ঢুকতেই চায় না। পরতে পরতে ওখান থেকেই ডেকে বল্লেন, "প্রিন্স, আপনি এখানেই থাকুন—একটা রবার পর্যন্ত ডামি নিয়েই খেলতে পারবেন।......না, না, আমি আবার আসব, একাতেরিনা আলেক্‌সিয়েভ্‌না......"

ওঁরা সবাই টেবিলে গিয়ে বসলেন বটে, কিন্তু তাস খেলতে কারও আর ইচ্ছে নেই। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন একাতেরিনা গিন্নী। ভুরু টুরু কুঁচকে টেবিলের ঢাকার ওপর খড়ি দিয়ে ছবি আঁকেন ভাসিলি—ক্ষুদে ক্ষুদে শয়তানের ছবি, আর ফাঁসি কাঠের ছবি। সোফার ওপর ছোট একাতেরিনার পাশে গিয়ে বসেন প্রিন্স। আনন্দে একাতেরিনার মুখ একেবারে লাল—পশম বোনায় ছেদ পড়ল। প নাচাতে নাচাতে প্রিন্স ওঁকে খবর শোনাল—অদ্ভুত এক জ্যোতিষীর নাকি খোঁজ পাওয়া গেছে, তাকে একদিন দেনিকিনের কাছে নিয়ে আসবেন।

"জ্যোতিষী আপনার মাথা থেকে একটা চুল চেয়ে নেবে, নিয়ে সেটাকে বাতির আগুনে পোড়াবে—অমনি দেখবেন তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে......

"আপনার হাত গুণে সে কি বল্ল?"

"বল্ল, অশ্বারোহণে দূর-যাত্রা আমার কপালে লেখা, আহতও হতে হবে তিন বার—তবে শেষকালে বিয়ে হবে খুব ভাল বিয়ে।"

হাসতে হাসতে প্রিন্সের তো প্রায় দম বন্ধ—একসঙ্গে দু পা নাচান আর দোলেন—মনে হয় কে যেন কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে। লালের ছোপ লাগল একাতেরিনার ছোট ছোট কান দুটিতে, কোমল গ্রীবাদেশ আরক্তিম হয়ে উঠল।

"সত্যি, মন আর স্থির থাকে না!" চোখের জল মুছে বলেন একাতেরিনা গিন্নী। "সবারই মেজাজ টেজাজ যেন একেবারে খিঁচড়ে আছে।......এমন হাল হবে তা কি কখনো ভেবেছি?"

"হ্যাঁ, চিন্তা টিন্তা করা আমাদের অভ্যাস ছিল না," জবাব দেন ভাসিলি। উনি তখন বধ্যমঞ্চের কুড়ুল আর পাটাতন আঁকছেন।

"আজব দেশ বটে রুশিয়া......"

কমাণ্ডার-ইন-চীফের যে কথা সেই কাজ: ঘরের বিলেতি ঘড়িটা তীক্ষ্ণ সুরে এগারোটার আওয়াজ দিয়েছে, অমনি জানালার নীচে মোটর হর্ণের কর্কশ শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকে দ্বিতীয়বার ওভারকোট ছাড়তে ছাড়তে দেনিকিন বল্লেন:

"একাতেরিনা আলেকসিয়েভনা, আমি ঠিক জানতাম আজ আপনি টার্কি মুরগি খাওয়াবেন, চেস্টনাট ঠাসা টার্কি......। সুতরাং প্রিন্স আপনাকে একটু কষ্ট করতে হচ্ছে। আমার গাড়ীতে এক বোতল শ্যাম্পেন আছে, সেটা যদি এনে দেন!"

দেনিকিনের মেজাজ খুব শরীফ—খুশিতে হাতে হাত ঘষছেন। কিন্তু রবারের বাকি দান খেলতে আর রাজি হলেন না। "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন! একাতেরিনা আর আমি দুজনেই অগ্রিম আত্মসমর্পণ করছি—শুধু সম্মানটুকু

থাকলেই হল, ব্যস্।" ভাসিলি সাহেবের সোনার কেস থেকে একটা সিগ্রেটও নিলেন, সত্যি, নিয়ে ধরালেন। অথচ এর আগে কোনো দিন সিগ্রেট ধরাননি দেনিকিন।

ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি খাবার দেওয়া হয়েছে, সবাই গিয়ে ডাইনিং রুমে বসলেন। ছোট্ট ঘরটিতে দুটি বাতি জ্বলছে—মৃদু, কোমল আলো পড়ছে ডাইনিং রুমের টেবিলের ওপর, আর সস্তা ওয়াল পেপারের গায়ে। খাঁজ কাটা প্লেটে সাজানো ঘরে-তৈরী মাংসের পিঠে আর আচার-মোরব্বা জিভে জল এনে দেয়। মনে হয় যেন পুরোনো দুনিয়া। দেনিকিনের প্রিয় খাদ্য—সরষে বাটা দিয়ে বাণ মাছ—শুধু সেটাই নেই। অন্য দিনের মতো চিত্তের প্রশান্তিও আজ নেই। অন্যদিন হলে খেতে খেতে খেলার কথা নিয়ে মৃদু তর্ক উঠতঃ "না, না, সত্যি বলছি, আপনার ইস্কাপন পার করে দেওয়া উচিত ছিল," কিংবা "কিন্তু শ্রীমতী, আমি তো ভাল করেই জানতাম ওঁর হাতে টেক্কা, সাহেব আর বিবি আছে, টেবিলের নীচে আমাকে খোঁচা দেওয়ার কি দরকার ছিল?......" আজ কিন্তু সে সব তর্ক একেবারেই নেই।

শিষ্টাচারী প্রিন্স, আবহাওয়ার থমথমে ভাব দেখে সকলের মনোযোগ নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করলেন—পিতার্সবুর্গের এক মুটে সম্বন্ধে এক গল্প লাগিয়ে দিলেন। দাঁতের ব্যাথা, পোড়া ঘা, বিসর্প রোগ—সব নাকি সে মুটেটি সারাতে পারত। সসারের মধ্যে কফির তলানিতে দৃষ্টি দিয়ে জার্মান যুদ্ধ সম্বন্ধেও সে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের কথা এসে পড়ায় গল্পটা একটু বেসুরো বাজল। ভাসিলি সাহেব তাড়াতাড়ি ডিকাণ্টার তুলে নিয়ে সকলকে ভদকা ঢেলে দিতে শুরু করলেন। জোর গলায় বল্লেনঃ

"সত্যি, রুশিয়ার মুটেরা কী আশ্চর্য! আসুন তাদের স্বাস্থ্য পান করি। কখনো যেন মুটের অভাব হয় না রুশিয়াতে!"

এমন সময় টার্কি হাজির। টেবিলের ভিড়ের মাঝখানে আস্তে আস্তে সেটিকে বসানো হল। তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে, টেবিলের বাতির আলো ধোঁয়াতে সামান্য একটু কেঁপে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গম্ভীর দৃষ্টিতে কমাণ্ডার-ইন-চীফ টার্কির প্রগতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একখানা ডানা তুলে নিয়ে বল্লেনঃ

"যাই বলুন, রুশিয়াতে ছাড়া আর কোথাও এমন টার্কি পাবেন না।" দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রিন্স রস্তভ্স্কি, পাকা হাতে শ্যাম্পেনের বোতল খুলে ঢেলে দিলেন গ্লাসে গ্লাসে। কলারে গোঁজা তোয়ালেখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে গ্লাস হাতে ক'রে উঠে দাঁড়ালেন দেনিকিন। চেয়ারের পিঠে হাত রেখে বল্লেনঃ

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! সুখবরটা আপনাদের না শুনিয়ে পারছিনে। ....আজ সকালে ফরাসী ফৌজ ওদেসা বন্দরে অবতরণ করেছে, আর খার্সন আর নিকোলাইয়েভ দখল করেছে গ্রীক সৈন্যদল।......মিত্রপক্ষের যে সাহায্যের

জন্যে এতদিন ধ'রে আমরা আশায় রয়েছি, সে সাহায্য অবশেষে পৌঁছাল।"

একদিন একখানা ব্রিটিশ এরোপ্লেন থেকে একজন যাত্রী নামলেন একাতেরিনোদার-এ। যাত্রীটি এমনই অদ্ভুত যে শহরের শাসক মহল ও মাতব্বর ব্যক্তিরা কিছুতেই আর হদিস পান না তিনি কে। তিনি ভাগ্যান্বেষী সাধারণ মানুষ, না ক্লেমাঁসোর চর, না কোনো হোমরা চোমরা ব্যক্তি—কিছুই আর তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারলেন না। নামের উপাধিটা অবশ্য ফরাসীই বটে—জিরো। কিন্তু আদ্য নাম হল পিঅতর্ পেত্রোভিচ। তার ওপর আবার কথা বলেন রুশ ভাষায়, অনর্গল—একটু দখনে টান আছে যদিও। পাসপোর্টটা উরুগুয়ের, কিন্তু তাতে তো আর জাতি বোঝায় না, বোঝায় শুধু এইটুকু যে ভদ্রলোক বেশ খেলোয়াড় আদমি। উনি পারী থেকে স্টীমারে নভরসিস্ক্ এসেছিলেন—রাইফেল, কার্তুজ, গুলিবারুদ ইত্যাদি মাল এনেছিলেন সঙ্গে। শহরের মিলিটারী কমাণ্ডারের কাছে পরিচয় পত্রটত্র যা হাজির করলেন তা দেখলে তাক লেগে যায়। পার্লামেন্ট মেম্বরদের সুপারিশ, ধর্মবিভাগীয় মন্ত্রীর চিঠি, জনৈক ফরাসী ডাচেসের (তাঁর নামটা উচ্চারণ করা শক্ত) পরিচয় পত্র সবই ছিল তার মধ্যে। এমন কি 'ল্য পতি পারিজিয়েঁ' কাগজের প্রতিনিধি কার্ডও ছিল। এসব যখন শেষ হল তখন উপস্থিত করলেন ব্যবসার প্রস্তাব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হরেক রকম পণ্য, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি তখন ফ্রান্সে গাদাবন্দী। সেই গাদার ওপর ব্যাঙের ছাতার মত কোম্পানীর পর কোম্পানী গজিয়ে ওঠে—তাদের কাছ থেকেই উনি ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

ভদ্রলোকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটাই খাঁটি ইয়োরোপীয়ানের মতো। ফার-এর বর্ডার দেওয়া খাটো কোট,—তাতে স্কাংক-এর লোমের কলার—আজানুলম্বিত চটকদার মাফ্লার, কাঁধ থেকে ক্যামেরা ঝোলানো, সঙ্গে আবার দুটো ঝকঝকে সুটকেশ—একেবারে ফুলবাবু। এহেন ফুলবাবু হঠাৎ সোজা পারী থেকে এসে উদয় হলেন এই দূর মফঃস্বলে, যুদ্ধবিক্ষত একাতেরিনোদার শহরে—মনে হল যেন আকাশ থেকেই পড়েছেন। শহরের কর্তাব্যক্তিরা যতই মাথা ঘামান এ ছাড়া আর জবাব খুঁজে পান না। আহা, আগন্তুক ভদ্রলোকের বাদামী রংয়ের বুট, তাতে কাণা বার করা ইয়া পুরু সোল—দেখতে কী সুন্দর! মিলিটারী কমাণ্ডাণ্ট পর্যন্ত বুট দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। জিরো সাহেব যখন হালকা ছাই রংয়ের বাঁকা টুপি চড়িয়ে মাথা উঁচু করে রাস্তা দিয়ে চলেন, আর সামনে সামনে তাঁর সুটকেশ ঘাড়ে করে চলে কসাক মুটিয়া—তখন রাস্তার লোক কেমন করে চেয়ে থাকে সে কথা না হয় নাই বল্লাম।

সেরা হোটেলের 'বিলাস কক্ষে' তিনি স্থান গ্রহণ করলেন। ঐ ঘরে আগে ছিল মুনাফাখোর পাপরিকাকি আর তার প্রণয়িনী—তারা স্থানচ্যুত হল। শহরে পৌঁছনোর পরদিন জিরো গেলেন জেনারেল দেনিকিনের ওখানে, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

বিব্রত দেনিকিন জেনারেল রোমানভ্স্কিকে দিয়ে মাফ চেয়ে পাঠালেন:

কমান্ডার-ইন-চীফ অসুস্থ তাই আসতে পারলেন না, তবে জিরোর মতো মহৎ ব্যক্তি এই শহরে এসেছেন এ খুব সুখেরই কথা।

তখন জিরো গিয়ে দর্শন দিলেন প্রোফেসর কলাগ্রভভ-এর বাড়ীতে। প্রফেসর সাহেব ডুমার একটি স্তম্ভবিশেষ: দোনাকিনকে কেন্দ্র ক'রে সংস্কৃতি আর রাজনীতিকুশলতার এক বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, নাম দিয়েছেন 'জাতীয় কেন্দ্র।' পারী-র তিনি মহাভক্ত, তা ছাড়া শহরটি তাঁর সুপরিচিত বটে। পারীর স্মৃতিকথা শোনাবার উৎসাহে জিরোকে তিনি আটকে রাখলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টাঃ ছোট ছোট কাফেতে সান্ধ্য ভোজনের গল্প, মঁমার্ত-র পল্লীতে নৈশ প্রমোদের কাহিনী, আরও কত বৃত্তান্ত শুনিয়ে গেলেন। প্রফেসরের এখন ভুঁড়ি হয়েছে, চাপ দাড়িতে চিরুনি পড়েনি বহুদিন—তবু পারীর বুলভারের গন্ধময় স্মৃতি রোমন্থন করে তরুণ বয়সের চাতুরালিই যেন আবার চোখেমুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আ-হা 'শেরামি'*!" বলে লাফিয়ে ওঠেন প্রফেসর সাহেব। "পারীর মেয়েদের সেই অননুকরণীয় সৌরভ—সে যে একান্তভাবে শুধু তাদেরই! সে সৌরভ কি কখনো ভোলা যায়? ইচ্ছে করে পারীর ধুলোতেই চুমু দিয়ে আসি! আশ্চর্য হবেন না—প্রত্যেক রাশিয়ানই যে ফরাসী দেশকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করে। ……আপনার কাগজে এই কথাটি লিখবেন।"

স্থির হল যে, 'জাতীয় কেন্দ্রের' কয়েকজন বাছাবাছা প্রতিনিধি নিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হবে—জিরো সেখানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনাবেন।

অমায়িক বন্ধুর মতো আগন্তুকের জামার বোতাম চেপে ধরে সোৎসাহে প্রফেসর বলে ওঠেন, "শুনুন বন্ধু! যারা আপনার ইয়োরোপের থেকেও আগে বুঝেছিল বলশেভিক বিভীষিকার বিপদ কী ভয়ঙ্কর—তাদের সঙ্গেই ওখানে আপনার দেখা করিয়ে দেব। রেড-রা যে সব কিমা বানিয়ে ছাড়ল! যারা ইতর ছোটলোক, মানুষের মধ্যে যারা অধমেরও অধম, তাদেরই সর্বনাশা ক্রোধ আর আক্রোশ হল বলশেভিজ্‌ম।……আপনারা, এমন কি যারা জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ তাঁরাও, সোশ্যালিজম শুনলেই গড় করেন! আরে ছোঃ! হ্যাঁ, সোশ্যালিজ্‌ম বলে একটা জিনিষ আছে বটে, কিন্তু সোশ্যালিস্ট একজনও নেই। থাকবে কি ক'রে—সোশ্যালিজ্‌ম তো আর বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় না। দেব, সে কথা প্রমাণ করে দেব। বারে বারে অরাজকতার বন্যা আসে, আর সে বন্যা রোধ করে রুশিয়া—এই ইতিহাসের বিধান। আমরা মূল্য দিয়েছি বলেই আজ ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা নিরুপদ্রবে বিস্তার লাভ করতে পেরেছে।……সেই কথা স্মরণ করে লাল প্রেতাত্মার হাত থেকে ইয়োরোপকে তথা সারা দুনিয়াকে বাঁচানোর প্রয়োজন স্মরণ করে আমরা আপনাদের কাছে হাত পেতেছি—আমাদের সাহায্য

---

* প্রিয় বন্ধু

দিন! আমরা সব সুবিধা দিতে রাজি। যে কোনো আত্মত্যাগের জন্যে রুশিয়া প্রস্তুত।......এই কথাই আপনাকে লিখতে হবে......।”

ভোজের আয়োজন এক মহা সমস্যা—সভ্য ভব্য খাবার জিনিষ কি ছাই একাতেরিনোদারে মেলে? চর্বি, হাঁস, আর, শুয়োরের মাংস—ব্যস এ ছাড়া আর কিছু নেই। পারীর লোককে তো আর ডাম্পলিং খাওয়ানো যায় না। ‘জাতীয় কেন্দ্রের’ সভ্য ভোজনবিলাসী ভন লিজে ভোজ্যতালিকা বানালেন: ‘কংসোমে’ সুপ, মাংসের প্যাটি, লাল মদের সঙ্গে মাছের ‘মাতেলত’, আর মুরগি—শুয়োরের পাকস্থলীর মধ্যে বিনা জলে সিদ্ধ করা মুরগি। ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার মতো মদ এল ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার পাপ্‌রিকাকির কাছ থেকে।

‘স্বদেশ’ কাগজের প্রকাশক তথা সম্পাদক শুলগিন সাহেব—তিনি আবার ডুমারও সদস্য—তাঁর ওখানেই খাওয়া দাওয়া। পিয়ত্‌র পেত্রোভিচ সহ ছ’জন অতিথি ঠিক ছটার সময় তাঁর ঘরে হাজির হলেন। খানাটা বাস্তবিকই চমৎকার হয়েছিল। বার্লি-পোড়া থেকে বানানো কফি পরিবেশনের পর জিরোর বক্তব্য শুরু হল:

“ভদ্রমহোদয়গণ, পারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শোনাতে চাই।......আগের দিনের পারী আপনাদের সুপরিচিত। বিদেশীরা তখন বছর বছর চল্লিশ কোটি স্বর্ণ-ফ্রাঁ রেখে যেত পারীতে। সে শহরের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে স্বপ্নচারী মাত্রেরই মাথা ঘুরে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এমন কি যারা সামান্য চিলেকোঠার ঘরে বাস করে, নীচে ঝক্‌ঝকে মোটরের ছাতটুকু দেখেই যাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়—তাদের পর্যন্ত মাথা বিগড়ে যেত! কিন্তু হায়, স্বপ্ন দেখার মানুষ আর পারীতে নেই, যারা দেখত তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে সম নদীর তীরে তীরে, পুতিগন্ধ ছড়াচ্ছে আর্দেনে, শ্যাম্পেনে। কলহাস্যমুখর পারীতে মানুষ একদিন পথে পথে নেচে গান গেয়ে ফিরেছে। রাজা লিওপোল্ডের দাড়ি নয়তো কোন্ রাশিয়ান গ্র্যান্ড ডিউকের প্রেমঘটিত দুর্ঘটনা—তাই নিয়েই তারা হেসে খুন হয়েছে। কিন্তু পারীর সে হাসি আজ কোথায়? পারী তথা ফ্রান্সে এখন পনের লক্ষ লোকের ঘাটতি, এরা সব যুদ্ধে মরেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাচ্চা ছেলে দেখতে পাবেন শহরে—অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিই তাদের পেশা। কাফে, রেস্তরাঁয় খালি বিষণ্ণবদন বৃদ্ধের দল। বিশ ফ্রাঁ দরের বেশ্যারা পর্যন্ত তাদের মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না। ট্যাক্সি আছে, গুলি-খাওয়া তোবড়ানো ট্যাক্সি, খোয়া-ওঠা রাস্তার ওপর ঝড়্‌ঝড়্‌ করে চলে। উঁচুদরের কাফে-রেস্তরাঁয় এখনো আমেরিকান সৈন্যদের অবাধ প্রবেশ। সৈন্য না তো যেন এক একটি দাগী ষাঁড়! আর মেয়েরা? নাঃ তারা দমবার পাত্র নয়। তাদের স্কার্ট এখন হাঁটু পর্যন্ত—আর আণ্ডারওয়্যার পরার রেওয়াজই উঠে গেছে।”

“আর একটু পরিষ্কার করে বলুন!” টেবিলের কোথা থেকে যেন আওয়াজ এল।

“থিয়েটার কি রেস্তরাঁয় গেলে দেখবেন—যেটুকু ঢাকার দরকার নেই মেয়েরা

শুধু সেটুকুই ঢাকে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, মেয়েদের পোষাক হল দুটো সরু ফালি আর তার সঙ্গে আটকানো এতটুকু একটু স্কার্ট। হাঁটু পর্যন্ত খালি পা দেখানোই আজকাল রুচির পরিচয়। আর পারীর মেয়েদের পা যে কী সুন্দর তা তো জানেনই। আন্ডারওয়্যার না থাকলে কি আসে যায়? এবং তৈরি আন্ডারওয়্যার—মানুষগুলো যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে এত কষ্ট সইল সে কি শুধু শুধু? যাকগে, এ সব তো তুচ্ছ কথা। পারী আজ বিজয়িনী। অন্ধকার, নোংরা—তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধোঁয়া ধোঁয়া দ্ব্যর্থবোধক কথায় আর উত্তেজনায় শহর একেবারে গুলজার। বিশ্বযুদ্ধে জিতেছে পারী, এবার বিশ্ব-প্রতিবিপ্লবেও জিতবে, তার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।"

অতিথিদের মধ্যে তিনজনের মুখে চাপা হর্ষধ্বনি। চতুর্থ অতিথি রুটির গুঁড়ো পাকিয়ে বড়ি তৈরী করতে ব্যস্ত, তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। ধরা ছোঁওয়া না যায় এমনভাবে মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকি দিলেন পঞ্চম জন।

"ক্রোধোন্মত্ত শার্দুল আজ পারীতে বাসা বেঁধেছে; প্রতিহিংসার জন্যে ছটফট করছেন ক্লেমাঁসো। শান্তি স্বাক্ষরিত হবার আগেই (স্বাক্ষর অবশ্য শীঘ্র হবে না) অবরোধ আর দুর্ভিক্ষের সমস্ত বিভীষিকা ভোগ করতে হবে জার্মানিকে। জার্মানির দন্ত-নখর এমনভাবে উপড়ে ফেলা হবে যাতে আর কোনো দিন না গজায়। ব্যক্তিগত আলাপ প্রসঙ্গে সেদিন ক্লেমাঁসো বলেছেন ঃ 'তৃতীয় শ্রেণীর জাতি ছাড়া আর কিছু হবার আশাটুকু পর্যন্ত জার্মানদের মন থেকে উৎপাটিত করে দেব। উপোসে মরবে না একেবারে, মটর আর আলু তো আছে।' কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, পঞ্চাশ বছর আগে তাঁকে তো শুধু সেদান-এর অপমানই সইতে হয়নি, পারী কমিউনের বিভীষিকাও চুপচাপ বরদাস্ত করতে হয়েছিল। সাংবাদিকদের সঙ্গে ভোজে বসে ক্লেমাঁসো একদিন পুরোনো স্মৃতি ঝালাচ্ছিলেন ঃ ওঁর চোখের সামনে কমিউনার্ডরা সম্রাট নেপোলিয়নের স্মৃতি-স্তম্ভটা উল্টে ফেলে দিল (তার জন্যে কত দড়াদড়ি, কত যন্ত্রপাতি!), ভগ্নাংশ উড়িয়ে গেল প্ল্যাস ভাঁদোমের পথের ধুলোয়; সেদিন ওঁর মনে কী হয়েছিল তাই বললেন ঃ 'স্তম্ভের ধ্বংস দেখে তো আমি ততটা ভয় পাইনি—ভয় পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, যে-ভাবধারার ফলে ফরাসী শ্রমিকরা আজ ধ্বংসের প্রেরণা পেল, সে ভাবধারা কী ভয়ঙ্কর! সভ্যতার সামনে এখন সাংঘাতিক বিপদ। আপাতত সে বিপদ হয়তো এড়ানো যেতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের হাতে যেদিন অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে সেদিন সে বিপদ আবার আসবে, আসতে বাধ্য। দুদিকে দু শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে বটে, কিন্তু সেদানের প্রতিশোধ আমরা সেই দিনই পূর্ণ করব।' দেখুন মহাশয়েরা! ক্লেমাঁসোর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে ঃ যুদ্ধ থেকে ছাড়া পেয়ে সৈন্যেরা ফিরে আসছে পারীতে। ভেদ্যঁ আর সম্-এর বিভীষিকা থেকে যারা বেঁচে ফিরল, প্রতিরোধের বেড়া তোলা আর রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধে নামা তো তাদের কাছে ছেলেখেলা। শহরের সমস্ত শরাপখানায় তারা আজ চীৎকার করে বেড়াচ্ছে—আমরা ঠকেছি, আমাদের ঠকিয়েছে। লোকও

জমছে তাদের পাশে। ওরা বলছে ঃ যারা লড়ল তারা পেল ব্যাজ আর মেডেল আর কাঠের পা; আর যাদের জন্যে লড়ল তারা নিল নগদ বিদায়—লক্ষ লক্ষ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির ফলে বুর্জোয়াদেরও সর্বনাশ হয়েছে, তারাও ঐ অসন্তোষের দিকে চলছে। পারীর শহরতলীতে আজকাল দারুণ বিক্ষোভ। কারখানায় কারখানায় কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পারী ব্যারাকে সৈন্যদের মন মেজাজও কিছু ঠিক নেই। ওদিকে বিপ্লবের ভূমিকম্প লেগেছে জার্মানিতে, থামাতে গিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা একেবারে হিমসিম। আর হাঙ্গেরি তো সোবিয়েত প্রতিষ্ঠা করল বলে।......ইংলণ্ডে স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইক, ঢেউয়ের মতো—তার মধ্যে লয়েড জর্জ গবর্নমেণ্ট কোনো রকমে জান বাঁচিয়ে চলতে চায়। সবারই এখন চোখ পড়েছে ক্লেমাঁসোর দিকে। তিনি ছাড়া আর কেউ তো বোঝেন না যে, ইয়োরোপে বিপ্লবের দফা রফা করতে হলে ঘা দিতে হবে এখানে, এই আপনাদের মস্কোতে। মাছ ধরার জালে যখন অক্টোপাস আটকায় তখন ইতালিয়ান মেছুয়ারা কি করে জানেন? অক্টোপাসের বায়ুস্থলীটাই কামড়ে ফুটো করে দেয়—ব্যস, বাছাধনের রক্তচোষা শুঁড়-টুঁড় সব একেবারে নিঃঝুম, নিস্তেজ।"

অতিথিরা শুনে যান—কেউ চুলের মধ্যে হাত চালাচ্ছেন, কেউবা ঝাপসা চশমা চোখ থেকে নামিয়ে আনছেন। আর একটা চুরুটের কোণা কাটবার জন্যে জিরো একটু থামলেন। অমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঃ

"ক' ডিভিশন ফরাসী সৈন্য ওদেসা গেছে?"

"ফরাসীরা কি দেশের অভ্যন্তরভাগে অভিযান করার ইচ্ছা রাখে?"

"জারিতসিনে ক্রাস্‌নভের আক্রমণ যে আবার ব্যর্থ হলো সে খবর কি পারীতে পৌঁছেছে? ক্রাসনভকে সাহায্য দেওয়া হবে?"

"রুশিয়া নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা কি শেষ? কোন্ কোন্ অঞ্চলে কার কার প্রভাব থাকবে? ভলাণ্টিয়ার আর্মিকে দস্তুরমতো সাহায্য দেওয়া হবে তো? সে ভার কার ওপর?"

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন জিরো ঃ

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এমনভাবে প্রশ্ন করছেন যেন আমিই ক্লেমাঁসো", তিনি বললেন। "আমি তো সাংবাদিক মাত্র। কাগজওলারা আমাকে পাঠিয়েছে—রুশিয়ার ব্যাপার নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছে, তাই ফৌজ টৌজকে সরাসরি সাহায্য দেওয়ার সমস্যাটা ক্রমেই বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খামোখা কাউকে চটানো লয়েড জর্জের ইচ্ছে নয়। তিনি যদি নভরোসিস্কে ইংরেজ সৈন্য পাঠান, শুধু দু' ব্যাটেলিয়ান পদাতিকই পাঠান, তাহলে আসন্ন উপনির্বাচনে তাঁকে দু' ডজন ভোট হারাতে হবে। আমি যা শেষ খবর পেয়েছি বলছি ঃ প্লেনে চড়ে লয়েড জর্জ ছুটেছেন পারীতে (সেদিন ঝড় হয়ে যাওয়ায় ইংলিশ চ্যানেলে এখন হরদম মাইন ভাসছে, তাই প্লেনে গেছেন)। 'কাউন্সিল অব টেন'-এর কাছে তিনি যা মত প্রকাশ করেছেন—এই দিন দুই আগে—তা হল ঃ অনতিবিলম্বে বলশেভিক গবর্নমেণ্টের পতন হবে বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু সে আশা

পূর্ণ হয়নি। বলশেভিকরা বরং আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, জনসাধারণের মধ্যেও তাদের প্রভাব বাড়ছে, এমনকি চাষীরা পর্যন্ত তাদের দিকেই ঝুঁকে আসছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মস্কো-সুজ্দাল রাজত্বের সময় রুশিয়ার সীমানা যতদূর বিস্তীর্ণ ছিল তাই তার স্বাভাবিক পরিধি: আজ বলশেভিক রুশিয়া সেই স্বাভাবিক সীমানাতেই ফিরে গেছে, তাছাড়া রুশিয়া থেকে এখন কোনোপক্ষেরই কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা নেই—সুতরাং পাবীতে কাউন্সিল অব টেল'-এর দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে মস্কো গবর্নমেণ্টকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। রোম সাম্রাজ্যের আমলে রোমের অধীনস্থ মফঃস্বল জেলার শাসকদের যেমন রোমে ডেকে পাঠান হত—তাদের কাজে-কর্মের রিপোর্ট পেশ করবার জন্যে—সেইভাবেই মস্কোকে ডেকে পাঠান হোক।......এই হল পশ্চিমের পরিস্থিতি, বুঝেছেন?......কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান কি?"

এই ভোজসভার ক'দিন পরে ('জাতীয় কেন্দ্রের' ইতিহাস ভোজসভার বিবরণ প্রফেসর কলোগ্রিভভ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মিলিটারি কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে রিপোর্ট দিতে এসেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে খবর শোনালেন:

"মহামান্য কমাণ্ডার-ইন-চীফ বাহাদুর! স্যাভয় হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে একটা দোকান বসেছে—তারা শুধু সোনা আর হীরে কেনে, ব্যস আর কিছু নয়। দাম দেয় দন সরকারের নোটে। এত চড়া দাম—ব্যাপারটা মোটেই সুবিধে হচ্ছে না।...নোটগুলো নিয়ে সন্দেহ উঠেছে—সব একেবারে আনকোরা নতুন নোট..."

"সব ভাতেই আপনার সন্দেহ, ভিতালি ভিতালিয়েভিচ", মিলিটারি বুলেটিনে চোখ বুলোতে বুলোতে রাগত সুরে বল্লেন দেনিকিন। "আমাকে না জানিয়ে আপনি ফের একজন ইহুদীকে বেত লাগিয়েছেন, অথচ সে ইহুদীও নয়, সে ওরেলের জমিদার।......ওরেল জেলায় বহু লোকেরই কালো চুল থাকে, অনেককে তো দেখলে জিপ্সি বলেই মনে হয়।......ওঃ আপনি যে কি বিভ্রাটই বাধাতে পারেন!"

"মাফ করবেন হুজুর, একটুখানি ভুল হয়ে গিয়েছিল। ....কিন্তু ঐ যে দোকানটার কথা বলছিলাম—ওর লাইসেন্স হচ্ছে চোরা-কারবারী পাপ্রিকাকির নামে। কিন্তু খোঁজ করে জানা গেছে, সন্দেহজনক নোটের সাহায্যে যিনি ঐ দোকানের মূলধন জুগিয়েছেন, অর্থাৎ যিনি দোকানের আসল মালিক, তিনি এই পর্যন্ত এসে কম্যাণ্ডাণ্ট একেবারে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়লেন—অবশ্য ভুঁড়ির পরিধি অনুসারে যতখানি নীচু হওয়া সম্ভব ততখানি), তিনি হলেন সেই ফরাসী ভদ্রলোক—পিয়তর পেত্রোভিচ শজিরো।"

কাগজ টাগজ এবার টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দেনিকিন। সজোরে বলে উঠলেন:

"দেখুন কর্ণেল, সামান্য কটা হার আর আংটির জন্যে আপনি ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বিপন্ন করতে চান? ঐ দোকান নিয়ে আর কি করেছেন?"

"ওদের ক্যাশবাক্স সীল করিয়ে দিয়েছি।"

"যান, এখুনি গিয়ে সব সীল টিল খুলে দিন। ওদের কাছে মাফ চেয়ে আসুন। নইলে......"

"তাই হবে চীফ বাহাদুর!"

ভুঁড়ি নিয়ে পা টিপে টিপে পার হয়ে গেলেন কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের সাদা গোঁফজোড়া একটু একটু কাঁপে. অনেকক্ষণ ধরে বুলেটিনের ওপর খালি আঙুলই বাজিয়ে চল্লেন। মিলিটারি বুলেটিনের ওপর আঙুল ঠুকে চল্লেন অনেকক্ষণ ধরে।

"পাজীর জাত!" বল্লেন দেনিকিন। গালাগালটা তিনি নিজের জাতকে দিলেন, না ফরাসী জাতকে—তা বোঝা শক্ত।

॥ পনের ॥

প্রখ্লাদ্নি গ্রামে পৌঁছে আবার আর এক দফা আশাভঙ্গ—হতাশা যেন রশাচনের জন্যে অপেক্ষা ক'রেই বসে ছিল। ঐ গ্রামে ক্রাসিল্নিকভদের সঙ্গে কাতিয়া যে বাড়ীতে থাকত সে বাড়ীর দরজা হাট খোলা। পায়ের চিহ্ন টিহ্ন কিছুই নেই, তাজা সাদা বরফে সব ঢাকা পড়ে গেছে। পরিত্যক্ত কুটিরের চৌকাঠের ওপর বরফের স্তূপ—চালা থেকে জল পড়ে বরফ গলতে শুরু করেছে।

স্ত্রীলোক দুটিকে নিয়ে ক্রাসিলনিকভ যে কোথায় গেল তা কেউ বলতে পারল না। ক্রাসিলনিকভ নামে একটা লোক ছিল বটে, তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু সে কোথা থেকে এসেছিল, তার বাড়ী কোথায়, অতশত কে জানে? কত লোকই তো মাখনোর কাছে ভেসে আসে!

বহু দিন ঠাণ্ডা পড়ে আছে উনুনটা, ঘরের ভেতর তারই গন্ধ। মেঝের ওপর এক গাদা আবর্জনা। ভাঙা শার্সির ফাঁক দিয়ে বরফ এসে ঘরে ঢুকেছে। খসে খসে পড়েছে দেওয়াল—তার পাশে দুটো চৌকি, একদম খালি। কাতিয়া চলে গেছে। দেওয়ালের গায়ে ছায়াটুকুও রেখে যায়নি। কত কষ্টের পর দুজনের পথ যদি মিলল, তবু দেখা হ'ল না—বড্ড দেরী হয়ে গেছে!

এবড়ো খেবড়ো চৌকি, তার একটার ওপর ভাদিম বসে পড়ে। কোন্ চৌকিতে ওরা ফুলশয্যা পেতেছিল, তাই ভাবে। আলেক্সির তো বেশ সুন্দর চেহারা—লজ্জা টজ্জাও বিশেষ নেই।...নিশ্চয়ই ওকে বলেছিল, "কান্নাকাটি তো হ'ল আর কেন, এবার চোখ মোছ!" রূঢ়ভাবে কখনই বলেনি—ভদ্রমহিলার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবে অমন বোকা সে নয়। খোশমেজাজেই বলেছিল নিশ্চয়, বেশ কর্তৃত্বের ঢঙে। ...আর পুশি অমনি চুপ, যা বলেছে মাথা পেতে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। ব্রীড়াবনতা শুচিশুভ্র কাতিয়া তো আলেক্সির ইচ্ছায় বাধা দিতে যাবে না...দেওয়ালে মাথা ঠুকেও মরবে না। না, ও তার স্বভাব নয়। উদাসীন জড়ের মতো ও হয়তো এই অবলম্বনই জড়িয়ে ধরেছে। ভুঁই-কুমড়োর লতা যেমন গাছের গুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে, তিক্ত-রসের ফুল ছড়িয়ে দেয়—তেম্নি।

ঘরের মধ্যে এলোমেলো পায়চারি করে রশাচন—পায়ের নীচে খালি টিন-গুলো চেপ্‌সে যায়। না, না, আমার কলুষিত, অসংযত কল্পনা মিথ্যা কথা বলেছে। কাতিয়া কখনোই আত্মসমর্পণ করেনি, সে লড়েছে, বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছে। তার পবিত্রতা নষ্ট হয়নি। উঃ কী ভয়ঙ্কর ইতর আর কাপুরুষ

আমি! আমার স্মৃতির প্রতি ও অনন্যমনা হয়ে থাকবে, তাই কি আশা কর যায়? আর আমি নিজে, নিজে কি করতাম? এখানে এই মড়মড়ে খাটে ওপর ওদের দুজনকে দেখতে পেলে খুনই করে ফেলতাম না? কিংবা হয়তো চৌকাঠের ওপার থেকে চেয়ে থাকতাম—কাতিয়ার চোখে চোখ রেখে জানতাম কোন্ দুনিয়া আজ হারিয়ে গেল। হয়তো বলতাম, "মাপ কোরো, তোমাদের পথে যেন কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছি বলেই মনে হচ্ছে!" উঃ শেষকালে এ কী যন্ত্রণা, এ কী অগ্নিপরীক্ষা! আর সহ্য হবে না? হবে, সহ্য হবে! খোঁজো কাতিয়াকে, খোঁজো, খোঁজো......বাঁকামুখো কারেৎনিক, সেই রশাচিনকে প্রোখ্লাদ্নি নিয়ে এসেছিল—গাড়ীতে বসে সে ওর অপেক্ষা করছে। গেট পার হয়ে গাড়ীতে উঠল রশাচিন, ঝোড়ো হাওয়া থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে কোটের কলারটা উঠিয়ে দিল। চার ঘোড়ার গাড়ী, চালাচ্ছে 'বোবা মহারাজ'। সে মাখনোর খাস ড্রাইভার তথা বডিগার্ড। আবার জল্লাদও বটে। মাখনোর মুখ থেকে শাস্তির হুকুম বেরুতে না বেরুতে ও গিয়ে তামিল করে আসে। বেশী কথা বলে না। ঢেঙ্গা গোছের চেহারা, তার ওপর মুখের নীচের দিকটা এমন বিদ্ঘুটে লম্বা, মনে হয় যেন বাঁকা আয়নায় মুখ দেখছি। ওর বেপরোয়া গাড়ী চালানোর চোটে বসে থাকা দায়—গাড়ীর দু'পাশে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে হয়।

গাড়ীর ধাক্কায় ঢক ঢক করতে করতে চলেছে রশাচিন। কারেভনিক কথা বলতে শুরু করল—ভাবটা এমন যেন রশাচিনের সঙ্গে কত কালের জানাশোনা:

"আরে আহাম্মক, প্যান প্যান কর কেন? বুড়ো কত্তা যখন হুকুম দিয়েছে যে তোমার বৌকে খুঁজে আনতে হবে—তখন সে যেখানেই থাক ঠিক খুঁজে আনা হবে। পোড়া কপাল! এই নিয়েই তোমার এত ভাবনা? আরে, মেয়েদের বাইরের দিকটাই শুধু রং করা, তফাৎ যা সে ঐ বাইরে। আর একটু ভেতরে যাও, দেখবে সব মেয়েই সমান। উৎপাত, মেয়েগুলো সব মহা উৎপাত।..... যেতে দাওনা তোমার ওকে—আলেক্সি কি আর সে ছাড়বে? ওর জন্যে তিন তিন গাড়ী লুট এনে দিল আলেক্সি!......কম্প্যানীর মধ্যে ও-ই ছিল সেরা লুটেরা—বরাত ভাল, ঠিক সময় থাকতেই কেটেছে......"

ওল্টানো কলারে রশাচিনের ভুরু পর্যন্ত ঢাকা। মনে মনে ও শুধু একটা কথাই উচ্চারণ করে, বার বার: "হবে, সহ্য হবে! আমার অগ্নিপরীক্ষা তো সবে শুরু হ'ল......"

গুলিয়াই-পলিয়ের খোয়াবাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে পুরো দমে গাড়ী ছুটেছে—ঘোড়া চারটে একেবারে ঘেমে সারা। শেষকালে সদর দপ্তরের সামনে এসে বোবা মহারাজ গাড়ী থামাল। রশাচিনের জন্যে লোক ছিল, আসবামাত্র মাখনোর কাছে তার ডাক পড়ল। ইস্কুলের ঠাণ্ডা ক্লাসরুমে তখন যুদ্ধ পরিষদের বৈঠক চলেছে, আবহাওয়া বেশ গম্ভীর। ছোট ছোট ডেস্কে আর বেঞ্চিতে কমাণ্ডাররা বসেছে কোনোরকমে। বাদামি রংয়ের ক্রসবেল্ট লাগানো কালো কুর্তা গায়ে দিয়ে সভাপতি মাখনো ডেস্কের সামনে পায়চারি করছে, ঠিক

চিতাবাঘের মতো। নেশাটেশা কিছু করে নি তা বোঝাই যায়, কিন্তু সেইজন্যেই মুখটা যেন আরও ভিজে ভিজে দেখায়। হাত দুটো পেছন দিকে—আল্‌গা বাঁ হাতটাকে ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। সেকেণ্ডখানেকের জন্যে ওর স্থির দৃষ্টি যেন রশ্‌চিনকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেল।

"আপনাকে একাতেরিনোস্লাভ যেতে হবে", চাঁছা গলায় মাখনো বল্ল, বিপ্লবী কমিটির কাছে আমার নির্দেশ নিয়ে যাবেন। অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা হচ্ছে আপনি তা দেখেশুনে নেবেন—আপনি আমার সেনানীমণ্ডলের প্রতিনিধি। যান!"

চটপট সেলাম ক'রে রশ্‌চিন ঘুরে দাঁড়াল, তারপর একেবারে ঘরের বাইরে। গলিপথে লেভ্‌কা অপেক্ষা করছিল।

"সব ঠিক হ্যায়। এস, তোমার নির্দেশ আমার কাছে", লেভ্‌কা বল্ল। রশ্‌চিনের কাঁধে হাত দিয়ে টানতে টানতে উরুতের এক ধাক্কায় একটা দরজার কাছে এনে ফেল্ল। "তোমার গ্রেটকোট ছাড়। তার বদলে ফার-কোট দিচ্ছি।"

তিনটে তিন রকম চাবি দিয়ে দরজাটা খুল্ল—তখনও রশ্‌চিনের কাঁধে হাত। "এটি একেবারে আমার নিজের জিনিস—কী চমৎকার লোম! লেভ্‌কার সঙ্গে ভাব রাখাই ভাল, বুঝেছ? লেভ্‌কার বন্ধু হলে তার আর কিসের পরোয়া?"

এবার রশ্‌চিনকে আর একটা ঘরে নিয়ে এল। ঘরটাতে বাসি বাসি গন্ধ—ঠিক সেই 'শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্রের' ঘরটার মতো। এন্তার হামবড়াই করে চলে লেভ্‌কা—বলে, দেখ আমার কত সম্পত্তি। জিনিষপত্রে ঘর একেবারে বোঝাই, এলোমেলো পড়ে আছে। রশ্‌চিনের জন্যে একটা কোট বেছে আনল, বাস্তবিকই কোটটা ভারী সুন্দর। তবে সামনে আর পেছনে গোটাকয়েক বুলেটের ফুটো আছে। মোটা মানুষ—হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানার তলা হাঁটকে এক বোঝা টুপি বার করল। তার মধ্যে থেকে লাল চুড়োওলা একটা সুন্দর ল্যাম্‌স্কিন টুপি বেছে নিয়ে ঘরের ওদিকে রশ্‌চিনকে ছুঁড়ে দিল—মাঝপথেই রশ্‌চিন ওটাকে লুফে নেবে সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ। শেষকালে একেবারে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে দেওয়াল থেকে টেনে নামালো একখানা তলোয়ার—রুপো বাঁধানো ককেশিয়ান তলোয়ারঃ "নাও, এটাই বা থাকে কেন? এ তলোয়ার ছিল্ল গার্ড দলের এক অফিসারের......।" তারপর ওর নিজের সাজসজ্জা—দু' হাতে দুটো রিস্টওয়াচ চড়িয়ে জ্যাকেটের ওপর বেল্ট কষল। বেল্ট থেকে দুটো মজার পিস্তল ঝুলছে আর একখানা তলোয়ার—তলোয়ারের খাপটা পুরোনো। আঙুলের ডগায় তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করতে করতে লেভ্‌কা বল্লঃ "এটা আমার আটপৌরে তলোয়ার।" গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু রবারের ওভারশু, তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে টিপ্পনী কাটলঃ "কে বলে আমি ঘোড়সওয়ার নই?..." তারপর শীপস্কিন কোট—একেবারে সব পোষাকের ওপর। কোট চাপিয়ে লেভ্‌কা হাঁকলঃ

"চলে এস দোস্ত! আমাদের দুজনকে তো একসঙ্গেই যেতে হবে।"

বোবা মহারাজ ঠিক হাজির। তার গাড়ীতে চড়ে এবার যাত্রা স্টেশনমু

“ওর গায়ে ভীষণ জোর”, কথাটা লেভকা এমনভাবে বল্ল যাতে ড্রাইভা শুনতে না পায়। “ও আগে কয়েদী ছিল। বুড়ো কত্তা আর ও, দুজনে মিলে চম্পট দিয়েছিল জারের জেলখানা থেকে। কেউ ওর দিকে চাইলে ও আবার চটে ওঠে, বুঝলে? ওকে বাঁচিয়ে চলবে। আমি যে আমি, আমিও ওকে ভ করি......”

লেভকার মেজাজ খুব শরীফ। আপখুশীভাবে আরামে ঠেস দিয়ে বসে

“তোমার বরাত ভাল রশাচিন, আমার সুনজরে পড়ে গেছ।......অভিজা শ্রেণীর লোকদের আমি পছন্দ করি।......সেদিন তিনটে প্রিন্সকে সাবাড় কর হল, গলিৎসিনদের তিন ভাই।......খাসা দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু, টলল না। দেখ বেশ লাগে।”

রেলগাড়ীতে উঠেও সমানে সেই একই বক্তৃতা। স্টেশনের হোটেল থে লেভকা আবার মদ আর বিস্কুট টিস্কুট আনিয়ে নিল, কোট খুলে বেল্টটা ঢি করে দিল।

“বিশ্বাস করা শক্ত,” শুয়োরের চর্বি থেকে মোটা মোটা চাকলা কাট কাটতে লেভ্‌কা বলে, “সত্যি বিশ্বাস করা শক্ত যে, তুমি আগে কখনো আমা নাম শোনোনি। ওদেসাতে তো আমি ছিলাম রাজা—টাকা বল, ছুঁড়ী বল, চাই তাই।......আর কেউ হলে হজমই করতে পারত না, আমার অসম্ভব শক্তি তা সহ্য হল। ওঃ যৌবন কী চীজ! কাগজে কাগজে আমার নামে কত প্রব বেরুত ঃ ‘জাদভ—কবি ও হাস্যরসিক।’ এ সব কথাও তোমার মনে পড়ছে না কী যে বল! আমার জীবনকাহিনী শোনার মতো। ইস্কুল থেকে পাস ক বেরুনোর সময় সোনার মেডেল পেয়েছিলাম। পেরেসিপ্‌-এ বাবা তখন গর গাড়ী চালান, আর এদিকে আমি একেবারে কেউকেটা বনে গেছি। হবই বা ন কেন ঃ ইয়া খুবসুরত চেহারা—তখন তো ভুঁড়ি ছিল না—দারুণ সাহস, ডো কেয়ার ভাব, তার ওপর অপূর্ব গলা—ভারী আর হাল্কার মাঝামাঝি। রসা কবিতাও লিখেছি ঝুড়ি ঝুড়ি। আর ঐ যে নতুন ফ্যাশান—গায়ে খাটো শীপ স্কিন কুর্তা, পায়ে পেটেণ্ট লেদার বুট—ঠিক যেন নাইট বাহাদুর—সে ফ্যাশ তো আমিই চালু করি! আমার নামে ওদেসাতে পোস্টার পড় পোস্টারের পর পোস্টার। হুঁঃ, তা বলে জাদভ কি অ কণ্টটষ্টের তোয়াক্কা রাখে—এক কথায় সব ছেড়ে দিল! সাবাস অরাজক তন্ত্র—এই তো আসল জীবন! একেবারে রক্তের ঘূর্ণিস্রোতে ভেসে চলেছি আরে কথা বল না কেন চাঁদ, লেভকার সঙ্গে ভাল করে ভাব ক'রে ফেল, বুঝেছ এতদিনে তোমার রাগ কি আর পড়েনি? এখন একটু চেষ্টা করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও দেখি। আমার কথা শুনলে অনেক লোকেরই মুখ শুকি যায়।......কিন্তু যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই, তারা আজীবন অনুগত থাকে।.... তারা আমাকে ভালবাসে, ওঃ কী ভালই না বাসে......”

রশ্‌চিনের মাথাটা বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে। সকাল বেলায় সেই আকস্মিক সাক্ষাতের পর ওর খালি ইচ্ছা করে কোথাও গিয়ে হাউহাউ করে কাঁদে; হলদে রঙের চাঁদটার দিকে চেয়ে কুকুরগুলো যেমন নির্জনে হাউ হাউ করে—তেমনি। এখন আবার অপ্রত্যাশিত কর্তব্যের ভার পড়ল। সংক্ষিপ্ত দু'কথার হুকুম, হেঁয়ালির মতো, তাই শুনেই ছুটতে হল। এ আবার আর এক পরীক্ষা। চালে একটু ভুল করে কি সন্দেহ জাগে তাহলেই প্রাণ দিতে হবে তা বুঝতে কষ্ট হয় না—ঐ জন্যেই তো লেভকাকে সঙ্গে দিয়েছে। আচ্ছা এই যে, বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে ইন্সপেক্টর হয়ে যাচ্ছি, সে কমিটিটা কি জিনিষ? অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তদারক করতে হবে, কিন্তু তাই বা কি? কে অভ্যুত্থান করবে, কার বিরুদ্ধে? লেভকা জানে অবিশ্যি। কয়েকবার লেভকাকে প্রশ্ন করল—এমনভাবে যাতে জবাব আপনিই বেরিয়ে আসে। কাকস্য পরিবেদনা! লেভকা শুধু ভুরু তুলে কাঁচের মতো নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আর এন্তার হামবড়াই চালায়—যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি। শুপ্‌ শাপ্‌ শব্দ করে খায়, মুখটা পর্যন্ত মোছে না। শেষকালে এমন লাল হয়ে উঠল যে, ফুলকাটা জামার কলার টলার খুলে তবে শান্তি।

ভাদিমও এক গ্লাস পানীয় গলা দিয়ে নামাল, একটা মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে চিবিয়ে চল্ল যন্ত্রের মতো—কিন্তু কোনো তৃপ্তি নেই। বিকট, বীভৎস জানোয়ারটাকে দেখলে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে—বিতৃষ্ণা দমন করতে করতে ওর প্রাণ বেরিয়ে যায়। উপন্যাসের পাতায়ও এহেন পিশাচ কখনো চোখে পড়েনি! সেটা আবার নিজের মতো বাণীও ঠিক করে রেখেছে: "রক্তের ঘূর্ণিস্রোতে ভেসে চলেছি!" রশ্‌চিনের মাথাটা এতক্ষণ যেন সাঁড়াশীর প্রচণ্ড চাপে বন্ধ ছিল ধমনীতে সুরার স্রোত বইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন আলগা হয়ে এল। আগে যে যন্ত্রের মতো বারে বারে শুধু ব্যর্থ পুনরুক্তি করছিল—"হবে, সহ্য হবে"—তার বদলে এখন ওর মনে বে-পরোয়া আত্ম-বিশ্বাসের ভাব এসেছে।

"ন্যাকামি থামাও তোমার" বল্ল লেভকাকে। "বুড়ো কত্তা অমাকে বেশ নির্দিষ্ট রকম কাজের ভার দিয়েছে। দেখ, আমি মিলিটারির লোক, হেঁয়ালি চেঁয়ালি বুঝিনে। ব্যাপারটা কি, খুলে বল দেখি।"

লেভকার মুখের হাসি যেন আবার শুকিয়ে গেল। মোটা হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোমকূপ—সেই হাত দিয়ে গ্লাসের ওপর বোতল ধরে আছে।

"আমার পরামর্শ শোনো—বেশী প্রশ্ন কোরো না, বেশী কৌতূহলও দেখিও না। ব্যবস্থা সব আগে থেকেই ঠিক আছে।"

"তার মানে আমার ওপর বিশ্বাস নেই, কেমন? তাহলে আমাকে পাঠাচ্ছেই বা কোন্‌ কম্মে?"

"কাউকে বিশ্বাস নেই। আমি তো বুড়ো কত্তাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিনে। ওসব ছাড়, এস আর একটু টানা যাক!"

এমন প্রকাণ্ড হাঁ যে গেলাসটা একেবারে ভেতরেই চলে যায়। ধীরে ধীরে গলা দিয়ে মদ ঢালে লেভকা। মুখে গন্ধ, বোটকা বোটকা গন্ধ—চিনি কিংবা কাঁচা

মাংসের মতো।......মাথায় একরাশ চুল, বিদ্যুতের তেজে পটপট করে। চুলগ
ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে ও এবার একটা মুরগির ঠ্যাং নিয়ে পড়ল।

"আমি হলে এ কাজের ভার নিতাম না। বুড়োকত্তা হুকুম দিয়েছে তো কি হয়েছে—সে তো বোকা বানাতেই ভালবাসে। এমন গোলমালে ফাঁসবে তুমি বুঝলে চাঁদ......"

হো হো করে হেসে ওঠে রশচিন—মুখটা জোরে জোরে ঘষে।

"আমাকে কি কেটে পড়তে বলছ নাকি? পায়খানায় গিয়ে চলন্ত ট্রেন থে ঝাঁপ দিই, কি বল বন্ধু?"

"কী আর বলা? আমার যা মনে হয় তা তো শুনলে, এখন নিজে যা বো ঠিক কর।"

"সস্তায় কিস্তি মাৎ—তাই না? ভেবেছ বুঝি যে আমি মরতে ভয় পাই"

"ভাবতে হবে কেন, তোমার ভেতর পর্যন্ত তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার মনে বিচ্ছু ঢের ঢের দেখেছি। চোখ রাঙাতে এসোনা, চোখ উপড়ে দেব। তার চে চালাও, ঢাল আর এক গ্লাস!"

কষ্টে দম নিয়ে লম্বা শ্বাস ছাড়ল রশচিন।

"ভাবছ আমাকে খুব চেন, কেমন? না জাদভ, তুমি আমাকে চেন না। তোমাকে যদি এখন গুলী করে মারবে বলে দাঁড় করিয়ে দেয় তাহলে নেমকহারামি করতে তোমার দেরী হবে না—তোমার মতো শুয়োরের বাচ্চা তা ছাড়া আর কি করবে......!" মুরগির ঠ্যাংয়ে কামড় দিতে যাচ্ছিল লেভকা, ঘট করে দাঁত দুটো জুড়ে নিল। ঘেমো মুখটা ঝুলে পড়ল।

"এত দিন তো তার উল্টোই দেখলাম", তো তো করে বলে লেভকা। "এতদিন অন্যেরাই নেমকহারামি করেছে। তুমি নিজেই আমাকে সাবাড় করবে ভেবেছ নাকি?

"তিন মাস আগে যদি আমার হাতে পড়তে......"

"চোপ্ হোয়াইট অফিসার—থানাই পানাই চলবে না, সোজা কথা বল্।"

"সবুর সইছে না বুঝি, বেটা কসাই কোথাকার?"

"সবুরই তো করছি, কথাটা বলে ফেল......"

জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে দুজনেই তাড়াতাড়ি কথা বলে; সীটের নীচে পা চালিয়ে দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে পরস্পরের চোখে চোখে চায়। জানলার ধারে টেবিলে বাতি নিভু নিভু, পট পট শব্দ করে। লেভকার লাল মুখটা ছাই হয়ে আসছে। তাই দেখে দাঁতে দাঁত চেপে রশচিন বলল:

"ওঠো বারান্দায় বেড়িয়ে এসো।......তুমি আগে।"

"না, আমি না!"

"বেরোও বলছি!"

"তুমি আমাকে হুকুম দেবার কে? আমি যাব না।"

বাতিটা ফুরিয়ে গেছে, পলতের ডগায় শুধু একটুখানি নীল আলো। মনে হয় যেন অশরীরী আত্মা, মরেও মরে না। যদি অন্ধকারে লড়তে হয় তাহলে

রশচিনেরই সুবিধা—সে শক্ত, ছিপছিপে লোক। লেভকা সে কথা বুঝতে পারল বোধ হয়। ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে বল্লঃ

"ওঠো, বারান্দায় যাও, যাও বলছি!"

হঠাৎ এক ধাক্কায় রেল কামরার দরজাটা খুলে গেল। আলোটা নিভতে নিভতে জ্বলে উঠল। ভেতরে এল চুগাই।

"কী খবর দাদা!" চুগাইয়ের গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসি। বড় বড় চোখ দুটো একবার লেভকার দিকে চায়, একবার রশচিনের দিকে। "সারা ট্রেনে আপনাদের গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি।"

রশচিনের পাশে বসে পড়ল—সামনে লেভকা। খালি বোতলটা তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে, গন্ধটন্ধ শুঁকে রেখে দিল।

"দুজনেরই এত গোমড়া মুখ কেন?"

"আমাদের ঠিক বনে না", চুগাইয়ের বিদ্রূপপূর্ণ চোখ থেকে চোখ এড়িয়ে লেভকা বল্ল।

"আপনি বুঝি কমিসার টমিসার কিছু, তাই এঁর সঙ্গে যাচ্ছেন?"

"কিছু টিছু নয়, তার ওপরে। যাই হোক, তাতে আপনার কি দরকার?"

"তাহলে কাজটার গুরুত্ব তো আপনার আরও ভাল করে বোঝা উচিত: এই কমরেডকে যে কাজে নিয়ে যাচ্ছেন সে কাজ কতো গুরুতর তা তো আপনিই জানবেন। মেজাজ সংযত করতে শিখুন। আচ্ছা, এখন একটু বাইরে যান তো দাদা আমি এঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

বেশ এঁটেসেঁটে বসল চুগাই। পেটের ওপর হাত জোড়া, পা দুটো দিব্যি ছড়ানো। বাতির আলোয় মুখটা সামান্য লালচে দেখায়, মনে হয় যেন চীনে মাটির মুখ। বাচ্চা ছেলের মতো ফিতে আঁটা জাহাজী টুপি, সেটা যে কি করে মাথায় আটকে গেছে ভেবে আশ্চর্য লাগে। বে-ইজ্জতি হজম করে লেভকা কতক্ষণে বাইরে যায় তারই জন্যে ধীর স্থিরভাবে চুগাই অপেক্ষা করে।

লেভকার মুখ লাল। অপ্রসন্ন মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে রশচিনের দিকে চেয়ে চোখ রাঙ্গায়। তারপর শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। পেটেণ্ট লেদারের চকচকে বুটজোড়াতে আলোর ঝিলিক তুলে বাইরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল চুগাই।

"আপনাদের ঝগড়া হচ্ছিল কি নিয়ে?"

"ও, ও কিছু নয়!" রশচিন বল্ল। "মদ খেয়েছি কিনা!"

"ঠিক—জবাব এমনি করেই দিতে হয়। কিন্তু শুনুন ভাই, আপনাকে সোজাসুজি আমার হাতে দিয়েছে, কাজেই আমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।"

উঠে সামনের সীটে বাতির কাছে গিয়ে বসল। আধ-পৃষ্ঠা একখানা টাইপ-করা কাগজ খুলে ধরল। কাগজটাতে মাখনোর সই। আনাড়ি হাতের টাইপে কাগজে লেখা আছে যে, একাতেরিনোস্লাভ জেলার বিপ্লবী সামরিক সদর

দপ্তরের হাতে রশচিনকে দেওয়া হল। লেখার মধ্যে ব্যাকরণ ভুল অসংখ্য, কমা-ফুলস্টপেরও বালাই নেই।

"হল তো?" জিজ্ঞাসা করল চুগাই। রশচিন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। "বেশ বেশ! আচ্ছা, এবার বলুনতো, আপনি কেন এর মধ্যে এলেন?"

"আপনি কি দস্তুরমাফিক সওয়াল করছেন?"

"তাই বৈ-কি! মানুষটাকে না চিনলে কি বিশ্বাস করা যায়—বিশেষ করে এমনধারা গুরুতর কাজে? একথা আপনিও মানবেন বোধ হয়।" (রশচি সায় দিল।) "আমি খানিকটা খোঁজখবর করেছি......কিন্তু তাতে তো ভরসা কিছু পেলাম নাঃ দেখলাম আপনি আমাদের দুশ্‌মন, জানী দুশ্‌মন......"

ধপ্‌ করে বেঞ্চিতে পিঠ এলিয়ে দেয় রশচিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জানলার কাঁচে দীপশিখার ছায়া পড়েছে, আর বাইরে দ্রুত-ধাবমান রাত্রি, যেন অন কালের মতো অন্ধকার। ওর মন তখন একেবারে শান্ত। শরীরটা আস্তে আস্তে দুলছে। তিন দিন তিন রাত্রি চোখে প্রায় ঘুম নেই, আর তার ওপর খালি জেরা—এবার বুঝি তৃতীয় দফা। কিন্তু এই শেষ, একেবারে শেষ—সে কথা সুস্পষ্ট। নিজের সম্বন্ধে কোন্‌ সত্যই বা বলবে? বাইরের লোক এ ভেঙে দিল আশৈশবের আশ্রয়—আপন ঘর, আপন জন্মস্থল, আপন দুনিয় সবখান থেকে তাড়িয়ে একেবারে পথে বসাল ঃ এ কাহিনী ছাড়া ও আর কি শোনাতে পারে? এলোমেলো, জটপাকানো ধোঁয়াটে কাহিনী—এ ছাড়া বলবার তো কিছু নেই! কিন্তু এ কাহিনীই কি সত্য? ওকে ঘাড় ধরে আবর্জনা-স্তূপের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল, সে কে? সে তো আর কেউ নয়, সে ও নিজে বাস্তবিক ওর আসল ভয়টা ছিল কোন্‌খানে? ঘৃণা ছিল কিসের প্রতি অতীতের সেই বাড়ী, সেই আরামের দুনিয়া—সেসব না হলে কি সুখ আ হতই না? ও তো মরীচিকাও হতে পারে—অসুস্থ মনের কল্পনা দিয়ে গড় রূপকথা? গত এক বছর ধরে ও যেভাবে চলে এসেছে, আজ পিছন ফি দেখতে গিয়ে ও তার কোনো অর্থ, কোনো সাফাই খুঁজে পেল না। এখানে এই রেলগাড়ীতে এ তো আদালতের বিচার নয়। রোমাঞ্চকর পরচুলা দুলিয়ে আসামী পক্ষের বাঘা উকীল এখানে জেরা করছেন না, জুরীও বসেনি। প্রায় অসম্ভব, সেই কঠোর কর্তব্যই এখানে ওকে পূর্ণ করতে হবে, সত্য কথ বলতে হবে। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ মানুষটা কি করল সে কথা নয়—এ আলোচনায় সে কথার কোনো মূল্য নেই—বলতে হবে ভেতরকার আসল মানুষটার কথা এখানে আসামী আর বিচারক—দুইই এক।......এমন কি, কার্যক্ষেত্রে আলোচনার ফল কি দাঁড়াবে তাতেও কিছু আসে যায় না, একবার ভেতরের মানুষটার কাছে পেঁৗছাতে পারলেই হল......

"মনে মনে কথা না বলে জোরেই বলুন," চুগাই বল্ল।

"না, আমি দুশমন নই; হলে তো সোজাই হয়ে যেত," সীটের গায়ে মাথাটা জোরে ঠেস দিয়ে ধীরে ধীরে বল্ল রশচিন। "শত্রু হলে তার একটা লক্ষ্য থাকে

লেগে থাকে—কত রকম কৌশল খাটায়।......আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?......"

"অনায়াসে।"

"সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকে আপনাদের দরকার আছে?"

রশাচিনের তোবড়ানো গাল, তার ওপর কালো ছায়া। চুগাই সে দিকে নীরবে চেয়ে থাকে, জবাব দেয় না। শেষকালে বল্ল ঃ

"আপনার নিজের কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয় আছে মাখনোর চেয়েও আপনাদের বেশী দরকার আছে।"

"মাখনোর কাছে শুনেছি--আপনাকে বাধ্যতামূলকভাবে ভলাণ্টিয়ার আর্মিতে ভর্তি করা হয়েছিল বটে, কিন্তু আপনি নাকি মনে প্রাণে এনার্কিস্ট—আপনার অতীত ইতিহাসেও নাকি কোনো খুঁত নেই।"

"সব মিথ্যে কথা। আমার যা অতীত তা মোটেই আপনাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ভলাণ্টিয়ার আর্মিতে গিয়েছিলাম ইচ্ছে করেই। আবার ইচ্ছে করেই ছেড়ে এসেছি।"

"বিবেকে বাধছিল?"

"না......কিছু বলবেন না, আমার নিজের কথা নিজেকেই বলতে দিন। একেবারে তলিয়েই গেছি, কতকাল আগে--এখন আর খড়কুটো ধরে ভাসতে হয় না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এ কথাও যদি বিশ্বাস করতে পারতাম!...... আমার তো সেটুকু সান্ত্বনাও নেই।"

"অনেক পৈশাচিক কাজ করেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ তাও করেছি।......নিজের কাছে সততা দাবী করেছি জীবনভর; এখন দেখছি আমার সততাই আমার অপমান।... ..পৃথিবী যেন একেবারে উল্টে গেছে --যা দেখি সবই বিপরীত, কালো আজ সাদা. ..."

"আপনার জীবন কাহিনীই বলুন না--নিয়মমতো অগ্রসর হওয়াই তো ভালো।"

"গ্র্যাজুয়েট হই পিতার্সবুর্গ ইউনিভার্সিটি থেকে . .আইনের ডিগ্রী। ওহো, মাফ করবেন, আমার অতীত ইতিহাসই বোধহয় আগে শুনতে চান। জমিদার ছিলাম, ছোট জমিদারি। মা মারা গেলে যা ছিল সব বেচে দিলাম-- বাড়ী, বাগান, বংশগত সমাধিক্ষেত্র—সব। রেজিমেণ্টও ছাড়লাম। আর কি? আমি ছিলাম উদারনীতিক—যাদেরই একটু আধটু সুরুচি ছিল তারা সবাই তখন উদারনীতিক......।" (বিরক্তিতে ভ্রূভঙ্গী করল রশাচিন) "আগামী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি ছিল অবশ্য। বড় বড় স্ট্রাইকের সময়—সময়টা বোধহয় ১৯১৩ সালেই হবে—ঘোড়সওয়ার পুলিশ যখন ছুটে আসত—তখন জানালা খুলে 'কশাই, জল্লাদ' বলে তাদের গালও দিয়েছি। আমার বিপ্লবী কর্মতৎপরতা ঐ ঐ পর্যন্তই।...... দিব্যি মনের মতো আরামের জীবন, সুতরাং ক্লান্ত হবার তো কিছু ছিল না!" (এবার চুগাইয়ের গোঁফ খাড়া হয়ে উঠল।)

"আরে দাঁড়ান, এত শীগ্গির মুখ বেঁকালে কি চলে?......আমি যে মন খুলে বলছি। আর যাই করি, ভোজসভায় দাঁড়িয়ে দুঃখদীর্ণ রুশ জনসাধারণের নামে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলিনি কখনো! আর ১৯১৭ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার সময় লজ্জায়, ঘৃণায় প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ট্রেঞ্চে ছিলাম আড়াই বছর একদিনও প্রমোশন চাইনি......উকুনের ভয়ে রেশমী শার্টও গায়ে চড়াইনি।"

"আপনি মহৎ ব্যক্তি নিশ্চয়ই।"

"ঠোঁট বেঁকিয়ে কোনো লাভ হবে না......।" (ভ্রূকুঞ্চিত করল রশ্চিন শীর্ণ মুখটাতে কালো কালো রেখা ফুটে উঠল।) "আপনার কাছে আপনার দেশ মানে কি, বলুন তো! হয়তো ছোট বেলাকার কোনো বসন্ত দিন—লাইলাক শাখায় মৌমাছিদের মেলা—আর তার সঙ্গে একটা আবেগ—মনের মধ্যে মধুর মতোই আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে। রুশিয়ার মাটির ওপর রুশিয়ার আকাশ এ সব কি আমি ভালবাসিনি ভেবেছেন? লক্ষ লক্ষ জওয়ান ট্রেনে চেপেছে রণাঙ্গনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে—তাদের কি ভালবাসিনি? মৃত্যুর সঙ্গে আমার হিসাবনিকাশ তখন সাঙ্গ, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব তা তো ভাবিনি।... আমার দেশ মানে আমি নিজে—এক গৌরবান্বিত মহাপুরুষ।......তারপর মনে হল আমার দেশ তো ও রকম নয়, দেশ যে আর এক রকম।......দেশ মানে—তার বলে দিন মানুষের দেশটা কি? আপনারই বা কি? আপনি চুপ করে আছেন ......জানি আপনি কি বলতে চান।......মানুষ এ প্রশ্ন করে জীবনে শুধু একবার—নিজের দেশকে যখন সে হারিয়ে ফেলে।......পিতার্সবুর্গে আমার ফ্ল্যাট খুইয়েছি, কিংবা আইনজীবীর বৃত্তি খুইয়েছি—সে কথা নয়।......আমার মধ্যে যে মহাপুরুষ, তাকেই খুইয়েছি। অথচ ছোট হয়ে থাকতে তো চাইনে আমার একটি কথাও যদি মিথ্যা মনে হয় তাহলে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, এক্ষুনি।......নিজেদের মতো করেই সব গড়ে নিল জওয়ানেরা।... আমি তখন কি করি? ওদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম! বুদ্ধিশুদ্ধি সব যেন সীসের আংটায় আটকানো ছিল।......ভলাণ্টিয়ার আর্মিতে তারাই গেছে যারা প্রতিহিংসার জন্যে উন্মত্ত, যারা হিংস্র গুণ্ডা, রক্তপিপাসু দুর্বৃত্ত। 'জারের নামে, দেশের নামে, ধর্মের নামে জয়ধ্বনি তোলো।'......তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সোজা ছোটো ইয়ার রেস্তোরাঁ—সেখানে খুব ভাল মাছের পাই পাওয়া যায়......"

"আরে দোস্ত, আপনি যে বুঝে ফেলেছেন দেখছি!" চুগাই বল্ল। ওর বড় বড় চোখের স্থির দৃষ্টি একটু কোমল হয়ে এল। "সত্যি আপনাদের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে ভারি আশ্চর্য লাগে। মাথার মধ্যে এত গোলমাল আপনারা পাকান কি করে? আর কিছু না হোক, রাশিয়ান তো আপনারাও, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলেও মনে হয়।......বুর্জোয়া শ্রেণীতে মানুষ করার কায়দাই নিশ্চয় এই রকম। আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি? সত্যি সত্যি বেঁচে আছেন কিনা তাও বোধহয় জোর ক'রে বলতে পারবেন না।

হুররে দোনিকিনওয়ালার দল। যাকগে আপনার কথা বেশ উপভোগ করলাম। তাহলে এখন আপনাকে নিয়ে কি ঠিক করা যায়? আপনি কি কাজ করতে চান? মানে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্যে নয়, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে করতে চান?"

"কথাটা যদি এ ভাবেই রাখেন তাহলে বলি—নিশ্চয় চাই।"

"বেশী ইচ্ছে নেই বুঝি?"

"যখন করব বলেছি তখন করবই।"

খালি বোতলটা ফের তুলে নিল চুগাই, নেড়েচেড়ে দেখল। টেবিলের তলা, লাগেজের তাক—সেদিকেও চোখ বুলিয়ে নিল।

"এবার আপনার নেড়ী কুত্তাটাকে ডাকা যাক", বলে দরজা খুলে হাঁক দিলঃ ও কমিসার, মালটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?" তারপর চোখ ঠারল রশ্‌চিনের দিকেঃ "ওকে টিট করে রাখবেন, বুঝলেন। গোলমালের চিহ্ন দেখছেন কি অম্‌নি গুলি। মাখনোর দলবলের মধ্যে এ লোকটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক।"

পুলের কাছে পেঁাছবার ঠিক আগেই রশ্‌চিন, চুগাই, আর লেভকা (লেভকা এখন মদে চুর) তিনজনে ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল। নদীপার থেকে কুয়াশা উঠে অপর পারে একাতেরিনোস্লাভ শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। ভয়ংকর ঠাণ্ডা তার ওপর ভিজে ভিজে, তাই কাঁধটাঁধ কুঁচকে তিনজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘটাঘট শব্দ করতে করতে গাড়ীটা অবশেষে পুলের ওপর দিয়ে গুটি গুটি চলতে শুরু করল। তখন দেখা গেল—প্ল্যাটফর্মের পাটাতনের ওপর একজন স্ত্রীলোক—তার সর্বাঙ্গ শাল দিয়ে ঢাকা, শুধু তীক্ষ্ন চোখ দুটি বেরিয়ে আছে। সে ওদের পাশ দিয়ে একবার হেঁটে গেল। তারপর আর একবার—আরও ধীর গতিতে। যখন তৃতীয় বার পাশে এসেছে তখন চুগাই যেন নিজের মনেই বলে উঠলঃ

"চা পাওয়া যায় কোথায় কে জানে?"

মেয়েটি অমনি থেমে পড়লঃ

"চায়ের জায়গা আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমাদের কাছে চিনি পাবেন না।"

"চিনি আমাদের সঙ্গে আছে।"

এ কথা শুনবামাত্র মেয়েটি মুখ থেকে শাল সরিয়ে নিল। ভারি সুন্দর মুখখানি। তরুণ বয়স, সুডোল গালের ওপর একটি তিল, মুখের হাঁটুকু ছোট্ট, ছুঁচলো।

"আপনারা কোথা থেকে আসছেন, কমরেড্‌স?"

"তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না; ষড়যন্ত্রের কায়দা ফায়দা ছেড়ে এখন পথ দেখাও", রাগত সুরে লেভকা বল্ল।

আশ্চর্য হয়ে চোখ তোলে মেয়েটি, কিন্তু চুগাই ওকে বুঝিয়ে দিল যে,

"যাদের সঙ্গে ওর দেখা হবার কথা" ওরা তারাই। শুনে লাফ দিয়ে পাটাতনের নীচে নেমে মেয়েটি ওদের এগিয়ে নিয়ে চল্ল। একটা সাইডিংয়ের ভেতর দিয়ে পথ। সাইডিংয়ের চারদিকে ভাঙ্গাচোরা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনো লোকজন চোখে পড়ে না। ওরা কখনো ব্রেকিং প্লাটফর্মের ওপরে ওঠে, কখনো মালগাড়ীর নীচে হেঁট হয়ে চলে—এম্‌নি চলতে চলতে শেষকালে একটা ঢাকা-দেওয়া মালগাড়ীর কাছে এসে পৌঁছাল। গাড়ীর গায়ে টোকা দিয়ে মেয়েটি হাঁকলঃ

"খোল, আমি মারুসিয়া, ও'দের নিয়ে এসেছি।"

গাড়ীর ডবল দরজা সাবধানে ফাঁক ক'রে একটি মুখ বার হল। শীর্ণ, কঠোর মুখখানা, চোখ দুটি কয়লার মতো কালো।

"ভেতরে এস", মৃদু স্বরে তিনি বল্লেন, "ঠাণ্ডা ঢুকছে যে।"

তিনজনে ট্রাকের ওপরে চড়ল, তারপর মারুসিয়া। গাড়ীর লোকটি ফের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে একটা লোহার চুলা জ্বলছে, তাই ভেতরটা বেশ গরম। জুতোর কালির পুরোনো টিনে তেলের বাতি—তার মৃদু আলো পড়ল বিপ্লবী সামরিক কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের মুখের ওপর। সে মুখের ভাব বোঝা শক্ত। চেয়ারম্যানের পেছনে আরও দুটি অস্পষ্ট মূর্তি।

চুগাই তার পরিচয়পত্র দেখায়। লেভকাও একখানা কাগজ বার করে। আলোর পাশে উবু হয়ে বসে চেয়ারম্যান সাহেব বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে কাগজ টাগজ সব পড়লেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেনঃ

"ঠিক আছে, বসুন। পরশু থেকেই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।" লেভকার পেটেণ্ট লেদার বুটজোড়ার দিকে একবার বাঁকা চোখে চেয়ে নিয়ে বল্লেন, "মাখনোর তো বিশেষ তাড়াটাড়া আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

লেভকাই প্রথমে বসল—এবড়ো খেবড়ো টেবিলের ধারে একটিমাত্র টুল, তার ওপর ও স্থান নিল। তারপর চুগাই—ওর আসন একটা গুঁড়ির ওপর, গুঁড়ির দুপাশে দু পা। রশ্‌চিন দাঁড়াল ওধারে গিয়ে—গাড়ীর দেওয়ালে গা হেলিয়ে। হুঁ, তাহলে এই হচ্ছে বলশেভিকদের সদর দপ্তর।.... সাজ-সজ্জাহীন মালগাড়ী, আর গম্ভীর গম্ভীর চেহারার মানুষ—বোঝা যায় এরা রেলওয়ে শ্রমিক—সাবধানী, স্বল্পভাষী।

সহজ সুরে কথা আরম্ভ করলেন চেয়ারম্যানঃ

"আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। জনসাধারণও আগ্রহে অধীর। অবিলম্বে কাজ শুরু করা দরকার। পেৎলুরাওলারা কিছু একটা আভাস পেয়েছে বলে খবর পেলামঃ—শহরে কাল একটা ভারী কামানের ব্যাটারি নামিয়েছে। কিয়েভ থেকে ওদের সৈন্য আসারও কথা আছে। আমাদের এখানে তো বিশ্বাসঘাতক কেউ নেই, সুতরাং ওরা খবর পেয়ে থাকতে পারে এক গুলিয়াই-পলিয়ে থেকেই।"

"দেখুন, ভেবেচিন্তে কথা বলবেন!" চোখ রাঙ্গানোর সুরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বল্ল লেভকা।

অমনি অন্ধকার থেকে দুটি মূর্তি কাছে এগিয়ে এল। চেয়ারম্যান কিন্তু আগের মতোই সহজ সুরে বলে চল্লেন:

"আপনাদের ওখানে সবই একেবারে হাট-বাজার। ওরকম করলে হবে না কমরেডস।......একাতেরিনোস্লাভে ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে। এতদিন অবিশ্যি এদের লক্ষ্য স্থির ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের একজন কমরেডকে গ্রেপ্তার করেছে......"

"মিশা ক্রিভোসজে, ইয়ং কমিউনিস্ট", জোর গলায় বলে উঠল মারুসিয়া, গলাটা যেন একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা। ও তখন শালটা খুলে ফেলেছে, রশচিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওদের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা। নারেগরোদ্‌ৎসেভ, সে নিজে ওকে জেরা করে। তার মানে ওরা তক্কে তক্কে রয়েছে......"

"রবারের রুল দিয়ে ওরা মিশার মাথায় এমন করে মারে, বেচারীর চোখ দুটো একেবারে ফেটে বেরিয়ে যায়", মারুসিয়া বল্ল। ও এখন নাক টানছে, কথাও বলছে খুব তাড়াতাড়ি। "ওর দুটো আঙুল কেটে দেয়, পেটটা চিরে দুফালা করে ফেলে—কিন্তু তবুও একটি কথাও বলেনি।"

তলোয়ারখানা দু'পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অবজ্ঞার সুরে লেভকা বল্ল:

"ভারি তো ব্যাপার! নারেগরোদ্‌ৎসেভ, না? আচ্ছা, আমরা ঠিক মনে রাখব। হুঁ, ওখানে সরকারী উকীলের নাম কি? পুলিশের কর্তা কে?

"নাম, ঠিকানা আপনাদের দেওয়া হবে......"

চেয়ারম্যান মারুসিয়াকে থামিয়ে দিলেন:

"কমরেডস্, আমাদের সুসংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। শত্রুর শক্তি কত সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবেন ফেদিউক" (বলে একটি গাঁট্টাগোট্টা লোককে দেখিয়ে দিলেন। লোকটির গায়ে তেলচিটে জামা তার একটা হাতা শূন্য, বেল্টের মধ্যে গোঁজা।) "বিপ্লবী কমিটির কাজ সম্বন্ধে আমি নিজেই রিপোর্ট করব। মাখনোর সম্বন্ধে রিপোর্টের ভার আপনাদের ওপর। চার নম্বর পয়েন্ট হল মেনশেভিক, এনার্কিস্ট, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি—এদের কথা। এই শুয়োরগুলো ভাবছে যে এবার বুঝি মধুর আশা আছে, তাই সীট দখল করার জন্যে লড়াই লাগিয়েছে। আচ্ছা ফেদিউক, তুমি বল।"

বেশ দৃঢ় স্বরে ফেদিউক রিপোর্ট আরম্ভ করল। একেবারে বিশ্ব-বুর্জোয়া-শ্রেণীর রক্তপিপাসু পরিকল্পনা থেকে সে রিপোর্ট শুরু। কিন্তু চেয়ারম্যান বাধা দিলেন তৎক্ষণাৎ: "এটা মিটিং নয় কমরেড, অলংকার বাদ দিয়ে শুধু খবরগুলোই বল।" দেখা গেল, খবরগুলো খুবই উদ্বেগজনক: একাতেরিনোস্লাভে পেতলুরার দু হাজার পদাতিক সৈন্য আর ষোলটা কামান আছে, তার মধ্যে চারটে ভারী কামান। বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকজন আর নিয়মিত সামরিক অফিসার—এদের নিয়ে কিছু ভলান্টিয়ার সৈন্যও আছে। তাদের হাতে প্রচুর মেশিনগান। তার ওপর কিয়েভ থেকে আবার নতুন সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দ্বিতীয় রিপোর্ট থেকে বোঝা গেলঃ বিপ্লবী সামরিক কমিটির ভরসা হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। তারা দ্বিধাহীন চিত্তে বলশেভিক সংগঠনকে সমর্থন করবে। আশেপাশের গাঁয়ে যথেষ্ট প্রচার হয়েছে, সেসব জায়গা থেকে কৃষক যুবকেরা আসবে বলেও ভরসা করা যায়। কিন্তু কমিটির অস্ত্রশস্ত্র বড্ড অল্পঃ "আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, ওর শতকরা দশভাগের হাতে অস্ত্র থাকবে—বাকী লোকদের শুধু খালি হাত।"

অবজ্ঞায় লেভকার নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। আর চুগাই খালি ছটফট করছে। দেখে চেয়ারম্যানের চোখ দুটো কালো পাথুরে কয়লার মতো ঝকমক করে উঠল। গলার স্বর চড়িয়ে বল্লেনঃ

"আমরা জিদ করছিনে। মাখনো নিজে যদি শহর আক্রমণ করতে ভয় পান, তো তিনি গুলিয়াই-পলিয়েতেই থাকুন—আমাদের শুধু রাইফেল আর গুলীবারুদ দিলেই হবে।"

লেভকার মুখ একেবারে লাল। মাটিতে তলোয়ার ঢুকিয়ে বল্লঃ

"আমার সঙ্গে চালাকি নয় কমরেড।......আমরা অস্ত্রের ব্যবসা করিনে।..... মাখনোর একটি ধাক্কায় পেৎলুরাওলা ছুঁচোগুলো সব একেবারে কাত হয়ে যাবে।......"

শুনে চুগাই বল্লঃ

"অত গরমে কাজ কি কমরেড লেভকা, একটু থামুন দেখি! শুনুন কমরেডস, মাখনোর সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করে এসেছি—তিনি ইউক্রেনের কমান্ডার ইন চীফের কথা মতো কাজ করতে রাজী। আদেশ পাওয়া মাত্র তাঁর 'গণ-ফৌজ'—ওটা এখন আমাদের পঞ্চম ডিভিসন—লড়াইয়ে নামবে। কমান্ডার ইন চীফের আদেশও মৌজুদ আমার হাতেই রয়েছে। এখন আসুন, আমাদের লড়াইয়ের কাজ-কর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় করা যাক।......সামরিক বিশেষজ্ঞও আছেন একজন আমাদের সঙ্গে। এই যে কমরেড রশচিন, একটু কাছে আসুন তো।"

সেই রাত্রেই চুগাই আবার গুলিয়াই-পলিয়েতে ফিরে গেল। লেভকাকেও সঙ্গে নিল, কারণ লেভকার যা মেদ-বহুল চেহারা, তার ওপর চকচকে জুতো আর ইয়া উঁচু ওভারশু—দেখে শ্রমিকরা হয়তো কি মনে করবে। তা ছাড়া গবেটটাকে রশচিনের কাছে একলা ছেড়ে দেওয়াও ঠিক নয়।

রশচিনের সঙ্গে দেওয়া হল মারুসিয়াকে। সে ওর দেখাশোনা করবে, সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দেবে। বিপ্লবী সামরিক কমিটি আক্রমণের যে প্ল্যান বানিয়েছিল তা কোনো কাজের নয়। প্রথম আলোচনায়ই সে কথা সোজাসুজি বলে দিল রশচিন। তখন কমিটি থেকে পরামর্শ দেওয়া হল—রশচিন নিজে গিয়ে শহরের অবস্থা দেখেশুনে আসুক, তারপর ও-ই প্ল্যান বানাক। সে অনুসারে রশচিন আর মারুসিয়া প্রতিদিন সকালে নীপার নদী পাড়ি দিতে শুরু করল। কুয়াশাচ্ছন্ন নীপারের ওপর তুষার ভেসে আসে, তার মাঝখান দিয়ে নৌকা চালিয়ে

ডান পারে মান্দিরভকা নামে শহরতলীর ওখানে পৌঁছে ওরা নেমে পড়ে। গাড়ী নিয়ে হাটে যায় কৃষকরা, তাদের বলে কয়ে ওরা তাদের গাড়ীতে রেল স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সেখান থেকে ট্রাম ধরে না হয় পায় হেঁটে একেবারে শহরের মধ্যে।

রেলের স্টেশন আর পুলটা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। সেখান থেকে শুরু হয়েছে একাতেরিনিনস্কি এভিন্যু। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, দুধারে বড় বড় আকাসিয়া আর পপলার গাছ—শহর যতদূর রাস্তাও ততদূর। রাস্তার দুধারে সারি সারি ব্যাঙ্ক, হোটেল, পোস্ট অফিস, টাউন হল ইত্যাদি—সব নতুন নতুন পাকা বাড়ী, জানলায় প্লেটগ্লাসের কাঁচ লাগানো। রাস্তাটা একদম খাড়া হয়ে পুরোনো শহরের দিকে উঠে গেছে। গীর্জার প্রাঙ্গণ ঘিরে তারই চারিধারে পুরোনো শহর। সৈন্যদের ব্যারাকও সেইখানে।

কি করে কদম গুণতে হয়, চোখে দেখে কি করে কোণা মাপতে হয়, আক্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক জায়গাগুলো কিভাবে মনে রাখতে হয়—সে সব মারুসিয়াকে রশচিন শিখিয়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে কোথাও কোনো কাফেতে বসে ওরা কাগজের ওপর নক্‌শা এঁকে নেয়। তারপর কাগজখানাকে খামের মতো ভাঁজ করে মুঠোর মধ্যে এঁটে ধরে চলে মারুসিয়া—যদি কখনো পুলিশের হাতে পড়ে তখন ওটা একেবারে গপ করে গিলে ফেলবে। কিন্তু ওদের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। ইউক্রেনের ফ্যাশানে মাথায় রুমাল বাঁধা সুন্দরী মারুসিয়া, তার ওপর লাল চুড়ো-তোলা শীপস্কিন টুপি মাথায় রশচিন—যে কিছু দেখে না তারও ওদের দিকে চোখ পড়া উচিত। কিন্তু এখানে কারও তো ওদের কথা ভাববার সময় নেই। পেৎলুরা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল যে তারা প্রজাতান্ত্রিক, তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এসে তারপর থেকেই পঞ্চাশ রকমের কমিটির তলে তারা একেবারে চাপা পড়ে গেছে: সোশ্যালিস্ট কমিটি, জিওনিস্ট, এনার্কিস্ট, ন্যাশনালিস্ট কমিটি, কনস্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলি কমিটি, এস আর এন এস, পি পি এস কমিটি, মডারেট আর প্রায়-মডারেট কমিটি—কোনো কমিটির প্রোগ্রাম আছে, কোনো কমিটির আবার ওসবের বালাই-ই নেই—এমনি দুনিয়ার যত পরগাছা এসে দাবী জুড়েছে: স্বীকৃতি দাও, টাকা দাও, গাড়ী দাও, নইলে তোমরা জন-সমর্থন হারাবে, পাপ্‌রিকারির ছোট ভাইয়ের নেতৃত্বে (বড় ভাই বেশী চালাক, সে দেনিকিনের আশ্রয়ে পালিয়ে গেছে।) শহরের মিউনিসিপাল ডুমা আবার আরও গোল বাধিয়েছে। পেৎলুরাদের পাশাপাশি তারা আর একটা শাসন কর্তৃত্ব খাড়া করতে চায়: জিদ ধরেছে যে, স্বর্গত মেয়র খেম সলোমনোভিচ গিস্তরি-র নামে ওদের একটা আলাদা রেজিমেন্ট গঠন করতে দিতে হবে। এ অবস্থায় পেৎলুরা কর্তৃপক্ষের আর কাজ থাকল কি? কাজের মধ্যে শুধু রাত বিরেতে বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাস চালানো আর কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার করা—তাও যারা নীপারের ডান পারে থাকে কেবল তাদেরই।

শহরে ঘোরাফেরা সাঙ্গ ক'রে দিনের শেষে মারুসিয়া আর রশ্‌চিন ঘরে ফিরে আসে, সোজা রাস্তা ধ'রে পুলের পথে নদী পার হয়। বাঁ পারের শহরতলী অঞ্চলে একটা জায়গা অন্তরীপের মতো ছুঁচলো হয়ে নদীর ওপর

ঝুকে পড়েছে—সেখানে একটা কুঁড়ে ঘর, চুণকাম করা। সেই কুঁড়েই ওদের গন্তব্যস্থল।

যখনই ঘরে আসে দেখে দিব্যি চুলো জ্বলছে, আর সুপরিচিত গন্ধ ছড়াচ্ছে জ্বলন্ত ঘুঁটে থেকে—বেশ সুন্দর ঘর ঘর আবহাওয়া। রেলের মোটা বাতি হাতে নিয়ে মারুসিয়ার মা এসে দাঁড়ান (মারুসিয়ার বাপ রেলে কাজ করেন), উনুনের গায়ে হাত রেখে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করেনঃ "ঠাণ্ডা লাগছে না তো?"

"না, মা।"

"এখন খাবার দেব?"

"দাও না মা, পেটে একেবারে আগুন জ্বলছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেনঃ

"তোমার বাবার আর আমার খাওয়া হয়ে গেছে ক-খন। যাও গিয়ে খেতে বস—ছেলেমানুষ তোমরা, খিদে তো লেগেই থাকবে।"

ভীষণ কোন দুঃখের কথাই যেন ভাবছেন এম্‌নি ভাবে আস্তে আস্তে পার্টিশানের ওপিঠে গিয়ে চিমটে দুটো তুলে নেন, তারপর 'বর্শ্‌'-এর* প্রকাণ্ড কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে আনেন। কড়াইটা ভয়ংকর ভারী—পিঠ কুঁজো ক'রে তুলে আনতে আনতে বিড়বিড় ক'রে বলেন, 'দেখো বাপু, প'ড়ে ভেঙোনা যেন, দোহাই তোমার!' মারুসিয়ার বাপের মুখে পাইপ—জড়সড় হয়ে খাটের ধারে বসেছেন। বাপ, মা, দুজনের কেউ যেন রশ্‌চিনকে দেখতেই পাচ্ছেন না (দুজনে যখন একান্তে কথা বলেন তখন রশ্‌চিনের উল্লেখ করতে হলে বলেন 'গুন্ত লোকটি')—কিন্তু যেম্‌নি রশচিন কিছু চেয়েছে—হয়তো একটু জল নয়তো একটা দেশলাইয়ের কাঠি—অম্‌নি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠবেন বাপ আর হন্তদন্ত হয়ে মা ছুটবেন অতিথির ফর্‌মায়েশ তামিল করতে।

কাণা-ভাঙা প্লেটের ওপর বর্শ ঢেলে নিয়ে মারুসিয়া আর রশচিন খাচ্ছে। কিন্তু খেতে খেতে মারুসিয়ার কথা আর ফুরোয় না। ওর মনটা যেন ঝকঝকে আয়না, সারা দিনের সমস্ত ঘটনা, মায় সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব কিছুই যেন সে আয়নায় ছায়া ফেলেছে।

"রক্ষে কর্‌, একটু ভাল ক'রে খা না বাপু", উনুনের ধার থেকে মা বলে ওঠেন, "খালি কথা বল্লে কি খাবার হজম হয়?"

"সারা দিন যে একটি কথাও বলিনি মা!" মারুসিয়ার চোখ দুটি খু বড় নয়, কিন্তু বেশ ঘন নীল; চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ও রশচিনের দিকে চাইল। "জানেন, আমার ভয়ানক বক বক করা স্বভাব। ঐ জন্যেই তো তরুণ কমিউনিস লীগে প্রথমে আমাকে নিতে চায়নি। সব সময়ই যদি কথা বলি তাহলে গোপ কাজ চলবে কি ক'রে? কিন্তু তা বলে পরীক্ষায় ফেল করিনি, একটি হপ্ত মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম।"

---

* বর্শ—বাঁধাকপি আর মাংসের তরকারী

খাওয়াদাওয়ার পর গায়ের ওপর আলোয়ান চাপিয়ে মারুসিয়া তো দৌড়—পার্টি মিটিং আছে। কর্তা-গিন্নীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রশচিন তখন আর একটা ঘরে চলে যায়। পার্টিশানের পেছনে ঘরটা, সরু মতো। আর এত নীচু যে, হাত বাড়ালেই ছাতে ঠেকে। একদিকে খড়খড়ি আঁটা ছোট্ট জানলা, অন্য দিকে মারুসিয়ার দেবদারু কাঠের টানা আলমারি—বেল্টে আঙুল গুঁজে ঐ জায়গাটুকুর মধ্যে রশচিন পায়চারি করে। তারপর জামা আর বেল্ট খুলে বসে গিয়ে জানলার ধারে—দূরে অনেক নীচে নীপারের বুক থেকে ভাসমান তুষাররাশির চাপা শব্দ কানে আসে। পার্টিশানের ওধারে কর্তা-গিন্নী—তাঁরা তখন ঘুমের রাজ্যে। ঘরের মধ্যে উনুনের চটা উঠছে, শব্দ শোনা যায়—ঝিঁঝিঁ পোকা তার ছোট্ট করাতের মুখে কাঠ কুরে কুরে চলেছে, সে শব্দও শোনা যায়; এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, ছোট্ট বাড়ীটি একেবারে নিঝ্‌ঝুম, নিস্তব্ধ। অপ্রত্যাশিত সুখ আর শান্তিতে ভাদিমের মন তখন ভ'রে ওঠে—সহজ, সরল, দৈনন্দিন ভাবনা ছাড়া আর কোনো ভাবনা থাকে না।

ওর ইচ্ছা যে মারুসিয়া এলে তবে ঘুমবে, তাই ঘুম তাড়ানোর জন্যে উঠে আবার পায়চারি করে। শাদা চুণকাম করা ছোট্ট ঘরটা খুব মনের মতন। ঘরে মারুসিয়ার জিনিষপত্র সামান্যইঃ পেরেকে টাঙানো ঘাগরা একটা, আলমারির ওপর চিরুনি আর ছোট্ট আয়না, আর খানকয়েক লাইব্রেরির বই।……দেওয়ালের ধারে লোহার খাটটা ও রশচিনকে ছেড়ে দিয়েছে, নিজে শোয় মাটিতে, ফেল্টের মাদুরের ওপর বিছানা পেতে।

একদিন রাত্রে রোজকার মতোই সামনের দরজায় শব্দ হ'ল, বেশী আওয়াজ না ক'রে আস্তে আস্তে ফাঁক হ'ল রান্নাঘরের দরজা। ভেতরে ঢুকল মারুসিয়া, তুষারের চোটে তার গালদুটো লাল হ'য়ে গেছে। শাল খুলতে খুলতে বল্লঃ

"বাঃ আপনি জেগে আছেন, ভালই হয়েছে। খবর শুনেছেন? তিন দিনের মধ্যে যে মাখনো এখানে পৌঁছাচ্ছে। আপনার প্ল্যান কালই দিতে হবে।…… আঃ আজ রাতটা ভারি সুন্দর! নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। আর কত তারা……"

দরকারী দরকারী কত কাজ, মনের মধ্যে কত ঘটনার কত অসংখ্য প্রতিচ্ছবি –তাইতেই মারুসিয়ার মন একেবারে মেতে আছে। তার ওপর মেয়েটা আবার ভয়ঙ্কর সরল। বিছানা পাতার পরে ভাদিমের সামনেই কাপড় ছাড়ে, এলোমেলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ঘাগরা, ব্লাউস, মোজা—এতটুকু অপ্রস্তুত বোধ করে না। দু হাতে হাঁটু দুটি ঘিরে মুহূর্তখানেক তোষকটার ওপর বসে থাকে। তারপর "নাঃ বড্ড ক্লান্ত লাগছে", ব'লে বালিশটা থাবড়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে—মাথা একেবারে লেপের ভেতর। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই ফের লেপ থেকে মুখ বার করেছে—তিল-আঁকা, গোলাপী মুখটি, চ্যাপ্‌টা ছোট্ট নাকটি।

"ওঃ বড় গরম!" ব'লে খোলা বাহু দুটি লেপের ওপর ছড়িয়ে দেয়। "আপনি ঘুমিয়ে পড়েননি তো?"

"না মারুসিয়া।"

“আচ্ছা, একথা কি সত্যি যে, আপনি হোয়াইট অফিসার ছিলেন?”

“সত্যি বৈকি, মারুসিয়া।”

“আজ আপনার বিষয় নিয়ে খুব তর্ক করে এসেছি।......কিছু কিছু কমরেড আছে, তারা আপনাকে বিশ্বাস করে না। ওদের বড় সন্দেহ বাতিক ......নিজের মাকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না।......কিন্তু কাউকে যদি বিশ্বাসী ব'লে মনে হয় তখন তাকে অবিশ্বাস করব কেন? দু একবার ভুল হবে, হোক—তা ব'লে যাকে দেখব তাকেই বিভীষণ বলে ধরে নিতে পারব না। সবাই যদি বিভীষণ, তবে তোমার সঙ্গে বিপ্লব করার সঙ্গী তো আর রইল না বাপু' শুধু বিপ্লব নয়, আমরা যে বিশ্ব-বিপ্লব করতে চলেছি।......আমি ওদের বলি—দেখ, বিপ্লব একটা বিশেষ শক্তি।......আমার কথাটা বুঝলেন? এই যে আমি, বিপ্লব না হলে আমি কোথায় থাকতাম? কাগজের কারখানায় বসে বসে রোজ বারো ঘণ্টা ক'রে পিজবোর্ড জুড়তে হ'ত। রোব্‌বার দিন রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে সূর্যমুখী বাদাম খাব, এর চেয়ে বড় সুখ কল্পনাও করতে পারতাম না......নয়তো পয়সা জমিয়ে জমিয়ে বড় জোর এক জোড়া লেস-আঁটা জুতোই কিনতাম, ব্যস। 'আচ্ছা কমরেডস্, তোমরা ও'কে বিশ্বাস কর না কেন?' আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি। 'বুদ্ধিজীবীর তো ভুল হতে পারে? ও'র নিজের শ্রেণীর হয়ে উনি খেটেছিলেন, তাতে হয়েছে কি? উনি মানুষ তো বটেই।..... ও'র চেয়ে কত খারাপ লোককে বিপ্লব এসে শুধরে দিল। নিজের হতচ্ছাড়া শ্রেণী ছেড়ে উনি কি আমাদের বিশ্ব-বিপ্লবের কাজে লাগতে পারবেন না? কেন পারবেন না? তা ছাড়া শ্রমিকদের পক্ষে লড়বার জন্যে উনি তো নিজের ইচ্ছেয় আমাদের কাছে এসেছেন।......তারপরও যদি বিশ্বাস না কর তাহলে বাবা তোমাদের সন্দেহের বলিহারি যাই।'......আমার কথা ওদের অনেককে বোঝাতে পেরেছি।”

ছোট্ট খাটটার ওপর কুঁকড়ে শুয়ে শুয়ে রশচিন মারুসিয়ার দিকে চেয়ে আছে। খোলা, শাদা হাত দুখানি মারুসিয়া একবার ক'রে ছড়িয়ে দেয়, আবার তারপরই আবেগের ভঙ্গিতে দু হাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরে। ওর কুমারীসুলভ সজীবতায় ঘরখানি পরিপূর্ণ, মনে হয় শুভ্র লাইলাকের গুচ্ছই বুঝি কে ঘরে রেখে গেছে।

“বুদ্ধিজীবীদের নতুন ক'রে শিক্ষা দিতে হবে নিশ্চয়ই।......আপনাকেও আমরা তালিম দিয়ে নেব।......হাসছেন যে?”

“হাসছিনে মারুসিয়া।......মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করব ব'লে আজ বহু বহু বছর পরে নিজেকে ফের তৈরী মনে হচ্ছে।......আমি কি ঠিক করেছি জান? কাল পুল দখল করার জন্যে প্রথম দলেই আমি যাব।......”

“যাবেন? সত্যি?”

ঝট করে লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মারুসিয়া একেবারে খাটের ধারে।

"আপনি যে সত্যিই আমাদের দলে, এখন আমার তা বিশ্বাস হ'ল", মারুসিয়া বল্ল। "আমি অবিশ্যি তক্কাতর্কি, চেঁচামেচি করেছিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক প্রমাণ তো হাতে ছিল না।......"

মাসের ছাব্বিশ তারিখে পেৎলুরা অশ্বারোহী বাহিনীর জনপঞ্চাশেক সৈন্য হঠাৎ নীপারের রেল-পুলের ওপর দিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মালগাড়ীর স্টেশনটা আক্রমণ করল। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে তখন চার মালগাড়ীওলা একটা ট্রেনে বালির বস্তা সাজানো হচ্ছিল। গাড়ীর কাছে পাহারাদার শ্রমিকদের পেৎলুরা অশ্বারোহীরা কেটে শেষ করল, তারপর ট্রেনের জানলা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে চালাতে রেল লাইন ধ'রে সরে পড়ল। কিন্তু ওদের চড়াও টড়াও সবই যেন খুব ভয়ে ভয়ে, খুব শশব্যস্তভাবে। আসলে ওরা মতলব এঁটেছিল যে বিপ্লবী কমিটির সদর দপ্তরেই হামলা করবে, কিন্তু লাইনে গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে চোরাগোপ্তা আক্রমণ হতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি চম্পট দিল খোলা জায়গার দিকে—যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাওয়াই ভাল।

পুলের ওপারে ওরা মেশিন গান বসাল—যে যাবে তাকেই ছাড়পত্র দেখাতে হবে। পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। শ্রমিক এলাকায় ঘরকে ঘর তল্লাশী হচ্ছে ব'লে গুজব শোনা যাচ্ছে। আশেপাশের অঞ্চল থেকে কৃষকেরা আসছে—কিন্তু এদিন আর একা একা নয়, দশজন ক'রে দল বেঁধে বেঁধে। সঙ্গে মালপত্র নেই, পেটি-টেটি একেবারে টাইট ক'রে বাঁধা। বিপ্লবী কমিটি তাদের নিয়ে একটা আলাদা রেজিমেণ্ট গঠন করল। অনুষ্ঠান পর্ব খুবই সাদাসিধে—প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হলঃ

"কি জন্যে এসেছেন?"

"রাইফেল চাই, সেই জন্যে।"

"রাইফেল নিয়ে কি হবে?"

"সোবিয়েত বসাতে হবে, নইলে আবার সব গোলমাল হয়ে যাবে যে।"

"আপনি কি বিনা শর্তে সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তিকে স্বীকার করেন?"

"কেন করব না? শর্ত আবার কি হবে?"

"আচ্ছা যান, দ্বিতীয় কম্প্যানীতে ভর্তি হোন গিয়ে।"

কিন্তু রাইফেলেরই অভাব। শেষকালে হঠাৎ দুপুরবেলা একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে চুগাই এসে উপস্থিত। যে ট্রেনে এসেছে তা'তে শুধু ইঞ্জিন আর একখানা মালগাড়ী—মালগাড়ীর মধ্যে তিন শো অস্ট্রিয়ান রাইফেল, তার সঙ্গে কিছু গুলি-বারুদ। তখন অবস্থাটা একটু সহজ হ'ল। তারপর সন্ধ্যার শেষ দিকে ঝন্‌ঝন্ খটাখট শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল সারা স্তেপভূমি—দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মাখনো' বাহিনী অবশেষে দ্বারে এসে উপস্থিত।

শ্রমিক বস্তিতে প্রথম পেঁছাল 'ক্রোপৎকিন গার্ড' নামে অশ্বারোহী দল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা, লম্বায় সবাই এক সমান। 'বুড়ো কত্তার' এরা উপযুক্ত সাকরেদ, পেঁছবামাত্র স্কুলবাড়ী গেল ওদের দখলে—বই, খাতা, টেবিল,

শিক্ষয়িত্রী, সব রাস্তায়। তারপর ওরা চল্ল বাড়ী বাড়ী—যেখানেই যায় উদ্ধতভাবে সবাইকে ডেকে তোলে।

এদের পরে পদাতিক সৈন্য—দুশো খানা মালগাড়ী, তা ছাড়া আরও নানা রকম যানবাহন, সব একেবারে ঠাসা। সবার শেষে প্রকাণ্ড এক চার ঘোড়ার গাড়ী—সম্ভবত কোনো মোহান্ত মশায়ের সম্পত্তি—এসে থামল স্কুল বাড়ীর দরজায়। গাড়ীর ড্রাইভারের আসনে 'বোবা মহারাজ'; আর আড়ম্বর সহকারে ভেতর থেকে নামল মাখনো, লেভ্কা আর কারেৎনিক।

মাখনো তখনি বিপ্লবী কমিটির সেনানীমণ্ডলীকে ডাক দিল—মন্ত্রণা সভা বসবে। বিপ্লবী কমিটির মালগাড়ীর সামনে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু শ্রমিক এসে জড়ো হয়েছে, ক্রুদ্ধ স্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চেয়ারম্যানকে বলছেঃ

"মিরন ইভানোভিচ, দেখে যান, নিজে এসে দেখে যান একবার—এর নাম কি সোবিয়েত সৈন্য—ওরা ডাকাত, স্রেফ ডাকাত......। এই যে গাপ্কা খুড়ীর কাছেই শুনুন না বেটারা কি করেছে......"

গাপ্কা খুড়ী একেবারে কাঁদো কাঁদোঃ

"মিরন ভাই, আপনি তো আমার সব খবর জানেন।......হুড়মুড় ক'রে দুটো মিন্সে এসে আমার ঘরে ঢুকল, বলে, 'দুধ দাও, চর্বি দাও......।' একেবারে রাক্কোস সব, কতকাল যেন খেতেই পায়নি। 'চল, চল, তোমাদের শুয়োর কোথায়, মুরগী কোথায় দেখাও শীগ্গির......।' যা পেল গব গব্ করে শেষ করে দিল গো। জানোয়ার, শয়তান বেটারা......"

বেশ কড়া সুরেই চেয়ারম্যানের তখন সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হল যে, কাজটা যখন হয়ে গেছে, মানে মাখনোকে যখন আমরা নিজেরাই ডেকে এনেছি, তখন আর ফেরার উপায় নেই। তার চেয়ে এখন সমস্ত শক্তি দিয়ে লাগো—এক ধাক্কায় শহর দখলে এনে তাড়াতাড়ি সোবিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করো। গাপ্কা খুড়ীর দিকে ফিরে জোর গলায় বলে উঠলেন চেয়ারম্যানঃ

"দুটো শুয়োর পেলে আপনার চলবে? নয়তো একেবারে এক পালই দিয়ে দেব......এখন অসন্তোষ ছড়ানো বন্ধ করুন দেখি।"

যুদ্ধের মন্ত্রণা সভায় মাখনোর আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত—কখনো উদ্ধত ভাব দেখায়, আবার কখনো বা ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। ও দাবী তুল্ল যে, ওকে সমস্ত সৈন্যের কমাণ্ডার ইন চীফ বানাতে হবে, নইলে ওর আর্মি আবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করবে। বার বার শুধু একই কথাঃ সোবিয়েত শক্তির হাতে ওর বাহিনীর মতো এত ভাল বাহিনী আর নেই, সুতরাং এ বাহিনীকে খুব ভাল করে রক্ষা করা দরকার, ইতস্তত আক্রমণে অপচয় করা কখনোই উচিত হবে না। অনবরত নখ কামড়ায় মাখনো, আর থেকে থেকে জ্যাকেটের সামনের দিকে হাত ঢুকিয়ে গা চুলকোয়। পেৎলুরার ষোলটা কামান আছে, সেইজন্যেই ওর সব চেয়ে বেশী ভয় তো বোঝা গেল।

ওকে সম্বোধন করে এবার চুগাই বল্লঃ

"বেশ। কামানই যদি আপনার ভয়ের কারণ হয় তাহলে আমি আজ রাত্রেই শহরে চলে যাচ্ছি, ওদের আর্টিলারি কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলে আসব।"

"কি বলবেন তাকে?"

"সে আমি বুঝব!"

"বটে, বুঝলেই হল?"

"হ্যাঁ হল! ওদের আর্টিলারি কমান্ডার কে? মার্তিনেংকো। ওতো আমাদেরই বল্টিক নৌবহরের লোক, 'গাংগুৎ' যুদ্ধজাহাজে গোলন্দাজের কাজ করত। আমার দেশের লোক মার্তিনেংকো, আত্মীয়ও হবে হয়তো। ও কখনই আমাদের ওপর গোলা দাগবে না......"

"ঝুট বাত্, সব ঝুট বাত্!" বার বার বলে মাখনো। চুগাইয়ের জামার আস্তিনে একেবারে নখই বসিয়ে দেয়। কিন্তু দেখা গেল চুগাইয়ের কথা যেন বিশ্বাসই করেছে, কারণ হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়ল, সম্ভ্রমবোধও ফিরিয়ে আনল।

"আচ্ছা আপনাদের আক্রমণের পরিকল্পনাটা কি রকম শুনি......"

বিপ্লবী কমিটি যে পরিকল্পনা উপস্থিত করল তা এইঃ হাত বোমা নিয়ে এক দল শ্রমিক রাতের অন্ধকারে নদী পার হবে। এক এক ক'রে পুলের মাথায় পৌঁছে ওরা ওখানকার শত্রুসৈন্যদের ওপর হামলা করবে। শত্রুর মেশিন গান আসবে ওদের হাতে—তার সাহায্যে পুল-মুখো রাস্তাগুলোর ওপর চলবে গুলিবৃষ্টি। এদিকে মালগাড়ীওলা সাঁজোয়া ট্রেনে সশস্ত্র শ্রমিকেরা তখন তৈরী হয়ে বসে আছে, তাদের সঙ্গে আবার সদ্যগঠিত কৃষক রেজিমেন্টের সেনারা: হাতবোমা ফাটার শব্দ শোনামাত্র সাঁজোয়া ট্রেনশুদ্ধ পুল পার হয়ে তারা প্রধান রেল স্টেশনটা আক্রমণ করবে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে বিপ্লবী কমিটির হাতে কতকগুলো টেলিফোন আর ঠিকানা আছে—তা আর কেউ জানে না—সেগুলোর সাহায্যে কমিটি তখন জেলার বলশেভিক কমিটি-গুলোকে খবর জানিয়ে দেবে। খবর পেলেই শহরে বিদ্রোহ শুরু—জেলা কমিটির ওরাই শুরু করিয়ে দেবে। বিদ্রোহীদের সমাবেশের স্থান হবে রেল স্টেশন। সেখানে সাঁজোয়া গাড়ী থেকে সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে। সেনানীমণ্ডলীর ক্রিয়াকেন্দ্রও তখন রেল স্টেশনে। এদিকে হাঁটা পুলের ওপর দিয়ে শহরে ঢুকে পড়বে মাখনোর অশ্বারোহী বাহিনী, আর পুলের ডাইনে-বাঁয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে নদী পার হবে পদাতিক দল। একাতেরিনন্‌স্কি এভিন্যুয়ের ওপর কতকগুলো জায়গা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকবে—সেগুলো পদাতিক বাহিনী দুটির পুনর্মিলনের স্থান। সেখান থেকে আক্রমণ অগ্রসর হবে শহরের ওপর দিকে—শুরু হবে মিউনিসিপাল অফিস আর সৈন্য-ব্যারাক দখলের লড়াই। যত শীঘ্র, যত আচম্‌কা আক্রমণ আরম্ভ হয়, বিদ্রোহের সাফল্যের সম্ভাবনাও তত বেশী, সুতরাং আজ রাত্রেই অভিযান অগ্রসর হোক।

"এত দূর এসে লোকজন যে সব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে! তা ছাড়া ঘোড়াগুলোর পায়ে নালও পরানো হয়নি", মাখনো বল্ল।

চেয়ারম্যান জবাব দিলেনঃ

"বিশ্রাম? সে তো শহর দখলের পরই করতে পারবে। আর ঘোড়ার পায়ে একেবারে সোবিয়েত মার্কা নালই না হয় পরিয়ে দেওয়া যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে চুগাই যোগ করলঃ

"বলি বুড়ো কত্তা, শহরের একেবারে চোখের সামনে তাঁবু গেড়েছেন, সে কি বিশ্রামের আশায়? কাল ওদের দু' ইঞ্চি কামান যে আপনাদের তুলো ধুনে ছেড়ে দেবে, না দেয় তো কি বলেছি! মোদ্দা কথা হচ্ছে—আজ হল তো হল নইলে আর হবেই না। আজ যদি আক্রমণ না করেন তবে যান, সোজা ঘরে ফিরে যান......"

সে রাত্রে নীপারের জল জমে গেল। কিন্তু বরফ তখনো তেমন শক্ত নয় ঠিক ভরসা করা যায় না। নদী পারের ব্যবস্থা করতে হবে তাই সারা রাত ধরে শ্রমিকদের কী পরিশ্রম! ইয়ার্ডের সেট, বেড়া যেখানে যা পায় তাই ভেঙে ভেঙে তারা তক্তা জোগাড় করে আর টেনে টেনে নিয়ে আসে নদীর ধারে। বিপ্লবী কমিটির প্রত্যেকটি সদস্য, মায় চেয়ারম্যান স্বয়ং, শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারা রাত খেটে চলেছেন।

মাখনোর 'বেটারা' কিন্তু কুটোটিও ভাঙেনি। গায়ের ঘাম ঝরাতে তাদের প্রবল আপত্তি। আপাদমস্তক হাতিয়ার ছড়িয়ে তারা শুধু নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়, আর ওপারে শহরের বিরল আলো ক'টা দেখিয়ে দেখিয়ে বলাবলি করে। মস্ত বড় শহর একাতেরিনোস্লাভ, সম্পদও যথেষ্ট।

রাত পোহাবার ঘণ্টা দুই থাকতে রশ্‌চিনের নেতৃত্বে চব্বিশ জন লোক বরফের ওপর নামল। আগে থাকতেই সব কথা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বরফের চাবড়ার জোড়ের মুখগুলো ফট ফট করে ওঠে, মাঝে মাঝে তার ওপর তক্তা পেতে দিতে হয়। তক্তা ওরা সঙ্গে এনেছিল। পারাপারির সমস্তটা সময়ের মধ্যে ওপার থেকে শুধু একবার আলো ঝলসে উঠল। পুলের কড়িগুলো যেখানে কালো কালো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে আলোটা এসেছিল সেখান থেকে, একটা গুলিও ছুটেছিল। অমনি সবাই বরফের ওপর শুয়ে পড়ল। ঐ সময় থেকে ওরা যতদূর সম্ভব ফাঁক ফাঁক হয়ে বুকে হেঁটেই চলেছে।

ওপারে একটা আধ-ডোবা গাধা বোট, তার পাশে গিয়ে নামবে বলে রশ্চিন ঠিক করে রেখেছিল। নামলও সেখানেই। ওখান থেকে একটা বন্ধ গলি ধরে পাহাড়ের ওপরমুখো চলতে চলতে রশ্চিন বাঁক নিল। বাঁকের শেষে পরিত্যক্ত মাল-ইয়ার্ডের পেছন দিকটা; সেখানেই সকলে এসে জমা হবার কথা। স্টেশনের আলো ওখানে ক্ষীণ হয়ে পৌঁচেছে। সারা শহর তো গভীর ঘুমে অচেতন। রশ্চিন তখন বেড়ার

ধরে। লঘু পায়ে ক' সেকেন্ড পায়চারি করতে করতে বারবার একটা ছড়া কাটে—অর্থহীন ছড়া, খালি হিস হিস শব্দ বার হয়। উঁচু বেড়াটা দেখে ওর ভালই লাগে, ভাবে রোগা শরীর নিয়ে অনায়াসে পার হতে পারবে। বাকী কমরেডরা তখন একে একে পেঁচচ্ছে চোরের মতো, পা টিপে টিপে। রশচিন তাদের হুকুম দিল—বেড়া ডিঙিয়ে ইয়ার্ডে নামো, তারপর ফটকের কাছে গিয়ে জমা হও। হুকুম দিয়ে ফের

চব্বিশ জনের মধ্যে মাত্র তেইশ জন হাজির, বাকি একজন হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে, নয়তো শত্রু পাহারার হাতে ধরা পড়েছে। রশচিন এক লাফ দিল। বুটের ডগাটা বেড়ার তক্তায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে হাতের জোর দিয়ে নিজেকে ও বেড়ার মাথায় ঠেলে তুল্ল। তারপর ঝুপ করে ওধারে - কিন্তু যত সহজে পারবে ভেবেছিল তত সহজে পারল না। ওপারে একগাদা ভাঙাচোরা ইঁট, নামল গিয়ে তারই ওপর।

গেটের ধারে দাঁড়িয়ে শ্রমিকেরা রশচিনেব আসা-পথের দিকে নীরবে চেয়ে আছে। কেউ কেউ মাটিতে বসে, হাঁটুর আড়ালে মুখ ঢাকা। ভোর হতে আর দেরী নেই। অপেক্ষা করে বসে থাকার এই শেষ ক'টি মুহূর্তই হল চূড়ান্ত মুহূর্ত। সব চেয়ে কঠোর পরীক্ষাও এই সময়েই, বিশেষ করে যাদের এবার প্রথম লড়াই তাদের পক্ষে তো বটেই। আবছা আলোয় অস্পষ্টভাবে রশচিন দেখতে পেল -দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কত জন ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে, নিষ্পলক চোখে শুষ্ক দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। এরা রুশিয়ার মানুষ— আনাড়ি, স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু সরল, সহজবিশ্বাসী, সাচ্চা মানুষ। এই কাজটাতে কত বিপদ, তবু ওরা স্বেচ্ছায় সে বিপদে ঝাঁপ দিয়েছে। ঝাঁপ দিয়েছে বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শের খাতিরে -সেই যে বাতিজ্বালা ছোট্ট ঘরে বসে মারুসিয়া বলেছিল, তারই জন্যে। পরম উল্লাসে রশচিন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে, মনে হয় শরীরের সমস্ত ভার যেন কেটে গেছে। আবেগে তখন ওর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তো কখনো পায়নি. .. এ যে অপূর্ব।

ওর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত। সবাইকে ডেকে বল্লঃ "কমরেডস্, ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি, তাহলে তারপর আরও জিত হবে। গোটা বিদ্রোহেরই সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের ওপর।" (যারা মাটিতে বসে ছিল তারা উঠে কাছে এসে দাঁড়াল।) "আবার বলে রাখি, কাজটা যে বিশেষ কঠিন তা নয়, আসল কথা হল কত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে পার। আমাদের শত্রুরা কোন্ জিনিষকে সব চেয়ে বেশী ভয় করে জান? সে জিনিষ অস্ত্র নয়, সে হল মানুষ। যদি তুমি, তুমি কমরেড"—মুহূর্তকাল থেমে সামনে এক নগ্নস্কন্ধ যুবকের দিকে চাইল—যুবকের ঘাড়টি ভারি মজবুত। কেমন যেন অদম্য আবেগে রশচিন ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল, ঘাড়ের উষ্ণতা স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে। "কমরেড, তোমার যদি বুক ঝাঁপে, মনে রেখো যে শত্রুরও বুক কাঁপছে। কাজেই দুজনের মধ্যে যার আদর্শ আছে, আদর্শে বিশ্বাস আছে, সেই জিতবে।"

পেছন দিকে মাথা ঝাঁকি দিয়ে যুবকটি হেসে উঠলঃ

"ঠিক বলেছেন আপনি—দুজনের একজন শেষ হবেই। ওরা মূর্খ, কিন্তু আমরা

মূর্খ নই।......আমরা জানি, আমরা কিসের জন্যে লড়তে চলেছি......।” পুষ্ট ঘাড়টা ঝাট করে সরিয়ে নিল, সুডোল মুখে কঠিন ভঙ্গি করে বল্ল: “আমরা জানি আমরা কিসের জন্যে মরতে চলেছি......”

ঠেলে ঠুলে এগোতে এগোতে আর একজন জিজ্ঞাসা করল:

“আচ্ছা বলুন তো: হাত বোমা ছুঁড়ে দেবার পর কি করব? তখন তো আমার আর হাতিয়ার থাকবে না।”

ভাঙা ভাঙা চাপা গলায় কে যেন জবাব দিল:

“দূর বোকা, হাত দুটো আছে কিসের জন্যে?”

“কমরেডস্, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবই আমি আর একবার বলে দিচ্ছি, শুনুন”, রশচিন বল্ল। “আমরা দু দলে ভাগ হয়ে যাব......”

বলতে বলতে ও খালি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নীপারের গায়ে ঊষার দীপ্তি ফুটছে কি?......তখনো আকাশে ঘন মেঘ, কিছু দেখা যায় না। কিন্তু এমনধারা উৎকণ্ঠার মধ্যে লোকদের আর বেশীক্ষণ রাখা ঠিক হবে না।

“সময় হয়েছে।” কোমরবন্ধটা ঠিক করে নিল রশচিন। “দু দলে ভাগ হয়ে যাও। গেট খুলে ফেল।”

“খুব সাবধানে গেট খুলে ওরা একে একে বার হল, তারপর গুঁড়ি মেরে হাতড়াতে হাতড়াতে বেড়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছল। জমাট-বাঁধা নদীর গায়ে পুলের মোটামুটি ছবিটা ওখান থেকে বেশ স্পষ্ট। ওর সামনে সেতুমুখের পরিখাপ্রাচীর, তার ওপর মেশিনগান—অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মেশিনগানের গোলন্দাজেরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রেল লাইনের অন্য দিকে অমনিধারা আর এক সার পরিখা।

“হাতবোমা পাকড়ো......ছোটো এবার!”

তেইশ জন মানুষ, মুখে শব্দ নেই, এক জোট হয়ে পুরো দমে ছুটেছে। ওদের মধ্যে অর্ধেক লোক ছুটল সোজা ট্রেঞ্চমুখো, আর বাকী তেরজন ডান দিকে ঘুরে চল্ল রেল লাইনের দিকে। রশচিনও ছুটেছে, ওদের নাগালের মধ্যে থাকবে। দেখল বেল্ট-আঁটা জ্যাকেট পরে লম্বা লম্বা ছায়ামূর্তির মতো তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে বাঁধ পার হচ্ছে। ঘুরে নিয়ে ও-ও তাদের পেছনে চল্ল। বুঝতে পারল, কোথাও একটা ভুল হয়েছে—শত্রুর সাবধানী সঙ্কেত বাজার আগে ওরা কিছুতেই পরিখার দ্বিতীয় সারিতে পৌঁছাতে পারবে না। হঠাৎ ওর পেছনে বিস্ফোরণের শব্দ উঠল—তার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চীৎকার আর হাতবোমার আওয়াজ, একটার পর একটা। প্রথম ট্রেঞ্চ দখল হয়েছে।......কিন্তু রশচিন পিছনে চাইল না, কনকনে হাওয়ায় হাঁ করে দম নিতে নিতে উঠে পড়ল বাঁধের ওপর। ওর সামনের তেরজন তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে এগিয়ে চলেছে......হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার প্রায় পৌঁছেই গেছে......আগুন বেরিয়ে এল মেশিনগানের মুখ থেকে—প্রকাণ্ড একটা প্রজাপতি যেন পাগল হয়ে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। রশচিনের মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ

বুঝি একটা ঝড় বয়ে গেল।......“অলৌকিক কিছু একটা ঘটিয়ে দাও ভগবান, অলৌকিক ঘটনাও তো ঘটে!” মনে মনে বলে রশাচিন। “ও ছাড়া আর কোন উপায় নেই. . .।” সামনে চেয়ে দেখল, সেই শক্ত ঘাড়ওয়ালা লম্বা ছেলেটি তার হাত-বোমাটা সোজা ছুঁড়ে দিচ্ছে—একটু নুয়েও নেয়নি—আর তারপর তের জনের তের জনই অক্ষত দেহে লাফিয়ে পড়ছে ট্রেঞ্চের মধ্যে। ওর চোখের সামনে শুধু মানুষের শরীরে শরীরে জড়াজড়ি, মোচড়াচ্ছে, দোমড়াচ্ছে, হাঁসফাঁস করছে। অফিসারের পশমী-আঁটা দাড়িওলা একটা লোক হঠাৎ বেরিয়ে এসে সবার ওপরে মাথা জাগায় যে কেউ ধরতে যায় পাগলের মতো তারই ওপর তলোয়ার চালায়। রশাচিন গুলী ছুঁড়ল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অফিসারটা। পর মুহূর্তেই তার জায়গায় আর একজন—গায়ে অফিসারের গ্রেট কোট—লাথি চালায় আর চীৎকার করে। রশাচিন ওকে জাপটে ধরেছিল, কিন্তু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অফিসার রশাচিনের টুঁটি টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে “শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা” বলে অফিসারটার কী চীৎকার। কিন্তু ওর আঙুলগুলো হঠাৎ ঢিলে হয়ে এল, বলে উঠল: “রশাচিন!”

ভগবান জানেন লোকটা কে। হয়তো এভার্তের অফিসারদের মধ্যেই কেউ হবে। বিনা বাক্যব্যয়ে তার রগের ওপর রিভলভারের বাড়ি কষাল রশাচিন......

এ ট্রেঞ্চও দখল। শ্রমিকরা মেশিনগানের মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ধরছে, তাও রশাচিনের চোখে পড়ল। ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে করতে পুলের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল সাঁজোয়া ট্রেন—এবার রেল স্টেশন দখলের আক্রমণ শুরু।

সূর্য মাথায় উঠেছে; কিন্তু উত্তাপ নেই, শুধু আলো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সাঁজোয়া গাড়ীটা আবার পুল পার হল—সৈন্য আর গোলাবারুদ নিয়ে অধিকৃত স্টেশনের দিকে চলেছে। ট্রেন দেখে পরিখা থেকে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। সবাই ভালই চলেছে। খানিক আগে মাখনোর পদাতিক বাহিনী বরফের ওপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেছে। খাড়া পাড় বেয়ে পিঁপড়ের মতো পিল পিল করে ওরা ওপরে উঠেছিল, তারপর পুলিশের বেড়াটেড়া সব উল্টে পাল্টে রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। গুলীর শব্দ আসছে—কখনো কাছে, কখনো দূরে; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে শব্দের বিরাম নেই।

“শাশ্‌কো, এক ছুটে একবার স্টেশনে যাও তো। কম্যান্ডারকে খুঁজে বার করে বলবে যে, সেই ভোর পাঁচটা থেকে আমরা এখানে বসে আছি, খিদে আর ঠাণ্ডার চোটে একেবারে কাহিল অবস্থা—উনি যেন আমাদের বদলি পাঠাবার ব্যবস্থা করেন,” সেই শক্ত কাঁধওলা যুবকটিকে বল্ল রশাচিন। ছেলেটির দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি, শুধু নরম লোম দেখা দিয়েছে; মুখে যেমন ছেলেমানুষির ছাপ তেমনই সাহসের দৃঢ়তা। ট্রেঞ্চ দখলের সময় মোটা মেশিনগানারটা মরতে মরতেও ওর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল—ক্ষত থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।

পাতলা জ্যাকেটে শীত মানে না, শীতে কাঁপতে কাঁপতেই শাশ্‌কো ছুট

দিল। সুমুখের জায়গাটা একেবারে শত্রুর গুলির মুখে, কোনো আড়াল নেই। শোঁ শোঁ করে বুলেট ছুটে আসে, কিন্তু বুলেট টুলেট ও গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না, সোজা দৌড়য়। পেছন থেকে কমরেডরা চীৎকার করেঃ "ওরে বোকা, মরবি যে!"......"শাশ্‌কো, আসার সময় সিগ্রেট আনিস!" ওর ফিরে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। ট্রেঞ্চের ওপর উবু হয়ে বসে কমরেডদের এক প্যাকেট সিগ্রেট ছুঁড়ে দিল, আর রশ্চিনকে দিল একখানা চিঠি। চিঠিতে সদ্য মোহর আঁকা, কালি জুবড়ে গেছেঃ

"সবুর। নতুন সৈন্য পাঠাচ্ছি।—মাখনো।"

"মারুসিয়া সেলাম জানিয়েছে," শাশকো বল্ল রশ্চিনকে।

ভাদিম তো অবাক। পরিখা থেকে মুখ তুলে শাশকোর দিকে চায়।

"মেয়েটি খাসা, বুঝলেন কমরেড রশ্চিন! আপনার বরাত ভাল.... ."

"ওকে দেখলে কোথায়?"

"ওঃ সে তো এখন স্টেশনে কর্তাত্তি করছে।......ও না থাকলে কি আর মাখনোর কাছে পৌঁছাতে পারতাম? আরে ভাই. ওখানে কী ভিড়. তা যদি তোমরা দেখতে! সবাই এসে রাইফেল চায়। একাতেরিনোস্লাভ এখন আমাদের হাতে!"

স্টেশনে মাখনোর সদরদপ্তর খোলা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে জলখাবারের টেবিল থেকে কাঁচের প্লেট টেলেট সব ঝেঁটিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেখানে বসেছে মাখনো—ওয়েটিং রুমের নকল পাম গাছগুলো তার দু পাশে। মাখনো অর্ডার লেখে আর তার ওপর খট খট ক'রে রবারের সীল লাগিয়ে দেয় কারেৎনিক। হন্তদন্ত হয়ে লোক ছোটে অর্ডার নিয়ে। উত্তেজিত লোকজন সব অনবরত ভিড় করে আসে. বলেঃ গুলিবারুদ দাও. নতুন সৈন্য পাঠাও. যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করো. রুটি কিংবা সিগ্রেট দাও. শুশ্রূষার জন্যে আর্দালি জোগাড় করো. অমুক দাও. তমুক আনো।......একজন কমান্ডারের মহা রাগঃ দলবল নিয়ে তিনি একেবারে 'কমার্শিয়াল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক'-এর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু গুলিবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় এখন দরজার দু হাত দূরে বৃথাই মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। রাগের চোটে তিনি তো সোজা মাখনোর টেবিলের সামনে হাজির; বেল্ট থেকে হাত বোমাটা খুলে ধপ করে ফেল্লেন মাখনোর সামনে। ভয় দেখিয়েই যদি কাজ হয়। এই তাঁর আশা। গাঁক গাঁক করে বল্লেনঃ

"এখানে আপনি কোন্ কম্মটা কচ্ছেন? ভগবানের নাম নিচ্ছেন? ভালয় ভালয় গুলিবারুদ বার করে দিন. দিয়ে চুলোয় যান!"

যারা অর্ডার চায় শুধু তাদেরকেই অর্ডার লিখে দেয় মাখনো। হিংস্র কায়দায় থুতনিটা বাড়িয়ে ধ'রে এমন ভাব দেখায় যেন ওই যুদ্ধ চালানোর মালিক, কিন্তু আসলে ওর মাথায় সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

সেনারা যে জায়গায় এগোচ্ছে বা পেছোচ্ছে, শহরের ম্যাপের ওপর সেই জায়গা-গুলোতে ও পেন্সিল দিয়ে ঢেঁরা কাটে—দাগের চোটে কাগজ একেবারে ফুটো ফুটো! কিন্তু পোড়ারমুখো শহরটাতে কোথাও ভাল করে নড়বারই জায়গা নেই! রাস্তাগুলো এমন সরু যে চারিদিকে খালি শত্রু—ওপরে, পাশে পেছনে শত্রু লেগেই আছে।......ম্যাপের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে মাখনো—রাস্তা, বাড়ি কিছুই তার চোখে পড়ে না। দিগ্বিদিক জ্ঞানই ও হারিয়ে ফেলেছে, লড়াই চলেছে চোখ বুজে। সেইজন্যেই তো ও বরাবর বলে এসেছে যে, শহরগুলো সব বিপদের আড্ডা, শহরের চেয়ে খারাপ জায়গা আর কিছু নেই।

মার্তিনেংকোর সঙ্গে সম্বন্ধটা কি দাঁড়াল ঠিক ঠাহর করতে না পেরে ও প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করে। চুগাই ভরসা দিয়েছিল যে, মার্তিনেংকো তার আপন লোকেদের ওপর কখনই গোলা দাগবে না। ওরা গত রাত্রে দেখা করেই ঠিক করুক কিংবা আগে থেকেই বোঝাপড়া করে থাকুক—যাই করে থাকুক, একথা সত্যি যে শত্রুর কামানশ্রেণী একেবারে নিস্তব্ধ। গোলন্দাজদের মধ্যে অর্ধেক লোক পালিয়েছে। আর মার্তিনেংকো নিজে তো নেশায় চুর, অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে মদের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছে। ওর যত কামান তার মধ্যে স্টেশনে ছিল শুধু দুটো ফীল্ড গান। পেৎলুরাওলারা সে দুটো ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। মাখনো এর আগে কখনো কামান দখল করেনি, তাই ওর এবার মহা আনন্দ। ওর হুকুমে কামান দুটো বড় রাস্তায় এনে বসানো হল, তারপর গোলা লাগার রশিটা টানল ও নিজের হাতে। দুড়ুম করে কামান ছুটতেই মাখনো কী খুশী—হাসির চোটে মুখ একেবারে কুঁচকে উঠল; ওদিকে লোকজন সব ভয়ে মাথা হেঁট করে নুয়ে পড়ে, লম্বা লম্বা পপলার গাছের মাথার ওপর দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে ছুটে চলে কামানের গোলা।

স্টেশনের সামনে স্কোয়ার, সেখানে বিপ্লবী কমিটির সদরদপ্তর। স্কোয়্যারের জায়গায় জায়গায় উৎসবের মতো আগুন জ্বলছে। শহরের সমস্ত অঞ্চল থেকে শ্রমিকেরা আসছে, দলে দলে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে আগুনের ধারে। বিপ্লবী কমিটির মেম্বাররা তাদের প্রত্যেককেই চেনেন, কে কোথা থেকে আসছে তাও জানেন। কারখানা বা ওয়ার্কশপে ওরা ওঁদের কমরেড—কেউ ঢালাইওয়ালা, কেউ চামড়া কারখানার মিস্ত্রী, কেউ সুতোকল বা ময়দাকলের মজুর। কারখানা হিসেবে কমিটি ওদের ডাক দেয়, অমনি আগুনের ওধার থেকে শ্রমিকরা চলে আসে, জন-পঞ্চাশেক করে এক একটা ডিট্যাচমেণ্ট গঠিত হয়। ওদের মধ্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে তিনিই ডিট্যাচমেণ্টের কমাণ্ডার নিযুক্ত হ'ন, না হলে বিপ্লবী কমিটির কোনো মেম্বার এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ওদের হাতে রাইফেল দেওয়া হয়, কেউ যদি রাইফেলের ব্যবহার না জানে, তাহলে তাকে শিখিয়েও দেওয়া হয় তখনি তখনি। তারপর ডিট্যাচমেণ্টের লড়াইয়ের আদেশ; আদেশ গ্রহণ করে কমাণ্ডার তাঁর রাইফেল তুলে ধরেন, বাতাসে রাইফেল হেলিয়ে হাঁক দেন: "আগে বাড়ো, কমরেড্‌স্‌!"

বহু-বাঞ্ছিত রাইফেলটি অবশেষে শ্রমিকের হাতে এসেছে—তারাও রাইফেল উঁচিয়ে ধরে আকাশেঃ

“সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তি জিন্দাবাদ!”

ডিট্যাচমেণ্টের পর ডিট্যাচমেণ্ট পা ফেলে ফেলে চলে একাতেরিনিন্স্কি এভিন্যুয়ের দিকে—লড়াইয়ে নামবে।

ভিড় ঠেলে রশচিন কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছাল। সেতুমুখ অধিকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব জানালঃ চারজন আহত আর একজন নিহত—শত্রুর পায়ের নীচে পিষে গেছে। পেন্সিল কামড়াতে কামড়াতে রশচিনের শীর্ণ, তামাটে চেহারার পানে চাইল মাখনো। মাখনোর মুখে সেই সুপরিচিত একগুঁয়ে ভঙ্গি, উদ্ধত অথচ কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত।

“বেশ বেশ, আপনাকে একটা রুপোর ঘড়ি পুরস্কার দেওয়া হবে”, বলে শহরের ম্যাপটা টেবিলের কিনারায় টেনে আনল মাখনো। “এদিকে দেখুন।” ম্যাপের ওপর যতগুলো ঢেঁড়া ছিল সেগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে লাইন টানল “আক্রমণ আর এগুচ্ছে না। আমরা এই পর্যন্ত এগিয়েছি—এই যে এই রাস্তা, তারপর বাঁকা গলি, তারপর এই বড় রাস্তা—এতদূর পর্যন্ত......কিন্তু তারপর এই যে যেখানে ঢেঁড়ার লাইন বেঁকে যাচ্ছে... ..বাঁকার কারণটাই আমি জানতে চাই—গোবরগাদায় পড়ার মতো আমরা শুধু পা ঠুকছি কেন, সেটাই জানতে চাই,” ওর সেই পাখীর মতো তীক্ষ্ম সুরে ও চেঁচিয়ে উঠল। “যান, গিয়ে কারণটা খুঁজে বার করুন।” একটুকরো কাগজের ওপর খস খস করে কি লিখল। অমনি রবার স্ট্যাম্প ফুঁ দিয়ে নিয়ে ওর বগলের তলা থেকে কাগজে ছাপ বসিয়ে দিল কারেৎনিক। “যারা ভীতু তাদের আপনি গুলি করে মারতে পারেন—আমি অনুমতি দিচ্ছি।”

বেরিয়ে স্কোয়্যারের ওখানে এল রশচিন। শ্রমিকদের নিয়ে সাময়িক ডিট্যাচমেণ্ট গঠনের কাজ সেখানে তখনও চলছে। আদেশের হাঁকডাকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শ্রমিকদের জয়ধ্বনি। বহ্ন্যুৎসবের আগুনের ওপর এখানে ওখানে কড়ায় ক'রে কাশ্রি সেদ্ধ হচ্ছে। আগুনের ধোঁয়ায় রশচিনের মাথাটা বন্ বন্ করে, মনের মধ্যে ভেসে আসে পুরোনো স্মৃতিঃ বাঁধাকপির ঝোল ভর্তি সেই সুপরিচিত লোহার কড়াই—টেবিল থেকে লাফ দিয়ে উঠে মার হাত থেকে টেনে নিয়ে আসত মারুসিয়া; কুট কুট ক'রে দাঁত দিয়ে রুটি কাটত—কী সুন্দর গন্ধ সে রুটিতে। আ-হা!

রশচিনের পেছনে রাইফেল কাঁধে শাশ্‌কো, তা ছাড়া ডিট্যাচমেণ্টের আর দুজন। একজনের নাম চীজ—মুখে বসন্তের দাগ, ফুর্তিবাজ, বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান। অপর জনের বেশ সুন্দর চেহারা, মুখে হাসি, কিন্তু ভাবটা বড় হিংস্র; চোখের ওপরটা কেটে গেছে তাই টুপি একেবারে কপালের নীচে পর্যন্ত টেনে এনেছে। ও জলকলের মিস্ত্রী, নাম জিগ্যেস করলে বলে রবের্ত।

একাতেরিনিন্‌স্কি এভিন্যু ধ'রে ওরা বেশ হুঁশিয়ার হয়ে চলে। আশেপাশে বুলেটের আওয়াজ, তার মধ্যে ওরা এ বাড়ির দরজার আড়াল থেকে একছুটে ও বাড়ির দরজায় পৌঁছায়, মাঝপথে দেওয়ালের কোণাটোনা থাকলে তার আড়ালে গা বাঁচায়। রাস্তায় লোকজন নেই। জানলায় জানলায় আত্মরক্ষার জন্যে গদি ঝুলছে, সেখান থেকে কৌতূহলী মানুষ মুখ বাড়ায়, আবার ঝট্‌ ক'রে মুখ সরিয়ে নেয়। একটা গহনার দোকানে দরজার ওপর শীপস্কিন কেটে গায়ে দিয়ে একজন লোক একা বসে আছে—শ্মশ্রুবহুল ক্ষুদ্র, খিন্ন মুখটা ওপর দিকে তোলা—মনে হয় যেন তার ইহুদী ভগবানের কাছে মূক আবেদন পাঠাচ্ছেঃ "হে ভগবান, এ আবার কি হল?"

"আরে, এখানে বসে কি কর কত্তা?" চীজ শুধায়।

"আমি?" বিষণ্ণ সুরে জবাব দেয় লোকটি, "আমি মরবার অপেক্ষায় বসে আছি।"

"বাড়ী চলে যাও না!"

"বাড়ী যাব কেন? গেলে তো পাপরিকাকি সাহেব বলবেন, 'তোমার এই কেঁচোর জীবন—তার দাম বেশী, না আমার দোকানের দাম বেশী?' সুতরাং দোকানে বসে মরাই ভাল......"

ওরা এগোয়, কিন্তু ঐ পাহারাদার লোকটি তখনি দোকানের বাইরে দাড়ি দাড়িয়ে ডাকেঃ

"ও বাবুরা, ওদিকে যেও না গো, ওদিকে গুলি করে করে মানুষ মারছে.. ..."

ওরা কোণায় পৌঁছাতেই মেশিনগানের গুলী এসে ওদের মাথার ওপর দেওয়ালের চূণবালি খসিয়ে দিল। হেঁট হয়ে এক ছুটে ওরা একেবারে পাশের ছোট রাস্তায়, একটা দেউড়ির ফটকের গায়ে দরজার হাতল ঘেঁষে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে বাইরে চেয়ে দেখে মোড়টার ওখানে সাত সাতটা মানুষের দেহ পড়ে আছে, সাতটা রাইফেল গড়াগড়ি যাচ্ছে তাদের পাশে। শ্রমিকদের কোনো ডিট্যাচমেণ্ট নিশ্চয়, একেবারে কচুকাটা করে দিয়েছে। তিক্ত হাসি হাসে, রবের্ত, চিবিয়ে চিবিয়ে বলেঃ

"আস্তোরিয়া হোটেলের চিলেকোঠা থেকে ওরা গুলী চালাচ্ছে। ওদের আড্ডাটাকে সাবাড় করা যাক, কি বলেন?"

প্রস্তাবে সবাই রাজি। ঐ আস্তরিয়া হোটেলেই রশাচিন এক সময় দু-দু মাস থেকে গেছে। হোটেলটা বড় রাস্তার ও ফুটপাথে, পৌঁছাতে হলে গুলিবৃষ্টির ভেতর দিয়েই যেতে হবে। দু-হাত বাড়িয়ে রশাচিন তার কমরেডদের দরজার সঙ্গে একেবারে চেপে ধরলঃ

"একবারে একজনের বেশী নয়। সমান সমান সময় ফাঁক দিয়ে এক একজনে বেরুবে, তারপর প্রাণপণে ছুটবে। কোনো ঝুঁকি নিতে যেও না, খবর্দার!"

রশাচিন এমন নীচু হয়ে ঝুঁকল যে পড়েই আর কি—তারপর এক ছুটে কোণাটার ওখানে পৌঁছে একটা মৃতদেহের আড়ালে শুয়ে পড়ল। দুটো গুলী

ছুটল আস্তোরিয়ার চিলেকোঠা থেকে। লাফ দিয়ে উঠে ঠিক খরগোসের মতো আঁকাবাঁকা হয়ে ও ছুটতে লাগল—রাস্তার মাঝখানে কতকগুলো পপলার গাছ, লক্ষ্য সেই দিকে। তাড়াতাড়ি গুলী বৃষ্টি শুরু হল চিলেকোঠা থেকে, কিন্তু ওরা দেরী করে ফেলেছে—ও ততক্ষণে নিরাপদ এলাকায় পেঁৗছে গেছে। একটা পপলারের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে টুপি খুলে মুখটা মুছে নিল, তারপর লম্বা দম নিয়ে হাঁকল ঃ

"শাশকো, এবার তুমি এসো!"

হোটেলের জানলায় পুরু কাঁচের ওপর হাত বোমা দিয়ে অনেকক্ষণ ঠোকাঠুকি করবার পর ভেতর থেকে কে যেন প্রথমে একটা আলমারি সরিয়ে নিল, তারপর দরজাটা খুলে দিল। ইয়া মোটা দরোয়ানটা—রবের্তকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে রব, হতভাগা, তুই আবার এখেনে কেন?" কিন্তু রব ওর কথা কানেও তোলেনা, ঝটকা মেরে ওকে সরিয়ে দিয়ে এক লাফে সামনে এগিয়ে গেল—হাতে হাত বোমা। বারান্দা মতো জায়গাটাতে বহু লোক, হোটেলের বাবুরা সব ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছেন। কিন্তু সামনে রোমাণ্টিক চেহারার যুবক হাতবোমা ঘোরাচ্ছে, তার পেছনে আবার আরও তিনজন হাতিয়ারবন্দ লোক—দেখবামাত্র বাবুদের মুখে আর কথাটি নেই। সিঁড়ির রেলিং ঘেঁষে হাঁপাতে হাঁপাতে সব একেবারে ওপরতলায়। ওদের পেছনে যেতে যেতে রশচিন দেখল কয়েকজন তার পরিচিত। ওরাও ওকে চিনতে পারল--চোখের দৃষ্টিতে যদি খুন করা সম্ভব হত তাহলে ওখানেই রশচিন শতবার খুন হত। কিন্তু সেই যে খোশমেজাজী জমিদার বাবুটি, তিন তিনটি আইবুড়ো মেয়ে যাঁর গলায়, সেই ভদ্রলোক শ্লথ চরণে ঘরের বাইরে এলেন (ঘরের ভেতর এতক্ষণ ওবেলার খাবার দিয়েই আহারপর্ব সমাধা করছিলেন), এসে রশচিনের ঘাড়ের ওপর যেন হুমড়েই পড়লেন। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মাদীরা মদের বাষ্প ছড়িয়ে বল্লেন ঃ

"আরে ভাই ভাদিম পেত্রোভিচ! আপনি এসেছেন! আর বোকা মেয়েগুলো বলছিল যে, কজন বলশেভিকই নাকি হৈ হৈ করে হোটেলে ঢুকেছে......"

বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ থ!—সামনে রাক্ষসের মতো শাশ্‌কো, গালে আবার রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন—তার পেছনে রবের্ত, ফোলা চোখের ওপর টুপিটা নামানো—তারও পেছনে চীজ, দিব্যি লাল গাল, হাসিখুসী মুখ, কিন্তু সে মুখের ভঙ্গি দেখলে শ্রেণী-শত্রু মাত্রেই চমকে উঠবে।......

রবের্ত জলকল মিস্ত্রী, হোটেলের নাড়ীনক্ষত্র সব জানে। তিনতলা পর্যন্ত ওঠার পর ও সকলকে নিয়ে গেল পেছন দিকের সিঁড়িতে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে একেবারে চিলেকোঠা। চিলেকোঠার লোহার দরজাটা খোলা। "ওরা এখানে আছে," ফিস ফিস করে এই কথা বলে দরজাটা খুলে ফেল্ল। তারপর এমন বেগে ভেতর দিকে ধাওয়া করল, মনে হবে যেন সারাজীবন ধ'রে এই মুহূর্তটির জন্যেই ও বসে ছিল। ঘরটা আধা অন্ধকার। নুয়ে পড়ে কড়িকাঠ থেকে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতে রশচিন যখন জানলার ধারে গিয়ে পেঁৗছাল, দেখল—ফার-কোট গায়ে একটা

লোক মেশিনগানের ধারে সটান পড়ে আছে, আর রবের্ত তার দেহের ওপর সঙ্গীন চালাচ্ছে বার বার......

"আমি তো তখনই বলেছিলাম! এ শালা মালিক নিজে!"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে রবের্তের স্নায়ু যেন আর সহ্য করতে পারে না—থর থর ক'রে ঠোঁট কাঁপে, টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে রুক্ষস্বরে শাশ্‌কো বল্ল: "তোমার জন্যে আমরা বসে থাকতে পারব না।" চীজ বল্ল: "তুমি আবার রবের্ত নাম নিয়ে গর্ব কর!" তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে শাশ্‌কোর হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিল রবের্ত—তারপর দুদ্দাড় শব্দে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে—এক এক লাফে তিন তিন ধাপ। ওকে আর চীজকে হোটেল পাহারা দেবার জন্যে রেখে দিয়ে রশচিন শাশ্‌কোকে পাঠাল সদর দপ্তরে—চিঠি লিখে দিল যে আস্তোরিয়া হোটেলে যেন একটা ডিট্যাচমেণ্ট পাঠানো হয়। তারপর আবার বার হল এভিন্যুয়ের রাস্তায়—এবার একা।

দিন তখন শেষ। ডাকঘর, টাউন হল আর খাজাঞ্চিখানা—শ্রমিক ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা এগুলো দখল করেছে। সবখানে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জায়গা থেকেই সদর দপ্তরে মেসেঞ্জার পাঠিয়ে দিল রশচিন। যুদ্ধটা টিকিয়ে টিকিয়ে চলবে বলেই মনে হয়। মাখনোর পদাতিক বাহিনীর মধ্যে প্রথমে যে বে-পরোয়া গতিবেগ এসেছিল তা এখন ফুরিয়ে গেছে—শহরের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে লড়াই করতে আর যেন ওদের মন সরছে না। .....স্তেপের লড়াই হলে এর কত আগেই ওরা লুটের মাল ভাগ করতে বসে যেত: আগুন জ্বলত, কড়াইয়ে মাংস ফুটত, ওরা গোল হয়ে বসে নাচ দেখত: নাচিয়েদের পায়ে কী সুন্দর জুতো, সে জুতো মরা মানুষের পা থেকে খুলে আনা হয়েছে—তাই তুলে তুলে উদ্দাম তালে তালে তারা 'হোপাক' নাচ নাচত।......এদিকে পেৎলুরাওয়ালারা এখন হতবুদ্ধি ভাব কাটিয়ে উঠছে, বড় রাস্তার মাঝামাঝি পর্যন্ত হটে গিয়ে ট্রেঞ্চ কেটে ঘাঁটি গেড়েছে, প্রতি-আক্রমণও শুরু করেছে দু এক জায়গায়।

রশচিন যখন স্টেশনে ফিরল তখন সন্ধ্যা নামছে। মাখনো ওখানে নেই, সে তার সদর দপ্তর তুলে নিয়ে গেছে আস্তোরিয়া হোটেলে। হোটেলেই গেল রশচিন। আগের দিন থেকে এখন পর্যন্ত এক মগ জল ছাড়া খাবার আর কিছু জোটেনি। অবসাদে পা দুটো যেন আর ভার সইতে পারে না, কাঁধের ওপর কোটটাকে মনে হয় মস্ত একটা বোঝা।

কিন্তু হোটেলে ঢুকতে পারল না। হোটেলের দরজায় দুটো মেশিনগান। গুলিয়াই পলিয়ের ফ্যাশানমতো কপাল পর্যন্ত তেড়ি বাগিয়ে মাখনোর পাহারাদারেরা দরজার সামনে পায়চারি করছে—তাদের বুটের সুরে বাজছে টুং টুং ক'রে। খাটো ঘোড়সওয়ার—কুর্তার ওপর একজন আবার লোমের কোট চড়িয়েছে, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। অন্য জনের গলায় সেব্‌ল্‌ লোমের দামী মাফ্‌লার। ওরা রশচিনের কাগজপত্র দেখতে চাইল বটে, কিন্তু লোকগুলো পড়তেই পারে না।

রশাচিনকে বল্ল, সে যদি ভেতরে যাবার চেষ্টা না ছাড়ে তবে তাকে ওখানেই গুলী করে মেরে ফেলবে। "চুলোয় যাও তোমরা আর তোমাদের বুড়ো কত্তা", ক্লান্ত সুরে এই কথা বলে স্টেশনে ফিরে গেল রশাচিন।

স্টেশনে সেই বিধ্বস্ত রিফ্রেশমেণ্ট রুমটা তখন অন্ধকার। তবে লম্বা লম্বা জানালার কাঁচে বাইরের বহ্যুৎসবের দীপ্ত প্রতিফলিত হয়ে আবছা আলো সৃষ্টি করেছে। সেখানেই ওক কাঠের বেঞ্চের ওপর সটান শুয়ে পড়ল রশাচিন। শোবামাত্র ঘুম—অত সব গোলমাল, গুলীর আওয়াজ, ট্রেনের বাঁশীর শব্দ—কিছুতেই ঘুম আটকায় না। কিন্তু ক্লান্তির গভীরতা ভেদ করে দিনের ঘটনাগুলো তবু মনের মধ্যে ভেসে আসে—ঘটনার খণ্ডবিখণ্ড অংশ, এলোমেলো তালগোলপাকানো।......সাচ্চা মানুষের মতোই কাজ করেছে সরোকিন, কোনো অন্যায় করেনি। না, একটা খুঁত থেকে গেছে। সেই লোকটাকে রগের ওপর বাড়ি কষাল কেন, সে তো আত্মসমর্পণ করতই।......নিজের অতীতটাকে চাপা দেবার জন্যেই কি বাড়ি লাগিয়েছিল? অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠল : টেবিলের ওপর একজোড়া তাস আর মশলাদার মদের গ্লাস......তার পাশে ঐ নিহত লোকটা—ক্যাপ্টেন ভেদেনিয়াপিন—এক নম্বর সুবিধাবাদী।......পোকায় খাওয়া দাঁত লোকটার, মুরগির পাছার মতো ভিজে ভিজে ঠোঁট—এমন ক'রে কুঁচকে রাখত মনে হত যেন জেনারেল এভার্তের জুতো চাটবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।. . জেনারেল এভার্ত আর্মি কম্যাণ্ডার, তিনিও তাস নিয়ে 'প্রেফারেন্স' খেলতেন। চুলোয় যাক লোকটা, ওকে মারা ঠিকই হয়েছে।. .

হৃদয়ের অশান্ত স্পন্দনের সঙ্গে লড়াই করে করে ঘুমই হার মানল, রশাচিন চোখ মেল্‌ল। সামনে চেয়ে দেখে—একখানি মুখ, ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি, জান্‌লা দিয়ে আসা লাল আলোয় রক্তাভ। রশাচিন লম্বা শ্বাস ফেলল, অমনি ঘুমও একেবারে ভেঙে গেল। দেখল; মারুসিয়া বসে আছে পাশটাতে, তার হাতে এক ঘটি গরম জল, আর হাঁটুর ওপর এক টুকরো রুটি।

"এই যে নিন, খেয়ে নিন!" মারুসিয়া বল্ল।

সেই রাত্রে বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যান আর চুগাই, দুজনে মিলে গেলেন কামানের ঘাঁটিতে। তখন শুধু সোবিয়েত পক্ষের লোকেরাই ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছে। মার্তিনেংকোকে ঘুম থেকে তুলে চুগাই বল্ল :

"কমরেড, তোমাকে একটু কড়া কথা শোনানো দরকার। তুমি যা ব্যবহার করেছ সে আর বোলো না। ......হয় সোজাসুজি পেৎলুরার দলে চলে যাও—অবিশ্যি তোমাকে জ্যান্ত যেতে দেব তা ভেবো না—আর নয়তো কামানটামান নিয়ে একটু নড়ো......"

"তা হতে পারে, সকাল বেলা কামান টামান সব আমি এদিকে নিয়ে আসব..."

"সকালে না, এখনি আনতে হবে।......মার্তিনেংকো, হায় মার্তিনেংকো, ঘুমের জন্যে তুমি কি স্বর্গই খোয়াতে বসবে......"

"বেশ, কামান পাবে……"

পরদিন কামানের পর কামানের গর্জন, একতেরিনোস্লাভের ঘর-দুয়ার একেবারে কেঁপে উঠল। ফুটপাতের পাথর, পপলারের ডাল, হকার স্টলের খণ্ডবিখণ্ড অংশ।—সব উড়ে চলেছে রাস্তার ওপর দিয়ে। এই গম্ভীর সংগীতের প্রেরণা জাগল সবাইয়ের মনের মধ্যে—শ্রমিক ডিট্যাচমেণ্ট, কৃষক রেজিমেণ্ট, মাখনোর পদাতিক সৈন্য সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পেৎলুরা বাহিনীর ওপর—ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ের অর্ধেক দূর পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে গেল পেৎলুরাওলাদের। তখন দলীয়, নির্দলীয় নানান প্রতিষ্ঠানের নানান প্রতিনিধি (তার মধ্যে ছোট পাপারিকাকিও একজন)—প্রাণ হাতে নিয়ে তারা সব বিপ্লবী কমিটির সদর দপ্তরে এসে হাজির। শ্বেতপতাকা উড়িয়ে তারা আবেদন জানাল যে, যুদ্ধবিরতি আর গৃহযুদ্ধ শান্তির জন্যে এখনি আলোচনা শুরু করা দরকার, এ বিষয়ে তারা মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত।

মিরন ইভানোভিচের টুপিটা তেলচিটে, কোটের গোটাকয়েক বোতাম নিরুদ্দেশ, এমনি অবস্থায় আস্তোরিয়া হোটেলের সামনের ঘরে টেবিলের ধারে কুঁজো হয়ে বসে তিনি বাসি রুটি চিবোচ্ছেন, কিন্তু মুখ দিয়ে লালা আর বার হয় না। প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে তিনি বল্লেনঃ

"শহর ধ্বংস হোক তা আমরাও চাইনে। আমরা আপনাদের চরমপত্র দিচ্ছিঃ বেলা তিনটের ভেতর পেৎলুরা বাহিনীর প্রত্যেকটি ইউনিটকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। ছাতের ঘর থেকে প্রতিবিপ্লবী দলগুলো যে গুলি চালাচ্ছে তাও বন্ধ করতে হবে। যদি না হয় তাহলে তিনটে বেজে এক মিনিটের সময় আমরা শহরের ওপর কামান দাগা শুরু করব।"

ওর মুখে কালিঝুলি মাখা। আরও আস্তে রুটি চিবোতে চিবোতে খুব ধীরে ধীরে কথা কটি বল্লেন। শুনে প্রতিনিধির দল তো একেবারে হেঁটমুণ্ড। অনেকক্ষণ ধ'রে ফিসফাস পরামর্শ চল্ল, তারপর আপত্তি তুলতে যাবেন এমন সময় দেখেন সামনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে বিচিত্র বেশভূষা পরা একদল লোকঃ মেশিন গান সাপটে ধ'রে দু'জন চলেছে আগে আগে, তাদের পেছনে জনা বারো জোয়ান ছোকরা—একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাতিয়ারে বোঝাই। আর ঠিক সবার মাঝখানে বাবরিওলা বেঁটেখাটো লোক একজন, তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয় যেন শয়তানের চেলা…..

দেখবামাত্র আর কথা নেই—চেয়ারম্যানের হাত থেকে চরমপত্রখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে প্রতিনিধিরা সব একেবারে খোলা রাস্তায়—গুলি চলছে চলুক!

পেৎলুরা কর্তৃপক্ষ চরমপত্র অগ্রাহ্য করল। তিনটে বেজে এক মিনিটের সময় বিপ্লবী সমর পরিষদের টেবিলের ধারে এসে মাখনোর সে কী হৈ চৈ—টেবিল ঠোকে আর বলে, কামান দেগে শহর একেবারে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হোক, দয়ামায়া দেখালে চলবে না। কিন্তু সমর পরিষদের সভ্যেরা সব স্থানীয় লোক, শহরটাকে ধ্বংস করার কথা ভাবতে তাঁদের কষ্ট হয়। অথচ দুর্বলতা

দেখালেই বা চলে কি ক'রে? তাই ঠিক হল, বুর্জোয়াদের বেশ একটু ভয় পাইয়ে দিতে হবে। বেতালা সুরে গর্জন করে উঠল মার্তিনেংকোর চোদ্দটা কামান। বড় বড় কয়েকটা বাড়ির চূণবালি, ইটকাঠ খসে পড়তে লাগল, থাকের পর থাকের মতো আকাশে উড়ে চল্ল। হরেক রকমের কমিটিওলা, তাদের তখন কী ছোটাছুটি—ইঁদুরের মতো একবার পেৎলুরাওলাদের কাছে দৌড়ায় আর একবার সমরপরিষদের কাছে ছোটে। শ্রমিক ডিট্যাচমেণ্টগুলোর আক্রমণে এদিকে ক্ষান্তি নেই। বড় রাস্তার শেষ দিকে একেবারে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত পিছু হটতে লাগল পেৎলুরাওলারা।

বিদ্রোহের চতুর্থ দিনে বিপ্লবী কমিটির পক্ষ থেকে শহরে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার ফর্মান জারি হল।

সারা রাত ধ'রে বিপ্লবী কমিটির বৈঠক চলেছে. গবর্নমেণ্ট গঠন করতে হবে। সেবার সেই রেলগাড়িতে বসে মিরন ইভানোভিচ যা বলেছিলেন তাই ফললঃ এনার্কিস্ট আর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা মাখনোর সঙ্গে দল পাকিয়ে তারই আশ্রয়ের সুযোগে মিটিংয়ে ঢুকে পড়েছে, প্রত্যেকটা সরকারী পদের জন্যে পাগলের মতো কামড়াকামড়ি করছে। কেন জানি, যে কজন সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি মিটিংয়ে এসেছে তারা প্রত্যেকেই খুব বেঁটে বেঁটে; কিন্তু প্রত্যেকেই বেশ গাঁট্টাগোট্টা। তা ছাড়া ওদের তো আর বলশেভিকদের মতো রাতের পর রাত জাগতে হয়নি. কাজেই সব কজনই দিব্যি বহাল-তবিয়ত—ওদের তর্কে হারানো শক্ত।

চেয়ারে লাফিয়ে উঠে উঠে ওরা বক্তৃতা দেয়—প্রত্যেকেরই বিশেষ লক্ষ্য মাখনোর দিকে। মাখনোর নাম মুখে আনতে জিভ দিয়ে মধু যেন ঝরে ঝরে পড়েঃ মাখনোই নাকি জনসাধারণের আসল প্রতিনিধি: সেই হ'ল কীর্তিমান নেতা, সুনিপুণ রণনীতিবিশারদ্, আবর্জনা দাহকারী লেলিহান বহ্নিশিখা, লৌহকঠোর সম্মার্জনী। আর তার দলের ছেলেরাই বা কী চমৎকার—যেমন বীর, তেমনই অনুগত।

মদে ভেজা মুখটা হেলিয়ে মাখনো শুধু ঘাড় নেড়ে নেড়ে জবাব দেয়, ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো কিন্তু একদম বন্ধ। সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা অদম্য—এমন তারস্বরে বক্তৃতা করে যে দরজার ওপারে (দরজাটা আবার অনবরত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে) গলিপথেও তাদের বক্তৃতা বেশ শোনা যায়। গলিপথে মাখনোর দলবল ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর আরও হরেক কিসিমের লোক এসে জমেছে—তারা যে কি করে হোটেলে ঢুকল তা ভগবানই বলতে পারে!

“বলশেভিক কমরেডস! তর্ক করার আর কি আছে? আপনারাও সোবিয়েতের পক্ষে, আমরাও সোবিয়েতের পক্ষে। শুধু রণকৌশল নিয়েই যা তফাত। পৌরশাসনের বুর্জোয়া যন্ত্রটি এখন আমাদের হাতে এসেছে। আপনারা রাতারাতিই ওটাকে সোবিয়েত শাসনে রূপান্তরিত করতে চান—একেবারে একদিনে। কিন্তু

পৌরশাসকেরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করবে না তা আমরা জানি। ফলে নাশকতামূলক কাজকর্ম আরম্ভ হতে বাধ্য। ধ্বংস আর দুর্ভিক্ষও অনিবার্য। কিন্তু ওরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, সেই মর্মে দুমার প্রস্তাবই রয়েছে। তাই 'সাপ্লাই বিভাগের কমিসার' পদের জন্যে কমরেড ভলিনকেই আমরা সমর্থন করছি। আমার প্রস্তাব হল, আলোচনা বন্ধ ক'রে এবার ভোট নেওয়া হোক......"

এতক্ষণ এনার্কিস্টদের ভাবটা ছিল হেঁয়ালির মতো, এমন কি উদ্ধতও বলা চলে। কিন্তু এবার তারা এমন এক চাল চালল যে, মাখনো পর্যন্ত হাঁ—সরু ঘাড় বাড়িয়ে শুনতে এগিয়ে এল।

লাল ফেজ-পরা একটি ছাত্র ওদের প্রতিনিধি—সে প্রস্তাব করল যে ছোট পাপ্রিকাকিকে 'অর্থদপ্তরের কমিসার' পদে নিযুক্ত করা হোক......

"যেমন করে পারি ওঁকে এই পদে নিযুক্ত করার জন্যে আমরা চেষ্টা করব। ছোট পাপারিকাকি আমাদের নীতিতে বিশ্বাস করেন, উনি 'থিওরেটিক্যাল' এনার্কিস্ট। তা ছাড়া অর্থনীতিবিশারদও বটেন। আমাদের পরিচালনাধীনে উনি খুব বাধ্য থাকবেন—স্বাধীন, বিদ্রোহী জনসাধারণের হাতে দরকারী হাতিয়ারের মতো কাজ করবেন।......আমি প্রস্তাব করি যে, আলোচনা টালোচনা দরকার নেই, সোজাসুজি হাত তুলে ভোট নেওয়া হোক......"

দেওয়ালের ধারে একই চেয়ারে বসে আছে মারুসিয়া আর রশচিন। মারুসিয়ার আর সহ্য হয় না, হাতে হাত ঘবতে ঘষতে লাফিয়ে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণ ছেলেমানুষি গলায় চেঁচিয়ে ওঠেঃ "ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না?" কিংবা "আমরা যখন লড়ছিলাম, তখন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই?" তারপর আবার বসে পড়ে, মুখচোখ একেবারে লাল। ওর ভোট নেই, শুধু বলবার অধিকার আছে।

এই ক'দিনে মারুসিয়া বেশ রোগা হয়ে গেছে, রোদ-জলের ছাপ পড়েছে মুখের ওপর। ওর চুলটুল সব এলোমেলো। গরমের জন্যে শীপস্কিন জ্যাকেটের বোতামও খুলে ফেলেছে। ক'দিনের কীর্তিকাহিনী সব ও রশচিনকে শুনিয়ে গেল, বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে .....বিভিন্ন ডিট্যাচমেণ্টকে রুটি আর গরম জল সাপ্লাইয়ের জন্যে যে কমিশন হয়েছিল, প্রথমে ও তাতে কাজ করে। তারপর ওকে পাঠাল মেডিকেল ডিট্যাচমেণ্টে। এমনি অদলবদলের পর শেষকালে ও হল মেসেঞ্জার (সংবাদবাহিকা)।......সারা শহরময় ছুটোছুটি করতে হ'ত......গুলির মুখে পড়তে হয়েছিল অন্তত 'একশো বার'। রশচিনকে দেখাল, ঘাগরার নীচের দিকটা গুলি লেগে লেগে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে......।

"আমি খুব চটপটে তাই, নইলে গিয়েছিলাম আর কি! একবার কে যেন 'মারুসিয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠল, অমনি আমি এক লাফ দিয়ে ওপাশে। দম্ করে একটা বোমা ফাটল—এক সেকেণ্ড আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখানে। কিন্তু আমি তখন পগার পার, একটা পপ্লার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছি।......ওরে বাপরে, কী ভয়ই লেগেছিল, ভাবলে এখনো হাঁটু কাঁপে।"

কিন্তু মারুসিয়ার যা প্রাণশক্তি তাতে একটা কেন, ডজনখানেক বিপ্লব হলেও কম পড়বে না। রশচিনের সঙ্গে বক বক করতে করতে দেখে দরজা থেকে শাশ্‌কো মুখ বাড়িয়েছে—মুখে তখনো কাটার দাগ। শাশ্‌কোকে বোধহয় ঘরে আসতে দিচ্ছে না, দরজায় দাঁড়িয়ে ও ইশারা করে মারুসিয়াকে ডাকল। মারুসিয়া ওর কাছে ছুটে যেতে কানে কানে কি যেন বল্ল—শুনে মারুসিয়া একেবারে মাথায় হাত!

তখন ঘরের মধ্যে চুগাইয়ের গলার শব্দ গম্‌ গম্‌ করছে। এতক্ষণ যে সব প্রার্থীর নাম প্রস্তাব হয়েছে তার বিরোধিতা করে সে বলছেঃ

“কমরেডস্‌, আমরা সবাই এখানে তর্ক করতে আসিনি, কোনো কথা প্রমাণ করতেও আসিনি, আমরা এসেছি হুকুম জারি করতে।......যে পক্ষের শক্তি আছে, সেই পক্ষই হুকুম জারি করবে......”

মারুসিয়া আর নিজের বক্তৃতার পালা আসার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না, টেবিলের ধারে দৌড়ে গিয়ে খবরটা জানিয়ে দিলঃ

“শহরে পুরো দমে লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। কমরেডরা খবর নিয়ে এসেছে, তাদের কাছে শুনুন। ওরা কি তাদের আসতে দেয়, হাত মুচড়ে ধরেছিল......”

ঠিক তখনি দরজার কাছে একটা ধস্তাধস্তি, গোলমালের শব্দ শোনা গেল। রাইফেল হাতে ক'জন শ্রমিক আর তাদের সঙ্গে শাশ্‌কো—হুড়মুড় করে সবাই একেবারে ঘরের ভেতর। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করছেঃ

“এ সব কি হচ্ছে? আপনারা দরজায় পুলিশ বসিয়েছেন কেন? যান না, নিজেরাই গিয়ে দেখে আসুন না।......বড় রাস্তার সবটাই তো মাখনোর লোকেরা ঘিরে ফেলেছে—দোকান টোকানের দরজা ভেঙে ভেঙে ভেতরে ঢুকছে—গাড়ি গাড়ি মাল পাচার হয়ে গেল..... ”

মাখনো এমনভাবে ঠোঁট বাঁকাল, মনে হল যেন কামড়েই দেবে।......উঠে বাইরে চলে গেল। বুড়ো কুকুরের মতো হলদে দাঁতগুলো কিড়মিড় করছে—দেখে ওর দলবলের লোকেরা যারা গলিপথে নয়তো সামনের ঘরে ভিড় করেছিল, তারা সব পিটটান। ওকে আর বেশী দূর যেতে হল না, রাস্তার ঠিক ওপারেই একটা বড় দোকানের সামনে ছায়ামূর্তির মতো লোকগুলো কি করছে দেখতে পেল। ও যখন হোটেল থেকে বাইরে পা দিয়েছে, তখনি লেভ্‌কা এসে হাজির।

“ব্যাপার কি, এত হৈ চৈ হচ্ছে কেন?” লেভ্‌কা বল্ল, কাঁপতে কাঁপতে।

“পাজী বদমায়েস, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?”

“আমি? আমার তলোয়ারই ভোঁতা হয়ে গেল.... .ছত্রিশজন......গোণাগুন্তি ছত্রিশজন—এই এক হাতে।”

“যাও, শহরের গোলমাল বন্ধ কর!”—বলে চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল মাখনো। লেভকার বুকে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়ে রাস্তার ওপারে দোকানটার দিকে ছুটল—পেছনে ক'জন রক্ষী আর লেভকা। কিন্তু দোকানের ওখানে যারা ছিল

তারা তখন বুঝতে পেরেছে যে এবার সটকে পড়া দরকার। জানলার বাইরে ছায়ামূর্তি সব তৎক্ষণাৎ উধাও—অনেক দূরে মাত্র দু একজনকে দেখা যায়, বাণ্ডিল ঘাড়ে করে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটছে। কিন্তু এদের মধ্যে একজন, ইয়া গোঁফওয়ালা এক 'মাখনো-বেটা' সে ঠিক টের পায়নি। রক্ষীরা তাকে খপ্ করে ধরে ফেলল, টানতে টানতে বার করে আনল দোকান থেকে। লোকটার তখন কী প্যানপ্যানানি, বলে দোকানে গিয়েছিল শুধু দেখতে, বুর্জোয়া শয়তানগুলো কিভাবে গরীবের ঘাড় মটকায় তাই দেখতে। চটে আগুন মাখনো, লোকটাকে দেখে আর রাগে ঠকঠক করে কাঁপে। হোটেল থেকে আরও সব কৌতূহলী দর্শক ছুটে আসতেই লোকটার মুখের ওপর ঘুষি পাকিয়ে মাখনো বল্লঃ

"এই লোকটা বিপ্লব বিরোধীদের দালাল, নামকরা দালাল..... এবার ওর লীলাখেলা সাঙ্গ করব! কেটে ফেল বেটাকে, শেষ করে দাও!"

"না না, কেটোনা, কেটোনা", বলে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল গোঁফওলা। কিন্তু ফোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লেভকা তলোয়ার বার করল, তারপর জোরে দম নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কোপ বসাল লোকটার ঘাড়ের ওপর।

"সাঁইত্রিশ!" গর্বের সুরে কথাটা উচ্চারণ করে পিছু হটে এল লেভকা।

রাস্তায় রক্তের স্রোত, তার মধ্যে দেহটা তখনও কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। পাগলের মতো মাখনো তার ওপর লাথি চালায়, লাথির পর লাথি।

"এরকম ধারা প্রত্যেকের জন্যেই এই শাস্তি। লুটের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে . হ্যাঁ, আমি বলছি শেষ হয়ে গেছে!"

ঝট করে ঘুরে ভিড়ের সামনাসামনি দাঁড়াল মাখনো। ভিড়ের লোকেরাও তৎক্ষণাৎ পিছু হটল। মাখনো বল্লঃ

"আপনারা এখন চুপচাপ ঘরে যেতে পারেন।"

রশচিনের কাঁধে দেহ এলিয়ে দিয়ে হঠাৎ চেয়ারের ওপরেই মারুসিয়া ঘুমে ডুবে গেছে—আলুথালু চুলওলা মাথাটা রশচিনের বুকের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তখন সকাল, ছ'টা বেজে গেছে। গোমড়ামুখো একজন বয়স্ক পরিচারক (সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার সম্মানে সে পরিচারকের ফ্রককোট ছেড়ে একটা পুরোনো জ্যাকেট পরেছে—তাতে আবার ব্যাং আঁকা) এসে সকলকে চা দিয়ে গেল, তার সঙ্গে বেশ অনেকখানি করে ময়দার রুটি। গবর্ণমেণ্ট গঠনের কাজ তখন শেষ, কিন্তু আরও অনেক সমস্যার সমাধান হয়নি। যেমন, আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই রেলের শ্রমিকরা বসে আছে, জানতে চাইছে—তাদের মাইনাটা কে দেবে, রেট-ই বা কত হবে? এনার্কিস্টদের সমর্থন নিয়ে মাখনো প্রস্তাব করলঃ রেল শ্রমিকেরা নিজেরাই টিকিটের দাম ঠিক করুক, পয়সা আদায় করুক, নিজেদের মাইনা নিজেরাই নিয়ে নিক।

তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। ঘরের মধ্যে আলোচনা সবে শুরু হয়েছে এমন সময় জানলার কাঁচটাচ কাঁপিয়ে একটা ভোঁতা আওয়াজ উঠল—বিস্ফোরণের

আওয়াজ। সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল মার্তিনেংকো, সে গোঁ গোঁ করে উঠল। কাঁচগুলো ফের কাঁপতে মার্তিনেংকোর ঘুম ভেঙে গেল। "কী চালাকি পেয়েছে সব". নেড়া মাথায় টুপিটা বসাতে বসাতে মার্তিনেংকো চেঁচিয়ে ওঠে। আবার আর একটা বিস্ফোরণের শব্দ, বেশ ভারী আওয়াজ। হাতের রুটি নামিয়ে রেখে চুগাই আর চেয়ারম্যান দুজনে উদ্বিগ্নভাবে পরস্পরের চোখে চোখে চাইলেন। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল লেভকা. তার সঙ্গে আর একজন ঘোড়সওয়ার। সওয়ারের মাথায় টুপি নেই. ভালুকের মতো মাথাটা দোলাচ্ছে, একবার এদিক একবার ওদিক।

"সর্বনাশ হয়েছে!" কানের কাছে হাত নাড়তে নাড়তে বলে উঠল ঘোড়সওয়ার লোকটা। "গোটা স্কোয়াড্রনটাই গেল বুঝি।"

"ওরা দিয়েভকা পর্যন্ত এসে গেছে!" বলে লেভ্‌কার চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে গাল দুটো কাঁপছে। "বুড়ো কত্তা, তুমি এখানে বসে বকেই যাচ্ছ......আর ওদিকে সাত সাতটা ডিট্যাচমেণ্ট নিয়ে কর্নেল সামোকিশ যে হাজির। স্টেশনের ওপর কামান দাগতে শুরু করে দিয়েছে.... ."

একাতেরিনিনস্কি এভিন্যুয়ের বাসিন্দারা এবার আর গদির আড়ালে মুখ লুকোয়নি; প্রতিহিংসার আনন্দে বেশ খোলাখুলিই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, মাখনোর সৈন্যরা কেমন পালায়। ডাইনে বাঁয়ে চাবুক চালিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ঘোড়সওয়ার দল—কারও গায়ে ফারকোট, কারও কসাক জোব্বা নয়তো হুসারের আঙরাখা, কেউবা আবার সিল্কের আলোয়ান চাপিয়েছে—সেগুলো বাতাসে উড়ছে।......ঘোড়ার ওপর জিনের থলিটলি সব মালে ঠাসা—ভার সইতে না পেরে ঘোড়াগুলো হোঁচট খাচ্ছে। বরফে পেছল রাস্তা, তাই অনেক সময় গড়িয়েও পড়ছে—ঘোড়া, সওয়ার, মাল সবই একসঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি। পশ্চাদ্ধাবমান অশ্বক্ষুরের নীচে তাদের ধ্বংসও অবধারিত।... .জানলা থেকে যারা দেখছে তাদের খুব আনন্দ—বলে. "ঐ যে, আর একটা সাবাড়!" লুটের মাল বোঝাই করে মালটানা গাড়ী দৌড়ায়, সামনে যা কিছু সব ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসে চার ঘোড়ার গাড়ী—ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। পদাতিকের মধ্যে যারা সময় মতো কোনো গাড়ীতে জায়গা করতে পারেনি তারাও দৌড়ে দৌড়ে চলে।

ঘর্ঘর. ঝন্‌ঝন্‌, হৈ চৈ—নানা শব্দ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মিছিল ছুটছে শহরের ওপর দিকে—যেদিকে পাহাড়ী অঞ্চল সেই দিকে—কারণ রেলপুল আর স্টেশন তখন কর্নেল সামোকিশ-এর দখলে এসে গেছে।.... .শোনা গেল, মাখনো নাকি হোটেলের বাইরে দৌড়ে এসে নিষ্ফল আক্রোশে দাপাদাপি করছিল. তারপর লেভকা যখন গাড়ী নিয়ে এল তখন কাঁদতে কাঁদতে ধপ করে শুয়ে পড়ল গাড়ীর ওপর—শীপস্কিন কোটের নীচে মুখ ঢাকল—লজ্জায়ই বোধহয়, কিংবা হয়তো লোকে যাতে চিনতে না পারে সেই জন্যে। এই হতভাগা শহর থেকে যেদিকেই হোক পালাতে হবে, তাই মাখনো পালিয়েছে—কোথায় গেছে তা কাউকে বলেনি।

এমনি ভাবে, একটি গুলিও না ছুঁড়ে মাখনোর আর্মি পালাচ্ছে—হঠাৎ পথের

মধ্যে পেৎলুরা ঘাঁটির একেবারে সামনাসামনি। ওরা এ সম্ভাবনার কথা ভাবেওনি, তাই আতঙ্কে বিহবল হয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে ছুটল নীপারের দিকে। কিন্তু সেদিকে সর্বনাশ অবধারিত। ওখানে নদীর পাড়টা খুব খাড়া। ঝোপঝাড়, বেড়াটেড়া ভেঙে, গাড়ীঘোড়া শুদ্ধ উল্টেপাল্টে মাখনোর লোকেরা এসে বরফের ওপর পড়ল। কিন্তু পাতলা বরফ সইতে পারে না, ডুবে যায়, নয়তো ভেঙে পড়ে। মানুষ, ঘোড়া, গাড়ী সব গেল জলের মধ্যে—কালো জল আর বরফের চাবড়া, তারই মধ্যে সব হাবুডুবু! মাখনোর আর্মির অতি সামান্য অংশই বাঁ পাড়ে পেঁছাতে পারল।

নবগঠিত শ্রমিক ডিট্যাচমেণ্টের অনেকেই সে রাত্রে ছুটি নিয়েছে—বাড়ী গিয়ে ঠান্ডাটা একটু কাটাবে, গরম গরম দুটো মুখে দেবে, বুটজোড়া বদলে আনবে—এই তাদের ইচ্ছা। শহরে অস্ত্রধারী সৈন্যের মধ্যে ছিল টহলদারেরা, আর কৃষক রেজিমেণ্টের লোকেরা—তারা আর যাবে কোথায়? কর্নেল সামোকিশের সৈন্যদের আক্রমণের সমস্তটা চোট এই কৃষক রেজিমেণ্টকেই সইতে হল, এমনি তাদের দুরদৃষ্ট। স্টেশনের সামনে স্কোয়ারের কাছে ওদের ঘিরে ফেলে সঙগীণ আক্রমণে গোটা রেজিমেণ্টটাকেই প্রায় শেষ করে দিল। পালাতে পারল দু'চারজন মাত্র—লড়তে লড়তে পেছনে এসে, তারপর এবাড়ী ওবাড়ী আঙিগনা ধরে ধরে তারা গ্রামে পেঁছাল। তিন তিন-শো বাহাদুর জোয়ান একাতেরিনোস্লাভে সোবিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কেমন করে প্রাণ দিয়েছে—সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের খবর ওদের কাছেই জানল গাঁয়ের লোকেরা।

মিরন ইভানোভিচ আর চুগাইয়ের নেতৃত্বে বিপ্লবী কমিটির সদস্যেরা ছুটে বেরিয়েছিলেন—শ্রমিক ডিট্যাচমেণ্টের লোকজনকে ডেকে ডুকে জড়ো করবেন, টহলদারদেরও এক জায়গায় নিয়ে আসবেন। শহর রক্ষা করার আশা নেই। যেসব লোক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, হাঁটা পুলের ওপর দিয়ে তাদের সবাইকে কি করে বাঁ পাড়ে নেওয়া যায়—এটাই তখন একমাত্র সমস্যা। ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা জমা হল। বাড়ীঘরের কোণে কোণে দাঁড়িয়ে, ফুটপাথের ওপড়ানো পাথরে আড়াল নিয়ে, নয়তো ব্যারিকেডের পেছনে খাড়া হয়ে তারা অগ্রগামী পেৎলুরাওলাদের ওপর মেশিনশান থেকে গুলি চালাতে লাগল অজস্র ধারায়। চতুর্দিক থেকে শ্রমিকেরা দৌড়ে আসে—সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র, আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ সম্পত্তি—যা ফেলে দিলেও কোনো লোকসান হত না। তাই নিয়ে ওরা ছোটে পুলের ওপর দিয়ে। নীচে থেকে, ছাত থেকে, নদীর পাড় থেকে চারিদিক থেকে ওদের লক্ষ্য করে গুলীবিদ্ধ হয়।

চুগাই, মিরন ইভানোভিচ, রশচিন, মারুসিয়া, শাশকো, চীজ এবং আর কয়েকজন কমরেড—ফেরার পথে এরাই সবার শেষে। এ কোণা থেকে ও কোণা, এ আশ্রয় থেকে ও আশ্রয়—এমনিভাবে লাফাতে লাফাতে ওরা চলেছে, সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে মেশিনগান। সামোকিশের সৈন্যদের উঁচু উঁচু ছাই-রঙগা টুপি তখন কাছে দেখা যাচ্ছে, পুল-মুখ থেকে বেশী দূর নয়। চুগাইদের পথের কঠিনতম অংশ এবার পার হতে হবে—পুলে গিয়ে উঠতে হবে। পুলের ওপর আড়াল নেবার কিছু নেই, থাকার মধ্যে আছে শুধু কতকগুলো মৃতদেহ আর

পরিত্যক্ত বোঁচকাবুঁচকি।......মেশিনগানটা ঘুরিয়ে তার ঢালের আড়ালে শুয়ে পড়ল চুগাই তার সঙ্গে শাশ্‌কো। বাকি সবাইকে চীৎকার করে বল্লঃ "তোমরা ছোটো, পাগলের মতো ছোটো!" ওরা ছুটল। পাল্লা দিয়ে চল্ল চুগাইদের মেশিনগানের গর্জন, মনে হতে লাগল গান্‌টা বুঝি হাতের মধ্যে গলে গলেই পড়ছে।

পুলের ঠিক মাঝখানে হঠাৎ যেন হোঁচট খেল মারুসিয়া—পা দুটো ভারী বোঝার মতো, চলছে, কিন্তু কোনো দিশা নেই।......ওকে ধরে ফেল্ল রশাচিন, নিজের হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড় করাল। একটু আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চাইল মারুসিয়া, কি যেন বলবে, কিন্তু শুধু চেয়েই রইল। হেঁট হয়ে ঠিক ছোট্ট মেয়েটির মতো ক'রে ওকে একেবারে কোলে তুলে নিল রশাচিন। ওর বুকের কাছে ঘন হয়ে আছে মারুসিয়া—ভার যেন ক্রমেই বাড়ছে। যাক, এবার পুল শেষ। কিন্তু ঠিক তখুনি রশাচিনের আঘাত লাগল, মনে হল উরুতের ওপর হঠাৎ কে যেন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি কষিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। তবু কোনো রকমে মারুসিয়াকে ধ'রে রাখে, পড়ে গেলে সে যে আঘাত পাবে। পেছন থেকে চুগাই এসে পৌঁছাল, ছুটতে ছুটতে। "আপনি একে ধরুন, নইলে আমার হাত থেকে পড়ে যাবে", চুগাইকে বল্ল রশাচিন। ঠিক সেই মুহূর্তে কিসের যেন ঘা লাগল মাথায়—রশাচিনের টুপিটা উড়ে গেল অন্ধকার হয়ে এল সারা পৃথিবী। শুনতে পেল চুগাই বলছে, "শাশ্‌কো, একে তো ফেলে গেলে চলবে না!".... ব্যস্‌, তারপরই অজ্ঞান।

॥ ষোল ॥

ফেব্রুয়ারি মাস এলে তবে 'দস্যু' নাটকের অভিনয় হল. তার আগে কাচালিন রেজিমেণ্ট হাঁফ ছাড়ারই সময় পায়নি। হিম আর তুষারঝড়ের মধ্যে দিয়ে শুধু লম্বা লম্বা মার্চ করে ফিরতে হয়েছে এতদিন। দিনের শেষে উষ্ণ আশ্রয় জোটেনি—মেঘলা আকাশের নীচে সূর্যাস্তের বিষণ্ণ আভা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বরফ-ঢাকা স্তেপের মধ্যে একটুকরো জ্বালানি কাঠ পাওয়াও অসম্ভব—একটু আগুন জ্বালিয়ে যে শীতার্ত শরীরগুলোকে গরম করে নেবে তারও উপায় ছিল না। আর এরি সঙ্গে সঙ্গে খালি যুদ্ধ আর যুদ্ধ, ভোরের বিপদ-সংকেত, কসাকদের সঙ্গে হিংস্র, সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ—এই চলত অবিরাম। কিন্তু এখন এ সবই অতীত। মামন্তভ তাঁর বিধ্বস্ত বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ সঙ্গে নিয়ে দনের ওপারে বহুদূর পর্যন্ত সরে গেছেন। তাঁর আর্মিই এখন লুপ্তপ্রায়। জারিৎসিনের ওপর তিন তিনটে আক্রমণে তিনি হাজার হাজার সৈন্য নষ্ট করেছেন, দন আর্মির সারবস্তুই খুইয়ে বসেছেন, কিন্তু তবু কিছুই করতে পারেননি। তাই ওঁর ওপর কারও আর বিশ্বাস নেই।

একটা বড় গ্রাম বিনা যুদ্ধেই রেডদের দিকে চলে এসেছিল, সেই গ্রামে ঘাঁটি বসিয়ে কাচালিন রেজিমেণ্টের লোকেরা এখন খুব খুশী। দিব্যি পেট ভরে খায় আর গরম বিছানায় শোয়। সামনে বসন্ত। বসন্ত এলে এই একটানা যুদ্ধটাও হয়তো শেষ হবে।

ছ হপ্তা ধরে মার্চ করার কঠোর পরিশ্রমে দাশা কাহিল হয়ে গেছে, নাটকের কাজ আরম্ভ করার কথা তার মনেও হয়নি। থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম সব কোথায় গেছে কে জানে, অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে আছে, এমন কি নাটক-লেখা খাতাখানা পর্যন্ত বে-পাত্তা। দিব্যি গরম ঘরের মধ্যে দাশা এখন কটা সন্ধ্যা শুধু ইভান ইলিয়িচের পাশে ঘন হয়ে বসে থাকতে চায়। কথাটি কইবে না, কিছু ভাববে না, শুধু বসে বসে কাটিয়ে দেবে সন্ধ্যার শান্ত ক্ষণটুকু—আর উনুনের তলা থেকে ওর সুপরিচিত ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে যাবে একটানা, অনবরত।

তারপর কাপড় কাচা আছে, সেলাই-ফোঁড়াই আছে। ইভান ইলিয়িচের বুট-জোড়া মেরামত করানোও দরকার। আবার চেহারার দিকেও একটু নজর দিতে হয়—নইলে ওরা সবাই, মায় ইভান আর ও নিজে পর্যন্ত কেউ যে আর ওকে আজকাল মেয়ে বলেই মনে রাখে না। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা বরফ-জমা মাঠের ওপর দিয়ে ও আর আগ্রিপিনা স্নানের ঘর থেকে স্নান করে ফিরল। গাল-

গুলো তখনো গরম, যেন ধোঁয়া উঠছে। তার ওপর তুষার-ভরা হাল্কা হাওয়া লাগে—মনে হয় কী আরাম, যেন স্বর্গ। দুজনে মিলে সামোভার-এ জল গরম করল, রাত্রের খানাও তৈরী ক'রে রাখল। ইভান ইলিয়িচ আর গোরা—ওরাও স্নান করে এসেছে। খেতে বসল চারজনে। পুরুষ দুজন বেজায় খুশী—আহা বাঁধাকপির ঝোলের গন্ধটা ভারি সুন্দর, আর সামোভার থেকে কী খুশবুই না আসছে?

“এই তো চাই, ইভান ইলিয়িচ,” গোরা বল্ল। “কাজের পর বিশ্রাম......”

কিন্তু দাশার কপালে বিশ্রাম কই? পরদিন ইভান ঘরে ফেরার ঠিক আগে আনিসিয়া এসে হাজির। হাতে একখানা বই—শিলারের গ্রন্থাবলী। আনিসিয়া সংযতবাক, গম্ভীর। স্বপ্নময় চোখ দুটি তুলে বল্লঃ

“আমার মনে সুখ নেই দারিয়া ভাই।......বোধ হয় আদর পেয়ে পেয়ে আব্‌দেরেই হয়ে পড়েছি।......আর সবাই বেশ সবার মতোই আছে, কিন্তু আমার খালি বায়না।......সেই এতটুকু বেলা থেকেই অম্‌নি......যাকগে, তখন তো অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে চুকে বুকে গেল, ছেলেপিলে হল......তারপর, তারপর আমার সেই দারুণ দুর্ভাগ্য। দারিয়া বোন আমার বয়স এখন চব্বিশ বছর। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি কি করব বল? আবার সেই কুড়ে*, আর এক চাষীর ঘর? জানলায় দাঁড়িয়ে শূন্য স্তেপের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটানো? এতদিনে যা দেখলাম, যা শুনলাম, তাতে আমার অন্য কিছু পাওয়া দরকার......!”

গ্রেটকোটের তলে আনিসিয়ার বুকটা ওঠে আর পড়ে, আধো বুজে আসে চোখ দুটো।

“এ বইটা আমি আগাগোড়া পড়েছি। যুদ্ধের সময়ও ছাড়িনি, কাছে ছিল। এখনো হয়তো ঠিকমতো শ্রেণী-চৈতন্য পাইনি আমি, তার ওপর মুখ্যু, শিক্ষা-দীক্ষা নেই। কিন্তু এসব তো শুধরে নেওয়া যায়। আমার মনের মধ্যে যেন কত রকমের সুর শুনতে পাই, দারিয়া ভাই।......নিজের বিষয় আমি বিশেষ জানিনে, কিন্তু অন্য লোকের কথা জানি।......এই যে কাউণ্টেস্ আমালিয়া—এর ওপর কত কথাই যেন বলতে পারি, ভাবলে চোখে জল আসে।......সত্যি, মনে হবে যেন বইয়ের পাতা ছেড়ে জীবন্ত আমালিয়া একেবারে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।......শারিগিন বেচারাও তাই বলেছিল।......দারিয়া ভাই, আজ আমরা একটা জায়গা বার করেছি—ঐ যে ঐ ইস্কুলটা—ওখানে তিনশো লোক বসতে পারবে।......ছুতোরও আছে এখানে—কাঠ আর ক্যাম্বিস আমরা জোগাড় করে আনব।......তাহলে ‘দস্যু’ থিয়েটার দেখানো হোক না? পার্ট-টার্ট সব আমাদের মনে আছে।......লোকেরা সব আজ এই কথাই বলাবলি করছিল......বলছিল ভাল মতো একটা তামাসা দরকার......”

এমন সময় ইভান ইলিয়িচ ভেতরে এল। কথাটা শুনে সে যে দারুণ খুশী তা বলাই বাহুল্য।

"চমৎকার কথা! এখানে তো আমরা হপ্তাখানেক থাকছি।......জওয়ানদের সত্যিই খুব ভাল লাগবে!"

অদ্ভুত লোক ইভান ইলিয়িচ, তার উৎসাহে কিছুতেই ভাঁটা পড়ে নাঃ দাশা তো আজ পাশে রয়েছে, ভরা বাতাসে পাল তুলে দিয়ে দুজনে চলেছে যেদিকে সুখ সেই দিকে।......সেই যে সেই বহুদিন আগের স্টীমার যাত্রা —জুনের নীল আকাশ, তার নীচে উতলা বাতাস ভরা দিনগুলি—ঠিক তেমনই......

গোধূলি বেলায় ঘরে বসে বসে প্রিয়তমের হৃৎস্পন্দনের সুর শুনবে, পুষির মতো সতর্ক পদক্ষেপে তার গোপনতম মনের নাগাল ধরবে—তা আর দাশার হল না।......আর, ওর কি সত্যি সত্যিই গোপন কিছু আছে? যদি থাকেও তাতে তোমার কি দাশা? ইভান ইলিয়িচের মধ্যে তো কোনো জটিলতা নেই, সে উদার মানুষ, ব্যস্। আর তার হৃদয়ে যা কিছু আছে সব, সবই তো দাশার জন্যে, ইচ্ছে করলেই দাশা নিয়ে নিতে পারে। হিম আর ঝড়ে পোড়-খাওয়া ইভানের মুখটাই দেখ, ঠিক সূর্যের মতো সোজা, সরল।......আহা, দাশার কৃশ-তনুর ভঙ্গুর অন্ধকারের মধ্যে ইভানেরই রক্তে মাংসে গড়া আর এক নতুন জীবন যদি আজ আশ্রয় নিত—দুনিয়ার রূপই তাহলে বদলে যেত......।

দলের রিহার্সাল আরম্ভ হল। ওঃ সে এক যন্ত্রণা! দাশা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে, অভিনেতারা পরস্পরের চোখে চোখে চাইতেই পারে না—এম্‌নি লজ্জাকর মহড়া। যুদ্ধের ধাক্কায় ওদের সূক্ষ্মতাই নষ্ট হয়ে গেছে, সবাই একেবারে চোয়াড়ের মতো। আর ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে।......শেষকালে সাপঝক্‌ভ এসে বাঁচাল—থিয়েটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, পশু, পাখী, এদের জীবনে পর্যন্ত নাটকীয়তার অভাব নেই। খেঁকশিয়ালীর কথাই ধরঃ ইঁদুর ধ'রে এনে তারপর ছানাগুলোর সামনে কী নাটকই করে—একবার ছোঁ মেরেছে, একবার পেটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে, আবার উঠে শুধু পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে চলছে, লেজ নাড়াচ্ছে—কত কী করছে।......বক্তৃতা শুনে নেতাদের গোমড়া ভাব দূর হ'ল, কাজকর্ম আর একটু ভালভাবে এগুতে লাগল। ইস্কুলঘরে স্টেজ খাড়া ক'রে তুলি আর রংয়ের সাহায্যে ওরা দৃশ্যপটও বানিয়ে নিল। আর ফুটলাইট হল এক সার তেলের পলতে—সসারে ভাসছে। খামারবাড়ীতে থাকার সময় উকিলের কাছ থেকে জবরদখল করা সেই যে ফ্রককোট আর ড্রেসকোট, সেগুলোর এতদিন পাত্তাই ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল লটবহরের মধ্যে সেগুলোও ঠিক হাজির।

শুভদিন অবশেষে সমাগত। সূর্য সবে ডুবেছে, এমন সময় কামানটানা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেতলের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে (শিঙা ফোঁকার পরিকল্পনাটা ইভান ইলিয়িচের) এক সিপাহী চল্ল গাঁয়ের ভেতর দিয়ে—চীৎকার করে সবাইকে

বলছেঃ "নাগরিক ভাই-বোনেরা, কমরেডস্‌, আপনারা আসুন, শিলারের 'দস্যু' নাটকের অভিনয় এখনি আরম্ভ হবে......"

হুড়মুড় করে সারা গাঁ-ই একেবারে ইস্কুলবাড়ীতে হাজির। দেউড়ীতে আর হলের দরজার কাছে কী ভিড়, কী ধাক্কাধাক্কি! যারা কোনো রকমে ভেতরে ঢুকতে পারল তাদের চোখটোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কারও টুপি গেছে, কারও জামার বোতাম গেছে—এম্‌নি কাণ্ড।......যারা জায়গা পেল না তারাও কিন্তু দুঃখ করে বসে থাকার লোক নয়। আকাশের গভীরতায় তখন মধু ঋতুর আগমনী বাজছে, জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে শুক্লপক্ষের চাঁদ—দেখতে দেখতে ইস্কুলের সামনে বাতাসে উঠল একর্ডিয়নের সুর। যে গ্রাম সেদিন পর্যন্তও বিরোধী ছিল, লাল সিপাহীরা আজ সে গ্রামের মেয়েদের মনোহরণ করছে, ওদেরই বাছা বাছা গান বাজিয়ে শোনাচ্ছে—'দেবদূত উড়ে গেল মাঝ রাতে আকাশে।'......চেনা-পরিচয় হতেও দেরী হয় না, হাসিঠাট্টার হুল্লোড় ওঠেঃ "কোমল কটাক্ষের জন্যেই তো চোখের সৃষ্টি, আর চুমু খাওয়ার জন্যে ঠোঁটের." "সেপাইয়ের বিয়ে তো আর হাঁচি নয় যে সবুর সইবে না......" —এম্‌নি সব হাসিঠাট্টা।

এদিকে অভিনয়ের ওখানে প্রথম দিকে শ্রোতাদের সে কী হাসি। পাদ্রীর পোষাককাটা ঢিলে আলখাল্লা—তাই পরে রং-মাখা মুখের ওপর শনের দাড়ি লাগিয়ে বুড়ো মুর অভিনয়ে নেমেছেঃ কিন্তু লোকেরা যেই চিনেছে যে এ হল সিপাহী ভানিন, অমনি হাসিতে হল একেবারে ফেটে পড়ে। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো ভানিন" বলে লোকেরা চীৎকার করে, বলে, "চালাও ভানিন, জোরসে চালাও, লজ্জা কোরো না!" তারপর উইংস-এর আড়াল থেকে লেংচে লেংচে ঢুকল আর একজন—তার পরনে অদ্ভুত টেলকোট, পায়ে মেয়েদের মোজা—চোখ পাকিয়ে, দাঁত কিড়মিড় করে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলছেঃ "আমি বাবা, আমি, তোমার বিশ্বস্ত পুত্র ফ্রান্‌ৎস্‌!" দেখবামাত্র লোকে চিনল—কুজমা কুজমিচ। হাসতে হাসতে সবাইয়ের পেটে খিল ধরে আর কি।

উইংসের পেছনে দাশা তো একেবারে মাথায় হাত, সাপঝকভকেই বলে বার বারঃ

"নাঃ এ আর চলবে না—একেবারে যাতা হয়েছে। তখনই জানতাম......"

কিন্তু অভিনয়ের গুণে দর্শকদের মন থেকে কৌতুকের ভাব শীগ্‌গিরই কেটে গেল। কে কোন্‌ পার্ট করছে বুঝে নেবার পর সবাই মন দিয়ে শুনতে আরম্ভ করল। এবার লাতুগিনের পালা। নীচে থেকে তেলের বাতির আলোয় ওর মজবুত চেহারা ঝকঝক করছে। মুখে ভেড়ার লোমের দাড়ি, এলোমেলো-আঁকা ভ্রূদুটি বাঁকা, দারুণ জোরে বুকের ওপর হাত দুটো চেপে ধরেছে (চাপের চোটে উকীলের কালো কোটটা ফেঁসে যাবার জোগাড়)—এমনি ভাবে এগিয়ে এসে পুরুষ কণ্ঠে উচ্চারণ করল লাতুগিনঃ

"ওঃ হোঃ, সমস্ত প্রকৃতিকে যদি ডেকে বলতে পারতাম ওঠো—আকাশ,

পৃথিবী, মহাসমুদ্র, তোমরা ওঠো, যুদ্ধ ঘোষণা করো এই নীচ শৃগাল বংশের বিরুদ্ধে......!"

শ্রোতারা এবার একেবারে নিস্তব্ধ। নাটকের গতি কোন্ দিকে তা তখন তারা বুঝতে পেরেছে।

দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা সবই বরাবর এক, কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রতি দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে যবনিকার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেয় সার্গি সার্গিয়েভিচ, অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ঘোষণা করেঃ

"তৃতীয় দৃশ্য। কাউণ্ট মুরের জমকালো প্রাসাদ। বাগান থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে জানলা দিয়ে। সুন্দরী আমালিয়া কুঞ্জবনে উপবিষ্ট......"

সার্গি মুখ সরিয়ে নেয়, তারপর যবনিকা ওঠে। রোষলোচনা সুন্দরী—প্রশস্ত ঘাগরা, বুকের ওপর আড়ি ক'রে বাঁধা রঙীন রুমাল, গালে গোলাপের আভা, আয়ত আঁখি দুটি, কুঞ্চিত কুন্তল—এই সুন্দরী যে ২নং কম্প্যানীর আনিসিয়া নাজারোভা হতে পারে সে কথা কারও মনেও আসে না।

মৃদু, কম্পিত স্বর, প্রায় গানের সুরের মতো। ছোট্ট মুঠি দিয়ে টেবিলের ওপর আঘাত ক'রে ফ্রান্‌ৎসকে বলছেঃ "আমার চোখের সুমুখ থেকে দূর হও শয়তান!" তখন থেকেই নাটক চলে অবাধ গতিতে—যেন শীতের রাতে ঘরে বসে বসে রূপকথা শোনা—বুড়ো দাদু গল্প বলছেন আর চুলার ধার থেকে মাথা বাড়িয়ে অবাক হয়ে শুনছে নাতি-নাতনীর দল....

কুজমার গালে আমালিয়ার যেখানে ঘুষি কষাবার কথা সেখানটায় কুজমার খুব ভয়। আনিসিয়ার চোখে যতই স্বপ্ন মাখানো থাকুক, হাতটা যে একেবারে পাকা যোদ্ধার হাত! "বেশী জোরে মেরো না" ফিস ফিস করে বলতে যায় কুজমা, কিন্তু আনিসিয়া সমস্ত হৃদয় ঢেলে চীৎকার করে ওঠে, "আরে নির্লজ্জ শপথহন্তা", সঙ্গে সঙ্গে এমন জোরে হাত তোলে মনে হয় যেন ওর অতীতের সবখানি গুরুভার ঐ হাতের মধ্যেই মুষ্টিবন্ধ। ঘুষির চোটে কুজমা একেবারে উইংসের ভেতর। কিন্তু এবার কেউ হাসল না। "ঠিক শাস্তি", বলে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল। সবাই মিলে দারুণ হাততালি—বদমায়েসটাকে হাতে পেলে ওরা কেউই তাকে ছাড়ত না।

তারপর গলার হার টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে মাটিতে আছড়ে ফেল্ল আমালিয়া। পায়ে দলতে দলতে বল্লঃ

"ওরে ধনীর দল, পর্, তোরা অলংকার পর্! ষোড়শোপচারে আকণ্ঠ পূর্তি ক'রে কোমল উপাধানে গা এলিয়ে দে! কার্ল! কার্ল! আমি তোমাকে ভালবাসি......!"

পর্দা সরিয়ে হাসতে হাসতে মুখ বাড়াল সার্গি সার্গিয়েভিচ—খুব গুরুত্ব দিয়ে বল্লঃ "ইণ্টারভ্যাল।" উইংসের মধ্যে দাশাকে খুঁজে বার ক'রে আনিসিয়া তার বুকে মুখ লুকাল। কাঁপছে আর বলছেঃ

"না, না, আমাকে প্রশংসা কোরোনা দারিয়া ভাই!"

এর পর থেকে অভিনয় চল্ল নিজস্ব গতিতে। প্রথম অংকের সময় অভিনেতাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল—কিন্তু এখন পেশী টেশী বেশ সহজ হয়ে এসেছে. অতি-চড়া গলাগুলো মানুষের মতো শোনাচ্ছে। সার্গি সার্গিয়েভিচ প্রম্‌ট্ করে, কিন্তু তাঁর ফিস ফিস কথা যদি কোথাও ফস্কে যায় তাহলেও অভিনেতারা এখন আর ঘাবড়ায় না, কথা বানিয়ে বেমালুম চালান করে দেয়। সে কথার ঝাঁঝ শিলারের চেয়ে কিছু কম নয়, আর বোঝার পক্ষে শিলারের চেয়ে অনেক সোজা।

নাটক দেখে শ্রোতারা খুব সন্তুষ্ট। সামনের সারিতে গোরার পাশে তেলেগিন বসেছে—ক'বারই তার চোখ প্রায় জলে ভেসে গিয়েছিল। ইভান গোরা কমিসার, তার আবেগ দেখানো সাজে না। সে শুধু জোরে জোরে শ্বাস ফেলে—লড়াইটড়াই বেশ জোর চল্লে যেমন শ্বাস ফেলে সেই রকম। কিন্তু সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট অভিনেতারা নিজেরা। সাজ-পোষাক. পেণ্ট, কিছুই আর তারা ছাড়তে চায় না। তখন মোরগ ডাকছে, কিন্তু তবু ওদের একবার বল্লেই হয়—একেবারে গোড়া থেকে আর এক দফা অভিনয় তখুনি লাগিয়ে দেবে।

সাঙ্গ হল উৎসব। গান বাজনা আর একর্ডিয়নের সুর তখন মিলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার শব্দ আসে, তা ছাড়া সব নিস্তব্ধ। এমন কি মোরগগুলো পর্যন্ত থেমে গেছে। নিদ্রামগ্ন সারাটা গ্রাম। ধীরে ধীরে পথ দিয়ে চলেছে আনিসিয়া, পাশে লাতুগিন। লাতুগিনের এখনও গরম লাগছে, তাই গ্রেটকাটটা কাঁধের ওপর ফেলা।

“কী আশ্চর্য আনিসিয়া”, ও বলছিল। “তুমি তোমার গ্রেটকোটের খোলস পরে চলেছ, অথচ তারই মধ্যে দিয়ে আমি তোমার ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।......মামুলি কথা এখন মানায় না—তোমার সঙ্গে আমি মামুলি কথা বলতে তো চাইনে......”

একেবারে গ্রামের শেষে যেখানে অন্ধকার দিগন্ত প্রান্তরে মিশে গেছে সেখানে পৌঁছাল দুজনে। কালো আকাশ, চাঁদ বহু দূরে। কিন্তু আনিসিয়ার চোখের সামনে সারাক্ষণই যেন পাদপ্রদীপের আলো ঝিকমিক করছে। আলোর ওধারে প্রেক্ষাগৃহের বন্ধ. গরম বায়ুমণ্ডল থেকে ওর প্রতিটি কথায় প্রাণের সাড়া জেগেছে. কাছে ভেসে এসেছে কত হৃদয়মথিত দীর্ঘশ্বাস। ওর এই যে শক্তি, এ যেন একেবারে প্রকৃতিগত, একান্তভাবেই নারীসুলভ—কিন্তু এতদিন ও তা টের পায়নি। লাতুগিনের কথা শুনতে ওর ভালই লাগলঃ

“তুমি আমার রাণী! জীবনে অনেক মেয়েকেই দেখেছি......ঝাঁটা মারি তাদের মুখে......কিন্তু তোমার মতো কাউকে তো কখনো দেখিনি।......ভালবাসায় আমি ডুবে গেছি একেবারে—কেউ সে কথা জানল তো ভারি বয়েই গেল।”

থামল। আনিসিয়াও থামল। দুহাতে আনিসিয়াকে জড়িয়ে ধরে লাতুগিন. কাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় গ্রেটকোটটা। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে আনিসিয়ার শীতল ওষ্ঠে সুদীর্ঘ চুম্বন এঁকে দেয়। তারপর এক পা পিছিয়ে আসে। আনিসিয়ার মুখটা যেন ভাবলেশহীন, কিন্তু গাল দুটি রাঙ্গা হয়ে

উঠেছে। ওর মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে লাতুগিন। আনিসিয়ার দৃষ্টি কিন্তু ফেরানো—রং-মাখানো চোখ তুলে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

"উঃ এই আমার যন্ত্রণা শুরু!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল লাতুগিন। "ও, আচ্ছা......"

মাটি থেকে কোটটা তুল্ল, তারপর এগিয়ে চল্ল দুজনেই।......

সে রাত্রে দাশাও ঘুমতে পারেনি। বালিশে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে উঠে বল্লঃ

"এক্ষুনি করা যাবে না সত্যি......তবু দেখ—আমাদের আনিসিয়া রয়েছে, লাতুগিন রয়েছে। তারপর কুজমা কুজমিচ—সে তো পাকা অভিনেতা। সেই ইয়াগো সাজতে পারবে......এবার 'ওথেলো' নাটক করতে হবে। পাত্রপাত্রী সব আমরা ঠিক করে ফেলব—কাল তুমি রেজিমেণ্টে একটা অর্ডার দিয়ে দিও।......গোটা ডিভিশন থেকেই আমাদের ডাক পড়বে, দেখে নিও। শুধু ডিভিশন কেন, কোর থেকেই।......কিন্তু আমাদের সীন-সীনারি যেন ঠিক থাকে, কিছুতেই গোলমাল হলে চলবে না। ওর জন্যে আলাদা গাড়ী চাই বুঝলে, কমিসারকে বলে দিও।......ওঃ কী তন্ময় হয়ে সবাই বাটক দেখছিল, মনে হচ্ছিল যেন শিল্পকলা একেবারে শুষে নেবে, স্পঞ্জের মতো......"

"তোমার কথা খুব সত্যি," তেলেগিন বল্ল। ওর শার্টের বেল্ট খোলা, পায়ে নরম স্লিপার—পেছন দিকে দুহাত জুড়ে পায়চারি শুরু করেছে। টেবিলের ওপর আলো জ্বলছে—তেলেগিন যত বারই সামনে দিয়ে যায়, ওর প্রকাণ্ড, কালো দেহের আড়ালে আলোটা ঢাকা পড়ে। দাশার যেন সহ্য হয় না। জানলা পর্যন্ত গিয়ে যখন আবার মুখ ফেরায়, হাসি হাসি রাঙা রাঙা মুখের ওপর আলো পড়ে, মুখের রেখায় রেখায় যখন ধাতুর দৃঢ়তা ফুটে ওঠে—তখন দাশার হৃদয়টা যেন উদ্দাম সুরে বাজতে থাকে।

"তোমার কথা খুব সত্যি।......রাশিয়ানরা থিয়েটারের ভক্ত।......শিল্পকলার দিকে ওদের বিশেষ রকম ঝোঁক। কী চাহিদা, মনে হয় যেন আকণ্ঠ পিপাসা...। একবার ভেবে দেখঃ ছ হপ্তা ধরে লড়ে লড়ে লোকগুলো একেবারে অস্থি-চর্মসার—যা কষ্ট গেছে তাতে পথের কুকুরও বোধ হয় বাঁচতে পারত না।—এত কষ্টের পর......এখন ওদের শিলার নিয়ে কি দরকার? অথচ আজকের ব্যাপারটা দেখলে তো, যেন মস্কো আর্ট থিয়েটারে কোনো নাটকের প্রথম অভিনয় দেখছি। আনিসিয়ার কথাই ধর! এমন অভিনয় কখনো দেখিনি—ও একেবারে জাত এক্ট্রেস। যেমন ভঙ্গি, তেমন গরিমা...তেমনই আবেগ! তার ওপর আবার--মহা সুন্দরী!"

হাত ছড়িয়ে দিয়ে আলোটা আবার পার হল। দাশা বল্লঃ

"পায়চারি একটু থামাও তো ইভান!"

বিরক্তির সুর—এমন সুর ইভান বহুদিন শোনেনি। বালিশে ঠেস দিয়ে দাশা একদৃষ্টে সামনে চেয়ে আছে, চোখের নীচে একটুখানি কালো ছায়া। হঠাৎ থেমে পড়ল ইভান। এগিয়ে গিয়ে বসল বিছানার ধারে। বোঝাই যায় যে ও ভয় পেয়েছে।

"ইভান!" (দাশাও উঠে বসেছে।) "ইভান, অনেকদিন ধরে ভাবছি তোমাকে

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।" চোখের ওপর ঝট করে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বল্ল, "তোমাকে এ অনুরোধ করা খুবই কঠিন, কিন্তু এমন করে আমি আর পারছিনে......"

ইভানের মুখ দেখে দাশা বুঝল যে, ওর কথার অর্থ সে ধরতে পেরেছে। কিন্তু তবু কথাটা ও বলেই দিল—নিজের মনে মনে এ কথা তো ও কতবার বলেছে।

"ইভান, তুমি কি আর আমাকে মেয়ে বলে মনে কর না?"

ইভানের কাঁধটা কুঁচকে উঠল। দুহাতে মাথা চেপে ধ'রে অস্ফুট স্বরে কি যেন বল্ল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দাশা ওর দিকে চায়—ক্ষীণ আশা তখনও জেগে আছে মনের মধ্যে।......না, কি, এই ওর চরম দণ্ডাজ্ঞা?

"দাশা, দাশা, তুমি কি বুঝতে পার না? দয়া করতে পার না?"

"দয়া?" (এই—এই ওর দণ্ডাজ্ঞা!)

"ওঃ দাশা, কী ভালবাসি তোমাকে।......তুমি হয়তো আমাকে ঘৃণাই কর.... কিন্তু কেন যে ঘৃণা করবে তা তো বুঝতে পারিনে।......স্বভাবজাত বিরাগেরই ফল হবে হয়তো। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারি।......তোমাকে যেদিন ভালবেসেছি, চিরকালের মতোই বেসেছি......সে আমার পক্ষে কঠিন হোক, কি সহজ হোক, বিশ্বাস করো, তাতে কিছু এসে যাবে না......যেমন আমার আপন হৃদয়, তেমনি তুমি—সারাক্ষণই বুকের কাছে।......তাই বলি, কিচ্ছু ভেবো না—বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, ব্যস......"

শুনতে শুনতে দাশা মাথা নাড়ায়। ভ্রূভংগ করে তেলেগিন, চেষ্টা করে আবার বলেঃ

"কেন জানি তোমার ছোট ছোট পা দুখানির কথা সব সময় মনে পড়েছেঃ আহা, কী কষ্ট পা দুখানির! সুখ খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হল, কিন্তু বৃথা, সবই বৃথা......

কম্বলের ভেতর থেকে সরু সরু খালি পা দুটি বার ক'রে দাশা মাটিতে নামল—ছুটে গিয়ে টেবিলের বাতিটা নিভিয়ে দিল।

নাটক দেখে আগ্রিপিনা আর গোরা ঘরে ফিরল। সারা দিনে বিস্তর কাগজপত্র জমেছে। গোরা বাতি জ্বালিয়ে বসে বসে কাগজপত্র দেখে। শোবার আগে সব ঠিক করে রাখতেই হবে—এ অভ্যাসের আর নড়চড় নেই। একটু দূরে দরজার কাছে আনিসিয়া বসে আছে, বেঞ্চের ওপর। টুপি, কোট কিছুই খোলেনি।

"না, তোমার পার্টও তা বলে মন্দ হয়নি," হাই তুলে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে গোরা বলে। "কিন্তু কুট কুট ক'রে কি বলছিলে ভাল শুনতে পাইনি, পার্টটা যা ছোট! কিন্তু আনিসিয়া, ওঃ সাবাশ!" বাতির কাছে মুখটা নামিয়ে কাগজ দেখে আর মুচকি মুচকি হাসে। "মেয়েলি কথায় যাকে বলে মাজা দোলানো, মানে মেয়েটা একটু বেশী রকমই মাজা দোলায় হয়তো......মরদ টরদ চায় বোধহয়......হুঁ, ওর ঝোঁকটা ঐদিকেই—ওকে ভাল করে দেখাশোনা করা

দরকার।......বিপ্লবের গুণে ওর মতো অনেকেই তো ওপরে উঠে এসেছে। হুঁ, এটাই আসল কথা, লাখ কথার এক কথা।......জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই, উঁহুঁ,......আমাদের দেশের লোকের কত গুণ।......কিন্তু আমরা যেভাবে লড়ছি তাতে বড্ড অপচয় হচ্ছে।......আমাদের মেশিন-টেশিন দরকার। এই যে এইটা পড়ে দেখ—" বলে একটা চিঠির ওপর চোখ বুলোল। 'ট্যাক্‌টা আমরা খালি হাতেই দখল করলাম।' ...উঃ একেবারে জংলী! আমার যদি ছেলে থাকত তো তার বুকের ওপর একেবারে দেগে দিতামঃ 'ওরে আহাম্মক, ভুলিসনে যেন, তোর সুখের জন্যে তুই কাদের কাছে ঋণী, তাদের হাড়পাঁজরা আজ স্তেপের মাঝখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে।......"

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছে আগ্রিপিনা—ঠোঁট দুটো চেপে বন্ধ করা। যে-ঘটনা জীবনে সব চেয়ে দুঃখ দিয়েছে তারই স্মৃতি মন্থন করছে বসে বসেঃ রাত্রিবেলা স্তেপের মাঝখানে অসাড় হয়ে পড়ে আছে ইভান গোরা, নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ। তার পাশে আগ্রিপিনা, ইভানের জীবন থাক বা না থাক কিছুতেই তাকে ছেড়ে যাবে না। ওর রাইফেল প্রায় শূন্য, বুলেট আছে মাত্র এক রাউণ্ডের মতো।......আর সবাই চলে গেছে কিন্তু ও যায়নি। স্তেপের মাঝখানে সেদিনের সেই রাত্রে ও তো ইভানকে একলা ছেড়ে দিতে পারেনি......ওর হাড়গুলো সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে না কেন? গেলেই ভাল হত।

"শুনতে যাচ্ছ না কেন আগ্রিপিনা?"

বাতির আলো থেকে চোখটা আড়াল করে ঘরের ওপারে আগ্রিপিনার দিকে চাইল ইভান। আগ্রিপিনার চোখ বোজা, অশ্রুজলের ধারা নেমেছে। কালো ভ্রূ-দুটি ওপরে তোলা, ভ্রূর নীচে দীর্ঘ পল্লব বেয়ে বেয়ে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।......কাগজপত্র থলিতে ভরে রেখে ইভান উঠল, আগ্রিপিনার কাছে গিয়ে সামনে উবু হয়ে বসল।

"আরে বকুরাম, হল কি? খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি?"

"দাও, ওর বুকের ওপর দেগে দাও! হাড়পাঁজরা গড়াগড়ি যাওয়ার কথা শেখাও গিয়ে.. ..."

"কি হয়েছে আগ্রিপিনা, বল না?"

ছোট্ট মেয়ের মতো মরীয়া সুরে জবাব দিল আগ্রিপিনাঃ

"আমার যে দু মাস হয়ে গেল.....তোমার তো চোখ নেই......খালি আনিসিয়া, আনিসিয়া......"

আগ্রিপিনার পায়ের কাছে একেবারে মাটির ওপর বসে পড়ল ইভান। বোকার মতো হাঁ করে আছে......

"সত্যি আগ্রিপিনা, সত্যি? ওঃ কী মজা—সত্যি তোমার খোকা হবে? আমার আগ্রিপিনা, আমার মণি......"

এভাবে কথা বলতে দেখে আগ্রিপিনার স্বর নীচু হয়ে এল, শোনালো একেবারে স্ত্রীর মতো। বল্লঃ

"যাও যাও, বেরোও আমার সম্মুখ থেকে......"

ইভানের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। ওর গায়ে গা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তবে ফোঁপানি ক্রমেই কমে আসে।

দন আর দনবাসের পথ আটকে ৮ম, ৯ম আর ১৩শ আর্মি দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণ রণাঙ্গনে। জারিৎসিনে আতামান ক্রাসনভ তৃতীয়বার পরাজিত হয়েছে শুনে ঐসব আর্মির মধ্যে লড়াইয়ের সাড়া পড়ে গেল, সাড়া জাগল দক্ষিণ রণাঙ্গনের সর্বত্র। শত্রুভাবাপন্ন কসাকেরা তখন শত্রুতা মিটিয়ে ফেলতে চায় বলেই মনে হচ্ছে। ঘোড়ার সাজটাজ শিকেয় তুলে (তার ওপর পায়রায় বসে বসে হাগুক, তাতেও ক্ষতি নেই) থুয়ে, রাইফেল টাইফেল কাপড়ে জড়িয়ে একেবারে সাত হাত মাটির নীচে পুঁতে রাখবে—এই তাদের ইচ্ছে। কোন্ শা—বলে বলশেভিকদের রাজত্বে বাস করা যায় না? জমি তো আর পালিয়ে যায় নি—ঐ তো বসন্তের রোদে জমি থেকে কেমন দিব্যি ভাপ উঠছে। কসাকদের দুখানা করে হাত, তাও রয়েছে। আর ঘোড়া আর বলদগুলো তো স্রেফ জোয়াল ঘাড়ে নেবার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

সের্পুকভ থেকে রেড কমান্ডার-ইন-চীফ আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। প্রথমবারের ভুল পরিকল্পনা কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে—অভিযানের পথেই আর্মিটাও নতুন করে সংগঠিত হয়ে উঠছে। বরফ গলে পথঘাট বন্ধ হওয়ায় লাল ফৌজ আটকা পড়েছে, তাই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দন অঞ্চল অভিমুখে আর যাওয়া হবে না; তার বদলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে দনেৎস অঞ্চলের দিকে চলতে হবে। কিন্তু এ চাল চালা উচিত ছিল অনেক আগে, এখন নয়ঃ সর্বহারা অধ্যুষিত দনবাস অঞ্চল, বিপ্লবের যা নাকি প্রশস্ত রাজপথ, সে পথ এখন একেবারে বন্ধ। এর আগে দু মাস ধরে যখন শুধু কালক্ষেপণ করা হচ্ছিল সেই সময় মাই-মায়েভ্স্কির ডিভিশন দনবাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আস্ত্রাখানের বালুভূমিতে ১১শ রেড আর্মিকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার পর যে ভলান্টিয়ার ইউনিটগুলিকে উত্তর ককেশাস থেকে দনেৎসে আনা হয়েছিল, সেগুলিকে মাই-মায়েভ্স্কি ডিভিশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় তাদের শক্তি বেড়েছে অনেক। এইভাবে দনেৎস-এর দক্ষিণ তীরে পঞ্চাশ হাজার বাছা বাছা সৈন্য জমা হয়েছে। মাই-মায়েভ্স্কি আর শুকুরো তাদের পরিচালক।

বসন্ত যেন ধেয়ে এল। ঝাঁকড়া সূর্যের তাপে দেখতে দেখতে বরফ টরফ একেবারে গলে জল—স্তেপের মধ্যে নালাগুলো জলে ভরে উঠেছে, নীল স্রোত ছুটে চলেছে উদ্দাম বেগে। ফুলে ফেঁপে দনেৎসের সে কী বিরাট পরিধি, ক্ষেত, মাঠ সব জলে জলময়—এমনধারা আর কখনো দেখা যায়নি। এ অঞ্চলে রেল লাইন শুধু উত্তরে আর দক্ষিণে। কাজেই সৈন্যদের পুনঃ সমাবেশের জন্যে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ব্যবহার করতে হয়, নয়তো পথঘাট বর্জিত পোড়ো এলাকা—তাই ধরতে হয়। সাপ্লাই ট্রেনগুলো সব কাদায় বসে বসে যায়, ইউ-

নিটের সঙ্গে সংযোগই রাখতে পারে না। এত সব গোলমালে সমাবেশের গতিতে ঢিলা পড়ে, দেরী হয়ে যায়। বিরাট বন্যাপ্লাবিত দনেৎসের ওপর পুলগুলো সবই হোয়াইটদের হাতে। কাজেই অভিযানের মানে দাঁড়ায় পরপর কতকগুলো যুদ্ধ —লম্বা, একটানা। ঠিক তখনি আবার বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে ভেশেন্‌স্কায়া গ্রামের মধ্যে (গ্রামটা তখন অল্পদিন মাত্র রেডদের পক্ষে এসেছে) একরোখা কসাক বিদ্রোহের রক্তারক্তি শুরু হল। বিদ্রোহ উস্কিয়ে দিলে দেনিকিনের দালালেরা, টাকা পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী চর—সবই হোয়াইটদের এরোপ্লেনে করে গ্রামে এসে পৌঁছাত।

দশম আর্মিটি দক্ষিণ রণাঙ্গনের বাম বাহু। কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ অনুসারে ঐ আর্মি একাই অগ্রসর হল দক্ষিণ অভিমুখে; ক্রাসনভের ধ্বংসাবশিষ্ট ইউনিটগুলোকে ঠেলে নিয়ে শেষ করতে করতে প্রধান রেল লাইন বরাবর এগিয়ে চল্ল।

সর্বনাশের পথে পা বাড়াল দশম আর্মি।

দক্ষিণে স্তেপ থেকে সুগন্ধ বাতাস বয়। ডোবা, জলস্রোত, আর বন্যাপ্লাবিত বিস্তীর্ণ বারিরাশির ওপর সূর্যের আলো ঝকমক করে—স্তেপের দিকে চাইতে গেলে চোখ ঝলসে যায়। স্বচ্ছ আকাশে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাখীর সারগুলি নীলিমার গভীরতায় পাড়ি দেয়। কীলকের আকারে বলাকা উড়ে যায় দলে দলে, ডাক ছাড়ে আকাশে আকাশে। রেলগাড়ীর সিঁড়ির ওপর মেয়ে পুরুষ সব দাঁড়িয়ে আছে—ঘাড় বেঁকিয়ে হয়তো বকের সারির দিকেই চেয়ে থাকে, যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ। ওগো স্বাধীন পাখী, কোথায় চলেছ তোমরা? উক্রাইন, পলেসিয়ে, ভল্‌হ্‌নিয়া, না আরও দূরে?......তোমরা কি জার্মানিই চলেছ, রাইন পার হয়ে তোমাদের সেই পুরোনো বাসায় ফিরে যাবে?......ও বক ভাই শোনো শোনো, সমস্ত শুভবুদ্ধি ভালো মানুষের কাছে আমাদের শুভ ইচ্ছা পৌঁছে দিও। তাদের বলে দিও, ছাতের ওপর যখন এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে তখন তাদের বলে দিও যে, তোমরা সোবিয়েত রুশিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছ—সেখানে দেখেছ বরফ গলছে, নদনদী কূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। ঝোড়ো হাওয়ায় মাতাল এমন ধারা রুদ্র বসন্ত, এমন উর্বর বসন্ত আর কখনো আসেনি সেকথা যেন তাদের বলতে ভুলো না।......

রোদে ঝড়ে কাতর হয়ে দাশা, আগ্রিপিনা, আনিসিয়া—ওরা প্রায়ই ওদের রেলকামরার পেছনের মঞ্চে এসে বসে। সৈন্যবাহী গাড়ীটা দক্ষিণে চলেছে। গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বসন্ত ঋতুও যেন ছুটে আসছে। লোকেদের গায়ে শুধু শার্ট, তাও গলা-খোলা। সামনে দিগন্তের ওপার থেকে মাঝে মাঝে কামানের গর্জন আর গুলির আওয়াজ কানে আসেঃ ১০ম আর্মির অগ্রগামী সৈন্যেরা গ্রাম অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের বাকী সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ তারই শব্দ। ভেলিকোক্‌নিঝেসকায়া গ্রাম দখল করতে ওদের বিশেষ বেগ

পেতে হল না। ঐ গ্রাম পার হওয়ার পর মানিচ নদীর ধারে এসে কাচালিন রেজিমেণ্ট ট্রেন ছেড়ে দিল—রণাঙ্গনে স্থান গ্রহণ করল।

বসন্তকালে সাল্স্ক স্তেপের ওপর দিয়ে মানিচের ঘোলাটে জল বয়ে চলে যায়, নলখাগড়াগুলো পর্যন্ত জলের নীচে ঢাকা পড়ে। স্তেপটা একেবারে শূন্য আর সমতল—যেন কোন্ জমাট-বাঁধা সমুদ্রের সবুজ জলরাশি। প্রাচীনকালে মানিচের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত তীর ছুটত এইখানেই—এশিয়ার যাযাবর দলের সঙ্গে যুদ্ধ করত সিথিয়ান আর আলানি আর গথ। হূনেরাও দলবল নিয়ে এখানেই এসেছিল, সোজা উত্তর ককেশাস পর্যন্ত সমস্ত দেশ একেবারে ছারখার করে দিয়েছিল। ফেল্টের তাঁবুর সামনে বসে বসে 'বগাতির মানসদের' প্রাচীন কীর্তিকাহিনী শুনত কাল্মুকেরা—সেও এখানেই। বসন্তের আগমনে স্তেপের বুকে সবুজের কী সমারোহ, মাটির তখন তৃষ্ণা মিটেছে, তৃণে তৃণে ফুলে ফুলে ঢাকা পড়েছে চারদিক; সূর্যাস্তের স্বচ্ছ আভায় কৃষ্ণসাগরের মাথার ওপর আকাশ একেবারে লালে লাল; রাত্রে আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্র ফোটে, দিগ্বলয়ের সীমানা পর্যন্ত আনত সে নক্ষত্র দল; তারপর উদয়-সূর্য, বহ্নিমান দীপ্তিতে গড়িয়ে আসে কাস্পিয়ানের ওপার থেকে।

একটা পরিত্যক্ত খোঁয়াড়ের বেড়ার পেছনে ছন-ছাওয়া একখানা মাটির ঘর—এই মরুভূমির মধ্যে সেটাই একমাত্র বাসযোগ্য স্থান। ওখানে কাচালিন রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর। কাছাকাছি শত্রুর কোন চিহ্ন না পেয়ে টহলদার দলগুলো ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে—কেউ যাচ্ছে দক্ষিণে তিখোরেৎস্কোয়ার দিকে, কেউ পশ্চিমে একেবারে রুস্তভ পর্যন্ত। লোকজন সব মানিচ নদীতে হাত-বোমা ছুঁড়ে মাছ মারে, দামী কার্তুজ খরচ ক'রে সূর্যাস্তের আলোয় হাঁস শিকার করে; ওরা যে এই কর্ম করতে এখানে আসেনি, ওদের সামনে যে কঠোর যুদ্ধের দুরূহ কর্তব্য পড়ে রয়েছে সে কথা বোঝানো দায়। আর্মি এখন শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে চলেছেঃ শত্রুর শক্তি আজও পরখ করা হয়নি বটে, কিন্তু তারা যে শখের সৈনিক নয়, অবজ্ঞেয় নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

ডিভিশনাল সদরদপ্তর থেকে ফিরে এসে গোরা একদিন তেলেগিনকে ডেকে পাঠাল। পথে বেরিয়ে দুজনে চল্ল নদীর পাড় ধ'রে, মুখে কোনো কথা নেই। তারপর জলের ধারে বসে প'ড়ে সিগ্রেট ধরাল। ডিম্বাকৃতি রক্তিম সূর্য দিগন্তের ওপারে অস্তায়মান। মাটি থেকে বাষ্প উঠছে, তার আড়ালে সূর্য প্রায় অদৃশ্য। নদীপার জুড়ে সর্বত্র ব্যাং ডাকে, প্রথমে প্রবল উদ্ধত সুরে, তারপর গোঙাতে গোঙাতে হিস হিস শব্দ করে। ......

"শয়তানগুলো ডিম পাড়ছে," গোরা বল্ল।

"থাকগে, তা আপনি কি খোঁজ বার করলেন?"

"নতুন কিছু নয়। ভাবনা হয়েছে সকলেরই, বুঝছেও সকলেই—কিন্তু করার কিছু নেইঃ কমাণ্ডার-ইন-চীফ একেবারে ঝাড়া হুকুম দিয়েছেন, তিখোরেৎস্কায়া আক্রমণ করতেই হবে। এ বিষয়ে আপনার কি মত?"

"মতামত দেওয়া তো আমার কাজ নয়, ইভান স্তেপানোভিচ, আমার কাজ হল হুকুম তামিল করা।"

"আপনি নিজে কি মনে করেন তাই জিগ্যেস করছি।"

"আমি কি মনে করি? বল্লে আপনি গুলি করে মারবেন না?"

"বেশ মজার লোক যা হোক! সবারই ঐ এক জবাব.........ভীরু, কাপুরুষ—আপনারা সবাই......"

টুপিটা পেছনে সরিয়ে ইভান গোরা মাথা চুলকাল; শরীরের পার্শ্বদেশ সমান অধিকার দাবী করাতে সেখানটাও চুলকাতে হল। পায়ের নীচে থেকে একটা মাটির চাবড়া ঘোলাটে ঘূর্ণিজলে গড়িয়ে পড়ল, শব্দ হ'ল—ঝুপ্। সম্ভোগের আনন্দাতিশয্যে ব্যাংগুলো ঘ্যাঙর ঘ্যাং করে ডাকছে—মনে হয় ক্লেদাক্ত ভেক বংশের সাহায্যে পৃথিবীই বুঝি ওরা ছেয়ে ফেলতে চায়। ......

"হুঁ. আপনি তাহলে কমান্ডার-ইন-চীফের নির্দেশ ঠিক বলেই মনে করেন?"

"না তো," শান্ত দৃঢ়স্বরে তেলোগিন জবাব দিল।

"আ-হা, ঠিক মনে করেন না তো? ভাল ভাল......কিন্তু কেন ঠিক মনে করেন না?"

"আমাদের রিজার্ভ বাহিনীর সংগে আমাদের সংযোগ কেটেই গেছে বলা চলে, সরবরাহ-কেন্দ্রের সংগেও। শত্রুরা যদি জারিৎসিনের সংগে যোগাযোগের সূত্রটা কোনো জায়গায় কেটে দেয়, ব্যস তাহলেই আমাদের দফারফা। গোটা জিনিষটারই যে কোনো শক্ত ভিত নেই।"

"বলে যান, বলে যান।"

"আমরা যদি আরো দক্ষিণে, মানে তিখোরেৎস্কায়া গিয়ে আক্রমণ করি, তাহলে তো সাধ করেই ডুবতে হবে। না, ওতে কোনো লাভ হতে পারে না। হোয়াইট বাহিনীকে যা করেই হোক দনবাস থেকে বের করে আনতে হবে এই যদি উদ্দেশ্য হ'ত, শত্রুকে শুধু অন্যদিকে টানার জন্যেই যদি আমাদের আর্মিকে পাঠিয়ে থাকত, তাহলেও না হয় বুঝতাম........."

"হুঁ-উঁ..."

"কিন্তু ও চালেও ক্ষতি প্রচণ্ড– শুধু অন্য দিকে টানার জন্যে একটা আর্মি বিসর্জন দেওয়া......

"আপনার সিদ্ধান্তটা কি তাহলে?"

মুখ ফুলিয়ে সিগ্রেটের টোকাটা ফুঃ ক'রে জলে ছুঁড়ে দিল তেলোগিন (সিগ্রেট মানে দা-কাটা তামাক, খবরের কাগজে পাকানো)।

"আমি কোনো সিদ্ধান্ত করিনি......"

"করেছেন এবং তা আপনি খুব ভালই জানেন। ......বেশ, থাকুন চুপ করে। আপনি কিছু না বল্লেও কথাটা তো জলের মতোই বুঝছি। ইভান, আপনার কমিসার গিম্‌জার কথা একবার আমাকে শুনিয়েছিলেন মনে আছে? সেই যে, বিশ্বাসঘাতক সরোকিন সম্বন্ধে গুপ্ত খবর দিয়ে তিনি আপনাকে কমান্ডার-ইন-

চীফের কাছে পাঠিয়েছিলেন?......আর এখন......” (পেছন দিকে চেয়ে নিয়ে স্বরটা নীচু করল ইভান গোরা) “এখন আমার নিজেরই যেতে ইচ্ছে করে—তবে সের্পুকভে কমাণ্ডার-ইন-চীফের ওখানে নয়, সোজা একেবারে মস্কো।......কোনো শালা বেজম্মা নিশ্চয়ই ওখানে লুকিয়ে আছে—হয় হাই-কমাণ্ডের মধ্যে, নয় সর্বোচ্চ সমর পরিষদে, নয়তো আর কোথাও—কিন্তু আছেই—লড়াই চলছে, থাকবে না?.. আমরা বড্ড সরলবিশ্বাসী। ......আমরা বড় বড় কথা ভাবি, আমাদের মন উদার—তাই মনে হয় বুর্জোয়ারা ছাড়া দুনিয়ার আর সবাই বুঝি একেবারে সাচ্চা মানুষ—এখন আমাদের তলোয়ার ঠিক মতো চালাতে পারলেই ফতে। পেত্রোগ্রাদে থাকতে ইভান ইলিয়িচকে (লেনিনকে) একবার বেশ ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিলাম। ও'র চোখ একেবারে রাশিয়ানের চোখ, কুঁচকে কুঁচকে বেশ খুঁটিয়ে দেখেন।......এদিকে মহা-উৎসাহী ভাবুক—পেছন দিকে হাত দুটো জোড়া করে পায়চারি করছেন, পায়চারিই করছেন—হঠাৎ কপাল কুঁচকে কারও দিকে চাইলেন, ব্যস এক মিনিটের মধ্যে বুঝে নিলেন তার দর কত।......এই তো চাই।......আপনি যা করেন, যা বলেন সব আমি লক্ষ্য করি।......কিন্তু আপনি তো আমার দিকে লক্ষ্য রাখেন না, অন্ধের মতো আমাকে বিশ্বাস করে যান।......ধরুন যদি আপনাকে বিশ্বাসঘাতকের মতো কোনো হুকুম দিই......কথাটি না বলে আপনি তামিল করবেন কি?”

“উঁহু, করব না......”

“কেন, এই যে বল্লেন করবেনঃ মতামত দেওয়া তো আপনার কাজ নয়!. আচ্ছা বেশ, ওরকম আদেশ পেলে কি করবেন আপনি?”

“আমি আপনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাব. ...”

“রাজি করাবেন! হায়রে বুদ্ধিজীবী! আপনার গুলি করতে হবে, গুলি!......”

প্রকাণ্ড হাত দুটো মাথায় রেখে, হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসল গোরা। সবচেয়ে গুরুতর খবরটা ও তেলেগিনকে বলেনি। ১০ম আর্মির কমাণ্ডারের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সমর পরিষদের চেয়ারম্যানের নামে মস্কো থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল—আগের দিন পার্টি মিটিংয়ে সে টেলিগ্রাম পড়া হয়। উদ্ধত, চোখ-রাঙানো টেলিগ্রাম—তাতে আগেকার নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করা হয়েছে।...

“শুনুন, তাজা খবর বলিঃ ওরা জেনারেল পক্রভস্কির চারটে ডিভিশন দনবাস থেকে সরিয়ে এনেছে, সেগুলো এখন ডান পাশে জড়ো করছে। জেনারেল কুতেপভের কোর এগিয়ে আসছে, সামনা সামনি আক্রমণ করবে। কুতেপভ আমাদের কমাণ্ডার-ইন-চীফের পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে......এরি মধ্যে তিখোরেৎস্কায়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কেটে দিয়েছে।......আমাদের বাঁ পাশে আসছে জেনারেল উলাগাই—ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে।......আর আমাদের পেছনে কি? দুশো মাইল জুড়ে খালি ফাঁকা জায়গা......”

“ঐটাই মোক্ষম কথা”, তেলেগিন বল্ল। “আমার মত যদি চান তো বলি—

আহত, অসুস্থ সবাইকে অন্যত্র চালান করতে হবে; এই মুহূর্তে যে সব জিনিস অতি প্রয়োজনীয় সেগুলো রেখে বাকি সব পাঠিয়ে দিতে হবে পেছনে—যাতে আমাদের হাত-পা একেবারে খোলা থাকে। যাই করি আর তাই করি, মানিচের লাইন আমরা রক্ষা করতে পারব না......”

ইভান গোরা নিরুত্তর।...একটু পরে রাগতভাবে জলে থুতু ফেলতে ফেলতে বল্ল ঃ

“এ রকম আলোচনার অপরাধে আমার, আপনার দুজনেরই কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত।...মানিচের তীরে মরতে হবে বলে যদি হুকুম হয়ে থাকে, তবে আপনাকে মরতেই হবে...”

“তাতে কখনো আপত্তি করেছি বলে তো মনে পড়ে না। এবারও করব না।”

২রা মে কুতেপভ কোরের অশ্বারোহী টহলদারদের নদীর ওপারে প্রথম দেখা গেল। প্রথমে অগ্রদলের কয়েকজন মাত্র। স্তেপময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তারা মাঝে মাঝে থামে, ফের আবার ঝকঝকে গোষ্পদের ওপর দিয়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছোটায়—তাদের পেছনে পেছনে ছোটে রাইফেলের গুলি। কিন্তু ওদের সংখ্যা বেড়েই চল্ল, সাহসও বাড়ল—নদীর ধারে আসতে লাগল আরও ঘন ঘন। কিছু পরে ঘোড়া থেকে নামাও শুরু করল—নেমে ঘোড়াগুলোকে শুইয়ে রাখে, তারপর রেডদের অগ্রগামী ঘাঁটির ওপর গুলি চালায়।

আর্টিলারির ভীম গর্জনের মধ্যে দিয়ে কুতেপভ বাহিনী এসে পৌঁছল ৩রা মে তারিখে। রেল লাইনের চারপাশে কেন্দ্র ক'রে মানিচের তীরের ওপর তারা তরঙ্গে তরঙ্গে ধেয়ে আসছে, একরোখাভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। মাথার ওপর উড়ছে পরিদর্শনকারী বাইপ্লেন (সেগুলো কিন্তু রাশিয়ান প্লেনের মতোও নয়, জার্মান প্লেনের মতোও নয়)। ভাসানো পুল ঘাড়ে ক'রে কতকগুলো লরী এগিয়ে এল—জল, বালি সব চারদিকে ছিটকে ছিটকে পড়ল। ঐ দিনই কুতেপভের বিদ্যুত বাহিনী রেড ব্যূহ ভেঙে নদীও পার হল—যেখানে মরোজভ ডিভিশন পাহারা দিচ্ছিল সেইখানটাতে, কিন্তু সঙ্গীন আক্রমণের মুখে টিকতে পারল না।

সন্ধ্যা নাগাত শত্রুর লাইনগুলো পিছু হটল, ট্রেঞ্চ কেটে তার মধ্যে ঘাঁটি গাড়ল। কিন্তু তাঁবুর সামনে আগুন টাগুন আর জ্বালে না। দু পক্ষেই গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। স্তেপের ওপর নেমেছে রাত্রি—চিরকালের মতোই নিঃশব্দ, সরস, আর বুনো ফুলের সুগন্ধে সুবাসিত। ভেক বংশের উন্মত্ত ঐকতান চলে ঠিক আগের মতোই, যেন কিছুই হয়নি। মাটিতে কান পেতে শুয়ে শুয়ে মানুষে পর্যন্ত ভাবে যেন কিশলয়ের মর্মর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, ভঙ্গুর অথচ দৃঢ়বৃন্ত তৃণগুলি সূচীভেদ্য অন্ধকারে মাথা নাড়াচ্ছে।

তেলেগিনের সদর পরিখায় সারা রাত ধ'রে বৈঠক চলেছে—ডিভিশনাল সদর ঘাঁটি থেকে আক্রমণের আদেশ আসবে সেই আশায় ওরা একেবারে উৎকণ্ঠ। ওরা

সকলেই বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, এমন ধারা দুর্ধর্ষ শত্রুকে একটি ঘণ্টাও সময় দেওয়া উচিত নয়। সুদীর্ঘ চল্লিশ মাইল জুড়ে দশম আর্মির সম্মুখ-লাইন অথচ সে লাইন মোটেই ঘন নয়; তার ওপর তার পার্শ্বদেশ আর পশ্চাদ্‌ভাগ একেবারে অবারিত; এ অবস্থায় শত্রুকে নিশ্চিন্তে পাঁয়তারা কষবার সময় দেওয়া যায় না, সুবিধা মতো যেখানে খুশি আঘাত হানবারও সময় দেওয়া চলে না। বিভিন্ন ইউনিটের কমান্ডারেরা নিজ নিজ ইউনিটের মনোবল সম্বন্ধে রিপোর্ট দিলেনঃ রেড আর্মির সৈন্যদের মধ্যে এমন উত্তেজনা যে তারা ঘুমতেই পারছে না, ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে হরদম ফুসফুস চলছে; ১৯১৮ সাল হলে এ রকম সময়ে সৈন্যেরা মিটিংয়ে ছুটত, তারপর কর্তৃপক্ষকে শাসিয়ে বলত যে এখুনি 'লড়াইয়ে নামার' হুকুম না পেলে কমান্ডারদের একেবারে ছিঁড়ে খাবে।

কম্প্যানি কমান্ডার মশ্‌কিন পরিখার ভেতর ঢুকল। ওর একটা প্লেটুন ছিল ওপারে, সেখান থেকে গলা জলে নদী পার হয়ে এইমাত্র পৌঁছেছে। লোকটি জারিত্‌সিনের ধাতু-শ্রমিক, সামরিক ব্যাপারে ওর উৎসাহ যেন শিকারীর উৎসাহ।

"আঃ, দিব্যি গন্ধ তো কমরেড্‌স", ও বল্ল। পরিখার মধ্যে তামাকের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, বাতিটা প্রায় দেখাই যায় না। তাই ধোঁয়ার মধ্যে মুখটা কুঁচকে নিয়ে ও কথা বল্ল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে এ পায়ের বুটটা খুল্ল, টান মেরে, তারপর ওপায়ের। বুটের মধ্যে জল ঢুকেছিল, ঢেলে ফেল্ল। "আমার জওয়ানের একটা ক্যাডেটকে* ঘায়েল করেছিল। লোকটাকে এখানে আনব ভেবেছিলাম, কিন্তু কপাল খারাপ, মরেই গেল।...লোক না তো বাচ্চা, একেবারে দুধের বাচ্চা—কিন্তু কী জংলী রোখ, এন্তার শুধু চেঁচিয়ে যাচ্ছেঃ 'জানোয়ার! শুয়োরের বাচ্চা!' আমাদের ওরা এমন নমুনা কখনো দেখেনি।......অথচ সাজপোষাকের কী বাহার! ফার্স্ট ক্লাস কাপড়, ফার্স্ট ক্লাস জুতো, পেটী। ...কসাকরা আর কি? তারা তো অসভ্য চাষা, মুঝিক—ঠিক আমাদের মতো। তুমি মারলে, ও মারল—ব্যস হয়ে গেল।...কিন্তু এই শৌখিন বাবুদের একেবারে দয়ামায়া নেই। ওদের প্লেটুনে সব অফিসার, প্লেটুন কমান্ডার একজন কর্নেল। প্রত্যেকের হাতে রিস্ট-ওয়াচ। আমার জওয়ানদের বলতে হল: 'শোনো বাপু বাছাধনেরা, ঘড়িটড়ির কথা ভুলে যাও!' বল্লাম, যদি কখনো দেখতে পাই, ঘড়ির জন্যে গুঁড়িসুঁড়ি হোয়াইট ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছ, তো মেরে একেবারে দাঁত ভেঙে দেব. বুঝলে......"

হো হো করে হেসে উঠল মশ্‌কিন। দাঁত দেখা গেল, দাঁতগুলো ভারি সুন্দর। সাদামাটা, বসন্তের দাগ-আঁকা মুখ, কিন্তু বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। মুখ থেকে সদিচ্ছা যেন উপচে পড়ছে।

"ব্যাপার স্যাপার বলি, শুনুন কমরেড্‌সঃ স্তেপের ওধারে একেবারে যেন হৈ হৈ চলেছে, শব্দ শুনছি সেই সন্ধ্যে থেকে। স্কাউট পাঠিয়েছিলাম—আমাদের ঐ স্তেপ্‌কা –আহা, মানুষ না তো যাদুকর...। ও খবর দিল যে, ওরা

---

* ক্যাডেট=সাধারণ সৈনিক রূপে কর্মরত শিক্ষানবীশ অফিসার

আর্টিলারি নিয়ে এসেছে। মালটানা গাড়ীতে করে পদাতিক সৈন্যও এসে পৌঁছেছে বলে ওর ধারণা।...সুতরাং, তৈরী হয়ে পড়ুন বুঝলেন কমরেড্‌স..."

তামাকের ধোঁয়া আর সহ্য হয় না। একটু তাজা হাওয়ার আশায় তেলেগিন পরিখার বাইরে এল। তারাগুলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। প্রতিপদের উজ্জ্বল চাঁদ অনেক উঁচুতে। মাঠের মধ্যে একটা আগড় মতো, তার ওপর তিনটি স্ত্রীমূর্তি। ওদের কাছে গিয়ে তেলেগিন বল্ল ঃ "এর মানে? সবাইকে ট্রেঞ্চের মধ্যে রাত কাটাতে হবে বলে হুকুম দেওয়া হয়নি?"

"আমাদের ঘুম আসছিল না", আগড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাশা বল্ল।

দাশা, আনিসিয়া, আগ্রিপিনা তিনজনেরই চোখগুলো বড় বড় দেখাচ্ছে, তিনজনেই রোগা হয়ে গেছে, আগের মতো যেন আর নেই।...ওরা হাসছে, না অদ্ভুত ধরনে ভ্রূভঙ্গি করছে, তেলেগিন তা বুঝতেই পারে না।

"আপনাদের বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব", আগ্রিপিনা বল্ল।

"কমরেড রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার, আমিও এদের সঙ্গে থাকি, কেমন?" অনুরোধের সুরে বল্ল আনিসিয়া।

"আরে, টংয়ের ওপর থেকে নামো শীগ্গির—মুরগির মতো টংয়ে চড়েছ কেন?...অনবরত বুলেট চলছে শুনতেও পাও না?"

"মাটিতে যে গোবর, আর মাছি", দাশা বল্ল। "এখানে কি সুন্দর বাতাস।"

"বুলেট না হাতী, ও তো আরশুলো উড়ছে। আমাদেব কি অত বোকা ঠাউরেছেন?" এবার আগ্রিপিনার গলা।

তেলেগিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দাশা আবার বল্লঃ

"ব্যাংগুলো একেবারে পাগল হয়ে গেল। বসে বসে আমরা তাই শুনছি।"

নদীর দিকে মুখ ফেরাল তেলেগিন। আহা-হা, কী দীর্ঘশ্বাস; আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা সুরের তালে তালে সে কী হা-হুতাশ—তেলেগিন এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। তারপর বরমাল্যবিজয়ী হঠাৎ তান ধরলেন—তিনি একক গায়ক, ইয়া মোটা গলা, লম্বায় তিন ইঞ্চি, সবুজ চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরুচ্ছে। এমন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর গলায় জীবনের স্তবগান বাজল, মনে হল যেন তারারাও কান পেতে শুনছে।

"সাবাশ! বহুৎ আচ্ছা!" হাসতে হাসতে তেলেগিন বল্ল। "আচ্ছা বেশ, তোমরা এখানেই থাক। কিন্তু দেখো, কিছু আরম্ভ হলেই আড়ালে চলে যেও কিন্তু...।" দাশার কাঁধে দুহাত রেখে তাকে কাছে টেনে আনল, মৃদু শব্দে বল্লঃ

"যা দেখি তাই সুন্দর, না? আর তুমি, তুমিও কী সুন্দর......"

মাথার ওপর হাত নাড়া দিয়ে তেলেগিন তার পরিখায় ফিরে গেল।

ওরা আবার একা। কোমল সুরে বল্ল আনিসিয়াঃ

"আহা, চিরকাল যদি এখানেই বসে থাকতে পারতাম......"

“রক্তের মূল্যে সুখ পেতে হয়,” বল্ল আগ্রিপিনা। “তাই তো সুখের এত দাম......”

দাশা বল্লঃ

“জীবনে কত না দেখেছি ভাই, কিন্তু সবই যেন পাশ দিয়ে উড়ে চলে যেত, আমাকে তো স্পর্শ করত না।......আমি শুধু বসেই থাকতাম—ভাবতাম এমন কিছু হবে যা অপূর্ব, যার বৈশিষ্ট্য আছে।......নির্বোধ হৃদয়টা কি কম ভুগেছে। অপরকেও কত ভুগিয়েছে।......ভালবাসা যদি এক রাত্রের হয় সেও ভাল, কিন্তু ঠিক মতো ভালবাসতে হবে। ...বোঝার যা কিছু সব বুঝতে হবে, ভ'রে উঠতে হবে কাণায় কাণায়। লক্ষ বছরের পরমায়ু পাবে একটি রাত্রি......”

মাথাটা এলিয়ে দিল আনিসিয়ার কাঁধে। প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর ওদিক থেকে আগ্রিপিনাও গা হেলাল আনিসিয়ার গায়ে। এমনি বহুক্ষণ বসে রইল আগড়ের ওপর। ওদের পেছনে আকাশের তারা।

নতুন বাইপ্লেনগুলোর সাহায্যে পুতেপভের আর্টিলারি লক্ষ্য স্থির করে। যেখানে গোলা পড়ে বিমানগুলি সেখানটা ঘুরে আসে, ঘুরতে ঘুরতে রেডদের ওপর কয়েকটা বোমা ফেলে, তারপর বাজ পাখীর মতো শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে আসে দিগন্তরেখার দিকে। আর্টিলারি সব ওখানেই—ভোর থেকে মানিচের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করেছে।

গোটা রেড ডিভিশনের মধ্যে একখানি মাত্র প্লেন উড়তে পারে। পুরোনো ঝরঝরে প্লেনটা, ধীর মন্থর গতি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় প্লেনখানা পুরো মেয়াদ খেটে এসেছে, তারপর জারিতসিনে মেরামত হয়েছে, একেবারে গেরস্ত কায়দায়। শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য ঐ প্লেনই এখন আকাশে উঠল।

প্লেনটার কাণ্ডকারখানা দেখলে ভয়ই লাগে। কাঠের ফ্রেম, ডানার ওপর তালি মারা—বৈমানিক গতি-বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে বোঁ ক'রে ওপর উঠল—কখনো বিকট শব্দ বার হয়, কখনো মনে হয় এই বুঝি ওর দফা শেষ। কিন্তু ওর পাইলট বড় যে সে নয়—পাইলট হল ভাল্কা চেরদাকভ। দক্ষিণ রণাঙ্গনের সর্বত্র ওর দারুণ নামডাক, হোয়াইট পাইলটরাও ওকে ভালরকমই চেনে। বেঁটেখাটো লোকটি দেখতে অনেকটা বাঁদরের মতো। শরীরের কত হাড় যে কতবার ভেঙেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই—ঠ্যাংটা খোঁড়া, কাঁধটা বাঁকা—কোনো রকমে যেন আটা দিয়ে জোড়াতালি মেরে খাড়া করে রেখেছে। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে ঃ “আচ্ছা ভাল্কা, সেই ১৯১৬ সালে আপনি যখন সেরা জার্মান পাইলটটাকে মাটি-সই করে দিলেন, তারপর কি হ'ল? আপনি নাকি পরদিনই আবার জার্মানি পর্যন্ত পাল্লা দিয়ে তার গোরের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন? সত্যি?”—অমনি ভাল্কা তার চিঁচি সুরে জবাব দেবেঃ “ছড়িয়েছি তো হয়েছে কি?” ওর মেশিনগানের গুলি একদম ফুরিয়ে গেলে ও কি করত—ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে এসে প্লেনের তলাটা দিয়ে শত্রুর

প্লেনে লাগাত এক ধাক্কা। লোকে যদি শোধায়, “কী আশ্চর্য ভাল্কা, আপনার নিজের প্লেনটা ভাঙে না তো!” অমনি ওর সেই এক জবাব, “ভাঙে তো হয়েছে কি?”

প্লেনটা নীচু হয়ে স্তেপের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, দেখে রেজিমেণ্টের লোকেরা চাংগা হয়ে উঠল। চাংগা হবার কিন্তু কারণ ছিল না। মানিচের দু পারেই গোলা ফাটছে, অতি-বিস্ফোরক গোলা। তার ফলে রেড আর্মির সৈন্যেরা সব পরিখার মধ্যে অবরুদ্ধ। এক একটা রেড ব্যাটারির জবাবে কম পক্ষে ছ'টা করে শত্রু ব্যাটারি—গোলাবর্ষণের আর বিরাম নেই। শত্রু সৈন্যের সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে আড়াল নেয়, আবার ছোটে, আবার আড়াল নেয়—ওদের অগ্রগতি রোধ করা প্রায় অসম্ভব।

ভাল্কা চেরদাকভ এক ঘোঁৎ মেরে মাটিতে নেমে এল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে প্লেনের চারদিক একবার চক্কর দিল। জায়গাটা কাছেই তাই ক'জন রেড সিপাহী ব্যাপার দেখতে ছুটে এসেছিল, তারা ওর তেলকালি মাখা মুখের দিকে চেয়েই আছে।

“হাঁ ক'রে দেখছ কি?” বলে ভাল্কা খেঁকিয়ে ওঠে। প্লেনের পেছন থেকে যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র বার করে সারাতে বসে। ওদের বলে, “আমার খানিকক্ষণ সময় লাগবে। তোমরা দেখো, দুশমনের প্লেন যেন এদিকে না আসতে পারে।”

হোয়াইটরা বাস্তবিকই ওকে দেখতে পেয়েছিল। ও যেখানে নেমেছে তার ওপর তিনখানা প্লেন চক্কর মারতে লাগল—অবিশ্যি বেশী নীচে নামেনি, কারণ রেডরা গুলি চালাচ্ছে। ওদের প্লেন থেকে বোমা পড়ে, একটার পর আর একটা। আকাশে মাটি ওড়ে ফোয়ারার মতো, কিন্তু ভাল্কার গ্রাহ্যই নেই, একমনে তেলের নলটা মেরামত করছে। একটা বোমা এত কাছে পড়ল যে, প্লেনটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল—ডানাটানা সব একেবারে মাটিতে বোঝাই। এবার ভাল্কা আকাশের দিকে চাইল, আঙুল তুলে ওদের শাসাল। মেরামত শেষ হলে চীৎকার করে ডাকল লাল সিপাহীদের :

“ওহে তোমরা এদিকে এস তো, প্রপেলারটা ঘোরাও দেখি!” তারপর নিজের সীটে গিয়ে উঠল। “জোর লাগাও, ভয় কি, এ তো আর মেয়েমানুষ নয়! গরম হলেই বা ভাবনা কিসের?”

এঞ্জিনটা প্রথমে ঘস ঘস করে, তারপর হঠাৎ কানফাটানো হুঙ্কার ছেড়ে গর্জাতে লাগল। লাফ দিয়ে সরে এল সিপাহীরা, হেলে দুলে মাটির ওপর দিয়ে ছুটল এঞ্জিন। ছুটছে তো ছুটছেই, উড়বে বলে আর মনে হয় না—এমন সময় হুস ক'রে একেবারে আকাশে। আরও ওপরে উঠে ফাঁসের মতো খালি পাক খায়—পেট্রোল ট্যাংকের মধ্যে স্পিরিট আর পেট্রোলে মেশানো যে অপূর্ব বস্তুটি জমা আছে সেটিকে ভালো করে মিশ খাওয়াতে হবে তো! মস্ত বড় একটা ফাঁস কাটার পর ঘোঁৎ করে সোজা নামতে লাগল শত্রুপক্ষের প্লেন তিনটে

লক্ষ্য করে। কিন্তু শত্রুর প্লেন লড়াইয়ে নারাজ, তাড়াতাড়ি চম্পট দিল।

যতক্ষণ ওড়া উচিত মনে হ'ল ততক্ষণ উড়ল ভাল্কা। তারপর মাটিতে নেমে এসে একটা চিরকুট পাঠাল তেলোগিনের কাছে ঃ

"ওপর থেকে দেখতে পেলাম, আটখানা নতুন মোটরগাড়ী। নিশ্চয়ই দেনিকিন আর তার বিদেশী বন্ধুরা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শত্রুর দুটো কামান ঘায়েল করে দেওয়া হয়েছে। একটা কলাম মার্চ করে যাচ্ছিল, তার ওপর গুলি চালিয়েছি। সরবরাহের আড্ডায় চল্লাম, পেট্রোল চাই।....."

দেনিকিন রণাঙ্গনে উপস্থিত। মাত্র বছরখানেক আগের কথাঃ দেনিকিন তখন ব্রংকাইটিসে ভুগছেন, লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে মালটানা গাড়ীতে টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছেন—সামনে চলেছে কর্নিলভের সাত হাজার ভলান্টিয়ার সৈন্য—রক্তের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে একাতেরিনোদার পেঁছাবে। আর এখন দেনিকিন হলেন সর্বশক্তিমান ডিক্টেটর। নিম্ন দন এলাকা, উর্বর কুবান জেলা, তেরেক অঞ্চল, আর উত্তর ককেশাস—সমস্তই তাঁর অধীনে।

জেনারেল কুতেপভের এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসার সময় দেনিকিন দুজন সামরিক প্রতিনিধি সঙ্গে করে এনেছেন—একজন ইংরেজ আর একজন ফরাসী। ওদেসা, খার্সন, নিকোলাইয়েভ—এতগুলো শহর যে ওরা ভীরুর মতো বলশেভিকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এল, তার বিরক্তি আর অপমান ওরা একটু বুঝে যাক, এইজন্যেই ওদের নিয়ে এসেছেন। ফরাসী আর গ্রীক সৈন্যরা যদি আসল লালফৌজের হাতে মার খেয়ে আসত তাহলেও বুঝতাম! কিন্তু তা তো নয়। নিকোলাইয়েভে চাষী গেরিলারা কিনা একটা আস্ত গ্রীক ব্রিগেডকে কচুকাটা করে দিয়ে গেল—তাও আবার ফরাসী যুদ্ধজাহাজগুলোর চোখের সামনে! মহাযুদ্ধবিজয়ী ফরাসী বীরেরা কি রুশিয়ান চাষী দেখেই তটস্থ? ওদের ভয়েই একেবারে খার্সন ছেড়ে পালিয়ে এলেন, দু দু ডিভিশন সৈন্য হটিয়ে আনলেন ওদেসা থেকে! না, এর কোনো অর্থ হয় না! মস্কো কমিউন দেখেই ওদের এত ভয়? তাই দেনিকিন ঠিক করেছেন যে, সম্মানিত বিদেশী অতিথিদের এবার দেখিয়ে দেবেন কি ক'রে তাঁর নিজের আর্মি (লরেল পাতা আর তলোয়ার সে আর্মির প্রতীক) কমিউনিস্টদের ধ্বংস করে।

ও'র মনে মনে আরও একটা অভিযোগ আছেঃ পারীতে 'কাউন্সিল অফ্ টেন'-এর বৈঠকে এডমিরাল কোলচাককে সারা রুশিয়ার সর্বোচ্চ শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে—অভিযোগ সে সম্বন্ধে। কোলচাকের মধ্যে ওরা কী দেখল? ১৯১৭ সালে নৌবহরের অধিনায়ক থাকার সময় উনি নিজের স্বর্ণ-খড়্গ খুলে ফেলে কৃষ্ণসাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের কাগজেই সে খবর বার হয়েছিল। আর দেনিকিন তখন বন্দী—বিখভ্স্ক জেলখানায়—অথচ সে খবর কোনো কাগজে বার হয়নি। ১৯১৮ সালে কোলচাক পালালেন ইউনাইটেড স্টেটস্-এ, বসে বসে আমেরিকান নৌবহরে টর্পেডো শিক্ষা

দেন—কাগজে কাগজে তখন কোলচাকের কত ছবি, সিনেমা স্টারদের পাশাপাশি।... ঐ সময়েই জেনারেল দেনিকিন জেল থেকে পালিয়ে 'তুষার-অভিযানে' যোগ দিয়েছিলেন। কর্নিলভের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে অধিনায়কত্বের গুরুভার তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, দিনে দিনে জিতে এনেছিলেন প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড, ফ্রান্সের চেয়েও বড়।.........সে খবর দিয়েছিল পারী শহরের একখানা বটতলার কাগজ, ব্যস্ আর কেউ নয়। তিন লাইন খবর দিয়ে কাগজটাতে কার না কার এক অদ্ভুত ফটো ছাপিয়েছিল, ইয়া গোঁফওলা কে একজন, তলায় লিখে দিয়েছিল, 'জেনারেল দেনিকিন।'। আজ কিনা রুশিয়ার শাসনকর্তা করা হ'ল এমন একজন লোককে যে শুধু নিজের ঢাক নিজে পেটাতেই ওস্তাদ, যে কোকেন-খোর, বায়ুগ্রস্ত, প্রতিষ্ঠা-উন্মাদ।

কোলচাকের শক্তিতে জয় হবে একথা দেনিকিন কোনো দিন বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু যখন মনে হ'ল যে, কোলচাকের আধা-আনাড়ি জেনারেল পেপেলাইয়েভ বুঝি পার্ম দখল করে ফেলে, সমস্ত বিদেশী কাগজগুলো যখন ঘোষণা করে দিল যে, এবার 'বলশেভিক রুশিয়ার উপর লৌহ-মুদ্গর উদ্যত হইয়াছে', তখন দেনিকিনের অবিশ্বাসও যেন মুহূর্তের মতো শিথিল হয়ে এসেছিল—পেপেলাইয়েভ জিতবে ভেবে মনে মনে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু মস্কো থেকে ওরা পাঠাল কমিসার স্তালিনকে (হোয়াইটরা তাদের গোয়েন্দা-চক্র মারফৎ এ খবর জানতে পারে)—সেই স্তালিন যিনি শরৎকালে জারিতসিনের যুদ্ধে ক্রাসনভকে দু-দুবার পরাস্ত করেছেন। কামা নদীতীরে পৌঁছবামাত্র স্তালিন আত্মরক্ষাব্যবস্থার চরম সংস্কার সাধন করলেন, নামজাদা জেনারেল পেপেলাইয়েভকে এমন আঘাত হানলেন যে, জেনারেল একেবারে উরাল পার। এখন ভল্‌গা অভিমুখে কোলচাকের যে অভিযান চলেছে, তারও ঐ দশা হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোলচাকের অভিযানের জন্যে সত্যিকারের কোনো প্রস্তুতিই হয়নি। যা কিছু করা হয়েছে তা শুধু লোক দেখানোর জন্যেঃ বিদেশী খবরের কাগজে এন্তার ঢাক পেটানো হয়েছে। আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাততালি বাজিয়েছে সাইবেরিয়ার নেশাখোর বণিকগুলো।

"মহাযুদ্ধের সময় আপনাদের দেশে কিংবা আমাদের দেশে যে রণকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, যে-কৌশল জার্মানরাও প্রয়োগ করেছিল, তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কৌশলের কিছু তফাৎ আছে। আমাদের লাইন একটু পাতলা, ঘাঁটিগুলোর মধ্যে ফাঁকও একটু বেশী। প্রত্যেক প্লেটুনের এক একটা স্বতন্ত্র কর্তব্য আছে", দেনিকিন বল্লেন। খোলা ফিয়াট গাড়ীটা খুব শৌখিন, একেবারে নতুনও বটে। গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়েছেন দেনিকিন, সাদা দস্তানা পরা হাত দিয়ে সামনে দেখাচ্ছেন। সামনে, মেজর জেনারেল তেপ্‌লভের রাইফেল ব্রিগেড। প্রদর্শনী কুচকাওয়াজের মতো নিখুঁতভাবে পা ফেলে ফেলে তারা ছড়িয়ে পড়ছে।

গাড়ীতে কমাণ্ডার-ইন-চীফের পাশে দাঁড়িয়ে একজন ফরাসী অফিসার। তাঁর পরিচ্ছদ হল ঃ সেরা কাপড়ে তৈরী আকাশী রংয়ের কুর্তা, তার উপযুক্ত

ব্রীচেস পায়জামা, সোনার ফিতে লাগানো মখমলের বাঁকা টুপি—ছোট্ট মাথার ওপর কী চমৎকার ফিট করেছে। উনি দূরবীনে চোখ লাগিয়েছেন, রেশমী গোঁফজোড়ার দুটি প্রান্ত দূরবীনের দু' পাশ দিয়ে উঁকি মারছে; পাশে ঝুলছে ব্রাণ্ডির বোতল। ফিটফাট ফরাসী বাবুদের মধ্যেও ইনি একেবারে মহা-বাবু! গাড়ীর ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়েছেন একজন ইংরেজ অফিসার। তাঁর চোখেও দূরবীন, তবে তাঁর ধরন-ধারণ আর একটু সাদামাটা। ফিটফাটও অত নয়। তাঁর খাকি কুর্তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পকেট, তাতে ফিল্মের কার্টিম,'তামাকের থলি, গোটাকয়েক পাইপ, কয়েকটা সিগ্রেট লাইটার—পকেট একেবারে ঠাসা। মাথার ওপর টুপিটা কপাল পর্যন্ত চেপে বসেছে, ঠিক চাপাটির মতন। দেনিকিনের সাঙ্গোপাঙ্গ অফিসারেরা শ্রদ্ধাভরে দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছেন। ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের টুপিটাই তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। "তা যাই বলুন না কেন, ইংরেজরা কিন্তু ইউনিফর্ম পরতে জানে না—ওরা মিলিটারিই নয়! সে তুলনায় অশ্বারোহী গার্ডদের টুপির বাহার একবার ভেবে দেখুন তো! কিংবা মহারাণীর দেহরক্ষী দলের হুসাররা কেমন টুপি পরত মনে আছে? কী কায়দা বেটাদের!"

কালমুক ঘোড়ার পিঠে চড়ে গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কুতেপভ। ও'র বদন একটু বিরস। কুতেপভের চুলে পাক ধরেছে, চেহারাটা বেঁটে খাটো মোটা-সোটা গোছের। গায়ে শীপস্কিন জ্যাকেট, তার বোতাম খোলা। প্রদর্শনীর খাতিরে উনি রেকাবের বুটে কাঁটা লাগিয়েছেন, আর হাতে চড়িয়েছেন দস্তানা: ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো রাঙা হয়ে আছে। হতচ্ছাড়া মানিচের পেছনে পাঁচ দিন ধ'রে হিমসিম খাচ্ছেন কুতেপভ। বিদেশী বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্যে তেপ্‌লভ ব্রিগেডটাকে যে এমনি ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া হল, তার ঠেলা ঐ ব্রিগেডকেই সামলাতে হবে একথা তিনি ভাল মতেই বুঝছেন।

"এই যুদ্ধের বিশেষ রূপই হল যে এতে প্যাঁচ-পাঁয়তারা খুব বেশী দরকার," দেনিকিন বুঝিয়ে বলেন। "সেই জন্যেই আমাদের আর্মিতে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর গুরুত্ব এত বেশী। এ বিষয়ে আমার অবিশ্যি দারুণ সুবিধা—তেরেক, কুবান আর দন থেকেই আমি এক লক্ষ পাকা ঘোড়সওয়ার পেতে পারব।"

"ও, লা-লা-লা" খুশী মনে সুর ভাঁজেন ফরাসী বাবু। দূরবীন চোখেই লাগানো।

"রেডদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী নেই—বাহিনী গড়বার মাল-মশলাই নেই। আছে খালি বুদিয়নি ব্রিগেডটা—সেই যে যে-ব্রিগেডের হাতে ভূতপূর্ব আতামান ক্রাস্‌নভ বেচারাকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।......"

"এক লক্ষ জিন আর লাগাম জোগাড় করা হয় সহজ নয়," চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ইংরেজ অফিসার বল্লেন। চোখে দূরবীন লাগানোই আছে।

"হ্যাঁ, ওটাই আসল কথা", নীরস সুরে সায় দিলেন দেনিকিন। উনি রসনা একেবারে সংযত করে রেখেছেন—যদিও ও'র খুবই ইচ্ছে করছিল যে, এখনি

এইখানেই এই কামান-গর্জনের মাঝখানে দাঁড়িয়েই (ব্যাটারিগুলো ওখান থেকে এক মাইলও নয়) সৈন্যদের সবার সামনে সত্যি কথাটা ওঁদের শুনিয়ে দেন। ওঁরা বানিয়া, ওঁদের সমস্ত পলিসিটাই ভীরু, কৃপণ, অদূরদর্শী—মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি দুজনকে এই কথা বলে দিতে পারলেই উনি খুশী হতেন।......ওঁদের পক্ষে বলশেভিজমের আপদ যে কী ভয়ঙ্কর, সে আপদের কাছে আড়াই শো জর্মান ডিভিশনও যে কিছু নয়, তা কি অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ হয়নি? দুয়ে দুয়ে চার যেমন সত্যি, একথাও তেমনি সত্যি। তাহলে আপনারা আমাকে অস্ত্র দিন—রুশিয়াতে আপনাদের সৈন্য পাঠাতে যদি ভয় থাকে, তবে প্রয়োজন মতো অস্ত্রই দিন আমাকে।...হিসাব-নিকাশ পরে হবে, মস্কোতে পৌঁছানোর পর।

ষোল আনা সংযম আর রাখা গেল না। সৌজন্যের সীমার মধ্যেই থাকার চেষ্টা করলেন বটে, তবে বিশেষ কোনো বন্ধুত্বের সুরও তুল্লেন না, বল্লেন ঃ

"প্রয়োজন মতো জিন যদি না পাই, তবে কসাকদের খালি ঘোড়ার পিঠেই চড়িয়ে দেব।" দোভাষীকে বল্লেন, "দেখো, দুজনেই যেন বুঝতে পারেন।"

দোভাষী ছোকরা বোধ হয় দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। মহা পা-চাটা। দেনিকিনের কথার তর্জমা করবে কি, ভয়ে ও একেবারে হাঁ। ঠিক তখনই লাগামে এক ঝটকা দিলেন কুতেপভ, ঘোড়ার গায়ে কাঁটার ঘা মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ

"যান যান, আপনারা এক্ষুনি গাড়ীর নীচে চলে যান।"

লড়াইয়ের গোলমালের শব্দে কারুরই খেয়াল হয়নি যে, একটা বিদঘুটে মতন হলদে এয়ারপ্লেন সোজা গাড়ীটার দিকে ধেয়ে আসছে। এত দ্রুত এসেছে যে, গুলী করারও সময় পাওয়া যায়নি। উস্কোখুস্কো চুলওলা বেঁটেখাটো ভাল্‌কা চেরদাকভ প্লেন থেকে ঝুঁকে পড়ল, তারপর দুটো হাত-বোমা ছুঁড়ল; একটা একেবারে ফিয়াটের বনেটের ওপর, আর একটাও তারই কাছে।... .বোমা ফেলে সাদা দাঁত বার ক'রে আকর্ণ হাসি হাসল ভাল্‌কা, তারপর খাড়া উঠে গেল আকাশে।

কিন্তু ইংরেজ আর ফরাসী অফিসার আর দেনিকিন তিনজনেই এর মধ্যে গাড়ীর নীচে ঢুকে পড়েছিলেন—যদিও ভুঁড়ি আর মোটা গ্রেটকোট নিয়ে দেনিকিনকে বেশ বিব্রত হতে হয়েছিল। যাই হোক, একটু ভয় পাওয়া ছাড়া কারোরই কোনো ক্ষতি হয়নি। সাঙ্গোপাঙ্গরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কুতেপভও ঘোড়া ছুটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

প্রচন্ড আক্রোশে আক্রমণ করল ভলান্টিয়ার বাহিনী। ওরা কাতারে কাতারে মানিচের ধারে ছুটে আসে, পেছনে স্তেপের সমতলভূমিতে ধরাশায়ী পড়ে থাকে কতজন। হাল্কা মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি চলছে—তারই মধ্যে ওরা এখানে, ওখানে সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, কুঁজো হয়ে ছোটে, তারপর

নদীর ওপারে গিয়ে জমা হয়। তেলেগিন আদেশ দিল—পরিখা থেকে রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডা নিয়ে এসো, খাপ খুলে বার করো ঝাণ্ডা।

চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে। হোয়াইটদের আর্টিলারি এবার কাচালিন রেজিমেণ্টের মজুত সৈন্যদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করেছে। গোলার আঘাতে মাটি উঠে প্রাচীর তৈরী হয়ে যায়, আর ওপাড় থেকে গুলি ছুটে আসে অজস্র ধারায়। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর শেষ সারিগুলো এবার সামনে দিকে দৌড়ল, দৌড়তে দৌড়তে একবার থামেও না। মুহূর্তের মধ্যে মেশিনগান সব থেমে গেল, মানিচের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অসংখ্য মানুষ—সে মানুষদের আক্রোশ এমনি প্রচণ্ড যে, মনে হয় যেন মানিচের জলই টগবগ করে ফুটছে। রাইফেল ওপরে তুলে নদীর মধ্যে দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে—প্রথমে বুক জল, তারপর গলা জল, তারপর সাঁতার জল। বুলেটের আঘাত লাগলে মরণ আক্ষেপে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে, হাবুডুবু খায়, শেষকালে তলিয়ে যায়। আবার মৃত মানুষের দেহের ওপর দিয়ে ছুটে আসে নতুন নতুন দল।......ওখানে নদীটা মাত্র দু' শো ফুট চওড়া। উন্মাদ কলরবমুখর ক্রুদ্ধ জনস্রোতের গতি রুদ্ধ করে, মেশিন গানের সে ক্ষমতা নেই।......ওপাড়ে নলখাগড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে মেজর জেনারেল তেপ্‌লভ—"আগে চলো, আগে চলো" বলে তলোয়ার ঘুরিয়ে চীৎকার করছেন। কিন্তু তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, আক্রমণের এই প্রচণ্ড ধাক্কায় রেড সৈন্যরা ভয় পাবে, পালিয়ে যাবে—তাহলে হিসাবে তিনি খুবই ভুল করেছেন।

কাচালিন সৈন্যেরা সারাটি দিন ধরে ঠিক এমনি ধারা মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। প্রথম দিনে উদ্বেগে যাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তাদেরও বিচলিত ভাবটা কেটে গেছে, তার বদলে এসেছে কঠোর আর ক্রুদ্ধ উত্তেজনা। আক্রমণ যখন এল তখন লাল সিপাহীদের ট্রেঞ্চে আটকে রাখাই দায়, কমাণ্ডার আর কমিউনিস্টরা মিলে ওদের জামাটামা ধ'রে কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখে, বলেঃ "গুলি করো, গুলি!" ওঃ রাগের চোটে সিপাহীদের সে কী মুখখিস্তি—ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে যেন ঝড়ই বয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বাচ্চা, জোয়ান অনেকেই শীতকালে গাঁয়ে থাকতে ঘুষোঘুষির লড়াইয়ে ভাগ নিয়েছে—এখন সেই প্রাচীন ঘুষোঘুষি লড়াইয়ের নেশাই যেন ওদের রক্তের মধ্যে নেচে উঠল। "ওঃ শালারা জানোয়ার, একেবারে জানোয়ার," বলতে বলতে রাগে ওরা পাগল হয়ে ওঠে। "দূর হারামজাদা, ছাড় না আমাকে," বলে লাতুগিনই সকলের আগে ট্রেঞ্চ থেকে বার হল। হাতে সঙ্গীন একেবারে খাড়া, বনমানুষের মতো বিকট চীৎকার করতে করতে লাতুগিন ছুটছে। ওর পেছনে পেছনে নদীপাড়ের ঢালু বেয়ে ছুটল আর সবাই, আকাশে উঠল জয়ধ্বনি। 'জানোয়ারগুলোও' ধ্বনির জবাবে ধ্বনি তুলল। কিন্তু কাচালিন সৈন্যদের উন্মত্ত সঙ্গীন আক্রমণ ঠেকায় কার সাধ্য! শত্রুদের মধ্যে যারা তীরে পৌঁছেছিল ধাক্কার চোটে তাদের জলে ফেলে দিয়ে ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের ভেতর। একেবারে নদীর মাঝখানেই শুরু করে দিল লড়াই—রাইফেলের কুঁদোর ঘা মারে, হাতবোমা ফাটায়, নয়তো হাতে হাতেই ধস্তাধস্তি লাগিয়ে

দেয়।......ওরা কেউ গাঁয়ের জোয়ান ছোকরা, কেউ দন্‌বাসের খনিমজুর, কেউ ভল্‌গার ডক-মজদুর, কেউ বা লাকড়ি কাটনেওয়ালা—ওরা সব জলের নীচে থেকে ভুস্‌ ভুস্‌ করে ঠেলে ওঠে একেবারে অফিসারদের ঘাড়ের ওপর। অফিসাররা অভিজাত বাপ-মায়ের আদুরে দুলাল, কোমল-শরীর—রোখ যতই থাক তারা এদের সংগে পারবে কি ক'রে? মানিচের দ্রুত ধাবমান স্রোত রক্তে রক্তে একেবারে লাল; আর ওপরে আকাশেবাতাসে শুধু অস্ত্রের ঝঞ্চনা, বিস্ফোরণের গর্জন, মানুষের আর্ত চীৎকার। পরাজিত হয়ে হোয়াইটরা তখন পিছু হটছে, ওপারে জল থেকে ডাংগায় পিছিয়ে গিয়ে পাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করেছে। আরও নতুন সৈন্য পাঠালেন জেনারেল তেপ্‌লভ। কমিসার ইভান গোরা তখন ঝাণ্ডাওয়ালার হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিল রেজিমেণ্টের পতাকা—লাল রেশমের ওপর সোনালি তারা, কত যুদ্ধের বুলেটে বুলেটে বিদীর্ণ। পতাকা আকাশে তুলে গুরুভার পদক্ষেপে মানিচের তীর অভিমুখে ছুটল গোরা। ওকে ঘিরে রইল যত কমিউনিস্ট।

নদীর ওপর দিকে জল কমে এসেছে, নলখাগড়াগুলো জলের ওপর মাথা জাগিয়েছে। ওখানে তেলেগিন তার মজুত সৈন্যদের আগে থাকতেই বসিয়ে রেখেছিল। এই সৈন্যদের নেতা সাপঝ্‌কভ। ইভান গোরা ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিতেই তেলেগিনও কমাণ্ডারের ঘাঁটি ছেড়ে বাইরে এল, এক লাফে ঘোড়ায় উঠে বন্যাপ্লাবিত মাঠ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল। নলখাগড়ার ধারে পাঁকের মধ্যে অর্ধেক দিন ভর লাল সিপাহীরা ঠায় বসে আছে, প্রায় শুয়োরেরই মতো। ওদের কাছে পৌঁছে হাঁক দিল তেলেগিনঃ

"কমরেড্‌স, শত্রুরা পালাতে আরম্ভ করেছে। তোমরা যাও, দেখো ওরা যেন দম ফেলার সময় না পায়!"

দেড়শো জন জংগী ফৌজ ওরা। নদীর আঠালো কাদায় পায়ের বুট আটকে আটকে যায়, তার ওপর হাতে বইতে হয় ভারী মেশিনগান—তবু তাই নিয়েই কখনো গুঁড়ি মেরে চলে, কখনো সাঁতরায়—এম্‌নিভাবে নলখাগড়ার আড়ালে আড়ালে ওরা নদী পার হল। তারপর আক্রমণ করল শত্রুর পার্শ্বদেশে। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। মানিচের তীর থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসে হোয়াইটরা তখন পিছু হটছে, আর আড়াআড়ি মেশিনগানের গুলি ওদের পেছনে ধাওয়া করছে। সুশৃংখলভাবে পিছু হটা আর চল্ল না, এলোপাথাড়ি পালাতে লাগল শত্রুদল।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য এক অংশ থেকে একটা অশ্বারোহী স্কোয়াড্রন এসেছিল কাচালিন রেজিমেণ্টকে সাহায্য করতে। শত্রুর ডান পাশ থেকে অনেকটা দূরে সরু লাইন করে তারা ছড়িয়ে পড়ল—শত্রুর পলায়ন-পথ আটকে দেবে।

ঘেরাও ভেঙে বের হয়ে গেল তেপ্‌লভ ব্রিগেডের বাকি অংশ। দু-একটা দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, লালফৌজের সংগীনের মুখে তারা প্রাণ হারাল। শত্রুকে বেশী দূর পর্যন্ত ধাওয়া করলে বিপদের সম্ভাবনা। তাই সাপঝকভকে তেলেগিন আদেশ দিল—দলবল ঠিক ক'রে নিয়ে ট্রেঞ্চ কেটে বস। আধ মাইল আন্দাজ দূরে

রেজিমেণ্টের পতাকা এগিয়ে চলেছে দেখা যায়, তেলেগিন নিজে ঘোড়া ছোটাল সেই দিকে। সারাক্ষণই ও চোখ রেখেছিল পতাকার ওপর: পতাকা নদী পার হয়ে এগিয়ে গেল, একটু থামল, নুয়ে পড়ল, তারপর আবার উঠল, পত পত করে উড়তে উড়তে এগিয়ে চল্ল......সবই ও দেখেছিল।

অস্তগামী সূর্যের গায়ে কুয়াশা-ভরা মেঘের ছায়া। দ্রুতগতিতে অন্ধকার নেমে আসছে স্তেপের বুকে। দূর দিগন্তে কুতেপভের কামানের আলো ঝলসে ওঠে, শোঁ শোঁ করে গোলা ছুটে যায়—কোথায় কে জানে। তারপর সব শান্ত। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত ক'রে রাত্রি নেমেছে।

যতক্ষণ আলো ছিল ততক্ষণ তেলেগিন গোরাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। পথে যেসব সিপাহীর সঙ্গে দেখা হয় তারা যা খবর দেয় তা পরস্পরবিরোধী। ঝাণ্ডা নিয়ে তাকে মানিচ পার হতে অবিশ্যি সকলেই দেখেছে। কিন্তু তারপর ঝাণ্ডা দেখা গিয়েছিল কম্প্যানি কমাণ্ডার মশ্‌কিনের হাতে। মশ্‌কিনও আহত হয়: ঝাণ্ডাটা যখন শেষবার চোখে পড়ে তখন সেটা এক জোয়ান ছোকরার কাঁধে। এম্‌নি নানারকম বলছে নানা জনে, এমন সময় তেলেগিনের কাছে পৌঁছাল লাতুগিন আর গাগিন। আর্টিলারি দলের মধ্যে শুধু ওরা দুজনই বেঁচে আছে। ওদের সেই বিশ্বস্ত কামান, সেটাও গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

"ওঃ কী ভয়ঙ্কর, ইভান ইলিয়িচ," দাঁতগুলো কোনোরকমে ফাঁক ক'রে বল্ল লাতুগিন। "ভাবলেও রক্ত হিম হয়ে আসে।"

গাগিন সাধারণত কথা বলে না। নীচু স্বরে সে বল্ল, "ওদের কারো কারো কাছে যাওয়াই যায় না এখনো। নিঃশ্বাস টানছে আর পাঁজরের হাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওদের দিকে চাইলেই হয়তো সঙ্গীন চালিয়ে দেবে......"

"ইভান ইলিয়িচ, আপনি কি ইভান স্তেপানোভিচকে খুঁজছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছ নাকি তাঁকে?"

"আমাদের সঙ্গে আসুন।"

মৃতদেহের পর মৃতদেহ। তার মধ্যে পথ করে করে ওরা নদীতীরে পৌঁছাল। এখানে ওখানে অন্ধকারের মধ্যে মানুষ গোঙায় অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে। আহতদের খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে স্ট্রেচার-ওলারা এ ওকে ডাক দেয়। তার মধ্যে কুজ্‌মা কুজমিচের হিস হিস আওয়াজ—তেলেগিন ঠিক চিনতে পারল। লাতুগিন ছিল ওদের সবার আগে, হঠাৎ থেমে সে মাটির ওপর বসে পড়ল।

মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ইভান গোরা—দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্তদেহ। বুলেটটা ওর বুক ভেদ করে গেছে, যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ঘুরে পড়েছে। হাত দুটি প্রসারিত—মাটিকেই যেন দুহাতে আলিঙ্গন করছে। মরণের মধ্যেও শত্রুকে ও মাটি ছাড়বে না।

প্রবীণ সৈনিকেরা ইভান গোরাকে সাধারণ সিপাহীরূপে দেখেছে, তারপর কম্প্যানি কমাণ্ডার হতেও দেখেছে। রাত্রিবেলা তারা সকলে মাঠের মধ্যে জমা

হয়ে স্থির করল যে, বেশ একটা ভাল জায়গা দেখে কমিসারের সমাধির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সকলের চোখে পড়ে। মানিচের তীরে বেশ একটা উ'চু স্তূপ ছিল, সেটাই সমাধির জন্যে সাব্যস্ত হল।

মানিচের ধারে এখানে ওখানে অমন ধারা স্তূপের অভাব নেই, কিন্তু এই স্তূপটা দেখতে ঠিক থামের মতো, সোজা ওপরে উঠেছে। প্রাচীনকালে ওখানে হয়তো কোন 'খান'-এর তাঁবু পড়েছিল; খান সাহেবের পশুপাল স্তেপের মধ্যে চরে বেড়াবে আর উ'চুতে বসে তাদের ওপর দৃষ্টি রাখা হবে, এই উদ্দেশ্যেই স্তূপ বানানো হয়েছিল বোধ হয়। কিংবা হয়তো আরও প্রাচীন কালে সিথিয়ানরা ওখানে তাদের সর্দারকে কবর দিয়েছে। সঙ্গে দিয়েছে সর্দারের প্রিয়তমা পত্নী আর তার যুদ্ধের ঘোড়া। তারপর স্তূপের উপরিভাগে উইলো শাখা বিছিয়ে তার মাঝখানে পুঁতেছে এক প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের তলোয়ার—ঊর্ধ্বমুখী সেই তলোয়ার উর্বরতা আর সমৃদ্ধির প্রতীকরূপে পূজা পেয়ে যাবে।

কমিসার ইভান গোরার মৃতদেহ ওরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল নদীর ওপাড়ে। সমাধিস্তূপের মাথায় বসন্তের নবীন তৃণ, তার ওপর দেহটিকে নামাল। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিল রেজিমেণ্টের রক্ত পতাকা।

নিস্তব্ধ রাত্রি। জ্যোৎস্নার দীপ্তিতে চরাচর পরিদৃশ্যমান। তলোয়ার খুলে কমিসারের পায়ের কাছে দাঁড়াল তেলেগিন। পেত্রোগ্রাদের কমিউনিস্ট বাবুশ্‌কিন, এক নম্বর কম্প্যানির কমিসার, সে দাঁড়াল মাথার কাছে। তারপর সার বেঁধে এক এক করে আসে লাল ফৌজের সিপাহীরা, সামরিক কায়দায় মৃতদেহটিকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়।

"বিদায়, কমরেড," বলে প্রত্যেক জনে।

বিদায় নেওয়া তখন শেষ হয়েছে, কমিসারের দেহ এবার কবরের মধ্যে নামাতে হবে, এমন সময় লাতুগিন আবার স্তূপের মাথার ওপর ছুটে এল।

"আমাদের যারা চরম শত্রু তারা আজ আমাদের সেরা কমরেডকে হত্যা করেছে," চীৎকার স্বরে বল্ল লাতুগিন।

"কিসের জন্যে আমরা রাইফেল পেয়েছি সে কথা উনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন।... শিখিয়ে গেছেন যে, সত্যের জন্যে আমাদের লড়তে হবে, তাই এই রাইফেল।......সত্য ছিল ও'র নিজের ধর্ম......উনি ছিলেন আমাদেরই একজন, আগা থেকে একেবারে গোড়া পর্যন্ত।... আমাদের গুরু উনি... বলতেন, 'তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তারপর যেদিন সেই প্রথম চীৎকারের শব্দ নিয়ে তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছ, সেদিন থেকেই তোমার একমাত্র কর্তব্য হল—সত্যের জন্যে লড়াই করা......।' রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আর কমিসার বাবুশ্‌কিন, আমার অনুরোধ আমাকে আপনারা কমিউনিস্ট পার্টিতে স্থান দিন।... এই মৃতদেহ, আর এই পতাকা, এরই সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একথা আজ উচ্চারণ করছি..."

কমিসারের দেহ সমাধিস্থ হল। ঐদিন অনেক রাতে তেলেগিন তার পরিখার মধ্যে বসেছিল, দাশা এসে বাইরে ডাকল। আঙুল মটকাতে মটকাতে বল্লঃ

"একবার ওর কাছে যাও, ওকে সরিয়ে আনো।"

সমাধিস্তূপের দিকে নিয়ে চল্ল ইভানকে। ভোরের ঠিক আগের সময়টা, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। চাঁদ তখন ডুবু ডুবু। স্তেপের হাওয়া কানের পাশে শোঁ শোঁ শব্দ করে।

"আনিসিয়া আর আমি কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও যে কোনো কথা শোনে না..."

ইভান গোরার তাজা কবরের পাশে বিষণ্ণ, আনত মুখে বসে আছে আগ্রিপিনা। হাতের কাছে পড়ে আছে টুপি আর রাইফেল। আনিসিয়াও বসে আছে, ওর থেকে একটু দূরে।

"ও যেন পাথর হয়ে গেছে। ওকে কোনো রকম করে সরাতেই হবে," ফিস ফিস করে দাশা বল্ল। বলে আগ্রিপিনার কাছে গেল। "চেয়ে দেখ আগ্রিপিনা, রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার নিজে এসেছেন, এখান থেকে চলো বলে তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।"

আগ্রিপিনা মাথা তোলে না। যত কথা সব কানের পাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়, ঠিক বাতাসের মতো। আনিসিয়া তখনো দূরেই বসেছিল, হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকল। গলাটা ঝেড়ে নিল তেলেগিন।

"এমন করলে তো চলবে না আগ্রিপিনা," তেলেগিন বল্ল। "এক্ষুণি আলো ফুটবে, আমাদের সবাইকে ওপাড়ে যেতে হবে। তুমি তখন এখানে একা বসে থাকবে কি করে?... না সে ঠিক হবে না..."

মাথা না তুলেই একটানা সুরে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল আগ্রিপিনাঃ

"সেবার আমি ওকে ছেড়ে যাইনি, এবারও যাব না...যাব কোথায়?"

নিজের কপালে আঙুল ঠেকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে দাশা বল্ল, "ঐ দেখ, ওর কথাবার্তা সব এলোমেলো হয়ে গেছে!"

"আগ্রিপিনা, এসো, কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক," বলে তেলেগিন ওর পাশে বসে পড়ল। "তুমি ওকে ছাড়তে চাও না, কেমন? কিন্তু এই কবরই কি সব? এ ছাড়া কি ওর আর কিছু বাকি থাকবে না? থাকবে, ও তো আমাদের স্মৃতির মধ্যে জীবন নেবে, প্রেরণা দেবে।... আগ্রিপিনা, ভুলোনা যে তুমি তার স্ত্রী...তার বীজ আজ তোমারই দেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চয় করছে, সেকথা ভুলোনা..."

মুখের সামনে দুহাত তুলে সজোরে চেপে ধরল আগ্রিপিনা, তারপর আবার শিথিল হয়ে এল হাত দুখানি।

"তোমার দাম যে এখন আমাদের কাছে অনেক বেশী...তোমার সন্তানকে রেজিমেণ্ট তার নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করবে।...তোমার কত বড় দায়িত্ব একবার ভেবে দেখ।" ওর মাথার চুলে আদর করতে করতে তেলেগিন বল্ল "তোলো, রাইফেল তোলো, এবার যেতে হবে..."

সারা রাত্রি যেখানে বসেছিল, সেদিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে মাথা হেঁট করল আগ্রিপিনা। তারপর উঠল। রাইফেল তুলে নিয়ে সমাধিস্তূপের পাশ বেয়ে নেমে চল্ল।

মানিচের তীরে তীরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চল্ল মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর নিভে গেল। কুতেপভ কিছুতেই দশম আর্মির যুদ্ধের লাইন ভাঙতে পারছেন না, তার ওপর হতাহতের সংখ্যা ভয়ঙ্কর বেড়ে চলেছে—এই সব দেখে দেনিকিন মহা বিরক্ত—কুতেপভের ডাক পড়ল একাতেরিনোদারে। দেনিকিন তাঁর পড়ার ঘরে বসে আছেন—গর্বিত, উদ্ধত রোমানভ্স্কি তাঁর পার্শ্বচর; ডেস্কে কাগজপত্রের ওপর মোটা পেন্সিলটা অধৈর্যভাবে ছুঁড়ে ফেলে ক্রুদ্ধ সুরে বল্লেন ঃ

“এটা কি হচ্ছে বলতে পারেন? লড়াই হচ্ছে, না মিত্রপক্ষের বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্যে খেল দেখানো হচ্ছে? আমরা গ্ল্যাডিয়েটর নই, বুঝলেন জেনারেল সাহেব? এ রকম বে-পরোয়া হঠকারিতা করার অর্থ কি? ছিঃ ছিঃ, একেবারে অসভ্য জংলীদের মতো লড়াই!—আমরা কি গেরিলা বনে গেলাম?”

কুতেপভ দেনিকিনকে ভালো মতোই চেনেন, উত্তেজনার কারণ বুঝতে দেরী হল না। দোয়াতদানির পাশে ছোট একটা ফুলের তোড়া—নীরবে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

“এই যে এইটা পড়ুন, খুব আনন্দ পাবেন” বলে খবরের কাগজের গাদা থেকে দেনিকিন ওপরের কাগজখানা তুলে নিলেন। ‘নবম রেড আর্মির অভ্যন্তরভাগে আমাদের সৈন্যেরা কীলকের আকারে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা নগণ্য।......আমরা এখন কসাক বিদ্রোহের এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছি, কয়েকদিনের মধ্যেই ভেশেন্স্কায়া গ্রাম অধিকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ......কিন্তু মানিচ নদীতীরে আমাদের অনেক সৈন্য আটকাইয়া থাকায় দনেৎস অঞ্চলের সামরিক কার্যকলাপ এখনও বিস্তীর্ণ অভিযানে পরিণত হইতে পারে নাই।’ আমাদের রণকৌশলের কথা ভাবতেও লজ্জা লাগে, বুঝেছেন?. .... সারা দুনিয়ার চোখ রয়েছে আমাদের ওপর. ....বিদেশের ওঁরা খুব সহজেই বিচলিত হয়ে পড়েন, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।......এদিকে আসুন তো......”

খানিকক্ষণ চশমাটা হাতড়ালেন, তারপর কুতেপভ আর রোমানভ্স্কিকে নিয়ে ওক কাঠের টেবিলটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপর সব যুদ্ধের মানচিত্র।

যুদ্ধের পরিকল্পনাটা এই রকম ঃ দশম আর্মির পার্শ্বদেশে বিরাট সংখ্যায় অশ্বারোহী সৈন্য সমাবেশ করার পর জেনারেল পক্রভ্স্কি আর জেনারেল উলাগাই, ওঁরা দুজনে শত্রুর পেছন দিকে ঢুকে পড়বেন; বলশেভিক অশ্বারোহী বাহিনী ধ্বংস ক'রে তাঁরা ভেলিকোক্নিয়াঝেস্কায়া গ্রাম দখল করবেন। তারপর চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মানিচ তীরবর্তী সমস্ত রেড সৈন্যদের ঘিরে ফেলতে হবে—এই তাঁদের কর্মসূচী।

অ'াডকলোন সুবাসিত পরিষ্কার লিনেনের রুমাল বার করে চশমা মুছলেন দেনিকিন। হাতের আঙুলগুলো ছোট ছোট, তার ওপর শুকনো চকচকে চামড়া। আঙুল একটু কাঁপে।

"ভলাণ্টিয়ার আর্মি আজ বিশ্ব রাজনীতির সমস্যা সমাধান করছে। ওদেসা, খার্সন আর নিকোলাইয়েভের সর্বনাশের পর পশ্চিমের ও'রা এ কথাটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন। ......বিদ্যুতের গতিতে আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে আমাদের, প্রতি আঘাতে একেবারে পঙ্গু করে ছেড়ে দিতে হবে। লোকে বাহবা দেওয়া চাই—বাহবা পেলেই রণসম্ভার এসে পেঁছাবে—এই এ যুদ্ধের মজা। বে-পরোয়া হঠকারিতার বিরুদ্ধে আমি তো সব সময়েই আপনাদের সাবধান করে দিয়েছি। জুয়াখেলা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু তা বলে হারাও পছন্দ করিনে।......দনবাসে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তা যদি সর্বজনীন অভিযানের রূপ না নেয়, দেশের অভ্যন্তরভাগে যদি আমাদের অভিযান পরিচালিত না হয়, আর শেষ পর্যন্ত যদি আমরা মস্কো পেঁছাতে না পারি—তা হলে গুলি করেই আমি আমার মাথার খুলি ফুটো করে দেব—সে কথা আপনাদের বলে রাখছি।......"

রুপোর সিগ্রেট কেসে সিগ্রেট ঠোকেন রোমানভ্স্কি—সুপুরুষ চেহারা, উদ্ধত, সবজান্তা ভাব। চোখ আর কপাল কুঁচকে ও'র দিকে এক নজর চাইতেই জেনারেল কুতেপভ বুঝতে পারলেন—দেনিকিনের মাথায় এই সব আকাশচারী ধারণা হঠাৎ কোথা থেকে এল। দেনিকিন সাহেব নিশ্চয়ই খুব জোর দাবড়ানি খেয়েছেন। কিন্তু কুতেপভ সেনানীমণ্ডলীর অফিসার নন, তিনি রণাঙ্গনের অফিসার—উচ্চতর রণনীতির ব্যাপার স্যাপার তিনি বোঝেনও না, কষ্ট ক'রে বুঝতে চানও না। ও সব ও'র কাজ নয়—ও'র কাজ হল যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে শত্রুর টু'টি টিপে ধরা।

"সেনাপতি বাহাদুর! আমাদের শক্তিতে যা কিছু সম্ভব তা আমরা করব," কুতেপভ বল্লেন। "এই শরৎকালেই মস্কো দখল করতে হবে বলে যদি আদেশ দেন, সে আদেশও পালিত হবে......"

গত তিনদিন ধ'রে কাচালিন সৈন্যেরা রেল লাইন লক্ষ্য ক'রে পথ কেটে চলেছে। এক দানা খাবার কি এক ফোঁটা জলও জোটেনি। পশ্চাদ্বর্তনের আদেশ এসেছিল ২১শে মে। প্রচণ্ড মেহনত আর ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে অবরোধ ভেঙে ফেলে, মানিচ থেকে উত্তর দিকে জারিতসিন লক্ষ্য ক'রে পিছু হটল দশম আর্মি। শুকনো ঝোড়ো হাওয়ায় নাগদোলা গাছগুলো মাটিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ধূসর স্তেপভূমির মধ্যে দূরে ঘোলাটে অন্ধকারের ভেতর উলাগাইয়ের অশ্বারোহী দল জমা হচ্ছে—যেমন নেকড়ে বাঘের পাল।

মালটানা ঘোড়াগুলো পড়ে আর মরে। অন্য অন্য গাড়ীতেও জায়গা নেই, তবু আহত আর অসুস্থদের তারি মধ্যে তুলে দিতে হয়। যারা অল্প জখম তারা

আর হাসপাতালের নার্সরা গাড়ীর পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। পিপাসার চোটে মানুষের ঠোঁটটোঁট সব ফুলে, ফেটে একাকার। চোখগুলো লাল হয়ে উঠেছে। পূর্বদিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া আসে, হাওয়ার ধাক্কায় চোখ কুঁচকে ওরা খালি দূর দিগন্তের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে—রেল স্টেশনের জলের ট্যাংক দেখা যাচ্ছে কি? স্তেপের মধ্যে চওড়া চওড়া নালা, তার হিমশীতল জলে এই সেদিনও তো ওদের কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে। কিন্তু আজ তাতে একটু বাষ্পও নেই। আহা, শুষ্ক তালু ভেজানোর জন্যে সেদিনের সে জলের দু ফোঁটাও যদি পাওয়া যেত!

একটা নালার কাছে আসতে হঠাৎ এক চোরাগোপ্তা আক্রমণের মুখে পড়লঃ নালার ঘাসঢাকা পাড় বেয়ে গাড়ীগুলো এঁকে বেঁকে নামছে এমন সময় খুব কাছেই গুলির শব্দ বেজে উঠল। রোগা রোগা ঘোড়া ছুটিয়ে একদল কসাক ধেয়ে এল (তারা যে কোথায় লুকিয়ে ছিল ভগবানই জানেন)—খুব সহজেই লুটের মাল পাওয়া যাবে এই আশায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মালগাড়ীগুলোর ওপর। মহা বিশৃঙ্খলা বেধে গেল গাড়ীর লাইনে। অসমসাহসী জনপঞ্চাশেক লুটেরা, দাড়ি বাগিয়ে ঢালু বেয়ে ওপরে উঠে এল। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে থেকে গুলি ছুটতেই তারা আবার তেম্‌নি তীরবেগে সোজা চম্পট। আহত লোকদের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল ছিল—গুলি তারাই করল। এমন কি দাশা, চোখ কান শক্ত করে বুঁজে সেও গুলি চালিয়েছিল।

কসাকরা দ্রুত পালায়, কিন্তু ওদের একজন ঘোড়াশুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল ঢালুর ওপর। অম্‌নি এদিক থেকে ক'জন মিলে কী ছুট--ওর জলের বোতলটা যদি পাওয়া যায়! কসাকটার কাঁধে রুপোলি স্ট্র্যাপ। ওর ঘোড়াটা মরে গেছে, ঘোড়ার নীচে থেকে ওকে সবাই টেনে বার করল। "আমি ধরা দিচ্ছি, ধরা দিচ্ছি", বলে ভয়ে লোকটার কী চীৎকার। "আমাকে আপনাদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে চলুন, অনেক খবর দিতে পারব….. "

ওর জলের বোতলটা সবাই প্রায় ছিঁড়েই বার করে আনল। থলিতে পাওয়া গেল আরও দু বোতল।

কম্প্যানি কমাণ্ডার মশ্‌কিনের হাতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ--গাড়ীর মধ্যে বসে আছে। চীৎকার করে বল্ল, "মেরো না, ওকে জ্যান্ত ধরে আনো, এইখানে আনো।"

বন্দী অফিসার ওর সামনে এটেন্‌শান হয়ে দাঁড়ায়। থলথলে চেহারা, মুখটা ঢিলেঢালা, নিষ্প্রভ চোখ—এমন চেহারা খুব কমই দেখা যায়। তার ওপর টক টক, পচা পচা গন্ধ।

"তোমরা কি ফৌজের লোক? না গেরিলা?"

"আমাদের ইউনিটটা সাহায্যকারী দল, নিয়মিত ফৌজ নয় স্যার!"

"আমাদের পেছনে বিদ্রোহ ওস্‌কাচ্ছে বুঝি?"

"সৈন্য-তালিকায় নতুন করে যাদের নাম উঠেছে, আমরা তাদের জড়ো করছিলাম—জেনারেল উলাগাইয়ের আদেশ……"

তখন মালগাড়িটাড়ি সব আবার চলতে আরম্ভ করেছে। অফিসারটা গাড়ার পাশে পাশে চলে। যা জিজ্ঞাসা করা হয় চটপট জবাব দেয়—সংক্ষেপ অথচ সঠিক। মনে হয় অফিসারটা সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক—বেশ ঝানু—প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কিভাবে দাম দিতে হয়, তা ওর জানা আছে। লালফৌজের জনকয়েক সিপাহীও পাশে পাশে চলেছে, ও কি বলে শুনবে। একটা প্রশ্নের জবাবে ও বল্ল যে, নবম রেড আর্মি দনেৎস জেলা থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে, আর জেনারেল সেক্রেতেভের ঘোড়সওয়ার বাহিনী নাকি নবম আর অষ্টম আর্মির মাঝখানে গোঁজ হয়ে ঢুকে পড়েছে, লাল ফৌজের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়ে আক্রমণ করছে। শুনে সিপাহীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কমান্ডার মশ্‌কিন বল্ল:

"ধ্যেৎ, সব মিথ্যে কথা—ওরকম কিছু হয়নি।"

"না স্যার সব সত্যি। এই দেখুন না সর্বোচ্চ কমান্ডের ইস্তাহারখানাই তো আমার কাছে রয়েছে।......"

আনিসিয়া নাজারোভা গাড়ীতে ছিল, নেমে পড়ে বন্দীর পাশে সিপাহীদের মধ্যে এসে ঢুকল। মশ্‌কিন ইস্তাহার পড়তে ব্যস্ত। ইস্তাহারের পাতাগুলো হাওয়ায় ফর ফর করছে, আর সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—ও কি বলে শুনবে। ক্ষীণ শক্তিতে আনিসিয়া ওদের ধাক্কা দেয়, বন্দীর কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। ওরা বিরক্ত হয়ে বলে, "আরে তোমার হল কি, এমন লোক আর দেখনি নাকি?"

আনিসিয়ার পা দুটো যেন চলতেই চায় না, সীসের মতো ভারি লাগে। মাথা ঘুরছে, চোখ দুটো যেন বালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে বন্দীর কাছে পৌঁছাতে না পেরে ও দৌড়ে এগিয়ে গেল, হোঁচট খেতে খেতে গাড়ীর লাগাম ধরে গাড়ী থামিয়ে ফেল্ল। প্রথমে কেউ বুঝতেই পারে না ও কি চায়। ঘাড় বাড়িয়ে আনিসিয়া বন্দীটাকে দেখছে—বিবর্ণ চোখের দৃষ্টি একেবারে স্থির। চোখ দুটি ক্রমেই আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, মনে হয় অন্ধকারায়মান পাংশু মুখমন্ডলের সবখানিই বুঝি চোখ।

"এই লোকটাকে আমি চিনি।" আনিসিয়া বল্ল। "কমরেড্‌স, ওই আমার দুধের বাছাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল...বেত মেরে মেরে আমাকেও প্রায় খুন করে ফেলেছিল ..আমাদের গ্রামের ঊনত্রিশজন লোককে ও চাবকে চাবকে শেষ করে দিয়েছে..."

কাঁধ কুঁচকে অফিসারটা আড় চোখে চাইল। ঘন হয়ে দাঁড়াল লাল সিপাহীর দল, তারা একবার বন্দীর দিকে চায় আর একবার আনিসিয়ার দিকে চোখ ফেরায়।

"বেশ তো", বল্ল মশ্‌কিন, "আমরা তদন্ত করব'খুনি। তুমি এখন যাও তো, গাড়ীতে গিয়ে একটু শোও তো লক্ষ্মী......"

কিন্তু আনিসিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বলে চল্ল:

"কমরেড্‌স, কমরেড্‌স, ওকে কক্ষনো জ্যান্ত রাখবেন না। ওকে বাঁচতে

দেওয়ার চেয়ে আমার হৃদ্‌পিন্ডই বরং উপড়ে নিন, সেও ভাল...। ওর শরীর তল্লাশি করুন। ওর নাম নেমেশায়েভ, আমার কথা ওর মনে আছে...।" বলতে বলতে হঠাৎ সোল্লাসে চীৎকার করে বন্দীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল :

"দেখুন দেখুন, ও আমাকে চিনতে পেরেছে!"

একগাদা হাত এগিয়ে এল—অফিসারের ঘামে ভেজা পিঠ থেকে ছিঁড়ে বার করে আনল ওর কুর্তা, আর শার্ট। পকেট উল্টে পাল্টে দেখা গেল, হ্যাঁ ঠিক, ক্যাপ্টেন নিকোলাই নিকোলায়েভিচ নেমেশায়েভ নামেই পরিচয়-পত্র পকেটে রয়েছে।

"আপনারা কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছিনে", নীরস সুরে বিড় বিড় করে বল্ল লোকটা। "এ মেয়েটার কথা সব মিথ্যে, ও এলোমেলো বকছে, নিশ্চয় টাইফাস হয়েছে..."

পাশে একজনের হাত থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে আনিসিয়া অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল, সিপাহীরা সব নীরবে সরে দাঁড়াল—আনিসিয়ার কাহিনী তো ওরা সবাই জানে! অফিসারের কাঁধের ওপর মৃদু আঘাত করে আনিসিয়া বল্ল :

"চলো!"

সিপাহীদের মুখ পাথরের মতো। আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাদের মুখের পানে চেয়ে নেমেশায়েভের দম আটকে এল, কি যেন বলতে গেল মশ্‌কিনকে। কিন্তু মশকিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ইস্তাহার পড়ছে। নেমেশায়েভও তখন গাড়ী আর ছাড়ে না, ধারটা একেবারে চেপে ধরে থাকে, যেন ওতেই ও বেঁচে যাবে। কিন্তু সিপাহীরা ওকে টেনে ছিনিয়ে আনল গাড়ীর পাশ থেকে, পিঠে খোঁচা দিয়ে বল্ল : "যাও, যাও......"

স্তেপের মধ্যে পা বাড়াল লোকটা, ঠিক অসাড়ের মতো। মাথা বাঁচাবার আশায় কাঁধ দুটো তুলে ধরেছে, পা ফেলছে যেন চোখেই দেখতে পায় না। আনিসিয়া ওর দশ কদম পেছনে। কিছু দূরে গিয়ে ভারী রাইফেলটা কাঁধে বসাল আনিসিয়া।

"আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।"

বোঁ ক'রে ঘুরল নেমেশায়েভ, যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। সোজা ওর মুখের ওপর গুলি চালাল আনিসিয়া। তারপর লোকটার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না, হেঁটে চলে এল সাথীদের কাছে। সাথীদের চোখে এতক্ষণ পলক পড়েনি। ন্যায়ের দন্ড কেমন ক'রে নেমে আসে, কঠিন দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল।

"এটা কার রাইফেল, নিন," বলে আনিসিয়া চলে গেল। একেবারে শেষ গাড়ীটাতে উঠে তেরপল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

॥ সতের ॥

স্কুলের খাতায় ছেলেদের ডিক্টেশন দেখছে কাতিয়া। দেওয়াল ঢাকার কাগজ, তাই কেটে কেটে সেলাই ক'রে খাতা বানানো হয়েছে—শুধু এক পিঠে লেখা যায়। কিন্তু ওর নিঃস্ব জীবনে তাই বড় কম নয়। এরই জন্যে ও নিজে কীয়েভ গিয়েছিল। শিক্ষা বিভাগের পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারের দেখা পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। ও কে এবং কেন এসেছে শুনবামাত্র কমিসার সাহেব ওর হাত ধ'রে আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলেন। খুব দামী একটা টেবিল, তার ওপর কালি-পড়া কেট্‌লি—কেট্‌লি থেকে গাজরের চা ঢেলে, তারই দু ফোঁটা অম্লরস ওকে পরিবেশন করলেন। কাঁধের ওপর ফারকোট ঝুলছে, পায়ে ফেল্টের বুট পরেছেন, কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে জনশিক্ষা সম্বন্ধে এমন একখানা প্রোগ্রাম শুনিয়ে দিলেন যে, কাতিয়ার মাথাই ঘুরে গেল। মৃদু হাসিতে দৃঢ় বিশ্বাস ফুটিয়ে আঙুল দিয়ে দাড়ি নাড়াচাড়া করছেন, আর বলে যাচ্ছেন ঃ

"দশ পনের বছরের মধ্যেই আমাদের দেশ সুশিক্ষিত দেশ বলে পরিগণিত হবে। বিশ্ব-সংস্কৃতির সমস্ত সম্পদ আমরা বিস্তীর্ণ সংখ্যক জনসাধারণের হাতে তুলে দেব, এ সংস্কৃতি হবে তাদের সম্পত্তি। নিরক্ষরতা দূর করার বিরাট কর্তব্য আমাদের সামনে। এ লজ্জা একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে হবে—নইলে কোনো বুদ্ধিজীবীরই আর মান-ইজ্জত থাকে না। শিশু-শিক্ষালয় আর কিণ্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারিত, আমাদের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে তার মধ্যে টেনে আনতে হবে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যে কাজের কথা স্বপ্নেই ভাবতে পেরেছেন, আজ বলশেভিকরা তা বাস্তবে রূপ দেব—কোনো বাধা মানব না।......"

লেখার খাতা, তাছাড়া প্রথম ভাগ, অন্য পাঠ্যপুস্তক, পেন্সিল, স্লেট ইত্যাদি মিলিয়ে দশ হাজারটা জিনিষ সরবরাহ করা হবে বলে তিনি কাতিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ও যখন ওঁর অফিস থেকে নেমে গেল—ভাবল বুঝি স্বপ্নই দেখছে। কিন্তু তারপর নানা মুশ্‌কিল, নানান গণ্ডগোল। সত্যিকারের বই-খাতার দিকে যতই যেতে চায়, সেগুলোও যেন ততই অবাস্তবতার শূন্যে সরে সরে যায়; খাতাপত্র যাদের বাস্তবিকই সরবরাহ করার কথা তারা যেন ততই দ্ব্যর্থবোধক কথা বলতে আরম্ভ করে, নয়তো বিদ্রূপ করে কিংবা মুখ অন্ধকার ক'রে বসে থাকে। হোটেলের শোবার ঘরে উত্তাপের ব্যবস্থা নেই, খাটের ওপর একটা গদিও নেই। মাথার ওপর অনেক উঁচুতে একটা ইলেক্‌ট্রিকের আলো আছে বটে, কিন্তু সেটা এমন টিম টিম করে জ্বলে

যে ভয় হয় বুঝি এখুনি নিভে যাবে। কাতিয়া তার ফারের পাড় লাগানো কোটটা পরে নড়বড়ে সোফার ওপর বসে থাকে। মন হতাশ।

একদিন লম্বা গোছের এক ভদ্রলোক কড়া না নেড়েই ওর ঘরে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোকের মাথায় ঝাঁকড়া টুপি, গায়ে টাইট কুর্তা, গলার স্বর বেশ মোটা আর গম্ভীর। সোজা একেবারে কাজের কথা পাড়লেন ঃ

"আপনি এখনও আছেন? হ্যাঁ, আপনি কি জন্যে এসেছেন সব জানি। দেখি, আপনার কাগজপত্র সব দেখান তো!"

লালচে আলোটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র পড়ে দেখলেন ভদ্রলোক। বেশ দৃঢ় আর সুন্দর ওঁর মুখটা—একটু বিদ্রুপেরও আভাস আছে সে মুখে! সরল বিশ্বাসে কাতিয়া ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"যত সব! পাজী ছুঁচো!" ভদ্রলোক বল্লেন। "ফাঁকিবাজ, নাশকারীর দল......। কাল খুব সকালবেলা সিটি কমিটিতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।......দেখি কি করতে পারি, ভেবে চিন্তে যাহোক একটা উপায় করা যাবে।......আচ্ছা, আসি!"

এই ভদ্রলোক মারফৎ কাতিয়া গুদাম থেকে দেওয়াল ঢাকার কাগজ আর পেন্সিল পেল। একটা গোটা লাইব্রেরিও (তার অর্ধেক বই ফরাসী ভাষায়) জবরদখল হয়ে এসে পৌঁছাল—সেটা আগে কোনো সংস্কৃতিমনা চিনি-কল-মালিকের সম্পত্তি ছিল। এই সব ধনরত্ন নিয়ে গরুচালানের মালগাড়িতে চেপে ফেরার পথে আবার নাকালের একশেষ—সবচেয়ে কঠিন বিড়ম্বনাই বুঝি বাকি ছিল। প্রত্যেক স্টেশনেই কত লোক গাড়ির মধ্যে তেড়ে আসে ঃ বস্তা ঘাড়ে দাড়িওলা সব মানুষ, পাগলের মতো চোখ; নয়তো চাষী ঘরের মেয়ের দল, গরুর মতো ইয়া মোটা মাজা আর পাশ—জামা-কাপড় ঘাগরা যা পেয়েছে তারই নীচে বে-আইনী খাবার জিনিষ লুকিয়ে নিয়ে চলেছে।

অবলা কাতিয়া—তারও তাহলে শক্তি আছে! সর্পিল দেহ আর আকুতি-ভরা চোখ নিয়ে ছোট্ট বেড়ালছানার মতো যে কাতিয়া অপরের শয্যায় বসে অসহায়ভাবে ঘড় ঘড় করত, সে কাতিয়া আর নেই।

আলেক্সি যেদিন খামোখা জাহির করে দিল যে, কাতিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে, সেদিনই কাতিয়া নিজের শক্তি টের পেল। গেঁয়ো মুদীর বৌ হয়ে জীবন কাটাতে হবে—এই ভবিষ্যতের কথা ভাবামাত্র আতঙ্কে ও একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল বুঝি কবরের মুখেই পা দিতে চলেছে। মদিরাবিহ্বল আলেক্সিও লালসাউন্মত্ত, চোখের মধ্যেই ও দেখেছিল ওর জীবন্ত সমাধির ছবি—এইতো ওর স্বামীর চোখ, ওর প্রভুর দৃষ্টি! কাতিয়ার সমস্ত সত্তা তখনি বিদ্রোহ ঘোষণা করল, উন্মুখ হয়ে উঠল এর বিরুদ্ধে যুঝবার জন্যে। মনে হল যেন দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শরীরে আবার বল ফিরে এসেছে—অপ্রত্যাশিত শক্তির আনন্দে নেচে উঠল মনটা। তারপর যখন সংকল্প করল যে, গরম পড়লেই মস্কো পালাবে তখন ও আরও

অবাক। ছলচাতুরীর ক্ষমতাও ও আবিষ্কার করল নিজের মধ্যে, মস্কো যাবার সিদ্ধান্ত আর কাউকে জানতেই দিল না। আলেক্সি, মাত্রিয়োনা ওরা শুধু দেখল যে, কাতিয়া দিব্যি খুশী হয়ে উঠেছে, কাজ করতে করতে আবার গানও গাইছে।

দুবেলা খেতে বসে আলেক্সির (অন্য সময় ও বাড়ি থাকে না) সে কী হাসি-মস্করা আর চোখ টেপাটেপি! বলে, "দেখ, দেখ কনে বৌটি কেমন খাসা......" ওরও এখন খুব ফূর্তি; গাঁয়ের মীটিং থেকে অবশেষে ওর পক্ষেই মত দিয়েছে—জমিদার বাড়ি ভেঙে ফেলে তার ইট কাঠ ও এখন নিজের জমিতে এনে জমা করছে।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে লাল ফৌজ যখন কিয়েভ দখল করে সে সময় ফৌজের একটা ইউনিট ভ্যাদিমিস্কোর্য়ে গ্রামে এসেছিল। তখন সোবিয়েতের পক্ষে জয়ধ্বনি তুলেছিল আলেক্সিই সবার আগে। কিন্তু তারপরই ঘটনার গতি চল্ল অন্য দিকে।

গ্রামে এক 'কমরেড' এসে উপস্থিত হল, তার নাম ইয়াকভ। গাঁয়ের পাদ্রীর ভাল বাড়ীটি জবরদখল ক'রে পাদ্রী আর তার স্ত্রীকে সে পাঠিয়ে দিল গোসলখানায়—তাদের সেখানে থাকতে হবে। মীটিং ডেকে জিনিষটা বোঝানো হ'ল এইভাবে ঃ "জনসাধারণের পক্ষে ধর্ম হচ্ছে আফিংয়ের মতো। যে লোক গির্জাটির্জা বন্ধ ক'রে দেওয়ার বিপক্ষে, সে সোবিয়েতেরও বিপক্ষে।" ব্যস, আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তখুনি ভোট নেওয়া হ'ল—তারপর গির্জার দরজায় একেবারে তালাবন্ধ। এই কর্ম সাঙ্গ হলে সে গেল চাষীদের দু ভাগ করতে—যারা দিনমজুর কিংবা যাদের ঘোড়া নেই—এরকম চাষী মোট প্রায় জনা চল্লিশেক হবে—গ্রামের সমস্ত লোক থেকে তাদের আলাদা করে তৈরী হল 'গরীব চাষী কমিটি।' কমিটির সভ্যেরা জমা হ'ল পাদ্রীর বাড়ীতে—সেখানে ঝাঁঝালো সুরে বক্তৃতা দিয়ে বল্ল ইয়াকভ্ ঃ

"রুশিয়ার 'মুঝিকরা' সব মূর্খ পশু। হাজার বছর ধ'রে গোবরগাদায় জীবন কাটিয়ে ওদের মনে এখন জেগে আছে শুধু একটানা রাগ আর লোভ, ব্যস আর কিছুই নেই। মুঝিককে আমরা বিশ্বাস করিনে, কোনোদিন করবও না। যতদিন আমাদের সঙ্গে চলে কিছু বলব না, কিন্তু বলার দিনও আসবে শীগ্গিরই। গ্রামের সর্বহারা শ্রেণী হলেন আপনারা—রাষ্ট্রশক্তি আপনাদেরই মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরতে হবে, আমাদের সাহায্য করতে হবে যাতে আমরা মুঝিককে ঠাণ্ডা রাখতে পারি।"

ইয়াকভের কথা শুনে গ্রামের সবাই ভয়ে তটস্থ, ওর ঐ কমিটির মেম্বাররা পর্যন্ত সবাই। গ্রামের মধ্যে কোনো কথা চাপা থাকে না—তাই বাড়ী বাড়ী হরদম ফিসফাস চল্ল ঃ

"উনি ও কথা বল্লেন কেন? আমাদের অমনি পশু বল্লেই হ'ল! আমরা রুশ দেশের মানুষ, নিজের দেশে বাস করছি, আর এখন আমাদের কিনা বিশ্বাস

করা যাবে না? সবাইকে ঠাণ্ডা করে দেবে? কেন? ঠাণ্ডা করতে হয় আলেক্সি ক্লাসিলিনিকভকে কর—সে একটা ডাকাত। ......কিংবা ঐ যে কন্দ্রাতেংকভ আর নিচিপরভ—লোকের রক্ত শুষে শুষে শেষ করল—ওদের ঠাণ্ডা কর।......কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা করবে কেন? খেটে খেটে মরছি, সেইজন্যে? না, না, এ ঠিক নয়, নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে......।" আবার আরও কেউ কেউ বল্লঃ "ওরে বাবা, এরি নাম সোবিয়েত রাজত্ব!"

ইয়াকভ চান করে না, দাড়িও কামায় না, কাণাভাঙা একটা টুপি মাথায় দিয়ে জরাজীর্ণ ফৌজী গ্রেটকোট চড়িয়ে বার হয়। কিন্তু বুট জোড়া বেশ খাসা। লোকে বলে ওর ঐ নোংরা গ্রেটকোটের তলে পোষাকও নাকি খাসা। ও যখন পথে বার হয়—কে জানে কোন্ সন্দেহজনক ব্যাপারে—ঘরে ঘরে সবাই জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে, কি হয় কি হয় ভেবে চাষীরা সব মহা-উদ্বেগে মাথা নাড়ে।

মার্চ মাস। গাড়িতে গাড়িতে গোবর চাপিয়ে মাঠে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছে সবাই। এমন সময় ইয়াকভ এক মীটিং ডাকল। বিপ্লববিরোধী আচরণের নানান গালাগাল দিয়ে তারপর দাবী করল যে, যত ঘোড়া আছে তার হিসাব নিয়ে বাড়তি ঘোড়া সব জবরদখল করতে হবে—জমিদারের জমিতে যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থাও এখুনি করতে হবে। ...নির্ঘিন্নে শয়তানটা, বেটা আমাদের গোবর নিতে দেবে না, বসন্তকালের জমি-চাষেও বিলম্ব ঘটাবে, মনে মনে ভাবল চাষীরা।..

কিছুদিন পরে গ্রামে এক খাদ্য-সংগ্রহ বাহিনী এসে উপস্থিত হল। কার কার ঘরে কত পরিমাণ বাড়তি শস্য আছে তার এমন এক ফর্দ দাখিল করল ইয়াকভ (সে কথা কারও জানতে বাকি রইল না) সে বাহিনীর লোকেরা পর্যন্ত অবাক। সঙ্গে সাক্ষী নিয়ে এ খামার ও খামার ক'রে চষে বেড়ায় ইয়াকভ নিজে, প্রতি খামারের দরজায় খড়ি পেতে লিখে দেয় সেখান থেকে কি পরিমাণ শস্য দখল করতে হবে।

দেখে খামারের মালিক তো হাঁ; "ওরে বাবা, আমার সারা জীবনেও তো এত ফসল পাইনি কখনো," বলে চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগিয়ে দেয়, জামার হাতা ঘষে খড়ির দাগ তুলে ফেলতে চেষ্টা করে। "মাটির নীচে ওর ভাঁড়ার ঘরে খুঁজে দেখুন," বাহিনীর লোকদের বলে ইয়াকভ। ওর সামনে ভগবানের দোহাই দিতে চাষী বেচারীর সাহস হয় না, শুধু চোখের জলে ভাসে, জামাটামা ছিঁড়ে চীৎকার করে, "ওখেনে কিচ্ছু নেই, যদি থাকে তো কি বলেছি!" তারপর ইয়াকভ আবার হুকুম দেয়—"ওর উনুন টুনুন ভেঙে ফেলুন, উনুনের নীচেই লুকানো আছে।"

ইয়াকভের কেরদানির ফলে গ্রাম একেবারে সাফ—বীজ গম পর্যন্ত চলে গেল বাহিনীর সঙ্গে। এই কাজ শেষ করে ইয়াকভ ধরল আলেক্সিকে, তাকে আলাদা নিয়ে এল কমিটি-বাড়ীতে। দরজা বন্ধ করে বসে (দরজার ওপর পেরেক দিয়ে আঁটা ছবি—সর্বোচ্চ সমর পরিষদের চেয়ারম্যানের ছবি) পাশে টেবিলের ওপর

রাখল রিভলবার। গোমড়ামুখো আলেক্সির দিকে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে তাকাতে তাকাতে বল্লঃ

“আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। শস্যটস্য আছে তোমার কাছে?”

“আমারে কাছে শস্য? আমি তো শরৎকালে চাষ করিনি, ফসলও কাটিনি।”

“তোমার ঘোড়াটোড়া সব কোথায় পাঠালে?”

“বন্ধুদের দিয়েছি, খামারের কাজে লাগবে।”

“তোমার টাকা-পয়সা লুকিয়েছ কোথায় বল দেখি?”

“টাকা? কিসের টাকা?”

“যা লুট করে এনেছ?”

আলেক্সি কিছুক্ষণ হেঁট হয়ে বসে থাকে—একেবারে ‘নট নড়ন চড়ন’—খালি ডান হাতের মুঠিটা খোলে আর বন্ধ করে, মনে হয় যেন ধরছে আর ছাড়ছে। বলেঃ

“এটা কি ভাল হচ্ছে? হ্যাঁ ট্যাক্স হলে অবিশ্যি বুঝতে পারি...কিন্তু তাই বলে একেবারে গলায় পা? গায়ের জামাটা পর্যন্ত খুলে নিতে চাও?

“দেখ, তোমাকে কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে!”

“আমি কি দেব না বলেছি? বল? যদি দিতেই হয় তো আর উপায় কি? বেশ তো, টাকা এনে দেব।”

বাড়ী ফিরে এসে এক লাফে একেবারে মেঝের তলে। থলে, বস্তা, বাণ্ডিল সব টেনে টেনে বাইরে আনল। জার আমলের মুদ্রা আর দন সরকারের মুদ্রা—এই ছিল একটা থলিতে। সেগুলো সব পকেটে ভরল, শার্টের বুকের তলেও কিছুটা লুকোল। কেরেন্সকি আমলের নোট বোঝাই আর একটা থলি—ও নোটের এখন কোনো দাম নেই—সে থলিটা মাত্রিয়োনাকে দিয়ে বল্লঃ

“এইটা কমিটিকে দিয়ে এসো। বলো যে এই আমাদের সর্বস্ব। যদি তোমার কথা বিশ্বাস না করে, মেঝে টেঝে খুঁড়ে ফেলতে চায়, কোনো আপত্তি কোরো না। ঘড়ি, চেন—ওগুলো সব কুয়োর মধ্যে ফেলে এসো। আর ছিটটিট যা আছে গাড়ীতে বোঝাই ক’রে ঘাস চাপা দিয়ে রাখবে। রাত্তির বেলা বুড়ো আফানাসির কাছ থেকে একটা ঘোড়া ধার করে এনো, গাড়ী নিয়ে চলে যেও দেমেন্তিয়েভের খামারে। আমি সেখানে অপেক্ষা করব।”

“যাবে কোথায় আলেক্সি?”

“বলতে পারছিনে। আমার ফিরতে একটু দেরিই হবে। কিন্তু ফিরে এলে দেখবে আমি একেবারে আর এক লোক।”

চোখ পর্যন্ত শাল মুড়ি দিয়ে, শালের নীচে টাকার থলিটা নিয়ে মাত্রিয়োনা চল্ল কমিটি-বাড়ী। উনুনের ধারে দাঁড়িয়েছিল কাতিয়া—দরজায় খিল লাগিয়ে তার দিকে ফিরল আলেক্সি। উত্তেজনায় ওর নাসারন্ধ্র তখন বিস্ফারিত, আর হিংস্নক উল্লাসে চোখ দুটি একেবারে পরিপূর্ণ।

“একাতেরিনা, বেশ গরম জামা-কাপড় পরে নাও...ফার কোট আর উলের

মোজা, বুঝলে। আণ্ডারওয়্যারও গরম কাপড়ের পোরো।...একটু জলদি কর, হাতে সময় খুব অল্প।..."

কাতিয়ার পানে চাইতে চাইতে ওর চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে উঠল, মনে হল যেন চোখের তারা থেকে আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়ছে। মুখটা একটু ফাঁক, তার ওপর সোনালি রংয়ের কড়া গোঁফ জোড়া আস্তে আস্তে কাঁপছে।

"আমি আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না," কাতিয়া জবাব দিল।

"এই তোমার জবাব? আর কিছু বলবে না?"

"আমি যাব না।"

আলেক্সি ওর কাছে ঘেঁষে এল। বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র তখন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

"তোমাকে এখানে একলা ছেড়ে যাচ্ছিনে, সে আশা ভুলে যাও।..তবে রে মাগী—খাইয়ে দাইয়ে তাজা করলাম কি আর একজনের কোলে তুলে দিয়ে যাবার জন্যে? সেটি হচ্ছে না।...কী আমার ননীর পুতুল রে...এদ্দিন একটু গায়েও হাত দিইনি, কিন্তু যেদিন হাত পা চেপে ধরব, সেদিন মজা টের পাবি, বুঝলি মাগী..."

লোহার মতো শক্ত হাত দিয়ে কাতিয়াকে চেপে ধরল আলেক্সি। কাতিয়া ওর গলার ওপর কনুয়ের ঠেলা দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দু লাফে ওকে বিছানার কাছে এনে ফেল্ল আলেক্সি। অপ্রত্যাশিত শক্তি নিয়ে যুঝল কাতিয়া—ঠিক বাণ মাছের মতো মুচড়ে মুচড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে আর চীৎকার হানেঃ "ওরে জানোয়ার, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না...।" লাফিয়ে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল কাতিয়া কিন্তু তখুনি আবার আলেক্সি চেপে ধরল। আলেক্সির গায়ে ফার কোট, ধস্তাধস্তি করতে করতে একেবারে ঘেমে উঠেছে—তার ওপর কোটের আস্তরের মধ্যে এক গাদা নোট পোরা আছে বলে চলাফেরায়ও অসুবিধা হচ্ছে। রাগে ও তখন অন্ধ, কাতিয়াকে ধরে দমাদ্দম মার কষাতে লাগল পাগলের মতো। মাথাটা কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখল কাতিয়া, দুর্দান্ত ঘৃণার আবেগে দাঁতে দাঁত ঘষে বারে বারে শুধু একটা কথাই উচ্চারণ করে চল্লঃ "মেরে ফেল্, ওরে পশু, মেরে ফেল্ আমাকে!"

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল, "দরজা খোলো" বলে মাত্রিয়োনা চীৎকার করছে। ঝট ক'রে বিছানার ধার থেকে সরে এসে নিজের মুখে হাত চাপা দিল আলেক্সি। আবার মাত্রিয়োনার কড়া নাড়ার শব্দ—এবার আরও জোরে। আলেক্সি দরজা খুলে দিতে মাত্রিয়োনা ভেতরে এল, এসেই বলে উঠল:

"আরে হাঁদারাম, পালাও, পালাও, শীগ্গির পালাও—ওরা যে এখানে আসছে!"

আগুনের ভাঁটার মতো চোখ মেলে ওর দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে রইল

আলেক্সি, তারপর কথাটার মানে বুঝল। বুঝবামাত্র দেখা গেল মুখে বুদ্ধির চিহ্ন ফিরে এসেছে। থলে আর বাণ্ডিলগুলো উঠিয়ে নিয়ে ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ওর ঘোড়ার মধ্যে তখন একটিই কাছে আছে—তার ওপর চড়ে বাড়ীর পেছন দিকের বেড়াটেড়া ডিঙ্গিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল নদীর ধার পর্যন্ত। তারপর ওপারে পৌঁছবামাত্র উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখতে দেখতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিছানার ওপর পড়ে আছে কাতিয়া, কাপড়চোপড় একেবারে শতছিন্ন। কিছুক্ষণ পরে ট্রাংক থেকে একটা বডিস্ আর স্কার্ফ বের করে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল মাত্রিয়োনা।

“নাও পরে নাও,” মাত্রিয়োনা বল্ল। “পরে চলে যাও এখান থেকে। তোমাকে দেখলে লজ্জা করে।”

ইয়াকভ আর তার সাক্ষীরা মিলে আলেক্সির বাড়ীর চিলেকোঠা থেকে চোর-কুঠরি পর্যন্ত সব খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, কিন্তু গাড়ীর মধ্যে লুকানো মালগুলো আর দেখতে পেল না। রাত্রি বেলা একটা ঘোড়া জোগাড় ক'রে গাড়ী সহ খামার-বাড়ি পৌঁছাল মাত্রিয়োনা। আর অন্ধকার শীতার্ত কুটীরের মধ্যে জেগে বসে রইল কাতিয়া —কখন ভোর হবে সেই আশায়। একেবারে স্থির হয়ে বসে সবই তো ওকে ভেবে নিতে হবে। ভোর হলেই ও চলে যাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দু হাতে মাথা চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে কাতিয়া। তারপর দরজার ধারে কলসী থেকে আঁজলা ভরে জল খায়। মস্কোই যাবে, তা ছাড়া আর কোথায়?......কিন্তু পুরোনো বন্ধুদের ভেতর মস্কোতে কি আর কেউ আছে এখন? সবাই তো ছড়িয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।......টেবিলের ধারে বসে বসেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ যখন এক সময় ঘুম ভাঙল তখন দিন। মাত্রিয়োনা ফেরেনি তখনো। মাথার শালটা গুছিয়ে নিয়ে সামনের আয়নাটার দিকে চাইল কাতিয়া। কী ছিরিই হয়েছে!

কাতিয়া কমিটি বাড়ী চল্ল। ওখানে কেউ জাগেই না, খিড়কীর দরজায় বসে থাকতে হ'ল অনেকক্ষণ। শেষ কালে ইয়াকভ বেরুল, হাতে ময়লার বালতি। নোংরা বরফ-গাদার ওপর বালতির ময়লা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাতিয়াকে বল্ল:

“এখনি আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।......আসুন আমার সংগে......”

বাড়ীর ভেতর এসে কাতিয়াকে বসতে দিল। তারপর ডেস্কের টানার মধ্যে কি যেন হাতড়াল খানিকক্ষণ ধ'রে।

“আপনার স্বামী—(আপনি ওকে স্বামী বলেন না আর কিছু?) ওকে আমরা গুলী ক'রে মারব।”

“ও আমার স্বামী নয়, কোনো সম্পর্ক নেই ওর সংগে,” চট করে জবাব দিল কাতিয়া। “আমাকে শুধু মস্কো যাবার সুযোগ করে দিন, ব্যস আর কিছু চাইনে। আমি মস্কো যেতে চাই।”

"আমি মস্কো যেতে চাই," ভেঙিয়ে বল্ল ইয়াকভ। "আর আমি চাই যাতে আপনাকে গুলী খেয়ে মরতে না হয়।"

রাত পর্যন্ত ওর ঘরেই রইল কাতিয়া। নিজের কথা, আলেক্সির সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ সে কথা—সব খুলে বল্ল। মাঝে মাঝে ইয়াকভ উঠে বাইরে যায়, অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে আবার ধপ ক'রে বসে পড়ে, সিগ্রেট ধরায়।

"শিক্ষা-বিভাগের 'পীপ্‌ল্‌স কমিসারিয়েট' থেকে নির্দেশ এসেছে যে, গ্রামে একটা স্কুল খুলতেই হবে," বল্ল ইয়াকভ। "ও কাজের পক্ষে আপনি বিশেষ উপযুক্ত না হলেও, আপনার চেয়ে ভাল যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন আপনাকেই লাগিয়ে দেখতে চাই আমরা।......আপনার আর একটা দায়িত্ব থাকবে, গ্রামে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর আমাকে জানিয়ে দেবেন। এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি পরে ঠিক করে ফেল্লেই হবে। কিন্তু সাবধান, এ বিষয়ে যদি কাউকে কিছু বলে দেন তো তার শাস্তি হবে খুব কঠোর। আর একটা পরামর্শ দিই—আপাতত মস্কোর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল, বুঝেছেন!"

এম্‌নি ধারা অপ্রত্যাশিতভাবেই কাতিয়া শিক্ষয়িত্রী হয়ে দাঁড়াল। স্কুলের পাশে ছোট্ট একটা কুটীর—সেটা ওর জন্যে। আগে যিনি শিক্ষক ছিলেন তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছিল, মারা গেছেন গত নভেম্বর মাসে। তারপর কিছুদিন পেৎলুরা বাহিনীর একটা ইউনিট ছিল স্কুল-বাড়ীতে—প্রথম ভাগ, এক্সারসাইজ খাতা, মায় দেওয়াল-ম্যাপ পর্যন্ত যা পেয়েছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারা সিগ্রেট পাকিয়েছে। কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করবে ভেবে না পেয়ে কাতিয়া ইয়াকভের কাছে গেল পরামর্শের জন্যে। কিন্তু ইয়াকভ তখন আর গ্রামে নেই—যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেছে জরুরী তার পেয়ে। বুড়ো আফনাসি ছাড়া কাউকে কিছু বলে যাওয়ারও সময় পায়নি। প্রভাব হারাবার ভয়ে বুড়ো আফানাসি আজকাল 'গরীব চাষী কমিটির' ওখানে খুব ঘোরাঘুরি করে—তাকে ডেকে ইয়াকভ বলে গিয়েছিলঃ

"আপনার কমরেডদের বলবেন, মুঝিকদের যেন মোটেই প্রশ্রয় না দেয়! আমি আবার আসব, এসে তদন্ত করব।......"

ইয়াকভের প্রস্থানের পর গ্রাম একেবারে ঠাণ্ডা। চাষীরা এসে কমিটি-বাড়ীর সিঁড়ির ওপর বসে, কমিটি মেম্বরদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলেঃ

"কমরেড্‌স, যা কাণ্ড বাধিয়েছে তোমরা, জবাবদিহি করবে কি ক'রে তাই ভাবি! ছোঃ ছোঃ......"

বেশ গোলমালে ফেঁসে গেছে সে কথা কমিটি মেম্বরেরা নিজেরাও বোঝে। গ্রামের বর্তমান শান্ত ভাবটা যে শুধু ওপর ওপর, তাও বোঝে। কিন্তু ইয়াকভও আর ফিরল না। এদিকে আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ্‌ সম্বন্ধে গুজব রটল যে, সে নাকি পাশের জেলায় একটা ডিট্যাচমেণ্ট গড়ে তুলে আতামান গ্রিগরিয়েভ-এর দলে যোগ দিয়েছে। ক'দিন যেতে না যেতেই গ্রামময় খালি গ্রিগরিয়েভের গল্প—সে নাকি এক ফার্মান জারি করেছে—সোবিয়েত শহরগুলো সব ধ্বংস করবে

বলে যুদ্ধযাত্রা করেছে। গ্রামের সবাই ভাবতে লাগল, এবার বোধ হয় আর এক দফা পরিবর্তন শুরু হবে।

গ্রাম-সোবিয়েত থেকে কাতিয়াকে ভরসা দিল, তারা স্কুল ঘরের অগ্নিকুণ্ড-গুলো মেরামত করিয়ে দেবে, কাঁচও লাগিয়ে দেবে জানালায়। মেঝে টেঝে জানালা টানালা সব ও নিজেই ধুয়ে মুছে সাফ করল, ঠ্যাঙ-ভাঙা ডেস্কগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিল। কাতিয়া আবার বড্ড ইমানদার, সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে একা বসে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে, স্কুলের বাচ্চাদের কী ঠকানোই না ঠকাতে যাচ্ছে ভেবে লজ্জায় মরে যায়। বই নেই, খাতা নেই—ছেলেদের শেখাবে কি? নিজেকেই যখন অসত্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে হয় তখন ছেলেদের ও কী সত্য শেখাবে? স্কুলের ধারে প্রথম যেদিন ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কলরব শোনা গেল সেদিন মনের ওপর কষে লাগাম টানতে হ'ল কাতিয়াকে। চুল আঁচড়ে শক্ত ক'রে এলো খোঁপা বাঁধল, ঘষে ঘষে হাত দুটোকে একেবারে ঝকঝকে করে তুল্ল, তারপর স্কুলের দরজা খুলে দিল। ছোট ছোট-বোঁচা বোঁচা নাক উঁচিয়ে ছেলেমেয়েরা ওর দিকে চেয়ে আছে—মৃদু হাসি হেসে তাদের সম্ভাষণ জানালঃ

“এসো এসো তোমরা, শুভদিন!”

“শুভদিন, একাতেরিনা দিদিমণি,” বলে ওরা সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। এমন নির্মল, এত মধুর আর আনন্দময় তাদের স্বর—কাতিয়া ভাবল হৃদয়টা বুঝি হঠাৎ আবার ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। ওদের ডেস্কে বসিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বসল শিক্ষকের আসনে, তারপর তর্জনী তুলে ধরে বল্লঃ

“দেখ! বই, খাতা, পেন্সিল টেন্সিল তো এখন নেই আমাদের। যতদিন ও সব না পাওয়া যায় ততদিন আমি তোমাদের সব কথা মুখে মুখেই বলব—কোনোখানে যদি বুঝতে না পার তাহলে আমাকে শুধিয়ে নিও, বুঝলে। ... আজকে আমরা রুরিক, সিনিয়াস আর ক্রুভর-এর গল্প শুরু করি।......”

কাতিয়ার ঘরকন্নার আয়োজন খুবই সামান্য। আলেক্সির বাড়ী থেকে ও কিছু নিতে চায় না; তাছাড়া মাত্রিয়োনা আজকাল যে রকম গোমড়া মুখ ক'রে থাকে তাতে তার সামনে যেতেও ইচ্ছে করে না। কাতিয়ার গেরস্থালির মধ্যে দরজার কাছে একটা ঝাঁটা, তাকের ওপর দুটো মাটির হাঁড়ি, আর দাওয়ার কাছে একটা পুরোনো কাঠের বালতি, তাতে জল—ব্যস। দুটো চেরী গাছ, একটা আপেল গাছ, আর গোটাকয়েক টেঁপারির ঝোপ—এই নিয়ে ওয়াটলের বেড়া-ঘেরা এতটুকু একটুখানি বাগানও আছে—বাগানটুকুই ওর একমাত্র সান্ত্বনা। বাগান পার হলে তারপরই মাঠ।

চেরীগাছের শাখায় শাখায় ফুল ধরল। কাতিয়ার মনে হ'ল সতের বছর বয়স যেন আবার ফিরে এসেছে।

সেই চিনিওয়ালার লাইব্রেরি থেকে সংগৃহীত ফরাসী নভেলগুলো ও যখন পড়ে, কিংবা স্কুলের পড়াটড়া দেখে নেয়—সবই ঐ বাগানে বসে। ওখানে বসে প্রায়ই ওর পারীর কথা মনে পড়ে—বহু বছর আগেকার অস্পষ্ট স্মৃতিকথা।

সে-ই ১৯১৪ সালে ও থাকত পারীর শহরতলীতেঃ সংকীর্ণ, নির্জন রাস্তার ধারে ওপর-তলার ফ্ল্যাট; পথের ওপর ঝুলে আছে বারান্দাটা; দূরে একটা ছোট্ট বাড়ীর ছাত দেখা যায়—সে বাড়ীতে একদা বাল্‌জাক বাস করে গেছেন।......বাল্‌জাকের পড়ার ঘরের জানালা কিন্তু রাস্তার দিকে নয়, বাগানের দিকে—বাগানগুলো থাকে থাকে নেমে গেছে সীন-এর কিনারা পর্যন্ত। তাঁর সময়ে এ এলাকা নিশ্চয় গ্রামের মধ্যেই পড়ত। রাস্তায় পাওনাদারদের আসতে দেখলে, তিনি চুপচাপ তাদের এড়িয়ে যেতেন—বাগানের পথ ধ'রে সোজা পেঁাছে যেতেন সীন-এর ধারে। কাতিয়ার সময়ে বাগানের মালিক ছিলেন কোনো ধনী আমেরিকান মহিলা; তাঁর বাগান থেকে বসন্তের কর্কশ কেকাধ্বনি তুলত ময়ূরের পাল, সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় গেলেই সে ধ্বনি কাতিয়ার কানে আসত। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর কাতিয়া তখন সবে পারীতে এসেছে—নিঃসঙ্গ শোকে মুহ্যমান হয়ে ভাবত এই বুঝি জীবনের শেষ ।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা ক্রমে ক্রমে কাতিয়ার ভক্ত হয়ে দাঁড়াল। রুশ ইতিহাস থেকে ও যখন গল্প বলে—সে গল্প ঠিক রূপকথার মতো—তখন ওরা খুব মন দিয়ে শোনে। অংক, নামতা, ডিক্টেশন—এগুলো অবশ্য ছাত্র-ছাত্রী আর দিদিমণি উভয়ের পক্ষেই বেশ শক্ত, তবু সবাই মিলে চেষ্টা ক'রে তারও কিনারা বার করে। আলেক্সি কাতিয়াকে কি রকম খুন করতে গিয়েছিল সে কথা তখন সবাই শুনেছে, কাজেই গ্রামের মধ্যে ওর জনপ্রিয়তা বেড়েছে আগের চেয়ে। মেয়েরা ওকে অনেক জিনিষ দিয়ে যায়—কেউ দুধ দেয়, কেউ ডিম, কেউ রুটি—ওতেই ওর খাওয়াদাওয়ার কাজ চলে যায়।

একটা বুড়ো, শ্যাওলা-পড়া আপেল গাছের তলে বসে কাতিয়া স্কুলের খাতা দেখছে। ওয়াট্‌লের নীচু বেড়াটা ঐ আপেল গাছের মতোই জরাজীর্ণ, নড়বড়ে। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলে অনেকক্ষণ ধ'রে নাকে কাঁদছে।

"আর কক্ষনো অমন করব না, কাতিয়া মাসী!"

"ইভান গাভ্‌রিকভ, তোমার ওপর আমি ভয়ংকর রাগ করেছি। পুরো দুটি দিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।"

নির্দোষীর মতো নীল চোখ হলে কি হবে, ইভান গাভ্‌রিকভ একটি পাক্কা শয়তান। পড়ার সময় ছোট ছোট মেয়েদের বেণী ধ'রে টানবে, আর তারপর বকুনি দিলেই অম্‌নি ধপ করে বেঞ্চির নীচে তলিয়ে যাবে—যেন ঘুমিয়েই পড়েছে। ওর দুষ্টুমির আর অন্ত নেই।

"উঁহু, গাভরিকভ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার একটুও দুঃখু হয়নি। আর কিছু করবার পাচ্ছ না তাই এখানে এসেছ নইলে......"

" না না আমি আর কখনো করব না, সত্যি বলছি, সত্যি......"

রাস্তা থেকে কে যেন ভেতরে এল। মাত্রিয়োনার গলা শোনা গেল, কাতিয়াকে ডাকছে।

ও আবার কি চায়? তাড়াতাড়ি গাভরিকভকে মাফটাফ করে দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল কাতিয়া। স্থির বিদ্বেষের দৃষ্টিতে মাত্রিয়োনা ওকে সম্ভাষণ জানাল।

"শুনেছ খবর? আলেক্সি আসছে, কাছেই এসে গেছে......। দেখ কাতেরিনা, আবার সেই আগের গণ্ডগোল হয় তা আমি চাইনে—তুমি তো আমাদের লোক নও।...তোমাকে পেলে ও খুনই করে ফেলবে। ও তো জানোয়ার......কত মানুষকে কেটেছে জান? ......সব তোমার দোষ, সব।......এক্ষুনি একজন খবর দিল, আলেক্সি আসছে, একেবারে মেশিনগানের গাড়ী সঙ্গে নিয়ে। তুমি এখান থেকে চলে যাও কাতেরিনা। আমি তোমাকে গাড়ী-ঘোড়া জোগাড় করে দিচ্ছি টাকা-পয়সাও দেব......"

খার্কভে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এন্তার ভাববার অবসর পেয়েছিল রশ্‌চিন। প্রজ্জ্বলিত সীমারেখা অতিক্রম ক'রে ও এখন অন্য পারে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু এই নতুন দুনিয়ার বাইরেটা তো মোটেই আকর্ষণীয় নয়ঃ হাসপাতালের ওয়ার্ডটা ঠান্ডা, গরম করার কোনো ব্যবস্থা নেই; জানলার সার্শির ওপারে ভিজে ভিজে বরফ পড়ছে; অখাদ্য খাবার, জলের মতো পাতলা মেটে মেটে ঝোল, তাতে শুঁটকি মাছের গন্ধ; আর রোগীদের নীরস কথাবার্তা, খালি খাবার আর তামাক আর টেম্পারেচার আর ডাক্তারের গল্প। অজানা ভবিষ্যতের দিকে রুশিয়া এগিয়ে চলেছে, অন্তহীন রক্তাক্ত সংগ্রাম আর আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনার পর ঘটনা ঘটছে—কিন্তু এসব সম্বন্ধে একটি কথাও কেউ বলে না। ময়লা ফ্ল্যানেলের ড্রেসিং গাউন পরে মুণ্ডিত মস্তকে যারা আজ আহত বা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তারাই একদিন এই সমস্ত ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন তারা দিনের পর দিন শুধু ঘুমোয়, নয়তো হাতে-বানানো ঘুঁটি দিয়ে বিছানায় বসে ড্রাফ্‌ট্ খেলে আর মাঝে মাঝে হয়তো একঘেয়ে সুরে গুণ গুণ ক'রে একটা তাল ধরে—ব্যস।

ভাদিম ঠিক একঘরে নয়, তবে ওর সঙ্গে কেউ ভাব করতেও আসেনি। ভাদিমেরও তাতেই সুবিধা। উপন্যাসের অতি রোমাঞ্চকর অধ্যায় থেকে পাতা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অনেক স্মৃতির গ্রন্থি ওর মন থেকে ছিঁড়ে গেছে, ভাল করে ভেবে দেখা হয়নি কিংবা মীমাংসা করা হয়নি এমন অনেক কথাই মনের মধ্যে জমে উঠেছে—তাই নিজের মনের সঙ্গেই ও এখন বোঝাবুঝি করতে চায়। বিনা দ্বিধায় ও স্বীকার করে নিয়েছে নতুন দুনিয়াটাকে, কারণ যা ঘটছে তার সঙ্গে ওর নিজের দেশের ভাগ্যই তো বিজড়িত। এবার ওর সময় হয়েছে—সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখবে, বেশ ভাল ক'রে বুঝে নেবে।

একদিন কখানা মস্কোর কাগজ এনে দিলেন বড় ডাক্তার। আগে এ সব কাগজ দেখলেই ও বিদ্রূপ ক'রে উঠত, আগে থাকতেই বিদ্বেষ প্রকাশ করত. কিন্তু এবার কাগজ পড়ল একেবারে নতুন দৃষ্টি দিয়ে।......রুশ বিপ্লব এগিয়ে

চলেছে—হাঙ্গেরি, জার্মানি আর ইতালিতে ছড়িয়ে পড়ছে। বে-পরোয়া আশা আর ভরসার সুরে কাগজগুলো একেবারে ভরপুর। আভ্যন্তরীন বিরোধে শতধা-বিচ্ছিন্ন যুদ্ধদীর্ণ রুশিয়া—প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের মাতব্বরেরা যাকে আগে থাকতেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন—সেই রুশিয়াই আজ বিশ্বরাজনীতির হাল ধরতে চলেছে। রুশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তিকে আর উপেক্ষা করা চলবে না।

হাসপাতালের সঙ্গীদের মনে ও যে গদ্যময় প্রশান্তি লক্ষ্য করেছিল এবার তার কারণ বুঝতে পারল—কী কর্তব্য পূর্ণ হয়েছে তা যে ওরা জানে, সে কর্তব্য পালনের জন্যে যে যার দায়িত্ব পূর্ণ করে এসেছে তাও জানে।......ধীর, স্থির, গাবদাগোবদা চালচলন ওদের চিরকালই, চিরকালই ওরা ধ্যান করতে ভালবাসে ঃ পাঁচ পাঁচটা শতাব্দী কেটে গেল, ঝড় ঝাপটা তো বড় কম হল না—কিন্তু ওদের প্রশান্তি তবু টিঁকে আছে। অদ্ভুত, বৈশিষ্টময় ইতিহাস রুশ জাতির আর রুশ রাষ্ট্রের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিরে ফিরে এসেছে কত বড় বড় কল্পনা, ন্যায়নিষ্ঠ জীবনের কত ধ্যানধারণা। সে কল্পনার আকৃতি তখনো রূপ পায়নি, কিন্তু তার মহত্ত্ব একেবারে পৃথিবীব্যাপী। দুঃসাহসী কত তত্ত্ব, যা কেউ কোনো দিন উপস্থিতও করেনি, তাই আজ কাজের মধ্যে রূপ পাচ্ছে। বাকি ইয়োরোপ আজ বিচলিত। ভয়ে রাগে তারা এই প্রাচ্য দৈত্যের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। এ দৈত্য দুর্বল অথচ শক্তিশালী, নিঃস্ব অথচ বিরাট সম্পদের অধিকারী—এ দৈত্যেরই অন্ধকার জঠর থেকেই বেরিয়ে এসেছে ধারণার পর ধারণা, তত্ত্বের পর তত্ত্ব। সে সব ধারণা প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, ব্যাপ্তিতে বিশ্বজনীন।

যে-পথে কোনো দেশ কখনো পা দেয়নি, শেষ পর্যন্ত রুশিয়াই সে পথ বেছে নিল, আর তার প্রথম পদক্ষেপেই গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি উঠল সারা বিশ্বময়।......

এমনি ধারা ভাবনা চিন্তায় ভাদিমের মাথা একেবারে ভর্তি। ওদিকে জানালার বাইরে রাস্তায় মার্চের বরফ গলে গলে নোংরা স্রোত বয়; অসন্তুষ্ট সোবিয়েত কর্মচারী পথ দিয়ে হেঁটে চলে যায়—পায়ে পচ-ধরা বুট, মুখ গোমড়া, পিঠের ওপর বাজারের থলি আর কেরোসিনের টিন—আজকালকার অসংখ্য অফিসের মধ্যে কোনো একটাতে কাজ করতে চলেছে। কিন্তু চিন্তামগ্ন ভাদিম এ সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাছের ঝোল পেলে কোঁৎ করে গিলেই ফেলে—ঝোল কেমন হয়েছে, ওর মধ্যে মাছের চোখ কোত্থেকে এল, সে সব কথা খেয়ালেও আনে না। বর্তমানের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব যোগ দিতে হবে, তারই জন্যে ও অধৈর্য।

পেৎলুরাওলাদের তখন ইউক্রেন থেকে তাড়ানো হচ্ছে। অল্পদিন আগে একাতেরিনোস্লাভ দখল করেছে লালফৌজ। বেলাইয়া সারকভ-এ এঁটে বসেছিল পেৎলুরা, কিন্তু সেখান থেকেও ওকে হটানো হয়েছে। দলবলের ধ্বংসাবশেষ সঙ্গে নিয়ে পেৎলুরা এখন দেশের সীমানার ওপারে গালিসিয়াতে

পালিয়েছে। লালফৌজের অগ্রগতির চূড়ায় চূড়ায় বিরাট তরঙ্গের মতো জেগে উঠছে গেরিলা অভ্যুত্থান—সেই অভ্যুত্থানের ব্যাপ্তি এমনই যে না যায় তার পরিধি নির্ণয় করা, না যায় তার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। শক্তিশালী কুলাকদের বিরুদ্ধে জমি-প্রত্যাশী দরিদ্র কৃষক-শ্রেণীর তীব্র দ্বন্দ্ব হঠাৎ অভ্যুত্থানের আকারে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, এক একটা গ্রামে, নয়তো গোটা জেলাতেই লড়াই বেঁধে যায়। দুপক্ষই সৈন্য সংগ্রহ করে, পদাতিক ও অশ্বারোহী ডিট্যাচমেণ্ট গড়ে তোলে, রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। চারিদিকে ছদ্মবেশী, বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর—কেউ পেৎলুরার, কেউ দেনিকিনের, কেউ পোলিশ পক্ষের, কেউ বা আবার আরও রহস্যময় বা সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে। সোবিয়েৎ রাজের ক্ষমতা শহরগুলোর মধ্যে, আর প্রধান প্রধান রেল লাইনের গায়ে গায়ে; কিন্তু সে ক্ষমতার সীমানার বাইরে যেখানে সাঁজোয়া ট্রেণের গোলার পাল্লা শেষ হয়ে যায়, সেখানে রেল লাইনের দু পাশেই যুদ্ধ চলে অনবরত।

দীর্ঘপ্রত্যাশিত নিয়োগপত্র শেষকালে পৌঁছাল, একটা সামরিক ছাত্র ব্রিগেডের সেনানীমণ্ডলীতে কাজ পেল রুশ্‌চিন। চুগাই সে ব্রিগেডের কমিসার। মার্চ মাসে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে লাঠি হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই কিয়েভ-মুখো রওনা হল ভাদিম, সেখানে ওর ইউনিটে যোগ দেবে।

আতামান গ্রিগরিয়েভেরই সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে ছিল জেলেনির দলটা, কিন্তু তারা আলাদা হয়ে একেবারে কিয়েভ পর্যন্ত ধাওয়া করল। শত শত মেশিন-গানের গাড়ী, তার ওপর চড়ে দলটা ছুটে চলে—চলার পথে গ্রাম সোবিয়েত-গুলোকে ভেঙে তছনছ করে দেয়, কমিউনিস্টদের খুঁজে খুঁজে সাবাড় করে। জেলেনির পথের পেছনে অসংখ্য নরনারীর মৃতদেহ—কারও
চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে, কাউকে ডাণ্ডার ওপর শূলে
কোথাও 'গরীব চাষী কমিটি'র সভ্যদের গোলাঘরের মধ্যেই পুড়িয়ে মেরেছে, কোথাও বা দরজার সঙ্গে ইহুদীদের পেরেক মেরে গেঁথে দিয়েছে, পেট কেটে দু ফালা ক'রে তার মধ্যে বেড়াল পুরে সেলাই ক'রে দিয়েছে। জেলেনির এই দলটাকে নিকাশ করার জন্যে 'যুদ্ধ সংক্রান্ত পিপল্‌স্‌ কমিসার' অফিসের সদর দপ্তরে পরিকল্পনা তৈরী হল—পরিকল্পনা রচনায় রশ্‌চিনও যোগ দিল। ওদের হাতে সৈন্য কিন্তু খুবই কম। ইউক্রেনের 'যুদ্ধ কমিসার' স্টীমারে ক'রে কিয়েভ থেকে রওনা হলেন, সরেজমিনে অভিযান নিয়ন্ত্রণ করবেন।

নীপার নদীতে তখনো জল কমেনি। স্বচ্ছ জল, মাঝে মাঝে মন্থর ঘূর্ণিপাক—তার মধ্যে স্টীমারের চাকার তাড়নায় ছপ ছপ শব্দ ওঠে। তীরে তীরে নাইটিঙ্গেল পাখী গান ধরেছে—স্টীমারের চাকার শব্দ, সামরিক ছাত্রদের গলার আওয়াজ সব কিছু ছাপিয়ে গানের সুর ভেসে আসে। সুগন্ধ, সরস পত্ররাজির কোমল হরিতে তীরভূমি আচ্ছন্ন—তার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে হলুদবরণ

পুসি উইলো'-র কুঁড়ি আর শাদা শাদা 'ফ্লাফ' আর 'ক্যাট্‌স-টেইল'। বন্যার জলের ওপর দিয়ে সূর্য উঠে স্টীমারের ডেকটাকে যেন পুড়িয়ে দিয়ে যায়। নদীপৃষ্ঠ ঝকমক করে, রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ভাদিম পেত্রোভিচ।

আগেও তা কত বসন্ত এসেছে, কিন্তু শিরায় শিরায় জীবনের উগ্র সুরা এমন মাতাল হয়ে ছোটেনি তো কোনো দিন।......আজ যদি ছুটল, তাও আবার এমন অসময়ে, এত অযাচিত মুহূর্তে।......অস্পষ্ট অশুভ আশঙ্কায় ওর মনটা ধোঁয়াটে হয়ে আছে।......নাঃ পকেটে সিগ্রেট হাতড়ে কোনো লাভ নেই; ধীর স্থির করিৎকর্মা মানুষের মতো ভ্রূ কুঁচকেও কোনো ফল হবে না—যে মায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে সে মায়া আর কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারবে না।..... ঐ তো সেই বাসন্তী মায়া—জল, আর দ্বীপ আর আধ-ডুবন্ত কুটিরের মাথার ওপর বাসন্তী কুহেলিকার উদীয়মান বাষ্প, প্রলম্বিত সূর্যের কিরণে কিরণে দীপ্তিমান। নদীর জল, আর সে জলে তরুচ্ছায়ার বর্ণহীন ঝিকিমিকি—তার ওপর রৌদ্রের মৃদু স্পর্শ লাগে; আজানু নিমজ্জিত গাভীপৃষ্ঠে রৌদ্র ছুঁয়ে যায়: তৃণাচ্ছন্ন উঁচু ঢিবিটা—একটা বলদ তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বসন্তের অলৌকিক সমারোহ দেখছে অবাক হয়ে—সে ঢিবির ওপরও সূর্য তার মৃদু স্পর্শ বিকীরণ করে। কিন্তু এ তো আশ্চর্য নয়, আসলে আশ্চর্য এই কথাটা যে, সেই একাতেরিনোস্লাভের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাতিয়ার ভাবনা ওর প্রায় মনেই আসেনি। অতীতের যে-জীবনের প্রতি ও এখন এত বিরূপ, সেই জীবনের সঙ্গে কাতিয়া যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই অতীতের সঙ্গে সঙ্গে কাতিয়াও যেন অন্তরালে প্রস্থান করেছে।...কাতিয়ার কথা ভাবলে ওর সেই পুরোনো রশ্‌চিনের কথা মনে পড়ে—সেই নাপিতের দোকানের আয়নায় একদিন যে রশ্‌চিনের মুখ দেখেছিল। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তখন তত বেশী বিতৃষ্ণা জাগেনি, ইচ্ছা হয়নি যে গুলি করে কিংবা অন্তত থুতু ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এখন হলে আর দ্বিধা করত না।

দু বছর আগেও কাতিয়ার প্রতি অনুভূতির আবেগে ভরপুর ছিল ওর সমস্ত দুনিয়া। প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত মরণাহত রশ্‌চিনের রেখাকুঞ্চিত ললাটের অন্তরালে যে দুনিয়া সেই দুনিয়া। কাতিয়ার ভালবাসা ওর তখন বড় প্রয়োজন; যেদিন একাতেরিনোস্লাভ হোটেলে এক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে দরজার হাতলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছিল ফাঁসির দড়ি জড়ানো যাবে কিনা, বিশেষ ক'রে সেই দিনই কাতিয়ার ভালবাসায় ওর একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল।......কিন্তু এখন, এখন কি আর প্রয়োজন নেই? এই কি সত্যি? রস্তভে কাতিয়ার প্রতি সেই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার পর আবার দ্বিতীয়বার কি একতেরিনোস্লাভেও বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে?

অপসৃয়মান তীরভূমি, সেদিকে চেয়ে চেয়ে সজোরে শ্বাস গ্রহণ করে রশ্‌চিন, সিক্ত মধুগন্ধী বাতাসে ফুসফুস পূর্ণ ক'রে নেয়। মনে আর গ্লানি নেই,

অনুতাপ নেই। না, একাতেরিনোস্লাভে ও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, শুধু অতীতের মুখোমুখি বসে হিসাবনিকাশ শেষ করেছে। ......আর তাছাড়া মারুসিয়া......নবজীবনের গান নিয়ে এসেছিল মারুসিয়া—সংক্ষিপ্ত কিন্তু অকপট আর আবেগময়—সে গানে বেজেছিল বসন্তের কলস্রোতের শব্দ, অপরিমেয় আনন্দের অনাস্বাদিত সুর।

তৃণাচ্ছন্ন ঢিবির ওপর থেকে বলদটা হাঁক ছাড়ে। তাই শুনে পাছ-গলুইয়ের ওখানে ছাত্রের দল হো হো ক'রে হেসে ওঠে, একজন আবার বলদের মতো আওয়াজ তোলে। পরম আনন্দে রশ্‌চিন চোখ বুজল। মৃত্যুতেই তো তাহলে আশার শেষ নয়। দীপ্তিমান মৃত্যু মারুসিয়ার। সে মৃত্যু যেন বিদায়-বাণী—যারা রইল তাদের ডাক দিয়ে বলে গেলঃ ভালবাসার ধন এ জীবন, দু হাতে সকল শক্তি দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর, আনন্দের রূপ দাও এ জীবনকে......

কাতিয়াকে খুঁজে বার করার চেষ্টা ছাড়েনি রশ্‌চিন। ওর অনুরোধে 'যুদ্ধ কমিসারিয়েট' থেকে একাতেরিনোস্লাভ আর খার্কভ জেলার কার্যকরী সমিতির কাছে চিঠি গেছে—তারা আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভের কোনো খবর জানে কিনা। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রশ্‌চিনের তখন আর কিছু করার উপায় ছিল না—গত ছ হপ্তার মধ্যে প্রতি দিনই আঠারো ঘণ্টা ক'রে কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। এবার স্টীমারে চলতে চলতে ডেকের ওপর এই যে কটা ঘণ্টা কাটাতে পারল, এই ওর প্রথম অবসর।

চুগাই আর যুদ্ধ কমিসার, দুজনে এসে দাঁড়ালেন। রোগা, রোদে-পোড়া চেহারা কমিসার সাহেবের। বেল্ট-আঁটা ক্যাম্বিসের কুর্তা গায়ে দিয়ে ঘোলাটে চোখে চান, মনে হয় যেন নেশা ক'রে এসেছেন। কিন্তু মদ উনি ছোঁনও না কখনো। আর মাতালদের ওপর ওঁর ভয়ংকর রাগ ঃ ওঁর ব্রিগেড কম্যাণ্ডার, বেশ খাসা লোক, সে একদিন এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে নিজের ঘরে খেতে বসেছে—দেখতে পেয়ে উনি তাকে গুলি করেই মারেন আর কি!

সামনে তীরভূমি একেবারে খাড়া, তার ওপর দিয়ে সাদা রং-করা একটা ঘণ্টাঘর মাথা জাগিয়েছে, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে কমিসার বল্লেনঃ

"ঐ যে ঐ আমার গ্রাম দেখা যাচ্ছে।...স্টীমারের ভোঁ শুনলেই আমার বুড়ী ঠানদি আমাকে ঘাটে পাঠিয়ে দিতেন—কুলোর ওপর ফুল, নাসপাতি আর বাদাম সাজিয়ে বিক্রী ক'রে আসতে হবে। উঃ কী হৈ-চৈ-ই তিনি করতে পারতেন।...... তা বাবা যত চেষ্টাই করুন—দোকানদার আর আমাকে বানাতে পারলেন না......"

"আমার ঠান্‌দি ছিলেন খাসা মানুষ", টেনে টেনে বল্ল চুগাই। "তীর্থে তীর্থে ঘুরতেন হরদম, আর আমি যেতাম সঙ্গে সঙ্গে। দশ বছর বয়স পর্যন্ত বুড়ীর সঙ্গেই কাটিয়েছিলাম, কাজ ছিল......ভিক্ষে করা......"

চুগাইয়ের কথায় কানও না দিয়ে কমিসার বলে চলেনঃ

"তারপর আমাকে লাগিয়ে দিল এক কামারের সঙ্গে। ঐ যে জায়গাটা দেখছেন, ঠিক ঐ ঘণ্টাঘরের নীচে, ঐখানে ছিল কামারশালাটা। আছে

বোধ হয় এখনো। কাঠকয়লা আর গ্যাসের গন্ধ আমার আজও ভাল লাগে। ওখানে রন্দা খেতে খেতে বিরক্তি ধরে গেল—চলে গেলাম কিয়েভ, ইঞ্জিন শেডে কাজ নিলাম, বুঝেছেন......সেখান থেকে আবার খার্কভ, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা......”

চুগাইও কমিসারের কথায় কান দেয় না, বলে চলেঃ

“গির্জার দরজায় দাঁড়িয়ে সুর ক'রে ক'রে ভিক্ষে চাইতে আমি ছিলাম একের নম্বর ওস্তাদ। গায়ের কোথাও একটু খামচে টামচে সেই রক্ত কপালে মাখতাম, তারপর চোখ উল্টে গান জুড়ে দিতাম—ধর্মের গান।......শেষকালে আধলা আর পয়সা নিয়ে যা লড়াই লাগাতাম ঠান্দির সঙ্গে.... .”

হঠাৎ থেমে পড়ল। “লড়তাম, ঠান্দি আর আমি......” অন্যমনস্কভাবে এই কটা কথার পুনরাবৃত্তি করতে করতে ও তীরের দিকে চেয়ে রইল। তীরভূমি এখানে অন্তরীপের মতো ছুঁচলো, অন্তরীপ ঘিরে বয়ে গেছে নীপার নদী—একেবারে সেই জলে-ডোবা মাঠ পর্যন্ত। চুগাইয়ের বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ কুঁচকে এল, ফিতেওলা জাহাজী টুপিটা ঝপ ক'রে মাথায় বসিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল ক্যাপ্টেনের সাঁকো অভিমুখে।

শুঁটকো, বুড়ো মানুষ ক্যাপ্টেন সাহেব। গোঁফজোড়া নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। “ও দাদু!” বলে চীৎকার করে ক্যাপ্টেনকে ডাক দিল চুগাই। “জলে-ডোবা ডাঙ্গার বাঁ দিকে জাহাজটা ঘুরিয়ে নিয়ে যান তো!”

“সে পারব না কমরেড, ওদিকে যে জল কম। বড় খাতেই জাহাজ রাখতে হবে।......”

“বড় খাতে রাখতে হবে না!” বলে রিভলভারের খাপটা চাপড়াল চুগাই। “ঘোরান জাহাজ!”

অন্তরীপ বরাবর ঘুরল জাহাজটা। ঘুরতে ঘুরতে দৃষ্টিপথে এগিয়ে এল প্রকান্ড একটা গ্রাম। গ্রামের গীর্জার সুউচ্চ ঘণ্টাঘর,, তারপর কয়েকটা উইন্ডমিল, চুণকাম করা কতকগুলি কুটির, কচি সবুজ পাতাঘেরা নীচু নীচু বাগবাগিচা -একে একে নজরে পড়ল।

“ঐ দিকে দেখুন, ঐ যে অন্য সব ঘর থেকে একটু তফাতে--সামান্য একটুখানি দেখা যাচ্ছে—ঐ ঘরেই আমার জন্ম হয়েছিল” কমিসার রশ্‌চিনকে বল্লেন।

এদিকে আগ্রহভরে ডাক দিয়ে উঠল চুগাই, “ওহে, ও কত্তা, জাহাজের হাল বাঁ পাশে ঘোরাও! জল্‌দি করো!”

নদীর পাড়ে কতকগুলো মালটানা গাড়ী। জলের ধারে অসংখ্য নৌকা বাঁধা—ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে লোকে নৌকার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। একখানা বোট দাঁড় টেনে চলেছে দ্রুতগতিতে। সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে ডেকে নেমে এল চুগাই, ওভারকোট বাতাসে উড়ছে। ঠিক তখনই স্টীমারের ওপর গুলীবর্ষণ শুরু হল—নদীতীর থেকে, বোটের ওপর থেকে গুলি ছুঁড়ছে। প্রত্যুত্তরে গর্জে উঠল স্টীমারের মেশিনগান। একটা বোটের লোকেরা সব জলে

ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। নদীর ধারে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল—দলে দলে লোক সব গাড়ীর ওপর চড়ে খাড়া পাড় বেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে. চারদিক ধুলোয় একেবারে ধুলোকার। বিপদের সংকেত বাজছে গির্জার ঘণ্টায়।

গুলিবর্ষণ, তারপর পলায়ন—কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। নদীতীর একেবারে জনশূন্য। চুগাইয়ের বড় বড় চোখ দুটো আনন্দে ঝকঝক করছে। সিঁড়ি বেয়ে ও আবার ওপরে উঠে এল।

এ জেলোনির দল। ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা তাহলে এখানে পৌঁছতে পেরেছিল! ঘেরাও পরিকল্পনার ফলটা দেখলেন তো, ভাদিম পেত্রোভিচ! আচ্ছা কমিসার সাহেব, আমরা তাহলে নেমেই পড়ি, কি বলেন?"

চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে জেলোনির দলটা ঠিক নেকড়ের পালের মতো একবার এদিকে ছোটে, আর একবার ওদিকে ছোটে। শেষ পর্যন্ত ওদের রেল-লাইনের ধারে কোণঠাসা করা হল, তারপর গুলি চল্ল সাঁজোয়া ট্রেন থেকে। পালাবার আশায় ওরা গাড়ী ছুটিয়ে হুড়মুড় করে একটা বাদাম বাগিচার মধ্যে ঢুকেছিল—সেখানেই ওদের শেষ। ওদের বিপদে ফেলবার জন্যে আশেপাশের মাঠে আগে থেকেই খানা খুঁড়ে রাখা হয়েছিল; চার ঘোড়ার গাড়ীগুলো সবেগে বাগিচা থেকে ছুটে আসামাত্র ঘোড়াগুলো পড়ল খানার মধ্যে, গাড়ীটাড়ী সব উল্টেপাল্টে ভেঙেচুরে একাকার। ডাকাতগুলো তখন ঝোপের মধ্যে ঝাঁপ দিল-কিন্তু সেখানে শুধু মৃত্যু—যেন অপেক্ষা করে বসে আছে। ওরা কেউ প্রাণভিক্ষাও চায়নি। গত বছরের কতকগুলো শুকনো ডালপালা, তার নীচে আতামান জেলোনিকে খুঁজে পাওয়া গেল। পা ধরে টেনে বার করে এনে ওকে দেখে সামরিক ছাত্ররা সব অবাক। ওরা ভেবেছিল জেলোনির দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা হবে, দেখলে তাক লেগে যাবে, তা না এ এক বেঁটেখাটো রোগাপটকা সামান্য মানুষ, তার ওপর মুখে আবার বসন্তর দাগ। তবে ওর ছোট ছোট বিবর্ণ চোখ দুটো একেবারে ধূর্তের মতো, প্রতিহিংসার তীব্রতায় পরিপূর্ণ—চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় যে লোকটা আসল নেকড়ের জাত। ওরা ওর হাত পা কষে বাঁধল—জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবে কিয়েভ শহরে।

ওরা দলের মধ্যে একটা ডিট্যাচমেণ্ট কিন্তু ঘেরাও ভেঙে বেরুতে পেরেছিল—তারা পূব দিকে পালাল। যুদ্ধ কমিসারের হুকুমে তিনশো ঘোড়সোয়ারের এক রেজিমেণ্ট ধাওয়া করল ওদের পেছনে। চুগাই আর রশচিন সে রেজিমেণ্টের পরিচালক। খুব সতর্কভাবে একটানা ছুটতে হয় ডাকাতদের পিছু পিছু। ওরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘোড়া বদলে নেয়, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী লালফৌজের সে সুযোগ নেই। চলতে চলতে একটা গ্রামে খবর পাওয়া গেল যে, ডাকাতরা আগের দিন এই গ্রামে এসে ঘোড়া টোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে। গ্রাম থেকে আরও যা পারে লুটেপুটে নিয়ে ওরা নাকি ভ্লাদিমির্স্কোয়ে গ্রাম লক্ষ্য ক'রে রওনা দিয়েছে।

কুয়োর ধারে ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াবার সময় চাষীরা চুগাই আর রশচিনকে ঘিরে ধরে বল্লঃ "ওদের একেবারে সাবাড় করা চাই কমরেড্‌স—

ওদের এই লড়াই টড়াইয়ে আমাদের ঘেন্না ধরে গেছে। ও দলের আতামানকে খুব চিনি, সে ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গাঁয়ের লোক—নাম হ'ল আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ। লোকটা আগে ভালই ছিল—হ্যাঁ তা বলতে হবে—কিন্তু এখন একেবারে পাগল হয়ে গেছে, শয়তানীর সীমা নেই......"

এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে রশ্‌চিন আবার আলেক্সির সন্ধান পেয়ে গেল—গত দু হপ্তা ধরে ও যে আলেক্সির পেছনেই ধাওয়া করে আসছে তা কে জানত! আর আলেক্সির খোঁজ মানেই কাতিয়ারও খোঁজ। ওর মনটা থর থর ক'রে উঠল। করবারই কথা—আর একদিন পথ চলার পরই তো কাতিয়ার ওখানে পৌঁছাবে। কী দশায় দেখবে তাকে? অত্যাচারে অত্যাচারে হয়তো তার মুখের চেহারাই বদলে গেছে, হয়তো চেনাই দায়—তার শুভ্র-কেশ মাথাটি নীরবে বুকের ওপর চেপে ধরা ছাড়া আর কিছুই হয়তো করার থাকবে না! শুভ্র কেশ......শুভ্র বেশ......। "আর ভাবনা নেই, এবার তুমি বিশ্রাম কর কাতিয়া! বাঁচব আমরা, নিশ্চয় বাঁচব।" কিংবা......না তা হতেই পারে না—শান্ত-শিষ্ট গৃহিণী হয়ে আলেক্সির ঘরে নির্বিরোধে বাস করবে কাতিয়া, সে কথা ভাবাও যায় না!......... দিনের যাত্রার শেষে যেখানে গিয়ে ঘোড়াটা থামবে সেখানেই হয়তো কাতিয়ার সমাধি—হ্যাঁ, তারই সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী।......দুঃখ কষ্ট যাই থাক, কাতিয়ার পক্ষে তাই হয়তো সব চেয়ে ভালো।......মনের মধ্যে অক্ষত, অকলঙ্কিত থাকবে কাতিয়ার প্রতিমূর্তি......।

ধূলি-ধূসর রাজপথে রেজিমেণ্ট দ্রুত ধাবমান। জিনের ওপর বসে বসে দুলছে ভাদিম পেত্রোভিচ। তাপস মনের স্মৃতিপটে কাতিয়ার ছবিটা অস্পষ্ট, এলোমেলো হয়ে আসে। কিন্তু কাতিয়ার যে দশাই হোক, যেমন পাবে তেমনই তাকে গ্রহণ করবে—সে কথা জানে রশ্‌চিন।

ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামে আগুনে পোড়া ঘরবাড়ী থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে। জায়গায় জায়গায় চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে। সে রক্ত তখনো ছাইয়ের মধ্যে শুষে যায়নি—ছেলেপিলেরা এসে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে রক্ত দেখছে। কেঁদে কেঁদে মেয়েদের চোখ ফুলে গেছে, লুকিয়ে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছে। এমন সময় শহরের দু মুড়ো থেকে দু দলে ছড়িয়ে চুগাই আর রশচিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ক্রাসিলনিকভ তখন উধাও। কে বুঝি ওকে সাবধান করে দিয়েছিল, রেড সৈন্যরা গ্রামে ঢোকার মাত্র আধঘণ্টা আগে দলবল নিয়ে সরে পড়েছে। যাবার আগে 'গরীব চাষী কমিটির' সভ্যদের ওপর প্রতিহিংসা নিয়ে গেছে—তলোয়ারের ঘায়ে প্রথমে সতের জনকে কেটে ফেলেছে, তারপর শুধু মজা দেখবার জন্যে বুড়ো আফানাসিকেও নিকাশ করেছে। গ্রামের লোক সব রাগে অগ্নিশর্মা। লাল সওয়ারেরা তখন সবে পৌঁছেছে, ঘোড়াগুলো বেদম হয়ে কাঁপছে—কিন্তু গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক ছুটে এসে তাদের ঘিরে ধরল, চীৎকার করতে লাগল:

"যাও তোমরা ধর বেটাকে! কেটে ফেল আলেক্সিকে—ওর সঙ্গে বেশী সৈন্য

নেই, গুলিবারুদও বেশী নেই। বেশী দূর নয়, শালা শুয়ারের বাচ্চা কোথায় গেছে আমরা জানি। খালি হাতেই ওদের ধরতে পারবে।......"

"আপনারা আমাদের তাজা ঘোড়া দিতে পারবেন কি?" চুগাই জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ পারব। এ কাজের জন্যে আমরা ঘোড়া জোগাড় করে দেব।"

"কতগুলো?"

"গোটা পঞ্চাশেক হবে।......আপনাদের গুলো এখানে রেখে যান, পরে বদলে নেওয়া যাবে। উঃ লোকটা আমাদের একেবারে শেষ করে ছাড়ল, সত্যি বলছি।"

ঘোড়া ধরে জিন টিন পরাচ্ছে ওরা, সেই অবসরে ধীরে ধীরে মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেল রশ্চিন। এই লোকটি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায় বুঝতে পেরে মেয়েরাও কাছে এল।

"জার্মান যুদ্ধের সময় ক্রাসিলনিকভের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল," রশচিন বল্ল। "ওর ভাই বিবাহিত, কিন্তু ওর বোধ হয় বিয়ে হয়নি। হয়েছে নাকি?"

রশ্চিন কি উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করছে মেয়েরা তখনো বোঝেনি। সাগ্রহে সবাই জবাব দিয়ে উঠলঃ

"হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়েছে! হয়েছে!"

"না বিয়ে হয়নি! ওতো ওর বৌ নয়......"

"ও, হ্যাঁ, বিয়ে না, ওর সঙ্গে থাকত......"

"না, তখন থাকত না।......সেপাই কমরেড, শুনুন আমি বলছি।..... মাখনোর সঙ্গে তাসের বাজি জিতে ও মেয়েটাকে পায়, এখানে নিয়ে এসে বিয়ে করতে চায়।......সে অবিশ্যি বলে—ইচ্ছে হয় আমাকে বিয়ে করতে পার, কিন্তু আমি তো চাষী-মেয়ের মতো থাকতে পারব না......ও বড় ঘরের মেয়ে, বুঝলেন কমরেড, বয়স কম, দেখতেও খাসা।......হ্যাঁ, আগের বছর জার্মানরা আলেক্সির ঘর-দুয়োর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল কিনা,......তাই ওর ইচ্ছে ছিল নতুন ঘর তোলে......কিন্তু তখনই তো সেই ইয়াকভের ব্যাপার ট্যাপার শুরু হ'ল......"

আর একজন স্ত্রীলোক, সে আরও খবর রাখে, ঠেলে ঠুলে এগিয়ে এলঃ

"শুনুন কমরেড কম্যান্ডার! মেয়েটাকে ও যা মার মেরে ছিল বাপরে—কিন্তু একেবারে মেরে ফেলতে পারে নি।......গত মার্চ মাস থেকে মেয়েটি আমাদের এখানে ইস্কুল মাস্টারি করছে......"

"তাই বুঝি, ও তাই বুঝি", কাশতে কাশতে রশচিন বল্ল। "তা এখন কি সে এখানে, এই গাঁয়ে আছে?"

মেয়েরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চতুর্থ একজন সবে এসে পৌঁছেছে, সে বল্লঃ

"একটা গাড়ীতে ঘাস চাপা দিয়ে মে টকে ও ধরে নিয়ে গেল। মেয়েটি বেঁচে আছে কিনা বলতে পারিনে......"

একটি ছোট ছেলে একেবারে মুগ্ধদৃষ্টিতে রশচিনের দিকে চেয়ে ছিল। রশচিনের পেতলের হাতলওলা তলোয়ার, কাঁটালাগানো ধুলোমাখা বুট, মস্ত বড়

রিস্টওয়াচ, ঝোলানো পিস্তল—সব হাঁ ক'রে দেখছিল। এবার মাথা পেছনে হেলিয়ে ওর মুখটা দেখে নিল, তারপর মোটা গলায় বল্লঃ

"ওরা সব মিছে কথা বলছে কাকু। কাতিয়া মাসীর খবর ওরা কিছু জানে না। আমি জানি।"

রোগাসোগা সাদামাটা গোছের ছোট্ট একটি মেয়ে, ঠোঁটে ঘা, ছেলেটির পেছন থেকে সে খুব জোরে বলে উঠলঃ

"হ্যাঁ কাকু, ওর কথা শুনুন—ও সব জানে।"

"বেশ, বেশ, বল তো খোকা কি জান তুমি।"

"কাতিয়া মাসীকে মাত্রিয়োনা স্টেশনে নিয়ে গেল। মাসী যেতে চাননি, খুব কাঁদছিলেন। মাত্রিয়োনাও কাঁদছিল। ...তারপর মাসী আমাকে বল্লেনঃ 'ছেলেদের বোলো আমি আবার ফিরে আসব......।' আলেক্সি তো গাড়ী-টাড়ী নিয়ে গাঁয়ে ঢুকল, অমনি অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল মাত্রিয়োনা আর কাতিয়া মাসী। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় উঠে তারপর আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিল।"

"সওয়ার হো যাও!" চুগাইয়ের হাঁক।

ছেলেটির গল্পের শেষটুকু আর শুনতে পেল না রশচিন। তাজা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ডিট্যাচমেণ্ট তখন গাঁয়ের বাইরে চলেছে—সঙ্গে মালটানা গাড়ীতে মেশিন গান। চুগাই আর রশচিনের পাশে ঘোড়ার ওপর একজন চাষী ওদের পথপ্রদর্শক। বেঁটেখাটো, কালো-মতো লোকটি—আলেক্সির ভয়ে সারাদিন ওকে কুয়োর মধ্যে কোমর জলে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। পায়ে জুতো নেই, কাপড়-চোপড় ভিজে ঢোল, এলোমেলো দাড়ি, শার্টটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন—ঠিক যেমন ছিল, তেমনই কুয়ো থেকে উঠে এসে সোজা ঘোড়ায় চেপেছে—ঘোড়ার ওপর জিন পর্যন্ত কষা হয়নি। গ্রামর প্রান্তসীমা দিয়ে ঘুরিয়ে ডিট্যাচমেণ্টটাকে ও নিয়ে এল ওক্ বনের ধারে। এ অঞ্চলে ঐ বন ছাড়া ডাকাতরা আর যাবে কোথায়?

আলো থাকতে থাকতেই বনের ধারে পৌঁছে বনটাকে ওরা ঘিরে ফেল্ল। শুধু একটা মুখ খোলা থাকল—সেখান দিয়ে পালাতে গেলেই ডাকাতগুলোকে চোরাগোপ্তা আক্রমণের মুখে পড়তে হবে। চকচকে সবুজ পাতা ভেদ করে ডুবন্ত সূর্যের কিরণ ভেতরে পৌঁছায়, এবড়োখেবড়ো গাছের গুঁড়িগুলো আলো হয়ে ওঠে। রশচিনের ঘোড়াটা বড্ড চঞ্চল, খালি খালি মাথা ঝাঁকায়, আচমকা থেমে থেমে পড়ে, হাঁটু কামড়ায়, পেছনের পা দিয়ে নিজের পেটেই লাথি লাগায়। শেষকালে রশচিন লাগাম ছেড়ে দিল, দু হাতে বন্দুক ধ'রে প্রস্তুত হয়ে থাকল। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা—ঠিক মেঘের মতো—রোদের আলোয় সোনালি রং ধ'রে ভেসে চলেছে। ফালি আর বিন্দুর আকারে সূর্য-কিরণ ঢালু হয়ে পড়েছে বনের ভেতর—সামনে বাঁ পাশে ভাল দেখতেই পাওয়া যায় না। সওয়ারেরা তখন মাটিতে। রশচিনের ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে সরু লাইন বেঁধে ওর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে, লম্বা লম্বা ফার্ন গাছ পার হয়ে অতি সাবধানে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে—ঝরা ডালপালাগুলো মড়মড় করে উঠছে ওদের শরীরের নীচে।

কাছেই একটা বনরক্ষকের কুটির আছে—পথপ্রদর্শক জানাল। আরও বল্ল যে, বনের গভীরে প্রবেশ করার পথ শুধু একটিই—ডাকাতরা নিশ্চয় সেই পথই ধরেছে; এখন রশচিনের দলও শীগ্গিরই সে পথে পেঁছে যাবে। একটু পরে হঠাৎ রশচিন দেখল, সুমুখে কয়েক পা আগে একটা বাড়ীর শ্যাওলা-ঢাকা ছাত—দু পাশ থেকে তেরছা হয়ে এসে এক জায়গায় মিলেছে—ঠিক ঘোড়ার জিনের মতো। ভাদিম দাঁড়িয়ে পড়ল, ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। আস্তে শিস দিতেই শুনল সিপাহীদের পদধ্বনি কাছে আসছে, ডালপালা মাড়ানোর শব্দ কানে আসছে। ফের ঘোড়া চালিয়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে আগাতে আগাতে পরিত্যক্ত কুটিরের সামনে এসে পেঁছাল ভাদিম। কুটিরের সুমুখ দিকে একটু খোলা জায়গা—সেখানে কয়েকটা মালটানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ঘোড়া নেই। ন্যাকড়া, কানি, রাবিশ ইত্যাদিতে জায়গাটা একেবারে ভর্তি। তার মানে ডাকাতরা ওখান থেকে সরে পড়েছে।

পা টিপে টিপে কুটিরের চারদিকে চক্কর লাগায় ভাদিম—হাতে বন্দুক খাড়া। আর আলেক্সি ক্লাসিল্‌নিকভও ঠিক তেমনি পা টিপে টিপে পিছু হটে, এ কোণা থেকে ও কোণায় আশ্রয় নেয়। সওয়ারের ঘোড়াটা কেড়ে নেবে, এই ওর মতলব। রশচিন একবার পেছনে চাইল, তারপর পাশের দেওয়ালের ধারে দাঁড়াল। সামনের দেওয়ালে দরজাটা কে কব্‌জা থেকে খুলে নিয়েছে, সার্শিটার্শি সব ভাঙা; সেখানে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়াল আলেক্সি। ওর হাতে খোলা ছুরি—যাতে শব্দ টব্দ না হয়, সেজন্যে ছুরি দিয়েই কাজ সারবে ঠিক করেছে। ঘরের কোণা ঘুরে রশচিন যেই এদিকে মুখ করেছে অমনি ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক্সি। কিন্তু পারল না, বন্দুকের সাহায্যে রশচিন ওর ছুরি ঠেকিয়ে ফেল্ল। লাফ দিয়ে সরতে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল আলেক্সি। ছুরিটা হাত থেকে খসে পড়ল, স্থির বিহ্বল দৃষ্টিতে ও চেয়ে রইল রশচিনের মুখপানে—ভূত দেখছে। ভয়ে, কুসংস্কারে এক বিরাট চীৎকার তুল্ল আলেক্সি। তারপর কুঁজো হয়ে, পাগলের মতো এলোমেলো হাত নাড়াতে নাড়াতে ছুট, ছুট, ছুট……

রশচিন হাঁকল, "আলেক্সি!" লাগামে টান মেরে ঘোড়া ছোটাল ওর পেছনে। আলেক্সি ছুটছে—ছুটতে ছুটতে একটা ওক্‌ গাছ দেখে হঠাৎ একেবারে জড়িয়ে ধরল গাছটাকে—মুখ চেপে ধরল গুঁড়ির গায়ে। ওর চওড়া পিঠটা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে উঠে রশচিন গুলি চালাল, সোজা ওর পিঠ লক্ষ্য করে।

"সে এই ঘরে থাকত?" রশচিন শুধাল।

"হুঁ-উঁ-উঁম", জবাব দিল ইভান গাভরিকভ।

মাথা নীচু ক'রে চৌকাঠ পার হয়ে তোবড়ানো ঘরটার মধ্যে ঢুকতে হয়। একটা মাত্র ছোট্ট জানলা। তাও এত নীচু যে বাইরের আগাছায় একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। জানলার ধারে সবুজ সবুজ একটু আলো আসে—সেখানে একটা

টেবিল পাতা। টেবিলটাও খুব ছোট আর নীচু। টেবিলের ওপর খানকয়েক প্রথম ভাগ, আর দেওয়াল-কাগজের এক্সার্সাইজ বুক। একখানা এক্সার্সাইজ বুকের পাতা খোলা, তার পাশে দোয়াত কলম। বোঝা যায় যে, একেবারে শেষ মুহূর্তেই কাতিয়াকে পালাতে হয়েছে। টেবিলের ধারে বসল রশচিন। বাচ্চা ছেলেটা মুখে হাত চাপা দিয়ে নীরবে হাসছে—হাসি যেন আর ধরেই না; চোখের ইসারা ক'রে উনুনটার দিকে রশচিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

উনুনের মুখের পাশে বসে আছে একটা দাঁড়কাকের ছানা—বোকা বোকা, গোল গোল চোখ। ধোঁয়া বেরুবার নলের গায়ে বোধহয় বাসা ছিল, সেখান থেকে পড়ে গেছে। ওরা লক্ষ্য করছে দেখতে পেয়ে ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে এক লাফে উনুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

"বাসাটাতে চার চারটে ছানা আছে," ছেলেটি বল্ল। "সব কটাকে ধরছি, দাঁড়ান।"

টেবিলের ওপর খাতাগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে কাতিয়ার স্কুল ডায়েরিটা রশচিনের চোখে পড়ল। তাতে পড়াটড়া সব লেখা আছে, আবার ঘটনাও লেখা আছে কতকগুলো। প্রতিদিনের রোজ-নামচার শেষে একটি মন্তব্য প্রায় অবধারিতঃ "ইভান গাভরিকভ আবার দুষ্টুমি করেছে......", নয়তো "ইভান গাভরিকভের সঙ্গে পুরো তিন দিন কথা বলব না, দিব্যি রইল......", কিংবা, "মেয়েদের ভয় দেখানোর জন্যে ইভান আবার ছাতের কার্নিশে উঠেছিল। কী যে করা যায়......"

"এই ইভান গাভরিকভটি কে বলতো খোকা?"

"আমি।"

"তুমি অত দুষ্টুমি করতে কেন? কাতিয়া মাসীকে অত মুশকিলে ফেলতে কি জন্যে?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গাভরিকভ। নীল চোখ দুটি দেখলে মনে হবে যেন কিচ্ছু জানে না।

"ও অভ্যাস আমি ছাড়তে পারিনে। ..... কিন্তু পড়াশুনা ঠিক করি। দেখুন না, মেয়েদের খাতা দেখুন—খালি কাটা আর কাটা! আর ওই দেখুন আমার খাতা। আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না? সব নামতা আমার একেবারে মুখস্থ। জিগ্যেস করুন না।" চোখ টোখ কুঁচকে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

"দরকার নেই, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি।"

পা গুটিয়ে মেঝের ওপর বসে ডায়েরির পাতা ওল্টায় ভাদিম। লেখিকার নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও নেই—কিন্তু তবু প্রতি পৃষ্ঠা থেকেই কাতিয়ার চিরন্তন তারুণ্য, তার নিষ্কলুষ কোমলতা আর বিশ্বাসপ্রবণতা যেন ওর দিকে উঠে উঠে আসে। নীল শিরা আঁকা কাতিয়ার হাত দুখানি, আর স্বচ্ছ, দীপ্তমান আঁখি দুটি—মনে হয় যেন একেবারে চোখের সামনে।......

"নয় নাং একাশী, কেমন, ঠিক বলিনি?" ইভান গাভরিকভ বল্ল।

“সাবাশ! আচ্ছা শোনো, কাতিয়া মাসী কোথায় যাচ্ছে তোমাকে বলেনি?”

“বলেছিলেন কিয়েভ যাবেন।”

“সত্যি?”

“মিথ্যে বলব কেন?”

“ওর হয়তো আরও খাতাটাতা, চিঠিটিঠি ছিল, অন্য কোথাও রেখে থাকবে। তুমি জান?”

“না, সব এরই মধ্যে। আমি এগুলো বাড়ী নিয়ে যাব। মাসী বলছিলেন খাতাটাতা খুব যত্ন ক'রে রাখতে হবে, নইলে ‘মুঝিকরা’ সিগ্রেট বানিয়েই খেয়ে ফেলবে।”

ডায়েরির শেষ পাতাটা পড়ল রশ্‌চিন:

“কেন যেন আমার বিশ্বাস হয় যে, তুমি বেঁচে আছ, আবার একদিন আমাদের দেখা হবে।......আমার কেমন লাগে জান? মনে হয় যেন সুদীর্ঘ রাত্রি পার হয়ে এসেছি।......আমার এই ছোট্ট দুনিয়া, এর কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে। জানলার ধারে পাখীর গান শুনে ঘুম ভাঙে ভোরবেলা। নদীতে স্নান করতে যাই। তারপর ফেরার পথে আগাফিয়া বুড়ীর ওখানে দুধ খেয়ে আসি। ওর কাছে এ পর্যন্ত আমার দেনা দাঁড়িয়েছে এক রুব্‌ল ষাট কোপেক। তবে ও তাগাদা করবে না। তারপর ছেলেমেয়েরা আসে, পড়াশোনা আরম্ভ হয়। না আছে বাধা-বিঘ্ন, না আছে ভাবনা-চিন্তা। যে সব জিনিষ আমরা অবশ্য-প্রয়োজন বলে মনে করতাম, যা নইলে নাকি বাঁচতেই পারতাম না—এখন মনে হচ্ছে সেসব জিনিষ মানুষের দরকারই করে না।......বলতে লজ্জা লাগে, কিন্তু সত্যিই আমার মনে হয় যেন সতের বছর বয়সে ফিরে গেছি। দাশেংকা মণি! আমি জানি আমার কথার মানে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে।......ইভান গাভরিকভ আমার প্রিয় ছাত্র—তার ব্যবহারে মাঝে মাঝে নাকাল হতে হয়, এছাড়া আর কোনো দুঃখ নেই আমার। ......ছেলেটি খুব......”

এখানে চিঠির ছেদ পড়েছে, খাতায় আর জায়গা ছিল না। ইভান গাভরিকভকে কাছে টেনে এনে দু হাঁটুর মাঝখানে দাঁড় করাল রশ্‌চিন।

“আচ্ছা, তোমাকে কি উপহার দেওয়া যায় বলতো?”

“একটা কার্তুজ দিন।”

“খালি কার্তুজ তো নেই আমার কাছে......”

“উঠোনে এসে একটা ফুটিয়ে নিন......”

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল ভাদিম। এক্সার্সাইজ বুকখানা দুমড়ে কুর্তার মধ্যে গুঁজে নিল।

“এ খাতাটা আমি নিলাম ইভান।”

“না না নেবেন না, মাসী রাগ করবেন।”

“কাতিয়া মাসীর সংগে আমার শীগ্‌গিরই দেখা হবে, তাঁকে বলে দেব যে খাতাটা আমি নিয়েছি। চল এখন কার্তুজ ফোটাই......”

॥ আঠার ॥

জারিতসিনের রাস্তাঘাট জনশূন্য। দেউড়িতে দেউড়িতে দরজাগুলো হাট খোলা, তার সামনে পথের ওপর রাবিশ জমে আছে স্তূপাকারে। একটুও হাওয়া নেই, প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে সব যেন ঝলসে যাচ্ছে। ওখানকার বাসিন্দারা তখন আত্মগোপন ক'রে আছে। মাঝে মাঝে ভল্‌গার খাড়া পাড় বেয়ে ঘর্ঘর শব্দে মাল-টানা গাড়ী নামে—সরকারী মালপত্র আর দপ্তরখানার দলিল-দস্তাবেজ বয়ে নিয়ে যায়—এ ছাড়া জীবনের আর কোনো চিহ্ন নেই। জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের নবগঠিত উত্তর ককেসিয়ান ফৌজ শহর আক্রমণ করেছে—শহরে এখন শেষ দশা। মানিচের যুদ্ধে লাল ফৌজের দশম আর্মির লোকবল অনেক কমে গিয়েছিল, যা আছে তাই নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে র‍্যাঙ্গেল বাহিনীকে কোনো রকমে আটকে রেখেছে।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এখনও একটু চালু আছে, কিন্তু জল বা বিদ্যুৎ কিছুই নেই। কলকারখানা সব বন্ধ। যন্ত্রপাতির যা কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব সেগুলো স্ক্রু থেকে খুলে, নামিয়ে, ডকের ওপর এনে ফেলা হয়েছে। মজুর এলাকা থেকে সবাই চলে গেছে—আছে শুধু ছেলেপিলে আর বুড়োবুড়ীর দল। গত দশ মাস ধরে জারিতসিনের মজুর শ্রেণী শহর রক্ষার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে—তাই হোয়াইটদের কাছে তারা প্রাণের আশা করে না। যাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্য ছিল তারা লাল ফৌজের মধ্যেই আছে। অন্যেরা কেউ রেলগাড়ীর ছাতে চেপে, কেউ স্টীমারের ডেক বা খোল বোঝাই ক'রে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শুধু এখান থকে পালানোর জন্যেই লোকজন সব উত্তরদিকে চলেছে। ভল্‌গার তীরে তীরে কাঠের গুদামে আগুন জ্বলছে। ভারী কামানের গর্জন ক্রমেই আরও নিকটে আসছে।

রেলস্টেশন আর ডক—এ দুটিকে কেন্দ্র ক'রেই শহরের সমগ্র জীবন। ভলগার পাড়ে বড় বড় বস্তা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স, মেশিনের অংশ, লেদ—সব একেবারে স্তূপাকার। ঘর্মাক্ত কলেবর শত শত লোক—এই সব জিনিষ টানাটানি ক'রে তারা স্টীমারে তুলছে, গাল দিচ্ছে, চীৎকার করছে—চারিদিকে মহা হৈ চৈ। জাহাজে ওঠার আশায় অপেক্ষা করছে আরও হাজার হাজার নরনারী। কেউ ঘন হয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে, অবসন্ন দেহে নীরবে কেউ বা নদীতীরে এখানে ওখানে গা এলিয়ে দিয়েছে, অচঞ্চল ধূলিজালের ভেতর দিয়ে রৌদ্রদীপ্ত তৈলাক্ত জলরাশির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। জুনের শেষ, ভলগার জল আর নেই বল্লেই হয়। ওপারে একটা বালুচর ছিল, সেটা এখন

প্রায় এপারে এসে ঠেকেছে—উলঙ্গ হয়ে লোকজন তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, নয়তো কিনারায় দাঁড়িয়ে স্নান করছে। এ পারে ডকগুলোর চারপাশে ঈষদুষ্ণ জল, তাতে যত সব ছাইপাঁশ ভেসে চলেছে—সেখানেও স্নান করছে কত লোক। এত জল, তবু কিন্তু গরম আর কাটে না।

একের পর এক স্টীমার এসে ডকের ধারে নোঙর ফেলে। কাদামাখা, নোংরা নোংরা স্টীমার—তার ভেতর থেকে বিকারগ্রস্ত মানুষের চীৎকার শোনা যায়। ডেকের ওপর কোথাও লাশ পড়ে আছে, কোথাও টাইফাস রোগী কাতর স্বরে ভুল বকছে, নয়তো বিকারের ধাক্কায় ছটফট করছে—তারই মধ্যে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে বাস্তুহারার দল আর লাল ফৌজের লোকজন। একগাদা স্টীমার আর টাগ্ বোট মাল ওঠানো-নামানোর অপেক্ষায় গায়ে গায়ে ঘষাঘষি করে, কর্কশ শব্দে বাঁশী বাজায়। নদীর নীচের দিক থেকেই এসেছে এগুলো—কোনোটা আস্ত্রাখান থেকে, কোনোটা বা চর্নি ইয়ার থেকে।

সারা গায়ে চুণ মেখে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা ডেকের ওপর ছুটে আসে, রোগীদের ডিঙ্গিয়ে লাশগুলোকে তুলে তুলে জলে ছুঁড়ে ফেলে—জীবিত মানুষদের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। চুণ ছড়িয়ে তারপর কার্বলিক এসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়। নদীতীরে যেখানে লেমনেড আর 'ক্বাস' পানীয়ের দোকান ছিল, সব লাশ সেখানে গাদা করে রাখতে হবে বলে হুকুম হয়েছে। কিন্তু গরমের চোটে মৃতদেহগুলো এমন ফুলে উঠেছে যে, নড়বড়ে দোকান-টোকান সব একেবারে ভূমিসাৎ। দারুণ দুর্গন্ধ! লোকে যে তাড়াতাড়ি জারিতসিন থেকে পালাতে চাইছে—এই দুর্গন্ধও তার অন্যতম কারণ। ধুলোজালের মধ্যে আবছা মূর্তির মতো র‍্যাঙ্গেলের হাওয়াই জাহাজগুলো শহরের আকাশে উড়ে যায়, মাঝে মাঝে নদীতে বোমা ফেলে।

নামবার জায়গায় বেড়া—সে সব ঠেলেঠুলে মেয়েপুরুষ সবাই স্টীমারের মধ্যে ধেয়ে আসে—লাল ফৌজের শান্ত্রীর বেয়নেটের মুখে ওদের বস্তাটস্তা আটকে যায়, তবু ধেয়ে আসে। ডেকের ওপর দমাদ্দম আছড়ে পড়ে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাক্স আর বাণ্ডিল—স্টীমারটা একেবারে জল-সই হবার জোগাড়।

জাহাজে ওঠার সিঁড়ি—ঠিক তার সামনে ডাঙ্গার ওপর ভিড়ের মধ্যে একটা মালটানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। সে গাড়ীতে শুয়ে আছে দাশা আর আনিসিয়া। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের আদেশ অনুসারে কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ ওদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে এসেছে। কমাণ্ডারের হুকুম খুব কড়া, বলে দিয়েছেন যে, মেয়েদের রেলে করে সরালে চলবে না, স্টীমারে পার করতে হবে—তাতে যদি কুজ্‌মার জান যায় তবু কুছ পরোয়া নেই।

"কমরেড নেফেদভ, জীবনে আর কখনো আপনাকে এত বড় দায়িত্ব নিতে হয়নি" তেলেগিন বলেছিল। "আপনি ওদের জাহাজে তুলে দেবেন। তারপর যতদূর সম্ভব ভাল ক'রে দেখাশুনাও করবেন—ছলে, বলে, কৌশলে যে ক'রে পারেন। ওদের জীবনের জন্যে আপনি দায়ী থাকবেন।"

গাড়ীতে ঘাস বিছানো, নেকড়া-কাঁথা মুড়ি দিয়ে তার ওপর শুয়ে আছে ওরা দুজনে। দুজনেরই কঙ্কালসার চেহারা। আনিসিয়ার জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু এত দুর্বল যে মুখ খোলারও শক্তি নেই। আঙুল দিয়ে দাঁত ফাঁক করে তবে কুজমা ওকে গরম জল খাওয়াতে পারে। দাশাকে টাইফাসে ধরেছিল আনিসিয়ার পর। সে এখন বিকারগ্রস্ত। ক্রুদ্ধ, নীচু স্বরে বিড় বিড় ক'রে অনবরত কি যেন বকছে।

এর আগে ক'খানা স্টীমার ছেড়েই দিতে হয়েছে কুজমাকে। মেয়ে দুটিকে ধরে স্টীমারে তুলবে, সাহায্য করার জন্যে কত লোকের হাতে পায়ে ধরেছে, কত ফন্দি খাটিয়েছে—কিন্তু অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর যে ওসব কথায় কেউ কান দেয় না। গুমোট নদীর ওপর লাশভর্তি স্টীমারগুলো অধৈর্য সুরে ভোঁ ভোঁ করে, নদীর ওপর আবহাওয়ায় ধুলো ভাসে, তার ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ রক্তাভ দীপ্তিতে প্রতিফলিত হয়—মনে হয় যেন এক মরীচিকার ছবি। কুজমার চোখ জ্বলছে, গাড়ীতে ঠেস দিয়ে মরীচিকার পানে চেয়ে আছে। বিমানের ভয়াবহ গর্জন আবার কাছে এল। বোমাটা এবার কাছেই পড়েছে, জমির ওপর—ধুলোয় ঢেকে গেছে নদীতীর। অনেক লোক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। একটা স্টীমার আসছিল, সাঁতরে সেটার কাছে গিয়ে চেঁচাতে লাগলঃ "দড়ি ফেলে দাও গো, একটা দড়ি......।" কিন্তু দড়ি আর কে ফেলে? স্টীমারের চারপাশ ঘিরে বেচারারা সাঁতরায়—মাথাগুলো জলের ওপর ওঠে আবার ডোবে—মনে হয় যেন কালো কালো তরমুজ ভাসছে।

সব স্টীমার চলে গেল, রইল শুধু একটা হলদে রংয়ের টাগ-বোট। বোটটা নীচু, চাকার ওপরকার ঢাকনাটা ভেঙে গেছে। এটাই বোধ হয় শেষ স্টীমার। জেটীর সিঁড়ির ধারে না গিয়ে কাছে আর এক জায়গায়, যেখানে কোন লোক নেই সেখানে দাঁড়াল স্টীমারটা। পুরু বালির মধ্যে গাড়ীটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে কুজমা ছুট দিল।—জেটিতে ওঠার তক্তার ধারে সবার আগে পৌঁছে পাগলের মতো হাত নাড়তে নাড়তে দৌড়াল তক্তা বেয়ে ওপর দিকে।

"ও ক্যাপ্টেন, ও কমরেড!" বলে কুজমার কী চীৎকার। বেঁটেখাটো সাবেকী ধরনের বুড়ো মানুষ ক্যাপ্টেন সাহেব। তাঁর দিকে চেয়ে কুজমা হাঁকেঃ "এখানকার যুদ্ধক্ষেত্রের যিনি প্রধান সেনাপতি—তাঁর স্ত্রী আর ভগ্নী রয়েছেন আমার সঙ্গে—তাঁদের অন্য এলাকায় সরাতে হবে। ভাল চান তো দুজন লোক দিন, এঁদের স্টীমারে ধরে তুলুক। নইলে কোর্ট মার্শালে পড়বেন, বুঝেছেন মশাই?"

ওর সোজা, স্পষ্ট কথা আর উত্তেজিত ভাবভঙ্গী—তাতে ফল হল। জাহাজের পাশ ডিঙিয়ে মুখ গোমড়া করে নীচে নেমে এল কয়লাওয়ালা—লোকটার খালি গা, কালিঝুলি-মাখা চেহারা, পরনে পাৎলুন।

"কোথায় তারা?"

"আপনি একলা পারবেন না কমরেড......"

"পারব।"

গাড়ীর কাছে গিয়ে মেয়ে দুটিকে দেখে নিল কয়লাওয়ালা। আনিসিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লঃ

"এই কি আপনাদের প্রধান সেনাপতির স্ত্রী?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনিই......ওঁর যদি ভালমন্দ কিছু হয় তবে আমাদের সবাইকে শাস্তি পেতে হবে, সত্যি বলছি......"

"হুঃ, আমাকে কি বোকা পেয়েছেন? ও তো আনিসিয়া, আমাদের রাঁধুনী." ধীর স্থির ভাবে বল্ল কয়লাওয়ালা।

"আপনি পাগল নাকি কমরেড? রাঁধুনী আবার কোথায় দেখলেন?"

"খামোখা চেঁচিও না বুড়ো কত্তা!"

গাড়ী থেকে আনিসিয়াকে অনায়াসে তুলে নিয়ে তাকে কাঁধের ওপর ফেল্ল কয়লাওয়ালা, তারপর আর একটু ভাল ক'রে গুছিয়ে রাখল—যাতে কষ্ট না পায়ঃ

"দিন, ওকেও দিন, নিতেই যখন হবে......"

দুজনকে দু কাঁধে ফেল্ল কয়লাওয়ালা। ভারের চোটে ওর পায়ের নীচের তক্তাগুলো দেবে গেছে, প্রায় জলসই—তাই নিয়েই কয়লাওয়ালা চল্ল টাগের ওপর।

স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল কুজমা। খাবারের থলি আর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে চল্ল পিছু পিছু।

৩রা জুলাই তারিখে ইস্কুল মাস্টার স্তেপান আলেক্সিয়েভিচ তাঁর বাড়ীর মাটির নীচেকার রান্নাঘর থেকে ঘাড়ে করে নিয়ে এলেন একগাদা জিনিষঃ গদি, বালিশ, সবুজ প্লাশ-মোড়া আরাম কেদারা, গাদাখানেক বই।

ছোট্ট উঠোন, তার ওপর এগুলোকে রেখে বয়ে আনলেন আর এক বোঝা, একেবারে পর্বতপ্রমাণঃ ময়লা ময়লা পাৎলুন, ফ্রক কোট, স্কার্ট, পশমের ড্রেস, এমনি সব জিনিষ। ভদ্রলোক বোঝার ভারে টলতে টলতে জিনিষগুলো ধপ ক'রে মাটিতে ফেলেন, হাঁ ক'রে দম নেন, তারপর জামার আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মোছেন। ওঁর হলুদ রংয়ের চুল আর দাড়ি, ক্যাম্বিশের পাৎলুন, নোংরা শার্ট—সব একেবারে ঘামে জবজবে। হাড়-বার-করা কাঁধের সঙ্গে শার্টটা আর কাঁধ-পটি দুটো লেপটে গেছে।

উঠোনে একটা বেল্ট-উড চেয়ারের ওপর ওঁর মা বসে আছেন। থলথলে চেহারা, পরনে কালো পোষাক, দুর্বল হাতে ছোটো লাঠি দিয়ে কার্পেট পিটছেন। ওঁর বোনটি পক্ষাঘাত রোগী—আকাসিয়া ঝোপের ছায়ার নীচে চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। মেয়েটির কপালটা এমন উঁচু যে তার আড়ালে মুখ-চোখ সবই খুব ক্ষুদে ক্ষুদে, চেপ্টা দেখায়। ভয়ানক গরম পড়েছে। চড়াইগুলো পর্যন্ত ঠোঁট বার ক'রে ধুঁকছে।

"ব্যাস, আর বোধ হয় কিছু নেই মা," স্তেপান বল্লেন। "আর আমি পারছিনে! আহা, এখন যদি মগভর্তি ঠাণ্ডা বীয়ার পাওয়া যেত!"

"এক ফোঁটা জলও তো নেই, স্তেপুশ্‌কা! তোমাকেই যেতে হবে, এক কলসী জল নিয়ে এস, লক্ষ্মীটি!"

"ওরে বাবা, আমি পারব না। জল ছাড়াই চালিয়ে নাও না! পারবে না? উঃ—যন্ত্রণা, মহা-যন্ত্রণা!"

হতাশার সাগরে তলিয়ে গেলেন স্তেপানঃ জল আনা মানে ভলগার পাড় ভেঙে নীচে নামতে হবে (লেমনেড আর 'ক্বাস'-এর দোকানে যে মড়াগুলোকে গাদা করে রাখা হয়েছিল, দোকান সহ সেগুলো পোড়ানো হয়েছে—পোড়া পোড়া লাশ আর গাদা গাদা ছাই এখনো পড়ে আছে!), তারপর কাদা ঠেলে ঠেলে পৌঁছাতে হবে বুকজলে (সেখানে জলটা পরিষ্কার), কলসী ভরতে হবে, ফের এই অসহ্য গরমের মধ্যে পাহাড় ভেঙে উঠতে হবে ওপরে, বালিতে গোড়ালি পর্যন্ত পা বসে যাবে......

"পয়সা দিয়ে লোক পাওয়া যায় না? এক বালতি জলের জন্যে দশ রুব্‌লও দিতে পারি, এম্‌নি মনে হচ্ছে। আমার হার্টের দাম আছে।..."

"যা ইচ্ছে কর......"

"কিন্তু তোমার তো ইচ্ছে যে কলসী নিয়ে আমিই হিমসিম খাই। তাই না?"

মা জবাব দেন না, দুর্বল হাতে কার্পেট পেটেন। ও'র থলথলে মুখ বেয়ে ঘামের ধারা বইছে। স্তেপান সেদিকে একবার চাইলেন, তারপর সজোরে নিশ্বাস ছাড়লেন।

"কলসীটা কোথায়?" শান্ত স্বরে বল্লেন স্তেপান। "তোমার কলসী কোথায়?" এবার গলার স্বর এমন চড়া যে আকাসিয়ার নীচে থেকে ওর বোন বলে উঠল, অনুনয়ের সুরেঃ

"তুমি যেও না স্তেপান!"

"যাব, আলবৎ যাব! তোমাদের জন্যে কলসী ঘাড়ে করব, পায়খানার টবও ঘাড়ে করব! যতদিন বেঁচে থাকব, ঘোড়ার মতো জলের গাড়ী টানব! আমার ভবিষ্যত, আমার পেশা, আমার থীসিস—সব চুলোয় যাক। সব শেষ হয়ে গেছে, কিছু আর বাকী নেই। আছে শুধু নোংরা মরুভূমি, পোড়া পোড়া লাশ, আর কবরের পর কবর—ব্যস। দেনিকিন হোক, যেই হোক, কারও বাপেরও সাধ্য নেই যে আবার সব ফিরিয়ে আনতে পারে!"

ঘামে ভেজা হাত দুটো কচলান। একদিন দাশার সামনেও এমনিভাবে হাত কচলিয়ে ছিলেন। জল আনার হাঙ্গামাটা যে করেই হোক এড়াতে হবে, এই ও'র মনের ইচ্ছা। এমন সময় গির্জার ঘণ্টাঘর থেকে প্রকাণ্ড ঘড়িটা বুম্ বুম্ করে বেজে উঠল—এক বছরের মধ্যে ও ঘড়ি আর বাজেনি। ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজে, পরিত্যক্ত শহরের বাতাসে গম্ভীর শব্দ উড়ে চলে, সমস্ত অস্থিরতা যেন শান্ত হয়ে আসে। কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়লেন স্তেপান, কম্পমান কৃশ মুখটা হঠাৎ প্রশান্ত হয়ে উঠল। মুখে একটু হাসিও ফুটেছে, তাই কেমন যেন বোকা বোকা দেখাচ্ছে।

"স্তেপুশ্কা", বলে মা ডাকলেন। "কাপড় চোপড় পরে নিয়ে উপাসনায় যাও।"

"ও তো ওসব বিশ্বাস করে না মা, ও যে নাস্তিক", আকাসিয়ার ছায়া থেকে রুগ্ন বোনটি হিংসার সুরে আস্তে আস্তে কীটুনি কাটল।

"নাস্তিক আছে তো আছে! তা বলে নিজের চেহারাটা দেখিয়ে আসতে বাধা কি? এম্‌নিই তো লোকে বলে আমরা নাকি রেড!"

"মা তুমি কী যে বল!" আবদারের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন স্তেপান। "বলশেভিজ্‌মের পরমানন্দ থেকে যদি বা মুক্তি পেলাম, অমনি তুমি আবার মধ্যবিত্ত সমাজের ছ্যাবলামির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাও? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তোমার ইচ্ছে।"

শেষ কথাকটা বলার সময় আকাসিয়া ঝোপের দিকে চেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ মুখভঙ্গী করলেন স্তেপান। ওঁর বোন সেখানে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে—ভাবটা এমনি যেন ওঁর কথা শুনছেই না।।

" কে আমাকে রেড বল্লে? শুধু তোমার ঐ শাভের্দভরা আর প্রাইসরা। যত সব ছ্যাবলা, ওদের কি কেউ পোছে? ......রক্ষে কর বাপু, ওদের স্তরে আমি নামতে পারব না। নামলে পরে নিজের অস্তিত্বই তো অস্বীকার করা হবে! এত যে পড়লাম শুনলাম, এত যে বড় বড় স্বপ্ন দেখলাম—সে সবের তাহলে কী দরকার ছিল? বলশেভিকরা আমাকে চোর কুঠুরীতে থাকতে বাধ্য করেছে, সেইজন্যেই কি তাদের ঘৃণা করি? না, কি, কলের জলের স্টেশন থেকে ওরা সব কয়লা সরিয়ে ফেলেছে বলে ওদের ঘৃণা করি? না সেজন্যে নয়।......ঘৃণা করি এই জন্যে যে, ওরা আমার অন্তরের স্বাধীনতা দু পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ......আমার বিবেক, আমার প্রতিভা যা বলবে আমি তাই ভাবতে চাই। যে বই আমাকে প্রেরণা দেবে, সেই বই পড়তে চাই।......আমি কার্ল মার্ক্স পড়তে চাইনে, পড়ব না, তার কথা যদি হাজার বার সত্যি হয়, তবু পড়ব না। আমি আমিই। তোমাদের ঐ দেনিকিনের হাতেও আমি চুমু খেতে যাব না, বুঝেছ?......ঠিক ঐ একই কারণে।......"

চল্লিশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড টেম্পারেচারের ঝলসানো ভাপ; তারি মধ্যে প্রবল অঙ্গভঙ্গী সহকারে বক্তৃতা শেষ করলেন স্তেপান। তারপর কথার সঙ্গে কিছুমাত্র সঙ্গতি না রেখে, কাপড়ের গাদা থেকে একটা ফ্রককোট আর প্যাণ্ট বার ক'রে নিয়ে নীচে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আধ ঘণ্টা বাদে—ফিটফাট পোষাক, হাতে ছড়ি আর "ইউনিফর্ম" টুপি। উঠোনে কারও মুখে কোনো কথা নেই। রাস্তায় বেরিয়ে ছায়ার দিকের ফুটপাথ ধ'রে স্তেপান এগিয়ে চল্লেন—গির্জার স্কোয়্যারে যাবেন।

গির্জার বাইরে নীচু নীচু আকাসিয়া ঝোপ—ধূলিতে ধূসর। কয়েকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া সেখানে বসেছিল। তাদেরই একজন বিদ্রূপের ঢংয়ে চোখ তুলে সোজা ইস্কুল মাস্টারের চোখে চোখে চাইলঃ

"আহা, স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে পর পর কত অলৌকিক পরিবর্তন", বেশ গভীর সুস্পষ্ট সুরে বলে উঠল ছোঁড়াটা।

রেলিংয়ের ভেতর দিকে দাঁড়িয়েছে খাকি-পরিহিত এক দল কসাক সওয়ার, আর পূর্ণ ইউনিফর্ম সজ্জিত একটা ক্যাডেট প্লেটুন। তাদের গ্রেটকোটগুলো বান্ডিল পাকিয়ে পিঠে বাঁধা; খাওয়ার পাত্র আর বেল্‌চা টেলচা সব পাশেই ঘাসের ওপর সাজানো রয়েছে। গির্জার সিঁড়িতে এখানে ওখানে শহরের লোক কিছু জমা হয়েছে। ভক্তি-উচ্ছ্বসিত জরি-ব্যবসায়ী শাভের্দভকে ওদের মধ্যে দেখতে পেলেন স্তেপান—এমব্রয়ডারি কাটা রুশিয়ান শার্ট প'রে স্ত্রী আর ছেলে দুটিকে সঙ্গে করে দাঁড়িয়ে আছে। ছাপাখানাওলা প্রাইস্‌-কেও দেখতে পেলেন; লোকটা আগে ইহুদী ছিল, ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে—নোংরা চেহারা, সর্বদা ফেন্‌ফান করে—এখন স্ত্রী আর ছ'টি বাচ্চাকে নিয়ে এখানে হাজির। মামুলি ভাবে তাদের দিকে একটু ঘাড় হেলিয়ে সোজা গির্জার ভেতর চলে গেলেন স্তেপান—ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। স্তেপানের গায়ে সরকারী ফ্রককোট, তাই ভেতরে ঢুকতে কোনো বাধা নেই। দু একজন বরং ওঁর জন্যে পথই ছেড়ে দিল।

বলশেভিক আমলে এখানে খাদ্যদ্রব্যের গুদাম করা হয়েছিল। তখনকার অবহেলার ছাপ গির্জার গায়ে এখনো কিছু কিছু লেগে আছেঃ জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে, রং-চটা দেওয়ালের গায়ে দু এক জায়গায় এ ধরনের লেখাও দেখা যাচ্ছে, যেমনঃ "আলু— ৯৪ বস্তা পাইলাম (স্বাক্ষর পড়া যায় না)।" সে যাই-হোক, এখন অসংখ্য মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে স্বর্ণময় বেদী, ঊর্ধ্বে গম্বুজ পানে উঠছে ধূপধুনার সুগন্ধ, ডীকন মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, ছাতের খিলানে খিলানে তার প্রতিধ্বনি গম্ গম্ করে ফিরছে বন্য জন্তুর গর্জনের মতো, আর চারণ বালকদের কচি কচি গলার নিরুত্তেজ সুর উঠছে আকাশে। এই সমস্ত মিলে স্তেপানের মনে এক মিশ্র অনুভূতি উপস্থিত হল। পুরানো অভ্যাসবশে একবার মনে হয় যেন মহান গাম্ভীর্যের শিখরে উঠেছেন, আবার সেই একই অভ্যাসের দোষে মনে হয় যেন, একেবারে খাটো হয়ে গেছেন। বুদ্ধিজীবী বাবুর মোটা লেজটি আর খাড়া রইল না, আপনিই গুটিয়ে এল।

সম্মুখে বেদীর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন দশ জন জেনারেল- এঁরাই প্রধান, এঁরা যা বলেন তাই হয়। এঁদের মধ্যে কেউ ঢেঙ্গা, কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ রোগা। সবাইয়েরই গায়ে ধবধবে সাদা কুর্তা, আর কাঁধে সোনা-রুপোর ষ্ট্র্যাপ—বেশ চওড়া আর নরম। যে যার চুড়ো-তোলা টুপি বাঁ হাতে ধরে আছেন; "হে প্রভু, আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই" বলে ডীকন মহাশয় যতবার মন্ত্র উচ্চারণ করেন, ততবারই ওঁরা অবহেলার বুকে আঙ্গুল ঠেকান—ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল আর অন্য দুটি আঙ্গুল দিয়ে বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে দেন। আর একজন জেনারেল ওঁদের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর কার্পেট আলাদা। এঁর উচ্চতা মাঝারি ধরনের, পরনে ঢিলা খাকি কুর্তা আর পায়জামা—পায়জামার জোড় বরাবর রেশমী ফিতে আঁটা; ব্যাকব্রাশ করা চুল, চুলে

পাক ধরেছে। ছোট, ছোট, গোলগাল হাত দুখানি একেবারে সাদা ধবধবে—সে হাত অবশ্য অন্য জেনারেলদের মতো মত ঘন ঘন বুকে ঠেকান না। কিন্তু যখন ঠেকান তখন বেশ প্রসারিত ভংগীতে হাত ছড়িয়ে দেন, বলিরেখাঙ্কিত ঈষৎ-ঢালু কপালের ওপর মুঠি-বাঁধা আংগুল কটি জোরে চেপে ধরেন, তারপর ধীরে ধীরে ক্রুশচিহ্ন এ'কে দেন।

ইনিই দেনিকিন—সে কথা স্তেপান অনুমান করলেন। সাগ্রহে ও'র দিকে চেয়ে থাকেন স্তেপান, যদিও ঠোঁটের কোণে সন্দেহবাদীর তিক্ত হাসি লেগেই থাকে—ওটা এখন ও'র অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। জমায়েতের ভেতর থেকে একজন অফিসার ও'কে মন দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন, সরতে সরতে তিনি একেবারে ও'র পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু স্তেপান কিছু টের পেলেন না। ও'র মনের ভেতর তখন পরস্পর বিরোধী আবেগের ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে, উনি তাই নিয়ে ব্যস্ত। দেনিকিনের শুভ্র হাত দুখানি ওঁকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। জেনারেলদের হাত, বিশেষ ক'রে সে হাতের অলস, মন্থর ভংগী—তা আর কে না দেখেছে? কিন্তু মত চেষ্টাই কর, হাতের চেহারায় তো আর মান-সম্ভ্রমের জাঁক আনতে পারবে না। জেনারেল অবিশ্যি সেই চেষ্টাই করেন—তোমার সংগে হ্যাণ্ডশেকের জন্যে যখন অনুগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে দেন, কিংবা সসেজের মতো মোটা মোটা আংগুল দিয়ে যখন তাস খেলার তাস বাঁটেন, কিংবা খাওয়ার সময় থুতনির নীচে তোয়ালে গোঁজেন, তখন তার মধ্যে একটু বিশেষ মান-সম্ভ্রমের ভংগী আনতে চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, দেখলে শুধু হাসিই পায়। হুঁ, এ সব কথা সবই সত্য, তবু ঐ হাত দিয়েই তো দেনিকিন ইতিহাসের টুঁটি টিপে ধরেছেন। ঐ হাতের ইঙ্গিতেই তো বাহিনীর পর বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত মহা-সংগ্রামে......

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে স্তেপান এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে উপাসনা কখন শেষ হয়ে গেছে টেরও পাননি। উপাসনা অন্তে পুরোহিত মহাশয় —চশমা পরা, ক্ষুদ্রকায় এক বৃদ্ধ—বক্তৃতা-বেদীতে এসে দাঁড়িয়েছেন, জেনারেল দেনিকিনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে অভিভাষণ শুরু করে দিয়েছেন:

"আমাদের প্রিয় নায়ক, দক্ষিণ রুশিয়াস্থ হোয়াইট সৈন্যসমূহের প্রধানতম সেনাপতি, লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল আন্তন ইভানোভিচ দেনিকিন মহাশয় যে ঐতিহাসিক আদেশ জারি করিয়াছেন—'অর্থডক্স চার্চের'* ধর্মমতাবলম্বী প্রতিটি রুশিয়ানের হৃদয়ে তাহা অগ্নির অক্ষরে খোদিত হইয়া থাকিবে। প্রধানতম সেনাপতি মহাশয়ের আদেশের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে: 'রুশ দেশের

মস্কো শহর, সেই মস্কো শহর অধিকার করাই আমাদের চূড়ান্ত

---

*অর্থডক্স চার্চ—খৃষ্টানদের মধ্যে গ্রীক ধর্মসংঘের অনুগামী অংশ। রুশিয়ায় ধর্মমতই বহুল প্রচলিত ছিল।

লক্ষ্য: সেই জন্য অদ্য তেসরা জুলাই তারিখে আমি আদেশ দিতেছি যে, সর্বাত্মক অভিযান আরম্ভ করা হোক......' ভদ্রমহোদয়গণ! আজ মনে হইতেছে যেন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে দেবদূত মাইকেল তাঁহার পবিত্র, শুভ্র বাহিনীকে যুদ্ধের আহ্বান জানাইতেছেন......"

স্তেপানের নাকের ভেতরে যেন রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগল। কড়া মাড়-লাগানো শার্টের ছাতি ঘামে ভিজে গেছে, তার নীচে বুকটা উঠছে আর পড়ছে। পরমানন্দে বিভোর হয়ে গেছেন স্তেপান। চেয়ে দেখলেন, দের্নিকিন ধীরে ধীরে কপাল হাত ঠেকাচ্ছেন। অকস্মাৎ স্তেপান উপলব্ধি করলেন যে, ঐ হাত তাঁকে চুম্বন করতে হবে, করতেই হবে।...কয়েক মিনিট পরে চলতে শুরু করলেন দের্নিকিন। সকলের আগে ক্রুশ চুম্বন সাঙ্গ ক'রে কার্পেট মোড়া পথ ধরে অগ্রসর হলেন। আহা, কী সাদাসিধা মানুষটি, ছোট করে ছাঁটা পাকা দাড়ি, দেখলে মনে হয়, যেন অতি অমায়িক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। উৎসাহের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে আবেগ ভরে এগিয়ে গেলেন স্তেপান—একেবারে দের্নিকিনের সামনে। পেছনে হটে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে হাত ওঠালেন দের্নিকিন। তাঁর বিকৃত মুখভঙ্গীতে কষ্ট আর যন্ত্রণার ছাপ। দেখতে দেখতে জেনারেলরা ছুটে এসে দের্নিকিনকে আড়াল ক'রে ফেল্লেন। পেছন থেকে কে একজন স্তেপানের দুই কনুই চেপে ধরল, তারপর এমন জোরে হেঁচকা টান মারল যে, ওঁর হাঁটু দুটো একেবারে দুমড়ে গেল।

"কিন্তু আমি তো শুধু......"

যে অফিসার ওঁকে পাকড়াও   ঝট ক'রে তিনি একবার ও'র মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"তুমি ভেতরে ঢুকলে কি ক'রে?"

"আমি শুধু ওঁর হস্ত চুম্বন করতে যাচ্ছিলাম . . "

"তোমার পাস কোথায়?"

স্তেপানকে মোক্ষম ধরা ধরে রেখেছেন অফিসার--সেই অবস্থায়ই ওঁকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে নিয়ে চল্লেন। পাশ-দরজার ধারে পৌঁছবার পর মাথা নেড়ে দুজন রাইফেলধারী ক্যাডেট যুবককে কাছে ডাকলেন:

"এই লোকটাকে কম্যান্ডান্টের অফিসে নিয়ে যাও. . "

"প্রিয় ইভান ইলিয়িচ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা একেবারে কস্ত্রমা পৌঁছে গেছি তাতো বুঝতেই পারছেন। পথে কোথাও ডাঙ্গায় নামতে সাহস হয়নি: সামরিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে নিঝ্‌নি নভ্‌গোরদ শহরেও ভরসার বিশেষ কারণ আছে ব'লে মনে হল না। সুতরাং আমরা কস্ত্রমা শহরের উপকণ্ঠেই জাহাজ থেকে বিদায় নিয়েছি। এখন বাসা করেছি ভল্‌গার ধারে ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ীতে। বাড়ীর বাগানে পাহাড়ী অ্যাশ গাছ, আর গেল্ডার গোলাপের চারা। মানে যেমনটি চাই ঠিক তেমনটি।

পাহাড়ের ওপর এই ছোট্ট শহরটি ভারী সুন্দর, ঠিক রোমের মতো। যেমন শান্ত, তেমনই নিভৃত। ঠিক এই রকমই তো আমাদের চাই।

দারিয়া দ্‌মিত্রেভনার শরীর সেরেছে, তবে খুব ধীরে ধীরে। এখন ভয়ঙ্কর দুর্বল—ঠিক ছোট্ট মেয়ের মতো। আমি ওকে বিছানা থেকে কোলে ক'রে তুলে বাইরে উঠোনে নিয়ে যাই। ওর খিদের বহর দেখলে মনে হবে যেন নেকড়ে বাঘের খিদে; এখনও কথা বলতে পারে না। তবু চোখের ইঙ্গিতেই খালি খালি জানায়ঃ 'খাবার দাও'! ওর শরীরের মধ্যে শুধু চোখ দুটোই আছে বলে বোধ হয়। মুখটা ছোট্ট, এই আমার হাতের মুঠোর সমান। স্রেফ কাহিল অবস্থার জন্যেই। ঘন ঘন কেঁদে ওঠে—গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। টাগ্‌টা যখন ভল্‌গা পাড়ি দেয়, তখন প্রায় তিন হপ্তা ধ'রে ওর জ্ঞান হয়নি, খালি ভুল বকেছে। বড্ড অশান্তি আর যন্ত্রণা ছিল ওর বিকারের মধ্যে: অতীতের প্রেতমূর্তিগুলোর সঙ্গে মনটকে যেন অনবরত লড়তে হচ্ছিল। আপনি শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, ওর এই লড়াইয়ের মধ্যে কতকগুলো গহনাপত্র, হীরেই হবে বোধহয়, সেগুলো বেশ বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। কি এক অন্যায় অপরাধের পর ওগুলো নাকি ওর হাতে এসেছে—এ রকমই যেন ভাবছিল। ভুল বকার সময় যা যা কথা বলে তার স্বর কিন্তু দু রকমেরঃ একটা স্বর যেন অভিযোগ করছে, আর একটা স্বর সাফাই দিচ্ছে। সাফাইয়ের স্বরটা অদ্ভুত—যেমন সরু, তেমনি ঘ্যানঘেনে। এ সব কথা আপনাকে লিখতাম না, কিন্তু নিতান্তই দৈবাৎ একটা অসাধারণ জিনিষ আবিষ্কার করে ফেলেছি, তাই লিখতে হচ্ছে......

রোগিণী দুটিকে ভাল ক'রে খাওয়াতে হবে—আপনার এই আদেশ সর্বদা মনে রেখে আমার প্রধান কর্তব্য বলেই এটিকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আদেশ পালন করতে গিয়ে অনেক সময়ই আমার মনে হতাশা এসেছে, এমন কি কখনো কখনো আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। সময় বড়ই কঠোর। লোকে আজকাল মস্ত বড় বড় কথা চিন্তা করে, মহাজাগতিক মাত্রায় না হলে তাদের আবেগই খোলে না। আর ওতে যদি না চলে, তখন একেবারে উলঙ্গ সিনিসিজ্‌মের আড়ালে গা বাঁচায়। উভয় ক্ষেত্রেই নিত্যনৈমিত্তিক দয়ামায়ার অত্যন্ত অভাব। কাউকে হয়তো আপনি দলে টানতে পারেন, কাউকে হয়তো ভয় দেখাতে পারেন, কিন্তু কারও হৃদয়ে সাড়া জাগানো কিংবা ক্ষুধার অশ্রুজলে কারও কাছ থেকে পাউন্ড দশেক রুটি জোগাড় করা সে প্রায় অসম্ভব।

বাড়তি টুকিটাকি জিনিষ যা কিছু আমাদের সঙ্গে এনেছিলাম—রুটি, ডিম আর মাছের বিনিময়ে সে সব খরচ করেছি। দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌নার কোট—যেটা গায়ে দিয়ে সেই শরৎকালে সামারা থেকে পালিয়ে আসে—অনেকবার লোভ হয়েছিল সেটা বিক্রি করি। কিন্তু করিনি। শরতের ঠান্ডা দিন আসছে, শুধু এই কথা ভেবেই যে বিক্রি করিনি তা নয়। বিক্রি না করার প্রধান কারণ ছিল যে, ভুল বকার সময় কোটটার কথা বার বার বলত দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না—কোটের

সঙ্গে কি যেন অভিযোগ জড়িত আছে, কিন্তু কি তা বুঝতে পারতাম না। যাই হোক, বিক্রি যখন করা চল্ল না তখন আমাকে প্রতারণার পথই ধরতে হল—বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করলাম, এমন কি সোজাসুজি চুরিও করলাম। লোকের হাত দেখতে জানি, তাই আরও সুবিধা। বস্তা-বোঝাই মাল নিয়ে কোনো কৃষক রমণী হয়তো ঘাটের ধারে এসেছে—দেখবামাত্র ওর সঙ্গে বকর বকর লাগিয়ে দিই, খালি খুঁজতে থাকি যে, ওর দুর্বল জায়গাটা কোথায়। দুর্বল জায়গা কার না আছে, একটু সাংসারিক বুদ্ধি থাকলেই খুঁজে বার করা যায়। তারপর আলাপ জুড়ে দিই 'এণ্টি-ক্রাইস্ট'* সম্বন্ধে—আজকাল ভল্‌গা অঞ্চলে বিশেষ ক'রে কাজানের ওপরের দিকে এণ্টি-ক্রাইস্টের কথা খুব চলেছে। বোকাসোকা মেয়েমানুষকে ভয় দেখানো আর এমন কি শক্ত! একবার ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেই ব্যস্—বস্তার অর্ধেক মাল হাতে আসবেই......

এই গতকালের কথা। দিনটা রবিবার, তাই বসে বসে দারিয়া দেবীর পোষাক আশাকগুলো মেরামত করছিলাম। একটি বেশ বড় গোছের সুতোর কাটিম আমার হাতে আছে, এ বিষয়ে কস্ত্রমা শহরের মধ্যে আমি বোধ হয় একমেবাদ্বিতীয়ম্। সামান্য কথা নয়—লোকে একেবারে তীর্থ দর্শনের মতো দলে দলে আসে আমাদের এখানে—কারও প্যাণ্টে বোতাম সেলাই ক'রে দিতে হবে, কারও তালি লাগিয়ে দিতে হবে—হরদম লোক আসছে।......এর বদলে খাবার জিনিষ আদায় করতে আমি দ্বিধা করিনে।......যাই হোক, একদিন সিঁড়িতে বসে দারিয়া দেবীর কোটটা খুলে দেখছি, সেই যে ছককাটা ফ্ল্যানেলের লাইনিং লাগানো কোট, সেইটা। ভাবছি যে, লাইনিংটা খুলে নিলে ক্ষতি কি, ওর থেকে খাসা ঘাগরা বানানো যাবে। ওর পুরোনো ঘাগরাটা তো একেবারে শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।......লাইনিং? সস্তা কাপড় দিয়ে আর একটা বানিয়ে দিলেই হবে। কথাটা খুব মনে ধরল, আনিসিয়া নাজারোভাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার মত কি। তারও ঐ মত। বল্ল, 'খাসা ঘাগরা হবে, সেলাই খুলে বার করে ফেলুন।' বসে বসে সেলাই খুলছি—ওমা, দেখি কি, হীরে বেরিয়ে পড়ছে। দামী হীরে, মোটমাট চৌত্রিশটা।......তার মানে, ওর বিকারের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে, বুঝলেন? হীরেগুলো নিয়ে দারিয়া দেবীকে দেখাই সেই দিনই। দেখবামাত্র হঠাৎ উপলব্ধি করলাম—হ্যাঁ, ওর মনে পড়েছে। চোখে সে কী কাতরতা আর আতঙ্ক!—কি ক'রে কথা বলতে হয় তা তো ও ভুলে গেছে, তবু মনে হ'ল ঠোঁট দুটি যেন কি কথা উচ্চারণ করতে চয়। ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এসে শুনলাম—সেই অসুখের পর থেকে এই প্রথম ওর কথা ফুটল—আধো আধো শব্দে বল্লঃ 'ছুঁড়ে ফেলে দিন, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন......'

---

*খৃস্টানরা মনে করেন যে, যীশু খৃস্ট দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবার আগে 'এণ্টি-ক্রাইস্ট' নামে এক মহা-পরাক্রান্ত খৃস্ট-বিরোধী শক্তি পৃথিবীতে উপস্থিত হবে।

আপনার কাছ থেকে খবর না এলে কিছু করতে সাহস পাচ্ছিনে। হীরেগুলো দারিয়া দেবী কোথায় পেল, ওগুলো দেখলে ওর মনে অমন ঘৃণা জাগে কেন—কিছুই জানিনে। কি করব তাও ভেবে পাইনে—বাসায় রাখতে ভয় হয়, আবার ফেলে দেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না। দারিয়া দেবীকে অবশ্য হলপ করে বলেছি যে, নৌকো করে ভলগার মাঝখানে গিয়ে হীরেগুলো জলে ফেলে দিয়ে এসেছি। শুনবামাত্র ও একেবারে শান্ত, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কি একটা পঙ্কিল জিনিষ গায়ে লেগে ছিল, এত দিনে যেন তার থেকে মুক্ত হল—ওর মুখের ভাব দেখলে তাই মনে হয়।

এত সবিস্তারে এ সব কথা লিখলাম সেজন্য কিছু মনে করবেন না, ইভান ইলিয়িচ। আমি একটা প্রকান্ড বাচাল তা তো জানেনই। যেমন ক'রে হোক আমাদের কাছে আপনার কুশল সংবাদ পাঠাবেন। আর শীতকালে আমরা এখানেই থাকব, না মস্কো যাবার চেষ্টা করব, তাও জানাবেন।...

আপনার ও দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌নার চির-অনুরক্ত

—কুজ্‌মা নেফেদভ।”

“ডাক নিয়ে এলাম,” গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে ঢুকে, তেলেগিনের পাশে খড়ের ওপর বসে পড়ে সাপঝকভ বল্ল। “তোমাকে অভিনন্দন জানাই ইভান!”

“খুবই দুঃখের কথা সার্গি ভাই। আমার যদি হাত থাকত তাহলে এখানে আমাদের কাচালিন বাহিনীর কমান্ডার হিসেবেই থেকে যেতাম। নতুন জায়গা, নতুন ঝঞ্ঝাট—ও সব আমার ধাতে সয় না।”

“তুমি যে বুড়ো মানুষের মতো কথা বলছ!”

“কেটে যাবে। একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই..”

মেঠো পথ ধ'রে ঘোড়াগুলো ধীর-কদমে ছোটে। গাড়ীর বাঁশে বাঁশে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয়। দূরে বাঁ দিকে ওক গাছের বন, অন্ধকার মতো। ডান দিকে মাঠের মধ্যে গমের আঁটিগুলো আড়াআড়িভাবে সাজানো রয়েছে—গোধূলির অন্ধকারে আবছা আবছা দেখা যায়। বাতাসে খড়ের গন্ধ। আগস্টের আকাশে তারা ফুটছে।

“ব্রিগেডে তোমার চীফ অফ স্টাফ কে হবে?”

“দেবে যাকে হোক।”

পথটা এখানে বনের কাছ ঘেঁষে এসেছে। অল্প ভিজে ভিজে হাওয়া আসে বন থেকে। ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি শুরু করে দেয়

“আমার চিঠি নিশ্চয়ই নেই, তাই না?” তেলেগিন জিজ্ঞাসা করে।

“ওঃ হো, আছে তো একটা! কিছু মনে করো না ইভান, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।”

ক্লান্তভাবে ঢুলতে ঢুলতে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে বসেছিল ইভান। এবার একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল:

"আরে, এতক্ষণ তাও বলনি! দাও দাও, কোথায় আছে দাও।"

থলির মধ্যে অনেকক্ষণ ধ'রে খুঁজতে হ'ল সাপঝকভকে। গাড়ী থামিয়ে ওরা দেশলাই কাঠি জ্বালে—একটার পর একটা—কিন্তু কাঠিগুলো এক মুহূর্ত হিস ক'রেই ব্যাস—কাঠির মাথা খুলে বেরিয়ে যায়। অবশেষে চিঠিটা তেলেগিনের হাতে এল। চিঠি লিখেছে কুজমা কুজমিচ। চিঠি হাতে নিয়ে বার বার উল্টে পাল্টে দেখে তেলেগিন।

"খুব মোটা চিঠি তো—অনেক কথা লিখেছে কুজ্‌মা," ফিস ফিস ক'রে বলে সাপঝকভ।

"সেটা কি খারাপের লক্ষণ?" তেমনি ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে তেলেগিন।

লাফিয়ে মাটিতে নেমে তেলেগিন গেল বনের ধারে। তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা ডালপালা জড়ো করে দেশলাই জ্বালাল. তারপর ফুঁ পাড়তে লাগল।

"আরে. এক আঁটি খড় দাও, দেখবে এখুনি আগুন ধরে যাবে!" বলে সাপঝকভ দৌড়ে গিয়ে গমের খড় এনে দিল এক আঁটি। দিয়ে তফাতে সরে এল। খড়ে আগুন ধরতে দেরী হয় না। আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে চিঠি পড়ে তেলেগিন। দূর থেকে সাপঝকভ দেখল—চিঠি পড়া শেষ ক'রে জামার হাতায় চোখ মুছল তেলেগিন, তারপর আবার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল। হুঁ, তার মানে দাশা আর নেই। জোরে শ্বাস ছাড়ল সার্গি। গাড়ীতে ফিরে এসে একটা সিগ্রেট ধরাল। যে বুড়ো গাড়ী চালাচ্ছিল সে শীগ্গির শীগ্গির ঘরে ফিরতে চায়, তাই বল্ল:

"দেরী করলে আপনাদের ট্রেণ ধরতে পারবেন না। আর একটু দূরে রাস্তা আবার খুব খারাপ, খালি বালি। তা ছাড়া নদী পার হবার মতো জায়গাও খুঁজতে হবে...তাতেও দেরী হবে।"

ফিরে এসে গাড়ীতে উঠে খড়ের ওপর ধপ ক'রে বসল তেলেগিন। গাড়ীটা কাত হয়ে আবার সোজা হয়ে গেল। সাপঝকভ ওর মুখের দিকে আর ফিরে চায় না। ধীর কদমে যাত্রা শুরু করল ঘোড়া দুটো। মাথার ওপর আকাশে তিরিশ লক্ষ আলোক-বর্ষের পরিসর জুড়ে ছায়াপথ প্রসারিত—ঝাপ্‌সা, দ্বিধাবিভক্ত তার পুচ্ছ। গাড়ীর পেছন দিকের চাকাটা ঢিলে, ক্যাঁচকোঁচ করছে। কিন্তু বুড়ো গাড়োয়ান গ্রাহ্য করে না: ভাঙে তো ভাঙবে, তার কি আর করা যাবে...

রুদ্ধস্বরে কথা কইল তেলেগিন।

"ওঃ দাশার মনের কী জোর! অনবরত শুধু লড়াই করেই চলেছে—নতুন ক'রে গড়বে নিজেকে, খাঁটি হবে, নিখুঁত হবে...। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেছি।..."

"উনি তাহলে বেঁচে আছেন?"

"তুমি তবে কি ভেবেছিলে? ও তো কস্ত্রমাতে রয়েছে। এখন ভালর দিকে।"

সার্গি ওর দিকে মুখ ফেরাল। তারপর দুজনে মিলে কী হাসি! সাপঝকভ তেলেগিনের পিঠে কিল মারে, তেলেগিন মারে সাপঝকভের পিঠে। এ সব শেষ হলে তখন চিঠির খবর বিস্তারিত বল্ল তেলেগিন, হীরের কথাটা শুধু বাদ দিয়ে গেল। বছরখানেক আগে দাশা ওর বাপের কাছে যে হীরে-জহরতের কথা লিখেছিল, এ নিশ্চয়ই তাই হবে। দাশা তখন একেবারে নির্লজ্জ হয়ে নিজের জন্যে যুঝছে, আবার তিলে তিলে সর্বনাশও করছে নিজেরই—সেই সময়েই হীরেগুলো ওর হাতে আসে। ওর মনে তখন উভয় সংকট, সেই অবস্থায় দিশাহারা হয়েই বোধ হয় কোটের মধ্যে ওগুলোকে সেলাই করে নিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তেলেগিনের কাছে কোনো দিন কিছু উল্লেখও করেনি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল হয়তো—হ্যাঁ, ভোলাই ওর পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক ভুলে টুলে গিয়ে শেষকালে শুধু বিকারের ঘোরেই মনে পড়ল! আর যেই মনে পড়ল অমনি—"ছুঁড়ে ফেলে দিন, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন!"—কথাটা ভাবতেই অনির্বচনীয় আনন্দে তেলেগিনের মনটা ছেয়ে গেল। এ কাহিনীর অনেকখানিই অবশ্য বোঝা যায় না—কিন্তু তা হোক—দাশাকেই বা ও করে বুঝবার চেষ্টা করেছে?

"দেখ সার্গি, একটা কথা কিন্তু আমার কাছে একেবারে জলের মতো পরিষ্কারঃ কোনো মেয়ের, মানে দাশার মতো কোনো মেয়ের ভালবাসা পাওয়া —এ এক পরম সৌভাগ্য।"

"সত্যি, তোমার ভাগ্য ভাল তা তো আমি বরাবরই বলে আসছি।"

"নিজেকে উঁচুতে তুলবার জন্যে কত চেষ্টাই না করতে হয়, বুঝলে সার্গি তা সত্ত্বেও লোকে মাঝে মাঝে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।...তুমিও পড় বোধ হয়—পড় না?"

"আমার কথা আলাদা।"

"কেন? আমার দাশার মতো কোনো মেয়েকে পাবে—সে প্রত্যাশা কি নেই তোমার?"

"কেন জানিনে, কিন্তু আমার জীবনে মেয়েদের ভূমিকা অল্পই...। এ সব বিষয়ে আমার মনের ভাব একদম সহজ, সরল...তার মধ্যে কোনো হৈ চৈ নেই..

"এই, এই তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হল! আরে বাপু, তোমাকে কি আমি চিনিনে?...জীবন এখন উঁচু সুরে বাঁধা, সার্গি ভাইঃ হয় জয় না হয় মৃত্যু—ব্যাস, তাছাড়া আর কিছুতে আসে যায় না। কিন্তু আমরা বেঁচে তো আছি জীবন বলতে যা কিছু বোঝায় তার সবখানি নিয়েই বেঁচে আছি। নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সমস্ত তুচ্ছতা আমাদের বিসর্জন দিতে হবে।...প্রেম হবে সাধনার ধন। সতর্ক থাকতে হবে সারাক্ষণই! যাকে ভালবাস তার চোখে চোখ রেখে অন্তস্থল পর্যন্ত দেখেছ কখনো? জীবনের সে এক পরম রহস্য।..."

সার্গি নিরুত্তর। ওর টুপিটা নামতে নামতে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে এসে পড়েছে। আবার সেই ছায়াপথের দিকেই চেয়ে আছে সার্গি।

“ওপরে ঐ সৌরজগতের গায়ে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে, ফাঁকটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মাথার মতো,” সার্গি বল্ল। “সেখানে না আছে আলো, না আছে তারা—ফটোতে ছবি দেখলে ভয়ই লাগে। কিন্তু এমন এক দিন আসবে যেদিন আমরা অতি সহজে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে, অসীম মহাকাশের মধ্যে আতঙ্কের কিছুই নেই। আমাদের শরীরের প্রতিটি পরমাণুই তো এমনি এক একটা অপরিমেয় নক্ষত্র-জগত। যেদিকে চাও সেদিকেই অনন্তের বিস্তার। আমাদের নিজেদেরও কোনো সীমা নেই, আমাদের মধ্যে যা কিছু তারও কোনো সীমা নেই। সসীমের বিরুদ্ধে অসীমের জন্যেই তো তুমি, আমি সবাই লড়ছি...”

সামনে দূরে গাছপালার অস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়ে—প্রথমে মনে হয় বুঝি বড় বড় গাছ, কিন্তু পরে বোঝা যায় নদীর ধারের ছোট ছোট ঝোপ ওগুলো—আর কিছু নয়। শীতল সুগন্ধ ভেসে আসে নদী থেকে। গাড়ীটা এবার পাহাড়ের নীচে নামছে। নাক দিয়ে সজোরে শব্দ করতে করতে ঘোড়াগুলো ভয়ে ভয়ে জলে নামল। ওখানে জল বেশী নয়।

“গর্তে টর্তে না পড়লে বাঁচি”, বুড়ো গাড়োয়ান বল্ল।

নিরাপদেই নদী পার হ'ল ওরা। পার হবামাত্র গাড়োয়ান একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো অনায়াসে লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ী থেকে। লাগাম ধ'রে গাড়োয়ান টক টক শব্দ করে, আর বালির ওপর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়াগুলো গাড়ী ওপরে তোলে। বুড়ো আবার ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল। স্টেশন আর বেশী দূর নয়। যাত্রীদের দিকে ফিরে গাড়োয়ান বল্লঃ

“এতসব হুড়-হাঙ্গামায় কোনো ফল হবে না—উনি খালি শুধু শুধু মানুষ মারছে। গাঁয়ের লোকেরা বলেঃ ‘জমি আমরা ফেরত দিচ্ছিনে কিছুতেই। যা করবে কর, তা বলে গায়ের জোরে কি আর আমাদের দাবাতে পারবে? এটা তো আর ১৯০৬ সাল নয় বাপু! মুঝিকের এখন জোর বেড়েছে, ভয় ডর আর কিচ্ছু নেই।’ ঐ যে কলকল্ৎসাভ্কা গ্রাম,” ব'লে চাবুকটা অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে ধরল, “ওখানে ওরা এরোপ্লেন থেকে ইস্তাহার ছড়িয়েছিল। সে ইস্তাহার চাষীরা পড়ে দেখেছে—উনি নাকি জমি কিনে নিতে চায়। এই হ'ল অবস্থা—বিনে পয়সায় আমরা জমি ফেরৎ দেব, সে পিত্যেশা আর নেই ওদের..। যাকগে, আমাদের আর তাড়াটা কি? ওনাকেই শুধু ফিরে যেতে হবে—যেখান থেকে এসেছে সেখানে! হায়রে দেনিকিন!”

কজ্লভ্-এ দক্ষিণ রণাঙ্গনের হেডকোয়ার্টার—তেলেগিন আর সাপঝকভ্ সেখানে পেঁছাল সকাল বেলা। আপেল বাগিচার দেশ কজ্লভ্, একেবারে সত্যিকারের ‘রুশিয়া মা!’ কুঁড়ে ঘরগুলোর ছাতের খড় সাদা হয়ে আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে জানলায় জেরেনিয়াম শোভা দিচ্ছে। এবড়োখেবড়ো খোয়া-বাঁধানো রাস্তার ওপর ঢকাস ঢকাস করতে করতে ওদের ঝরঝরে দ্রশ্কি গাড়ীটা প্রচণ্ড

ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলেঃ অনাথ বালকের মতো নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে টেলিগ্রাফের থাম্বাগুলো, ছেঁড়াখোঁড়া ঘুড়ির টুকরো ঝুলছে তার থেকে; তারপর গ্রাম্য মুদীর দোকান-ঘর, পাকা গাঁথনি, সামনে একটু চাঁদোয়া খাটানো—আড়াআড়ি কাঠ মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে; গাড়ীর সামনে দিয়ে একটা ছোট মেয়ে, খালি পা, ভয়ে ভয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়—সঙ্গে আবার তার ছোট্ট ভাই, ধনুক বাঁকা পায়ে টলে টলে চলে, তাকেও টেনে নিয়ে চলেছে; নোংরা চৌমাথাটাতে আগে বাজার বসত, এখন তার কিছু নেই; চৌমাথায় সরকারী জলাধারের পাশে একটা গির্জা, ভেঙে চুরে পড়ে আছে, রাস্তা থেকে আবর্জনাগুলোও সরানো হয়নি। নড়বড়ে নড়বড়ে বেড়া, অর্ধেক বাঁশই হয়তো উড়ে গেছে—তার পেছনে আপেল গাছ, আপেলে আপেলে ভর্তি—কোনোটা লাল, কোনোটা বা সবুজ মোমের মতো। বাড়ীর ছাত আর বাগানের মাথা ছাড়িয়ে মহা ফুর্তিতে একঝাঁক দাঁড়কাক উড়ছে আকাশে—ওড়ার তালে তালে তাদের ডানার উল্টো পিঠগুলো একই সঙ্গে চোখে পড়ছে।

কালাকাল-জ্ঞানের পরোয়া না রেখে এখানকার বাসিন্দারা বোধহয় আরও হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারত—যদি ঐ ঘটনাটা না ঘটত, মানে বিপ্লব না আসত। যাই হোক, তা বলে দুঃখ করবার কিছু নেই, জীবন এখানে কোনো দিনই চলনসই অবস্থার ওপরে ওঠেনি। তবে লোকে খুব ঘুমতে পারত, এই যা।

“শুধু একবার ভেবে দেখ!” তেলোগিনের পাশে বসে গাড়ীর ঝাঁকুনি খেতে খেতে সাপঝকভ্ বল্ল। “ঠিক এখনই সাগরপারের কত দেশে হয়তো প্রতিটি মুহূর্ত গলিয়ে গলিয়ে টাকা তৈরী হচ্ছে; বিরাট যন্ত্রের পাকে পাকে মানুষকে চেঁচেছুলে একেবারে সমান করে দিচ্ছে—যাতে কলকারখানার কাজে লাগে। দুঃস্বপ্নের ঘোরের মতো অনবরত মাল তৈরী করে চলেছে কারখানায় কারখানায়;—এই মাল বেচবার ফুরসৎ পাবার জন্যেই এক কোটি মানুষকে খুন করতে হয়েছিল। এরই নাম সভ্যতা! অথচ এখানে দেখ—ছেঁড়া ঘুড়ি ঝুলছে টেলিগ্রাফের তার থেকে!......ঐ লোকটার দিকে চাও, ঐ যে ঐ জানলার ধারে—এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, উস্কোখুস্কো মাথাটা চুলকোচ্ছে।......তবু এইখান থেকেই আমরা ঝাঁপ দিতে চলেছি অজানা ভবিষ্যতের বুকে—মানুষ যা শুধু স্বপ্নে দেখেছে তাই আমরা গড়ব।......এই তো আমাদের ‘রুশিয়া মা’! জীবন কী সুন্দর ইভান......আর আপেলের কী মিষ্টি গন্ধ—মনে হয় যেন তরুণীর অঙ্গরাগ।......আহা, যদি বেঁচে থাকি, যদি সব দেখে যেতে পারি! আমার মনে হচ্ছে একটা বই লিখে ফেলব......।”

দ্রশ্কি এসে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাল। হেডকোয়ার্টারের জানলা টানলা সব খোলা, টাইপরাইটারের খটাখট আওয়াজ আসছে।

কখন ডাক আসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সাপঝকভ্ আর তেলোগিন যুদ্ধের খবর টবর সব শুনে নিল। খবরের সারমর্ম এইঃ সাময়িক

প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম ক'রে দেনিকিনের সৈন্যদল এখন মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা তিনটি দলে বিভক্তঃ প্রথমত, জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের উত্তর ককেসীয় আর্মি (গত জুলাইয়ে এদের ব্যূহ ভেদ করেই লালফৌজের দশম আর্মি বেরিয়ে আসে—অবশ্য তার জন্যে তাদের কামিশিন শহর বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়)—তারা আসছে ভল্‌গা নদী বরাবর—তাদের অভিযান-মুখে ভল্‌গা আর সাইবেরীয়া অঞ্চলের শস্যময় এলাকাগুলি মধ্য রুশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে; দেনিকিনের প্রিয়পাত্র আতামান বোগাইয়েভ্‌স্কি কর্তৃক পুনর্গঠিত দন আর্মি হল ওদের দ্বিতীয় দল—সেই আর্মি নিয়ে ভরোনেঝ অভিমুখে জোর হামলা শুরু করেছে আতামান সিদরিন—সে হামলার অগ্রভাগে আছে মামন্তভ আর শ্‌কুরোর 'অভিজাত' অশ্বারোহী বাহিনী দুটি; আর তৃতীয় দল হল মাই-মায়েভ্‌স্কি পরিচালিত ভলাণ্টিয়ার আর্মি (মাই-মায়েভ্‌স্কি প্রতিভাবান জেনারেল, কিন্তু প্রায় সব সময়ই নেশায় চুর হয়ে থাকেন)—বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন জুড়ে সে আর্মি এক বিরাট আক্রমণ গড়ে তুলেছে—একদিকে যেমন ইউক্রেন থেকে রেড সৈন্য আর গেরিলা ডিট্যাচমেণ্টগুলোকে তাড়িয়ে আনছে, তেমনি সংগে সংগে 'ঘুষির' আকারে জেনারেল কুতেপভের 'গার্ড কোর' নিয়ে আক্রমণোদ্যোগ করছে ওরেল, তুলা তথা মস্কো অভিমুখে।

দেনিকিনের সামরিক সাফল্য অনস্বীকার্য। তাঁর বাহিনীর সাজসরঞ্জাম, জিনিষপত্র সবই খুব চমৎকার: ভলাণ্টিয়ার রেজিমেণ্টগুলিতে অবশ্য কৃষকের সংখ্যা অনেক, তাহলেও তারা বেশ ভরসার সংগেই বে-পরোয়াভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে বিপদের গুরুত্ব দেনিকিনের চোখে পড়ছে না তা হল তাঁর বাহিনীর পেছনদিককার অবস্থা—সেখানে লোকের অসন্তোষ দিনে দিনে বেড়েই চলেছেঃ কুবান দাবী তুলেছে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই—সে দাবীর বিরুদ্ধে রুশিয়ার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কুবান 'রাদা'-র (বিধান পরিষদের) দু দুজন প্রভাবশালী সদস্যকে ফাঁসিতে চড়াতে হয়েছে; তেরেক নদীর দু ধারের এলাকায় রক্তক্ষয়ী লড়াই চালাতে হচ্ছে। 'মস্কো চলো' বলে দন কসাকদের কাছে যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তার জবাবে কসাকরা বলছেঃ "শান্ত দন আমাদেরই ছিল, আমাদেরই থাকবে; কিন্তু যদি মস্কো দখল করতে হয় তো দেনিকিন নিজেই করুন"; ভলাণ্টিয়ার বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত এলাকায় কৃষক সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে সহজ, সরল, সামরিক কায়দায়, অর্থাৎ ডাণ্ডার চোটে; জার আমলের যত সব প্রদেশপাল, জেলাশাসক, পুলিশকর্তা তারাই আবার গদিতে বসছে—মুঝিকরাও আবার সেই গত বছরের কায়দা শুরু করেছে, জার্মান-দখলদারী সময়ের মতো বন্দুক-টন্দুক সব দু ভাগে কেটে সরিয়ে রাখছে, রেড-আর্মি কবে আসে তারই দিন গুণছে; ওদিকে মাখনো তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আতামান গ্রিগরিয়েভকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতেই সাবাড় করে ফেলে এখন খোলাখুলিই ফর্মান জারি করেছে যে, একাতেরিনোস্লাভের আশেপাশে সমস্ত জেলায় 'স্বাধীন এনার্কিস্ট ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা হল; হাজার পঞ্চাশেক দস্যুকে

নিজের পতাকাতলে সমবেত করে সে এখন দেনিকিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চলেছে তাগানরগ, ক্রাইমীয়া, একাতেরিনোস্লাভ আর ওদেসা।......তার ওপর এখন আবার 'গ্রীন্‌স্‌' নামে এক নতুনতর কসাক দস্যুদলের আবির্ভাব হয়েছে—এরা সকলেই পলাতক সৈন্য। যেখানেই পাহাড় বা জঙ্গল সেখানেই তাদের জ্বালাতনে একেবারে অস্থির।

লালফৌজের নয় আর তেরো নম্বর আর্মি ভয়ঙ্কর মার খেয়েছিল। বারো নম্বর আর্মিও বীরের মতো লড়তে লড়তে পিছু হটে এসেছিল নীস্তান আর বাগ নদী এলাকা থেকে। তারপর এখন লালফৌজ তার যুদ্ধের লাইন সোজা করে তুলেছে। পেত্রোগ্রাদ. মস্কো, ইভানভো প্রভৃতি উত্তরের শহর থেকে দলে দলে কমিউনিস্টরা এসে যোগ দিয়েছে রেড আর্মিতে—প্রধানত সেই কারণেই রেড আর্মির সৈন্যদের মনোবলও এখন আগের চেয়ে অনেক দৃঢ়, তাদের সংগ্রামের শক্তিও অনেক বেশী। প্রতি আক্রমণের আদেশ এল বলে—সবাইয়েরই এই আশা।

তেলেগিন আর সাপঝকভের পদোন্নতির আদেশ অনুমোদিত হয়েছে—আলাদা একটা ব্রিগেডের ভার পেয়েছে তেলেগিন, আর সাপঝকভ হয়েছে কাচালিন রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার। অনুমোদন পেয়ে সেই দিনই ওরা ফিরে চল্ল। এখানে অনেক খবর শুনেছে, ফেরার পথে যেতে যেতে সারাক্ষণ ধরে তারই আলোচনা করে দুজনে। দেনিকিনের পরিকল্পনা চমকদার হলেও তার যে কোনো শক্ত ভিত্তি নেই সে বিষয়ে ওরা একমতঃ গত বছর কুবানে দেনিকিন যে সাফল্য দেখাতে পেরেছিল এবার গ্রেট রুশিয়ায় আর তা দেখাতে হচ্ছে না—কুবানে তো শুধু সরোকিনকে হারিয়েছিল, কিন্তু এবার আছেন লেনিন স্বয়ং, আর তাঁর খাঁটি, সাচ্চা জাত-শ্রমিকের দল। তা ছাড়া এদিককার মুঝিকরাও বড় কঠিন চীজ—যারা একদিন কাঁটা-কোদালের ডগায় গেঁথে নেপোলিয়নকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রুশিয়া থেকে, এরা তাদেরই বংশধর।

“রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডা আগে বাড়াও! খাপ খোলো!”

সামনে এসে দাঁড়াল ঝাণ্ডা-বরদার, আর তার পাশে দুজন পাহারাদার লাতুগিন আর গাগিন। রেজিমেণ্টের নতুন কমাণ্ডার সার্গি সার্গিয়েভিচ সাপঝকভ—তার হাতে রেজিমেণ্টটাকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছে তেলেগিন। তেলেগিনের মুখ গম্ভীর, চিন্তাকুঞ্চিত—রোদে-পোড়া গাল থেকে সমস্ত রংই যেন অন্তর্ধান করেছে। ওর হাতে একখানা কাগজ, তাতে বক্তৃতার পয়েণ্ট লেখা আছে।

“কাচালিন ভাইসব!” বলে লাল সৈনিকদের দিকে চাইল তেলেগিন। সৈনিকরা এটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের প্রত্যেককেই ও জানে; কে কোথায় চোট পেয়েছে, কার মনে কি দুঃখ, সব জানে—ওরা যে ওর আপনার লোক। “কমরেডস! কত শীত, কত গ্রীষ্ম তোমরা আর আমি একসঙ্গে মার্চ করেছি হাজার হাজার মাইল।......জারিৎসিনে তোমরা অসীম গৌরব লাভ করেছ—দু দুবার। সেখান থেকে পিছু হটতে হয়েছে সে দোষ তোমাদের নয়—কিন্তু শত্রুর সেই সাময়িক,

অনিশ্চিত সাফল্যের জন্যেও তার কাছ থেকে ভয়ঙ্কর দাম আদায় করে ছেড়েছ তোমরা। তোমাদের বীরত্বের ইতিহাস বড় কম নয়—যদিও সে কাহিনী কেউ ঘটা করে লিখে রাখেনি, সরকারী বুলেটিনের অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে তার ইতিবৃত্তও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।......কিন্তু তাতে কি আসে যায়......।" (তেলোগিন হাতের কাগজটা একবার চট করে দেখে নিল!) "ভবিষ্যতে আরও অনেক কষ্ট আছে তা মনে রেখো। শত্রু এখনো পরাস্ত হয়নি। আর শত্রুকে পরাস্ত করাই যথেষ্ট নয়, তাকে একেবারে শেষ করতে হবে।......এ যুদ্ধে জিততেই হবে—হার হওয়া অসম্ভব। মানুষ আজ লড়ছে বুনো জানোয়ারের সঙ্গে—তাতে মানুষকে তো জিততে হবেই।......কিংবা আর একটা উদাহরণ ধরঃ শস্যের কচি কচি অঙ্কুরগুলি কী দুর্বল, কত ক্ষীণজীবী, কিন্তু সে অঙ্কুরই বেরিয়ে আসে কালো মাটি ভেদ করে, পাথর সরিয়ে দিয়ে। উদ্গত অঙ্কুরের বুকে রয়েছে নতুন জীবনের সমস্ত শক্তি—সে শক্তি ভূমিষ্ঠ হবেই, কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। ঠাণ্ডা কনকনে শীতের প্রভাতে আমরা লড়াই শুরু করেছি আলো-ঝলমল নতুন দিনের জন্যে। ওদিকে আমাদের শত্রুরা চায় রাত্রির অন্ধকার, চোর-ডাকাতের উপযুক্ত সময়। কিন্তু শত্রু যতই রাগে ফুলুক আমাদের দিন আসবেই...।" (সন্ত্রস্তভাবে আবার নোটটা দেখে নিয়ে কাগজটা হাতের মধ্যে দুমড়ে ফেল্ল তেলোগিন।) "কমরেডস তোমাদের অভাব আমাকে সারাক্ষণই অনুভব করতে হবে, তোমরা কাছে না থাকায় আমাকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হবে, তা স্বীকার করি।.....একটা গোটা বছর ধরে আমরা কত যুদ্ধের কত তাঁবুতে এক সঙ্গে কাটিয়েছি—সে তো কম কথা নয়। আজ আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, বিদায় নিতে হচ্ছে তোমাদের সংগ্রামী পতাকার কাছ থেকে। গৌরবময় কাচালিন রেজিমেণ্টকে এই পতাকা যেন জয় থেকে জয়ান্তরে পরিচালিত করে—এই আমার কামনা, আমার দাবী।"

মাথার টুপি খুলে পতাকার কাছে দাঁড়াল তেলোগিন। বুলেট-বিদীর্ণ, বিবর্ণ বস্ত্রখণ্ড—তার একটা কিনারা মুখের কাছে তুলে ধরে চুম্বন করল, টুপি মাথায় চড়িয়ে স্যালুট দিল। চোখ দুটো তখন বন্ধ—কুঞ্চিত রেখায় রেখায় মুখটা একেবারে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

সাপঝকভ আর অন্য সব কমাণ্ডারেরা মিলে তেলোগিনকে বিদায় ভোজ দিল। পানাহারের পর তেলোগিনের বেশ একটু গোলাপী গোলাপী অবস্থা—ছই তোলা গাড়ীর মধ্যে কিটব্যাগটা (তার ভেতর আর সব জিনিষের সঙ্গে দাশার সেই মাটির বেড়াল আর কুকুর ছানাটাও আছে) পাশে নিয়ে বসে মহা আবেগের সঙ্গে ভোজ-সভার বক্তৃতাগুলো স্মরণ করছে। আহা, মানুষে মানুষে এত ভালবাসা আর হয় না বোধহয়। ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে, চুম্বন করেছে, হাতে হাত মিলিয়ে আর ছাড়তেই চায়নি। কী সুন্দর লোক ওরা সবাই—যেমন সাচ্চা তেমনই ইমানদার! লাফিয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে ছোকরা কমাণ্ডাররা, বিশ্ব বিপ্লবের জয় কামনা করে ঊর্ধ্বে তুলেছে পানপাত্র; তাদের বক্তৃতা হয়তো অতি-সরল, কিংবা অতি

অলংকৃত—কিন্তু তা বলে আস্থার দৃঢ়তা কিছু কম নয়। ব্যাটালিয়ান কমান্ডার বেশ ধীর, নম্র স্বভাবের মানুষ—হঠাৎ আবেগের আতিশয্যে তার ইচ্ছা হল যে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াবে। যে কথা সেই কাজ, উঠেই দাঁড়াল। চিবোনো হাঁসের হাড় আর তরমুজের খোলা ছড়ানো চারদিকে—তারই মাঝখানে লাগিয়ে দিল এক প্রচণ্ড কসাক নৃত্য! এ কথা মনে পড়তে হো হো করে হেসে উঠল তেলেগিন।

গ্রাম পার হবার মুখে গাড়ীটা থামল, কাছে এগিয়ে এল তিনটি মূর্তি—লাতুগিন, গাগিন আর জাদুইভিতের। তিনজনের অভিবাদনাদি সাঙ্গ হলে লাতুগিন বল্ল ঃ

“ইভান ইলিয়িচ, আমরা ভেবেছিলাম আপনি আমাদের ভুলবেন না। কিন্তু আপনি ভুলেই গেছেন।”

“হ্যাঁ, আমরা আপনার আশায় ছিলাম”, বলে গাগিন সায় দিল।

“কী ব্যাপার কমরেডস? কী বলছ তোমরা?”

“আমরা আপনার আশায় ছিলাম”, চাকার ধুরোর ওপর পা রেখে লাতুগিন বল্ল। “পুরো একটা বছর আপনার সঙ্গে পাশাপাশি দিন কাটালাম—পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে কত মিল ছিল! কিন্তু সেসব কথা আপনার আর মনে নেই—তাই তো বোধ হচ্ছে। তার মানে এইখানেই শেষ, কেমন না?......”

খুব রাগ করেছে লাতুগিন, গলাটা কাঁপছে।

“আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও!” বলে উঠল তেলেগিন। গাড়ী থেকে নেমে এল।

“এখানে এই পদাতিক বাহিনীতে আমাদের কি কাজ?” জাদুইভতের শুধাল। “এ জিনিষ আমাদের জন্যে নয়। চিরব কি ধুলো মাড়িয়ে চলতে হবে?”

“নৌবহরের গোলন্দাজ আমরা—আমাদের মতন লোক যেখানে সেখানে পড়ে থাকে না”, চকচকে চোখ করে গাগিন বল্ল।

“নিঝনিতে আমরা ছিলাম বারো জন”, লাতুগিন শুরু করল, "আর এখন আছি শুধু তিনজন—আপনাকে ধরলে চারজন। অথচ আপনি দিব্যি হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে গাড়ী হাঁকাচ্ছেন। আমরা তো আর মানুষ নই, আমরা হলাম জওয়ান, মামুলি সিপাহী মাত্র।......আপনি আমাদের ভাল করেই জানতেন, কিন্তু হঠাৎ আমরা যেন একেবারে উপে গেছি। মরুক গে, আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভই বা কি, আপনি তো এখন নেশায় একদম চুর!”

“আস্ত একটা ব্রিগেডের ভার পেয়েছেন”, মাঝখানে ফোড়ন কাটল জাদুইভিতের “এখন ভারী আর্টিলারি তো আপনার তাঁবেই থাকবে।......”

“চুলোয় যাক তোমার আর্টিলারি!” বলে লাতুগিনের কী হাঁক! “দরকার হলে আমি মেথরের কাজ করতেও পিছ-পা হব না। কিন্তু একটা মানুষকে খোয়াব—সেটাই আমি সহ্য করতে পারছিনে! আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, ইভান ইলিয়িচ, ভালোবেসেছিলাম।......কাউকে ভালবাসার মানে কি জানেন? কিন্তু এখন দেখছি আপনার কাছে আমি হলাম—'ডান দিক থেকে পাঁচ নম্বর', ব্যস

আর কিছু নয়। যাক গে, বক বক করে আর কি লাভ? যান এখন, যেতে যেতে বুঝবেন আমরা কি বলতে চেয়েছি, কিন্তু বলিনি......"

ওদের কথা শুনে ইভান ইলিয়িচের মাথা একেবারে ঠাণ্ডা। বল্ল: "কমরেডস! আপনারা আগেভাগেই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেছেন। আমার বরাবরই ইচ্ছে আছে যে, ব্রিগেডে যোগ দেওয়া মাত্র আপনাদের তিনজনকে আমার আর্টিলারি বহরের জন্যে ডেকে পাঠাব।"

"ধন্যবাদ," বল্ল জাদুইভিতের। ওর মুখের অন্ধকার ভাবটা কেটেছে।

কিন্তু লাতুগিন ছেঁড়া বুট দিয়ে মাটিতে দুম দুম করে।

"ওঁর কথা সব মিথ্যে—এক্ষুনি ভেবে ভেবে বানিয়েছেন।" তারপর সুর একটু নরম হল, কিন্তু আঙুল তুলে তেলেগিনকে শাসাতে ছাড়ল না। শাসাতে শাসাতে বল্ল: "শুধু বিবেকে বাধলেই কি আর বেশী দূরে যাওয়া যাবে কমরেড? যাই হোক, তবু ধন্যবাদ।"

হাসতে হাসতে তেলেগিন ওর কাঁধ চাপড়ায়:

"কী মাথা গরম বাবাঃ। কিন্তু আমার প্রতি তোমরা অবিচার করছ।"

"বিচার নিয়ে আমি করব কী কচুপোড়া—আমি তো আর কাউকে ঠকাতে যাচ্ছিনে। তবে আপনি যেরকম সাদাসিধে লোক, আপনাকে মাফ না ক'রে পারা যায় না। ঐজন্যেই তো মেয়েগুলো সব আপনাকে দেখলেই মরে। আচ্ছা, আচ্ছা, রাগ করবেন না, এখন গাড়ীতে উঠুন।" তারপর তেলেগিনের কনুইটা সজোরে চেপে ধরে ফের বল্ল: "কমরেডের জন্যে শত্রুর ছুরির সামনে বুক পেতে দিতে কেমন লাগে তা জানেন? কখনো দিতে হয়নি বুঝি?" ওর হাল্কা, ফাঁক ফাঁক চোখ দুটি নিরুত্তাপ অথচ আবেগময়। তেলেগিনের মুখের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বল্ল: "এক্ষুনি যা বল্লেন, সেটা মিছে কথা—তাই না?"

"অ্যাঁ, হ্যাঁ মিছে কথা। তোমরা আমাকে কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ, আমার চৈতন্য হয়েছে।......"

"সাবাশ, এই তো কথার মতো কথা!"

"আরে বাবা ওঁকে ছাড় না এখন, পেছনে না লাগলেই কি নয়? আবার সেই 'সৃষ্টি কর্তার' খেল ধরেছ বুঝি? জ্বালালে বাপু!" গম্ গম্ শব্দে ছাড়ল গাগিন।

এবার বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় নিয়ে তেলেগিন গিয়ে গাড়ীতে উঠল। পথ চলতে চলতে কতবার যে মুচকি হাসে আর ঘাড় নাড়ে তার আর ঠিক নেই।

প্লেনে গেলে স্পেশ্যাল ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতে সময় লাগে এক ঘণ্টা, আর ঘোড়ায় গেলে এক দিনের একটু বেশী। ইভান ইলিয়িচ গেল ট্রেনে—তাতে চার দিন লাগল। বার বার গাড়ী বদল করতে হয়—নোংরা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কত স্টেশনে জড়ভরতের মতো বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা—ক্লান্তির একেবারে একশেষ। সেলুন গাড়ী তৈরী থাকবে বলে ওকে ঘটা করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—সে গাড়ীর যে হদিসই মিল্ল না তা বলা বাহুল্য। পথের শেষ অংশটা আবার মালগাড়ীতে, গরু ভেড়া চালানের মালগাড়ী—এখন তার অর্ধেক

বোঝাই করে খড়ি চালান যাচ্ছে। এমন ধারা সময়ে এত খড়ি কার দরকার, কি জন্যে দরকার তা বলা শক্ত। গোদের ওপর বিষফোঁড়া—গাড়ীতে আবার আর একজন ভাগীদার। লোকটার ইয়া মোটা মুখ, দেখলে মনে হয় যেন কলসীর গায়ে কেউ বুঝি একটা প্যাশনে চশমা পরিয়ে দিয়েছে। তাকের ওপর শুয়ে শুয়ে অনবরত খালি একই সুরে ভাঁজে—অফেন্‌বাক অপেরার একটা সুরঃ "তুলুজের হ্যাম আরে তুলুজের হ্যাম, কিন্তু শরাপ বিনে নোনতা লাগে বড্ড......।" সন্ধ্যা হলে লোকটা তার লটবহরের মধ্যে হাঁতড়াতে লাগল—এ থলির মাল খুলে ও থলিতে ভরে, এটা ওটা বার করে শুঁকে শুঁকে দেখে, তারপর আবার ভেতরে রেখে দেয়।

অবসাদের ক্লান্তিতে ইভান ইলিয়িচের প্রায় বমি হবার জোগাড়। খিদেও খুব পেয়েছে। আস্তে আস্তে বেশ বুঝতে পারল যে নানা রকম খাবারের গন্ধ নাকে লাগছে। শেষকালে হতভাগাটা যখন বেশ শক্ত একটা সেদ্ধ ডিম বার করে ভেঙে ছাড়িয়ে খাওয়া আরম্ভ করে দিল, ইভান ইলিয়চ আর থাকতে পারল নাঃ

"দেখুন নাগরিক মশাই, আর এক মিনিটের মধ্যেই ট্রেণ থামবে। ট্রেণ থামামাত্র মালপত্র নিয়ে এখান থেকে আপনাকে কেটে পড়তে হবে, বুঝেছেন?"

অপর ব্যক্তির চিবোনোর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, অন্ধকারের মধ্যে সে বসে রইল, নড়ে না। একটু পরেই সসেজের কড়া গন্ধ—একেবারে ঠিক তেলেগিনের নাকের নীচে। সসেজধারীর অদৃশ্য হাতটাকে রাগের চোটে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল তেলেগিন।

"কমরেড সিপাহী, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন", বেশ কোমল অথচ পুরুষালি সুরে লোকটি বলে। "শুধু একটু পানভোজনের জন্যেই আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিলাম।" বলে 'আ-আঃ' শব্দে লম্বা শ্বাস টানল লোকটি। সসেজ আবার এগিয়ে এসেছে—তেলেগিনের নাক সে খবর জানিয়ে দেয়। "আজকাল অবিশ্যি নীতি ছাড়া কথা নেই—চারদিকে স্রেফ নীতি আর নীতি! কিন্তু ইউক্রেনের সসেজ, তার সঙ্গে নীতির কি সম্বন্ধ? সসেজের মধ্যে রসুন আছে, শুয়োরের চর্বি আছে। পানীয়ও আছে—ফোঁটা দুই করে কুলিয়ে যাবে দুজনের।" সাড়ার আশায় ও একটু থামল, কিন্তু তেলেগিন একেবারে চুপচাপ। "আপনি বোধহয় আমাকে চোরাকারবারী, নয়তো মুনাফাশিকারী—ঐ রকম কিছু বলে ধরে নিয়েছেন।......মাফ করতে হল—আমি তা নয়, আমি নাট্যশিল্পী। কাচানভ কি ইউরেভের মতো অত বড় না হতে পারি। না হতে পারি মামন্ত দাল্‌স্কির মতো —আহা ঈশ্বর তার পাপিষ্ঠ আত্মার সদ্‌গতি করুন। হ্যাঁ, বিয়োগান্ত অভিনয় জানত বটে লোকটা! কিন্তু হারামজাদাটা ভাবল যে সে-ই বুঝি বিশ্ব-অরাজকতন্ত্রের হর্তাকর্তা বনে গেছে—মস্কোর বড় বড় প্রাসাদে গিয়ে লুটপাটই লাগিয়ে দিল। আর ওর সঙ্গে তাস খেলতে বসলে তো রক্ষাই থাকত না। আমার নাম বাশ্‌কিন-রাজ্‌দর্সকি। মফঃস্বলের জেলায় জেলায় নামটা একেবারে অপরিচিত নয়, অগ্রগণ্যদের মধ্যেই দেখতে পাবেন।......" আবার একটু থামল, মনে হয় যেন আশা করছে যে এবার তেলেগিন বলে উঠবেঃ "ও, বাশকিন-রাজদর্সকি? তাই

বলুন! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুসী হলাম!" কিন্তু তেলেগিন রা কাড়ে না। "মস্কোতে দু বছর অভিনয় করেছিলাম—একবার 'হার্মিটেজে', আর একবার "কর্শ" থিয়েটারে।......ভল্‌দিমির ইভানোভিচ নেমিরোভিচ-দানচেংকো—আমার ওপর তাঁর নজর সেই তখন থেকেই। 'না, এখন নয়', বলে ওঁকে জবাব দিয়েছিলাম, 'দাঁড়ান আগে প্রাণ ভরে অভিনয় করে নিই, তারপর আমাকে চান তো পাবেন।......' আঠার সালে কর্শ থিয়েটারে আমরা 'দাঁতঁ-র মৃত্যু' নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করি। আমি সেজেছিলাম দাঁতঁ......ওঃ সে কী পার্ট—একাধারে ক্রুদ্ধ সিংহ আর গণ-দেবতা......পাগলা ষাঁড়, হিংস্র জানোয়ার, বিরাট প্রতিভা, আবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপেটুক, তার ওপর কামাচারী......। ওঃ যদি একবার দেখতেন আমার পার্ট! একেবারে দারুণ! কিন্তু ওদিকে শহরে কয়লা নেই, মস্কো একদম অন্ধকার। টিকিট বিক্রী হল না, কোম্পানী একেবারে ছত্রখান হয়ে গেল। আমরা পাঁচজন জেলায় জেলায় অভিনয় করে বেড়ালাম—ঐ 'দাঁতঁ-র মৃত্যু'। শিক্ষা-বিভাগের কমিসার লুনাচার্স্কি হুকুম দিলেন—মস্কোয় এ অভিনয় করা যাবে না। কিন্তু মফঃস্বলে আমরা একেবারে চুটিয়ে দেখিয়ে নিলাম। শেষ দৃশ্যে স্টেজের ওপর একটা গিলোটিনই ঢোকালাম টেনেটুনে—ঘ্যাঁচ করে আমার মাথাটা কেটে ফেলে দিল।......ওঃ সে কী টিকিট বিক্রী!..... আর লোকেদের চীৎকার যদি শুনতেন—খালি বলছে, "ওর মাথাটা আবার কাটো!' খার্কভে আর কিয়েভেও আমাদের অভিনয় হয়েছে—রেডরা সেখানে ছিল তখনও। তারপর উমানে—ওদের ফায়ার ব্রিগেডের শেডে। সেখান থেকে নিকোলাইয়েভ, খার্সন, একাতেরিনোস্লাভ। রস্তভ-অন-দন শহরে গিয়েই আমাদের হল কাল। থিয়েটার জমল দারুণ—বক্স থেকে একজন অফিসার তো একেবারে গুলিই ছুঁড়তে লাগল রবেসপিয়ের-এর দিকে। কিন্তু পরদিন সোজা তলব মেয়রের ওখানে—একেবারে সাবেকী ঢংয়ে চড়-চাপড় কষিয়ে মেয়র বল্লেন : 'কমান্ডার ইন চীফ দেনিকিনের নামে দোয়া কোরো—তিনি ছিলেন তাই বেঁচে গেলে—নইলে শুধু যদি আমার হাতে থাকত তো তোমাদের ফাঁসি দিয়ে ছাড়তাম!......যাও, এক্ষুনি রস্তভ থেকে দূর হয়ে যাও!' সত্যি আজকাল অভিনেতা হওয়ার অনেক ল্যাঠা।......আমরা যেন বেদে—যত সব হতচ্ছাড়া জায়গা, তারই মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরি। সিন-সিনারি সব খসে খড়ে পড়ছে, টাঙাতেও লজ্জা করে......কজলভ-এ গিলোটিনটা তো রেলগাড়ীতে তুলতেই দিল না, বল্ল ওটা নাকি 'অপরিজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সামগ্রী', তাই যেতে পারবে না।......নিরুপায় হয়ে শেষকালে আমার মাথাটা কাটতে হল কুড়ুল দিয়ে! দেশলাই আছে? দেশলাই থাকলে দেখিয়ে দিতাম—আমার মাথাটা তো ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে। ওটা মস্কোয় তৈরী—'মালী' থিয়েটারের সাজওয়ালা বানিয়ে দিয়েছিল—সত্যি লোকটার কী দারুণ প্রতিভা! সেন্সরগিরির কথা আর কী বলব: কপি দিলাম—তা কমরেড মশাই পড়ছেন তো পড়ছেনই।......হয়তো বুঝিয়ে দিলাম: এটা একটা ঐতিহাসিক তথ্য।......ব্যস ফের আবার পাতা ওল্টান কমরেড, বলেন, 'এটা যে ঐতিহাসিক তথ্য তার গ্যারান্টি কি?'......লুনাচার্স্কি খুব

প্রশংসা করেছেন, দেখিয়ে দিলাম......তাও পড়লেন। তারপর, 'আচ্ছা, আর একটু মজাদার কিছু অভিনয় করতে পারেন না?' উঃ গা একেবারে জ্বলে যায়, বুঝেছেন! ......এবার আবার কি হবে কে জানে?......স্পেশাল ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার 'এক্‌স্', সেখানে আমাদের অভিনয় করার কথা......"

অপ্রত্যাশিতভাবে শুনল তেলেগিন জিজ্ঞাসা করছেঃ

"আপনার দলবল কোথায়?"

"এই যে পাশের ভ্যানে—সেখানে সিন-সিনারিও আছে। রবেসপিয়ের চড়েছে ইঞ্জিন কামরায়। ওর নাম তিনস্কি—নাম শুনে থাকবেন—রবেসপিয়েরের ভূমিকায় সারা রিপাব্লিকে ওর জুড়ি নেই।......যেখানেই থাকুক, মদ ও ঠিক জোগাড় করবে—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মস্ত প্রতিভা! ইঞ্জিন কামরায়ই ও চড়ে সব সময়। তাতে আমরাও শান্তি পাই। হুঁ, তাহলে কমরেড সিপাহী, এবার একটু ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাক, কি বলুন? না বল্লে হবে না কিন্তু!"

"আচ্ছা, না বলব না......"

"কৃতার্থ করলেন আমাকে।" ব্যাগের মধ্যে হাতড়ায় বাশকিন—নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ফিস ফিস করে বলে, "আরে ওটা রাখলাম কোন্ চুলোয়?"

একটা ডিম, এক টুকরো সসেজ আর একখানা পিঠে—তেলেগিনের হাতে পৌঁছে গেল। "এক্‌স-এ অভিনয় শেষ হলে আমরা এবার মস্কো পাড়ি দেব।...এ বেদেবৃত্তি আর পোষায় না! একজন আর্মেনিয়ান—ওঃ সেও এক মস্ত প্রতিভা—সে এক খাবার দোকান খুলেছে—৫নং নেগ্‌লিন্নি প্যাসেজ। সসেজ, কাবাব—যা চান তাই পাবেন। পুলিশ হামলা হয় প্রত্যেক দিনঃ গ্রাহকদের মুখে ভুর ভুর মদের গন্ধ, কিন্তু পুলিশ শুধু তালাশ করে করেই হায়রান—মদ আর কিছুতেই খুঁজে পায় না। পাবেও না।......লোকটা পাঁচতলায় চিলে-কোঠার ঘরে একটা মদের ট্যাংক্ বসিয়ে রেখেছে—জলের কলের খালি পাইপ, তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে ট্যাংকটা। আর নীচে দোকানঘরে হাত ধোবার বেসিন, তার ওপর জল-কলের মুখটা—যেমন সব জায়গায়। কল খুলুন আর গ্লাস ভরে নিন, ব্যস।"

আরামে সসেজে কামড় দেয় তেলেগিন। দুচার চুমুক পানীয়ের মধুর প্রভাব অনুভব করতে করতে সহযাত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলেঃ

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দেব। জিরিয়ে-টিরিয়ে ধীরে সুস্থে রিহার্সাল চালান আপনারা, তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। কিন্তু ভাল অভিনয় দেখাতে হবে আমাদের। এক্‌স্-এ আপনারা আমার অতিথি, আমিই ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার।"

"ও-ও-ও" করে ঝটিতি নিশ্বাস টানল বাশকিন। "আপনি তাহলে এহেন লোক।......আর আমি খালি আপনার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি—এই লোকটাই বুঝি আমার কাম সারল! কী ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলেন! আমি খালি বকছিই, বকছিই, আর ভাবছি—কই গাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে না তো! আচ্ছা দাদা, জবর অভিনয় দেখাব আপনাদের, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। সাচ্চা অভিনেতার মতো শুধু শিল্পকলার খাতিরেই আমরা অভিনয় করব, দেখে নেবেন!"

কিট ব্যাগ হাতে ট্রেন থেকে নামল তেলেগিন। প্ল্যাটফর্মে ক'জন মিলিটারির লোক—চিমনি-ভাঙা তেলের বাতি থেকে তাদের মুখে সামান্য আলো পড়েছে।

"শুভ সন্ধ্যা কমরেডস্", ওদের কাছে এগিয়ে এসে তেলেগিন বল্ল। "আপনারা কি ব্রিগেডের কমাণ্ডারকে নিতে এসেছেন? এই যে আমি, তেলেগিন। চেহারাটা একটু নোংরা হয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না......"

এক এক ক'রে সবাইয়ের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে একজনকে দেখে ও একটু অবাক হয়ে গেল। লোকটির চুল পেকে গেছে; রোগা, শুকনো চেহারা, মুখভাব কঠোর, চালচলন ঠিক মিলিটারির মতো।......স্টেশন থেকে বার হয়ে অন্ধকার চৌমাথায় পা দিতে দিতে কাঁধের আড়াল থেকে তেলেগিন লোকটিকে আর একবার দেখে নিল, কিন্তু মুখের চেহারা ধরতে পারল না। তেলেগিনকে ওরা তুলে দিল একটা দ্রশ্‌কি গাড়ীতে। মাঠের পর মাঠ, ভয়ংকর অন্ধকার, তার ওপর ভীষণ গোবরের গন্ধ—তার মধ্যে দিয়ে দ্রশ্‌কি চল্ল অনেকক্ষণ ধ'রে। তারপর একটা শেডের মতো লম্বা বাড়ী, ইয়া উঁচু ছাত, তার সামনে এসে থামল দ্রশ্‌কিটা। ওখানে ইভান ইলিয়িচের ঘর একেবারে তৈরী—ঘরে আসবাবপত্র নেই বল্লেই হয়, তবে নতুন চুনকাম করা হয়েছে। জানালার ওপর একটা বাতি জ্বলছে। তার পাশে প্লেটের মধ্যে খাবার, আর একটা প্লেট উল্টে ঢাকা দেওয়া আছে। কিটব্যাগ মাটিতে ফেলে তেলেগিন জামা খুল্ল, তারপর আড়ামুড়ি ভেঙে নিল। বিছানাটা এখনি করা হয়েছে, বেশ পরিষ্কার। বিছানার ধারে বসে ও ওর খড়িমাখা বুট খুলতে লাগল।

দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ।

"তখুনি বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। পাঁচটা বেজে গেছে, এখন আবার আলাপ করতে হবে কতক্ষণ ধ'রে। কী জ্বালাতন ঘোড়ার ডিম", বিরক্ত সুরে ও নিজেকেই শোনাল। কিন্তু গলার আওয়াজ দিয়ে বল্ল ঃ

"ভেতরে আসুন!"

সেই যে পাকা চুলওলা মিলিটারি লোকটিকে ও আগে লক্ষ্য করেছিল, সেই লোকটিই চট ক'রে ভেতরে ঢুকল। ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত স্যালুটের ভঙ্গিতে হাতটা টান টান করে তুল্ল কপালের ওপর।

আধখোলা বুটটা পায়ে ঢুকিয়ে নিল তেলেগিন। তারপর আর নড়ে না, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে এই প্রেতমূর্তির পানে চেয়ে থাকে......

"মাফ করবেন কমরেড", বল্ল তেলেগিন, "স্টেশনে একটু অপ্রস্তুত লেগেছিল সত্যি, তবে আমি তখনই ঠিক করেছিলাম যে, পরস্পর পরিচয় কিংবা কাজকর্ম সব কাল পর্যন্ত মুলতুবী থাকবে।......আপনি বোধ হয় আমার চীফ অফ স্টাফ, তাই না?......

মিলিটারি লোকটি তখনও দরজার কাছে। সংক্ষেপে জবাব দিল ঃ

"হ্যাঁ।"

"আপনার নামটি জানতে পারি?"

"রশচিন, ভাদিম পেত্রোভিচ।"

অসহায় বিস্ময়ে তেলেগিন ওর দিকে চায়। মুখটা হাঁ ক'রে জোরে জোরে দম নেয়।

"ও-হো......হুঁ......।" মুখটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে তেলেগিনের। তারপর অস্ফুট স্বরে ফের বলে ঃ "ভাদিম?"

"হ্যাঁ।"

"তাই তো, তাই তো,।......বড়ই আশ্চর্য।......তুমি আমাদের পক্ষে, আমার চীফ্‌ অফ স্টাফ।...... কী কান্ড!"

আগের মতোই আবেগহীন দৃঢ়স্বরে রশচিন বল্ল ঃ

"ইভান, এখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে নেব ঠিক করেছি—যাতে কাল আর তোমাকে বে-কায়দায় না পড়তে হয়।"

"তাই বুঝি? আলাপ করতে হবে?"

বুটটা প্রায় খুলে ফেলেছিল, তাড়াতাড়ি আবার প'রে নিল তেলেগিন। জামাটা উঠিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে আরম্ভ করল। মাথা নীচু করে রশচিন বেশ মনোযোগ সহকারে প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করে, আবেগ বা ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নেই।

"কিন্তু তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করা সহজ হবে না বলে আমার আশঙ্কা হয়, ভাদিম।"

"আমার তো তা মনে হয় না।......"

"তুমি খুব চালাক, হ্যাঁ সত্যি।......তোমাকে আমি খুব ভালবাসতাম ভাদিম। গত বছর সেই রুস্তভ স্টেশনে তোমার সঙ্গে দেখা হল—সে কথা ভুলিনি। অসম্ভব উদারতা দেখিয়েছিলে তুমি।......উদার হৃদয় তোমার, বরাবরই।...... ওঃ, ভগবান!"

তেলেগিন বেল্টটা কষে, বোতামে প্যাঁচ লাগায়, পকেটের মধ্যে হাতড়ায়। মনে হয় ও যেন একেবারে মহা বিব্রত হয় উঠেছে, কিংবা হয়তো অপরিহার্য আলোচনার যন্ত্রণা স্থগিত রাখতে চাইছে।......

"তুমি বোধ হয় ভাবছ যে," ও বল্ল, "এবার আমাদের জায়গা বদল হয়েছে, উদারতা দেখাবার পালা এবার আমার। তোমার প্রতি আমার টান আছে, যথেষ্ট আছে।......তোমার আমার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তা কারও চেয়ে কম নয়।......কিন্তু......তুমি এখানে কি করছ ভাদিম? তুমি এখানে কেন? বল, বল......"

"বলতেই তো এসেছি ইভান।"

"বেশ, বেশ। কিন্তু ব্যাপার স্যাপার গোপন রাখতে তোমাকে সাহায্য করব, তা যদি ভেবে থাক......তোমার বুদ্ধি আছে—কথাটা বুঝে নাও ঃ আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারব না।......এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার আমূল পার্থক্য।......"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে রশ্চিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল তেলেগিন। কিন্তু ভাদিম পেত্রোভিচ হাসি মুখেই ওর কথা শুনে গেল।

"তুমি নিশ্চয়ই কিছু ফন্দি এঁটেছ," ইভান ব'লে চল্ল, "কী ফন্দি তাও পরিষ্কার।......তুমি মরেছ বলে যে গুজব রটেছে তার সঙ্গেও এর সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়।......কী ফন্দি বল, কিন্তু আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব তা বলে দিচ্ছি। উঃ, এ কী ভয়ঙ্কর......," বলে দারুণ হতাশার ভঙ্গীতে হাতটা ছড়িয়ে দিল তেলেগিন, মনে হয় সে ভঙ্গীর মধ্যে যেন রশ্চিনকে, নিজেকে আর ওর জীবনের সর্বনাশকে—সব কিছুকেই ও জড়িয়ে নিয়েছে। দ্রুত পায়ে ওর কাছে এগিয়ে এল রশ্চিন, দুহাতে জড়িয়ে ধরে দৃঢ় চুম্বন এঁকে দিল ইভানের মুখে।

"তুমি ভারি সুন্দর লোক ইভান......সহজ, সরল, স্পষ্টবাদী—বরাবর ঠিক একরকম। তোমাকে এমনধারা দেখলে ভারি ভাল লাগে।......সত্যি তোমাকে কী যে ভালবাসি! এসো এসো বসা যাক।" তেলেগিন তখনও আপত্তি করছে, কিন্তু ও তাকে টেনে ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। "গাধামি করো না! আমি চরও নই, গুপ্ত দালালও নই।......ভাবনার কোন কারণ নেই—আমি রেড আর্মিতে আছি সেই ডিসেম্বর থেকে।"

একটু আগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ইভান ইলিয়িচ, তাতে ওর সত্তার ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। এখনও ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়নি; যুগপৎ বিশ্বাস আর সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে ভাদিম পেত্রোভিচের রোদে-পোড়া, কোমল অথচ কঠোর মুখপানে চেয়ে আছে, তার বুদ্ধিদীপ্ত জ্বলন্ত কালো চোখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। বিছানার ধারে বসল দুজনে, হাতে হাত বাঁধা। ভাদিম পেত্রোভিচ তার কাহিনী শুনিয়ে চলল—কি করে সে এই পক্ষে যোগ দিল—আপন ঘরে, আপন দেশে ফিরে এল—সেই কাহিনী।

কাহিনীর গোড়াতেই বাধা দিয়ে তেলেগিন শুধাল ঃ

"আর কাতিয়া, কাতিয়া কোথায়? বেঁচে আছে তো, ভালো আছে? এখন সে কোথায়?"

"মস্কোয় আছে বলেই তো আশা করি।......এবারও আমাদের দেখা হয়েও হল না। কিয়েভে পৌঁছাতে আমার দেরী হয়ে গেল, পৌঁছলাম একেবারে লোকাপসরণের মুখে।......তবে ওকে খুঁজবার সূত্র পেয়েছি।......"

"সে কি জানে যে তুমি বেঁচে আছ, আমাদের পক্ষে এসেছ?"

"না।......তাইতেই তো আমাকে পাগল করে তুলছে।......"

॥ উনিশ ॥

দু মাস কাটল।

জেনারেল দেনিকিনের অভিযান প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। রুশিয়ার 'সর্বোচ্চ শাসনকর্তা' কোলচাক আবার উরাল লক্ষ্য ক'রে ধেয়ে আসছেন ঃ এই তাঁর শেষ চেষ্টা তাই একেবারে মরিয়া হয়ে এগোচ্ছেন। ওদিকে বল্টিক অঞ্চলে সপ্তম রেড আর্মির মাথার ওপর যেন বিপদের আকাশ ভেঙে পড়েছে। জেনারেল য়ুদেনিচের আক্রমণ-মুখে পস্কভ, লুগা, গাশিনা—একটার পর একটা শহর ছাড়তে ছাড়তে সপ্তম আর্মি পশ্চাদ্বর্তন করছে। পথে প্রচণ্ড কাদা, নাকালের একশেষ। য়ুদেনিচ তাঁর সৈন্যদের অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন যে, "শত্রু-ব্যূহ ভেদ ক'রে এবার পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করতে হবে।"

যে সব অঞ্চল থেকে শস্য আর জ্বালানি আসে সে সব অঞ্চলের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের যোগাযোগ তখন একেবারে বিচ্ছিন্ন। যানবাহন যা কিছু হাতে আছে—সৈন্য বা গোলাবারুদ আনা-নেওয়ার পক্ষেও তা যথেষ্ট নয়। রুশদেশের মাটি—তার ওপর অক্টোবরের আকাশ যেন কাঁদছে। নীচে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত শহর—শীত এবার আরও ভয়ঙ্কর হবে সেই আশঙ্কায় শহরগুলিতে মানুষের জীবন কোনো রকমে ধিকি ধিকি জ্বলছে; ফ্যাক্টরির চিম্‌নিতে ধোঁয়া নেই, কলকারখানায় মানুষ নেই—শ্রমিকরা সব এখানে ওখানে যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে; শ্মশানের মতো পড়ে আছে চূর্ণবিচূর্ণ রেলওয়ে এঞ্জিন, আর ভাঙা-চোরা রেলগাড়ী; চিরন্তন স্তব্ধতাময় গ্রাম—খড় ছাওয়া কুটীরগুলিতে মানুষজন খুব কমই আছে, ঘরে ঘরে আবার সেই প্রাচীনকালের মতো আলো জ্বলছে খড়ের সলতেয়, আর ঘরোয়া তাঁত চলছে খটাখট খটাখট।

এম্‌নি ধারা দুর্ভাগ্যের দিনে জেনারেল মামন্তভ আবার দ্বিতীয়বারের মতো রেড আর্মির লাইন ভেদ করলেন, লালফৌজের পশ্চাদ্‌ভাগে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিলেন। তারপর কসাকবাহিনী নিয়ে ধাওয়া করলেন দেশের ভেতরে বহুদূর পর্যন্ত।

থুতু দিয়ে জোড়া একটা জরাজীর্ণ ম্যাপ—তার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন তেলেগিন, রশ্‌চিন আর কমিসার চেস্‌নোকভ। চেস্‌নোকভ নতুন লোক। ব্রিগেডের আগের কমিসার টাইফাস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ওঁকে বদলি পাঠিয়েছে। উনি মস্কোয় শ্রমিক ছিলেন। জার আমলে জেলে জেলে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে, তার ওপর উপযুক্ত খাদ্যও পাননি, তাই ওঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, অকালেই বুড়ো হয়ে পড়েছেন। চেস্‌নোকভ

তাঁর টাকপড়া কপালে হাত বুলোচ্ছেন, দেখলে মনে হয় যেন ভুরুর ঠিক ওপরটাতে খুব ব্যথা হয়েছে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে কমাণ্ডার-ইন-চীফের জঙ্গী হুকুমনামাটা উনি আর একবার পড়লেন। এবার নিয়ে দশবার পড়া হ'ল।

তেলেগিন পাইপ টানছে। হাতে-পাকানো সিগ্রেটের বদলে ও আজকাল পাইপের ভক্ত হয়ে পড়েছে। পাইপটা লাতুগিনের উপহার, স্কাউটিংয়ের সময় ওটা এক হোয়াইট অফিসারের কাছ থেকে কেড়ে এনেছিল। বর্তমান সময়ে সংকটের তো কামাই নেই—সঙ্কটের মুহূর্তে পাইপটা ওকে যেন বেশ সান্ত্বনা দেয়, ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায়। আর একটু বেশী দিন পর্যন্ত পরিষ্কার না করলে পাইপ থেকে কী সুন্দর শোঁ শোঁ শব্দ বার হয়—মনে হয় যেন শীতের সন্ধ্যায় সামোভারে জল ফুটছে।

হুকুমনামাটা যে হতাশার আক্ষেপ, রশচিন তা দেখবামাত্র বুঝেছিল। অর্ধ-নিমীলিত পল্লবের আড়াল থেকে ওর চোখ দুটো রাগে জ্বলজ্বল করছে; কাঠের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ও অপেক্ষা করছে—সর্বোচ্চ নায়কমণ্ডলীর এই মহা-রচনা সম্বন্ধে কমিসার সাহেবের চিন্তা-ভাবনা কখন শেষ হবে তারই অপেক্ষা।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঁচ ছ' মাইল দূরে একটা খামারবাড়ীতে ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টারের আড্ডা। ওদের বাসস্থানও সেইখানে। আগস্ট মাসে তেলেগিন যে দুটি রেজিমেণ্টের ভার নিয়েছিল, দু মাস যুদ্ধের পর তাতে এখন তিনশো সৈন্যও আছে কিনা সন্দেহ। বদলি হিসেবে নতুন যারা এসেছে, তাদের সৈন্য বলা শক্ত। এরা সবাই প্রায় পলাতক সৈন্য, 'গ্রীন্‌স্‌' দলের লোক। বৃষ্টি-বাদলের সময় বলে তারা শহরে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকে তাদের ধ'রে ধ'রে এনে তাড়াতাড়ি জড়ো করেছেন কর্তারা। সামরিক শিক্ষা নেই, ট্রেনিং নেই, সেই অবস্থায়ই বদলি কম্প্যানিতে ভ'রে ভ'রে সোজা চালান দিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধের যে সব পরিকল্পনা শুধু কাগজেপত্রে, কমাণ্ডার-ইন-চীফের অফিসে গুরু-গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে মানচিত্রের ওপর লাল পেন্সিল বুলিয়েই যে পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচালনা সমাধা হয়েছে—সেই পরিকল্পনা নাকি কার্যে পরিণত করবে এই এরা!

“আমি বুঝতে পারছিনে.” চেস্‌নোকভ বল্লেন। আদেশপত্রের উল্টো পিঠটা একেবারে সাদা, তবু সেই পিঠটাও পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন, “এ আদেশের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিনে......।”

“বোঝার কিছু নেই,” জবাব দিল রশচিন। “বাঁধাধরা, সরকারী আদেশ যাকে বলে, এ তাই। একদিন সকালে উঠে কমাণ্ডার-ইন-চীফ মশায় দুটি ডিম ও এক কাপ কোকো সহযোগে প্রাতরাশ সমাধা করলেন, তারপর একটি দামী সিগ্রেট জ্বালিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে উপস্থিত হলেন ম্যাপের সামনে। তাঁর চীফ অফ স্টাফ—যে শুধু দিনই গুনছে, যে কবে এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের

হাত থেকে অব্যাহতি পাবে—সে তার দ্বটি আঙ্বলের টানে ম্যাপ থেকে একটা ছোট্ট লাল নিশান উঠিয়ে আনল। নিশানটা হচ্ছে আমাদের ব্রিগেডের ১২৩নং রেজিমেণ্ট, সরকারী রিপোর্ট অন্বসারে যার সৈন্যসংখ্যা ২৭০০। নিশানটি তুলে নিয়ে চীফ-অফ-স্টাফ সেটিকে দিব্যি মোলায়েমভাবে ফের বসিয়ে দিল—৬০ মাইল দক্ষিণেঃ "এইভাবে দার্মভ্কা গ্রাম দখল ক'রে আমরা শত্রুর পার্শ্বদেশে আতঙ্ক স্বৃষ্টি করছি।"......তারপর আর একটা নিশান—আমাদের ব্রিগেডের ৩৯নং রেজিমেণ্ট—মিলিটারি ব্বলেটিনের রিপোর্ট অন্বসারে যার সৈন্যসংখ্যা ২১০০—সেটিকে তুলে এনে বসাল ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেঃ "আর এইভাবে সোজাস্বজি আক্রমণ আরম্ভ করছে ৩৯শ রেজিমেণ্ট......।" এমনি আরও কত! সিগ্রেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চোখ কুঁচকে কমাণ্ডার-ইন-চীফ সাহেব ম্যাপের দিকে চান. তারপর সম্মতি দেন। চীফ-অফ-স্টাফ রাত্তির বেলা সবই ভেবেচিন্তে, লাইনটাইন কেটে, খাসা লাল আর নীল তীর এ'কে রেডি করে রেখেছে—তা উনি জানেন; আরও জানেন যে, নিশানগ্বলো যে দিকেই লাগাক ফল হবে একই—সে ফলের নাম ঃ "য্বদ্ধক্ষেত্রে সতেজ সংগ্রাম-চাঞ্চল্য।"......তাই তো চাই......

টাকপড়া প্রকাণ্ড মাথাটা নেড়ে, চেসনোকভ ওকে বাধা দিলেন। বল্লেনঃ "এটা ঠিক সমালোচনা নয় দোস্ত, আপনি শ্বধ্ব গায়ের ঝাল ঝাড়ছেন।"

"তা জানি।......কিন্তু আমার যদি তাই মনে হয়, তো চুপ ক'রে থাকব কেন? তেলেগিনও আমার মতোই ভাবছে, আমাদের সিপাহীরাও ভাবছে। তারা বলছেও।"

ম্বখ থেকে পাইপ না নামিয়েই লম্বা শ্বাস ছাড়ল তেলেগিন। কমিসার এতক্ষণ ধরে মনোভাব চাপবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্বকের মধ্যেও তিক্ততা, সন্দেহ, আর অস্থিরতা ঠেলে উঠতে লাগল। জারের জেলখানায় দশ বছর ধ'রে বন্ধ থেকে থেকে উনি আধ্বনিক য্বগের সংগে ঠিক যোগাযোগ রাখতে পারেননি সে কথা সত্যি—কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্যি হল যে, এখনকার য্বগটাই যেন বড্ড বেশী জটিল, যেদিকে ফেরো সেদিকেই যেন গভীর জল। বহ্ব বছর ধ'রে যন্ত্রণার আগ্বনে প্বড়ে প্বড়ে ওঁর মনটা একেবারে খাঁটি হয়ে উঠেছে—উনি ভেবেই পান না যে, বিপ্লবের পক্ষ নিয়ে যারা য্বদ্ধে নেমেছে তাদের কি ক'রে অবিশ্বাস করা যায়! এমন ধারা সমস্ত লোককে উনি তো দেখলেই ভালবেসে বসেন—অথচ কতবার প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের অনেকে মনের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা প্বষে রেখেছে। রশচিনের কট্ব স্পষ্টবাদিতা ও'র ভাল লাগল—ব্বঝলেন যে, এ লোকটি কাউকে ডরায় না, এর কপালের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেও ভয় পাবে না।

"আচ্ছা, সিপাহীরা কি বলছে তাই না হয় বল্বন!" কমিসার মন্তব্য করলেন। "শীগ্গিরই সবাইকে তুলোর কোট দেওয়া হবে, ফেল্টের জ্বতোও। দেখবেন তখন ওদের স্বর কেমন বদলায়। বেশী কথা বলে কারা? যারা

পলাতক ছিল তারা? বৃষ্টির চোটে ওদের হাড়-মাস পর্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেল, তার ওপর পেট একদম খালি—দাঁত তো একটু ঠকঠক করবেই।"

"কোট আর জুতো কবে দেওয়া হচ্ছে?" রশচিন শুধাল।

"কমিসারিয়েট বিভাগ থেকে আমাকে একেবারে পাক্কা কথা দিয়েছে। চালান পর্যন্ত দেখে এসেছি আমি।......ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পনের শো হাঁস আর আধ গাড়ী চর্বিও পাঠাবে......"

"নন্দন পাখীর রোস্ট পাঠাবে বলেনি?"

কমিসার জবাব দিলেন না, খালি একটু ঘড় ঘড় করলেন। শুধু প্রতিশ্রুতি আর কাগজপত্র ছাড়া ব্রিগেডকে এখন পর্যন্ত আর কিছুই এনে দিতে পারেননি, সে কথা সত্যি। উনি বার বার সের্পুখভে গেছেন, টেলিফোনে কত গালমন্দ দিয়েছেন। বন্দী দিনের মতো ঘরে পায়চারি করতে করতে জেগেই কাটিয়েছেন কত রাত।......কি একটা মহা-দুর্বোধ্য ব্যাপার চলছেঃ বিপ্লবী কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে যেখানেই উনি হাত দিতে গিয়েছেন, সেখানেই যেন কোন্ রহস্যের দেওয়াল এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, জট পাকিয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে সব কিছু।

"তাহলেও, বলুন না সিপাহীরা কি বলছে?" কমিসার শুধালেন।

মহা রাগতভাবে আদেশপত্রের ওপর আঙুলের খোঁচা দিল রশচিন।

"আদেশের এই জায়গায় বলছেঃ 'দুটি কম্প্যানি গিয়ে মিত্রোফানভ্‌কা গ্রাম আর দাল্‌নি খামারবাড়ী দখল করবে। দখল বজায় রাখতে হবে।' কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ অনুসারে ঐ গ্রাম আর খামারবাড়ী আমরা এর আগেই একবার দখল করেছিলাম। কিন্তু তারপর ফিরে আসতে পথ পাইনি, একেবারে বুলেটের মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। পরশু দিন যখন আমরা এবারকার হুকুম তামিল করতে যাব, তখনও ঠিক তাই হবে আবার।"

'কেন?"

"কারণ এটা এমন একটা জায়গা যেখানে দখল বজায় রাখা যায় না। ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত নয়।"

"তবু আমরা যাব এবং যাওয়ার চেষ্টায় শতখানেক লোককে বলি দেব। হোয়াইটদের ব্যূহও আমরা ভেদ করব, কিন্তু নিজেদের দলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে না। তারপর শত্রু এসে যেই দু পাশে চেপে ধরবে অমনি লাফ দিয়ে বেরুতে হবে ঐ বস্তা থেকে। তার মানে তিনবার নদী পার হওয়া এবং প্রত্যেকবার গুলি খাওয়া। নদীর পর খোলা মাঠ—সেখানে আক্রমণ করবে শত্রুর ঘোড়সওয়ার দল। মাঠ পেরুলে তখন আবার জলা, কাদার মধ্যে আমাদের গাড়ীঘোড়ার অর্ধেক ভাগই আটকে থাকবে।"

"কিন্তু সর্বাত্মক রণ-পরিকল্পনার ভিতর এই গ্রাম আর খামারবাড়ীর নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ভূমিকা আছে", আপত্তি তুল্লেন চেস্‌নোকভ।

"না, নেই।...ম্যাপটা দেখুন তাহলেই বুঝবেন।...সেই কথাই তো বলাবলি

করছে সিপাইরা। বলছে যে, গত দু মাস ধ'রে যে সব লড়াই আমরা লড়লাম তার মধ্যে না আছে পরিকল্পনা, না আছে কাণ্ডজ্ঞান, আর না আছে কোনো উদ্দেশ্য।...আমাদের সামনে কোনো সম্ভাবনা নেই, শুধু শুধুই তাল ঠুকছি—আর ঠুকতে ঠুকতে মার খাচ্ছি খামোখা, লোকবল নষ্ট করছি, জয়ের ভরসাই হারিয়ে ফেলছি।...দেখতে পাবেন, আজ রাত্রেই দু চার কুড়ি লোক লটকে পড়বে। ...তারপর একমাস বাদে তাদেরই আবার পাঠিয়ে দেবে আমাদের কাছে।... ব্যাপার কি বলুন তো! এ সব হচ্ছে কি সব? এ যে একেবারে পক্ষাঘাত!"

পাইপের নল দিয়ে ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে তেলেগিন বল্লঃ

“আজ স্কোয়াড্রনের ওখানে শুনলাম—ওরা যে কি ক'রে খবর পায় খোদা জানে—শুনলাম যে, মামন্তভ আবার দন পার হয়েছে, সে এখন আমাদের পেছন দিকে মার্চ করে চলেছে।”

আদেশ-পত্রটা খপ্ করে তুলে নিল রশচিন। একবার চোখ বুলিয়ে তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেল্ল। পিঠটা আবার এলিয়ে দিল দেওয়ালের গায়ে—ঠিক আগের মতো।

“খুবই সম্ভব”, ও বল্ল। “কিন্তু এটাতে...এটাতে তো তার একটু আঁচও দেয়নি।...”

বেঁটেখাটো, দাড়িওলা এক আর্দালি—ক্যাম্বিসের তৈরী ময়লা কার্তুজের থলি কোমরে বাঁধা—সে এসে ডাকল ঃ

“কমরেড ব্রিগেড কমাণ্ডার, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।”

একটু আশ্চর্য হয়ে কমিসারের দিকে চাইল তেলেগিন। তারপর তাড়াতাড়ি গ্রেটকোট চাপিয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

“দেখুন রশচিন”, কপালে হাত বুলতে বুলতে কমিসার শুরু করলেন, “আপনার কথা শুনলে মানুষের সব বিশ্বাসই উড়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এ সবের অর্থ কি বলুন তো! বেইমানী আছে নাকি আমাদের মধ্যে?”

“আমি কোনো ইঙ্গিত করছি নে, জোর ক'রে কিছু বলছিও নে। শুধু বুঝতে পারছি যে, এইভাবে বেশী দিন লড়াই চালানো যাবে না।...”

“আদেশ-পত্রের হুকুম কি তামিল করতেই হবে?”

“নিশ্চয়। কালই আমি তামিল করতে যাব।...”

একটুখানি ভাবার পর মুচকি হেসে কমিসার বল্লেনঃ “জীবনে আপনার ঘেন্না ধ'রে গেল নাকি?”

“তার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। আর আপনারই বা সে বিষয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার?...আরও শুনে রাখুন, জীবনে আমার মোটেই ঘেন্না ধরেনি!...আপনি যদি বেশী দিন আমাদের সঙ্গে থাকতেন তাহলেই জানতে পারতেন যে, আমাদের রেজিমেণ্টের কেউই এ আদেশ পালন করতে চায় না। তবু তাদের করতে হবে।...যুদ্ধের আদেশ পালন করাই তো যে-কোনো আর্মির জীবনের সবখানি। তা না করলেই আসবে ধ্বংস, মৃত্যু আর সর্বনাশ—অন্য

কোনো পথ নেই। আদেশ-পত্র আমি নিজে ওদের পড়ে শোনাব, তারপর আক্রমণে এগিয়ে নিয়ে যাব।...এ লড়াইটাকে নিয়মানুবর্তিতার পরীক্ষা বলে ধরুন...হ্যাঁ, ও ছাড়া আর কীই বা বলার থাকতে পারে...”

ঠিক তখনি তেলেগিন এসে ওদের পাশে বসল। হাত দুটোও পকেট থেকে বার করেনি—ইয়া বড় বড় চোখ ক'রে অবাক হয়ে চাইছে।

“কমরেডস, সর্বোচ্চ সমর পারিষদের সভাপতি যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে এসে যাবেন...”

এক ঘণ্টা যায়। তারপর আর এক ঘণ্টা। খামারবাড়ীর পেছনে গোচারণের মাঠ, সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে স্কোয়াড্রন আর কম্যান্ড্যাণ্টের ডিট্যাচমেণ্ট। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—সওয়ারদের ভাঁজ-করা গ্রেটকোটের ওপর বৃষ্টি-জল চিকমিক করে। ঘোড়াগুলির ঢেউ খেলানো কেশর আর তাদের লেজের নীচে পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো চুলের গোছা, তার ওপরও বৃষ্টিবিন্দু চিকমিক করে। ক্ষুরে ক্ষুরে কাদা ঘুলিয়ে ওঠে। পাঁজরা বার করা ঘোড়াগুলো—পাছা-টাছা চুপসে গেছে, ঠোঁটগুলো ঝুলে পড়েছে—দেখলে মনে হয় যেন লাশ, জল থেকে কে তুলে এনেছে। স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার ইমেরমান আগে গ্রদ্‌নো হুসার বাহিনীতে প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট ছিল: গোলমুখ আর খাঁদা নাক বার ক'রে সে এখন কাতর দৃষ্টিতে চাইছে তেলেগিনের দিকে, যেন বলছে—কী লজ্জা, কী লজ্জা! গোদের ওপর আবার বিষফোঁড়াঃ হঠাৎ কোথা থেকে একটা লম্বা-ঠেঙো কুকুরের বাচ্চা এসে হাজির। কাদামাটিমাখা কুকুরটা দিব্যি বন্ধুর মতো একেবারে স্কোয়াড্রনের সামনে থাবা গেড়ে বসল, কৌতূহল ভরে চেয়ে চেয়ে দেখছে!

হট্ হেট্, হুস্ হুস্, কত রকম শব্দ করে ইমেরমান, কিন্তু কুকুরের গ্রাহ্যও নেই—শুধু কান খাড়া ক'রে ঘাড়টা একটু বেঁকায়। সংকেত জানাবার জন্যে একটু দূরে টিলার ওপর একজন অশ্বারোহী শান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল—সে হঠাৎ ঘোড়ার পেটে কাঁটার ঘা মেরে এদিকে মুখ ঘোরাল, তারপর চারদিকে কাদা ছিটোতে ছিটোতে প্রচণ্ডবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে হাজির হল তেলেগিনের কাছে।

মোটরের এক জোড়া হেড-ল্যাম্প আর একটা প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে রেডিয়েটর যেন খাড়া পাহাড়ের ওপর দিকে সোজা উড়ে আসছে। পাতলা ধূসর বর্ণের লম্বা মোটরগাড়ীটা ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হল। গাড়ীটার ছাত খোলা।

মোটরের প্রচণ্ড গর্জন শুনে ঘোড়াগুলো একটু ভড়কায়—পা তুলে তুলে মাথা ঝাঁকায়। “প্রস্তুত!” বলে হাঁক দেয় ইমেরমান। কুকুরের বাচ্চাটাকে প্রায় চাপা দিতে দিতে মোটর এসে থামল। লাফ দিয়ে সরল বাচ্চাটা—তারপর দূরে বসে বসে আবার দেখতে লাগল। গাড়ীর মধ্যে তিনজন মিলিটারি অফিসার বসে—তিনজনেরই গ্রেটকোটের ওপর ট্যান-করা বর্ষাতি চড়ানো। ঘোড়ায় চড়ে এঁদের সামনে দাঁড়াল তেলেগিন, ওঁদের যে-কোনো একজনকে লক্ষ্য ক'রে

তলোয়ার ওঠাল স্যালুটের কায়দায়। ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর হাতটা রেখে তেলেগিনের রিপোর্ট শুনে গেলেন, কিন্তু তেলেগিনের দিকে চাইলেনও না।

তারপর ঝট্ ক'রে মুখ ফিরিয়ে একেবারে স্কোয়াড্রনের সামনাসামনি। তাঁর পেছনের সীটে যে দুজন বসে ছিলেন—একজনের ভিজে দাড়ি, কাপড়ের মতো সাদা রং, আর আর একজনের বেশ মোটাসোটা, গুমরে গুমরে, কড়া কড়া চেহারা—উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম বাজালেন তাঁরা দুজন। যিনি রিপোর্ট শুনেছিলেন তিনি এবার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে ঘেউ ঘেউ সুরে বক্তৃতা করলেন। মাথা হেলানোর চোটে ভদ্রলোকের প্যাঁশনে চশমাটা নাকের ওপর নাচে, কালো কালো ফুটোর মতো নাসারন্ধ্র দুটো দেখা যায়।

"সৈন্যগণ! আপনাদের তলোয়ার একেবারে শানিয়ে রাখুন, মজবুত ক'রে সঙগীন এ'টে নিন বন্দুকে—চাষী মজুর গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে এই আমার আদেশ। সোজা দনের খাড়িতে পেঁছে তারই শান্ত জলে ঘোড়াকে জল খাওয়াতে হবে ঃ আপনাদের মধ্যে কে আছে যে তা চায় না? চায় না শুধু ভীরু আর কাপুরুষেরা।...আপনারা এখানে বসে কেন? ওখানে পেঁছে যাননি কেন এখনও? চূড়ান্ত বীরত্ব দেখাবেন আপনারা—প্রজাতন্ত্র তো আপনাদের কাছে এই আশাই করে! আগে বাড়ো! শত্রুকে পুড়িয়ে ছাই করো! আর তারপর মাতৃসমা স্তেপের বুকে সে ছাই উড়িয়ে দাও......"

বক্তৃতার সুর ক্রমেই চড়তে লাগল, তবে বক্তব্য ঐ একই ধরনের। বক্তৃতা শেষ হলে বক্তা একবার সার-বাঁধা সেপাইদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর ঘুষিপাকানো হাতটা মাথার ওপর তুলে জয়ধ্বনি করে উঠলেন—"হুর্‌রা!" বেতালা সুরে একসঙ্গে সাড়া দিল সেপাইরাও। বক্তৃতাটা শুনে ওরা ধাঁধায় পড়ে গেছে, মনে হচ্ছে বক্তা যেন এ দুনিয়ার মানুষ নন। আর যা বলুন বলুন, তা বলে একেবারে 'কাপুরুষ'! এ ওরা আশাই করেনি।

ঘাড় হেলিয়ে বক্তা তেলেগিনকে কাছে আসার জন্যে ইশারা করলেন।

"আপনার সৈন্যদের অবস্থা দেখে আমি খুব অসন্তুষ্ট—কতকগুলো আনাড়িকে ধ'রে ঘোড়ায় চাপিয়েছেন। আপনার ঘোড়াটোড়া দেখেও আমি খুব অসন্তুষ্ট—সব একেবারে ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া। আসুন আমার সঙ্গে..."

বলে ড্রাইভারের পাশে ধপ করে বসে পড়লেন। প্রকাণ্ড গাড়ীটা এগিয়ে চল্ল গোলাবাড়ীমুখো।

পেছনে পেছনে তেলেগিন, ঘোড়ায় চড়ে। ব্যাপার-স্যাপার ও তখন মনের মধ্যে খতিয়ে নিচ্ছে—আখেরে মৃত্যুদণ্ডই পেতে হবে খুব সম্ভব......

যে কুটিরে সদর দপ্তরের অফিস সেখানে এসে থামল গাড়ীটা। ঘোড়া ছুটিয়ে তেলেগিনও পেঁছাল। তার পেছনে চেসনোকেভ—আনাড়ির মতো ঘোড়ার ওপর ঢক ঢক করতে করতে আসছে। ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল টেলিফোন অপারেটর—হাত তুলে স্যালুট দিচ্ছে, কিন্তু হাতটা

কাঁপছে। দুই চোখ দিয়ে সে নীরবে তেলেগিনের অনুমতি ভিক্ষা করল—কিছু বলতে চায়। আদবকায়দামাফিক কথা বলার চেষ্টায় তোৎলাতে তোৎলাতে রিপোর্ট দিল যে, মিনিটখানেক আগে ব্রিগ্রেড সদর দপ্তর থেকে ওকে টেলিফোন করেছিল (ব্রিগেডের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট, মালপত্র, টাকাপয়সা, দলিল দস্তাবেজ—সবই ছিল গাইভরনি গ্রামে--ওখান থেকে মাইল পঁয়ত্রিশের পথ)। টেলিফোনে ওরা শুধু এইটুকু জানাতে পারে যে, গাইভরনিতে হোয়াইট পক্ষের ঘোড়সওয়ার টহলদারেরা আক্রমণ করেছে—তারা বোধ হয় মামন্তভের ফৌজ। এই কথা বলতে বলতেই টেলিফোনের লাইন কেটে যায়।

পিছনের সীটে গুমুরে গোছের অফিসারটি কমাণ্ডার-ইন-চীফের চীফ-অফ-স্টাফ (সেনানীমণ্ডলীর প্রধান)। সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে তিনি সভাপতির কানে কানে কি যেন বল্লেন। সভাপতি মাথা নাড়লেন, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে কটা কথা ছুঁড়ে দিলেন তেলেগিনের উদ্দেশে :

"সামরিক ডাক মারফৎ আমার নির্দেশ জানতে পারবেন।"

তেলেগিন, চেস্‌নোকভ দুজনেই একেবারে থ। কাল্‌চে রাস্তার ওপর দিয়ে বারুসে গাড়ীটা তখন ছুটছে, ছুটতে ছুটতে ঠিক ছায়ামূর্তির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে জলভরা কুয়াশার মধ্যে। ওরা দুজন নীরবে সেদিকে চেয়ে রইল বহুক্ষণ।

'উন্নতিসাধন বিভাগের' কার্যকরী কমিটিতে দাশা কাজ পেল; 'পরিকল্পনা ব্যুরোর' যিনি প্রধান, ও তাঁর দ্বিতীয় সহকারী। ওকে কখনো কস্ত্রমা জেলার ম্যাপের ওপর কতকগুলো এলাকায রং লাগাতে হয়—ঐ সব এলাকায় জলা জায়গা থেকে জল-নিষ্কাশনের প্রস্তাব করা হয়েছে, জল-নিষ্কাশনের পর ওখানে নাকি অফুরন্ত পরিমাণে পীট (জ্বালানি) আর খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে। কখনো আবার এঞ্জিনীয়ার গ্রিবসলভ-এর নোটগুলো কপি ক'রে রাখতে হয়—বিরাট বিরাট পরিকল্পনার জাঁক দেখিয়ে কার্যকরী কমিটিকে হরদম বেসামাল ক'রে রাখাই এই সব নোটের একমাত্র উদ্দেশ্য। আসলে পরিকল্পনাগুলি একেবারেই নিরর্থক, কারণ 'উন্নতিসাধন বিভাগের' দপ্তরে থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা রংয়ের বাক্স, কয়েকটা তুলি, আর কিছু ড্রইং কাগজ। গাড়ী, ঘোড়া, কোদাল, পাম্প, লোকজন, টাকাপয়সা—এ সব কিছুই নেই।

দাশা রেশন পায়—দৈনিক আধ পোয়া রুটি (তার মধ্যে কিছু খড়ের কুচি), আর মাঝে মাঝে খানকয়েক লরেল পাতা কিংবা গোটাকয়েক গোলমরিচ। আনিসিয়াও কার্যকরী কমিটিতে চাকরি করে—পিওনের চাকরি। যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছিল বলে পুরস্কার হিসাবে ও কিছু বাড়্‌তি রেশন পায়—রুটি আর গোলমরিচ তো আছেই, তার ওপর আবার দেড়খানা শুঁটকি আছে। মাঝে মাঝে জংধরা গোছের নোনা হেরিং মাছও জোটে এক আধটা।

কার্যকরী কমিটির কাজ ছাড়া একটা অভিনয় মণ্ডলীতেও যোগ দিয়েছে আনিসিয়া। কাজান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টা এখানে উঠে এসেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস আর ভাষাতত্ত্বের সাধারণবোধ্য বক্তৃতা থাকলেই আনিসিয়া আবার সেখানেও ছুটে যায়। অবিশ্যি ওর প্রধান কাজ হল কার্যকরী কমিটিতে উপ-সভাপতির ঘরের দরজায় একটা উঁচু, নড়বড়ে চেয়ারে রেডি হয়ে বসে থাকা। এই কাজটাকেই ও সব চেয়ে অবজ্ঞা করে। মাথা আর কান দুটো চেপে ধ'রে ও ওখানে দুমড়ে বসে থাকে—হাঁটুর ওপর থাকে সেক্সপীয়ারেরই নাটক একখানা। ডাক পড়লে অন্যমনস্ক ভাবে সাড়া দেয়, "আসছি!" দপ্তরে অসংখ্য ঘর, ঘরের মধ্যে টেবিলের পর টেবিল, আর টেবিলে টেবিলে লোক একেবারে বোঝাই—সকলেই নিজের নিজের জন্যে একটা না একটা চাকরি তৈরী করেছে। এমনি ধারা কোনো ঘরে চিঠি দিয়ে আসতে হবে বলে কেউ যদি বেশী জিদ করে, তাহলে আনিসিয়া অনেক সময় বেশ "শুনিয়েও দেয়"। মাঝে মাঝে আবার একেবারে কাজেই আসে না। পাণ্ডুবদন এক মহিলা কর্মচারী একবার ওকে এই সবের জন্যে বকেছিলেন। মহা ঠেঁটার মতো আনিসিয়া তাঁকে জবাব দিয়েছিল, "বেশী গলা ক'রে লাভ হবে না কমরেড, কসাকের তলোয়ারেও আমি ভয় খাইনি......।" ভদ্রমহিলা বুদ্ধিজীবী, নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে আগের দিনে অনেক খেটেছেন; তিনি ভাবলেন যে, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর এই উদ্ধত প্রতিনিধিকে বেশী না ঘাঁটানোই ভালো।......

পাঁচটা বাজার কিছু পরে দাশা বাড়ী ফেরে। আনিসিয়া কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক রাত করে। ভল্‌গার ধারে একটা ছোট কাঠের বাড়ীতে ওদের বাসা। কুজমা কুজমিচ তেলেগিনকে কথা দিয়েছিল যে, দাশা আর আনিসিয়া যাতে ভাল খেতে পায় তার ব্যবস্থা করবে; সে কথা কুজমা ভুলতে পারে না, তাই বিবেকে বাধলেও খাবার জিনিষ আর জ্বালানি জোগাড় করার জন্যে ওকে নানা রকম সন্দেহজনক কারবারে লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু এই সব করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট লাগে। একে বয়সের বর্ধমান বোঝা, তার ওপর শরতের কনকনে ঠাণ্ডা, এখন ইচ্ছে করে শুধু আরামসে উনুনের ধারে বসে থাকতে—ছাতের উপর বৃষ্টি পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে শুনতে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার প্রশান্তিতে মন ছেড়ে দিতে। এখন কি আর হটর হটর ক'রে বেড়াতে ভাল লাগে?

ভোরবেলার আবছা আলোয় জানলার সার্সিতে নীল রং ধরেছে—সাধারণত সেই সময়ই দাশা, আর আনিসিয়া দুজনে গাজরের চায়ের সঙ্গে বিস্কুট টিস্কুট কিছু একটা খেয়ে কাজে যায়। ধোয়াপাকলা করে কুজমা কুজমিচ্, ময়লা টয়লা বাইরে ফেলে এসে ছোট্ট ঘর দুটোতে ঝাঁটপাট লাগায়। তারপর বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে ঃ আজ দুটো ডিম চাই, একটু শুয়োরের মাংস চাই, এক বোতল দুধ আর আধ থলি আলু চাই—কোথায় পাওয়া যাবে এ সব? ভিক্ষা? রাম রাম, কুজমা কখনো ভিক্ষা করে না! ও শুধু দ্রব্য বিনিময় করে—দার্শনিক আর নৈতিক তত্ত্বজ্ঞানের বিনিময়ে খাদ্যবস্তু। এই দু মাসের ভেতর

সারা কস্ত্রমাই ওকে চিনে ফেলেছে: আশে পাশের গাঁয়ে পর্যন্ত কুজমা গিয়ে ঠেলে উঠেছে মাঝে মধ্যে।

জানলার ধারে বসে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ দিনের আলো জোর হয়, সেই ফাঁকে ও সাধারণত কিছু না কিছু একটা সেলাইফোঁড়াইয়ের কাজ সেরে নেয়। জীবনের প্রচন্ড শক্তি। মহা মহা ঐতিহাসিক প্রগতি কিংবা কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও মানবশিশু জন্মলাভ করেছে, মাথাটা এগিয়ে দিয়ে মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে এসে এই পৃথিবীতে আপন স্থানের জন্যে ক্রুদ্ধ স্বরে দাবী জানিয়েছে—তা বাপ-মায়ের পছন্দ হোক বা না হোক: কত নরনারী প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে—অথচ ভুলেও একবার ভাবেনি যে, প্রেম করার পক্ষে তাদের পার্থিব সংগতি আর কতটুকু? বসন্তের নর্ম-প্রাঙ্গণে ঐ যে কালো মোরগটা তার বর্ণাঢ্য পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে—তার চেয়েও ওদের সংগতি অনেক কম, কিন্তু সে কথা ওরা ভাবেও না। মানুষের সান্ত্বনার প্রয়োজন অফুরন্ত, তাদের বুকের মধ্যে সন্দেহ কেবলই আঁক্‌পাক্‌ করে ঃ "এম্‌নিভাবে চল্লে কি দশা হবে আমাদের? বোধ হয় ঘাস খেয়েই থাকতে হবে, লজ্জা নিবারণ করতে হবে কপি পাতা দিয়ে।" অযাচিত কেউ এসে যদি ওদের সন্দেহতাপিত হৃদয়ে বারি সিঞ্চন করে, তাহলে তাকে আধখানা রুটিরও ভাগ দিতে তারা সব সময় প্রস্তুত। আবার আরও অনেকে আছে, দরদী শ্রোতা পেলেই তারা খুশী; গোয়েন্দা টোয়েন্দার ভয় থাকবে না, জ্বলন্ত মনের ঝাঁঝটাঁঝ সব প্রাণ খুলে প্রকাশ করতে পারবে—এই তারা চায়।

খামারবাড়ী ঘুরে ঘুরে রোঁদ দিতে বার হয় কুজমা। অন্ধকার দরজার ধারে পা-টা মুছে নিয়ে সোজা একেবারে রান্নাঘরে। কোনো কোনো সময় বাড়ীর গিন্নী হয়তো চটেমটে চেঁচিয়েই ওঠে ঃ

"এই যে, হাভাতে পরগাছাটা এসেছে আবার। আজ বাপু বাড়ন্ত, কিছু নেই ঘরে......"

"মাত্রিয়োনা সাবিশ্‌নার খবর নিতে এলাম", কুজমা জবাব দেয়। ঠোঁট কুঁচকে লাল মুখটা নাড়ায়, বন্ধুর মতো। "কেমন আছেন মাত্রিয়োনা?"

"ভাল না, অবস্থা খুবই খারাপ।"

"মৃত্যু তো তেমন ভয়ংকর নয় আনা ইভানোভ্‌না, দুঃখ হয় শুধু এই ভেবে যে, জীবনটা বৃথাই কাটল। এইজন্যেই মানুষের সান্ত্বনা দরকার; মৃত্যুর ছোঁয়া লেগে শরীর যখন হিম হয়ে আসে, তখন যেন কেউ কপালের ওপর হাত রেখে বলেঃ মাত্রিয়োনা সাবিশ্‌না, জীবনে তো বিশেষ কিছু পাওনি, এখন সে জীবন ছেড়ে যেতেও দুঃখ করার দরকার নেই। কিন্তু সারাজীবন ধ'রে খেটেছ তুমি, ঠিক ঐ ছোট্ট পিঁপড়েটার মতো; তোমার খড়কুটো তুমি বয়েছ ঠিকই—ক্লান্তি লাগলেও ধর্মভীরুর মতো নিজের কর্তব্য পালন করেছ। কাজ তো কখনও বৃথা যায় না মাত্রিয়োনা, সব কিছুই যে দরকারে লাগে; মানুষ সমাজের ইমারত দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, আর তারই দেওয়ালে কোথাও না কোথাও তোমার খড়কুটোও

স্থান পেয়েছে। পুত্র-পৌত্রদের তুমি মানুষ করে তুলেছ, তারপর আজ তোমার জীবনে সন্ধ্যা নামল। চোখ বোজ, ঘুমোও নিশ্চিন্তে। দুঃখ করার কি আছে, তোমার দুর্দশার জন্যে তুমি তো দায়ী নও......'।"

দরজার ধারে টুলের ওপর বসে এলোমেলো বলেই চলে কুজমা। বাড়ীর গিন্নী কাঠ চেলা করছিল, হঠাৎ কুড়ুল টুড়ুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বারকয়েক দ্রুত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—জলের ধারা নামল দু গাল বেয়ে।

"সত্যিই তাই। বেঁচে আছ তো বেঁচে আছ, যেদিন মরবে সেদিন কেউ একটা ভাল কথাও বলবে না......"

"আমাদের জীবনে এখনো অনেক অবিচার আছে কিনা, তাই অমন হয়।..... প্রত্যেক মানুষই যা খাটা খাটে, তার জন্যে প্রত্যেকের নামেই একটা ক'রে স্মৃতি-স্তম্ভ বানিয়ে দেওয়া উচিত।......ভবিষ্যত কালে তাই হবে আনা ইভানোভ্না—জীবন হবে মঙ্গলময়......"

"তার মানে পরকালে?"

"না, না, ইহকালেই।"

"ভিক্ষেসিক্ষে করলে কি হবে, তোমার মমতা আছে। তোমার মতো লোক দেখিনি।......"

"মমতা নয় আনা ইভানোভনা, এই আমার পেশা।......কৌতূহলের যে আমার অন্ত নেই। মানুষ করুণা চায় না—তাদের ঝামেলার দিকে অন্য কেউ একটু খেয়াল করুক, এই তারা চায়। আচ্ছা......তাহলে মাত্রিয়োনা সাবিশনার কাছে যাই?"

"যাও না, যাও।"

এমন ধারা সব বাড়ী থেকে কুজমা কখনো খালি হাতে ফিরবার পাত্র নয়। তারপর সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসে এখানে ওখানে কারও উঠোন থেকে একটা তক্তা হাতিয়ে আনে; তক্তাখানা চেলা ক'রে মেয়েদের ঘরে অঙ্গীঠিটা গরম করে দেয়; ফুটন্ত জলের সামোভার টেবিলে বসিয়ে ফুঁ দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে দিনের কীর্তিকাহিনী সব শোনায় দাশা আর আনিসিয়াকে।

এই রকম একবারের কথা। সসারে চায়ে ফুঁ দিতে দিতে ও বল্ল: "আর একজন আজকাল পাল্লা দিচ্ছে আমার সঙ্গে। লোকটা বুড়ো। মুখময় ছড়ানো দারুণ একটা নাক, দাড়িটা বেশ সযত্নে উস্কোখুস্কো ক'রে দেওয়া, পরনে চটের শার্ট, খালি পা—এই চেহারা নিয়ে সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। নাম নিয়েছে 'এঞ্জেল বাবাজি'। বদমায়েসটা বেশ সহজ, সরল গল্প বানিয়েছে একটা। হুট ক'রে কোনো বাড়ীতে ঢুকে মেঝের ওপর বসে পড়ে, হাত টাত ছুঁড়ে দুলতে দুলতে গোঁ গোঁ করে: 'এঞ্জেল, এঞ্জেল, তুমি ভেবেছিলে বিশ্বাস করবে না—কিন্তু এখন, এখন তো নিজের চোখে দেখলে, নিজের হাত দিয়ে ধরলে পর্যন্ত ...।' শ্রোতারা সব একেবারে হাঁ। আরও কিছুক্ষণ অমনি ঢং ঢং ক'রে ও তখন গল্প শুরু করে: একজন মেয়েছেলের স্বামী আছে লাল ফৌজে—তা সেদিন বেস্পতিবার

মেয়েছেলেটার বাচ্চা হয়েছে—দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা, তার ওপর পুরো দু পাটি দাঁত। ওরা তো বাচ্চাকে ধুইয়ে ধাইয়ে জামাটামা পরিয়ে তুলে দিয়েছে মার কোলে—মা মাই খাওয়াতে যায় কিন্তু বাচ্চা ধরেই না—মার দিকে চেয়ে (মাগো, সে কি চাওয়া!) বলে, 'মা, মা, আমি এসেছি'!"

সসারে চুমুক দিতে দিতে মুচকি হাসে কুজমা। "আমার মক্কেলদের সব ভাগিয়ে নেবে এঞ্জেল। তার ওপর লোকটা যা হিংসুটে। এক বাড়ীর উঠোনে ওর সঙ্গে আজ মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল—কী মুখটাই ভেঙ্গাল। 'আমার উচ্ছিষ্ট খেতে এসেছিস কুজমা? আর যদি কখনো আমার পেছন পেছন আসিস তো ডান্ডার চোটে ঠান্ডা করে দেব, বুঝলি?' "

"আপনার এই সব ফক্কিকারি টারি ছাড়ুন কুজমা কুজমিচ," কড়া সুরে দাশা বল্ল। "সোবিয়েতের ওখানে কোনো একটা কাজ নিন গিয়ে। আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না, আমরা আমাদের রেশনেই চালিয়ে নিতে পারব। লোকে আপনাকে নিয়ে যাতা বলতে আরম্ভ করেছে, আমার একদম ভাল লাগে না……"

অভ্যস্ত দিবাস্বপ্ন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আনিসিয়া মন্তব্য করলঃ

"আজ একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম—লোকটা একটা জানোয়ার।" একটু থেমে ও এবার লোকটার ভাবভঙ্গি আর গলার স্বর নকল করতে লেগে গেল। "আমি বসে বসে পড়ছিলাম তা তো বুঝতেই পারছ। এসে হাজির হ'ল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারী একজন—থলথলে, পচা পচা চেহারা, তার ওপর মুখটা বাঁকা।

" 'আপনার খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে যদি পরিচয় করিয়ে দেন', বল্ল লোকটা।

" 'খুড়োমশাই, কোন্ খুখোমশাই?' আমি শুধোলাম।

" 'ঐ যে আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন,' সে বল্ল। 'ওঁর কাছে আমি কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ নিতে চাই।'

" 'উপদেশ টুপদেশ তিনি দেন না', বল্লাম আমি।

" 'কিন্তু দেন বলেই তো শুনেছি। কত লোক তাঁর কাছে গিয়ে উপকার পায়।'

" 'কমরেড, আপনার এই সব গাঁজাখুরি কথাবার্তা শোনার আমার সময় নেই,' বল্লাম আমি, 'দেখছেন না আমি কাজ করছি?'

"লোকটা তখন একেবারে কানের কাছে মুখ এনে বল্ল—কানটা এঁটোই করে দিল বলতে গিয়ে—

" 'মুখফোঁড় বাচ্চার বিবরণ শোনেননি আপনি?'

" 'যান যান, চুলোয় যান', বলে তাড়া দিলাম।

" 'তার জন্যে বেশী দূর যেতে হবে না', লোকটা বল্ল। 'যুগ যুগ ধ'রে চুলোয়ই তো রয়েছি আমরা।…আচ্ছা বলুন দেখি, এই বাচ্চাই কি এণ্টি-ক্রাইস্ট?' "

"ভারী বিশ্রী ব্যাপার তো", দাশা বল্ল।

"সত্যি, এ জায়গাটা একেবারে দুনিয়ার বার" চিন্তিত মনে আর এক গ্লাস

গরম জল ঢালতে ঢালতে কুজমা বল্ল। "এমন কুণো গর্ত, কান যেন ভোঁ ভোঁ করে। কিন্তু রুশরা খুব অনুসন্ধিৎসু জাত। আর ওদের মনে, বুঝলে কি না, ছাপও পড়ে খুব সহজে। কী মাথা এক একজনের! শুধু জ্ঞান দাও ওদের, এই বাইজাণ্টাইন গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার পথ দেখিয়ে দাও, ব্যস তাহলেই হবে। অনেক দিন থেকেই তাই ভাবছি, বুঝলে মা মণি, যে এবার মস্কো যাওয়ার প্রস্তাব করব—কিন্তু কথাটা ঠিক বলে উঠতে পারছিলাম না।"

"মস্কো?" নীল চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে প্রতিধ্বনি তুল্ল আনিসিয়া।

"হ্যাঁ মস্কো; এবার চল আলোর দিকে, নতুন নতুন ধ্যানধারণা যেখানে, যেখানে থাকলে মহা মহা ঘটনার একেবারে পাশেই থাকা যাবে, চল সেই দিকে। ছলাকলা আমি সব ছেড়ে দেব, কথা দিচ্ছি।......এ সবে আমার নিজেরই ঘেন্না ধ'রে গেছে অনেক দিন থেকে। তারপর যখন নিজের ছবি দেখলাম—'এঞ্জেল বাবাজি'—তখন থেকে মন একেবারে অশান্ত হয়ে উঠেছে......"

"মস্কো চলো, মস্কো!" দাশা বল্ল "সেখানে মাথা গুঁজবার ঠাঁইও তো রয়েছে ঃ মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না নামে এক বৃদ্ধা মহিলার ফ্ল্যাটে কাতিয়ার একটা ঘর ছিল।......অবিশ্যি এখন আর সেখানে কিছু নাও থাকতে পারে।......ওঃ কুজমা কুজমিচ, আর দেরী টেরী করবেন না লক্ষ্মীটি......এখানে বসে বসে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদই সব বেচে ফেলছি—আপনার ঐ তুচ্ছ বিস্কুট আর চীজ-কেকের জন্যে। আপনিও তো এখানে এসে একেবারে বদলে গেছেন, ভীষণ অধঃপতন হয়েছে আপনার।......শুনুন! মস্কো পৌঁছবামাত্র আনিসিয়াকে একটা থিয়েটারের স্কুলে পাঠিয়ে দিতে হবে......"

আনিসিয়ার মুখে কথাটি নেই, তবে সারা মুখ একেবারে লাল; চোখ দুটি মাটির দিকে নামানো।

"কুজমা কুজমিচ, যান কাল গিয়ে দেখে আসুন ইয়ারোস্লাভ্ল যাওয়ার কোনো স্টীমার পাওয়া যায় কি না!"

দাশা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে, কথাই বলতে পারে না, খালি লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলে। পেটের ওপর হাত দুটো চেপে ধ'রে কুঁকড়ে শুঁকড়ে বসে আছে কুজমা, মনে মনে নিজেকে বোঝাচ্ছে যে মেয়ে দুজনকে খাওয়ানোর দিক থেকে মস্কোতে নিশ্চয়ই মুশ্‌কিলে পড়তে হবে না ঃ নেহাত বেকায়দায় পড়লে দাশার জহরতগুলো তো আছে—সেগুলো ও গোপনে লুকিয়ে রেখেছে।......আর কয়েক বস্তা রাই ময়দা কস্ত্রমা থেকেই নিয়ে যাওয়া যাবে।......আচ্ছা হঠাৎ মস্কো যাওয়ার কথাটা ওর মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল কেন? মরুকগে, এখন বলা যখন হয়েই গেছে, তখন আর কি করা? সকলই মঙ্গলের জন্যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।......ইভান ইলিয়িচকে বোঝানোর জন্যে কি লিখবে, ও তখন মনে মনে তারই খসড়া করতে লেগে গেল; ইভান ইলিয়িচের কাছ থেকে ক'দিন আগে একটা ছোট্ট পোস্টকার্ড এসেছে, লিখেছে যে সে বেঁচে আছে, ভাল আছে—ভালবাসা আর চুম্বন পাঠিয়েছে।

টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে রাতের প্রদীপটার ক্ষীণ আলোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আনিসিয়া; ওর কল্পনার চোখে কখনও ভেসে উঠছে একটা সিঁড়ি (কার্যকরী কমিটির অফিসের সিঁড়িটার মতো)—রেশমী বসনপ্রান্ত ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে অনাবৃত স্কন্ধে সেই সিঁড়ি বেয়ে ও নেমে আসবে, আর রক্তাক্ত হাত দুখানি মুছতে থাকবে বার বার; আবার কখনো ভেসে উঠছে একটা লম্বা দেবদারু কাঠের কফিন বাক্স—ঐ কফিন থেকে উঠে চোখের সামনে দেখবে রোমিও, আর সেই বিষের শিশি......

ফুটন্ত সামোভারের পাশে তিনজনে মিলে বসে রইল অনেকক্ষণ। ছোট্ট জানলার সার্সিতে বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় ঝাপ্‌টায় রাত্রি এসে আঘাত করে। কিন্তু ঝড়ো আবহাওয়া কিংবা হতচ্ছিরি ঘরদরজায় ওদের কি আসে যায়? জীবনের আরও সব দৈনন্দিন দুঃখদৈন্য—তাতেই বা কি আসে যায়? জীবনের প্রবেশপথে ওদের হৃদয় যে তখন উগ্র উত্তেজনায় নাচছে, দৃঢ় বিশ্বাসের ভরসায় ধক্ ধক্ করছে—মনে হয় যেন চিরযৌবনের জয়টীকাই রয়েছে কপালে......

ইভান ইলিয়িচ নিজেকে বেশ ধীরস্থির বলেই মনে করত—দোষ টোষ যাই থাক মাথা ওর সব সময়েই ঠিক থাকে। কিন্তু শেষকালে এও হল? এক মুহূর্ত ভাবল না পর্যন্ত, একেবারে অন্ধের মতো পিস্তলের খাপ খুলে থরথর হাতে রিভলবারটা বার করল, তারপর মাথার সঙ্গে লাগিয়ে ঘোড়া টিপল! কিন্তু শব্দ হল না, যে কারণেই হোক কার্তুজটা কেউ সরিয়ে রেখেছিল।

রশচিন আর কমিসার চেসনোকভ দুজনে মিলে তখন ওকে কী গালাগালি—মেরুদণ্ডহীন, বুদ্ধিজীবী, ছেঁড়া নেকড়া, ঘোড়ার পাছা মোছারও যোগ্য নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘটনাস্থান একটা ঘাসের গাদা, মাঠের মধ্যে—বৃষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে ওরা ওখানে ঘোড়া থেকে নেমেছিল। সওয়ার হয়ে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্কোয়াড্রনটা আর কম্যাণ্ডাণ্টের ডিট্যাচমেণ্টটা। তেলেগিনের ব্রিগেডের মধ্যে এখন শুধু ওরাই বাকী আছে।

ওদের বাহিনীর পেছন দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মামন্তভের সৈন্যদল আক্রমণ করেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা সমস্ত ধ্বংস ক'রে গাইভরনি গ্রামের সাপ্লাই আর গোলাবারুদ গুদাম তারা একেবারে তছনছ ক'রে দেয়। ক'দিনের মধ্যেই ব্রিগেডের পশ্চাদ্‌ভাগে আর কোনো শৃঙ্খলা রইল না। কোনো কমাণ্ড ঘাঁটির সঙ্গেই কারো কোনো যোগাযোগ নেই—বিচ্ছিন্ন ইউনিট, সংযোগহীন সৈন্য ইত্যাদি সবাই যে যে ভাবে পারে পিছু হটছে, নয়তো লুকিয়ে পড়ছে, আর তা না হলে এলোমেলা এদিক ওদিক ঘুরছে।

চোট সামলাবার আগেই পদাতিক রেজিমেণ্ট দুটো আবার ফাঁদে পড়ল—ওদের পেছনে মামন্তভ আর সামনে দন কসাকের দল। যুদ্ধের লাইন টাইন ছেড়ে ওদিকে সেদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ফৌজের সিপাহীরা।

সর্বনাশের পরিমাণ কতখানি, ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে বোঝা গেল সে

কথা। স্কোয়াড্রন আর কমাণ্ডান্টের ডিট্যাচমেণ্ট সঙ্গে নিয়ে তেলেগিন বেরিয়েছে, ওর ব্রিগেডটাকে খুঁজে বার করবে। মামন্তভ এখন দূরে চলে গেছে, আতঙ্কও কেটেছে অনেকখানি, এবার বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ কিছু না কিছু জড়ো করা যাবে--ওর মনে তখনও এই আশা। কিন্তু মাথার ওপর কালো আকাশ, পায়ের তলে কর্দমাক্ত গোচারণ ভূমি আর দুরতিক্রম্য চষা ক্ষেত, কুয়াশা-ভরা নালা আর ঝোপঝাড়—এর মধ্যে লোকজনকে কিছুতেই জড়ো করা যাবে না তা শীগ্গিরই বোঝা গেল।

ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে কোনো একটা ইউনিট খুঁজে বার ক'রে তাতে যোগ দেবে। আর এক অংশ এদিক সেদিকে খামারে খামারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—খামারবাড়ীর জানলার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনতি জানায়—একটু আশ্রয়, একটু আগুনের তাত ভিক্ষা করে। আরও অনেকে আবার অনেকদিন থেকেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—এবার তারা সব রওনা দিয়েছে ঘরমুখো—সেখানে আগুনের ধারে মৌজ করবে, স্ত্রীর সঙ্গে মিলবে।

চলতে চলতে তেলেগিন, রশচিন আর কমিসার হঠাৎ দুজন সিপাহীর সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। ওরা লাল ফৌজের ৩৯নং রেজিমেণ্টের লোক। রোগা একেবারে হাড্ডিসার, ঘাসের গাদায় ঠেস দিয়ে কোনো রকমে বসে আছে। ওরা যে কাহিনী বল্ল, শুনলে দুঃখ হয়।

"মাঠে মাঠে ঘুরে কোনো লাভ নেই, কাউকে খুঁজে পাবেন না", ওদের একজন বল্ল। "৩৯নং রেজিমেণ্ট এককালে ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই।"

অপর জন তখনও ঘাস-গাদায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। দাঁত কিড়মিড় ক'রে বল্ল ঃ

"আমাদের বেচে দিয়েছে, তা নয়তো কি?......আমরা কি আর লড়াইয়ের হুকুমনামা বুঝিনে? সব বুঝি। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আমাদের নিয়ে। কমাণ্ড টমাণ্ড সব চুলোয় যাক! পিজবোর্ডের সোল লাগায়নি আমাদের জুতোয়?" জুতোর ফাঁক দিয়ে আঙুল বেরিয়ে আছে, আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে দেখাল। "যুদ্ধটুদ্ধ আর করছিনে বাবা......এক্কেবারে ইতি!"

এইখানে এই ঘাসের গাদার ধারেই তেলেগিন হঠাৎ ভেঙে পড়ে। সেই যে সেই প্রকাণ্ড রেডিয়েটর, দু পাশে দুই হেডলাইট—সেটা ওর স্মৃতিতে ভেসে এল। নিজের পক্ষে কী সাফাই দেবে এখন? ভালমানুষি আর আলসেমি ক'রে ক'রে সব কিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে বসে আছে।

"থাম, আর গাল দিতে হবে না!" রশচিন আর চেসনোকভকে বল্ল তেলেগিন। "আচ্ছা আচ্ছা, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম সত্যি, সাহস হারিয়েছিলাম—মাফ চাইছি!" বলে ভীষণ বিকৃত মুখে রিভলবারটা খাপে ভরল। "বরাবরই আমার কপালটা খুব ভাল ছিল—জানতাম, এ কপাল একদিন ভাঙবেই। আচ্ছা বেশ, বিপ্লবী ট্রাইবিউন্যালই তাহলে আমার বিচার করুক......"

"গোল্লায় যাও তুমি, এমন ধারা সময়ে তোমার কথা কে ভাবছে?" বলে চেঁচিয়ে উঠল রশ্চিন—ওর গালের পেশীটা কেঁপে উঠল। "স্কোয়াড্রনটাকে এখন কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চাও? পূব? পশ্চিম? প্ল্যান ট্যান কিছু মাথায় আছে? এখনি কি করতে হবে ঠিক করেছ? ভাব, ভাব!"

"ম্যাপটা দাও আমাকে......"

রশ্চিনের হাত থেকে ম্যাপটা একেবারে ছিনিয়ে নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল তেলেগিন—দেখছে আর বিড় বিড় ক'রে নিজেকেই খিস্তি করছে। শহর, গ্রাম, খামারবাড়ী—নামগুলো সব চোখের সামনে যেন নেচে চলেছে। যাই হোক, এবারও শেষ পর্যন্ত মনকে বাঁধল তেলেগিন। কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর স্থির হল পূব দিকেই যাওয়া যাক, ওদিকে গেলে ৮ম আর্মির ইউনিট টিউনিটের সঙ্গে দেখা হবার আশা আছে।

যেখানেই সম্ভব জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা এগিয়ে চল্ল। দিনের বেলার বাকী অংশটা সারাক্ষণই এম্নি ধারা। তারপর যখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এল, ঘোড়ার কান পর্যন্ত দেখা যায় না, তখন ক'জন স্কাউট পাঠিয়ে দেওয়া হল সামনের দিকে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রজ্‌দেস্তভেন্‌স্‌কোয়ে গ্রামটা নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে, ওরা সেটা খুঁজে বার করবে। তেলেগিনরা ঘোড়া থামাল, কিন্তু নামল না, দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। ঘোড়া চালিয়ে রশ্চিন এবার তেলেগিনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল—দুজনের হাঁটুতে হাঁটুতে এক।

"তারপর?" জিজ্ঞাসা করল রশ্চিন। "এবার বোধহয় কথাটা খুলে বলবে! মহাশয়ের সঙ্গে এখন কথা কওয়া যেতে পারে?"

"পারে।"

"অভিনয়টুকুর অর্থ কি?"

"কি অভিনয় ভাদিম?"

"ঐ যে টোটাহীন রিভলবার দৃশ্য. ...."

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" ওর দিকে ঝুঁকে দেখতে গেল তেলেগিন—কিন্তু দেখা যায় শুধু একটা অস্পষ্ট শ্বেতমূর্তি আর তার মধ্যে কালো কালো চোখের কোটর, আর কিছু নয়। "ভাদিম, তাহলে রিভলবারের টোটা তুমি বার করনি?"

"আমি? আমি তোমার রিভলবারের টোটা বার করে নেব? বাঃ, তোমাকে যত সোজা ঠাউরেছিলাম তার চেয়ে তো তোমাকে চালাক বলেই মনে হচ্ছে......"

"বুঝলাম না। আমি না হয় সাহস হারিয়েছিলাম, কিন্তু তার মানে কি চালাকি? তোমার জায়গায় হলে এ কথা আমি কখনো তুলতামই না......"

"রাখ রাখ, এড়ানো টেড়ানো চলবে না!"

দুজনেরই গলার স্বর চাপা। রাশ ছেড়ে দেওয়ার আগের মুহূর্তে শিকারী কুকুর যেমন কাঁপতে থাকে তেমনি কাঁপছে রশ্চিন।

"ঘাস-গাদার ধারে যে যাচ্ছেতাই খেল্‌টি দেখালে, সারা স্কোয়াড্রনই তা

বেশ ভাল ক'রে দেখেছে। তারা কি বলছে জান? বলছে যে এ তোমার অভিনয়......যাতে বিপ্লবী ট্রাইবিউন্যালের কাছে রেহাই পেতে পার।"

"কী যা তা বলছ তুমি?"

"রোসো, রোসো, আমার কথাটা শুনেই নাও।" এবার রশচিনের ঘোড়াটা পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। "আমাকে তোমার জবাব দিতেই হবে, বুকে হাত দিয়ে জবাব দিতে হবে।......এম্‌নি ধারা সময়েই মানুষের কদর যাচাই হয়।...... তুমি কি কদরের পরীক্ষায় উতরেছ? তোমার গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, বোঝ তা? কলঙ্ক জমিয়ে রাখার কোনো অধিকার নেই তোমার।......"

রশচিনের ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠে লেজের বাড়ি কষাল তেলেগিনের মুখে।

তেলেগিনের খুব লেগেছিল। দম বন্ধ স্বরে চাপা গলায় গর্জন করে উঠল তেলেগিন:

"সরে যাও আমার কাছ থেকে! নইলে খুন ক'রে ফেলব তোমাকে!"

ঠিক সেই সময়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে কমিসার চেস্‌নোকভের গলা শোনা গেল:

"হয়েছে হয়েছে, আর ঝগড়া করবেন না দোস্ত! টোটা বার করে নিয়েছিলাম আমি।"

জবাবে একটি কথাও বল্ল না কেউ, না তেলেগিন না রশচিন। ওরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দুজনেই হাঁপাচ্ছে—একজনের মনে অপমানের জ্বালা, আর আর একজন জ্বলছে রাগে। এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে চীৎকার উঠল, সংক্ষিপ্ত চীৎকার, ঠিক গুলির আওয়াজের মতো।

"হল্ট, হল্ট!" "হুকুমদার!" "ছাড়ো, ছাড়ো বলছি!" "তোমরা কোন্ দলের?" "আমরা ঠিক দলের, তোমরা শালারা কোন্ দলের?"

দু দিকের দু দল স্কাউট সামনাসামনি এসে পড়েছে। ঘোড়সওয়ারেরা পরস্পরকে ঘিরে পাক মারছে—ঘুটঘুটে অন্ধকারে তলোয়ার চালাতে সাহস হয় না, অথচ লড়াই করার সুযোগটাও ছেড়ে দিতে মন চায় না। তাই খালি চীৎকার আর খিস্তি। যাই হোক, খিস্তির বহর দেখে দু পক্ষই শেষকালে বুঝতে পারল যে, দু পক্ষই রেড।

"তবু আমার লাগাম ধরে টানছ কেন তোমরা?"

"কোন্ ইউনিট?"

"তাতে তোমার বাপের কি, শালা শুয়োরের বাচ্চা? আম ইউনিট ঘোড়সওয়ার ইউনিট, মস্ত বড়।"

"কোথায় তোমাদের ইউনিট?"

"এস দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দু পক্ষই শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হল, শান্তভাবে ঘোড়া চালাল স্কোয়াড্রন যেদিকে সেইদিকে। দেখা গেল রজ্‌দেস্তভেন্‌স্‌কোয়ে গ্রামটা একবারে হাতের কাছে—নদী আর ঝোপের ঠিক ওপারে। গ্রামে যে সৈন্যেরা আছে তারা কারা

জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রতার বালাই না রেখেই নবাগত স্কাউটদের কে যেন জবাব দিলঃ "ওখানে গেলেই দেখতে পাবে......"

কুটিরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সামোভার, সেটাকে ঘিরে বসে আছেন সেমিয়ন মিখাইলোভিচ বুদিওনি আর তাঁর দুজন ডিভিশনাল কমাণ্ডার। চা পান চলছে। তেলেগিন, রশচিন আর চেসনোকভ ভেতরে এল। দেখে বেশ খুশী মনে বুদিওনি বল্লেনঃ

"এই যে আরও নতুন শক্তির সমাবেশ হল! বেশ বেশ আপনাদের দেখে খুব খুশী হলাম। বসুন, একটু চা খান।"

টেবিলের কাছে এসে তেলেগিনরা উপস্থিত সকলের সঙ্গে হাত মেলাল। প্রথমে বুদিওনির সঙ্গেঃ পথহারা ব্রিগেড কমাণ্ডার আর তার সেনানীবৃন্দের দিকে একটু তেরছা চোখে চাইলেন বুদিওনি (ওদের খবর তিনি সবই জানতেন)। তারপর ৪নং ডিভিশনের কমাণ্ডারঃ লোকটি বেঁটেখাটো, কিন্তু গোঁফজোড়া একেবারে দারুণ, সে গোঁফ দিয়ে ওঁর ঘোড়াটা বেঁধে রাখা যায়। এঁর পর ৬নং ডিভিশনের কমাণ্ডারঃ নবাগতদের দিকে প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে মর্দন করলেন, মনে হল যেন একটা ঘোড়ার নাল বাঁকাবার চেষ্টা করছেন; অথচ ওঁর লালচে, ছেলেমানুষি মুখভাবে কোনো পরিবর্তন নেই, একেবারে শান্ত।

রাত্রে থাকার জন্যে ওদের ইউনিট ভাল জায়গা পেয়েছে কিনা, ওদের কোনো অনুরোধ বা নালিশ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন বুদিওনি। রশচিন জবাব দিল যে, ওরই মধ্যে যথাসম্ভব ব্যবস্থা হয়েছে লোকজনদের, নালিশটালিশও কিছু নেই।

"বেশ!" বল্লেন বুদিওনি। শুধু একটু দম নেবার জন্যেই তাঁর ঘোড়সওয়ার কোর এ গ্রামে যাত্রাভঙ্গ করেছে—এখানে একটা মাছির পক্ষেও ভালভাবে থাকার জায়গা জুটতে পারে না, সে কথা জানতে তাঁর বাকী ছিল না। "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। আপনার কথা আমার বেশ মনে আছে কমরেড তেলেগিন, আপনার ইউনিটই তো সেবার দন কসাকদের একেবারে চুটিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল।" বেশ খুশী মনে চোখটা কুঁচকে টেবিলে অপর সহযোগীদের দিকে চাইলেন বুদিওনি। ছ নম্বরের কমাণ্ডার দিব্যি প্রশান্তভাবে ঘাড় হেলালেন—অভ্যর্থনাটা যে সত্যি সত্যি চুটিয়েই করা হয়েছিল ঘাড় নাড়াটা সেই বক্তব্যের সমর্থন। আর চার নম্বর ডিভিশনের কমাণ্ডার গভীর আত্মসম্ভ্রম সহকারে তাঁর 'কালমুক' প্যাটার্নের মুখখানি একটুখানি নীচু করলেন।

"হুঁ, এবার তাহলে মামন্তভ আপনাদের খুব ঠেঙিয়েছে, কি বলেন? তা আপনারা কি নিয়ে এলেন—অযোদ্ধা ইউনিট, না জঙ্গী ইউনিট?"

"জঙ্গী ইউনিট—বর্ধিত শক্তি স্কোয়াড্রন একটা", তেলেগিন বল্ল।

"আপনাদের ঘোড়াটোড়ার কি অবস্থা?"

“একেবার ফার্স্ট ক্লাস”, তাড়াতাড়ি বলে দিল রশচিন। “ঘোড়াগুলোর সামনের পায়ের ক্ষুরে নাল পরানো আছে।”

“সামনের ক্ষুরে নালও আছে, সত্যি বলছেন?” বিস্ময়ের সুরে কথাটার প্রতিধ্বনি তুল্লেন বুদিওনি। “তা আমি ভাবছিলাম, ৮ম আর্মির খোঁজে বহুদূর গিয়ে আপনাদের কি লাভ? আর্মি হয়তো সেখানে নেই-ই এখন......”

“কিন্তু আর্মির কমান্ডারের কাছে তো আমাকে রিপোর্ট করতে হবে”, তেলেগিন বল্ল।

“কেন, আমার কাছে রিপোর্ট করতে পারেন।......ডিভিশনাল কমান্ডার কমরেডস, আপনারা কি বলেন? ব্রিগেড কমান্ডারকে আর তাঁর স্কোয়াড্রনকে আমরা নিয়ে নেব?”

ডিভিশনাল কমান্ডার দুজন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। টিন থেকে একটু তামাক বার করে খবরের কাগজে সিগ্রেট পাকাতে শুরু করলেন বুদিওনি।

“আপনাদের অত দূর যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না”, ফের বল্লেন তিনি। “আমাদের সঙ্গে লেগে যান। ডিভিশনাল কমান্ডারদের সঙ্গে এখানে বসে বসে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম—এখন সিদ্ধান্তই করে ফেলেছি যে, ঘোড়াগুলোর যখন খালি মেদবৃদ্ধি হচ্ছে, লোকজনও সব বিরক্ত হয়ে উঠছে—তখন এবার উত্তরে গিয়ে জেনারেল মামন্তভের তত্ত্ব নেওয়া যাক। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াছে এইরকম—মামন্তভ ছুটছে আমাদের হাত থেকে, আর আমরা ছুটছি মামন্তভের পিছু পিছু।......”

বুদিওনি হাসিঠাট্টা করলেন বটে, কিন্তু ওঁদের অবস্থা বেশ গুরুতর। মামন্তভের বাহিনীর লালফৌজের ব্যূহ ভেদ করেছে শুনে উনি সর্বোচ্চ সমর পরিষদের সভাপতির আদেশ অমান্য করেন; তাতে মাথা যাওয়ার ঝুঁকি আছে, কিন্তু বুদিওনি তার পরোয়া করেননি। অভিযানের যে পরিকল্পনা সম্বন্ধে এত অখ্যাতি রটেছে, বিশ্বাসের অযোগ্য হোক বা না হোক যে-পরিকল্পনা একেবারে শূন্যগর্ভ বলে এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সেই পরিকল্পনাই বুদিওনিকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করতে হবে—নিজ হাতে এই আদেশ দিয়েছিলেন সভাপতি মশাই। কিন্তু বুদিওনি সে আদেশ পালন করেননি, তার বদলে নিজের উদ্যোগেই ধাওয়া করেছেন মামন্তভের পেছনে। উনি আর ওঁর ডিভিশনাল কমান্ডাররা ভাল করেই বুঝছিলেন যে, কমান্ডার-ইন-চীফের অফিসে এখন ওঁদের বিরুদ্ধে মহাআক্রোশে কলম ছুটছে—প্রচণ্ড শাসানি, এমন কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইনের ওপারে। কিন্তু নিজেদের মাথা বাঁচানোর চাইতে মস্কো বাঁচানোর জন্যেই ওঁদের আগ্রহ বেশি। অবিলম্বে মামন্তভের পেছনে ধাওয়া করে হোয়াইটদের সেরা ঘোড়সওয়ার দলটাকে ধ্বংস করে দিতে পারলে তবেই মস্কো বাঁচবে—ওঁরা এই বোঝেন। বুদিওনির সাত হাজার তলোয়ারের সামনে ওরা যে দাঁড়াতে পারবে না, দন আর ৎস্না নদীর মাঝামাঝি

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কচুকাটা হয়ে পড়ে থাকবে, সে বিষয়ে ও'দের কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু মামন্তভ এখন দস্যুদলের কায়দা ধরেছেন, কোনো গ্রামে বা খামার-বাড়ীতে পৌঁছালে নিজেদেব যুদ্ধশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াগুলি রেখে দিয়ে সেখানকার তাজা ঘোড়াগুলি দখল করে নেন—তাই মামন্তভের নাগাল ধরা বেশ শক্ত।

সাফল্যের পর সাফল্যে মামন্তভের দন কসাকদের মাথা ঘুরে গেছে। ওরা প্রচণ্ড যোদ্ধা, বুদিওনির ঘোড়সওয়ারদের চেয়ে ওদের সংখ্যাও বেশী। তবু কিন্তু মামন্তভ যুদ্ধ এড়িয়ে চলেন, পশ্চাদপসরণকারী অভিজ্ঞ শত্রুদল সম্বন্ধে তাঁর বেশ ভয় আছে। বুদিওনির ওরা মামুলি গেরিলা ঘোড়সওয়ার নয়। খোলা ময়দানে যে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক—ওরা তাই, ওরা সুশিক্ষিত রাশিয়ান অশ্বারোহী বাহিনী। বুদিওনি মামন্তভের চেয়ে একটু আস্তে চলেন বটে; কিন্তু অনেক বেশী ভেবেচিন্তে এগোন—কখনো কম দূরের পথ কিংবা সুবিধার রাস্তা খুঁজে বার করে নেন, কখনো বা মামন্তভকে এমন ধারা এলাকার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যান যেখানে নতুন ঘোড়া কিংবা ঘোড়ার খাবার পাওয়া খুব শক্ত।

ধাওয়া চল্ল দিনের পর দিন—দুই শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে এ এক সাংঘাতিক খেলা। মামন্তভের পথের পেছনে পড়ে থাকে ধোঁয়া আর আগুন, শারদ কুয়াশার ভেতর দিয়ে অগ্নিকাণ্ডের আভা ফুটে ওঠে। ওরা হঠাৎ হঠাৎ এসে লালফৌজের পেছনের ইউনিটের ওপর চড়াও হয়, তারপর তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু শেষকালে একদিন ওদের চোখে ধুলো দিয়ে নাগাল ধরে ফেল্লেন বুদিওনি। অতি নগণ্য একটা গ্রামের মধ্যে মামন্তভের সৈন্যরা রাত্রি যাপন করছিল। খুব ভোরবেলা—সব্জি ক্ষেতের বেড়ায় শুকনো উইলো ডালগুলো তখন কয়লা-আঁকা ছবির মতো সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে—এমন সময় স্কোয়াড্রন সমেত বুদিওনি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন গ্রামের ভেতর।

গ্রামের অন্য প্রান্তে একটা ফটকের ভেতর দিয়ে একখানা তিন ঘোড়ার গাড়ী—ঘোড়াগুলো বাদামী রংয়ের—ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে এল। গাড়ী ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে। খোলা গাড়ীটার মধ্যে বসে আছেন মামন্তভ—মাথায় টুপি নেই, কোটেও বোতাম লাগানো হয়নি। কালো কসাক কোট-পরা এক গোঁফ-ওলা ঘোড়সওয়ারকে দেখে মামন্তভ সীটের ওপর ঘুরে বসলেন, ঘোড়সওয়ারের উঠন্ত-পড়ন্ত মাথাটা লক্ষ্য ক'রে কয়েকবার গুলি চালালেন। বুদিওনিকে উনি ঠিকই চিনেছিলেন, কিন্তু হাতের মধ্যে বন্দুকটা ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। লাল সিপাহীরা ও'র গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুটল—কিন্তু বাদামী রংয়ের দন ঘোড়া ক'টা একেবারে যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল গাড়ীটাকে।

খামার বাড়ীগুলোর ভেতর থেকে তখনও উন্মাদ চীৎকার আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা কানে আসে। এখানে ওখানে গুলিও চলে। প্রাণ বাঁচানোর আকুল আগ্রহ নিয়ে লড়ছে জেনারেলের দেহরক্ষী কসাকেরা।

শত্রুর খোঁজে গ্রাম চষে বেড়াতে বেড়াতে বুদিওনির সৈন্যেরা এ কোণ সে সে কোণ থেকে কতকগুলি লোককে টেনে বার করে আনল—লোকগুলি ভয়ে কাঁপছে। তাদের কারও পরনে শুধু জাঙ্গিয়া, কেউ বা এক পায়ে বুট চড়িয়েই বাইরে পালিয়েছে, ভয়ের চোটে খেয়ালও করেনি। ধ'রে আনার পর বোঝা গেল যে এরা বাজনাদার। তখন তাদের ঘিরে সবাইয়ের কী হাসি-ঠাট্টা! বুদিওনিও ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে এলেন, তারপর উত্তেজনার কারণ জানতে পেরে ওদের বল্লেন—বাজনা-টাজনা সব বার কর।

বাজনাদারেরা দেখল, বলশেভিকরা তো কোতল করে না, শুধু হাসে। ওরা তখন ছুটে গিয়ে চোখের পলকের মধ্যে সাজপোষাক সব চড়িয়ে নিল, তারপর বার ক'রে আনল ওদের কারবারের মালপত্র—ইয়া বড় বড় হেলিকন, রামশিঙ্গে, ট্রাম্‌পেট ইত্যাদি। বিউগল্‌গুলো আবার খাঁটি রুপোর তৈরী, দেখেশুনে বুদিওনির লোকেরা একেবারে অবাক। আচ্ছা মাল পাকড়ানো গেছে যা হোক!

“বেশ, তাহলে”, বল্লেন বুদিওনি, “ঘেয়ো কুকুরের এক গোছা চুল অন্তত পেয়েছি আমরা। আচ্ছা তোমরা ‘ইণ্টারন্যাশনাল’ বাজাতে পার?”

ওরা সবই বাজাতে পারে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মস্কো সঙ্গীত-শালার ছাত্র। ওরা কাজ চায়, সাদা রুটি চায়—দাঙ্গা, জেরা আর রাস্তার লড়াই থেকে বাঁচতে চায়—সেইজন্যেই গত আঠারো মাস ধ'রে এ শহর ও শহর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশেষে রস্তভে ওদের সৈন্যদলে ঢুকিয়ে দিয়েছে, জবরদস্তি। বাজনাদারদের মাস্টারমশাই—তাঁর স্পঞ্জের মতো ফুলো নাকটা যেন মদে চপচপ করছে—তিনি আবার দিব্যি দিয়ে জানালেন যে, তিনি বরাবরই একেবারে পাকা বিপ্লবী। তবে ওঁর নীলচে-বেগুনি নাকটার দিকে একবার চেয়েই সবাই বুঝল যে লোকটি নিরীহ, কোনও ক্ষতি করবে না।

এবারও লড়াই ফাঁকি দিলেন মামন্তভ। ঝট্ ক'রে এক পাঁয়তারা কষে ওঁর সৈন্যদল হাতের বাইরে চলে গেল। বুদিওনির দলও চল্ল পিছু পিছু। মামন্তভের উদ্দেশ্য তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বোঝা যাচ্ছে যে, রেডদের লাইন ভেদ ক'রে তিনি নিজের দলের সঙ্গে মিলতে চান। এটাই বুদিওনির কাছে সবচেয়ে ভয়ের কথা, কারণ এতে গোটা অভিযানটাই একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাছাড়া কমাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে জবাবদিহি তো করতেই হবে, হয়তো সমর পরিষদের সভাপতির সামনেও হাজির হতে হবে। তাহলে আরও বিপদ।

বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি, এতদিন ধ'রে বাইরে কি ঘটছে কিছুই জানা নেই—সেও খুব দুর্ভাগ্যের কথা।......যাই হোক শেষকালে ওঁরা রেল লাইনে পৌঁছালেন, কমিসার আর চীফ-অফ-স্টাফ সহ স্টেশনে গিয়ে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের পাশে বসলেন বুদিওনি। তারের খবর শুনে উনি তো অবাক, তাড়াতাড়ি ডিভিশনাল কমাণ্ডার, রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার সবাইকে ডেকে পাঠালেন।

সবাই এসে জমা হলেন রিফ্রেশমেণ্ট রুমে। রুমটার ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানলা দিয়ে বাইরে স্কোয়াড্রনটাকে দেখা যাচ্ছে—সুগঠিত পদ্ধতিতে

মার্চ করতে করতে সৈন্যেরা রেল লাইন পার হচ্ছে। তাদের পেছনে সূর্যাস্তের বিষণ্ণ বিস্তার নিচু নিচু মেঘের চাপে একেবারে মাটির কিনারায় এসে ঠেকেছে। বর্শাফলকের মাথায় নিজ নিজ রেজিমেণ্টের প্রতীক-চিহ্ন উঁচুতে তুলে ধরে সারি সারি ঘোড়সওয়ার দল ঢালু বেয়ে ওপরে ওঠে, দেখলে মনে হয় যেন ইস্পাতের মূর্তি—অতিকায় ঘোড়ার ওপর অতিকায় মানুষ। জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের প্রতিফলিত আলোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল রশ্চিন: ওর মুখের ভাব দেখে তেলেগিন চমকে উঠল—কী মহিমোদ্ধত অভিব্যক্তি, যেন ক্রোধের আতিশয্যে একেবারে জমাট বেঁধে গেছে।

"মা যে এমন ধারা তা আমাদের জানা উচিত ছিল," নীচু গলায় আধা-স্বগত সুরে বলছিল রশ্চি। ওর কথা শুনবার জন্যে তেলেগিন আরও কাছে এল।

"আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ... এ বিশ্বাসঘাতকতার কি শাস্তি আছে? মাটি তোমায় মাফ করেছে, তার পায়ে এবার লুটিয়ে পড়ো......"

ঘাসের গাদার পাশে সেই ঝগড়ার পর রশ্চিন এই প্রথম মন খুলে কথা বলল। ও যে মনে মনে যন্ত্রণা ভোগ করছে সে কথা বোঝে তেলেগিন। অহঙ্কার ওর নীরবতার প্রধান কারণ নয়, অনুশোচনা প্রকাশ করতে পারবে না ভেবে হতাশা থেকেই রশ্চিন চুপ করে আছেঃ "ইভান আমি দুঃখিত", শুধু এটুকু বলেই তো ও সেরে দিতে পারে না। আর এখন, মনের মধ্যে এই দীর্ঘকাল ধ'রে এত টানাটানি, এত অবসাদের পর আজ ওর বহু-বিস্মৃত হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমিকে নতুন ক'রে খুঁজে পেয়েছে, তারই অনুভূতিতে মুহূর্তের জন্যে ও একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনাও জানিয়েছে এমনি করেই......।

তেলেগিনেরও ইচ্ছে হল, দরদের সঙ্গে রশ্চিনকে কিছু বলবে: আহাম্মকের মতো দুজনে যে ঝগড়া করেছিল, ঝেঁটিয়ে সেটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে, যেন ঝগড়া কোনও দিন হয়ইনি। কিন্তু গলা ঝাড়ার চেয়ে বেশী দূর ও আর এগুতে পারল না। . ..ঠিক তখনি টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বাইরে এলেন বুদিওনি, দেখতে দেখতে সবাই তাঁকে ঘিরে ফেল্ল। তাদের সম্বোধন করে বুদিওনি বল্লেনঃ

"দারুণ খবর কমরেডস্! প্রথমে খারাপটুকু দিয়েই শুরু করি। কুতেপভ ওরেল দখল করেছে, তার স্কাউটরা এখন প্রায় তুলার কাছাকাছি। এই চালের ফলে আমাদের লাইনের বেশ অনেকখানি জায়গায় ওরা গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। চাপের চোটে আট আর দশ নম্বর আর্মি পূব দিকে পিছু হটে এসেছে। নয় আর তেরো নম্বর হটেছে পশ্চিম দিকে।.. ...কিন্তু এ সব গত সপ্তাহের খবর।" বলে চোখ মিট মিট করতে করতে বুদিওনি একটু থামলেন। "শুনুন, কমরেডস্, ওর পর অবস্থা যা বদলেছে, একেবারে দারুণ। প্রথমত, আপনারা শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে, হাই কমাণ্ডের খোল নলচে সবই বদলে গেছে। সর্বোচ্চ সমর পরিষদের সভাপতিকে আর দক্ষিণ রণাঙ্গনের মোড়লি

করতে হবে না।......আমাদের পক্ষের সৈন্যেরা ওরেল পুনর্দখল করেছে।..... ওরেল আর ক্রমি-র মাঝামাঝি এলাকায় কর্নিলভ, মার্কভ আর দ্রজদভ্স্কির বাহাদুর সিপাহীদের মেরে তুলো ধুনে ছেড়ে দিয়েছে।......যার জন্যে আমরা এতদিন অপেক্ষা ক'রে ছিলাম, এবার তারই আরম্ভ।......একটা বিশেষ আক্রামক বাহিনী বেশ সাফল্যের সঙ্গেই কুতেপভের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায়নি......"

টেলিগ্রামের ফিতেটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বুদিওনি আবার থামলেন। ও'র গোঁফজোড়া নাচছে। চারপাশে জমায়েত কমান্ডারদের মুখের ওপর ঈগল দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন একবার।

"আমাদের কোর নিয়ে আমরা যে অভিযান চালিয়ে এসেছি তা কমান্ডার-ইন-চীফের আদেশ অনুসারে নয়, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে।......আমাদের যেতে বলা হয়েছিল দক্ষিণে, সাল্স্ক স্তেপ অঞ্চলে মানিচ নদীর ধারে—যেখানে গিয়ে ১০ম আর্মি প্রায় সাবাড় হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা গিয়েছি উত্তর দিকে। দনের বাম তীরে পৌঁছাবার বদলে আমরা পৌঁছেছি দক্ষিণ তীরে। দন আর্মির অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে থেকে আমরা পিছু হটিনি, তার লেজ চেপে ধরেছি। এ সব তো ঠিক নয়, এ রকম করলে কখনো চলবে না। আমাদের সহজ বুদ্ধির কথা ছেড়ে দিন—আমরা কসাক, আমরা চাষা, আমাদের আবার মাথা—বুদ্ধি বিবেচনা খাটাবার অধিকারই নেই আমাদের; কমান্ডার-ইন-চীফের সেনানীমন্ডলীতে কত শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত মাথা রয়েছে—ওসব কাজ তাঁদের।... যাই হোক, আমরা তো চল্লাম, পেছনে পেছনে আসতে লাগল কমান্ডার-ইন-চীফের হুকুমপত্তর। সেসব আমি খুলিনি, কখনো পড়িওনিঃ ওসব পড়লে হাত থেকে তলোয়ারই খসে পড়ে যায়।.. ...তবু, চাই বা না চাই, হুকুমটা এবার আমাকে ধ'রে ফেলেছে।......না, ওতে লম্বা লম্বা শব্দ টব্দ নেই......।" কুন্ডলী-পাকানো টেলিগ্রামের ফিতেটা সমান ক'রে নিয়ে বুদিওনি পড়লেনঃ " 'অশ্বারোহী কোর কমান্ডার বুদিওনি সমীপেষু। আমাদের স্কাউটদের নিকট হইতে হালে যে সমস্ত খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনী ভরোনেঝ জেলা হইতে উত্তর মুখে চলিতেছে। শত্রু বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করার জন্য আমি অশ্বারোহী কোর কমান্ডার বুদিওনিকে আদেশ দিতেছি।'......ব্যস। কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ একেবারে কাজের কথা। তাহলে আমাদের মাথাই ঠিক বলেছিল তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।......অর্ডার দস্তখত করেছেনঃ স্তালিন, দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপ্লবী সমর পরিষদের সভাপতি, সদর দপ্তর সের্পুখভ।"

কাতিয়া মস্কোয় ফিরে এল। আর্বাত স্ট্রীটের বড় রাস্তার বাঁক ঘুরে 'পুরোনো আস্তাবলের গলি'তে সেই আগের পুরোনো বাড়ী—সেখানেই ফিরে এল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে পীতার্সবুর্গ থেকে এই বাড়ীতেই উঠে এসেছিলেন নিকোলাই

ইভানোভিচ স্মকভ্‌নিকভ আর দাশা—কাতিয়া নিজেও পারী থেকে এই বাড়ীতেই এসে উঠেছিল। ঘরটাও সেই আগেরই ঘর, নিকোলাই ইভানোভিচের অন্ত্যেষ্টির দিন যে ঘরে বসে কাতিয়া একেবারে আশাহীন বিষাদের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। ফার কোটের নীচে কুঁকড়ি শুকড়ি হয়ে শুয়ে শুয়ে স্থির করে ফেলেছিল যে আর বেঁচে থাকা চলে না; গা থেকে কোট সরিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফলতে ও উঠে গিয়েছিল খাবার ঘরে—আফিংটা গিলবার জন্যে এক গ্লাস জল আনবে...... তারপর সেই গোধূলির অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ দেখা দিয়েছিল ওর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়—ওর জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করে বসেছিল ভাদিম পেত্রোভিচ...

থমথমে আবেগ, প্রেম আর বেদনা-উন্মথিত জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়—সে অধ্যায়ও পূর্ণ হল। অপূরণীয় ক্ষতির সুদীর্ঘ পথ ওর পেছনে। বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে মস্কোর কিয়েভ রেল স্টেশন থেকে বাইরে পা দিতে অসাধারণ মর্মান্তিকতার সঙ্গে এই অনুভূতিটাই কাতিয়ার মনে জাগল।..... মস্কো নদীর চড়ার কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জল ছিটোছিটি করছে--ওদের তীক্ষ্ণ, করুণ স্বরে স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। নদীপারে ক্ষুধিত তৃণের ওপর বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে এক বুড়ো। সাদোভায়া স্ট্রীটে গাছের কেয়ারি করা বেড়াবার পথ, তার দুধারের রেলিংই আর নেই; বাঁক ঘুরে ঐ রাস্তায় পড়তে চারিদিকের নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় কাতিয়া বিস্মিত হয়ে গেল। পরিত্যক্ত অট্টালিকার ওপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাইম গাছের ঘন সবুজ ছায়া পড়েছে--গাছের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কী গোলমাল আর ছুটোছুটি চলত আর্বাত স্ট্রীটে, আর এখন সেখানে না আছে ট্রাম, না আছে দ্রশ্‌কি গাড়ী—পথচারী দেখা যায় ক্বচিৎ দু একজন—বিষণ্ণ মনে মাথা হেঁট করে তারা জংধরা ট্রাম লাইন পার হয়।

'পুরোনো আস্তাবল গলি'র কোণা পর্যন্ত হেঁটে এসে গলির ভিতর ঢুকল কাতিয়া। অবশেষে বাড়ীটা যখন নজরে এল তখন ওর হাঁটু দুটো আর সোজা হয়ে থাকতে চায় না। এপারের ফুটপাথেই অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেঃ স্মৃতির ছবিতে এ বাড়ীর রং ছিল সোনার মতোঃ সাদা সাদা চেপ্‌টা চেপ্‌টা থাম, পর্দা খাটানো জানালাগুলো সব ঝকঝকে—আর তারই আড়ালে বাস করত ওদের অশরীরী মূর্তি--ও আর ভাদিম আর দাশা।......একদিন যা বর্তমান ছিল তা কি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে? কোনো চিহ্নও রেখে যায় না? ঘুমন্ত মানুষের মাথার ভেতর দিয়ে যেভাবে স্বপ্ন এসে পা ফেলে যায়, নিষ্ফল আশার হাতছানি দেখিয়ে, তারপর জাগরণের প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়—জীবনও কি উড়ে যায় তেম্‌নি ক'রে? অযাচিত যত আনন্দ সে সবই নিশ্চয় বিগত দিনগুলির মধ্যে কোথাও না কোথাও গাঁথা আছে; গাঁথা আছে সেই মুহূর্তটি যে মুহূর্তে আফিংয়ের শিশিটা কার্পেটের ওপর ফেলে দিয়ে শিথিলাঙ্গ কাতিয়া ঢলে পড়েছিল ভাদিমের সুদৃঢ় বাহু দুটির মাঝখানে, আর আবেগে আড়ষ্ট ভাদিম তার কানে কানে শুনিয়েছিল ভালবাসার কত কথা।

এ তো স্বপ্ন নয়, উড়েও যায়নি—আজও রয়েছে ঐ অন্ধকার শার্সির পেছনে। ওখানেই বেঁচে রয়েছে ওদের সহবাসের নিদ্রাহীন প্রথম রাত্রি। নিঃশব্দে, শোকের মতো গভীর চুম্বনে চুম্বনে কেটেছিল সে রাত্রি। কোমলে কঠিনে মিশেছিল, রোদে-পোড়া পুরুষ আঙুলে আঙুলে জড়িয়েছিল ক্ষীণ, সুগৌর করাঙ্গুলি—আর পৃথিবীর এই অদ্বিতীয় পরম রহস্যের পানে চেয়ে বিস্ময়ের অতি-পুরাতন অথচ চির-নূতন শব্দ পুনরুচ্চারণ করতে করতেই ওদের সময় অতিবাহিত হয়েছিল।......

ছোট্ট বাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে—বাঁকাচোরা, শ্রীহীন। দেওয়ালের রং খসে খসে পড়ছে। সাদা থাম টামও কিছু নেই, ও শুধু কাতিয়ার কল্পনা। দোতলার শেষ জানলা দুটোতে ভেতর থেকে খবরের কাগজ আঁটা, আর অন্য জানলাগুলোতে চাকা চাকা কাদা লেগে শুকিয়ে আছে। ওখানে কেউ থাকে না তা বোঝাই যায়।......একতলা আর দোতলার মাঝামাঝি তলায় যেখানে দাশার শোবার ঘর ছিল, সেখানে জানলার শার্সিটার্সি সব ভেঙে গেছে।

রাস্তা পেরিয়ে কাতিয়া সদর দরজার কড়া নাড়ল। দরজার বাদামি রং ফালি ফালি হয়ে খসে পড়ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ওর খেয়াল হ'ল যে, দরজার হাতল নেই, শুধু গর্তটা রয়েছে, ধুলোয় একেবারে ভর্তি। মনে পড়ল, খিড়কি দরজায় পৌঁছতে হলে পাশে আর একটা রাস্তায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে দেখে গেটটা খোলা, উঠোনে ঘাস গজিয়েছে, দরজা থেকে উঠোনের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথের ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। যাক, এখানে তাহলে মানুষ আছে!

রান্নাঘরের দরজায় ঘা দিল কাতিয়া। মিনিট দুই পরে একজন লোক এসে দরজা খুল্ল—লোকটি বেঁটে খাটো, গায়ের রং চাদরের মতো সাদা, প্রকাণ্ড উস্কো খুস্কো মাথায় গৌরবর্ণ চুল, চোখে চশমা।

"আপনাকে তো চেঁচিয়ে বল্লাম, দরজা খোলা আছে। কি চান?"

"মাফ করবেন। আচ্ছা, মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না—বৃদ্ধা মহিলা তিনি—তিনি এখানে থাকেন কি?"

"থাকেন", গম্ভীর স্বরে লোকটি জবাব দিল, মনে হ'ল যেন গণিতের কোনো সমস্যাই বুঝি সমাধান করছে। "কিন্তু তিনি মারা গেছেন......"

"মারা গেছেন? কতদিন হ'ল?"

"বেশী দিন নয়। ঠিক তারিখটা মনে নেই......"

"আমি তাহলে কি করি এখন?" ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলে উঠল কাতিয়া। "আমার ফ্ল্যাটে কি লোক আছে?"

"এটা আপনার ফ্ল্যাট কিনা জানিনে, তবে লোক আছে নিশ্চয়ই।"

লোকটি দরজা বন্ধ করতে যাবে, কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীলোকের চোখে জল দেখে একটু দ্বিধায় পড়ল।

"কী বিপদ! সোজা স্টেশন থেকে আসছি আমি, এখন যাই কোথায়?

দু বছর মস্কোর বাইরে ছিলাম, তারপর এখন ঘরে ফিরলাম, তারপর...... তারপর......"

"ঘরে ফিরলেন? মস্কোয়?" লোকটি অবাক হয়ে শুধাল।

"হ্যাঁ। অনেক দিন দক্ষিণে ছিলাম, তারপর উক্রাইনে......"

"আপনার কি মাথা খারাপ? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।"

"কেন? ঘরে ফেরা কি এতই আশ্চর্য?"

লোকটির বিবর্ণ, অবসন্ন মুখের ওপর ঠোঁটের কোণাটা কেঁপে উঠল, ফাঁপা গালটা কুঁচকে গেল।

"মস্কোয় লোকে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তাও জানেন না?"

"শুনেছিলাম বটে যে এখানে খাবার জো নেই মুশকিল......তা আমার বেশী লাগে না......আর এ সব তো সাময়িক ব্যাপার।......মুশকিলের দিনে ঘরে থাকাই তো ভাল।"

"আপনার পরিচয় জানতে পারি?"

"আমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, আমার নাম একাতেরিনা রশ্চিনা...দাঁড়ান, আপনাকে দেখাই......"

দাঁত দিয়ে ক্যাম্বিশ ব্যাগের গিঁট খুলে 'সরকারী শিক্ষা কমিসারিয়েটের' সার্টিফিকেটখানা ও বার করল।

"আমি কিয়েভে ছোট ছেলেদের রাশিয়ান স্কুলে কাজ করেছি—একেবারে সেই লোকাপসরণের সময় পর্যন্ত।... ওখানকার 'পীপল্‌স কমিসার'-এর হুকুম ছিল—হোয়াইটদের রাজত্বে যেন না থাকি।.....আমিও থাকতামই না।...... পীপল্‌স কমিসার লুনাচার্স্কি-কে দেখাবার জন্যে তিনি এই চিঠি দিয়ে দিয়েছেন।......কিন্তু চিঠিটা সীল করা।......"

সার্টিফিকেটের ওপর, তারপর খামে লেখা ঠিকানার ওপর চোখ বুলাল লোকটি—ওর সমস্ত ভঙ্গিই যেন অতি ধীর, অতি-শিথিল।

"বাস্তবিকপক্ষে, বৃদ্ধা মহিলার ঘরটি খালিই আছে। আপনি যদি কিছুতেই আর কোথাও না যান, এখানে থাকবেন বলেই জিদ করেন, তাহলে ঐ ঘরে উঠুন। ......কিন্তু সব তাতেই এখানে পচ ধরেছে, একেবারে খসে খসে পড়ছে।...... মস্কোতে যে-কোনো খালি বাড়ী আপনি ইচ্ছে হলেই দখল করতে পারেন......।"

এক পাশে সরে গিয়ে ও কাতিয়াকে রান্নাঘরে ঢোকার পথ করে দিল। ঘরটা আধা-অন্ধকার, ভাঙাচোরা আসবাবপত্রে ভর্তি। ধোঁয়ার কালো গলিপথ, সেখানে পেরেক থেকে বৃদ্ধা মহিলার ঘরের চাবিটা ঝুলছিল। সেটা দেখিয়ে দিয়ে লোকটি ধীরে ধীরে চলে গেল নিজের ঘরে (ওটাই আগে নিকোলাই ইভানোভিচের পড়ার ঘর ছিল)। কন্টেসুন্টে বন্ধ ঘরের তালা খুলল কাতিয়া—কাদামাখা জানলা যে ঘরে সেই ঘরটা। এটাই ছিল কাতিয়ার শোবার ঘর। খাটটা এখনো আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই খোদাই করা ছোট্ট ওষুধের আলমারিটা, তার দরজায় পৌরাণিক কুহকিনীর ঝাপসা মূর্তি—সেই যে

যেখান থেকে ও সেদিন আফিংটা বার করেছিল—সেটাও এখনো দেয়ালে ঝুলছে। স্বর্গতা মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না সব ঘর থেকে ভাল ভাল জিনিষগুলি এনে এই ঘরে জড়ো করেছিলেন। সোফা, আরাম কেদারা, হোয়াটনট ইত্যাদি আসবাবপত্র গায়ে গায়ে লাগালাগি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সেগুলির অবস্থা একবারে জীর্ণ, ধুলো আর মাকড়সার জালের নীচে প্রায় চাপাই পড়ে গেছে।

হতাশা এসে ঘিরে ধরল কাতিয়াকে। জুলাইয়ের তাপদগ্ধ এই প্রকান্ড মস্কো, দুর্ভিক্ষদীর্ণ, মনুষ্য-পরিত্যক্ত—এখানে এই বন্ধ ঘরের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ভিড়ের মাঝখানে ওকে আবার জীবন আরম্ভ করতে হবে—ওর জীবনের তৃতীয় অধ্যায়! খালি গদিটার ওপর বসে ও নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। খুব অবসন্ন লাগছে, তার ওপর খিদেও পেয়েছে। সামনে কত সমস্যা, কত জটিলতা—মনে হ'ল ওর ক্ষুদ্র শক্তিতে কিছুতেই কুলোবে না। ভ্‌লাদিসির্স্‌-কোয়েতে স্কুলের পাশে ওর সাধের কুটিরখানি—ছোট্ট, বাঁকাচোরা—সে কুটিরের কথা ওর মনে পড়ল; মনে পড়ল সব্জি ক্ষেতটুকু, ওয়াট্‌লের বেড়ার ওধারে সেই পাহাড়ী মাঠটা .....দরজার পাশে পাতার ঝাড়ু, গলি-পথের মুখে জলের কলসী, পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ আলোর স্রোত ঘরের মধ্যে ছেলেদের খাতার ওপর এসে পড়েছে......আর সেই ভাবনাচিন্তাহীন হাসিখুশী ছেলের দল, ওর প্রিয়পাত্র ইভান গাভ্‌রিকভ......সব মনে পড়ল.....

চিরকাল, চিরকাল কেন থাকতে পারল না সেখানে?

কিয়েভ থেকে শুকনো পাঁউরুটি নিয়ে এসেছিল। রুটিটা ভেজানোর জন্যে জল চাই, তাই বিছানা থেকে উঠল কাতিয়া। কিন্তু নতুন জীবন আরম্ভ করার জন্যে একটা গেলাসও নেই! এবার কাতিয়া চটে উঠেছে—চোখ টোখ মুছে চল্ল সেই ফ্যাকাশে-মুখ লোকটির খোঁজে।

আস্তে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সরু গলা চড়িয়ে ডাকল:

"আপনাকে বারে বারে বিরক্ত করছি, কিছু মনে করবেন না......"

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে লোকটি দরজা খুল্ল, তারপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাতিয়ার দিকে—মনে হয় যেন বেশ কষ্ট ক'রেই ওর চিন্তাশক্তিগুলোকে জড়ো করছে।

"দেখুন, আমাকে একটা গেলাস দিতে পারেন? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

"আমার নাম মাস্‌লভ, কমরেড মাস্‌লভ", সে বল্ল। "আপনার কি রকম গেলাস দরকার?"

"যা থাকে দিলেই হবে।"

"আচ্ছা দিচ্ছি।"

দরজা খুলে রেখে সে ভেতরে গেল। কাতিয়া দেখতে পেল: ঘরের মধ্যে নুয়ে-পড়া শেল্‌ফ, তার ওপর অনেক বই, তারপর একটা হতচ্ছিরি লোহার খাট, তার ওপরও এখানে ওখানে বই পড়ে আছে, মেঝেয় একগাদা জঞ্জাল, জানলায়

খবরের কাগজ আঁটা—সেগুলো হলদে হয়ে এসেছে। প্রথমবারের মতোই আস্তে আস্তে ফিরে এল মাসলভ, একটা নোংরা গ্লাস দিল কাতিয়ার হাতে :

"এ আপনি রেখে দিতে পারেন......"

রান্নাঘরে জলের সিংক্-এর নাগাল পাওয়া বেশ শক্ত—আগড়বাগড় সব তার ওপর গাদা করা। যাই হোক, কলে জল আছে। গ্লাস ধুয়ে প্রাণ ভরে জল খেল কাতিয়া, খেয়ে ঘরে ফিরে এল। ভাবল রুটি খাওয়ার আগে জানলাটা খুলবে, গাও ধুয়ে নেবে। কিন্তু জানলার ফ্রেম একেবারে সীল করা, খোলা বড় সহজ কথা নয়। কাতিয়া তবু নাছোড়বান্দা—লম্বা শ্বাস ফেলে ফেলে জোড়ের 'পটি' খোঁচাচ্ছে, একটা চেয়ারের পায়া নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘা লাগাচ্ছে হুড়কোগুলোর ওপর। আওয়াজ শুনে মাসলভ এসে হাজির—নির্বাক বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই কাতিয়ার দিকে চেয়ে রইল।

"জানলা খুলছেন কেন?"

"নইলে এখানে যে দম আটকে আসে।"

"তা বাইরের হাওয়াটা কি বেশী বিশুদ্ধ মনে করেছেন? বাইরে শুধু ধুলো আর দুর্গন্ধ। প্রত্যেক বাড়ীর উঠোনেই তো জঞ্জালপত্র সব পচছে।...... আমার মনে হয় জানলা না খোলাই ভাল।"

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে গেল কাতিয়া। তারপর নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধ'রে চেয়ারের পায়া নিয়ে ফের বাড়ি কষাতে লাগল।

"মনে করুন জানলাটা না হয় খুল্লেনই", বলে চল্ল মাসলভ, "কিন্তু আবার সন্ধ্যে বেলা বন্ধ করতে হবে তো। এত গায়ের জোর নষ্ট ক'রে লাভ কি?"

হুড়কোগুলো নড়ল শেষ পর্যন্ত। জানলার চৌকাঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে ঝনাৎ ক'রে জানলাটা খুলে দিল কাতিয়া, তারপর বাইরে মাথা বার ক'রে দিয়ে গো-গ্রাসে হাওয়া টানতে লাগল।

"সত্যি," চিন্তান্বিত সুরে মাসলভ বল্ল, "শহরের সমস্যা আমরা এখনো সমাধান করতে পারিনি।"

ওর হাঁটু দুটো হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে যেন অবশ হয়ে এল। বসবার মতো একটা জায়গা না পেয়ে দরজার কাঠামোয় ভর দিয়েই দাঁড়াল। গায়ে নোংরা ক্যাম্বিশের শার্টটা একটা দড়ি দিয়ে আলগা ক'রে বাঁধা, বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে।

"এখন বরফ গলে গেছে। যত সব নোংরা রাবিশ আর মরা বেড়াল-কুকুর সব পড়ে আছে রাস্তায় রাস্তায়, উঠোনে উঠোনে—মরা ঘোড়াগুলো পর্যন্ত। ......বৃষ্টিতে কিছু কিছু ধুয়ে গেছে অবিশ্যি, কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না......"

বাধা দিয়ে কাতিয়া বল্ল :

"বাথরুমটা ঠিক আছে?"

"সে সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা নেই। আগে একজন জলকল মিস্ত্রী

থাকত; রোব্‌বার রোব্‌বার রান্নাঘর আর বাথরুমে লোকটা খুটখাট ক'রে বেড়াত—উদ্যোগটা সম্পূর্ণরূপে ওর নিজেরই অবিশ্যি। কিন্তু তারপর সে তো যুদ্ধে চলে গেল......"

"আচ্ছা, এখন আপনি যান!" দৃঢ় সুরে কাতিয়া বল্ল। "দেখি ঘরটাকে একটু ভদ্রস্থ করতে পারি কি না। ঘর সাফ করে গা ধোব, তারপর আপনার কাছে যাব। কতকগুলো ঠিকানা রয়েছে, প্রথমে সেগুলো আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।......মস্কোর আমি কিছুই জানিনে। আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে, করবেন তো?"

"করব বৈকি। আজ রোব্‌বার, সারা দিনই বাসায় আছি।"

ধীরে ধীরে দরজার হাতলটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাসলভ। কাতিয়া তখন দরজায় ছিটকিনি লাগাল। মেজাজটা একটু গরম করে নিতে পারলেই হল—তারপর কাজ যা জোর কদমে চলে, মনে হয় বাড়ীতে যেন আগুন লেগেছে। ব্লাউস আর স্কার্ট যাতে ময়লা না হয় সেজন্যে ও দুটো কাতিয়া খুলে রাখল, রেখে দিয়ে নামল ধুলো-বিরোধী অভিযানে। বাক্সটাক্স সব কাপড়চোপড় আর নেকড়া-কানিতে ভর্তি, কোনো অভাব নেই। হাতড়াতে হাতড়াতে কাতিয়া তার নিজের মার্কা দেওয়া বিছানার চাদরও পেয়ে গেল ওর মধ্যে, তারপর নিজের সেমিজ, নিকার, মায় ক' জোড়া রিফু-করা মোজা পর্যন্ত। মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্‌না একটি রত্ন—কী ভাল ভাল জিনিসই না সব বাঁচিয়ে রেখেছে! বুড়ী বড্ড লোভী ছিল তা সত্যি, একটু হাত-টান দোষও ছিল......তা হোক......মরে যেন শান্তি পায় বুড়ী......

সেদিনই সন্ধ্যে বেলা মাসলভ তার পাণ্ডুলিপিটিপি কাতিয়াকে দেখিয়ে ফেল্ল; পড়েও শোনাল কিছু কিছু—ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজ্‌মের ক্লাসিক গ্রন্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা সেগুলো। খাটের ওপর বিছানা ওল্টানো, খাটের কিনারায় বসেছে কাতিয়া। মাসলভ তাকে বল্ল ঃ

"এমনধারা সময়ে ইউটোপিস্টদের নিয়ে গবেষণা—আপনার বোধ হয় আশ্চর্য লাগছে। সর্বহারা একাধিপত্যের আমলে কাল্পনিক ইউটোপিয়া! এর ভেতর যুক্তিটা কোথায়? নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন আপনি। বলুন, হননি?"

ঘুমের ভারে কাতিয়ার তখন চোখ খুলে রাখাই দায়—ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল যে হ্যাঁ, আশ্চর্য হয়েছে।

"কিন্তু তবু দেখুন এর মধ্যে যুক্তি তো রয়েইছে।......উনিশ শতাব্দীর মাঝের দিকে কোনো কোনো ব্যক্তি ও গ্রুপ ইউটোপিয়ান তত্ত্ব কাজে প্রয়োগ করার জন্যে যে সব চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন, আমি তার অনুসন্ধান করছি সবিস্তারে। সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ অধ্যায় খুবই কৌতূহলজনক।"

আপনাআপনিই মুখে একটু হাসি এসেছিল, ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতগুলো বার হয়ে পড়েছিল। কাতিয়া যাতে না দেখতে পায় সেজন্যে ও পাশ ফিরে দাঁড়াল।

“কিন্তু রবিবার ছাড়া তো লিখতে পারিনে। আমার কাজ জেলা কমিটিতে, লোক বড় অল্প ঃ মস্কোতে এখন পার্টি-সভ্য একেবারে নেই বল্লেই চলে।...... নেহাত আমার শরীর কাহিল, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার দল থেকে বাদ দিয়েছে। ......শারীরিক, মানসিক দু দিক দিয়েই আমার দম একেবারে ফুরিয়ে গেছে।...”

সত্যিই, হাড় চামড়া ছাড়া লোকটার আর কিছু নেই; কিন্তু এত কাহিল অবস্থা সত্ত্বেও দেখা গেল যে, মাসলভ বেশ কাজের লোক। পরদিন ‘সরকারী শিক্ষা কমিসারিয়েটে’ কাতিয়াকে ও সঙ্গে করে নিয়ে গেল, উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, রেজিস্ট্রিতে নাম লিখিয়ে রেশন কার্ড পাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিল।

কমিসারিয়েটের প্রকাণ্ড অফিস, কত অসংখ্য বিভাগ আর দপ্তর আর অধ্যক্ষ; তার ওপর কর্মচারীরা সব মহা-চঞ্চল, রুটিনের একেবারে ঘোর বিরোধী; হপ্তায় অন্তত একবার ক'রে তারা নিজ নিজ দপ্তরের টেবিল, আলমারি ফাইলপত্র সব ঘাড়ে নিয়ে পাগলের মতো জায়গা বদলে বেড়ায়—এখান থেকে ওখানে, এ তালা থেকে ও তালায়—আর তার ফলে সংগঠনের গোটা ব্যবস্থাটাই বদলে যায় হপ্তায় হপ্তায়—উর্ধ্ব-অধঃ সম্পর্ক, যোগাযোগ, দায়িত্ব—কিছুই আর ঠিক থাকে না। এ অবস্থায় মাসলভ যদি সঙ্গে না থাকত তাহলে কাতিয়া একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ত।

কাতিয়া তক্ষুনি কাজ পেয়ে গেল, প্রেস্‌নিয়া পাড়ায় একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ। তারপর ওকে পাঠানো হল আর এক দপ্তরে—সেখানে সামাজিক সেবায় নাম লেখাতে হবে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সান্ধ্য ক্লাসে গিয়ে কাজ করতে হবে। ওটা শেষ হলে ফের আর এক দপ্তর; জলপাই-বরণ, ভয়ঙ্কর রোগা এক ব্যক্তি, প্রকাণ্ড চোখ দুটো যেন জ্বরে চকচক করছে—তিনি ওকে বগলদাবা করলেন—অসংখ্য গলি আর সিঁড়ি পার ক'রে নিয়ে চল্লেন ‘চারুকলা প্রচার বিভাগ’-এর দপ্তরে। সেখানে ওকে দায়িত্ব দেওয়া হল-কারখানায় কারখানায় বক্তৃতা করতে হবে।

“বক্তৃতায় কি বলতে হবে তা পরে ঠিক করা যাবে,” জলপাই-বরণ ব্যক্তিটি বললেন। “প্রয়োজনীয় সাহিত্য আর পাঠ্যসূচী—দুইই পাবেন আপনি। ঘাবড়াবার কিছু নেই—আপনি তো সংস্কৃতিবতী মহিলা, ব্যস তাই যথেষ্ট। যথেষ্ট সংস্কৃতিশীল লোক পাইনে এই তো আমাদের দুঃখ, বুদ্ধিজীবীদের অর্ধেকেরও বেশী অংশ ইচ্ছে ক'রেই শুধু কাজ বিগড়ে দিচ্ছে, ‘সাবোতাজ’ করছে। এর জন্যে ওদের ভয়ঙ্কর পস্তাতে হবে। আর বুদ্ধিজীবীদের বাকী অংশ, তারা সব যুদ্ধের কাজে হজম হয়ে গেছে। আপনি যে আমাদের কাছে এলেন তাতে সবাইয়েরই খুব ভাল ধারণা হ'ল... ..।”

শেষ কিস্তিতে আর একজন মোটাসোটা লোক এসে কাতিয়ার গায়ের ওপরই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। শশব্যস্ত ভাব লোকটির, প্রকাণ্ড হাঁ, কুঁচি

দেওয়া কোরা কাপড়ের জ্যাকেট গায়ে, বগলের তলায় জ্যাকেটটা প্রায় সবুজ হয়ে এসেছে।

“আপনি কি অভিনেত্রী?” ব্যস্তসমস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। “এইমাত্র আপনার কথা শুনলাম।” কাতিয়া বলছে যে সে শিক্ষয়িত্রী, কিন্তু কে কার কথা শোনে—ওর কাঁধের ওপর হাত ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ওকে নিয়ে চল্লেন গলিপথ ধ'রে। “ভ্রাম্যমান গাইয়ে-বাজিয়ে দলে ঢুকিয়ে দেব আপনাকে, একেবারে আলাদা রেল-কামরায় চড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবে। মস্কো একবার পার হন, ব্যস রুটি পাবেন যত চান, তার ওপর চিনি, সেরা কোয়ালিটির মাখন......। অভিনয়-তালিকা? হুঃ, ছাড়ান দিন; আপনার যা সুন্দর চেহারা—একটু নাচলে গাইলেই, ব্যস পাগলের মতো হাততালি দেবে লাল ফৌজের সেপাইরা। ......আরে, প্রফেসর চৌবিতুর্কিন্‌-কেও তো আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলাম—ভদ্রলোকের ষাট বছর বয়স—কেমিস্ট না এস্ট্রনমার না ঐ রকম কি যেন হবেন। সবাই এখন তাঁকে বলে ‘যাত্রা পার্টির রাজা’—তা জানেন? বেরাঞ্জের-এর ছড়া শুনিয়ে কী গানই গান তিনি।......না না আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না, আমি একেবারে নিঃস্বার্থ উৎসাহবাদী।......”

টেনে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাতিয়া চেঁচিয়ে উঠলঃ “শুনুন! আমার স্কুল আছে, তারপর লেকচার আছে, বর্ণপরিচয় শেখানোর সমিতি আছে......আমার শরীরে কিছুতেই কুলোবে না. . .”

“শরীরে কুলোবে না বলার কোনো অর্থ হয়? শরীরে যা কুলোয় আমি কি শুধু তাই করি? চালিয়াপিনও বলেছিলেন শরীরে কুলোবে না—কিন্তু যেই এক বাক্স ব্রাণ্ডির বোতল জোগাড় ক'রে দিলাম, ব্যস, উনি নিজেই বল্লেন ওঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হোক।... . আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি একটু ভেবে দেখুন। আমি আপনাকে খুঁজে বার করে নেব।......”

কাতিয়া ঘরে ফিরল—দায়িত্বের বোঝায় একেবারে নুয়ে পড়েছে। ধূলিধূসর গলিঘুঁজি থেকে গরম বাতাস বইছে, খোয়া বাঁধানো রাস্তার ওপর ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে। ঘুরে ৎভেরস্‌কয় বুলভারের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ভাবতে লাগলঃ যদি ছ' ঘণ্টা ক'রে ঘুমোয় তাহলে সময়ে কুলোবে? আঠার ঘণ্টা......নাঃ হবে না! পড়া নেওয়া, ছেলেদের খাতা দেখা, পরদিনের পড়া তৈরী করা......বর্ণপরিচয় সমিতি—সব দু ঘণ্টা ক'রে।......তারপর, ও পোড়াকপাল, আসা-যাওয়ার সময়-গুলো ধরতে হবে না? ফের আবার লেকচার—সেখানে যাওয়া-আসা ধ'রে। তাছাড়া লেকচারও তো তৈরী করতে হবে......নাঃ আঠার ঘণ্টায় কুলোবে না!

বুলভারের বেঞ্চিতে বসে পড়ল কাতিয়া। ১৯১৬ সালে এখানেই ওদের বেসোনভের সঙ্গে দেখা হয়েছিলঃ ও আর দাশা বসেছিল বেঞ্চে, হয়তো এই বেঞ্চিটাতেই, ধুলোমাখা পা টেনে হাঁটতে হাঁটতে এল বেসোনভ।......অবাক কাণ্ড! একেবারে অপদার্থ দুটো মেয়ে, নিজেদের নিয়ে কি করবে তাও জানে না—কিন্তু পথ চলতে চলতে যেম্‌নি বেসোনভ তাদের নমস্কার জানিয়েছে (বেসোনভ যেন

বুক্‌-এরই কোন্‌ কবিতা থেকে নেমে এসেছে) ব্যস অম্‌নি সে মেয়ে দুটির মনে কী কাতরানি—বেসোনভের পেছন থেকে চোখ আর ফেরে না—তার আধা-মিলিটারি ঢোলা পায়জামা দেখেই হৃদয় একেবারে ছিন্নভিন্ন......

না, ওকে চার ঘণ্টা ঘুমিয়েই চালিয়ে নিতে হবে, তারপর না হয় আশ মিটিয়ে ঘুমনো যাবে রবিবারের দিন। ওঃ আবার রেশনের লাইনও আছে। চোখ বুজে কাতিয়া এবার কাতর শব্দ করে উঠল।......ছিপছিপে কাঁধের ওপর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ—বাতাস এসে তাতে দোল দিয়ে যায়, কর্কশ মর্মর তোলে বুড়ো লাইমের পাতায় পাতায়।......পত্রমর্মর কাতিয়াকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিল ঃ একটা দিন আর একটা রাতের ভেতর থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় কি ক'রে বার করা যায় সে সমস্যা ভুলিয়ে দিল। চলে যাবে যাহোক ক'রে।......নিজের মধ্যে যে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে সেই কথাটাই ও এবার ভাবতে শুরু করল—পরিবর্তনটা দেখে দেখে ওর বিস্ময় আর আনন্দের আজকাল শেষ নেই। সেই যখন আলেক্সি ওর মাথাটা ঠেসে ধরেছিল উনুনের গায়ে, আর তার বিকৃত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে ও বলেছিল, "না"—সেই মুহূর্ত থেকেই কী যেন এক নতুন আনন্দের শান্ত, সুদৃঢ় প্রত্যাশা ওর মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এ আনন্দের প্রথম আস্বাদ পেয়েছিল গত বসন্তে ঃ ঘুমোবার আগে প্রতি রাত্রেই ও সারা দিনের ঘটনা খতিয়ে দেখত—কিন্তু তার মধ্যে মালিন্য পায়নি কোনোদিন, শ্বাসরোধেরও অনুভূতি জাগেনি কোনো কিছুতে। নিজেকে নিয়ে ও খুশী হতে আরম্ভ করেছিল। আর এখন, এখন যে এই এত কাজ পারবে না পারবে না বলে আতঙ্কে আর হতাশায় মরছে, সে কি শুধু আতঙ্ক আতঙ্ক খেলা নয়? সেদিন পর্যন্তও ও ছিল একটা কাদামাখা বেড়ালের বাচ্চা—দেখলে দুঃখ হয়—আর আজ হঠাৎ ওর গুরুত্ব হয়েছে কতখানি। এইটাই তো আসল কথা। ওর প্রয়োজন এখন বাস্তবে স্বীকৃত বলেই মনে হচ্ছে; ঐ যে জলপাই রংয়ের ভারিক্কি কমরেডটি, ভারি সুন্দর চোখ যাঁর, কি সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি ওর সঙ্গে কথা বল্লেন।..... ওকে তো এর সম্মান রাখতে হবে।. . . শিক্ষা কমিসারিয়েটের ওঁরা যদি শেষকালে বলেন ঃ "আমরা ওর ওপর ভরসা করেছিলাম, কিন্তু ও আমাদের ডুবিয়ে দিল",—নাঃ সে বড় ভয়ংকর।......এখানে মস্কোতে জীবনের অর্থ অন্য রকম। স্তেপের ওপর যেভাবে আলেক্সির তিন ঘোড়ার পেছনে দাঁতে খড় কাটতে কাটতে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলত, আর নিজেকে খালি জিজ্ঞাসা করত—"ওরে বন্দিনী, রূপ নিয়ে তোর কী কাজ হল?"—শুধু তাতেই তো এখানে চলবে না।

ঘরে ফিরলে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইল মাসলভ। জলপাই-রং কমরেডের সঙ্গে যা কথা হয়েছে তার সারমর্ম শুনে ম্লান হাসিতে মাসলভের ডান গালটা একেবারে রেখায় রেখায় কুঁচকে উঠল।

"তা বটে", কাতিয়ার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সে বল্ল। "কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের দুঃখজনক পরিণতি তো এর সামান্য অংশ মাত্র......এমন আরও কিছু আছে যা ওর চেয়েও অনেক বেশী দুঃখের।"

পয়লা আগস্ট থেকে কাতিয়া স্কুল চালু করল। ছোট ছোট মেয়ে, খালি পা, সুতো নয়তো ন্যাকড়া দিয়ে তাদের বিনুনি বাঁধা—আর ছোট ছোট ছেলে, গায়ে ছেঁড়া শার্ট, কদম ছাঁট চুল—তারা সব অত্যন্ত শান্তভাবে এসে ভেতরে ঢোকে, তেমনি শান্তভাবে গিয়ে বসে নিজের নিজের ডেস্কে। ওদের মধ্যে অনেকে এত রোগা যে তাদের মুখগুলো যেন কাচের মতো—দেখলে মনে হয় বুড়ো মানুষ।

কাতিয়ার প্রথম দিনের সবটাই কাটল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জানাশোনা করতে—ডেস্কে ওদের পাশে গিয়ে বসে, প্রশ্ন করে, কথা বলার জন্যে ওদের উৎসাহ দেয়—এম্‌নি সব। ছেলেপিলেদের কৌতূহল কি করে জাগাতে হয় সে বিষয়ে আগেই ওর কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওদের সামনে একখানা বই খুলে ধরল কাতিয়া ঃ "এই দেখ, এই একখানা বই—পাতাগুলো সব সাদা, অক্ষরগুলো কালো আর লাইনগুলো মনে হয় যেন ছাই ছাই রংয়ের। সারাদিন বসে বসে বই দেখ, তবু ও ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। কিন্তু যদি লিখতে পড়তে শেখো, একটু ইতিহাস আর ভূগোল আর অংক আর অম্‌নি আরও সব শিখতে পার, তাহলে দেখবে বইখানা একেবারে কথা বলছে......।"

ভ্‌লাদিমির্স্কোয়ে গ্রামের স্কুলে ছেলেমেয়েদের চোখে হঠাৎ কেমন কৌতূহল একেবারে জ্বলে উঠেছিল, পুশ্‌কিনের 'রাজা সাল্‌তান'-এর গল্প শুনে তাদের কী ভালই না লেগেছিল—সে কথা কাতিয়ার মনে পড়ল।

"প্রথমে তোমাদের অক্ষরগুলো শিখতে হবে—এ, বি, সি,..... তারপর অক্ষরগুলো লিখতে হবে বোর্ডে। লেখা শেষ হলে তখন বানান, তারপর পড়া—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যত কথা সব—জোরে জোরে অবিশ্যি।......এম্‌নি পড়, হঠাৎ একদিন দেখবে লাইন টাইন সব উড়ে গেছে—কোথায় বইয়ের লাইন, না তার বদলে দেখতে পাচ্ছ নীল সমুদ্দুর—তীরের ওপর ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছ কানের ভেতর। তারপর সমুদ্রের ফেনার মধ্যে থেকে উঠে আসবে চল্লিশ বীর, গায়ে লোহার বর্ম, মাথায় লোহার টুপি, আর তাদের সঙ্গে আসবে ইয়া দাড়িওলা চের্নোমর......"

এখানে প্রেস্‌নিয়া স্কুলে ঐ গল্প বলতে গিয়ে কাতিয়ার মনে হল কথাগুলো যেন ছেলেপিলেদের কানেই ঢুকছে না। এখানে ক্লাসরুমের অর্ধেক জানলায় সার্সি নেই, সার্সির বদলে কাঠ মারা। দেওয়ালের চুণবালি খসে খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে—এই ক্লাসরুমের মধ্যে কথাগুলো যেন শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। ছোট ছোট মেয়ে—তাদের হাতগুলো এমন কাঠি কাঠি যে তোয়ালে রাখার আংটার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যায়—আর ছোট ছোট ছেলে—মুখময় ঘা আর কোঁচকানো দাগ—ছেলেমেয়ে সবাই চুপ করে গল্প শুনে যায়, কিন্তু তাদের মুখ দেখে কাতিয়া বোঝে যে ওরা শুধু ভদ্রতার খাতিরে সহ্য করছে।...তারা ভাবছে একদম অন্য কথা।

টিফিনের সময় সবাই স্কুলের উঠোনে নামল। কিন্তু খেলা করছে মাত্র ক'টি মেয়ে—অলস ভঙ্গিতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা ঢিল ঠেলে ঠেলে বেড়াচ্ছে; আর ঢিমে তেতালা ঢংয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে দুটি ছেলে। বেড়ার নীচে ডক পাতা

গজিয়েছে—সেই বেড়ার ছায়ায় গিয়ে বসেছে বেশীর ভাগ ছেলেপিলে। বসেছে তো বসেই আছে, খাবার টাবার কারো নেই। ঐ জেলার শ্রমিকদেরই ওরা ছেলেপিলে, ওদের অনেকেরই বাপ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে।

মাটিতে হাত রেখে একটি ছেলে মেঘের দিকে চেয়ে বসে ছিল—রাস্তার ওপর মেঘগুলো ঝুঁকে আছে ঠিক ধোঁয়ার মতো। ওর পাশে বসে পড়ে ঝটপট প্রশ্ন শুরু করে দিল কাতিয়া ঃ

"তুমি মিতিয়া পেত্রভ, তাই না?"

"হুঁ।"

"তোমার বাবা কোথায় কাজ করেন?"

"বাবা তো সেই কবে যুদ্ধে গেছেন।"

"আর তোমার মা কি করেন?"

"মা বাসায় থাকেন, তাঁর অসুখ।"

"বাবা চিঠি দেন?"

"না।"

"চিঠি দেন না কেন?"

"চিঠিতে আর কি লিখবেন? যাবার সময় মাকে বলে গিয়েছিলেন, 'তুমি যে খেটে মরে যাচ্ছ তার আমি প্রতিশোধ নেব, দশটা জেনারেলের মুণ্ডু কাটব।' বাবার যা সাহস..."

"বড় হলে তুমি কি করবে বল তো?"

"কি জানি। মা বলেন, শীত হলে এবার আর বাঁচতে হবে না. .।"

মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে হোয়াইট চমু, কিন্তু তার চেয়েও তাড়াতাড়ি আসছে শরৎকাল। প্রথমে ক্ষণস্থায়ী উষ্ণতার ক'টি সোনালি দিন, পরম আকাঙ্ক্ষার ধন—কিন্তু তারপরই উত্তর থেকে এল একরোখা ঝোড়ো হাওয়া—স্তরে স্তরে, পুঞ্জে পুঞ্জে ঠেলে নিয়ে চক্র মেঘগুলোকে।

স্কুলে লোহার অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালাবে কি দিয়ে—কিছু নেই। শিক্ষা কমিসারিয়েটে সেই জলপাই-রং কমরেডের কাছে গিয়ে কাতিয়া নালিশ জানাল। কিন্তু তিনি শুধু মাথা নাড়লেন, কাতিয়ার সুন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে বল্লেন ঃ "একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না, আপনার উদ্বেগ কতখানি তা বুঝতে পারছি, আপনার আগ্রহের ঐকান্তিকতা দেখে খুব ভালও লাগছে—কিন্তু এবার শীতে জ্বালানি নিয়ে আমাদের খুবই মুশ্‌কিলে পড়তে হবে। শিক্ষা কমিসারিয়েটকে কাঠের আশা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সে কাঠ রয়েছে ভলগ্‌দা প্রদেশে, আসবে গরুর গাড়ীতে। দেখুন, হৈ চৈ ক'রে যা পারেন দেখুন, যেখানে সম্ভব চাপ টাপ দিন...।"

ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে আসে—ঠাণ্ডায় একেবারে নীল। ভিজে চপ্‌চপ করছে, গায়ে জামাটামা নেই বল্লেই হয় (থাকার মধ্যে শুধু পাতলা, বিচ্ছিরি কোট, নয়তো

মায়েদের পুরোনো জ্যাকেট—ঠিক যেন সঙের সাজ)—দেখে দেখে কাতিয়া শেষকালে ঠিক ক'রে ফেল্ল যে এবার একেবারে নির্ভেজাল দস্যুবৃত্তির পথ ধরবে। বেড়াটা জবর দখল করার জন্যে সুবৎনিক-এর* ব্যবস্থা করল। একদিন সন্ধ্যাবেলা বেশ অন্ধকার, ঝোড়ো হাওয়া বইছে প্রচণ্ড শব্দে, তারই মধ্যে জমা হল ইস্কুলের কালা-খোঁড়া দরোয়ান বুড়ো আর কাতিয়া আর ছেলেমেয়েরা—ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই এসেছে। বেড়াটা সবাই মিলে ভেংগে ফেল্ল, রেলিংগুলো ঘাড়ে ক'রে এনে রাখল দেউড়িতে। দরোয়ান গিয়ে ওগুলো সব কেটেকুটে দেবার পর ব্যস, পরদিন ক্লাসরুম একেবারে দিব্যি গরম, একটু স্যাঁতসেঁতে হলেও ভিজে দেওয়াল থেকে খাসা ধোঁয়া উঠছে। ছেলেপিলেদের মুখে চোখে তখন কী খুশির ছাপ! দিদিমণির চেয়ার থেকে কাতিয়া তাদের কষে তালিম দিচ্ছে, 'সৌরশক্তির' হাটহদ্দ সব বুঝিয়ে ফেলছে (বিষয়টা ও নিজে বুঝেছে ঠিক আগের দিন—'প্রকৃতির শক্তি' নামে একখানা সুন্দর বই থেকে)।

"তোমরা যা কিছু দেখতে পাও—ধর দিদিমণির টেবিল, তোমাদের বসার বেঞ্চি, তারপর ঐ অগ্নিকুণ্ডের আগুন, এমন কি তোমরা নিজেরা পর্যন্ত—এ সব এসেছে সৌরশক্তি থেকে।.. এই শক্তিকে তাঁবে আনাই মানুষের কাজ। সেজন্যে আমাদের সবাইকে শিখতে হবে, লড়তে হবে।...আচ্ছা, এবার রুশ ভাষার পড়াটা ধরা যাক। রুশ ভাষাও তো সৌরশক্তি, কাজেই ওটাও আমাদের ভাল করে পড়তে হবে..."

টিফিনের ছুটির সময় ছেলেরা কত খবর শোনায় কাতিয়াকে।...ওদের পাড়ায় কিংবা সারা মস্কোতে যেখানে যা ঘটছে সব ওরা জানে, বিদেশী লর্ডদের ওখানে কি ঘটছে তাও জানে।

ওদের বৃত্তান্ত থেকে কত কথাই জানল কাতিয়া। খবরের কাগজে তখনো বার হয়নি, কিন্তু ও ঠিক খবর পেল যে হোয়াইটরা ওরেলেব কাছে ব্যূহ ভেদ করেছে, সেখান থেকে আসছে জখমী মানুষেরা। ছোট্ট দুটি মেয়ে—খবরের জন্যে ওরা ইচ্ছে করেই মিকুলিনদের বাড়ী গিয়েছিল—সেই যে টার্নার মিস্ত্রী স্তেপান মিকুলিন, সেদিন যে বাড়ী এল—আহা, গুলি খেয়ে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বেচারা। সব সময় শুয়ে থাকতে হবে, ডাক্তারের কড়া হুকুম, তবু কি শোনে—একেবারে বিছানার ওপর উঠে বসে কী চেঁচিয়েই না বল্ল ওর মাকে আর বৌকে—নিজের কানে সে কথা শুনে এসেছে মেয়ে দুটি। মিকুলিন বল্ল ঃ

"যুদ্ধের ময়দানে আমাদের মধ্যে নেমকহারামি চলছে, নেমকহারামি! দাও, আমাকে কাগজ কলম দাও, ভ্লাদিমির ইলিয়িচকে* জানাব! সেরা মজুররা সব যুদ্ধের ময়দানে রক্ত ঢালছে, প্রাণ দিচ্ছে—হোয়াইট জেনারেলের হাতে মস্কো তুলে দেবে এ তো তারা সইতে পারে না।...ওরেল হাত ছাড়া হল সে আমাদের দোষ নয়, হাত ছাড়া হল নেমকহারামির জন্যে!"

---

* ছুটির পর স্বেচ্ছামূলক কাজ

মেয়ে দুটির কাহিনী শুনতে শুনতে মিতিয়া পেত্রভের মুখটা একেবারে সাদা হয়ে আসে, চোখ দুটি ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে। সে চোখে এমন কাতরতার ছাপ যে ওর পাশে বসে পড়ে মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরল কাতিয়া। কিন্তু নীরবে ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিল—কোনো আদর, কোনো সান্ত্বনাই ওকে এখন শান্তি দিতে পারবে না।

ক'দিন ধ'রে মুষলধারে বৃষ্টি—প্রেস্‌নিয়া পল্লীতে এক হাঁটু কাদা, কালো কালো, পেছল পেছল। শহরময় ভয়ংকর ভয়ঙ্কর গুজব ছড়িয়েছে একেবারে মড়কের মতো। ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসেছে বটে, কিন্তু গুজব শুনে তারা খুবই আতংকগ্রস্ত—পড়ায় মন দেওয়ানো যায় না। ছোট্ট ক্লাভ্‌দিয়া, মাথায় লাল চুল, যোগ বিয়োগ অংকটংক সে কিছু করেনি—পড়ার মাঝখানে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। টেবিলের ওপর পেন্সিল ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে কাতিয়া বল্ল ঃ

"ক্লাভ্‌দিয়া, স্থির হয়ে বস, বস এক্ষুনি।"

"পারছিনে দি-দি-দিমণি।"

"কেন হয়েছে কি?"

ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর আসে ঃ

"মা বলেন, অংক শিখে কি হবে ক্লাভ্‌দিয়া, তুই তো কখনো.. "

"বাজে কথা, তোমার মা কখনো তা বলেননি।"

"মা বলেছেন ঃ ধুলো থেকে এসেছিস, তোরা ধুলোতেই যাবি আবার।.. অফিসাররা এসে আমাদের সব্বাইকে ঘোড়ার নীচে পিষে দেবে ."

সন্ধ্যেবেলা কাতিয়া চল্ল বর্ণপরিচয় সমিতিতে। জল থেকে পা বাঁচাবার জন্যে বেড়ার কিনারা ঘেঁষে হাঁটে। রাস্তার বাঁকে পেঁাছলেই কিন্তু হতাশ হয়ে থেমে পড়তে হয়, ভাবে এই রাস্তা কি আর পার হওয়া যাবে? চেস্‌নোকভ নামে এক শ্রমিকের বাসায় (চেস্‌নোকভ সম্প্রতি কমিসার হয়ে যুদ্ধে গেছেন) ক্লাস, কিন্তু যে-মেয়েদের ও পড়াচ্ছিল তাদের একজনও আসেনি সেদিন। চেস্‌নোকভের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস আগে। তার স্ত্রী এখন গর্ভবতী, তার ওপর ভয়ংকর রোগা, মুখময় গোল গোল হলদে দাগ। চেস্‌নোকভের স্ত্রী কাতিয়াকে বল্ল ঃ

"দিন কতক আর আসবেন না। কিছু সময় সবুর করে থাকুন, আমাদের এখন অন্য অনেক ভাবনা-চিন্তা।...আপনার পক্ষেও এই ভাল।"

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বামী চিঠি লিখেছে, কাতিয়াকে দেখাল ঃ "লিউবা, তুলা শহর যদি ওরা দখল করে তাহলে তোমরা প্রস্তুত থেকো। মস্কো আমরা ছাড়ব না, যতক্ষণ একটা মানুষেরও প্রাণ থাকে ততক্ষণ লড়ব।...এ চিঠি খুব তাড়াতাড়ি লিখলাম—একজন মস্কো যাচ্ছে, তার হাতে দিয়ে দিচ্ছি।...আমার এখানকার এক মহযোদ্ধা, নাম রশচিন, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বোধ হয়। তাঁকে বিশ্বাস করতে পার। তাঁর কাছেই সব খবর পাবে। তিনি যা বলবেন, আমাদের কমরেডদের যদি তা শোনাতে পার তো খুব ভাল হয়...ও'র কোনো কিছু দরকার

হলে ওরা যেন সাহায্য করে, দেখো। আমি বেঁচে আছি, ভাল আছি, আবার ঘোড়ায় চড়তেও শিখেছি—ঘোড়ায় চড়ব তা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি...”

“ঐ কমরেড রশচিনের জন্যেই আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি, কিন্তু তিনি তো এলেন না এখনো”, ভিজে শার্সির মধ্যে দিয়ে অসন্তুষ্টভাবে বাইরের দিকে চেয়ে চেস্‌নোকভের স্ত্রী বল্ল। “তিনি যখন পৌঁছাবেন, তখন আপনি এসে শুনবেন ’খুনি—ছোট মেয়ে টেয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেব আপনাকে ডাকতে।...কে এই রশচিন? আপনার স্বামী নন তো?”

“না”, বলে জবাব দিল কাতিয়া। “আমার স্বামী মারা গেছেন অনেক দিন।’

বাড়ী ফিরে লোহার তৈরি ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটা জ্বালাল কাতিয়া। অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা পাইপ বেরিয়েছে, শার্সির ফুটোর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ঘরের বাইরে। লম্বা লম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে আগুন ধরালে কুণ্ডগুলো ভোঁ ভোঁ শব্দ করে ওঠে, তাই এগুলোর নাম হয়েছে ‘ভোমরা’। কাতিয়ার ভোমরাটা প্রেসনিয়া পল্লীর শ্রমিকদের হাতের তৈরি, তারা নিজেরাই ওটাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে কাতিয়ার ঘরেঃ তাদের শিক্ষয়িত্রীর শোবার ঘরটা যদি একটু গরম থাকে তাহলে তিনি আরও ভাল কাজ করতে পারবেন, এই তাদের ধারণা। ভিজে ঢোল জুতো-মোজা আর কাদামাখা ঘাগরা—সব ছেড়ে ফেল্ল কাতিয়া, পা ধুল বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে, শুকনো কাপড়চোপড় পরে নিল, তারপর কেট্‌লি ভর্তি করে বসিয়ে দিল ‘ভোমরা’-টার ওপর। কোট-পকেট থেকে মেটে রংয়ের রুটি বার করল একটা—রুটিতে ভুষিগুলো যেন দাঁত বার করে আছে—রুটিটাকে রাখল পরিষ্কার তোয়ালের ওপর। রুটির পাশে একটা কাপ আর একটা রুপোর চামচ। এতগুলো কাজ, সবই করে গেল অন্যমনস্কভাবে। তারপর যখন শুনল রান্নাঘরের দরজাটা ঝড়াং করে খুলছে, গলিপথ বরাবর মাসলভের অসহ্য-রকম মন্থর পায়ের ঘস্‌টানির শব্দ শোনা যাচ্ছে—তখন ও উঠে গিয়ে তার দরজায় কড়া নাড়ল।

“একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভ্‌না নাকি? নমস্কার, বসুন বসুন। কী যে যাচ্ছে-তাই বাদলা চলেছে।......আরে, আপনি যে দিন দিন আরও সুন্দর হচ্ছেন! সত্যি বলছি......”

কেন জানি সেদিন ও যেন বড্ড বেশি খিটখিটে হয়ে উঠেছে। ব্যাপারস্যাপার কি চলছে, সব জায়গায় সবাই এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে কেন—বলে কাতিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে মাস্‌লভ তার সরু ঠোঁটজোড়া ছড়িয়ে দিয়ে দারুণ বিষাক্ত হাসি হাসল। সাধারণত এরকমভাবে হাসার সময় ও মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, সেদিন কিন্তু তাও ঘোরাল না।

“পার্টির খবর জানতে চান আপনি? না অন্য কিছু? যুদ্ধের খবর চান? আমাদের পক্ষ হারছে। তা ছাড়া আর কি খবর দেব? হারছে! মস্কোতে কিন্তু চিরাচরিত কায়দার কোনো ব্যতিক্রম নেই—দিব্যি নিশ্চিন্ত,

খোশমেজাজী ভাব।......দেনিকিনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে কমিউনিস্টদের ফৌজে ভর্তি করা হচ্ছে দলে দলে।...... পেত্রোগ্রাদে বুর্জোয়া পল্লীতে ব্যাপক খানাতল্লাশী।...... জ্বালানি নেই তাই সমস্ত কল-কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে, সিদ্ধান্ত হয়েছে। ......আর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে সুখের সংবাদ হল—ঘোষণা করা হয়েছে যে, পার্টি সভ্যদের সভ্যপত্র আবার নতুন করে রেজিস্টারি করতে হবে, মানে নোংরা গোয়াল পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে।......এমনি করেই বোধ হয় আমরা দেনিকিন আর য়ুদেনিচ আর কোলচাককে হারাতে পারব......”

সিগ্রেটের টুকরোয় ভর্তি মেঝেটা, তার ওপর পা টেনে টেনে পায়চারি করে মাসলভ। ওর লম্বা আন্ডারওয়্যারের গোড়ালি-আঁটা ফিতেটা খুলে পড়েছে, ভিজে নোংরা প্যাণ্টের তলা থেকে ঝুলছে। ......পায়চারি করতে করতে আঙুল মটকায়, কিন্তু শব্দ হয় না—শব্দ করার মতো গায়ে জোর নেই।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ওদের হারাতে পারব, হারাতে পারব,” উপহাসের সুরে পুনরাবৃত্তি করে মাসলভ। “আপনি অবিশ্যি এর কিছুই বুঝতে পারছেন না ......পারবেন না তা আর আশ্চর্য কি......। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য এই যে, আমিও এর কিছুই বুঝতে পারছিনে...... এক বর্ণও বুঝতে পারছিনে ...। সোশ্যালিজ্‌ম তৈরি হয় বস্তুগত সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর......। শ্রমের উৎপাদনশীলতার শ্রেষ্ঠ রূপ হল সোশ্যালিজম.... । বেশ। তাহলে খুব উঁচু রকমের শিল্পপ্রসার অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয় কি? নিশ্চয় প্রয়োজন। সংখ্যাবহুল অথচ সুসংস্কৃত শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয় কি? অবশ্য। আমরা যে কার্ল মার্কস পড়েছি, খুব ভাল করে পড়েছি! সুতরাং চল এখন নতুন করে রেজিস্টারি নিয়ে মেতে থাকি। বুড়ো কুকুরটার দেহে এখনও একটু জান আছে।”

ওর খবরে কাতিয়ার আশা মিটল না। পরদিন নির্দেশ আনবার জন্যে শিক্ষা কমিসারিয়েটের দপ্তরে গেছে—দেখে বড় বারান্দাটাতে হাওয়ায় যেন একেবারে ছুঁচ ফোটাচ্ছে (এ রকম সাধারণত হয় না, নিশ্চয়ই কোনো জানলাটানলা ভেঙে গেছে, কিংবা কেউ ইচ্ছে করে খুলে রেখেছে), কিন্তু এত হাওয়া সত্ত্বেও চারদিকে কর্মচারীরা সব দল বেঁধে বেঁধে ফিস্‌ফাস্‌ করছে। কাতিয়া এ ঘরে যায়, ও ঘরে যায়, কিন্তু কোনো ফল হয় না। শেষকালে এক মহিলা কর্মচারী—তাঁর নাকটা স্কাঙ্ক্‌ লোমের কলার দিয়ে ঢাকা, তিনি বল্লেন:

“আরে আপনি কি ঘুমোচ্ছেন, নাগরিকা? জানেন না, আমাদের যে খুব সম্ভব ভলগ্‌দায় সরিয়ে দিচ্ছে?”

তারপর আবার ঠিক তেমনি আকস্মিকভাবে আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল। পরদিন ভোরবেলা কাতিয়া তাড়াতাড়ি স্কুলে যাচ্ছে, সাদোভায়া স্ট্রীটের মোড়ে এসে থামতে হল, দাঁড়িয়ে থাকতে হল অনেকক্ষণ। সামনে শক্ত কাদার ওপর দিয়ে মার্চ করে চলেছে শ্রমিকদের সশস্ত্র ডিট্যাচমেণ্ট। ঝোড়ো হাওয়ায়

তখন শীতের আমেজ—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাইম গাছের রিক্ত শাখাপ্রশাখায় সে হাওয়া হা হা ক'রে ফিরছে; আর গাছের নীচে গোষ্পদের তুষার আস্তরণ গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলছে সশস্ত্র শ্রমিকের দল। সশস্ত্র দলের পর এক সার মালটানা গাড়ী। তারপর আবার দলে দলে মানুষ, ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। এখানে ওখানে কর্কশ, বেসুরো গলার গান শোনা যায়—'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে। লাল শালুর টুকরো উঁচুতে তুলে ধরা, তাতে আঁকাবাঁকা হরফে তাড়াতাড়ি ক'রে লিখে এনেছেঃ "দেনিকিনের হোয়াইট দলের সঙ্গে লড়তে হবে, সবাই চলো!" "বিশ্বব্যাপী সর্বহারা বিপ্লব জিন্দাবাদ," "দুনিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী ধ্বংস হোক!" নতুন নতুন দল বেরিয়ে আসে শীতার্ত প্রভাতী কুয়াশার ভেতর থেকে, মার্চ করে চ'লে যায়। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—রোগা, অস্থিচর্মসার, কালো-কালো মুখগুলি, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পা ফেলছে—সেদিকে চেয়ে কাতিয়ার মনে হল, ওদের সবাইয়ের মুখে চোখে যেন একই অভিব্যক্তি—চাপা যন্ত্রণা, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আর অলঙ্ঘ্য ইচ্ছাশক্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে।......

স্কুলে পৌঁছতেই ছেলেপিলেরা এসে খবরটা জানালঃ কাল প্রেসনিয়া এলাকায় লেনিন এসেছিলেন—ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়—'পার্টি হপ্তা' এবার শুরু হলঃ......

ভরোনেঝের কাছে শ্কুরো-র কুবান কোর এসে মামন্তভের সঙ্গে যোগ দিল। বুদিওনির দু' ডিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মামন্তভের হাতে এখন ছ' ডিভিশন অশ্বারোহী সৈন্য। ওখানেই থেমে পড়ে তিনি এবার বসে রইলেন বুদিওনির অপেক্ষায়। মামন্তভ বেশ হুঁশিয়ার লোক—কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন ভরোনেঝ-রক্ষকদের শক্তি বাড়াবার জন্যে। দুটো কোর ভেঙে তৈরি করা হল তিনটে কলমে। লাল অশ্বারোহী বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে একেবারে সাবাড় ক'রে দিতে হবে, সেই রকম একটা যুদ্ধক্ষেত্রও ঠিক করে রাখা হল। জায়গাটা একটা প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের শেষে রেল লাইন। রেল লাইনে একটা সাঁজোয়া গাড়ী ঘোরাফেরা করছে, দেখলে মনে হয় যেন ইস্পাতের কচ্ছপের গায়ে ছ' ইঞ্চি কামান চড়ানো হয়েছে।

সাহসী হলেও বুদিওনি কিন্তু বেশ সাবধান। মামন্তভের উদ্যোগ-আয়োজন, প্যাঁচ-পাঁয়তারা এসবের বেশ বিস্তারিত বিবরণ তিনি জানিয়ে নিয়েছেন।...... শাল বা রুমালের তলায় তাড়াতাড়ি লেখা চিঠিটা লুকিয়ে নিয়ে কোনো বাচ্চা মেয়েই হয়তো হোয়াইটদের পাহারা পার হয়ে যায়—নোংরা, পুঁচকে ছুঁড়ি দেখে কারই বা লোভ হবে; কিংবা ঝুড়ি-হাতে জঞ্জাল-কুড়োনো বুড়িটুড়ি কেউ হয়তো—বুড়ি দেখলে কোনো কসাকই আর ছোঁবে না, ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে; এরাই সব খবর নিয়ে আসে, বুদিওনির চরদের সঙ্গে দেখা ক'রে সে খবর চালান করে দেয়।

যে প্রকাণ্ড মাঠে বুদিওনিকে ধ্বংস করার কথা সে মাঠে তিনি ঢুকলেন না, ঠিক তার গায়ে জঙ্গল আর জলার মাঝখানে তাঁবু গাড়লেন। হুকুম দিলেন—ঘোড়াগুলোকে পেট ভ'রে খেতে দাও, ওদের পায়ের ক্ষুরটুর সব ভাল ক'রে দেখে নাও (ঘোড়াগুলোর শুধু সামনের পায়ে নাল লাগানো), গোলাবারুদের স্টক একেবারে ভর্তি করে রাখো। আরও বলে দিলেন যে, সৈন্যদের বাজরা আটার বদলে (ওঃ, বাজরা খেয়ে খেয়ে ওদের ঘেন্না ধরে গেছে!) নোনা মাংস আর বীন্ দাও, মিষ্টি কণ্ডেন্সড্ মিল্ক আর বিস্কুট দাও, তারপর সুগন্ধি তামাক দাও—যাতে আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসে মৌজ করতে পারে। এসব জিনিস এসেছে ওদের "চলন্ত ভাণ্ডার" থেকে—হোয়াইটদের রসদ-বোঝাই গাড়ীগুলোকে ওরা ঐ নামেই ডাকে। গাড়ীগুলো মালে একদম ঠাসা, চলেও সারা দিন-রাত—ভরোনেঝ থেকে মাল নিয়ে যায় মামন্তভের ঘাঁটিতে। বুদিওনির বিশেষ আগ্রহ যাতে ওপক্ষের জাপানী কার্বাইন-বন্দুক পাকড়ানো যায়—নিজেদের রাইফেলগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, সেগুলোকে যথাসম্ভব বদলে নিতে হবে। তা ছাড়া অফিস সংক্রান্ত মালপত্রের দিকেও ও'র লক্ষ্য আছে।

গুরুতর লড়াই আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারে কারণ জলা-জংগলের আড়াল পেয়েছে। কিন্তু ছ'-ছটা দন ডিভিশনের সংগে হাতাহাতি লড়তে হবে, এ ভবিতব্যটা এতই কঠিন যে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার ইচ্ছে কারও বড় দেখা গেল না। ওরা বসে বসে ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করল—এমন দলাই-মলাই যে সাদা রুমাল দিয়ে ঘোড়ার পিঠ ঘষলেও রুমালে একটু ময়লা লাগবে না। তারপর রেকাবটেকাব পালিশ করল, তলোয়ারে ধার দিল। গোটা স্কোয়াড্রনের মধ্যে না আছে গানের শব্দ, না আছে একর্ডিয়ানের আওয়াজ—শুধু গভীর তর্কবিতর্ক চলেছে সবখানে। কমিসারকে দেখতে পেলেই সৈন্যেরা হাত নেড়ে ডাকেঃ "ও কমিউনিস্ট, এদিকে আসুন। .. আচ্ছা কমরেড, মামন্তভকে সাবাড় করার পর আমরা ভরোনেঝ দখল করব তো? ওখানে বহুৎ মাল আছে, বুঝলেন কমরেড!" কমিসার জবাব দিলেন যে, ভরোনেঝ সম্বন্ধে বুদিওনির কাছ থেকে এখনো কোনো আদেশ আসেনি। তখন উঠল আর এক তর্কঃ দুর্গ দ্বারা রক্ষিত এলাকা কি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পক্ষে দখল করা সম্ভব? কেউ কেউ বল্ল—সম্ভব, প্রচণ্ড উৎসাহ থাকলে দখল করা যায়। আবার অন্যেরা বল্ল—না, যুদ্ধের সমস্ত নিয়মই এর বিরুদ্ধে।

জলার ধারে পাহারা-ডিউটি পেয়েছে তেলেগিনের স্কোয়াড্রন। জলার দক্ষিণে একটা মাঠ, সে মাঠে হোয়াইট স্কাউটদের আবছা আবছা চেহারা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। জানা গেছে যে, মামন্তভের তিন কলামের মধ্যে একটা এসে ওখানে বসেছে। রাত্রিবেলা মামন্তভ কলামের সৈন্যরা আগুন জ্বালায়, মেঘের ওপর সে আগুনের ক্ষীণ আভা দেখা যায়।

আসন্ন যুদ্ধ, যার জন্যে এমনি সব বিরাট আর শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীর সমাবেশ হয়েছে, সে যুদ্ধ নিয়ে তেলেগিনের স্কোয়াড্রনেও যথেষ্ট আলোচনা

চলেছে। গবর্শিন নামে এক পুরনো ঘোড়সওয়ার তার স্মৃতি থেকে এমনি এক যুদ্ধের কাহিনী শোনাল। বল্লঃ চৌদ্দ সালে ব্রদিতে থাকতে চার রেজিমেণ্টের একটা অস্ট্রিয়ান ঘোড়সওয়ার ডিভিশন আমাদের হাল্কা সওয়ার ডিভিশনের ওপর জোর আক্রমণ করে; কিন্তু ঐ শেষ—ওর পর থেকে অস্ট্রিয়ানরা আর তাদের ঘোড়সওয়ার সৈন্য বার করেনি—ডিভিশনের বাকী-বক্রী যা ছিল সে সব আর্মির পেছনেই রেখে দিত।... একটা পাহাড়ের ওপর থেকে ঢালুর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছুটে এসে ওরা আক্রমণ চালায়। নীচে উপত্যকা, ওদের আশা ছিল যে আমাদের সৈন্যদের নীচে ঠেলে ফেলে দেবে। কিন্তু আমাদের সৈন্যরাও ছুটে গেল, পাহাড়ের গায়েই ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে। আমাদের দু'পাশে চার । ক'রে বর্শাধারী কসাক, মাঝখানে উহ্‌লান সৈন্য—তারাও বর্শাধারী, আর আখ্‌তির হুসার—তাদের টুপিতে হলদে রঙের বন্ধনী, উর্দির ওপর হলদে রঙের ফিতে—দারুণ ফিটফাট।

এত জোরে ঢালু বেয়ে নামতে নামতে অস্ট্রিয়ানরা কিছুতেই ঘোড়া ফেরাতে পারবে না, তা আমরা জানতাম। আমাদের আক্রমণ যে এত ভয়ঙ্কর তা কিন্তু ওরা ভাবতে পারেনি, তাই আমাদের কাছে এসে গিয়েছিল। কাছে এসে তখন ওরা ঘোড়া থামাতে চেষ্টা করল—কিন্তু তখন কি আর পারে? শত্রুর বুকে আমরা বর্শা গেঁথে দিলাম নীচে থেকে। ওঃ সে ভারি সুবিধা—বর্শাটা গেঁথেই ব্যস, এক্কেবারে ছেড়ে দাও। তারপর ঘোড়া ছোটালাম ওদের লাইনের মধ্যে দিয়ে, পাশ ফিরে ফিরে দিলাম তলোয়ারের কোপ—তা বলে কাঁধের ওপর নয় কিন্তু, ওদের আবার কাঁধপটির নীচে ইস্পাতের পাত ছিল—কোপ দিলাম আড়াআড়িভাবে, যাতে শরীরটাই চিরে ফেলা যায়।... ওদের চার চারটে রেজিমেণ্ট—সব পড়ে রইল পাহাড়ের মাঝখানে—একেবারে কচুকাটা, নয়তো বর্শার সঙ্গে মাটিতে গেঁথে গেছে। ওঃ সে কী ভীষণ দৃশ্য!

রোমহর্ষক গল্প বলে অন্য কেউ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে—এটা লাতুগিনের বিশেষ পছন্দ নয়। পুরোনো যোদ্ধাটির কথায় বাধা দিয়ে ও বল্লঃ

"ও গল্প সবাই জানে। আর এমন কীই বা ব্যাপার—স্রেফ বরাত জোর। তার চেয়ে সেই গল্পটা বল, সেই যে তিনজন মাত্র লাল সিপাহী কি ক'রে একটা জার্মান ব্যাটালিয়নকে বন্দী করল। আরে সে গল্প জান না? আহা, ঐ গল্পই তো জানা দরকার......"

"বল বল, লাতুগিন তুমিই বল!" এক সঙ্গে ক'জনে বলে উঠল।

আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল লাতুগিন। জ্বলন্ত অঙ্গারের আভায় ওর বিশীর্ণ মুখটা আলো হয়ে উঠেছে। ক'হপ্তা ধ'রে ঘোড়ার পিঠে পিঠে কাটিয়ে মুখে হাড়-চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই। ও, গাগিন আর জাদুইভিতের—এই তিনজনকে তেলেগিন একেবারে শুরুতেই কমাণ্ডাণ্টের ব্যাটালিয়নে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। দু'-মাসে ওদের গতরে একটু মাংস লেগেছে। এখন ওরা ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনে সওয়ারের কাজ করে।

"দশ নম্বরে একজন লোক ছিল—লেংকা-শ্চুর নাম তার—সারা পৃথিবী খুঁজেও অমন একটি মহাযোদ্ধা তুমি বার করতে পারবে না।" বলে আরম্ভ করল

লাতুগিন। তলোয়ারের ডগাটা মাটিতে পুঁতে হাতলের ওপর হাত দুটো জোড় ক'রে ও বলে চল্লঃ "গতবার শরৎকালে—লেংকা তখনও উক্রাইন ব্রিগেডে—দুজন কমরেডকে নিয়ে ও গেল স্কাউটিং করতে। দিব্যি নিরুদ্বেগ মনে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে, এমন সময় দেখে সামনে জার্মান সৈন্য—একেবারে একটা গোটা ব্যাটালিয়ান। জায়গাটা নিরিবিলি, ওখানে ঘাঁটি গেড়ে তারা স্তূপ বানাচ্ছিল......"

"মিথ্যে কথা", বলে আপত্তি তুল্ল শ্রোতাদের একজন। "জার্মানরা কখনো নিরিবিলি জায়গায় স্তূপ বানায় না।"

এমনভবে ওর দিকে চাইল লাতুগিন, যেন ভস্ম ক'রে ফেলবেঃ

"তারা স্তূপ বানাচ্ছিল কেন তাও বুঝিয়ে দিতে হবে? বেশ শোনো।... . জার্মানরা তখন বাড়ী যাচ্ছে—ওদের নিজের দেশে বিপ্লব শুরু হবার পরের ঘটনা এটা। ......আশেপাশে উক্রাইনের যত গ্রাম সব তখন বিদ্রোহী, চারদিকে তারা মেশিনগান খাড়া করে রেখেছে। জার্মানরা তাহলে যায় কোথায়? তার ওপর তাদের ক্ষিদেও লেগেছে। ......বুঝলে এবার? জার্মানগুলো উঠে দাঁড়াবার আগেই লেংকা করল কি, থলি থেকে বেশ ফর্সা এক টুকরো সাদা পট্টি বার ক'রে সেটাকে লটকে দিল তলোয়ারের ডগায়, তারপর নির্ভয়ে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হ'ল। 'তোমরা আত্মসমর্পণ কর', বল্ল লেংকা, 'প্রকান্ড অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আমরা তোমাদের ঘিরে ফেলেছি। তলোয়ারও লাগবে না, স্রেফ্ ঘোড়ার পায়ের তলেই তোমাদের পিষে মেরে ফেলতে পারব. . .।' একজন দোভাষী পাওয়া গেল, সে-ই কথাগুলো তর্জমা করে দিল। জার্মান ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিল কর্পোরাল, বেশ গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান, সে লেংকাকে জবাব দিল, 'আপনার কথা সত্য কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।' তাকে জবাব দিল লেংকাঃ 'সন্দেহ করা কিছু অন্যায় নয়। আচ্ছা বেশ, ঘোড়ায় চড়ে আমাদের হেড-কোয়ার্টারে চল—আত্মসমর্পণের বেশ ভাল শর্তই দেবে সেখানে.... ।' জার্মানরা নিজেদের মধ্যে খুব খানিকক্ষণ পরামর্শ করল, তারপর ওদের কমান্ডার বল্লঃ "গুট মর্গেন। ঠিক আছে, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের এক-একজনের পিছনে আমাদের তিন তিন জন– রাস্তায় যদি কিছু চালাকি খেলতে যাও তাহলে একেবারে শেষ করে দেব।' 'রাজি,' বল্ল লেংকা। 'তবে চালাকি-টালাকির ভয় কোরো না—আমরা বিপ্লবের সৈনিক, বুঝেছ. .।' বেশ, ওরা তো চল্ল। হেডকোয়ার্টারে পেঁছিবামাত্র শর্তটর্ত নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হল। জার্মানরা বলে রেললাইন পর্যন্ত ওদের পথ দিতে হবে, আর পঁচিশ পুদ বাজরাও দিতে হবে। ওদিকে আমরা বলি—তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র আর কামান দুটো রেখে যাও। ওরাও নাছোড়বান্দা, আমরাও নাছোড়বান্দা। এদিকে লেংকা তো খালি ঘুরঘুর করছে। শেষকালে ব্রিগেড কমান্ডারকে বলেই ফেল্ল, 'কমরেড, ওদের পেটে কিছু নেই, সেইজন্যই এমন গোঁ ধরেছে। আমি ওদের বলেকয়ে পথে আনছি, আপনি এখন ওদের জন্যে বেশ কিছু ভাল শুয়োরের চর্বি আর সাদা ময়দার রুটির ব্যবস্থা করুন দেখি।' বেটা মহা-ধড়িবাজ, মদের কথা কিছু বলেনি—কিন্তু

সাপ্লাই ম্যানেজার ছিল ওর দোস্ত, তাকে তুতিয়েপাতিয়ে কোয়ার্টখানেক ঠিক আদায় করল। তারপর জার্মানদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে বসে রুটি আর চর্বি স্লাইস করে দিল লেংকা, ভদকা ঢেলে দিল মগের ভেতর, সঙ্গে সঙ্গে চালাল আলাপ—উক্রেইনের লোকেরা কেমন দিব্যি খায় দায়, কেমন খাসা মানুষ তারা সব, এমনি পাঁচ কথা। জার্মানদেরও সাবাস দিল—ওরা কাইজারের গণেশ উল্টে দিয়েছে কিনা। এবার কিন্তু দোভাষী টোভাষী নেই, তবু জার্মানদের আর বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। লেংকা ওদের পিঠ চাপড়ায়, কানের কাছে দু হাত রেখে মুখে চুমু দেয়—একেবারে গলায় গলায় ভাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সব গড়াগড়ি যাচ্ছে, বসে আছে শুধু দুজন—লেংকা আর ঐ জার্মান কর্পোরাল। লেংকার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু জার্মানটা খালি হাসে আর বক দেখায়। ......চীফ অফ স্টাফের কাছ থেকে লোক এসে শুধোল—অবস্থা কি? 'অবস্থা খারাপ', লেংকা বল্ল, 'জার্মান কমান্ডার আমাদের প্রচারে সাড়া দিচ্ছে না, আরও এক কোয়ার্ট চাই।' তারপর দ্বিতীয় কোয়ার্টও যখন শেষ, ব্যস, তখন বসে থাকার মধ্যে শুধু লেংকা। রাত্তিরটা জার্মানরা ওখানেই কাটাল। সকালবেলা জার্মান কর্পোরাল তার সঙ্গীদের জামিন হিসেবে রেখে দিয়ে (অত মদ টানার পর ওরা এমনিতেও ঘোড়ায় চড়তে পারত না) ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল—সঙ্গে লেংকা। তারপর সন্ধ্যেবেলা গোটা ব্যাটালিয়ন নিয়েই ফিরে এল—চার চারশো ফৌজ—তাদের মাথার ওপর লাল ঝান্ডা। লেংকার প্রচারে ওদের মন একেবারে বদলে গেছে......"

গবুর্শিনের ব্রাদ যুদ্ধের কাহিনীর চেয়ে লাতুগিনের গল্প অনেক ভাল; গল্প শেষ হতেই লোকে হেসে একেবারে কুটোপাটি—কেউ বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে ঘোঁত ঘোঁত করছে, কেউ চোখ মুছছে, কেউ বা হাত নাড়াতে নাড়াতে অসহায়ভাবে শুধু গোঁ গোঁ করছে—এমন সময় রশ্চিন এসে হাজির। আগুনের ধারে লাতুগিনের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে সে বল্লঃ

"গাগিন আর জাদুইভিতেরকে নিয়ে তাঁবুতে এস।"

সকালবেলার সাদা কুয়াশা প্রান্তরের ওপর নিচু হয়ে জমে আছে। তার ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে পাঁচজন অশ্বারোহী। কেশর-ছাঁটা একটা গেরুয়া রংয়ের মাদী ঘোড়ার পিঠের ওপর দুমড়ে বসেছে রশ্চিন। তার আধ-ঘোড়া আগে কালো ঘোড়ায় চড়ে বেঁটেখাটো দুন্দিচ—লোকটি সার্ব, বুদিওনি স্কোয়াড্রনের অন্যতম কমান্ডার। ওদের পেছনে ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে আসছে লাতুগিন, গাগিন আর জাদুইভিতের। রশ্চিন আর দুন্দিচের গায়ে অফিসারের গ্রেটকোট—হাল্কা রং, সোনালি কাঁধপটি। অন্য তিনজনের মাথায় ফিতে-আঁটা টুপি, গায়ে শীপস্কিনের কুর্তা, তাতে সার্জেন্টের কাঁধপটি।

জীবনের অবিচল গতিপথে দুন্দিচ এক নতুন স্বদেশ খুঁজে পেয়েছে। ওর প্রকৃতি সাদাসিধে, উৎসাহপরায়ণ, ভয়লেশহীনঃ সেই প্রকৃতির সমস্ত আবেগ দিয়ে ও এই সীমাহীন রুশিয়াকে ভালবেসেছে, তার সীমাহীন বিপ্লবকেও ভালবেসেছে।

ওদের ওপর ভার পড়েছে যে, ভরোনেঝ-এর ভেতরে ঢুকে আর্টিলারীর অবস্থান লক্ষ্য করতে হবে, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর শক্তি কত জানতে হবে, আর তারপর শহর-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জেনারেল শ্‌কুরোর হাতে একখানা সীল-আঁটা খাম দিয়ে আসতে হবে—তাতে বুদিওনির চিঠি আছে।

দুন্দিচ জীবনকে ভালবাসে, জীবনের বাজি ধরতেও ভালবাসে। অক্টোবর দিনের হাওয়ায় হাওয়ায় আর্জ জামার নীচে পেশীগুলো বারে বারে টান হয়ে ওঠে, তাজা প্রভাতী কুয়াশায় দম নেবার সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র গন্ধে বুক ভ'রে যায়--এমন সময় চুপ ক'রে বসে থাকা ওর পক্ষে একেবারে অসহ্য। তাই ও স্বেচ্ছায় ভার নিয়েছিল—নিজ হাতে শ্‌কুরোকে চিঠিটা দিয়ে আসবে। রশ্‌চিনকে খুঁজে বার করে ও বলেছিলঃ

"ভাদিম পেত্রোভিচ! একটা বিপদের কাজ আছে, আপনাকে চাই—আপনিই সে কাজের উপযুক্ত। অফিসারদের চালচলন, রকমসকম আপনি ভালই জানেন। ভরোনেঝ পর্যন্ত একবার দৌড় দিয়ে আসবেন আমার সঙ্গে? একদিন লাগবে। দিব্যি খাসা ঘোড়ার পাল্লা দেওয়া যাবে—বুদিওনির নিজের ঘোড়া, পেতুশক আর অরোরা, দুটোই তিনি দেবেন বলেছেন......"

রাজি কি গররাজি তা আবার জিজ্ঞেস করা!—যদিও অফিসারদের 'রকমসকম' কথাটা রশ্‌চিনের কানে একটু বেজেছিল। কিন্তু কাজের বেলা সারা সন্ধ্যাই কেটে গেল কমরেডদের শেখাতে শেখাতে--নিচো র‍্যাঙ্কের লোকদের আদবকায়দা কি রকম, কি ক'রে স্যালুট করতে হয়, প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, ইত্যাদি। ভলাণ্টিয়ার অফিসারদের ভাবভঙ্গি কেমন হয় তাও শেখালঃ দ্রজ্‌দভ্‌স্কির অফিসারদের মুখে একটু ব্যঙ্গের ভাব থাকে, ভূতপূর্ব অধিনায়কের অনুকরণে ওরা সবাই প্যাঁশনে চশমা পরতে খুব ভালবাসে; কর্নিলভের লোকেরা আবার কটমট চাহনির জন্যে বিখ্যাত; মনে হয় যেন কিছুতেই কিছু হবে না গোছের নাক সিঁটকানো ভাব; আর মার্কোভাইটদের বিশেষত্ব হল নোংরা গ্রেটকোট আর তার চেয়েও নোংরা ভাষা।

ঠিক করা থাকল যে শত্রুরা যদি ওদের থামিয়ে দেয় কিংবা প্রশ্ন করে তাহলে বলতে হবেঃ "দক্ষিণ থেকে একটা ভলাণ্টিয়ার রিজার্ভ রেজিমেণ্ট কাস্তোরনাইয়া পৌঁছেছে, সেই রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের গোপন মেসেজ নিয়ে আমরা ভরোনেঝ যাচ্ছি।" কথাটা বিশ্বাস করার মতো, অথচ পষ্টাপষ্টি কিছু বলতে হচ্ছে না।

সীসের মতো কালো মেঘের নীচে থেকে মাঝে মাঝে ফ্যাকাশে আলো ঝলসে ওঠে। সেই আলোর মধ্যে ঘণ্টা তিনেক ধরে জোরে ঘোড়া চালাতে চালাতে ওরা শেষকালে দেখল—সামনে ভরোনেঝ, তার গম্বুজ, পাহারা ঘর, লাল লাল ছাত—সব দেখা যাচ্ছে। এতটা পথ কোথাও কোনো টহলদার দল ওদের বাধা দেয়নি, শুধু দূর থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখেছে যে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে ভরোনেঝ-এর দিকে যাচ্ছে—ব্যস দেখেই চলে গেছে। প্রথম বাধা এল পুলের কাছটাতে। কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নেবার জন্যে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি পুলটা—পুলের ওপর পাহারা আছে। বেশ ভারিক্কি গোছের কয়েকজন দাড়িওয়ালা

লোক, মাথায় চুড়োহীন টুপি, গায়ে ইউক্রেনী চাষী মেয়েদের মতো শীপস্কিন কোট—তারা পুলের ওপর পায়চারি করছে। আর পুলের শেষে পরিখার ধারে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে একদল ক্যাডেট অফিসার।

লাগাম টেনে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল দুন্দিচ, তারপর ঘোড়ার পেটি কষতে লাগল।

“ওখানে জাল পাস না দেখাতে হলেই ভাল” চাপা স্বরে বল্ল দুন্দিচ। “কিন্তু নদীতে বান ডেকেছে—অন্য কোথাও পার হতে গিয়ে যদি গলা পর্যন্ত ভিজে ঢোল হতে হয় তবে সে হবে আরও খারাপ। নাঃ, পুলের ওপর দিয়েই ঘোড়া হাঁকাতে হবে।”

“ঠিক হ্যায়! খিস্তি টিস্তি যা হোক ক'রে একরকম পার হয়ে যাবই,” বল্ল লাতুগিন।

এমন সময় হাসিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে জাদুইভিতের বলে উঠলঃ

“আরে ভাই, পুলের ওপরে ঐ ওরা পাদ্রী না হয়ে যায় না—সব একেবারে জটা বাবাজি। যদি না হয় তো কি বলেছি।”

“ধীর কদমে আগে বাড়ো—মুখে হাসি ফোটাও,” বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠতে উঠতে দুন্দিচ বল্ল।

পুলের ওখানে দাড়িওলারা বেতালা সুরে চেঁচাচ্ছে, “থামো! থামো!” লাগাম টান ক'রে সোজা তাদের দিকে চল্ল দুন্দিচ, সঙ্গে সঙ্গে জুতোর কাঁটা দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল পেতুশকের গায়ে। কিন্তু পুলরক্ষকরা ভীষণ হৈ-চৈ করছে, প্রচণ্ড বিক্রমে রাইফেল ওঁচাচ্ছে—তার ফলে ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠল, লেজের ঝাপ্টা দিতে লাগল রাগের ভরে। কাজেই দুন্দিচকে থামতে হল। থামামাত্র কয়েকখানা হাত একেবারে সামনে, লাগাম ধরে আর কি! তাই দেখে ঘোড়া হাঁকিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল লাতুগিনঃ

“তোমরা কি পাগল? মহামান্য কর্নেল সাহেবের লাগামে হাত দাও এত স্পর্ধা! কে তোমরা? দেখাও, তোমাদের কাগজপত্র দেখাও!”

“চুপ কর! ঘোড়া রুখে দাঁড়াও!” কাঁধের ওপর দিয়ে লাতুগিনকে লক্ষ্য করে বল্ল দুন্দিচ—দিব্যি শান্ত স্বর। তারপর জিন থেকে নুয়ে পড়ল দাড়িওলাদের দিকে—খোঁচা খোঁচা গোঁফের ফাঁক দিয়ে সাদা দাঁতগুলো ঝকমক করে উঠলঃ

“এই পুল পার হতে পাস লাগে? আমার কাছে তো পাস নেই। আমি কর্নেল দুন্দিচ, এরা আমার দেহরক্ষী।......বুঝেছেন তো? ধন্যবাদ......”

হাসতে হাসতে ঘোড়াটাকে ও সজোরে সামনে ঠেলল। নাক দিয়ে বিকট শব্দ ক'রে সামনের পা ওপরে তুলল ঘোড়াটা—মখমলের মতো নরম ছাই-রঙা পেটটা দেখা গেল—তারপর এমন তেজে দাড়িওলাদের পাশ দিয়ে ছুট দিল যে, ওরা কোনোরকমে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। দুন্দিচ কিন্তু তখনি আবার ঘোড়াকে শান্ত ক'রে নিল, নিয়ে এগিয়ে চল্ল ধীর কদমে। ততক্ষণে ওপারে হুঁশিয়ারী পড়ে

গেছে। সিগ্রেট-টিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে, লম্বা গ্রেটকোটের কিনারার সংগে জড়িয়ে-মড়িয়ে ক্যাডেটরা একেবারে এক ছুটে তাদের পরিখার ভেতর। পরিখা থেকে দুটো মেশিনগান মুখ বার করল—সে দুটোর লক্ষ্য ঘোড়সওয়ারদের দিকে। সেতুমুখে পরিখার কমাণ্ডার একজন ঢেংগাগোছের অফিসার, গোঁফওলা ঢিলেঢালা চেহারা, উদ্ধত সুরে টেনে টেনে সে বল্ল (এই ঔদ্ধত্যের সুর এত পরিচিত যে বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে উঠল রশচিন)ঃ

"এই, পুলের ওপরের তোমরা, ঘোড়া থেকে নেমে পাসটাস বার কর।...... দুই পর্যন্ত গোণার পর আমি গুলি চালাব।......"

মুখের এক কোণা থেকে দুন্দিচ বল্ল রশচিনকেঃ

"উপায় নেই, আক্রমণ করতেই হবে।"

বলে তলোয়ারে হাত দিতে যাচ্ছে, ঝট করে থামিয়ে দিল রশচিন।

"তেপ্লভ!" ঢেংগা অফিসারকে সম্বোধন করে রশচিন ডাকল। "তোমার মেশিনগানে আর কাজ নেই। আর কেউ নয়, আমি-- ভাদিম রশচিন . . ।"

ধীরে-সুস্থে মাটিতে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে ও এগিয়ে চল্ল পুল বরাবর। রশচিনের রেজিমেণ্টে এককালে যে ভাস্কা তেপ্লভ ছিল, অফিসারটা সেই তেপলভ। লোকটার হামবড়াইয়ের বাই আছে, তার ওপর আহাম্মক আর মাতাল; কুৎসিত ইংগিত করার জন্যে রশচিন ওকে একবার মারতেই উঠেছিল। চলন্ত রশচিনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে তেপলভ তার পিস্তলটা আবার আস্তে আস্তে খাপে ভরল।

"কি হে, চিনতে পারছ না ?. ..না কি নেশাটেশা করে এসেছ ? গুড মর্নিং, গুড মর্নিং দোস্ত!" বলে করমর্দন করল রশচিন, দস্তানা না খুলেই। "তা এখানে তুমি কি করছ ? ভুঁড়িদাস ভাল্লুকদের ব্রিগেড নিয়ে কি করবে হাঁদারাম ? এদ্দিনে তোমার একটা রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ড পাওয়া উচিত ছিল। . কি, আবার নামিয়ে দিয়েছে নাকি ? মাতলামির জন্যে নিশ্চয়!"

"অবাক কাণ্ড, ভাদিম রশচিনই তো বটে!" তেপ্লভ বল্ল। স্বরটা আধো আধো, কারণ ওর গোঁফের নীচে যেখানে সামনের দাঁত থাকার কথা, সেখানে দাঁত নেই, আছে শুধু একটা কালো ফুটো। চোখের নীচে নীল নীল গর্ত—কথা বলার সময় সেগুলো কাঁপে। "তুমি আসছ কোথা থেকে? আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ফৌজ ছেড়েই পালিয়েছ. ..."

"ধন্যবাদ!" বলে চোখ গরম ক'রে এমন কঠোর দৃষ্টি হানল রশচিন যে তেপ্লভ স্থির করে ফেল্ল, পালানোর কথা না তোলাই ভাল। "আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুব উঁচু তো!......এতদিন ওদেসা ছিলাম, গ্রিশিন-আল্মাজভের স্টাফে।......এখন একান্ন নম্বর রিজার্ভ রেজিমেণ্টে চীফ অফ স্টাফ। তাহলেও কাগজপত্র তো তোমার দেখতেই হবে, হবে না?" চ্যালেঞ্জের সুরে রশচিন ফের বল্ল। তারপর পাশ ফিরে ডাক দিলঃ "চলে এসো দুন্দিচ, ঘোড়ায় চড়েই চলে এসো.........।"

রাগের ভরে জোর নিশ্বাস টানল তেপ্লভ; কিন্তু তার বেশী কিছু নয়, রশচিনকে ও চিরকালই ভয় করে।

"কী যে বল!......আমার সঙ্গে আর ও রকম ঠাট্টা করে কথা বল কেন রশচিন?.........তা যাচ্ছ কোথায়?"

"জেনারেল শ্কুরোর কাছে। তোমাদের সাহায্যের জন্যে একটা রেজিমেণ্ট নিয়ে এসেছি আমরা। শুনলাম বুদিওনি নাকি তোমাদের বেশ ঘাবড়ে দিয়েছে...।"

"হ্যাঁ। এখানে সবই একেবারে হযবরল।.........যত বে-সামরিক লোক ছিল সকলকে জবরদস্তি যুদ্ধের কাজে ভর্তি করে এনেছে—যত সব পেন্সনওলা জেনারেল আর হতচ্ছাড়া সরকারী কর্মচারী। পাদ্রীগুলোকে পর্যন্ত ইউনিফর্ম পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে......।"

রশচিন তার সিগ্রেট কেস বার করল। আগের দিন শত্রু হেডকোয়ার্টারের মালগাড়ী থেকে বিদেশী সিগ্রেট দখল করা গিয়েছিল, এ সেই সিগ্রেট। সিগ্রেট জ্বালিয়ে গোঁফের ওপর দিয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ল তেপলভ।

"কী আশ্চর্য!" অবাক হয়ে ও বল্ল। "আসল বিদেশী সিগ্রেট! পেলে কোথায়? আমরা তো কাটা তামাক ছাড়া আর কিছু পাইনে—ওঃ তাতে যা বুক জ্বালা করে। আরও গোটা দুই দাও না ভাই, রেখে দেব।"

"মোটের ওপর অবস্থা টবস্থা কি রকম, বল তো ভাস্কা।"

"যাচ্ছেতাই.........একটা পয়সা নেই।.. .. আমার আর কিচ্ছু ভাল লাগে না।"

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামছে দুন্দিচ, চোখ পিট পিট করে সে দিকে চাইল তেপলভ। দুন্দিচের পেছনে তিনজন গোমড়াবদন সওয়ার, তাদেরও দেখে নিল। বল্লঃ "ভরোনেঝে ফুর্তি-টুর্তির আশা করবেন না, ও গুড়ে বালি। লাল শুয়োরগুলো সব একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়ে গেছে---না আছে একটা কাফে, না আছে বেশ্যাবাড়ী—বসবারই জায়গা নেই......"

"এসো, পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি কর্নেল দুন্দিচ," রশচিন বল্ল।

"ক্যাপ্টেন তেপ্লভ।"

স্যালুট করল দুজনে। দুন্দিচের কালো মুখ, চঞ্চল চোখ দুটি; মুখচোখ হাসিতে কুঁচকে সে বল্লঃ

"কী দুর্ভাগ্য! আমরা যে সত্যিই এক চোট ফুর্তির আশা ক'রে আছি...... তার জন্যে যা দরকার তাও আছে সঙ্গে........."

"তা গেরস্থ বাড়ীতে ছুঁড়িটুঁড়ি পাওয়া যায় অবিশ্যি। যুদ্ধের আগেকার ভদ্কাও পাবেন—এমন কি শ্যাম্পেনও লুকানো আছে চোরাকারবারীদের কাছে... এক বোতল পাঁচশো রুবল! বলুন তো কী লজ্জার কথা!"

ফুলো ফুলো পাতার নীচে তেপলভের সজল চোখ দুটো—ওর চোখে সব সময়ই জল পড়ে—সে দুটোতে বিক্ষোভের ভাব ফুটে উঠল। "এই সব মুনাফাখোরদের যা খাতির করেন মিলিটারি কর্তারা—মনে হয় যেন ওরা সব পীর-পয়গম্বর......পিতৃভূমির ত্রাণকর্তা! এই দেখ না, ক'দিন আগে তামবোভে

একটু মদটদ টেনেছিলাম কজনে......বিল যা হল, একেবারে অসম্ভব; আর দেবই বা কোথা থেকে, ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ; কি করি, দিলাম লোকটার নাকে এক ঘুষি, দিয়ে ব্যস কেটে পড়লাম। তারই জন্যে আমাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে।... এই রকম ক'রে ক'রে আমাদের ইউনিট টিউনিটের মনোবলই ভেঙে দিল, বুঝলে ভ্লাদিম। হাত্তেরি নিকুচি করেছে—আমরা জানটাই তো দিয়ে দিচ্ছি। যৌবন আর কদিন?......তা ছাড়া ভবিষ্যতেই বা কি আছে? বিধ্বস্ত মস্কোর ভাঙা ইঁট......আর অভাবের চূড়ান্ত।......তোমার আর কি, তুমি ইউনিভার্সিটি ফেরতা, কচুপোড়ার ইউনিফর্ম ছেড়ে তখন লেকচারার হবে, নয়তো অম্‌নি আর কিছু করবে।......কিন্তু আমার কপালে সেই পুরোনো একঘেয়ে ব্যবস্থা—ভাল মতো একটা আর্মিও আর রাখতে দেবে না তখন......"

"ক্যাপ্টেন, আপনার একটু মুখ বদলানো দরকার", দুন্দিচ বল্ল। "চলুন আমাদের সঙ্গে শহরে চলুন। এই ডেসপ্যাচটা কমান্ডার সাহেবের হাতে দিয়ে দিলেই ব্যস, তারপর সারা রাত আমাদের। শ্যাম্পেনের খরচ আমার......"

"হাত্তেরির কপাল!" বলে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে কান চুলকোতে লাগল তেপলভ। "হঠাৎ নিজের ঘাঁটি ছেড়ে কি ক'রে যাই......"

"আরে, তোমার সিনিয়র নন-কমিশণ্ড অফিসারের হাতে ভার দিয়ে যাও না," বল্ল রশচিন। "কমাণ্ড্যাণ্টকে না হয় বোলো যে, আমাদের তুমি বিশ্বাস করতে পারনি, ছদ্মবেশী রেড টহলদার বলে সন্দেহ করেছ। ওরা তখন আর কী করবে, বড় জোর আহাম্মক বলে গাল দেবে তোমাকে......"

নির্দন্ত মুখটা বিস্তার ক'রে হো হো শব্দে হাসল তেপলভ, চোখের জলও মুছল।

"খুব বলেছ ভাই! আরে আমি তো তোমাকে গ্রেপ্তারই করতে যাচ্ছিলাম..."

"যাচ্ছিলেই তো!"

"সার্জেণ্ট গুভজদেভ!" ট্রেঞ্চের দিকে মুখ ক'রে হাঁকল তেপলভ—এবার বেশ ফুর্তির সুর। ক্যাডেটরা তখন ট্রেঞ্চে ফিরে গেছে, বিরক্ত মনে মেশিনগানের পাশে বসে আছে। সেখান থেকে উঠে এল সার্জেণ্ট। আঠারো বছরের বাচ্চা, উদ্ধত নীল চোখ, কাঁধ আর কনুই সমান ক'রে একেবারে ফিটফাট কায়দায় স্যালুট দিল। ওকে কম্যাণ্ডের ভার বুঝিয়ে দিয়ে তেপলভ হাঁকল—আমার ঘোড়া নিয়ে এস।

শহরে যেতে যেতে তেপলভের সবুর আর সয় না—খালি ছটফট আর বকবক করে: ওদের যা যা খবর দরকার, সবই ওর কাছে পাওয়া গেল। ভরোনেঝে কতগুলো মিলিটারি ইউনিট আছে, কত আর্টিলারি আছে, আর্টিলারি বসেছে কোথায় কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

"ভয় স্রেফ ভয়, আর কিছু নয়।......ওরেলে কুতেপভ একটু বিপাকে

পড়েছেন বটে, কিন্তু তাতেই আমাদের এ'রা একেবারে কাপড়েচোপড়ে।...... আগে কিন্তু এরকম হত না।......তুষার অভিযানের কথা মনে আছে তো ভাদিম? কিন্তু আজকাল যেখানেই যাও শুনতে পাবে, 'আমাদের মনের জোর চলে গেছে।' হ্যাঁ, কিছু গেছে সত্যি, আগের জিওট আর নেই।......তা ছাড়া মুঝিকগুলোও একেবারে পাজির পাঝাড়া, কী করে তাকায়!......জেনারেল কুতেপভের কথাই ঠিক—কমান্ডার-ইন-চীফকে তিনি সাফ বলে দিয়েছিলেনঃ 'মস্কো দখল করতে পারা যায়, কিন্তু একটি শর্ত—চাষীদের ভূমি সংস্কার দিতে হবে, আর ফাঁসি দিতে হবে......।' একটি টেলিগ্রাফ পোস্টও যেন খালি না থাকে......গাঁ-কে গাঁ লটকে দিতে হবে একসঙ্গে—সেই পুগাচেভ-এর আমলের মতো।......যাকগে এসব কথা, বিরক্তি ধরে যায়। দুটি বোনের ঠিকানা আছে আমার কাছে—খাসা মেয়ে, কিছুতেই আর না করতে পারে না—তার ওপর গীটার বাজায়, মজলিসী গান গায়—দেখলে একেবারে পাগল হয়ে যাবে! আচ্ছা সোজা ওদের ওখানে গেলে হয় না?"

মনে হল তেপলভকে যেন সবাই চেনে—দু চারজন টহলদার যাদের সঙ্গে দেখা হল, তারা শুধু সেলাম দিল, দুন্দিচ বা রশচিনের দিকে একবার চাইলও না। বড় রাস্তার ওপর একটা হোটেল, তার লোহার দেউড়ির ধারে এসে তেপলভ নেমে পড়ল। পা ছড়াতে ছড়াতে সলজ্জভাবে বল্লঃ

"আমি আর বেশী নজরে পড়তে চাইনে, আপনাদের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করছি।......সদর দপ্তর তেতলায়।......বেশী দেরী করবেন না যেন......"

গোঁফওলা একজন কুবান কসাক—মুখময় বসন্তর দাগ—সে ছিল দরজার পাহারায়। চড়া সুরে তাকে ডেকে তেপলভ বল্লঃ "এই হাঁদারাম, এ'দের ভেতরে যেতে দাও!"

লোহার সিঁড়ি বেয়ে দুন্দিচ আর রশচিন ওপরে উঠে গেল। বুদিওনির খামে ঠিকানা লেখা ছিলঃ "মেজর জেনারেল শ্কুরো, ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।" শ্কুরোর কোনো এডজুটেন্ট মারফৎ চিঠিটা পাঠাবে এই ওদের ইচ্ছা। হোটেলের রেস্তোঁরা ঘরে অফিস, ঘরের জানলাগুলো নোংরা, শার্সিটার্সি সব ভেঙে গেছে। দুন্দিচ আর রশচিন অফিসের ভেতরে ঢুকেছে, তখনি আর একটি দরজা দিয়ে দুজন লোক ভেতরে এলেন—ওদের আগে। একজন বেশ লম্বা গোছের, শরীরের ওপরের অংশ বেশ মোটাসোটা, মুখে প্রচুর গোঁফ ও জুলফি—তবে এক ধরনের অমার্জিত সৌন্দর্যও আছে সে-মুখে। তাঁর বগলের তলায় লাঠি—তাইতে ভর দিয়ে দিয়ে হাঁটছেন, পাতলা গ্রেটকোটের কাপড়টা কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। ইনি মামন্তভ—রশচিন চিনতে পারল। অপর জনের গায়ে বাদামী রংয়ের সিরকাসিয়ান কুর্তা। তাঁর ফোলা ফোলা মুখ, উঁচু গালের হাড়, বড় বড় নাকের ফুটো, ওপর দিকে বাঁকানো নাক—চেহারার মধ্যে বেশ একটা পাশবিক ভাব। ইনিই শ্কুরো। ও'রা ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। অতিরিক্ত রকম ঢোলা ব্রীচেস পরা একজন ছোকরা স্টাফ অফিসার টেবিলে বসে সুন্দরী গোরী

টাইপিস্টকে লেখা ডিক্টেট করে যাচ্ছিল, টাইপিস্টের হাত দুটো ওঠানামা করছিল আণ্ডারউড টাইপারাইটারের কী-বোর্ডের গায়ে।

শ্‌কুরোকে দেখিয়ে দিয়ে রশচিন দুন্দিচকে শুধাল ঃ "এখন কি করা?" ঠিক সেই সময় মামন্তভ এদিকে ফিরেছিলেন, দুজন অপরিচিত অফিসার দেখে ভরাট গলায় ডাক দিলেন ঃ

"আপনারা এদিকে আসুন তো!"

সোজা এটেনশন হয়ে রশচিন দরজার ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। দুন্দিচ এগিয়ে গেল শ্‌কুরোর কাছে।

"মান্যবর জেনারেল সাহেব, আপনার নামে একটা ডেসপ্যাচ আছে।"

দুন্দিচের দিকে শ্‌কুরোর পেছন ফেরানো। তিনি আর ঘুরলেন না। মজবুত ঘাড়ের ওপর কলারের লেস একেবারে কেটে বসেছে—সেই ঘাড়টা শুধু বাড়িয়ে দিলেন। নেকড়ে বাঘের মতো ওপরের ঠোঁটটা তুলে ধরে, বার্তাবাহকের মুখ না দেখেই প্রশ্ন করলেন ঃ

"ডেসপ্যাচ কে পাঠিয়েছেন?"

"একান্ন নম্বরের রিজার্ভের কমাণ্ডার পাঠিয়েছেন। রেজিমেণ্টটা দনের দক্ষিণ তীরে এসে পৌঁছেছে, এখন আপনার আদেশ মতো কাজ করবে......"

"একান্ন নম্বর রেজিমেণ্ট—কখনো নাম শুনিনি তো", আগের মতোই অপ্রিয় সুরে বল্লেন শ্‌কুরো। তবে এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে থামটা হাতে নিলেন—দু হাতে ঘোরাতে লাগলেন। "রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কে?"

দরজার কাছে রশচিনের বুকটা যেন কেঁপে উঠল—গ্রেটকোটের পকেটে রিভলভারের হাতলটা চেপে ধরল তাড়াতাড়ি। না, সব গোলমাল হয়ে গেল—বড্ড বোকামি করা হয়েছে, কোনো কাজ হবে না।.... .অজানা, অচেনা কি না কি নাম বলে ফেলবে দুন্দিচ......অথচ কী আপশোষের কথা—কত দরকারী খবর বুদিওনিকে পৌঁছে দেওয়া যেত......

"একান্ন নম্বর রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কাউণ্ট চেম্বারতিন", বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করেই দুন্দিচ বলে দিল। শ্‌কুরোর পিত্তগ্রস্ত, ঘুম ঘুম চাহনির বিরুদ্ধে ওর সহাস্য দৃষ্টি যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। "আচ্ছা, আমরা তাহলে যেতে পারি জেনারেল সাহেব?"

"এক মিনিট দাঁড়ান কর্নেল।" বক্তা মামন্তভ—বগলের লাঠিতে আড়ষ্টভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন। "নামটা যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে, দেখি তো!" হঠাৎ ও'র মোটাসোটা সুন্দর মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল ঃ গত সপ্তাহে বুদিওনির আক্রমণ থেকে পালাবার সময় গুলী লেগে পায়ের একটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল—এখন লাঠিতে ঘুরতে গিয়ে তাতে ঘষা লেগেছে।......"উঃ!" বলে তিনি অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। 'বাপরে! আচ্ছা কর্নেল আপনি যান......'

স্যালুট বাজিয়ে ঝট করে ঘুরল দুন্দিচ, দরজার কাছে পৌঁছাল। রশচিন চেয়ে আছে, দেখছে মামন্তভের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে থামটা

ছিঁড়তে লাগলেন শুকুরো। মামুন্তভের মুখ তখনো যন্ত্রণায় বিকৃত। খামের ভেতর বুদিওনির সই-করা একটা চিঠি—দুন্দিচ, রশচিন দুজনেই জানে যে, তাতে লেখা আছে ঃ “২৪শে অক্টোবর সকাল ছ'টার সময় আমি ভরোনেঝ পৌঁছাইব। জেনারেল শুকুরো, আপনাকে আমি আদেশ দিতেছি যে ‘ক্রেসেণ্ট’-এর সম্মুখস্থিত চৌমাথায়—যেখানে আপনি শ্রমিকদিগকে ফাঁসিতে চড়াইয়াছিলেন—সেখানে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী সৈন্যের প্যারেড করাইবেন। আপনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্যারেড পরিচালনা করিবেন, ইহাই আমার আদেশ......”

লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ওরা দেখতে পেল রাইফেল কাঁধে এক সার ক্যাডেট ওপরে উঠছে—একজনের পিছনে আর একজন। এদিকে রশচিনের সামনে দুন্দিচ—বেঁটেখাটো মানুষটি, মাথা উঁচু করে নামছে, বুটের কাঁটা বাজছে টুংটুং টুংটুং। বড্ড আস্তে নামছে দুন্দিচ—রশচিন ভাবল।......কী দরকার এই হঠকারিতার? শুধু মূর্খতা!

ভাঙা ভাঙা গলার প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেল দোতলা থেকে।......দুন্দিচ আর রশচিন দেউড়ি দিয়ে বার হতেই ফুটপাথ ছেড়ে ধেয়ে এল তেপলভ; ঝুলে-পড়া গোঁফ শুদ্ধ ওর থলথলে মুখখানা যেন শ্যাম্পেন আর গান আর নারীদেহের আকাঙ্ক্ষায় সতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে।

“বাঁচা গেল, এসেছেন তাহলে আপনারা।......চলুন এবার......”

ওর ঘোড়াটা অস্থির। রেকাবে এক পা ঢুকিয়ে দিয়ে, ঘোড়ার পাশে পাশে লাফাতে লাফাতে চলেছে তেপলভ। রশচিন তখন ঘোড়ার পিঠে। সিগ্রেট কেস বার করে সিগ্রেট ধরাল দুন্দিচ—শুকনো বাদামী রংয়ের আঙ্গুলগুলো একটুখানি কাঁপছে। জ্বলন্ত কাঠিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লাতুগিনের কাছ থেকে লাগাম হাতে নিল, তারপর চড়া সুরে বল্ল ঃ

“বাঁ-দিকে প্রথম বাঁক—দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকাও।”

মাত্র দশখানা বাড়ীর পরই প্রথম বাঁক; খোয়ার ওপর ঘোড়ার ক্ষুর বাজাতে বাজাতে লাতুগিন, গাগিন আর জাদুইভিতেরই সবার আগে বাঁক ঘুরল। লাগাম কষতে কষতে চেঁচিয়ে উঠল তেপলভ ঃ

“আরে ওদিকে নয়—ডানদিকে, পরের বাঁকটা”

কিন্তু ওর ঘোড়া ওকে আর সবাইয়ের সঙ্গেই টেনে নিয়ে গেল। মোড় ঘোরার সময় পেছনে চেয়ে রশচিন দেখতে পেল—সেই ক্যাডেটগুলো হোটেলের দরজা দিয়ে ছুটে বেরুচ্ছে, রাইফেলের ‘লক’ খুলতে খুলতে তারা তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক চাইছে।

“আরে রশচিন, কি করছ ছাই?” বলে কাঁদো কাঁদো সুরে চেঁচিয়ে উঠল তেপলভ। ওর ঘোড়াও তখন আর সকলের সঙ্গে সমান তালে ছুটছে। তেপলভের ঘোড়ার একেবারে গা ঘেঁষে এসে ধাবমান অবস্থায়ই দুন্দিচ ওর কব্জিটা চেপে ধরল, তারপর একটানে ওর রিভলভারের দড়ি ছিঁড়ে ফেলে খাপ

থেকে টেনে বার করে নিল রিভলভারটা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ঘোড়া থেকে।

"শ্যাম্পেনের খরচ আমার," বলে হাঁকল দুন্দিচ—দু সারি দাঁত ঝকঝক ক'রে উঠল হাসিতে।

দুন্দিচ, রশাঁচিন, আর তিনজন সিপাহী—পাঁচজনেই এখন বাড়ীঘর, বেড়াটেড়া সব পার হয়ে আঁকাবাঁকা গলিপথ ধ'রে একেবারে উড়ে চলেছে—বুড়ো বুড়ো লাইম গাছের শুকনো ডালে ওদের টুপিগুলো আটকে যাচ্ছে, তবু পরোয়া নেই। গুলীর শব্দ আসছে ওদের পেছন থেকে। গতিবেগ একটুও না কমিয়ে ওরা মাঠ পার হল, তারপর পুলের কাছে এসে দুল্‌কি চাল ধরল। যখন পুলের মুখে পৌঁছেছে তখন একেবারে হাঁটা-কদম। ঘোড়ার ঘাড় থেকে বাষ্প উঠছে, ঘাড়টা চাপড়াতে চাপড়াতে দুন্দিচ ডাকল:

"সার্জেণ্ট গুভজদেভ!"

সার্জেণ্ট তার সিগ্রেটটা তাড়াতাড়ি আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে বাইরে এল। দুন্দিচ তাকে বল্ল: "কাপ্তেন তেপলভ আমাকে খবর দিয়ে যেতে বলেছেন যে, তিনি আধ ঘণ্টার ভেতর এখানে ফিরবেন। আমরা আবার ২৪ তারিখ সকাল বেলা আসছি—দেখবেন তখন যেন আর মেশিনগান-টান ও'চাবেন না।......"

"আচ্ছা স্যার!"

......পুলটা তখন ওদের অনেক পেছনে—ঘোড়াগুলোর গা-ময় সাদা ফেনা, চলতে হোঁচট খাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগে ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে দিতে দুন্দিচ রশাঁচিনকে সম্বোধন করল:

"আমি খুব লজ্জিত; আপনার কাছে, কমরেডদের কাছে, সবাইয়ের কাছে মাফ চাইছি। বাহাদুরী দেখানোর জন্য আমি নিজেই নিজেকে কতবার তিরস্কার করেছি।......বিপদ দেখলে যেন নেশা ধ'রে যায়, বুদ্ধিটুদ্ধি সব চোখা হয়ে ওঠে। নিজেকে তখন এত ভাল লাগে যে উদ্দেশ্যের কথা আর মনে থাকে না—দায়িত্বের ধারণাই যেন উপে যায়।...পরে অনুশোচনা করি......প্রত্যেকবার করি।... যদি এখন ঘোড়া থেকে নেমে আমাকেও ঠ্যাং ধ'রে টেনে নামান, বেশ ক'রে উত্তমমধ্যম লাগান, তাতে আমি কিচ্ছু মনে করব না, বরং শান্তিই পাব..."

ঘাড়টা হেলিয়ে প্রাণ খুলে হাসল রশাঁচিন—সারা দিনের মানসিক টানাটানির শেষে ওরও একটু ঢিলা দেওয়া দরকার।

"উত্তমমধ্যমই দেওয়া উচিত আপনাকে—বিশেষ ক'রে দরজার কাছে সেই সিগ্রেটের জন্যে।......"

বুদিওনির চালাকিটা ঠিক খেটে গেছে। অবিশ্বাস্য স্পর্ধার সঙ্গে চিঠিটা একেবারে হাতে দিয়ে গেল! চিঠি পড়ে মামন্তভ আর শুকুরোর দুজনেরই সে কী রাগ! এ রকম ভাবে চিঠি লেখা, কবে কখন ভরনেঝ দখল করবে তা স্থির করে দেওয়া—এ তো বড় সামান্য ভরসার কথা নয়। বোঝা যাচ্ছে যে, বুদিওনির

তাহলে যথেষ্ট ভরসা আছে। ব্যাপার দেখে দুই জেনারেলের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল।

দন আর কুবান বাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে বুদিওনিকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। বুদিওনি স্থির করেছেন যে তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে ওদের তিনটি কলামকেই পরপর প্রতি-আক্রমণ করবেন।

হোয়াইট অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্যে এরই ভিত্তিতে তিনি রণ-পরিকল্পনা রচনা করলেন। শত্রু কলামগুলি আক্রমণে দেরী করছে, গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মধ্যেই ওদের প্রচেষ্টা তখনো সীমাবদ্ধ। এবার যে ওরা আক্রমণে ধেয়ে আসবে, সে বিষয়ে বুদিওনির কোনো সন্দেহ নেই।

১৮ই অক্টোবর রাত্রিবেলা রেড টহলদারেরা রিপোর্ট দিল যে, শত্রু-শিবিরে গতিচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। রক্তাক্ত যুদ্ধের সময় তাহলে এসেছে। ডিভিশনাল কমান্ডারদের সঙ্গে নিয়ে ম্যাপের পাশে বসেছিলেন বুদিওনি, বল্লেনঃ "কপাল ভাল!" সমস্ত ডিভিশন, রেজিমেন্ট, স্কোয়াড্রন—সবাইকে আদেশ জানালেনঃ

"সওয়ার হো যাও!"

সর্বত্র টেলিফোন বাজছেঃ অন্ধকার কুটিরের ভেতর, পরিখা আর প্রান্তরের মাঝখানে—কোথাও ঘাসের গোলার মধ্যে, কোথাও বা ডালপালা, ঘাসপাতার আড়ালে। যে খবরের জন্যে সকলে প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করে ছিল, টেলিফোন রিসিভার মারফত সে খবর পৌঁছাল সিগন্যালওয়ালাদের কাছে। ঘোড়ার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্দালির দল, ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতেই রেকাব টেকাব গুছিয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাওয়ার বেগে উড়ে চল্ল। নিবাত নিষ্কম্প রাত্রি—অন্ধকার যেন শত্রু-কবরের মতো মুখব্যাদান করে আছে। সওয়ারেরা সকলে উর্দি পরেই ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভাঙল একটানা, লম্বা হাঁক শুনেঃ "সওয়ার হো যাও!" ঘুম-টুম ঝেড়ে ফেলে তারা ছুটলো ঘোড়ার লাইনে। জিন চড়িয়ে এমন কষে পেটি বাঁধল যে ঘোড়াগুলো কেঁপেই উঠল থর থর ক'রে।

অন্ধকারের মধ্যে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে হুকুমের হাঁক ছড়িয়ে পড়ে, সেই শব্দ অনুসরণ ক'রে ক'রে স্কোয়াড্রনগুলো মাঠের মধ্যে জমা হল। যুদ্ধের কায়দায় সার বেঁধে তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইল—ভোরের আলো কখন ফোটে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে। ঘোড়াগুলোর নিঃশ্বাসে তখনো ঘুমের আমেজ। সৈন্যদের গায়ে তুলো-ভরা জ্যাকেট, শীপ-স্কিন কোট, আর পাতলা গ্রেটকোট—সে সব ভেদ ক'রে কনকনে হাওয়া ঢুকছে। কারও মুখে কোনো শব্দ নেই। সিগ্রেটও জ্বালায় না কেউ।

তারপর দূর থেকে প্রথম গোলাগুলির শব্দ উঠল—গুড়গুড় গুড়গুড়। কমিসারদের হাঁক শোনা গেলঃ "কমরেড্‌স! সেমিয়ন মিখাইলোভিচ বুদিওনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে। বুর্জোয়াদের ভাড়াটেরা আজ মস্কো পৌঁছবার চেষ্টা করছে—ওদের নিকাশ কর! বিপ্লবী হাতিয়ারের মুখ উজ্জ্বল কর!"

মাটির ওপর কুয়াশা ছেয়ে আছে, তাই ভোর হলেও মাঠে আলো পৌঁছায় না। রেকাবে রেকাবে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে, ক্ষুরে ক্ষুরে বজ্রনাদ তুলে বুদিওনির আটটা রেজিমেণ্ট ছুটল তীরগতিতে—কয়েক মাইল লম্বা তাদের লাইন। কুয়াশা এত ঘন যে সওয়ারেরা শুধু দুপাশের দুজন কমরেডকে দেখতে পায়—আর সামনের ঘোড়াটার পাছা উঠছে নামছে সেটুকুও সাদাটে কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়ে তাদের চোখে পড়ে—ব্যাস্ আর কিছু নয়।

কাছেই শত্রু, ক্রমেই আরও কাছে আসছে। এলোমেলো গুলীর শব্দ তখন কানে পৌঁছে গেছে। আরও তেজে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে বুদিওনির সিপাহীরা আগ্রহে ঘাড় বাড়িয়ে দিল—শত্রুকে একবার দেখতেই হবে।......শেষকালে একটা চীৎকার উঠল—আক্রোশে আওয়াজে আর হিংস্রতায় বাড়তে বাড়তে সে শব্দ ছড়িয়ে গেল সমস্ত সৈন্যের মাঝখানে। সামনের সারির ওরা শত্রুর দেখা পেয়েছে।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল অশ্বারোহীদের ছায়ামূর্তি—কিন্তু তারা ঘোড়ার মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। দন কসাকরা তখন সাহস হারিয়ে ফেলেছে। ওরাও হাজারে হাজারে ছুটে এসেছিল শত্রুকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ওদের আপন আপন গ্রাম থেকে এত দূরে এই লাল শয়তানদের সঙ্গে তলোয়ারের মোকাবিলা!—স্বয়ং ইব্লিসই নিশ্চয় এই ফাঁদে টেনে এনেছে ওদের! দ্রুত ধাবমান বুদিওনি বাহিনীর পদভরে মেদিনী কাঁপছে, শব্দে শব্দে পৃথিবী ভরে উঠছে—তাই শুনে ওরা বুঝতে পারল যে, এই ভয়ঙ্কর শক্তির আসন্ন আঘাতে মানুষ, ঘোড়া সব পিষে যাবে, ঘূর্ণির মতো ঘুরতে ঘুরতে স্তূপাকার হয়ে উঠবে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।...আর কেনই বা এত সব? কসাকরা ঘোড়ার লাগাম কষল, তারপর ঘুরে গেল পেছন দিকে—তেজী দন ঘোড়ার সাহায্যে পার পেয়ে যাবে এই ওদের ভরসা।.. সবাই তাই করল; খালি জনকয়েক একেবারে বে-পরোয়া কসাক, উন্মত্ত দুঃসাহসে সোজা ছুটে গেল বুদিওনি সৈন্যের মাঝখানে—তলোয়ার চালাতে লাগল প্রাণপণ শক্তিতে।

কিন্তু দন ঘোড়াই কি আর সওয়ারদের বাঁচাতে পারে? যারা পেছন দিকে ঘুরেছিল তাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগল যারা সামনে আসছে তাদের।......সহযোদ্ধায় সহযোদ্ধায় ঠোকাঠুকি, মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কত লোক।......বুদিওনির সৈন্যেরা এসে কাউকে তলোয়ারের কোপ দিল, কাউকে পিষে ফেলল ঘোড়ার পায়ের তলায়, কাউকে বা ঠেলে নিয়ে চল্ল সামনের দিকে। .. ..উন্মাদ চীৎকার চারিদিকে......কুয়াশার মধ্যে চাইলেই দেখা যায় জোড়া জোড়া ঘোড়সওয়ার—প্রথম জন একেবারে ঘোড়ার কাঁধের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আর অপরজন তাকে ধরবার জন্যে পেছনে ছুটছে, জিনে ঠেস দিয়ে তলোয়ার গুছিয়ে নিচ্ছে হাতের মধ্যে, ধরতে পারলেই কোপ বসাবে।.. ..ঘোড়াগুলোও উন্মত্ত, কর্কশ স্বরে আওয়াজ করছে আর দাঁতের কাছে যা পাচ্ছে তাই কামড়াচ্ছে।

এতক্ষণে সবগুলো কসাক রেজিমেণ্টই পালানোর পথ ধরেছে। কিন্তু সে পথও বন্ধ; মেশিন-গানের গাড়ীগুলো ওদের পাশের দিকে অনেকখানি ভেতর

পর্যন্ত ঢুকে পড়ে ওদের এক পাশে ঠেলে দিল; আর সেই এলোমেলো বিশৃংখল কসাক দলগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন নতুন বুদিওনি স্কোয়াড্রন।

মামন্তভের ডিভিশন দুটোর পেছনে ধাওয়া চল্ল বেশ বেলা পর্যন্ত। নীল কসাক কুর্তা আর লাল ঢেঁড়া দেওয়া ঢোলা ব্রীচেস—এম্‌নি পোশাকের হাজার হাজার মৃতদেহ তখন মাঠের মধ্যে পড়ে আছে, আর তারই মাঝখানে আরোহী-হীন, আতংকিত ঘোড়াগুলো প্রাণপণে ছুটছে।

খাওয়ার সময় আসতে আসতে বুদিওনি সৈন্যদের বিরাট ক্যাম্প বসে গেছে মাঠের মধ্যে। শত্রুর হাত থেকে দখল করা বড় বড় তামার ডেকচি—খাঁটি তামা—তার চারপাশে কী ভিড়। নিত্যনৈমিত্তিক বাজরার মণ্ড আর শুয়োরের চর্বিই তাতে সেদ্ধ হচ্ছে বটে, কিন্তু আজ আবার তার সংগে আছে মাকারোনি আর চাল আর বীন্‌ আর কৌটোর মাংস, আর আরও কত কি—যাতেই রান্নার উন্নতি হবে বলে মনে হয়েছে তাই যোগ করেছে বাবুর্চিরা।

পেট ভ'রে খাওয়াদাওয়ার পর সিগ্রেট ধরিয়ে সিপাহীরা বসে বসে জাঁক করে—শত্রুর কাছ থেকে কে কি কেড়ে আনতে পেরেছে তারই জাঁক। কেউ এনেছে রুপোর হাতলওলা সওয়ার-তলোয়ার, কেউ জাপানী কার্বাইন-বন্দুক, কেউ বা আবার বাদামি রংয়ের দন-ঘোড়া, তার গায়ে সাদা সাদা ছিটে আর কপালে সুবিখ্যাত শ্বেত-তিলক।

যুদ্ধের উত্তেজনা কিন্তু কমে না, বেড়েই চলে। তারপর একর্ডিয়ন বাজতে শুরু করল চারিদিকে, গলায় গলায় গান উঠলঃ "মেঘ রে, মেঘ ঝুঁকেছে মাথার ওপর, মাঠে মাঠে কুহেলি......।" গানের ধুয়া ধরল আরও কত জন। মাঝে মাঝে দু' একজন নাচিয়ে এগিয়ে আসে, উঁচু হয়ে ব'সে প'ড়ে দ্রুত তালে গোড়ালি বাজায় মাটির ওপর, রাজহাঁসের পাখার মতো দু'বাহু ঝাপটায় বাতাসে। তালে তালে বালালাইকা বাজে, দর্শকেরা শিস দেয়।

কিন্তু শোনো! ঐ আবার বিউগ্‌ল বেজে উঠল—আবার এল যুদ্ধের ডাক, গুরুভার পরিশ্রমের আহ্বান। অশ্বারূঢ় বুদিওনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন দূর দিয়ে—তাঁর গায়ে কসাক আংগরাখা, মাথায় রুপালি আস্ত্রাখান টুপি। দুজন ডিভিশনাল কমাণ্ডারই ওঁর সংগে। আটটি রেজিমেণ্টই আবার দল বাঁধল, আটখানা লাল নিশান পত পত ক'রে উড়তে লাগল মাথার ওপর।

প্রথম কলামের এই দারুণ বিপর্যয়, তার ওপর মূল পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতা—কাজেই বুদিওনিকে ঘেরাও করার ইচ্ছা হোয়াইট পক্ষকে ত্যাগ করতে হ'ল। বুদিওনিও শত্রুপক্ষের অস্থিরতার সুযোগ নিলেন অবিলম্বে। পরদিন ভোরবেলা মামন্তভের দ্বিতীয় কলামের ওপর তাঁর সৈন্যরা চড়াও হল, আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দ্বিতীয় কলাম পিছু হটল রেল লাইনের দিকে। ভরোনেঝের পুলের ওপর দিয়ে ঝকঝক করতে করতে একটা সাঁজোয়া ট্রেন যাতায়াত করে, ওরা তার আশ্রয় নিল। গাড়ীর ইস্পাত বুরুজের নীচে ছ' ইঞ্চি কামান আর মেশিন গান—তার পাশে দাঁড়িয়ে আর্টিলারি অফিসারেরা অপসৃয়মান কুয়াশার

ভেতর দিয়ে সামনে দেখবার চেষ্টা করছে। সামনে লাইনের ওপর নিশান নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে এক এক জন সিগন্যালম্যান এসে দাঁড়ায়—ট্রেনটাও একটুখানি থেমে খবর জেনে নেয়। ওরা এইভাবেই খবর পেল যে, দ্বিতীয় কলামটার সংগীন অবস্থা, বুদিওনি সৈন্যদের ঠেলায় তারা রেল লাইন পর্যন্ত হটে এসেছে।

সাঁজোয়া গাড়ীতে স্পীড দিল। আকাশ বিদীর্ণ ক'রে কর্কশ হুইসিলটা অনবরত বাজছে—মামন্তভের সৈন্যদের কাছে আশ্বাস পাঠাচ্ছে যে, সাহায্য পৌঁছাতে আর দেরি নেই।

বুরুজের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বাইরে চাইতে চাইতে গোলন্দাজেরা দেখল, অস্পষ্ট আকৃতির কী একটা জিনিস যেন কুয়াশার ভেতর থেকে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে—সোজা সাঁজোয়া গাড়ী লক্ষ্য ক'রে। গাড়ীর স্পীড কমিয়ে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার, তারপর গাড়ী পেছন দিকে চালাল। ছায়ামূর্তিটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে—গোলন্দাজেরা তার ওপর কামান দাগতে শুরু করল। কিন্তু তখন আর কিছু হবার নয়। মালগাড়ীর একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন, ভেতরে লোকজন কেউ নেই, সেটা একেবারে পুরো দমে ছুটে এসে ধাক্কা লাগাল সাঁজোয়া ট্রেনের সংগে। মাল-ইঞ্জিনের সুমুখের অংশ আর তার দু' পাশ ডিনামাইট ঠাসা—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ডিনামাইট ফেটে উঠল, সাঁজোয়া ট্রেনের সামনের কামরাতে কামানের গোলাগুলোও ফেটে উঠল তৎক্ষণাৎ। কামরার সুমুখের দিকটা উঁচু হয়ে উঠল আকাশে—মাটি, বালি, ধোঁয়া আর বাষ্প মিলে মিশে সে এক মহা আবর্ত। তারপর ওলটপালট খেয়ে কামরাটা বাঁধের নীচের দিকে গড়িয়ে চল্ল, অজেয় লৌহ-কচ্ছপের সবখানিকেই টেনে নিয়ে চল্ল সংগে সংগে।

মামন্তভের দ্বিতীয় কলাম পালাল ভরোনেঝের দিকে। এ তো যুদ্ধ নয়, একেবারে অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ড। যুদ্ধ না করেই মামন্তভের তৃতীয় কলামও ভরোনেঝের দিকে সরে পড়ছিল, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের চতুর্থ দিনে তাকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হল। সে যুদ্ধের শেষে তৃতীয় কলাম একবারে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, চারপাশে মাঠ আর টিলার ওপর মাইলের পর মাইল জুড়ে খালি নিহত কসাকের মৃতদেহ।

ধ্বস্তবিধ্বস্ত দন আর কুবান ডিভিশনগুলোর মধ্যে কোনো কোনো রেজিমেণ্টে প্রায় অর্ধেক সৈন্যই খোয়া গেছে। এই অবস্থায় ওরা সব নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল। কিন্তু ২৪শে তারিখ ভোরবেলা বুদিওনির প্রধান বাহিনীও সেখানে এসে হাজির, ওদের অনুসরণ করে এসেছে। সেই যে কাঠের পুলটা—তেপলভের ক্যাডেট আর পাদ্রী ডিট্যাচমেণ্টের লোকেরা যে পুলের পাহারায় ছিল—সে পুলটা ওরা উড়িয়ে দেবার সময় পায়নি, ছেড়ে চলে গিয়েছিল।...... শহর থেকে কয়েকটা ব্যাটারি গোলা দাগছে, থামের মতো কাদা আর জল উঠছে নদী থেকে। ঘোড়ায় চড়ে পুলের কাছে এসে বুদিওনি দেখলেন যে পুলটা নেহাতই ফংগবেনে। রুপোর বিউগ্‌লওলাদের ডেকে পাঠিয়ে তিনি হুকুম

দিলেন—তোমরা ওপারে যাও, ওপারে গিয়ে রসাল, মনমাতানো গানের সুর যা জান খুব বাজাতে থাক—নাচের সুর, কুচকাওয়াজের সুর, সব। সঙ্গীত-শালার ছাত্রদের গায়ে তখনও সেই আগের পোশাক—লাল আর হলদে রংয়ের চুঙ্গী বসানো কুর্তা (কুর্তাগুলো গায়ে খাটো হয়ে গেছে)—তাই পরে তারা ছুট দিল পুলের ওপর দিয়ে। ওরা ওপারে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে গোলা পড়ল পুলের ওপর—পুল ফেটে চৌচির। ভয়ে আধমরা হয়ে ওরা সব ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো লাগিয়ে দিল রুপোর ট্রাম্পেটে। ওদিকে কামানের গর্জন চল্ল পাল্লা দিয়ে।

প্রত্যেক লাল সিপাহীকে একটা ক'রে গোলা দেওয়া হয়েছে, হাতে ক'রে ওপারে নিয়ে যাবে। "আগে বাড়ো" বলে হাঁক দিলেন কমান্ডার আর কমিসারের দল, ছুটতে ছুটতে সবার আগে গিয়ে জলে নামলেন। সে জল বরফের মতো ঠান্ডা—গোলার পর গোলার আঘাতে খালি আছড়ে আছড়ে উঠছে, টগবগ ক'রে বুদ্বুদ ফুটছে। মাঝ-নদীতে পৌঁছে সিপাইরা সব ঘোড়া থেকে পিছলে পিছলে জলে নামল, এক হাতে ঘোড়ার কেশর আর এক হাতে গোলাটা চেপে ধরে সাঁতরাতে লাগল। ক্রুদ্ধ জলরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কামানের ঘোড়াগুলো, নদীর খাতের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চল্ল কামানের গাড়ীটাড়ী সব। সিপাহীরা যখন ওপারে পৌঁছাল তখন গা দিয়ে জল ঝরছে, ঘোড়াগুলো সব ভিজে জবজবে, তবু সেই অবস্থায়ই তারা হিংস্র বেগে ছুটল ভরোনেঝ আক্রমণ করতে। কিন্তু এখানেও মামন্তভ আর শ্কুরোর ডিভিশন যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয়—তাড়াতাড়ি দন পার হয়ে কাস্তরনাইয়া-র দিকে প্রস্থান করেছে।

হোয়াইটদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বাহিনীকে এমনিভাবে ধ্বংস করা আর ভরোনেঝ দখল করা—নতুন রণনীতির বিরাট পরিকল্পনায় এ দুটি ছিল প্রাথমিক পর্ব। দক্ষিণ রণাঙ্গনের নতুন অধিনায়কমণ্ডলীই এ পরিকল্পনা রচনা করেছেন।

লাল রংয়ের কাগজে টাইপ ক'রে তাতে স্তালিনের দস্তখত লাগিয়ে পরিকল্পনার নকল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কমান্ডারদের কাছে—আর্মি, কোর, ডিভিশন, ব্রিগেড আর রেজিমেণ্টের কমান্ডাররা সবাই নকল পেয়েছেন।

দক্ষিণ রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি ইউনিটের সংগ্রামী কার্যক্রম সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি বিধিব্যবস্থা পর্যন্ত লিখে দেওয়া আছে—সে সব বিধিব্যবস্থা এমন ভাষায় লেখা যাতে মামুলি সিপাহীও পড়লে বুঝতে পারে। ওরেল আর ক্রমি জেলা থেকেই বিধিব্যবস্থা শুরু—সেখানে সার্গো অর্জনিকিদ্জের নেতৃত্বাধীন এক বিশেষ গ্রুপের আক্রমণের চোটে জেনারেল কুতেপভ পরিচালিত 'দেনিকিন গার্ড বাহিনী' পিছু হটছে (জেনারেল কুতেপভই এক সময় শপথ করেছিলেন যে, সকলের আগে মস্কো প্রবেশ করবেন)। ভরোনেঝ আর কাস্তরনাইয়া জেলার কার্যক্রম সম্পর্কেও এই পরিকল্পনাতে ব্যবস্থা করা আছে—বুদিওনিকে ভার দেওয়া হয়েছে যে, দন আর্মি আর ভলান্টিয়ার আর্মির সংযোগস্থলে হোয়াইটদের যুদ্ধসীমান্ত দ্বিধাবিভক্ত ক'রে ফেলে তাঁকে রস্তভ-

অন-দন শহর অধিকার করতে হবে—খনিমজুরপ্রধান শ্রমিক দনবাসের রন্ধ্রপথে রস্তভ যাওয়ার রাস্তা তখন উন্মুক্ত।

মনে হয়েছিল বলশেভিকদের দম বুঝি একেবারে ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তারাই এবার অসম্ভবকে সম্ভব করল: দুর্ভিক্ষ, টাইফাস মহামারী, চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ভাঙ্গন—এত সমস্ত সত্ত্বেও প্রবল প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত ক'রে তুল্ল। সীমাহীন প্রকাণ্ড রুশিয়া বাইরের দুনিয়ার কাছে তখনো এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতো: সে রুশিয়াকে গলা টিপে মারার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তারা ব্যর্থ করে দিল, চমৎকৃত করে দিল সমস্ত মানুষকে। পৃথিবীশুদ্ধ অবাক। হোটেলের অপরিচ্ছন্ন কামরায় বাক্স-পেঁটরা বেঁধে যাঁরা শুধু দৃঢ় বিশ্বাসে দিন গুণছিলেন যে, এবার নববর্ষের মধ্যেই ফরাসীরা নিশ্চয় মস্কো আসবে, আর তাদের সঙ্গে আসবে শ্যাম্পেন আর অয়স্টার,* এমন কি পার্মা এলাকার ভায়োলেট ফুলও আসতে পারে—তাঁরা একদম আশ্চর্য হয়ে গেছেন। 'ইয়োরোপাধিপতি'র দর্শন-প্রত্যাশী যে সব রুশিয়ান ভদ্রলোক এত দিন তাঁর কামরার বাইরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ণা দিতেন, কিন্তু 'নিয়মতান্ত্রিক রুশিয়া'টাকে প্রায় পকেটে পুরে ইদানীং যাঁরা সোজাই ঢুকতেন ক্লেমসোঁর অফিসে, তাঁরাও আশ্চর্য হয়ে গেছেন। ক্লেমসোঁর অফিসে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে খর্বকায় ন্যুব্জদেহ, পলিত-ভ্রূ ডিক্টেটর মহাশয় কুঞ্চিত ললাটে পরিকল্পনা আঁকেন কি ক'রে পৃথিবীময় শ্মশানের শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা যায়—অফিসে পূর্বোক্ত রুশিয়ান ভদ্রলোকেরা ইদানীং উন্নত মস্তকেই ভেতরে ঢুকতেন, ডিক্টেটর মশায় উঠে দাঁড়াবামাত্র তাঁর গ্রন্থিজীর্ণ আঙুলকটিকে উল্লাসভরে চেপে ধরতেন—কিন্তু তাঁরাও আজ অবাক হ'য়ে গেছেন। আর আন্তন ইভানোভিচ দেনিকিন—অন্য পাঁচজনের মতোই নশ্বর প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও যিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন যে, তিনি এক ভগবৎ-প্রেরিত মহানায়ক—শুক্রবার শুক্রবার তাস খেলার অভ্যাসও যিনি অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন—সেই দেনিকিন সাহেবই অবাক হয়েছেন সব চেয়ে বেশী।

রুশ জনগণের প্রেরণার উৎস কোথায় তাও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। লোকে ভেবেছিল, সর্বজনীন সুখ আর ন্যায়ানুগ সমাজব্যবস্থা—দুটি ধারণাই বুঝি মহাযুদ্ধের পাহাড়প্রমাণ মৃতদেহের নীচে চিরকালের মতো চাপা পড়ে গিয়েছে; কিন্তু তা নয়—সেই ধারণার বীজ যেন স্বর্গের উদ্যান থেকেই উড়ে এসেছিল রুশিয়ার বুকে—যে রুশিয়া যুদ্ধবিক্ষত আর দারিদ্র্যজীর্ণ, যে-রুশিয়ায় নিরক্ষর চাষীরা তখনো ডাইনী বুড়ী আর উড়ন্ত কার্পেট আর 'ইভান দি ফুল'-এর রূপকথা শুনে বেড়ায়, যে-রুশিয়ায় অন্ধ বুড়ো-বুড়ীরা তখনো 'বগাতির'-দের যুদ্ধ আর উৎসব আর পরিণয়ের মন্থর একটানা মহাকাব্য নিয়ে গাথা গেয়ে যায় সুর ক'রে ক'রে।

রুশ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ধারণাদুটি ঠিক ইস্পাতের ফলকের মতো

---

*সুখাদ্য শুক্তিবিশেষ

দৃঢ়তা আর নমনীয়তা অর্জন করল। ভাঙাচোরা, কর্মহীন কলকারখানার শ্রমিক সম্প্রদায় আর রূপকথা-বিলাসী কৃষকের দল—দুর্ভিক্ষ মহামারী আর অর্থনৈতিক সর্বনাশের সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই তারা তখন দেনিকিনের প্রথম শ্রেণীর বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছে, ধাওয়া ক'রে চলেছে তাদের পিছু পিছু: পেত্রোগ্রাদের প্রবেশপথেই যুদেনিচের বিদ্যুত-বাহিনী ওদের হাতে প্রতিরুদ্ধ, আঘাতের চোটে তারা পিছু হটছে এস্তোনিয়া মুখো; কোলচাকের বিরাট আর্মিকে ওরা ছত্রভঙ্গ ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে সাইবেরিয়ান তুষারের মাঝখানে, বন্দী করেছে 'সর্ব রুশিয়ার শাসনকর্তাকে', তারপর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে: সুদূর প্রাচ্যে জাপানীদের ওরা পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ওদের প্রেরণা দিচ্ছে লেনিনের ধ্যান-ধারণা—শুধুই ধ্যান-ধারণা, কারণ রুশিয়াতে তখন খাবারও কিছু নেই, পরারও কিছু নেই। তারই প্রেরণায় ওরা বিশ্বাস করেছে যে, ওদের শক্তি সারা পৃথিবীর চেয়েও বেশী; বিশ্বাস করেছে যে, দারিদ্র্য-জীর্ণ রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষের ওপর ওরা অদূর ভবিষ্যতেই এক ন্যায়ানুগ কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।

॥ কুড়ি ॥

কাতিয়ার মনে হয় যে, পাকস্থলিটা যেন ছোট্ট একটা থলির মতো এতটুকু হয়ে গেছেঃ এক ছটাক রুটি, এক টুকরো নোনা মাছ আর দু-এক চামচ সুপ—ব্যস এর বেশী আর ধরবে না। ঘাগরাগুলো নিয়েই মহা উৎপাত, খালি প'ড়ে প'ড়ে যায়—অথচ কোমরটা ঠিক ক'রে নেওয়ার মতো সময়ও নেই, সুতোও নেই। কিন্তু চোখ দুটো খুব বড় হয়ে উঠেছে—শরৎকালে মাত্রিয়োনার হাতে মাখন আর ময়দা খেয়ে খেয়ে যা সাইজ ছিল এখন তার ডবল।

ইস্কুলের ছেট ছোট মেয়েরা মাঝে মাঝে হঠাৎ ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, অনাহার-শীর্ণ মুখগুলি কুঞ্চিত ক'রে কাতিয়াকে বলেঃ

"কী সুন্দর তুমি, কাতিয়া মামী!"

কাতিয়ার সমগ্র জীবনই এখন ভবিষ্যতের হাতে, তাই ওদের কথা শুনে ওর খুব ভাল লাগে। অতীতের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, সেই ছোট্ট সবুজ দীপ্তির পান্না-বসানো হারটা, সেটা হারিয়ে গেছে অনেক দিন আগে—যখন ভ্লাদিমির্স্কোয়েতে থাকত তখনই। পুরানো আস্তাবলের গলিতে ভাঙাচোরা বাড়ীটার মধ্যে ওর প্রিয় ছায়ামূর্তিগুলি, তাদের কথাও এখন আর মনে পড়ে না। অভাব, অনাহার, শীত, যুদ্ধ—যন্ত্রণার পর যন্ত্রণাজর্জরিত একটা জাতির সমস্ত চিন্তা-বাসনা যে-ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত, কাতিয়ার মনে হত সে-ভবিষ্যৎ যেন এক প্রশস্ত রাজপথ—সূর্যকিরণে স্ফটিকের মতো ঝলমল করছে, দুধারে রয়েছে শ্যামল প্রান্তর আর কুহেলিবিলীন পুষ্করিণী, সূর্যের দিকে শাখা প্রসারিত ক'রে চারিপাশ ঘিরে রেখেছে অসংখ্য তরুগুচ্ছ। পথ চলে গেছে দূরে, নীলাভ শহরের দিকে—জটিল অথচ পরমসুন্দর সে শহরে সুখের সীমা নেই—সকল মানুষই সেখানে সুখ খুঁজে পাবে।

একদিন পড়ানোর সময় এই কথাটা তুল্ল কাতিয়া। রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনে গেল ছেলেমেয়ের দল। মেয়েরা একটু ভাবালু—ভবিষ্যতের পথটা সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে গেছে, সেখানে তারা প্রজাপতির পেছনে ছুটতে পারবে, তারার মতো ছোট্ট ছোট্ট ফুল তুলে গুছি বাঁধতে পারবে—ভেবে ওদের ভাল লাগে। কিন্তু ছেলেদের মন ভরে না—মাঠের ওপর দিয়ে সিগন্যাল আর পুল আর সুড়ঙ্গ পার হয়ে বিদ্যুতগতিতে ট্রেন ছুটবে, নয়তো কারখানায় কারখানায় প্রকাণ্ড চিমনি থেকে কী সুন্দর ধোঁয়া বেরুবে, সে সব কথা তো কাতিয়া বলেনি! তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ভবিষ্যতে শহরের রং নীলই হবে, ঘরবাড়ীর মাথা গিয়ে ঠেকবে সেই একেবারে আকাশের গায়ে, ট্রাম ছুটবে ঝড়ের মতো, পার্কে-পার্কে ঝুলবে দোলনা; আর দোকানও থাকবে—বিনা পয়সার রুটি আর সসেজ

পাওয়া যাবে সেখানে। “আইসক্রীম থাকবে না?”—কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু দেখা গেল যে, ছেলেমেয়েদের কেউই কখনো আইসক্রীমের স্বাদ পায়নি—কিংবা যদি পেয়েও থাকে তো সে এত ছেলেবেলায় যে কিছু মনে নেই।

শারীরিক শক্তি কাতিয়াকে এখন খুব হিসেব করেই খরচ করতে হয়। একদিন ভরা কলসী নিয়ে উঠোনে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথা ঘুরে মনে হল কলসীর ভার আর সইতে পারবে না—তাড়াতাড়ি কলসী নামিয়ে রেখে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সে যাই হোক, শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রোগ্রামটা আর অগ্রসর হয়নি এ একটা সৌভাগ্যের কথা : মস্কোতে লোকই নেই, দিনে দিনে খালি হয়ে যাচ্ছে, আর্বাত স্কোয়ার থেকে স্ত্রাস্ত্‌নয় স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটে গেলেও কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু যুদ্ধে তখন জিত হচ্ছে, ‘ইজ্‌ভেস্তিয়া’ কাগজে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সামরিক সাফল্যের সংবাদ বার হয়। কাস্তরনাইয়ার রন্ধ্রপথে লাল ফৌজ প্রশস্ত স্রোতের আকারে দনবাস এলাকায় প্রবেশ করছে, ওদিকে কৃষক বিদ্রোহের ঢেউ লেগে গিয়েছে হোয়াইটদের পশ্চাদ্ভাগে। যুদ্ধ আর দুর্ভোগ শেষ হতে আর দেরী নেই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাতিয়া ঘরে বসে আছে। আটটা বেজে গেছে তবু রাত্রের আলো জ্বালেনি—জ্বলন্ত ‘ভোমরা’-র আধ-খোলা মুখ থেকে যা আলো আসছে তাই যথেষ্ট। নীচু টুলে বসে বেশ সাবধানে পাতলা কাঠের টুকরো উনুনে ফেলছে কাতিয়া—খাসা পটাপট শব্দে দপ ক’রে জ্বলে উঠছে টুকরোগুলো। পড়াবার সময় ছেলেমেয়েদের কাছে ও যে সৌরশক্তির কথা বলেছিল, টুকরোগুলো যখন সেই শক্তি দিয়েই গড়া, তখন অমনধারা জ্বলবে বৈকি।

বসে বসে কাতিয়া দস্তএভ্‌স্কি-র ‘ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট’ বইটা পড়ছে। উঃ, তখনকার দিনে মানুষের জীবনে কি কোনো আশাই ছিল না? বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজে আগুনের শিখার পানে চেয়ে থাকে কাতিয়া। ‘বল্‌শয় প্রসপেক্ত’ রাস্তার ওপর কাঠের তৈরী রেস্তোরাঁটাতে স্বিদ্রিগেইলভ যে-রাত কাটাল, কী ভীষণ সে রাত! ঠিক ঐ রেস্তোরাঁতেই কাতিয়াও একবার গিয়েছিল—শুধু একবার মাত্র—বেসোনভের সঙ্গে। হয়তো সেই একই ঘরে—যে-ঘরে বসে-বসে আশাহীন দীর্ঘসূত্রতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিল স্বিদ্রিগেইলভ, আর মনে মনে জেনেছিল যে, জীবনের প্রতি আতঙ্ক আর বিরক্তি ও কোনোদিন জয় করতে পারবে না।

সে অভিশাপ আজ চূর্ণবিচূর্ণ—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। আজ মানুষ নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে অতীতের কাহিনী পড়ে যেতে পারে, আগুনে কাঠের টুকরো ফেলতে ফেলতে বিশ্বাস রাখতে পারে যে সুখ আসবে।

বেতালা পায়ের শব্দ এল গলিপথ থেকে—মাস্‌লভের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে আরও লোক এল বোধ হয়। আজকাল রাত্রিবেলা নানান ধরনের লোক আসে মাসলভের কাছে, তাদের ক্রুদ্ধ বাগবিতণ্ডার শব্দ কাতিয়ার ঘরেও পোঁছায়। অভ্যাগতদের রান্নাঘর পর্যন্ত বিদায় ক’রে দিয়ে মাসলভ একবার কাতিয়ার দরজায়

আসবেই—যত রাত্রিই হোক ধীরে ধীরে কড়া নেড়ে বলবেঃ

"এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছেন? আপনি আধুনিক মহিলা......এত সকাল, সকাল শুতে লজ্জা করে না?......ছি, ছি!"

দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে কড়া নেড়েই চলেছে, রাগে কাতিয়া একেবারে কেঁপে ওঠে। কিন্তু মহা একগুঁয়ে লোক মাসলভ, তার ওপর আবার আত্মম্ভরি—হয়তো সকাল পর্যন্তই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়বে।

"একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভ্‌না, আমি শুধু আপনার উনুনের ধারে চুপচাপ বসে থাকব......আমার নাড়ীটাড়ী যেন সব ছিঁড়ে যাচ্ছে।......লক্ষ্মী কমরেড, দরজাটা খুলুন।......"

এ অবস্থায় সাড়া না দেওয়া অসম্ভব, তাই শেষ পর্যন্ত দরজা খুলতেই হয় কাতিয়াকে। মাসলভ এসে বসে 'ভোমরা'-টার সামনে, কাঠের পর কাঠ গুঁজে দিতে থাকে উনুনের মধ্যে—যদিও এক একখানা কাঠ প্রায় সোনার মতোই দামী। রহস্যময় ঢংয়ে মুচকি হাসতে হাসতে সরু সরু হাত দু'খানা তপ্ত লোহার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা এক লম্বা বক্তৃতা শুরু করে দেয়—যৌন আকর্ষণের মহাজাগতিক শক্তি সে বক্তৃতার বিষয়বস্তু।......এই যৌন আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করাই নাকি রূপের অর্থ, ও ছাড়া আর যা সে সবই জঘন্য শুচিবায়ু। তা ছাড়া কাতিয়া সুন্দরী, তায় একাকিনী; তার ওপর মাসলভের ভাষা অনুসারে, 'ভাড়াটের অসুবিধাও তার নেই।' মাসলভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শীগ্গিরই একদিন কাতিয়া তাকে বিছানার মধ্যে স্থান দেবে।. ....

একদিন সন্ধ্যাবেলা মাথায় দস্তএভ্‌স্কি বোঝাই ক'রে কাতিয়া বসে আছে কিন্তু মাসলভের ঘর থেকে ভেসে আসা একঘেয়ে আলাপ-আলোচনার শব্দ আর কিছুতেই ঠেকাতে পারে না। কখনো প্রচণ্ড রাগের শব্দ শুনতে পায়, কখনো জিনিষপত্র পড়ার আওয়াজ আসে, মনে হয় কে বুঝি বইটই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সান্ত্বনার জন্যে মাসল্‌ভ আজ আবার ওর দরজার সামনে আসবে নিশ্চয়।

দরজায় ঘড় ঘড় শব্দ হল, চাবি লাগানোর ফুটো দিয়ে কচি গলায় কে ডাকল, "কাতিয়া মাসী, ঘরে আছেন?" ক্লাভ্‌দিয়া এসেছে—পায়ে ইয়া বড় বড় ফেল্টের বুট, দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

"চেসনোকভা আপনাকে আসতে বল্লেন—যুদ্ধের এলাকা থেকে রশ্‌চিন সাহেব এসেছেন ওঁদের ওখানে।"

"বাইরে কি খুব ঠাণ্ডা"

"ভীষণ ঠাণ্ডা। এমন জোর বাতাস, চোখ যেন আর চাওয়াই যায় না। বরফ পড়লে বাঁচতাম, কিন্তু তা কি আর পড়বে?......এমন ধারা আজব শীত আর দেখিনি! কাতিয়া মাসী, আপনার ঘরটা তো বেশ গরম?"

এই ঠাণ্ডায় বেরিয়ে সেই প্রেস্‌নিয়া এলাকায় চেসনোকভা-র বাসা পর্যন্ত নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না কাতিয়ার; কিন্তু মাঝরাতে মাসলভের বক্তৃতা অবশ্যম্ভাবী, তাতে আরও কষ্ট। কোট পরে মাথায়

ওপর একটা গরম শাল চড়িয়ে ক্লাভ্‌দিয়ার সঙ্গে ও বেরিয়ে পড়ল, সাবধানে পা টিপে টিপে, যাতে মাসলভ না টের পায়। অন্ধকার গলি-রাস্তা থেকে রাতের হাওয়া ধেয়ে আসে, শালের কোণা দিয়ে তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে ঢেকে নিল কাতিয়া। মুখের ওপর ধুলো বিঁধছে ছুঁচের মতো, বাড়ীর ছাতে আলগা টিনগুলো ঝড়াং ঝড়াং আওয়াজ করছে। গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ শব্দে ঝোড়ো হাওয়ার কী আর্তনাদ—মনে হয় যেন কাতিয়া আর ক্লাভ্‌দিয়াই পৃথিবীর শেষ প্রাণী, যেখানে যা ছিল, সব যেন মরে গেছে, পৃথিবীর ওপর সূর্য আর উঠবে না কোনো দিন......

একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ীর জানলায় ম্লান আলো পড়েছে, হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে কাতিয়া সেখানে দাঁড়াল—একটু জিরিয়ে নেবে। জানলায় পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল—ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের ছড়াছড়ি, অগ্নিকুণ্ডের গা থেকে সমকোণ ক'রে একটা কালো পাইপ বেরিয়ে এসেছে, ঘরের মাঝখানে একটা 'ভোমরার' আলো দেখা যাচ্ছে, আর তার চারপাশে আরাম-কেদারায় বসে রয়েছে কয়েকজন লোক। লোকগুলির সামনে খাঁদা নাকটা ইয়া উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে একজন যুবক, একটা নোটবই থেকে কি যেন পড়ছে—হাতের ওপর মাথা হেলিয়ে বসে বসে শুনছে সবাই। যুবকের জীর্ণ কোটটা বুকের কাছে খোলা, পায়ে ফেল্টের বুট জোড়া ঠিক ক্লাভ্‌দিয়ার মতো, পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ও যে রকম ভাবভঙ্গি করছে, ঘন চুলওলা উস্কোখুস্কো মাথাটা যে রকম রোমান্টিক কায়দায় পেছনে হেলাচ্ছে তাতে কাতিয়া বুঝতে পারল যে সে কবিতা পড়ছে। সহানুভূতিতে উষ্ণ হয়ে উঠল কাতিয়ার হৃদয়, মৃদু হেসে ও আবার হাওয়ার দিকে মুখ ফেরাল—তারপর ক্লাভদিয়াকে শালের নীচে নিয়েই ছুটল আর্বাত স্ট্রীটের দিকে।

চেসনোকভার ঘরে অনেক লোক। বেশীর ভাগই যুদ্ধরত প্রবাসী শ্রমিকদের স্ত্রী। কিন্তু বুড়ো মানুষও আছেন দু চার জন—টেবিলের ধারে সম্মানের জায়গায় তাঁদের বসানো হয়েছে। নবাগত লোকটি মিলিটারি ব্যাপারস্যাপার সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। যখন কাতিয়া এল, উপস্থিত সবাই তখন তাঁকে প্রশ্ন ক'রে চলেছে, একজন শেষ না করতেই আরেকজন: আচ্ছা, রুটি পাওয়ার কষ্ট কি শীগ্গিরই দূর হবে? বড় দিন নাগাত মস্কোর শহরে কাঠের চালান আসবে বলে কি আশা করা যায়? ইউনিটের লোকেরা ফেল্টবুট পায় তো? শীপস্কিন কোট? তারপর স্বামী বা ভাইয়ের নাম ক'রে ক'রে প্রশ্ন—তারা বেঁচে আছে তো? যত যুদ্ধক্ষেত্রে যত হাজার হাজার শ্রমিক লড়াই করছে, নবাগত মিলিটারি অফিসার যেন তাদের সবারই নাম জানেন!

ভিড় ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকতে না পেরে কাতিয়া গলিপথেই দাঁড়িয়ে ছিল। ডিং মেরে দেখতে পেল যে আগন্তুকেব মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, মাথা ঝুঁকিয়ে একটা কাগজে কি যেন লিখতে যাচ্ছেন।

"কমরেড্‌স, আর কোনো প্রশ্ন আছে?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। শুনবামাত্র কেঁপে উঠল কাতিয়া—এই শান্ত, পরুষ কণ্ঠ যেন ওর অস্তিত্বের

অন্তরেই প্রবেশ করেছে, বিদীর্ণ করে দিয়েছে হৃদয়টাকে। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, ভাবল চলে যাবে। কিছুই তাহলে ভুলতে পারেনি! এই স্বর তো সেই প্রিয় স্বরেরই মতো—যে স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে—আজ এই স্বরই আবার ওর অতীত শোকটাকে জাগিয়ে তুল্ল, ফিরিয়ে আনল সেই আগেকার নিরর্থক যন্ত্রণা। ......নিঃসংগ মানুষের কাছে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এমনি করেই ফিরে আসে বহু-বিস্মৃত কত স্মৃতি; মানুষ চোখের সামনে দেখেঃ বনের মধ্যে নিভন্ত অংগারের আলোয় আলোকিত আশ্চর্য এক কুটির, আর অংগারের পাশে বসে হাসছেন তার স্বর্গতা জননী—যেমন হাসতেন সুদূর শৈশবের দিনে। হাত বাড়িয়ে ও তাঁকে ধরতে চায়, ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চায় জীবনের মাঝখানে, কিন্তু ছুঁতে পারে না— নীরবে বসে বসে মা শুধু হাসেন; তখন বোঝে যে এ শুধু স্বপ্ন—অম্‌নি মনের গভীর থেকে চোখের জল বেরিয়ে আসে, নিদ্রিত মানুষের বুকটা যেন উথালপাথাল করতে থাকে।

কাতিয়ার মুখের ভাবে কী যেন দেখে দরজার ধারে একজন স্ত্রীলোক বলে উঠলঃ

"ওগো, তোমরা দিদিমণির জন্যে একটু পথ ক'রে দাও, আমাদের চাপ উনি সইতে পারছেন না।......"

ওরা কাতিয়াকে ঘরে যাবার পথ করে দিল। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে টেবিলের ধারে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি মাথা তুল্লেন, তাঁর গম্ভীর মুখটা দেখতে পেল কাতিয়া। মানুষটির বিস্ফারিত কালো চোখে আনন্দের আলো তখনো ফুটতে পায়নি, তার আগেই কাতিয়া একেবারে থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ওর মাথা ঘুরছে, মনের মধ্যে সব কিছু এলোমেলো হয়ে আসছে—মনে হচ্ছে ঘরের ভেতরকার কলরবটা যেন বহু দূরে, আর আলোটা যেন অন্ধকার অন্ধকার—ঠিক সেই কলসী নিয়ে সেদিন যেমন হয়েছিল তেমনই।......ঠোঁটে দোষীর মতো মৃদু হাসি, শ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে, হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এল মুখটা, মূর্ছিত হয়ে পড়ল কাতিয়া।......

"কাতিয়া!" বলে চীৎকার ক'রে উঠলেন নবাগত মানুষটি। লোকের ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে পথ করতে করতে ডাকলেন, "কাতিয়া!"

কাতিয়াকে ওরা পড়তে দেয়নি, চারিদিক থেকে হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেলেছিল। ওর পতনোন্মুখ মুখখানিকে দু হাতের মধ্যে রাখল ভাদিম—ঠাণ্ডা হিম আধখোলা মুখখানি, চোখের পাতার নীচে তারাদুটি ঊর্ধ্বপানে চেয়ে আছে—কী মধুর, কত প্রিয়।

"আমার স্ত্রী, কমরেড্‌স, ইনি আমার স্ত্রী," ভাদিম বারবার বলে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে।......

ঝোড়ো হাওয়া পেছনে নিয়ে ওরা পথ বেয়ে চলে। কাতিয়ার ক্ষীণ স্কন্ধে হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে ভাদিম। সারাটা পথ কাতিয়া খালি

কাঁদে, তবে থামেও ঘন ঘন, থেমে থেমে ওকে চুম্বন করে। পুরো এক বছর ধরে রুশিয়ার সর্বত্র ভাদিম কাতিয়াকে খুঁজে বেড়িয়েছে, তবু ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সে বেঁচে নেই—এর কারণ কি সেকথা ভাদিম কাতিয়াকে বোঝাতে আরম্ভ করল। কিন্তু মহা গোলমেলে আর লম্বা সে কাহিনী—এই মুহূর্তে তার দরকারও নেই এতটুকু। 'দাঁড়াও. দাঁড়াও, এ রাস্তা তো নয়!" বলে কাতিয়া মাঝে মাঝে হেঁকে ওঠে. তারপর উল্টো দিকে ঘুরে অন্ধকার, জনশূন্য গলিঘুঁজি ধরে ওরা আবার চলতে থাকে। সে-সব রাস্তায় বাড়ীর চিমনীর ওপর জংধরা বায়ুযন্ত্রগুলো ক্যাঁচকোঁচ করে, আধ-ভাঙ্গা টিন থেকে ঢংঢং শব্দ হয়। জীর্ণ বেড়ার ওপারে বুড়ো লাইম গাছের শাখাগুলি হাওয়ায় দোলে। ঠিক এমনি ধারা আর এক রাত্রে দুঃস্বপ্নগ্রস্ত নিকোলাই গোগোল যেদিন কোটের প্রান্ত বাতাসে উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা দিয়ে ছুটেছিলেন, সেদিনও হয়তো এই বুড়ো লাইম গাছটা বসে বসে দেখেছিল।

'পুরোনো আস্তাবলের গলি'তে পৌঁছালে কাতিয়া বল্লঃ

"এই আমাদের বাসা—মনে আছে তোমার? না. তুমি তো সব সময় সদর দরজা দিয়েই আসতে। জান ভাদিম. আমি সেই আগের ঘরটাতেই আছি।"

ছোট্ট উঠোনটা ওরা তাড়াতাড়ি পার হ'ল। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ।

"কী আপদ! এখন আবার দরজা ধাক্কাতে হবে।......লাগাও, যত জোরে পার ধাক্কা লাগাও।"

হো হো করে হাসল কাতিয়া. তারপর একটু কাঁদল, ভাদিমকে চুমু দিয়ে আবার হাসল। দরজার ওপর দমাদম কিল মারতে শুরু করল ভাদিম।

"কে?" দরজার ওধার থেকে উদ্বিগ্নভাবে শুধাল মাসলভ।

"দরজা খুলুন, আমি কাতিয়া।"

মাসলভ দরজা খুল্ল। কাঁচের চিমনি দেওয়া টিনের আলোটা ওর হাতে, হাতটা কাঁপছে। কাতিয়ার পেছনে একজন মিলিটারি পুরুষ দেখে ও চমকে পিছু হটল—গালটা কুঁচকে রেখা ফুটে উঠল লম্বালম্বি, ঘৃণায় চোখ দুটো ছোট হয়ে এল।

"ধন্যবাদ" বলে নিজের ঘরের দিকে ছুটল কাতিয়া—ভাদিমের হাত হাতেই ধরে আছে। ঘরে যখন ঢুকল তখনও উষ্ণতার রেশ রয়েছে ঘরের মধ্যে।

"তোমার কাছে দেশলাই আছে?" ফিসফিস করে কাতিয়া বল্ল।

"আছে", জবাব দিল ভাদিম। উত্তেজনায় ওর স্বরও একেবারে চাপা।

কাতিয়া আলো জ্বালল—খালি টিনের মধ্যে সামান্য একটু শিখা—কিন্তু সারা রাত পরস্পরের পানে চেয়ে থাকবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। শালটা খুলতে খুলতে ভাদিমের দিক থেকে একবারও চোখ ফেরায়নি কাতিয়াঃ ভাদিমের চুল একেবারে সাদা, কয়েকটা ভুরু পর্যন্ত পেকে গেছে; মুখের চেহারা আগের চেয়েও পুরুষত্বব্যঞ্জক—তাতে এমন একটা সুকঠোর প্রশান্তির ভাব এসেছে, যা ওর কাছে নতুন ঠেকল, খুব ভালও লাগল। রুস্তভে থাকতে যে ভাদিমের কথা ওর মনে

আছে, এ যেন তার চেয়েও তরুণ, তার চেয়েও সাহসী, তার চেয়েও সুন্দর। ওর ব্যাণ্ডেজের ওপর চোখ পড়াতে ঠোঁটদুটি ঈষৎ ফাঁক করে কাতিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল ঃ

"তুমি কি চোট পেয়েছ?"

"কিছু না, সামান্য একটু ছড়ে গেছে।......কিন্তু এরই কল্যাণে মস্কোয় আসার ছুটি পেলাম চোদ্দ দিন।.. ...তুমি এখানে আছ তা জানতাম।......কিন্তু খুঁজে বার করতাম কি করে?" (আনন্দের হাসি হাসল কাতিয়া, তবে তার মধ্যে একটু দুষ্টুমির ভাবও ছিল—তাই ঠোঁটের কোণা দুটি উঁচু হয়ে উঠল।)

"সেই গ্রামটাতে তোমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম, বুঝলে?......ক্রাসিলনিকোভের পিছু পিছু ধাওয়া করছিলাম তখন।......তাকে আমি মেরে ফেলেছি, কাতিয়া।" (চোখ নামাল কাতিয়া, মাথাটা ঝুলে পড়ল।) "আমি মরে গেছি বলে তোমার কাছে খবর পেঁছাল, তার কারণটাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম...... বাস্তবিক পক্ষে আমি মরেই গিয়েছিলাম।..... " (সশঙ্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল কাতিয়া, বড় বড় চোখদুটি আবার জলে ভরে উঠল।) "একদিন রাত্রে ট্রেনে যেতে যেতে বেঁচে থাকার আর কোনো উদ্দেশ্যই খুঁজে পেলাম না; জীবনে যা সবচেয়ে বড় তাইতেই যখন ভুল করে বসে আছি, তখন মরতেই হবে তা বেশ বুঝতে পারলাম—হয় যুদ্ধে মারা পড়ব না হয় আত্মহত্যা করব। মাফ করো কাতিয়া, যা বলতে যাচ্ছি সেকথা বলা খুবই কষ্ট, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে বলতেই হবে. .. .শুধু তোমার কথা, তোমার চিন্তা—না না ভালবাসা নয়, সেদিন আমার মনে ভালবাসা ছিল না, শুধু এই চিন্তা ছিল যে, তুমি এমন একটা জিনিস যা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না, দূরে ঠেলে ফেলে ভুলে যাওয়া যায় না, যার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না--শুধু এই চিন্তাই সেদিন আমাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।......সেদিনই সেই ট্রেনের কামরায় আমার ভেতরকার সমস্ত কিছুই যেন মরে গিয়েছিল।......বন্দুকের মাছির ওপর দিয়ে আজ যখন পরিচিত মুখগুলো নজরে আসে তখন বুঝতে পারি যে, যাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছি —কী কালো, কী শূন্য তাদের আত্মা।. . ."

ওর কাঁধে হাত দিয়ে দ্রুত ধাবমান হৃৎপিণ্ডের ওপর নিজের গালটি চেপে ধরল কাতিয়া। দুজনে তখনো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে—ভাদিমের গায়ে গ্রেটকোট, বোতাম খোলা, আর কাতিয়ার গায়ে তার ওভারকোট। ভাদিমের কাছে যে কথার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, সেকথাই সে বলছে—বুঝতে পারল কাতিয়া। কী অপূর্ব, কী সুন্দর এই মানুষটি! কাতিয়ার চোখের সামনে নিজের যথার্থ স্বরূপ নিয়ে দাঁড়াবার জন্যেই সে সবচেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, নিজের মধ্যে যা সাচ্চা আর নতুন, যা সুকঠোর আর আবেগময় তাই যাতে কাতিয়া ভালবাসতে পারে, সে-জন্যেই সে উদগ্রীব......হঠাৎ উন্মত্ততার ঝোঁকে ভাদিম যেদিন ওকে রস্তভে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেদিনই কাতিয়া জানত যে, সে প্রচণ্ড ব্যথা পাবে, তারপর একদিন সবই বুঝতে পারবে। ভাদিমের বুকের কাছে ঘন হয়ে এসে

তার কথা শুনতে লাগল কাতিয়া—এলোমেলো, ছাড়া ছাড়া কথা—মনে হয় যেন ওর আত্মার প্রাণান্ত যন্ত্রণার কথাই সঙ্কেত-লিপিতে তাড়াতাড়ি লিখে চলেছে...... কিন্তু কথা না বল্লেই কি কাতিয়া বুঝত না?......

“আমাদের একাজের একেবারে সীমা নেই কাতিয়া। এ কর্তব্য আমরাই পূর্ণ করব তা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।......মনে আছে এ নিয়ে আমরা কত আলোচনা করেছি? ইতিহাসের ঘূর্ণিপাক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভ্যতার অধঃপতন—মূল আকৃতির ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে এক একটা আইডীয়ার সকরুণ রূপান্তর—আমরা ভেবেছি এ সবই একেবারে নিরর্থক। ধোপদস্ত জামার নীচে লোমশ বুকটা সেই আদিম মানুষেরই! সব, সব মিথ্যে! আজ আমাদের চোখ থেকে ঠুলি খসে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের অতীত জীবনের সমস্তটাই শুধু পাপ, শুধু মিথ্য কথা। রুশিয়া দেশ নতুন মানুষের জন্ম দিয়েছিল। সে মানুষ দাবী করল যে, সকল মানুষের জন্যে মানুষের অধিকার চাই। স্বপ্ন নয়, এ এক মহা-ধারণা, এই ধারণাকেই বয়ে নিয়ে চলেছি আমাদের সঙ্গীণের মুখে, একে বাস্তব রূপ দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব।......বহু শতাব্দীর বিধ্বস্তপ্রায় পাতালকক্ষে আজ প্রচণ্ড আলোর দীপ্তি......সবই এখন স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত......লক্ষ্য কি তা খুঁজে পাওয়া গেছে......লাল ফৌজের প্রতিটি সিপাহী সে লক্ষ্যের কথা জানে।......এবার আমার কথা বুঝতে পারছ কাতিয়া? আমার যা কিছু আছে সবই তুমি নাও এই আমি চাই কাতিয়া......তুমি আমার আনন্দ, আমার হৃদয়, আমার ধ্রুবতারা আর ভালবাসার ধন......”

হঠাৎ এত জোরে জড়িয়ে ধরল কাতিয়াকে, মনে হ'ল তার ভঙ্গুর হাড় কখানি বুঝি ভেঙেই যাবে, কিন্তু ও শুধু ভাদিমের বুকের কাছে আরও ঘন হয়ে এল। এমন সময় দরজায় কড়া-নড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাসলভের গলা শোনা গেল।

“একাতেরিনা দ্মিত্রেভনা, আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পারি?...”

উত্তর না পেয়ে সাবেকী অভ্যাস মতো ও দরজার হাতল ঠক ঠক করে চল্ল। “আশা করি আপনি জানেন যে, এ শহরে সামরিক আইন চালু আছে। রাত দশটার পরও আপনার ঘরে একজন লোক রয়েছে......এই বাড়ীর দায়িত্ব যখন আমার......”

“একটু সবুর কর, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আসছি,” কাঁধ থেকে কাতিয়ার হাত সরিয়ে নিয়ে রশচিন বল্ল।

“পাগলামি কোরোনা ভাদিম—ছাড় আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আসি।... লক্ষ্মী ভাদিম, লক্ষ্মীটি।...”

পেছনে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ও তক্ষুনি বাইরে চলে গেল। আলো হাতে নিয়ে মাসলভ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে দেঁতো হাসি।

“কমরেড মাস্‌লভ, আপনাকে ভেতরে আসতে দিতে পারব না,” দৃঢ় স্বরে বল্ল কাতিয়া—এভাবে ও আর কখনো মাসলভকে জবাব দেয়নি।

দরজা থেকে পিছু হটতে হটতে মাসলভ ওকে সঙ্গে আসার জন্যে ইশারা করল। ওর দৃষ্টিটা ঠিক মৃগী রোগীর মতো, স্থির হয়ে রয়েছে কাতিয়ার মুখের ওপর। মাসলভের পেছন পেছন গিয়ে কাতিয়া জিজ্ঞাসা করলঃ

"কি? কি চান আপনি? আমি বুঝতে পারছিনে..."

"আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই...যে সর্বনাশে আমি পড়েছি সেটাকে যেন খুব বড় ক'রে দেখবেন না...আসলে ওটা সর্বনাশই নয়...আপনি নিশ্চয় সব কথা শুনেছেন...সারা জেলায়ই তো লাফালাফি, নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে...কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নাচলেই কি আর হয়..."

"আপনি কিসের কথা বলছেন জানিনে," ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল কাতিয়া। "তবে দয়া ক'রে আর আমার দরজা ধাক্কাবেন না..."

"মিথ্যে কথা বলবেন না! সব আপনি জানেন...আপনি কি চীজ তাও এবার বুঝেছি। প্রথম কথা বলে রাখি, আমার পার্টি কার্ড যেন বাতিল হয়নি এমন ভাবেই চলবেন আমার সঙ্গে...তাতেই আপনার সুবিধা..." (ওর গলাটা কেমন ঘড়ঘড় করে উঠল—যদিও কথা বলার ধরন বেশ শান্ত।) "কিছুই বদলায়নি, বুঝেছেন? দ্বিতীয় কথা—আপনার রাতের অতিথিকে এখুনি বিদায় দিতে হবে। .কেন জানতে চান? এই যে এই জন্যে..." (বোতামশূন্য তেলচিটে জ্যাকেটের পাশের পকেট থেকে একটা চেপ্টা পিস্তল বার ক'রে হাতের তালুর ওপর রাখল—যাতে কাতিয়া দেখতে পায়)। "আর শেষ কথা, আমার আপনার পুরোনো সম্পর্কই পুনঃস্থাপিত হবে।.."

কাতিয়া একেবারে থ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু চোখ পিটপিট করে। দরজায় এক ধাক্কা মেরে রশচিন বাইরে এল।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কি দরকার?"

মাসলভ মুখচোখ এমনভাবে কোঁচকাল যে, কান পর্যন্ত শুধু রেখাই দেখা যায়। নীচু হয়ে বাতিটা মাটিতে বসাল। অন্য হাতে রিভলবারটা কিন্তু আছেই, অনবরত নাড়াচাড়া করছে।

"এই, ওটা রেখে দিন!" রশচিন বল্ল। ওর কাছে গিয়ে টান মেরে রিভলভারটা কেড়ে নিল, নিয়ে নিজের গ্রেটকোটের পকেটে রাখল। "কাল এটাকে জেলা গোয়েন্দা অফিসে জমা দিয়ে দেব, সেখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। ফের যদি আমাদের দরজার কাছে আসেন তো ঘাড় ভেঙে দেব।..."

ঘরে ফিরে এল দুজনে। কাতিয়া চুপচাপ আঙুল মটকাচ্ছে। রশচিন ওকে কোট খুলতে সাহায্য করল।

"ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে কাতিয়া, ও আর কখনো নাক গলাতে আসবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে এক মাসলভের কথা শুনেছিলাম, ফৌজের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করত—এ নিশ্চয়ই সেই মাসলভ।"

অস্থির মনে কাতিয়া আর্ম-চেয়ারে বসেছিল। গা থেকে গ্রেটকোট নামিয়ে রশচিন চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর বসে পড়ল, মাথাটা রাখল কাতিয়ার কোলে।

রশচিনের চুলে, গালে, ঘাড়ে হাত বোলাতে লাগল কাতিয়া। একটু আগে মাসলভ্‌কে নিয়ে যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেল সে কথা ওরা তখন একেবারে ভুলে গেছে। কারও মুখে কথা নেই। যে-আবেগ কোনোদিন পুরানো হয় না সেই প্রচণ্ড আবেগই তখন প্রাকৃতিক শক্তির মতো দুর্দম গতিতে ওদের মনের মধ্যে নতুন ক'রে সঞ্চারিত হচ্ছেঃ রশচিনের মনে কামনার আনন্দ, আর রশচিনের আনন্দ অনুভব ক'রেই কাতিয়ার সুখ।

"আমার ভালবাসা আগের চেয়েও শতগুণ বেড়ে গেছে কাতিয়া," রশচিন বল্ল।

"আমারও।...কিন্তু আমি—বরাবরই, বরাবরই, ভাদিম..."

"তোমার কি শীত করছে?"

"না না।...তোমাকে বড্ড বেশী ভালবাসি তাই, আর কিছু নয়..."

আর্মচেয়ারটা বেশ চওড়া। চেয়ারে কাতিয়ার পাশে বসে চুমু দিতে লাগল রশচিন—কাতিয়ার চোখে, মুখে, ঠোঁটের কোণে। তারপর বুকে। বুকের বাঁ দিকে একটা তিল, কাতিয়ার মনে পড়ল যে, ভাদিম সেটাকে ভারি ভালবাসত। মনে পড়তেই ব্লাউসের বোতাম খুলে দিল কাতিয়া—যাতে ভাদিম চুমু দিতে পারে।

উনুনটা সত্যিই একেবারে নিভে গিয়েছিল, ঘরের ভেতরটা যেন জমে যাচ্ছে। রশচিন উবু হয়ে বসল 'ভোমরা'টার পাশে—চোখ কিন্তু কাতিয়ার দিকে বাঁধা, স্মিত হাসিতে মসৃণ দাঁতগুলি উন্মুক্ত—বসে বসে পোড়া কাঠে ফুঁ পাড়ে আর মেহগনি চেয়ারের পায়া-ভাঙা টুকরো নিয়ে ভোমরার ভেতর ফেলে ফেলে দেয়। ঘরটা গরম হয়ে উঠল আবার। কাপড় ছাড়ার সময় কাতিয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল—হাসতে হাসতে রশচিন তার মুখখানি দু' হাতে তুলে ধ'রে চুমু এঁকে দিল।

চিমনীর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া সারা রাত গোঁ গোঁ ক'রে বেড়ায়, হাওয়ার ধাক্কায় প্রচণ্ড ঢং ঢং শব্দ ওঠে ছাতের টিনগুলোতে। মাঝে মাঝে উঠে উঠে দেবী 'সাইকি'-র মতোই কাতিয়া বাতিটাকে ঠিক ক'রে দিচ্ছিল—কিন্তু ঘুমন্ত রশচিনের মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি একবারও। আনন্দ উপছে পড়ছিল ওর মনের মধ্যে; এও জানত যে ভাদিমের মনেও তখন আনন্দের ঢেউ—নইলে তার ঘুমন্ত মুখটা অমন প্রশান্ত অথচ গম্ভীর হবে কেন?

"কাতিয়া, কাতিয়া" বলে চীৎকার করতে করতে হুড়মুড় শব্দে রান্নাঘরের মধ্যে ছুটে এল দাশা। গলিপথের মেঝের ওপর বরফ-জমা বুট জোড়া ঠুকছে আর চীৎকার দিচ্ছেঃ "কাতিয়া, আমার কাতিয়া!" ওর ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে দু'হাতে সাপটে ধরে, চুমু খায়, একটু দূরে সরিয়ে ধ'রে আবেগের সাথে চেয়ে চেয়ে দেখে, তারপর আবার জাপটে জাপটে ধরে আর আদর ক'রে পিঠ থাবড়ায়। দাশার গায়ে বরফ আর শীপস্কিনের গন্ধ, মোটা আটার রুটির

গন্ধ। চাষী বৌয়ের মতো শাল আর শীপস্কিন জ্যাকেট—এই ওর অঙ্গাবাস। পিঠে একটা বাণ্ডিল।

"কাতিয়া বোন, সোনা, মণি, আমার আদরের কাতিয়া...ওঃ তোমার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে ছিলাম, কত যে স্বপ্ন দেখতাম।...ভাব তো একবার, সেই ইয়ারোস্লাভ্‌ল স্টেশন থেকে এ পর্যন্ত সারাটা রাস্তা হেঁটেই আসতে হল! মস্কোটা একেবারে পাড়াগাঁ বনে গেছেঃ সব চুপচাপ, চারদিকে খালি কাক আর বরফ রাস্তার মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ জেগে উঠেছে...ওঃ কী দূর রে বাবা! ঠ্যাং দুটো আর থাকবে না।...কুজমা কুজমিচ আবার দু 'পুড' ময়দার বস্তা ঘাড়ে করে আনলেন...। 'পুরোনো আস্তাবলের গলি' পর্যন্ত তো ঠিক এলাম, কিন্তু তারপর বাড়ীটা আর খুঁজে পাইনে! রাস্তার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত ঘুরলাম তিন তিন বার।...কুজমা বল্লেন, রাস্তা ভুল হয়েছে।...আমি তো চটেমটেই লাল—বাড়ীটা ভুললাম কি ক'রে? তারপর হঠাৎ...কি হ'ল বল তো? দেখি বাঁক ঘুরে একজন লোক আসছেন, মিলিটারির লোক, তাঁর কাছে গিয়ে বললামঃ "দেখুন কমরেড...।" আর তিনি, দু চোখ মেলে হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন আমার দিকে...আমি তো থ, সোজা বরফের মধ্যেই বসে পড়লাম... লোকটি যে ভাদিম! মনে হল একেবারে পাগল হয়ে গেছি...মরা মানুষ, সে কিনা মস্কোর রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে...আর ওর সে কি হাসি, হাসে আর চুমু দেয়... আমি আর উঠতেই পারিনে।...কাতিয়া, আমার চাঁদমণি, বুদ্ধিমতী ধন আমার ...আরে কত কথা আছে, পুরো দশ রাত্তির লাগবে বলতে।...ইয়া আল্লা, এবার তো ঘরটা মনে পড়েছে। ঐ তো সেই খাট আর ওষুধের আলমারি, তার ওপর 'মোহিনী' মূর্তি। ভাদিমের কাছে ইভানের খবর পেলাম। ক'দিনের মধ্যেই ওদের ইউনিটের জন্যে একটা হাসপাতাল ট্রেন যাবে, আমিও যাব ঠিক করেছি। আমি যাব নার্স হয়ে, আনিসিয়া, কুজ্‌মা কুজ্‌মিচ ওরাও যাবে... কুজমাকে এখানে একলা ছাড়া ঠিক হবে না, মুশকিলে পড়ে যেতে পারেন।... ওঃ খিদেয় একেবারে প্রাণ গেল কাতিয়া।...দাও দাও কেটলিটা চড়িয়ে দাও! খাওয়ার পর চানও করতে হবে। ইয়ারোস্লাভ্‌ল থেকে মালগাড়ী আসছিল, তাতে কাটিয়েছি পুরো একটি হপ্তা...সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে বেশ তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে হবে।...তোমার ঘরে এখন ঢুকব না, রান্নাঘরেই থাকি। এসো এসো আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই...ওঃ এরা একেবারে আশ্চর্য লোক, বুঝেছ, কাতিয়া! আমার জীবনের জন্যে ওদের কাছেই ঋণী, শুধু জীবন কেন, সব কিছুরই জন্যে! আমরা নিজেরাই উনুন ধরিয়ে নিচ্ছি, জলও গরম ক'রে নিচ্ছি—আসবাবপত্রের তো অভাব নেই।...সে কি কাতিয়া, তোমার একটা চুলও পাকেনি? আরে সাবাশ, তোমাকে যে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট বলে মনে হচ্ছে।...হ্যাঁ হ্যাঁ, শীগ্গিরই আমরা সবাই আবার এক হব, আলবৎ হব..."

মস্কোয় তখন রেশন দেওয়া হচ্ছে জই। প্রজাতন্ত্রের রাজধানীতে ১৯২০ সালের শীতকালের মতো এমন দুঃসময় আর কখনো আসেনি। হাতের কাছে লোকবল যা ছিল সবই লালফৌজের আক্রমণের কাজে খরচ হয়ে গেছে। হোয়াইটদের জমানো কয়লা আর শস্য যা কিছু দখল করা হয়েছিল, সে সবও নিঃশেষিত। তার ওপর কসাক আর ভলাণ্টিয়ারের দল উর্বর এলাকাগুলোকে এমনভাবে ছারখার করে দিয়ে গেছে যে, শ্রমিকদের খাদ্য-বাহিনী সে সব এলাকায় বাড়তি শস্য প্রায় খুঁজেই পাচ্ছে না।

'তুষার অভিযানের' বাৎসরিকীর দিন ভলাণ্টিয়ার আর্মি আবার নভরসিস্ক-এর দিকে পশ্চাদ্বর্তন করল—কুবান স্তেপের দুরতিক্রম্য কর্দমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রইল পরিত্যক্ত মোটঘাট, কাদায় আটকানো কামান, আর ঘোড়ার লাশ। সব তখন শেষ। পলিতকেশ, ন্যুব্জদেহ আন্তন ইভানোভিচ দেনিকিন ফরাসী টর্পেডো বোটে চড়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন—এবার থেকে প্রবাসী জীবনযাপন করবেন, আর জীবন-স্মৃতি লিখবেন। ভলাণ্টিয়ার রেজিমেন্টগুলোর যা সামান্য অংশ অবশিষ্ট ছিল সেগুলোকে ক্রাইমীয়া চালান করা হয়েছে। এতদিন পরে দন আর কুবান কসাকদের চৈতন্য হয়েছে যে তারা নিষ্ঠুর প্রতারণার ফাঁদে পড়েছিল: ভরোনেঝ থেকে নভরসিস্ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কত অসংখ্য কবর—নামগোত্রহীন—সেগুলিই আজ তাদের একগুঁয়েমির দেনা শোধ করছে।

মস্কোতে তখনো শীত, মার্চের ঝড়-ঝঞ্ঝায় শহর একেবারে তুষারাস্তীর্ণ। বেড়াটেড়া, আসবাবটাসবাব অনেক কিছুই জ্বালানো হয়ে গেছে। কল-কারখানা সব বন্ধ। অফিসে অফিসে কর্মচারীরা গুটিসুটি বসে আছে, পেন্সিল ধরার চেষ্টায় ফুলো ফুলো আঙুলে ফুঁ পাড়ছে—কালিটালি সব জমে পাথর হয়ে গেছে, গরম না পড়লে আর গলবে না। লোকের হাতে রেশনের থলিটি একেবারে বাঁধা, আস্তে আস্তে পথ হাঁটে—বাসা থেকে অফিস পর্যন্ত যেতে সকলকেই প্রায় পথের মধ্যে খানিকটা জিরিয়ে নিতে হয়—কোনো বরফ-গাদায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, নয়তো কোনো দরজার আড়ালে আশ্রয় নেয়। তার ওপর অনাহারের যন্ত্রণায় সকলে একশেষ—লোকে কচি শুয়োরের স্বপ্ন দেখে, যেন সুগন্ধি পার্সলি শাকের গুচ্ছ দাঁতে ধরে নরম সেদ্ধ শুয়োরছানাটা একেবারে ডিশে করে হাজির: ঘুমোতে ঘুমোতেই মানুষ শূন্যে কামড় দেয়, ভাবে যেন ইয়া পুরু হ্যাম আর সেদ্ধ ডিম চিবোচ্ছে। কিন্তু মনের মধ্যে সবাইয়ের দারুণ উত্তেজনাঃ রক্তাক্ত প্রতিবিপ্লবের নাছোড়বান্দা রাক্ষসটা টুঁটি টিপে ধরেছিল, কিন্তু আজ তাকে শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, জীবন এখন সামনে এগিয়ে চলেছে। আর কয়েক মাস দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারলেই আবার রুটি পাওয়া যাবে। তারপর সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়ে লালফৌজের সিপাহীরা লাগবে শান্ত মেহনতের কাজে—যা ধ্বংস হয়েছে, তা ফিরিয়ে আনবে, গড়ে তুলবে নতুন জীবন। সমস্ত যন্ত্রণা, শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী অত্যাচারের সমস্ত তিক্ততা—সব মুছে যাবে মানুষের মন থেকে।

দাশার ইচ্ছা সার্থক—ওরা সবাই আবার এক হয়েছে। রশ্‌চিন আর তেলেগিন অল্পদিনের ছুটি পেয়েছিল, দাশার হাসপাতাল ট্রেনে চড়ে মার্চের এক শীতার্ত প্রভাতে তারা মস্কো এসে পৌঁছাল। শহরের আকাশ ঘিরে ধূসর রঙের মেঘ চলেছে, ছাতে ছাতে বরফ গলছে, ছুঁচলো বরফের বড় বড় টুকরো খসে খসে পড়ছে। গুরুভার, সুগন্ধ বাতাসে কেমন যেন অস্থির চঞ্চলতা।

কাতিয়া ওদের নিতে এসেছিল। গাড়ীর জানলা থেকে ওকে প্রথমে দেখতে পেয়ে গাড়ী থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ভাদিম। কাতিয়ার চোখে, মুখে, হাসিতে, দেহের সর্বাঙ্গে খুশি যেন উপচে পড়ছে। ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় লোহার থামগুলো ঢাকা পড়ে গেছে--সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ও ভাদিমের দিকে ছুটল। ডিসেম্বরে ওকে যেমন দেখেছিল, তার চেয়েও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে বলে ভাদিমের মনে হল। ওদের প্রণয়-জীবনের সবখানিই তো এই এমনি ধারা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের মধ্যে। দেখা হবা মাত্র ওরা দুজনে এক পাশে সরে গিয়ে ঘড়িটার নীচে দাঁড়াল। কিন্তু নিজের সম্পত্তি না দেখালে দাশার আর চলে না, তেলেগিনকে দেখে কাতিয়া তারস্বরে আনন্দ জানাবে, তবে তো? টানতে টানতে তেলেগিনকে নিয়ে এল ওদের কাছে।

"দেখ দেখ একবার চেয়ে দেখ কাতিয়া। কি রকম বদলেছে দেখেছ? পিতার্সবুর্গে থাকার সময় মনে হ'ত ওর মুখটাতে কি যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ...চোখদুটোও এখন বদলেছে।. কিছু মনে কোরো না ইভান--কিন্তু সেবার স্টীমারে করে যখন সামারা গেলাম, তখন তোমার চোখদুটো ছিল একেবারে ফিকে নীল, একটু বোকা বোকাও বটে। আমার তো একটু ভাবনাই হয়েছিল। ...কিন্তু এখন একেবারে ইস্পাতের মতো.... "

কাতিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে তেলেগিন শুধু আবেগভরে শ্বাস ছাড়ে—ধীরে ধীরে, টেনে টেনে। ওকে দেখে কাতিয়ারও খুব ভাল লাগল- বেশ একটা সুপরিচিত স্থির, প্রশান্ত ভাব আছে তেলেগিনের।

"ও কেমন ধারা লোক শুনবে? শুধু একটা ঘটনা বলছি: কি করেছে জান? যখন যেখানে লড়াইয়ে গেছে, এমন কি মামন্তভের পেছনেও যখন ঘোড়ায় চড়ে ধাওয়া করেছে--তখনও জিনের থলির মধ্যে একটি জিনিস কখনো পুরে রাখতে ভোলেনি। কি জিনিস বলতে পার? চীনেমাটির বেড়ালছানা একটা আর কুকুরছানা একটা—জারিত্সিনে আমাদের দ্বিতীয় বিয়ের দিন ওটা আমাকে দিয়েছিল.........মানে ও দুটো আমার খুব পছন্দ ছিল কিনা......"

গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে কাতিয়ার কাছে ছুটে এল কুজমা কুজমিচ—দুহাতে ওর হাতটা ধরে নাড়ছে তো নাড়ছেই। পরিষ্কার করে কামানো লাল মুখটা খুশিতে আর ভালবাসায় একেবারে চকচক করছে: সার্জনের শাদা কোট গায়ে ওর চেহারাটা এমন মোটাসোটা আর তেল-চিকচিকে যে, আশেপাশের রোগা রোগা মানুষজন সব ওকে দেখে মুখই বেঁকাল।......

"একাতেরিনা দেবী, ঐ ক'দিনের মধ্যে আপনিও আমার প্রিয়জন হয়ে গেছেন,

ঠিক দারিয়ার মতো," কুজমা বল্ল। "আমি বরাবরই বলে এসেছি, রুশ মেয়ের মতো এত সুন্দর মেয়ে আর হয় না......ঐকান্তিক আবেগ তাদের মনে, স্বার্থত্যাগও করতে পারে; তারা ভালবাসার ভক্ত, আবার দরকার হলে দেখা যাবে যে, সাহসও আছে দারুণ।......কাতিয়া দেবী, আমাকে দিয়ে যা কাজ হবে বলবেন, যখন ইচ্ছে।......কাজটাজগুলো সেরে নিয়ে দুপুর নাগাত আপনাদের ওখানে আসছি—রস্তভ থেকে দু-চারটা জিনিস এনেছি দেখবেন।......সেখানে এখন বসন্ত।......তবু কেন জানি উত্তরটাকেই যেন বেশি ভাল লাগে। আচ্ছা, এখন তাহলে আসি......"

তারপর আনিসিয়া। ওর গায়েও সাদা কোট। ডাগর চোখ দুটিতে হতাশা আঁকা: এই ক্ষেপের পর মস্কোয়ই থেকে যেতে পারবে ভেবেছিল, কিন্তু বড় ডাক্তার (সত্যি তাঁর ব্যবহারটা বড়ই বে-সোবিয়েত ধরনের!) কথাটা কানেই তুল্লেন না। "আরে নাটকের ইস্কুলে তোমার কি দরকার? বড় বড় যুদ্ধ হবে শীগ্গিরই আবার, কত লোক আহত হবে......। না, তোমাকে যেতে দিতে পারিনে!"

"আচ্ছা দেখি, শরৎকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে," রুমালের খুঁটে নাক মুছতে মুছতে দাশাকে বল্ল আনিসিয়া। "কিন্তু এম্‌নিভাবে সময় চলে যাচ্ছে, একটার পর একটা ক'রে আমার বছর নষ্ট হচ্ছে—এ বড় খারাপ।......লাতুগিনও তো এখানে, বোকচন্দর স্টেশনে এসেছিলেন দেখা করতে। এখানে এসেছে কংগ্রেসে যাবে বলে—ডেলিগেট হয়েছে কিনা। ও এখন মহা-গম্ভীর লোক, দেমাকও বেশ।......বল্ল, পর পর তিন দিন ধ'রে স্টেশনে আসছে, এই হাসপাতাল ট্রেন কখন আসে তার জন্যে......গেছে বড় ডাক্তারের কাছে, একদিনের জন্যে আমার ছুটি করিয়ে আনতে পারে কিনা দেখবে।...ওর কাছে আগ্রিপিনার কথা শুনলাম ভাই। সে আছে সারাতভে, বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু ছেলে না মেয়ে তা ও বলতে পারল না। অনেকদিন অসুখে ভুগেছিল। ......বাচ্চা নিয়ে আবার রেজিমেণ্টে ফিরে গেছে। ......বেচারী! ওর আবার বড় কঠিন প্রকৃতি—আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না......"

মস্কোর এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে ওরা পুরোনো আস্তাবলের গলিতে পৌঁছাল। যে ঘরে আগে মাস্‌লভ থাকত, সেটাই দাশা আর তেলেগিনের জন্যে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। মাসলভ গেছে প্রায় দু'মাস—প্রথমে বইপত্র নিয়ে গিয়েছিল, তারপর নিজেই উধাও। ওরা সবাই খুব আস্তে হাঁটছে, নইলে কাতিয়া পারে না। ওপরে বসন্তের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ—ভাদিমের ইচ্ছা করছিল কাতিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে মেঘের নীচে দিয়ে হেঁটে চলে যায়। তেলেগিন আর দাশা একটু পেছনে পেছনে চলেছে, যাতে ওদের অসুবিধা না হয়।

"কাতিয়ার জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে," দাশা বল্লে। "মস্কো আর এই ইস্কুল—এতেই ও মরবে। কিছুই প্রায় খায় না। তিন মাসের মধ্যেই পায়ের চামড়া একেবারে মোমের মতো সাদা হয়ে গেছে।......আমাদের সঙ্গে ট্রেনে এসে থাকা উচিত ওর, খাইয়ে-দাইয়ে ঠিক করে দেব।...ও তো শুধু আবেগের ওপর বেঁচে

আছে। না, এমন করলে চলবে না।"

তেলেগিনও বেশ তাৎপর্যসহকারে শান্তভাবে জবাব দিলঃ

"ওর অভাবে ভাদিমও শুকিয়ে যাচ্ছে।......"

একটু পরেই লাতুগিন আর আনিসিয়া ওদের ধরে ফেল্ল। আনিসিয়া সার্জনের কোট খুলে ফেলেছে, গাল দুটিতে খাসা গোলাপী রং ধরেছে। লাতুগিন কিন্তু গম্ভীর, তার ভুরু একেবারে কোঁচকানোই আছে। খুব সংযতভাবে ওদের সম্ভাষণ ক'রে তারপর গ্রেটকোটের হাতার মধ্যে থেকে বল্‌শয় থিয়েটারের চারটে টিকিট বার করল—একেবারে ওপর তলার গ্যালারীর টিকিট।

"লড়াইয়ের ময়দানের চেয়েও খারাপ অবস্থা এখানে," টিকিট ক'টা দিতে দিতে লাতুগিন বল্ল। "এই ক'টা টিকিট পেতেই কী মারামারি করতে হয়েছে।......তবে ভাগ্যি ভাল, দেখি কম্যাণ্ডাণ্ট আমাদেরই জাহাজী ব্রাদার, 'অরোরা' ক্রুজারের নাবিক।......দেখবেন, আপনারা যেন দেরী করবেন না, আজকের অধিবেশন খুব গুরুতর ব্যাপার। আচ্ছা, চল আনিসিয়া......"

মানুষের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বলশয় থিয়েটারের পাঁচতলা প্রেক্ষাগৃহে আবছা কুয়াশা জমেছে—শত শত ইলেক্‌ট্রিক বাতির মৃদু লালচে দীপ্তিও সে কুয়াশা যেন ভেদ করতে পারছে না। হলের ভেতরটা ঠিক কবরের মতো ঠাণ্ডা। প্রকাণ্ড স্টেজের ওপর একটুখানি একপাশ ক'রে সভাপতিমণ্ডলীর টেবিল, তার প্রায় সামনেই ফুটলাইট—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জ্বলছে। উইংগুলো ক্যাম্বিশের খিলান দিয়ে ঢাকা। মঞ্চের পেছনে ইয়োরোপীয় রুশিয়ার একটা ম্যাপ ঝুলছে—ম্যাপটার প্রায় সর্বাঙ্গেই খালি বিন্দু আর বৃত্ত। সকলের দৃষ্টি ম্যাপের দিকে। ফার-কোট প'রে খালি মাথায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাপের সামনে। তাঁর প্রশস্ত কপাল থেকে চুলগুলি পেছনে আঁচড়ানো, ম্যাপের ওপর তার ছায়া পড়েছে। হাতে বিলিয়ার্ডের লম্বা ছড়ি—ঘন ভ্রু-জোড়া এক ক'রে মাঝে মাঝে সেই ছড়ির ডগাটা রঙীন বৃত্তের ওপর ঠেকান—অমনি সেখান থেকে তীব্র আলো ঝলসে ওঠে। সে আলোয় হলের ভেতরকার রং-চটা সোনালি রূপসজ্জা ঝকমক করে। অসীম মনোযোগে বিস্ফারিত মানুষের চোখ, উত্তেজিত রোগা রোগা মুখ—সবই একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

থমথমে স্তব্ধতার ওপর দিয়ে তাঁর উঁচু স্বর ভেসে এলঃ

"শুধু আমাদের ইয়োরোপীয়ান রুশিয়াতেই 'হাওয়া-শুকোনো পীট' * মজুত রয়েছে কোটি কোটি টন। কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজনের পক্ষে এই পীট যথেষ্ট। স্থানীয়ভাবেই পীট পাওয়া যায়। এক একর বন-জমি থেকে যা শক্তি উৎপন্ন হয় তার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী হতে পারে এক একর পীট-জলা থেকে। বিপ্লবী গঠনকর্মের সমস্যা আজ আমাদের সামনে, সে সমস্যা সমাধানে প্রথম স্থান নেবে

---

* পীট—এক রকম জ্বালানি, সাধারণত জলা জায়গায় পাওয়া যায়। —অঃ

পীট, তারপর জল-বিদ্যুত শক্তি আর কয়লা। যুদ্ধ জিতেই বিপ্লব যদি শান্ত হয়ে যায়, বিপ্লবী তত্ত্বগুলিকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাতে আরম্ভ না করে, তাহলে সে-বিপ্লব দমকা হাওয়ার মতোই উড়ে চলে যাবে। আজ এখানে আমাদের মধ্যে বসে আছেন ভ্লাদিমির ইলিয়িচ লেনিন—আমার আজকের বক্তব্যের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। বিপ্লবের বিকাশের জন্যে তিনি অতি-সংক্ষেপে একটা সার কথা সৃষ্টি করে দিয়েছেন: 'কমিউনিজ্‌ম হচ্ছে সোবিয়েত শাসনের সঙ্গে বিদ্যুত-ব্যবস্থার যোগফল'।"

"লেনিন কই?"—পাঁচতলার গ্যালারি থেকে নীচের দিকে চেয়ে কাতিয়া শুধাল। ওর রোগা হাতটা সারাক্ষণই হাতের মধ্যে ধরে রেখেছে রশচিন—সে ফিসফিস ক'রে জবাব দিল:

"কালো কোট গায়ে ঐ উনি—ঐ যে খুব তাড়াতাড়ি কি নোট করছেন এই এবার মাথা তুলে নোটটা টেবিলের ওদিকে ছুঁড়ে দিলেন......ঐ উনিই লেনিন। আর একেবারে শেষে রোগা মতো লোকটি, কালো গোঁফ, উনি স্তালিন, দোনিকিনকে উনিই ঠাণ্ডা করেছেন।......"

বক্তা বলে চলেছেন:

"রুশিয়ার কালাতীত স্তব্ধতার মধ্যে যেখানে যেখানে লক্ষ কোটি টন পীট লুকিয়ে আছে, যেখানে জলপ্রপাত আছে কিংবা বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করছি—সমাজতান্ত্রিক মেহনতের পক্ষে এগুলো হবে এক একটা আলোকস্তম্ভ। শোষণকারীদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রুশিয়া—চিরকালের জন্যে—এখন বৈদ্যুতিক আগুনের অনির্বাণ দীপ্তিতে দেশকে আমাদের ভাস্বর করে তুলতে হবে। যে মেহনত ছিল অভিশাপের মতো, তাই হবে আশীর্বাদস্বরূপ।"

ভবিষ্যতের বিদ্যুত স্টেশনগুলির দিকে ছড়ি তুলে দেখালেন, সভ্যতার নতুন নতুন কেন্দ্রের প্রতীকস্বরূপ বৃত্তগুলিকে স্পর্শ করলেন। অমনি বিরাট মঞ্চের আধা-অন্ধকারের মধ্যে বৃত্তগুলি তারার মতো ঝলসে উঠল। এই রকম কয়েকবার কয়েক মুহূর্তে মাত্র ম্যাপের ওপর আলো জ্বালাবার জন্যে মস্কো বিদ্যুত স্টেশনের সমস্তটা শক্তিই হলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছিল—এমন কি ক্রেম্‌লিনে পীপল্‌স কমিসারদের অফিসে পর্যন্ত সমস্ত আলো খুলে নিতে হয়েছিল—টিম টিম করে জ্বলছিল শুধু একটি মাত্র ষোল পাওয়ারের বাল্‌ব।

বিপ্লব এখন সৃষ্টির পথে। সে বিপ্লবের এমনি ধারা সম্ভাবনার কথা—যা শুনলে মাথা ঘুরে যায়, অথচ যা কাজে পরিণত করা সম্পূর্ণ সম্ভব—হলের সমস্ত মানুষ দম বন্ধ করে সেই কথাই শুনছে। তাদের বুলেটবিক্ষত কুর্তা আর মিলিটারী গ্রেটকোটের পকেটে শুধু কয়েক মুঠো জই—সেদিন রুটির বদলে তারা ওই পেয়েছিল।

"উনি যা বলছেন তার মর্ম খুব ভালই বোঝেন", আস্তে আস্তে দাশাকে বল্ল তেলেগিন। "আমি চিনি ওঁকে, বেশ চিনি—উনি এঞ্জিনীয়ার। যুদ্ধ শেষ

হোক, আবার কারখানায় চলে যাব—কয়েকটা পরিকল্পনার কথা আমি নিজেই ভেবেছি।......ওঃ দাশা, কাজে ফিরে যাবার জন্যে কী ইচ্ছেই যে করছে! ঐ রকম বিদ্যুত-শক্তির বনিয়াদ যদি ওরা গড়ে দিতে পারে, তাহলে কী না করা যায়।...... আমাদের দেশের যা সম্পদ—ধারণাই করতে পারবে না তুমি! ঠিকভাবে লাগাতে পারলে আমেরিকাকেও আমরা বহুদূরে ফেলে যাব। আমাদের সম্পদ ওদের চেয়ে কত বেশী।......আমার সঙ্গে তুমি যাবে, সেই উরালে......"

দাশা জবাব দিলঃ

"হ্যাঁ, বেশ কাঠের বাড়ীতে থাকব—বড় বড় জানলা—একেবারে ঝকঝকে তকতকে—রজনের ফোঁটা বেরুবে কাঠের ভেতর দিয়ে।......শীতের সকালে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলবে দাউ দাউ করে।......"

রশ্চিন—কাতিয়ার কানে কানেঃ

"বুঝলে এবার? এত যে খাটলাম আমরা, খুন ঝরালাম, যন্ত্রণা সইলাম নীরবে, মানুষের অগোচরে—সে সবের পেছনে কত বড় তাৎপর্য রয়েছে বুঝতে পারলে তো......? সকলের যাতে মঙ্গল হয় তেম্‌নিভাবে পৃথিবীটাকে সাজানো হবে, একেবারে নতুন ক'রে।......এই হলে যারা এসেছে তারা প্রত্যেকেই এর জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত।......এ শুধু কথা নয়। ওদের গায়ে এখনো কালশিরা আছে, বুলেটের দাগ আছে—ওরা দেখিয়ে দিতে পারে।......এত যে কর্মকাণ্ড, সে তো এখানেই, আমারই নিজের দেশে। এরই নাম রুশিয়া।"

"শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে," ম্যাপের পাশ থেকে বক্তা বল্লেন। ছড়িটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন—ছড়ি না তো যেন বর্শা। "প্রতিরোধের বেড়া তুলে আমরা লড়ছি—নিজেদের অধিকারের জন্যে, সারা পৃথিবীর অধিকারের জন্যে। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ আমরা চিরকালের মতো শেষ করে দেব—তাই লড়ছি।"

VOLTAS-VOLKART EMPLOYEES' UNION LIBRARY
CALCUTTA.